সুবর্ণবণিক্ সমাচার

(সচিত্র মাসিক পত্র)

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন   শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

দ্বাবিংশ বর্ষ

অগ্রহায়ণ ১৩৪৪—কার্তিক ১৩৪৫

কার্য্যালয়

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা

সূচী

চিত্র সূচী

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক্ সমাচার

(সচিত্র মাসিক পত্র)

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন   শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

দ্বাবিংশ বর্ষ

অগ্রহায়ণ ১৩৪৪—কার্তিক ১৩৪৫

কার্য্যালয়

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা

সূচী

চিত্র সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
অধ্যাপক টমাস, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা	...	১১০
কলিকাতার সেরিফ ডক্টর সত্যচরণ লাহা, ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিংলিথগো	...	১০৭
কুমারী কনক দত্ত	... ...	৫৯৯
গুডিভ মেডাল	... ...	৫২১
৺গৌরমোহন দে	... ...	৫২০
জুলজি মেডাল	... ...	৫২১
ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা	... ...	৪২৬
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সি আই ই	... ...	৩৬৮
ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র (ত্রিবর্ণ), শ্রাবণ সংখ্যার মুখচিত্র	... ...	৪৭৭
ধর্মশালার বারান্দা হইতে ওঁকারেশ্বরের মন্দিরের দৃশ্য	... ...	৫৫৭
নর্মদাতীরে ওঁকারেশ্বরের মন্দির ও প্রাসাদ	... ...	৫৫৬
৺পান্নালাল মল্লিক	... ...	৬৭
বালিগঞ্জ ব্যাঙ্কের বার্ষিক অধিবেশন	... ...	১৯৫
৺বৈদ্যনাথ দে	... ...	৩৯১
মহাকালের মন্দির, উজ্জয়িনী	... ...	৫৫৪
লণ্ডন ইউনিভার্সিটি মেডাল	... ...	৫২১
শ্রীমান্ মধুসূদন নন্দী	... ...	৫১৫
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন	... ...	৩৮০
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	...	১০৮
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মল্লিক	... ...	৬৭৬
শ্রীশ্রী৺মহাকাল মূর্তি, উজ্জয়িনী	... ...	৫৫৫
সাতগেছিয়া সান্ধ্য-সম্মিলনীতে গৃহীত আলোক-চিত্র	... ...	৪২১
সিপ্রাতীরে রামঘাট ও মন্দিরাবলী, উজ্জয়িনী	... ...	৫৫৩
স্বর্গীয় প্রেমলাল মল্লিক	... ...	৩৪০
স্বর্গীয়া চুণীমণি দাসী	... ...	৩৮৯

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক সমাচার

২২শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ সাল | ১ম সংখ্যা

শিলঙের পথে

শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ

ভ্রমণ আমি করি, কিন্তু স্থান-নির্দেশ করেন, ইউনিভার্সিটির সম্মানিত ছাত্র পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষক বন্ধু শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ। প্রচলিত দস্তুর এবং প্রথা অনুযায়ী এবারেও তিনি তৃতীয়ার দিন আসিয়া জানাইলেন—"সুধাংশু চল কালই পালাই। পঞ্চমীর দিন থেকে ভিড় হবে। এবার শিলং বুঝলে ?"

শিলংএর নামে মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ইহার বহুখ্যাতি বহুকাল হইতে আমাকে টান দিতেছিল। বন্ধুর নির্বাচনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মনে মনে কহিলাম —"কিন্তু গতিটা তোমার পশ্চিম হতে একেবারে পূর্বদিকে সঞ্চালিত হল এরই বা কারণ কি।"

যাহা হউক সেই আনন্দের আতিশয্য আর "কালই পালাইবার" ইচ্ছা লইয়া বন্ধুর অনুসরণ করিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলাম সকলেই এক সঙ্গে একই পথে পলাইতে গিয়া এক-স্থানে আসিয়া ধরা দিয়াছি। সে এক প্রকাণ্ড কাণ্ড। শিলং এবং অন্যান্য স্থানে পলায়মান যাত্রীরা মিলিয়া প্ল্যাটফর্মটাকে মাথায় করিয়া তুলিয়াছে। তাহারই মধ্যে নিজেদেরকে গুঁজিয়া দিলাম। এইবার ভিড়ের চাপে পূর্বসঞ্চিত আনন্দ-রসের খানিকটা যে নিংড়াইয়া বাহির করিয়া লইল, সে কথা না বলিলেও অনুমান করা চলে।

ক্রমাগত যাত্রীর ধাক্কা আর কুলীর ধাক্কা খাইয়া খাইয়া প্রায় শেষ দিকটাতে আসিয়া একটি "৪৬ জন বসিবেক" কামরায় ৭৬ জনের মধ্যে দাঁড়াইবার স্থান অধিকার করিয়া হাঁপ ছাড়িতেছে এমন সময় একটি পূর্বপরিচিত বন্ধু হঠাৎ উদয় হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি-রে সুধাংশু! কোথায় চলেছিস ?"

আমি বলিলাম—'শিলং।"

"শিলং" ? তিনি বলিলেন, "কিন্তু এই ভিড়ে থার্ড ক্লাশে কি দূরের পথ ট্র্যাভেল করা যায়। আমিও তো শিলং যাচ্ছি। অন্তত সেকেণ্ড ক্লাস না হলে চ'লে সুখ নেই।"

বুঝিলাম, বন্ধু সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী এবং 'চ'লে সুখ নেই' সে তো হৃদয় দিয়া পলে পলে উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু উপায়ই বা কি? উত্তরে বলিলাম—"তোমরা ভাই বড় লোক। কাজেই অন্তত সেকেণ্ড ক্লাসে চলতে পারলে তোমাদের একটু সুবিধেই হয়। আর আমি অন্তত থার্ড ক্লাসের নীচে যদি কোন ক্লাস থাকতো কিংবা মাল গাড়ীতে মানুষ টানতে আরম্ভ করতো তা হলে তাতেই যেতাম এবং তাতে আমারও একটু সুবিধেই হোত।"

মনে মনে বলিলাম,—"ভগবান্ চক্ষুদানে কোন ক্লাস নির্ণয় করেন নি। আসল উদ্দেশ্যে কোন বিভ্রাট নেই। বিভ্রাট এই ট্রেনের কামরায়।"

যাহা হউক বন্ধু কৃষ্ণ-বিনোদ কিছু লজ্জিত হইলেন কি না জানি না; তবে তিনি একটু বিনয় প্রকাশ করিয়াই কহিলেন—"আরে না, না, ভাই, সে সব কিছু নয়। আমি ভাই, পাস পেয়েছি। পাণ্ডু থেকেও কমার্শ্যাল ক্যারিং কোম্পানীর একটা ফার্ষ্ট ক্লাস পাসও আছে। তাই বলছিলাম......"

এতক্ষণে মনে পড়িল কৃষ্ণবিনোদ রেল কোম্পানীরই একজন মোটা-চাকুরে। ইত্যবসরে গাড়ী ছাড়ার প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গেল, কৃষ্ণবাবু বিদায় নিলেন এবং আশ্বাস দিয়া গেলেন শিলং যাইয়া দেখা দিবেন। সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীকে থার্ড ক্লাসের পলায়মান যাত্রীর কষ্টটা প্রত্যক্ষ করিবার অবসর দিয়া আমার নিজেরই লজ্জা বোধ হইতে ছিল। কাজেই শিলং যাইয়া দেখা পাইবার ভরসায় না হউক বন্ধু আমাকে মুক্তি দিয়া নিজেও পরিত্রাণ পাইলেন, এই ভাবিয়াই আশ্বস্ত হইলাম।

ঠিক দেড়টায় আসাম মেল নাকি-সুরের বাঁশী বাজাইয়া সকলকে তাহার ষ্টেশন পরিত্যাগের বার্তা জানাইয়া পেট-ঠাসা অগুন্তি যাত্রী সহ চলিতে সুরু করিল। তখন সে আর এক দৃশ্য। অনেকেই জানালা গলাইয়া, অনেকে দরজা খুলিয়া টুপটাপ্ করিয়া লাফাইয়া পড়িল। বুঝিলাম ইঁহারা সকলেই বন্ধুদেরকে বিদায়-অভিনন্দন দিতে আসিয়াছিলেন, যাইবেন না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিদেশগামী বন্ধুর সঙ্গসুখ লাভের সুযোগ ছাড়িতে এবং বন্ধুর নিমিত্ত রিজার্ভ-করা জায়গা ছাড়িতে ইঁহারা কেহ রাজি ছিলেন না। অনেকে বিলিতী কায়দায় রুমাল উড়াইয়া বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতে লাগিলেন। অনেকে আবার হর্ষ-বিষাদ-গম্ভীর মুখে প্রিয়জনের দিকে শুধু নীরবে চাহিয়াই অন্তরের ভাষা ব্যক্ত করিলেন।

এই সমস্ত সকলকেই উপেক্ষা করিয়া গাড়ী চলিতে সুরু করিল। এইবার মনে হইল, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সত্যিই তাহা হইলে জনবহুল কলকারখানার রাজত্ব কলিকাতা সহর ছাড়িয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবের হস্তরচিত সুরম্য পার্বত্য নগর শিলংএ চলিলাম। গাড়ী রুদ্ধ নিশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। মন যেন তাহারও আগে ছুটিয়া চলিতে চাহে। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চোখ ফিরাইয়া দেখিলাম বন্ধুবর ততক্ষণে পার্শ্ববর্তী বহু যাত্রীর সঙ্গে আলাপ জমাইয়াছেন। অবশ্য মামুলি কায়দায় নাম-ধাম-গোত্র সহ পিতৃপিতামহের ইতিবৃত্তের সন্ধান না লইলেও কেন বেড়াইতে চলিয়াছেন, কাহার কি উদ্দেশ্য, কোথায় থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে প্রভৃতি অনেক কিছুই প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইতেছেন। চুপ করিয়া রহিলাম ভাবিলাম, আমি ইহার কি বুঝিব! আমিও ছাত্র ছিলাম, কিন্তু চিরকাল শেলী-বাইরণ-সেকস্‌পিয়ার পড়িয়া কাটাইয়াছি; সুতরাং আমার ঔৎসুক্যের জটিলতা অত গভীর হইবে কি প্রকারে? ইনি বিজ্ঞানের ছাত্র—তাহার উপর গবেষক। অনুসন্ধিৎসা ইঁহাদের অনেক বেশী। তবে এইটুকু বুঝলাম, বন্ধু বোধ করি ভাবিয়াছেন ইঁহারা সকলেই শিলং-যাত্রী না হইলেও প্রবাস-যাত্রী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাজেই প্রশ্নের ধারাও তদ্রূপ।

গাড়ীতে অনেক যাত্রী এবং নানা প্রকারের। বিবিধ মতাবলম্বী, কর্মাবলম্বী এবং বিবিধ শ্রেণীর যাত্রী এই এক শ্রেণীর মধ্যে। কাজেই নানা রকম হাসি ঠাট্টা আলাপ আলোচনাও যেমন চলিতে লাগিল, এই প্রকার

অবস্থার মধ্য দিয়া সময় এক প্রকার ভালই কাটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে অবশ্য মনেও হইতেছিল, থার্ড-ক্লাসের যাত্রী আমরা; এই প্রকার আমোদ-প্রমোদই আমাদেরকে আনন্দ দিবার পক্ষে যথেষ্ট। অনেক ষ্টেশনে চা, খাবার ইত্যাদি পাওয়া যায়। কাজেই ভিড়ের কষ্ট কিছু থাকিলেও ক্ষুধা বা পিপাসার কষ্ট দূর করিবার ব্যবস্থা ছিল। যাহা হউক সমস্ত ব্যাপারটাই আমাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছিল কিন্তু সহের সীমা অতিক্রম করিল শান্তাহার ষ্টেশনে, যখন একদল মজুর লাঠি-সোটা লোটা-কম্বল, দা-কাটারী, কোদাল-কুড়ুল, খুন্তি-খোন্তা ইত্যাদি লইয়া যাত্রিসংখ্যা ১৭ স্থলে ২৭ করিল। 'যায়গা নেই' বলিলেই কি তাহারা শোনে? তাহারা ঘরবাড়ী সমেত এক পাল মেয়ে পুরুষ রাজ্যের ময়লা সংগ্রহ করিয়া যে যেখান হইতে পারিল কামরার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। যেখানে মানুষ এবং মালের চাপে দরজা বন্ধ, সেখানে তাহারা নির্বিচারে জানালার ব্যবহার করিতেও ছাড়ে না। তাহাদের কাছে ভদ্র-অভদ্রের বিচার নাই, মাল মানুষের বিচার নাই।' তাহারা গা মাড়াইতেও ছাড়ে না, পা মাড়াইতেও আপত্তি করে না। কথা কহিলেই বলে—"হামরাভি টিকিট হায়।" বুঝিলাম দাবী ইহাদের অনেকখানি বেশী। কারণ আমরা তো শুধু পূজার যাত্রী, কিন্তু ইহারা চিরকালের যাত্রী অর্থাৎ সম্বৎসরই এইরূপ যাতায়াত করে। পূজার ছুটিতে আমরা আসিয়াছি। ইহারা পূজার ছুটিরও তোয়াক্কা রাখেনা, পূজার ভিড়ও মানে না। গতি-বিধি ইহাদের সর্বত্র এবং সর্বদাই এইরূপ অনির্দিষ্ট কিন্তু অচঞ্চল। এখানে কাজ ছিল, ফুরাইয়াছে। আবার অন্যত্র কার্যের আহ্বান আসিয়াছে, ঘরবাড়ী লোটা-কম্বল স্ত্রীপুত্র সহ সেইখানেই ছুটিয়া চলিয়াছে। এমনই ইহারা যাতাযাত করে, এবং রেল কোম্পানীকে টাকাও দেয় তাই টিকিট কিনিবার দাম এবং দাবী ইহারা সব জানে। অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই!

দেখিলাম ক্ষমতা জাহির করিতে প্রত্যেকে চায় এবং টিকিটের দাবী সকলেই বোঝে কিন্তু সে কেবল ঐ কামরাখানির ভিতর। প্রত্যেকেই আপন আপন দাবীর চুলচেরা বিচার করিতে বসিয়াছে এবং সেই দাবীর ধাক্কা উপস্থিত জনতার প্রত্যেকেই কিছু-কিছু ভোগ করিতেছে কিন্তু গাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ কাষ্ঠপ্রাচীর ডিঙ্গাইয়া সে ধাক্কা রেল কোম্পানীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইতেছে না বা কোন কালেও হয় নাই, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলাম; এবং সসম্মানে আমার সেকেণ্ডক্লাসের বন্ধুকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলাম—"বন্ধু, তুমি সেকেণ্ডক্লাসে আরামে চলেছে, গতি-পরীক্ষার কোন সুযোগই অর্জন করতে পারছ না; আমি কিন্তু শক্তিপরীক্ষা আর ন্যায্য দাবীর চুল-চেরা বিচার করতে করতে চলছি।"

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটায় পার্বতীপুর পৌছান গেল। এইখানেই গাড়ী বদল করিয়া মিটার গেজের শিলং মেলে উঠিতে হইবে। বন্ধু নিলেন মালের ভার কুলীর মাথায় চাপাইয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইবেন। আমি একলম্ফে গাড়ী হইতে নামিয়া মিটার গেজের গাড়ীর উদ্দেশ্যে ছুটিলাম। অগ্রে স্থানাধিকার না করিতে পারিলে থার্ডক্লাসের যাত্রীর বিপদ্ আছে। গাড়ী নিকটেই সাজান আছে। একটি কামড়ায় উঠিয়া কম্বল বিছাইয়া খানিকটা যায়গায় অস্থায়ী মালিকানা-স্বত্বের নিশানা নির্দেশ করিলাম। ইতিমধ্যে এক ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া গোটাচারেক বিছানা পটাপট বিছাইয়া ফেলিয়া বলিলেন—"মশায়, দেখবেন আমার এইগুলো একটু। আমার সমস্ত মাল-পত্র পড়ে আছে, আসছি এক্ষুণি।"

বলিয়াই মুহূর্ত মধ্যে তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। 'মশায় তো দেখবেন', কিন্তু 'মশায়ের নিজেরই দুইখানা আর ঐ চারখানা, এই ছয়খানার খবরদারীর ভার, 'মশায়ে'র একার উপর, তাহার উপর এই পূজার ভিড়! কি করিয়া সামলাই? কি বিপদেই পড়িলাম! কিন্তু এই দায়িত্ব গ্রহণের শক্তি আছে কি নাই সে বিবেচনা না করিয়াই ভদ্রমহোদয় যখন আমার ঘাড়েই দায়িত্ব চাপাইয়া গেলেন, তখন কর্তব্য পালনে আর পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। সৌভাগ্যের বিষয় আমার বন্ধু গিরীন্দ্র

নাথ শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক যাত্রী। সে এক ঠেলা-ঠেলি হুড়োহুড়ি ব্যাপার। একটা আটকাইতে অন্যটার এক পাশ বেদখল হইয়া যায়। অন্যটা ঠেকাইতে পরবর্তীটার দখলী-স্বত্ব নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায়। কিছু পরহস্তগত হইল, কিছু স্বদখলে রহিল। ইত্যবসরে ভদ্রলোক উপস্থিত হইলেন পুলিশের সহিত বিতণ্ডা করিতে করিতে। সঙ্গে আরও একটি ভদ্রলোক প্রায় বৃদ্ধ। তারপর দেখিলাম আরও দুটি তন্বী তরুণী ধীরে ধীরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে এস্রাজ, সেতার, বেহালা ইত্যাদি তারের বাদ্যযন্ত্র। পুলিশের ঝগড়া আর থামিতে চাহে না। মালপত্র লইয়া একটা ভীষণ টানাহেঁচড়া সেই যুবক ভদ্রলোক আর পুলিশের মধ্যে চলিতে লাগিল। প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কোন পক্ষকে নিরস্ত করিতে পারিয়া উঠেন না। শেষে আমাদেরকেই মাথা গলাইতে হইল। অনেক কষ্টে ঝগড়া মিটাইলাম এবং জানিয়া লইলাম এই ঝগড়ার কারণ ছিল বেওয়ারিশ রকমে প্লাটফর্মের একধারে মাল ফেলিয়া রাখা। আশ্বস্ত হইলাম, তবু ভাল যে অন্য কোন গুরুতর ব্যাপার নহে।

৪৫ মিনিট সময় এখানে পাওয়ায় খাবারের সুবিধাও আছে। আগন্তুক ভদ্রলোক সোরাবজির কাছে আটআনা-ওয়ালা চারিখানা ডিসের ইচ্ছা জানাইলেন। অবিলম্বে ভাত-মাংস ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ চারিখানি ডিস্ আসিল। চার জনেই তখন বসিলেন ঐ সমস্ত বস্তুর সদ্ব্যবহারে। একটি বেয়ারা সম্মুখেই উপস্থিত রহিল নূতন আদেশের অপেক্ষায়। সম্ভবতঃ বেয়ারাটি ব্রাহ্মণ নয়। সে যাহাই হউক, এই মেয়ে দুইটির ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। প্রগতির দিনে এই সব পুরাতন মামুলী জিনিষ যে অচল, তাহার প্রমাণ পথে ঘাটে সর্বত্র পাওয়া যায় এবং সে বিষয়ে অগ্রণী মেয়েরাই। কবি তো বলিয়াই গিয়াছেন—"না জাগিলে সব ভারত ললনা……" ইত্যাদি।

যাহা হউক, আহারান্তে তরুণী দুইটি অর্ধশায়িত হইলেন। বৃদ্ধ এবং যুবকের শুইবার স্থান ছিল না।

দেখিলাম একটি তরুণীর হস্তমুক্ত একখানি 'প্রবাসী' গাড়ীর মেঝেতে পড়িয়া লুটাইতেছে। তরুণীর আঁখি নিদ্রাকাতর; সুতরাং আমি পুস্তিকাখানি উঠাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম, নিদ্রাকাতর তরুণী কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। গভীর মনঃসংযোগ সহকারে পাঠে নিমগ্ন হইলাম; কিন্তু একটু পরেই মালুম হইয়া গেল, এই তরুণী শুধু তার-যন্ত্র বাজাইতেই জানেন না, আমার বন্ধুর হৃদয়-যন্ত্রও বাজাইতে জানেন। কি করিয়া তরুণীর চোখের ঘুম বিদায় লইয়াছিল এবং কি করিয়া আলাপের সূত্রপাত হইয়াছিল, আমি তাহা লক্ষ্য করি নাই। আমি যখন দেখিলাম তখন পুরাদমে আলাপ চলিয়াছে। বিজ্ঞান-কলেজে কত মেয়ে পড়ে, পদার্থবিদ্যায় বেশী না রসায়নেতে? সেবারে চামেলী দত্ত প্রথম হইল কি প্রকারে? বেথুনের অধ্যাপকমণ্ডলীতে এখন কে কে আছেন। বেথুনের পঞ্চানন বাবুকে আপনি কি প্রকারে জানিলেন? ইত্যাদি প্রশ্নের বন্যা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। আমি প্রবাসীতে চক্ষুনিবেশ করিয়াই রহিলাম, মনোনিবেশ হইল না। কথা যোগ করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক হইবে ভাবিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। আলাপী ত পাঁচজন, তাহার মধ্যে তিনজন কিছু বেশী উৎসাহী। আমার বন্ধু এবং তরুণীদ্বয় যেন এইমাত্র বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতার নব আলোক দেখিতে পাইয়াছেন। উৎসাহ তাঁহাদের চোখেমুখে; রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া আসিল, অথচ ইঁহাদের গল্পের রেশ একটুও প্রশমিত হইতে চাহে না। কিন্তু বৃদ্ধ হঠাৎ একটু বেরসিক রকমে ব্যাপারের যবনিকাপাত করিলেন। তিনি একটু ক্রুদ্ধভাবেই বলিলেন—"থাক, থাক আর কথার ফোয়ারা না ছুটিয়ে এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা দেখ, সমস্ত রাত জেগে গেলে অসুখ করবে।"

বন্ধু অবিলম্বে চাদরমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন, তাঁহারই সম্মুখের বেঞ্চিতে একাংশ গ্রহণ করিলেন তরুণীদ্বয়ের একটি। আমার শুইবার স্থান কোন প্রকারে হইয়াছিল কিন্তু ঘুমের ইচ্ছা ছিল না। ভরসাস্থল বন্ধুর যে অশান্ত চিত্ত-যন্ত্র একবার পূর্ণজ্ঞানেই বাজিতে সুরু করিয়াছে, সে

দিয়াও একবার স্বর-ঝঙ্কারে ফাটিয়া পড়িবেই। কিন্তু বৃদ্ধের সতর্ক দৃষ্টিতে ঘটিল অন্যরূপ। তরুণী দুইটিকে বৃদ্ধ যক্ষের মত পাহারা দিয়া লইয়া চলিলেন। আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়া তাহাদেরকে তিনি এমন এক অবস্থার অন্তরাল করিলেন যে, তাহারা তরুণ কি তরুণী তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না। যদি কোন অসতর্ক মুহূর্তে কোন পার্শ্ব একটু কম্বল-মুক্ত হয়, বৃদ্ধের সতর্ক তৎপরতায় অবিলম্বে আবার তাহা কম্বল-চাপা পড়ে। এইরূপ অবস্থার মধ্যে একটু অসুবিধার সূত্রপাত হইয়াছিল। যেখানেই নূতন যাত্রী উঠিতেছিল এবং শয্যাশায়ী তরুণীদ্বয়ের গায়ে ধাক্কা মারিয়া বেয়াদপি করিয়া ফেলিতেছিল সেইখানেই বৃদ্ধ ক্ষিপ্রতার সহিত বলিয়া উঠিতেছিলেন—"জেনানা আদমি দেখতা নেই তোম্ কেইসা আদমি?"

আদমি যেই হউক, সকলেই জেনানা আদমির ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইতেছিল, আমি কিন্তু আর হাসি সামলাইতে পারিতেছিলাম না। আমার শায়িত অবস্থা ঘুচাইয়া কয়েক জনের বসিবার যায়গা হইল। সকলের স্থান সঙ্কুলান হইল না। অনেকেই দাঁড়াইয়া রহিল। ঠিক এমনি অবস্থায় আর একবার যখন বৃদ্ধ আর একজনকে ধমক দিলেন—"জেননা আদমি দেখতা নেই" বলিয়া, আমি আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলাম না; বলিয়া উঠিলাম—"দেখতা তো নেই। কিন্তু কি প্রকারে দেখেগা? কম্বলের তলায় জেনানা কি মর্দানা তা দেখার সাধ্য আপনারই কি থাকতো, যদি আগে না জানা থাকে?"

বৃদ্ধ আমার কথার কোন জবাব দিলেন না, উপস্থিত যাত্রীদেরকে লক্ষ্য করিয়া—"আপলোক ইধার বইঠিয়ে" বলিয়া তিনি নিজের একধারে যে স্থান নির্দেশ করিলেন, সেখানে সূচ ফেলিবারও স্থান নাই।

সকাল ৬টায় আমিন-গাঁও ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিল। এবার ফেরি ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হইবার পালা। ষ্টীমার ঘাটেই প্রস্তুত ছিল; গাড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গেই মুটিয়ারা ছোঁ মারিয়া মাল লইয়া ষ্টীমারের দিকে ছুটিল। ষ্টীমারের আর কুলীতে ষ্টীমার ভর্তি। কুলী-চার্জ এখানে কিছু বেশী—প্রতি ট্রিপে দুই আনা দেখিতে পাইলাম। তরুণীদ্বয় ও ভদ্রমহোদয়দ্বয় আমাদের পাশে আসিয়াই দাঁড়াইয়াছেন। বন্ধুর ব্যবস্থার গুণে আমরা তাঁহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি কি তাঁহারা আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন যাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। এই ষ্টীমারেও রেস্তরাঁ আছে, ভাল খাবার পাওয়া যায়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের উৎসাহ দেখিলাম কিছুতে কমিতে চাহে না। তিনি তরুণীদ্বয়কে লইয়া চায়ের টেবিলে বসিলেন। চা চলিতে লাগিল। বন্ধু আমার কানে কানে কহিলেন—"ভাই এদের সঙ্গে আলাপ করে রাখলাম। নির্বান্ধব দেশ শিলং এ যাচ্ছি, দু'এক জন সঙ্গী সাথী চাই। মেয়ে দুটি থার্ড ইয়ারে পড়ে। বিশেষ ভদ্র।"

আমি বলিলাম—"সে তো ঠিকই। বন্ধু চাই বই কি? বিশেষ যখন লেডি-ফ্রেণ্ড! কো-এডুকেশনের যুগে, কো-অপারেশনে আপত্তি কি?"

বন্ধু মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

এদিকে কামাখ্যার পাণ্ডার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া বড় শক্ত হইয়া পড়িল। পিতৃপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া তদূর্ধ্ব সপ্ত পুরুষের ইতিবৃত্ত ইঁহারা প্রত্যেকের কাছে জানিতে চাহেন। প্রত্যেক পাণ্ডার বগলে একখানি মান্ধাতার আমলীয় পাকাখাতা। নাম-ধাম শুনিয়া মুহূর্তে খাতা খুলিয়া বংশ-পরম্পরাক্রমে তাঁহারা অসংখ্য নামের নিখুঁত তালিকা দিয়া যাইতে লাগিলেন। একবার যদি কোন প্রকারে কোন আত্মীয়ের নাম উহার মধ্যে ধরা পড়ে, তাহা হইলে উপস্থিত আত্মীয়ের আর রক্ষা নাই। কামাখ্যা দর্শনের কিঞ্চিৎমাত্র ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাকে পাণ্ডার আতিথ্যগ্রহণ করিতেই হইবে। অবশ্য ইঁহারা কোন জুলুম প্রকাশ করেন না। তবে ইঁহাদের লোক বশ করার ক্ষমতা অদ্ভুত। ইঁহাদের ভদ্রতাসূচক ব্যবহার, কথা বলার কায়দা, এবং ধৈর্যশীলতায় একেবারে মুগ্ধ না হইলেও উপেক্ষা করিবার শক্তি থাকে না।

কামাখ্যাদর্শনের ইচ্ছা আমাদের ছিল এবং ধারণা ছিল

হইতেই কামাখ্যা-দর্শন চলিতে পারিবে। কিন্তু ষ্টীমারে উঠিয়াই পাণ্ডাদের এই বাক্য-ধনুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে অসমর্থ হইয়া বন্ধুর অগোচরেই এক পাণ্ডাকে আশ্বাস-বাক্যে ঠাণ্ডা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেই কি নিস্তার পাওয়া যায়? সমস্ত পাণ্ডারাই যাচাই করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, আমি তাঁহাদের যজমানী তালিকার অন্তর্ভুক্ত কি না। দুইচার জন আত্মীয় স্বজনের নাম তাঁহারা বাহির করিতে সমর্থও হইয়াছিলেন এবং আমিও নির্বিচারে অস্বীকার করিয়া পূর্ব-প্রতিশ্রুতি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। মিনিট কুড়ি ষ্টীমারে কাটিল। পাণ্ডুঘাটে নামিয়া দেখিলাম কমার্স্যাল কোম্পানীর ১ম, ২য়, ৩য় প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর গাড়ী প্রস্তুত। যাত্রীরা দলে দলে উঠিয়া স্থান গ্রহণ করিতেছে। ভাড়া ১ম শ্রেণী ১৮৲, ২য় শ্রেণী ১২৲, মধ্যম শ্রেণী ৮৲ ও ৩য় শ্রেণী ৪৲। তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া সব শ্রেণীতেই কিছু কিছু পূজা-কনসেশন ছিল।

আমরা এখন পাণ্ডা-ঠাকুরের অধীনে। অন্য একধারে গৌহাটীর বাসও প্রস্তুত ছিল। মুটিয়ার সাহায্যে পাণ্ডা-ঠাকুর আমাদের মালপত্র গৌহাটীর বাসে তুলিয়া দিলেন। পার্বতীপুরের সেই বন্ধুরা সেখানেও দেখি আগে আসিয়া যায়গা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। আমরা যাইতেই "আসুন, আসুন" করিয়া উঠিলেন। উপবিষ্ট হইয়াই বন্ধু প্রশ্ন করিলেন—"আপনারাও কি কামাখ্যা হয়ে শিলং যাবেন?"

বৃদ্ধ স্থিরভাবে জবাব দিলেন—"আমরা কামাখ্যা হয়ে শিলং যাচ্ছিনে, আমরা গৌহাটী হয়ে শিবসাগর যাচ্ছি।"

বন্ধু নির্বাক্-বিস্ময়ে ক্ষণকাল উঁহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া ঢোক গিলিয়া জবাব দিলেন—"আমি ভেবেছিলাম বুঝি শিলং……না, এই আমরা শিলং যাচ্ছি কি না তাই……আমরা বন্ধের কুড়ি দিন ওখানে থাক্‌বো, তাই ভাবছিলাম।"

বন্ধুর মুখের অবস্থা দেখিয়া আমি ভাবিলাম, একি হইল! ইঁহারা তো যাইতেছেন শিবসাগর, কিন্তু বন্ধুর চিত্ত-সাগরে যে 'মন্থন' আরম্ভ হইয়া গেল! আর ইহাও ভাবিলাম যে বন্ধু বোধ করি প্রশ্ন না করিয়াই শুধু উঁহাদের এস্রাজ আর সেতার দেখিয়াই ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন যে, এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র এতদ-ঞ্চলের মধ্যে শিলংএর সঙ্গেই খাপ খায় সব চেয়ে বেশী। হয়ত বা বন্ধু 'অমিত-বন্যা'র কথাই ভাবিতেছিলেন, কে বলিবে!

পাণ্ডু-গৌহাটী পথের মাঝখানেই কামাখ্যা। প্রায় মাইল আড়াই পথ অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির কাছে বাস আসিয়া থামিল। বাসের দক্ষিণা দুই আনা হিসাবে দিয়া এবং মুটের মাথায় ছয় আনা চুক্তিতে মাল চাপাইয়া পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে আমরা সিঁড়ি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলাম। সমস্তরাত্রি জাগরণের পর এই ব্যাপারটি বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে সমাধা করিতে পারিতেছিলাম না। আমাদের সঙ্গে বাধ্য হইয়া মাঝে মাঝে পাণ্ডাঠাকুরকেও বিশ্রাম করিতে হইতেছিল। কামাখ্যা-মন্দিরটি পাহাড়ের উপর প্রায় ৭০০ ফিট ঊর্ধ্বে অবস্থিত। উহারই চতুষ্পার্শ্বে পাণ্ডাদের বসতি। প্রায় ১০০ ঘর পাণ্ডা পুরোহিত এবং শ-আড়াই ঘর কায়স্থ সেবাইত এই পাহাড়ে শুধু মাত্র এই মন্দিরটিকে আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া আছেন। অথচ প্রায় সকলেরই অবস্থা ভাল মনে হয়। মন্দিরের পথেই 'ঋণমোচন কুণ্ড' এবং 'সৌভাগ্য কুণ্ড' নামক দুইটি পুকুর। মন্দিরে যাইবার কালে সৌভাগ্য কুণ্ডের জলস্পর্শ, পাণ্ডোচ্চোরিত মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক আচার শেষ করিয়া মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ করিতে হয়।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই চোখে পড়ে কুচবিহারের মহারাজা বিশ্বসিংহ ও শিবসিংহের মূর্তি। কালাপাহাড় কর্তৃক ধ্বংসের পর ইঁহারাই মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। সুড়ঙ্গপথে খানিকটা নীচে নামিয়া ফুল-বিল্বপত্রাচ্ছাদিত একটি সঙ্কীর্ণ স্থানে একটি শিলাখণ্ড স্পর্শ করিয়া পুরোহিতের মন্ত্র পড়ান চলে। মন্ত্রপাঠ করতঃ মন্দির-দর্শন-কার্য সমাধা করিতে হয়। দক্ষিণা খুসিমাফিক দিলেই চলে। এখানে কোন মূর্তি সংস্থাপিত নাই। বিষ্ণুচক্র-

খণ্ডিত সতী-দেহাংশকে আশ্রয় করিয়া এই মন্দিরের উৎপত্তি এবং ইহাই একান্ন পীঠের একটি। উক্ত সুড়ঙ্গ পথের দুই-ধারে তৈল-প্রদীপ জ্বালান থাকে। উহারই সাহায্যে কোন প্রকারে পথ দেখিয়া গহ্বরের মধ্যে নামিয়া যাওয়া যায়। কামাখ্যার মন্দির ছাড়া এখানে আরও কয়েকটি মন্দির আছে, কামেশ্বর, ছিন্নমস্তা ইত্যাদি। কামাখ্যা-মন্দির হইতে কিছু দূরে ঐ পাহাড়েরই পশ্চিম প্রান্তে ভুবনেশ্বরীর মন্দির নামে আর একটি মন্দির আছে। এখানেও পাণ্ডা পুরোহিত আছেন এবং দুইচার জন সাধু সন্ন্যাসীও দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

পাণ্ডাদের বাড়ীগুলি এক প্রকার হোম-হোটেল। যাত্রীদেরকে ইঁহারা খুবই যত্ন করেন। খাওয়া-দাওয়া, শোয়া, বসা, চলাফেরা প্রভৃতি সমস্ত দিকেই একটা সতর্ক দৃষ্টি ইঁহারা যত্নের সঙ্গেই রাখিয়া দেন। আচারে-ব্যবহারে ইঁহারা রীতিমত বাঙ্গালী। কামাখ্যার পাণ্ডার হাতে যাত্রীদের ভেঁড়া হইবার প্রবাদ আছে। তাই ভয় ছিল এবং সর্বদাই সন্ত্রস্ত ছিলাম, আমার নরদেহটা যাত্রীদের পাণ্ডার মন্ত্রের গুণে রূপান্তরিত হইয়া আবার না ভেড়ায় পরিণত হয়। ঠিক সে প্রকার ঘটিল না বটে, তবে উপলব্ধি করিলাম যে যত্নের আতিশয্য ইঁহাদের এত বেশী যে, 'গুণজ্ঞান' না জানিলেও যত্নের চোটে ভেড়া বনিয়া যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। ভেড়া বানানির মন্ত্রটা বোধ করি ঐ যত্নের মধ্যেই আছে। দেনা-পাওনা সম্বন্ধে ইঁহাদের কোন জুলুম নাই। খুসি হইয়া যাহা দেওয়া যায় বিনা আপত্তিতে তাহাই গ্রহণ করেন। তবে আদায়ের ভদ্র পদ্ধতি ইঁহারা জানেন বলিয়া সকল ক্ষেত্রেই কিছু বেশী আদায় হয়।

গৌহাটী সহরের সম্মুখে ব্রহ্মপুত্রনদের মাঝখানে উমানন্দ ভৈরব ঠিক একটি দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। এই উমানন্দ না দেখিলে কামখ্যা-দর্শন সম্পূর্ণ হয় না, পাণ্ডারা এই প্রকারই বলেন। সপরিবারে গৌরাঙ্গ ব্যানার্জির সলিল-সমাধি উমানন্দের একটি চিরস্থায়ী কলঙ্ক এবং উহা উমানন্দের পাদদেশ-বিধৌতকারী ব্রহ্মপুত্রের সম্বন্ধে যাত্রীদের অন্তরে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্যই উমানন্দ-দর্শন সম্বন্ধে আমার এবং বন্ধুর মনে দ্বিধা ছিল। কিন্তু দূর হইতে উমানন্দের সেই অন্তরস্পর্শী রূপ দেখিয়া আর কাছে না যাইয়া থাকিতে পারিলাম না। অবশ্য ব্রহ্মপুত্র এখন শান্ত। নির্ভয়ে যাতায়াত করা যায়। গিয়া উপলব্ধি করিলাম, উমানন্দ ভৈরব না দেখিয়া ফিরিলে পুণ্যার্জনের কতটুকু বাকি থাকিত তাহা জানি না, তবে জীবনের একটা মস্ত বড় কাজ বাকি থাকিয়া যাইত, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। সুবিস্তৃত ব্রহ্মপুত্র নদ। রজতধারার ন্যায় শুভ্র জলরাশি একটানা স্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহারই ঠিক মাঝখানে গাছপালায় ঢাকা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর উমানন্দ ভৈরব। দূর হইতে দেখিলে নেশা লাগে, কাছে গেলে উদগ্র আগ্রহে সেই পাহাড় কামড়াইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। দেখিলাম বহুযাত্রী ঘাটে স্নান করিয়া মন্দির দেখিতে যাইতেছেন। এখানেও একটা নাটমন্দির পার হইয়া সুড়ঙ্গ-পথে আসল মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। উমানন্দ ভৈরব অর্থাৎ শিবের মূর্তি এখানে নাই। একটি শিলাখণ্ড পাণ্ডাঠাকুর উমানন্দ ভৈরব বলিয়া নির্দেশ করলেন। পিত্তল-নির্মিত একটি মূর্তি আছে বটে, সেটাকে বলিলেন ঠাকুরের প্রতিমূর্তি— আসল মূর্তি নয়। পুরোহিত পাণ্ডাঠাকুর অতিশয় ভদ্র। তিনি আমাদেরকে প্রতিমূর্তির একটা ছবি (ফটো) নেওয়া সম্বন্ধে সাহায্য করিলেন। পর্যায়ক্রমে পাণ্ডাদেরকে এখানে পৌরোহিত্য করিতে হয়। যে পাণ্ডার পূজার পালা পড়ে, তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা এখানে আছে। দর্শকদের কাছ থেকে কিছু পার্বনী আদায় হয় এবং নানাপ্রকারে বিভক্ত হইয়া, জমিদার, পাণ্ডা, মন্দির মেরামত ইত্যাদির দিকে বাধিত হয়।

গৌহাটী হইতে সাত মাইল দূরে বশিষ্ঠ আশ্রমের বেশ খ্যাতি আছে এবং বহু ভ্রমণকারী ও তীর্থকামীকে আকর্ষণ করে এই আশ্রম। যাতায়াতের নিয়মমাফিক কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। চুক্তিকরা বাস কিম্বা ঘোড়ার গাড়ী আর না হয় পা-গাড়ী। আশ্রমটি নির্জন এবং মনোরম। মিঠে-আওয়াজ করিয়া একটি ঝরণা নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত ছুটিয়া চলিয়াছে। বহু যাত্রী এই ঝরণার জলে স্নান করিয়া পিক্‌নিক্ করেন; তাহার নিদর্শনও পাওয়া গেল।

এই দুই দিনে বেশ একটু সুস্থ হইতে পারিয়াছি এবং শিলংএর জন্য নবোদ্যম সঞ্চিত হইয়াছে। তৃতীয় দিবসে অতি প্রত্যূষে পাণ্ডাঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেই মুটিয়ার মাথায় মাল চাপাইয়া পাণ্ডুর দিকে চলিলাম কমার্শ্যাল ক্যারিং কোম্পানীর বাস ধরিতে। পৌনে আটটায় বাস ছাড়ে। শিলং-গৌহাটী রোডে ইহাদের একাধিপত্য। প্রতি বৎসর বহু অর্থ আসাম গভর্ণমেণ্টকে দিয়া এই লাইনের মালিকানা-স্বত্ব বজায় রাখিতে হয়। এই কোম্পানীর ব্যবস্থা অতি সুন্দর। যে কোন রেলওয়ে কোম্পানী অপেক্ষা একটুও খারাপ নহে। সঙ্গের মালপত্র লাগেজে দিতে হয়। ছোট-খাটো টুক্‌রি-টাক্‌রি, এটাচিকেশ, টিফিনক্যারিয়ার, পাতিয়া বসিবার কম্বল ইত্যাদি সঙ্গে যাইতে পারে। ইণ্টার ও থার্ড ক্লাসের টিকিটে ১৫ সের এবং ফাষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটে যথাক্রমে দেড় মণ ও আধ মণ বাদ দিয়া অতিরিক্ত প্রতিসেরে এক আনা ইঁহারা আদায় করেন। কোন দ্রব্য নষ্ট হইবার বা হারাইবার ভয় নাই। মালপত্র ওজনান্তর ভাড়া চুকাইয়া রসিদ লইয়া গেলেই নিজ দায়িত্বে সমস্ত মাল ইঁহারা যথাস্থানে পৌছাইয়া দেন। লরী, বাস এবং মোটর গাড়ীতে প্রায় ৫০০ যান এই কোম্পানীর এই রাস্তা দিয়া চলে। গাড়ীগুলি সবই ভাল। থার্ড ক্লাসের গাড়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কিছু নাই। মাঝে মাঝে টিকিট চেক্ করিবার বন্দোবস্ত আছে। ওয়ানওয়ে রোড বলিয়া বিপদ্ বাচাইবার জন্য আপ্ এবং ডাউন গাড়ীর জন্য বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট আছে। পথে নংপো নামক স্থানে ট্রাফিক কনট্রোল করা হয়। উপযুক্ত সময় পর্যন্ত ঊর্ধ্বগামী এবং নিম্নগামী উভয় প্রকার সমস্ত গাড়ীই এখানে আটক রাখা হয়। এখানে পোষ্টঅফিস্ আছে। দুটি ভাল রেস্তরাঁ এবং খাসিয়া মেয়েদের চায়ের দোকান আছে। যাত্রীদের যাতায়াতের নিমিত্ত ছোটখাটো একটি বাজার এখানে দুইবেলাই বসে। পেঁপে, পেয়ারা, কমলা, কলা এবং নানাপ্রকার তরিতরকারি এখানে কিনিতে পাওয়া যায়।

চলিতে আরম্ভ করিল। ধারণা ছিল, এত দীর্ঘপথ বাসে যাইতে কষ্ট হইবে। কিন্তু কষ্ট কিছুমাত্রই বোধ করিতে পারিলাম না, বরঞ্চ যতই চলিতে লাগিলাম, নব-নব আনন্দের বস্তু রাস্তার দুই ধার হইতে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। পথ চলিয়াছে উঁচুর দিকে, কোথায়ও বা আবার খানিকটা নামিয়া যায়। কোথায়ও খুব কাছাকাছি অর্থাৎ বিশ-ত্রিশ হাত অন্তর বাঁক—একধারে খাড়াই পাহাড় আর একধারে পাতালপুরীর খাদ। তাহারই মধ্য দিয়া বাস সন্তর্পণে আঁকিয়া-বাঁকিয়া, হেলিয়া-দুলিয়া চলিয়াছে। কোন প্রকারে একবার পথভ্রষ্ট হইলেই বাসে-মানুষে পাতাল-প্রবেশের পথ উন্মুক্ত দেখা যাইবে; ফলে ফিরিবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইবে। ড্রাইভার খুবই নিপুণ, বাস এই পথ দিয়া রীতিমত ছুটাইয়া লইয়া চলিল। সে তো ভয়কে জয় করিয়াই আসিয়াছে। আনন্দের আতিশয্যে আমাদেরও ভয়ের কথা আদৌ মনে ছিল না।

শিলং-গৌহাটীর রাস্তা অতীব মনোরম। একবার উপরে উঠিয়া দেখিতে পাইলাম অদূরে নিম্নে আঁকাবাঁকা পরিত্যক্ত পথটি ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর শোভায় সরীসৃপের মত সহজ ভঙ্গীতে অঙ্গ এলাইয়া পাহাড়ের বুকে লুটাইতেছে। আবার হয়ত দেখিলাম আমরা বহুনিম্নে তলদেশে রহিয়াছি দূরে ঊর্ধ্বে লাল পথটি সর্পিল গতিতে যেন যজ্ঞাগ্নির মত আকাশে উঠিয়া যাইতেছে। পাহাড়-শিরে আকাশের গা ঘেঁসিয়া মানুষের তৈয়ারি পথ। মাঝে মাঝে কত পর্বত-নির্ঝরিণী ঝর-ঝর করিয়া জল ছুড়িয়া ছুড়িয়া ভয়ার্ত পথিকের চিত্তবিনোদন করতঃ মহানন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। কত কত স্থানে শৈল-স্রোতস্বিনী কলকলনাদে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে কোন্ অনন্তের পথে, হয়তো বা তার প্রিয়তমের অভিসারে। স্থানে স্থানে শ্যামল তরুশ্রেণী লতাগুল্মাচ্ছাদিত পাহাড়ের বুকের উপর সগর্বে দাঁড়াইয়া অরণ্যরাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। অসংখ্য বাঁশ-বন বাতাসের সঙ্গে মিতালি করিয়া একটানা শ্যামের বাঁশী বাজাইতেছে। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই দেখিতে পাইলাম

রাস্তার তুইধারে যেন কেয়ারি করিয়া সাজান রহিয়াছে। মাঝে মাঝে সারিবদ্ধ অসংখ্য পাইন গাছ নিশ্চল প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া এই মর্ত্যনন্দন পাহারা দিতেছে। প্রকৃতির অপরিমেয় রূপ প্রাণের স্পর্শ দিয়া অনুভব করিবার এমন উপযুক্ত স্থান বোধ করি আর নাই। দেবী যেন নানা আভরণে সজ্জিত হইয়া রূপের মহিমায় বিপদসঙ্কুল এই পথের ভয়ার্ত যাত্রীর মন ভুলাইতে চাহেন! যে পথের একধার মৃত্যুকে স্পর্শ করিতে চলিয়াছে সে পথ যে এমন অপরূপ সৌন্দর্যের অলৌকিক মহিমায় চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হইতে পারে, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

এই প্রকারে প্রকৃতির সৌন্দর্যকিরণে স্নান করিতে করিতে শিলঙের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। হাওয়ায় শীতের আমেজ অনুভূত হইল। শিলঙের কল্পনার ছবি ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল। তখন অল্প অল্প বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। সাদা সাদা মেঘ পাহাড়ের বুকে মাথা ঠেকাইয়া শিমূল তুলার মত পড়িয়া আছে। কোথাও ধোঁয়ার মত মেঘ পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া আকাশে উঠিয়া যাইতেছে। কোথায় বা মেঘের ছায়া তৃণগুল্মাচ্ছাদিত পাহাড়ের শিরে প্রতিফলিত হইয়া চাপ-বাঁধা মুক্তার মত টল্‌টল্ করিতেছে। অসংখ্য পাহাড়ের শ্রেণী পিরামিডের মত মাথা তুলিয়া ঢেউয়ের পর ঢেউ খেলাইয়া দিক্‌চক্রবাল-রেখার সঙ্গে মিলাইয়া হারাইয়া গিয়াছে। তাহারা যেন একটা বিরাট্ উত্তেজনায় পৃথিবীর বুক ফুঁড়িয়া একযোগে প্রতিযোগিতা করিতে করিতে আকাশের দিকে উঠিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কোন্ ক্রুদ্ধ দেবতার অভিসম্পাতে ঊর্দ্ধগতি তাহাদের থামিয়া গিয়াছে এবং স্ব-স্ব স্থানে নিথর-নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এতক্ষণে মনে হইল কবীন্দ্রের 'শেষের কবিতা'র দেশে আসিয়া পৌছাইতে পারা গেল। তখন মনে হইল আজ একবার প্রাণপণে খুঁজিয়া দেখিব জয়ন্তী পাহাড়ের কোন্ শিলাতলে মোটর-বিভ্রাটের আশীর্বাদ মাথায় লইয়া 'অমিত-বন্যা'র প্রেম জমাট বাঁধিয়াছিল। কোন্ অনুচ্চ শৈল-শিখরে বসিয়া এই তুইটি প্রেমিক কবিতার সুরে সুরে পরস্পরের হৃদয়স্পর্শ করিয়া একদিন অজানা অনন্তে মিশাইয়া গিয়াছিল। আজ কি তাহাদের কোন চিহ্ন পাওয়া যাইবে? এই দেশ যে অকবিকে কবি বানায়। ইহার প্রতি পাহাড়ের অন্তর-স্পন্দন প্রাণ পাইতেছে যেন কবিতার সুরে। উহারই প্রেমান্ধ শৈলগুহাতলে বসিয়া লাবণ্যের চক্ষু-তারায় নিজের চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া অমিত বলিয়াছিল—"হে মোর বন্যা, আপন স্বরূপে তুমি আপনি ধন্যা।" আমরা আজ সেই লাবণ্যময় দেশে আসিয়া লাবণ্যকে না পাইয়াই ধন্য হইলাম বটে, কিন্তু পূর্ব হইতে সংবাদ না দিয়া আসার মজাও টের পাইলাম।

প্রায় সাড়ে বারোটায় শিলঙে পৌছিলাম। আশা ছিল নামিবার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের প্রতিনিধিরা ছোঁ মারিয়া ধরিয়া প্রবাসীর বাসস্থান তাহাদের সজ্জিত আস্তানায় লইয়া যাইবে। কিন্তু 'কা কস্য পরিদেবনা।' উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে কাহারও সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ পাইল না। আমি তখন মালপত্র ছাড় না করিয়াই সায়েন্স কলেজের গবেষককে লইয়া হোটেল-গবেষণায় বাহির হইলাম। 'স্বাস্থ্যনিবাস', 'হিলটপ্,' 'স্নোভিউ', 'সেণ্ট্রাল বোর্ডিং' ইত্যাদি যে কয়টি হোটেল আছে সবই পর্যবেক্ষণ করিলাম, কিন্তু স্থান মিলিল না। যাত্রীরা আগে হইতে স্থান অধিকার করিয়াছেন। অনেকে আবার দূরে থাকিয়াই ব্যবস্থার গুণে দখলী পরওয়ানা জারি করিয়া ম্যানেজারকে দিয়াছেন খবরদারীর ভার। আমরাও সহজে নিরুৎসাহ হইবার পাত্র নয়! ক্রমাগত শিলং সহর চষিয়া বেলা প্রায় তুইটার সময় পুলিশবাজার পল্লীর একপ্রান্তে পান্থনিবাসে গিয়া শান্ত হইলাম। হোটেলটি নূতন এবং একটু আড়ালে। 'হিলটপ্' ইত্যাদির মত ইহার যশঃসৌরভ এখনও চতুর্দিকে প্রসার লাভ করে নাই, কাজেই মৌমাছিকুলের অভাব।

হোটেলের চার্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া ম্যানেজার মহাশয় একখানি ছাপান নিয়মাবলী আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া পূর্ববৎ গম্ভীর হইয়া তামাকে মনোনিবেশ করিলেন। দেখিলাম চার্জ অপেক্ষাকৃত কম। প্রথম

শ্রেণীতে ৩৲ এবং দ্বিতীয় শ্রেণী ২৲। পূর্বতন হোটেল-বাসীদেরকে গোপনে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম, শ্রেণী-বিভাগ কার্যতঃ কিছুই নাই। দুইটি শ্রেণীই একই স্থানে আসিয়া মাথা ঠেকাইয়াছে। উহা শুধু নামের চটক। আমরা সেই দুই টাকারটাই কশাকশি করিয়া দেড়টাকায় রফা করিলাম। উপরোক্ত হোটেলগুলি বাঙালী পরিচালিত। ইহা ছাড়া 'ফার্ণডেল', 'পাইন উড' প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত হোটেলে কৃষ্ণাঙ্গের স্থান হইতে পারে যদি কর্তাদের স্থান সঙ্কুলান হইয়া অতিরিক্ত স্থান থাকে। তবে আশ্রয়প্রার্থীর ভাবে, চলনে, পোষাকে পুরাপুরি সাহেবী-আনা থাকা চাই।

আশ্রয় যখন মিলিয়াছে, তখন শিলং-সুন্দরীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া আসল চেহারার সঙ্গে পরিচয় ঘটাইতেই হইবে। আমার ভিতরের আসল মানুষটি যেন এতদিন দেহ-দুর্গে বন্দী হইয়াই ছিল। আজ বাংলার বাহিরে আসিয়া সে উন্মুক্ত অধীর আগ্রহে ছুটিতে চাহে, বিচরণ করিতে চাহে, আপনাকে প্রচার করিতে চাহে, স্বাধীনতার শুভ্রসমুজ্জল আলোকের মধ্যে। বিকাল হইতে না হইতে সেই অবেলায়-পৌছান দুইটি বন্ধু নূতন প্রেরণা লইয়া শিলঙের অলিগলির সঙ্গে পরিচয় করিয়া ফিরিতে লাগিলাম। শিলং-গৌহাটি রোড ধরিয়া দুইজনে আলাপ করিতে করিতে চলিয়াছি হঠাৎ পার্শ্বস্থিত একটি জুতার দোকানের দিকে মুখ ফিরাইয়া বন্ধু একটু সচকিত হইয়া উঠিলেন। এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া লইয়া বন্ধু এক লহমার মধ্যে সেই দোকানে গিয়া ঠেলিয়া উঠিলেন। 'বোবার শত্রু নেই' গোছের ভাব দেখাইয়া আমিও গুটি-গুটি সেই দিকেই পদচালনা করিলাম। বন্ধু ততক্ষণে "হ্যাল্লো, মিষ্টার চাউড্রী" করিয়া লম্বা হাত বাড়াইয়া একটি সাহেবী পোষাক পরা বাঙালী ভদ্রলোকের হাত চাপিয়া ধরিলেন। দুইজনের মুখেই গোলাপী হাসি।

ভদ্রলোক বলিলেন—"গিরীন বাবু তাহলে শেষ পর্যন্ত শিলঙেই এলেন ?"

গিরীন বাবু সে কথার কোন জবাব না দিয়া 'চাউড্রীর' পার্শ্বস্থিত তরুণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"জুতো কেনা হচ্ছে ? কলকাতা থেকে এসে এখানে জুতো কেনার মানে ? বড় যে আগে আসা হয়েছিল। শরীর যে বিশেষ খারাপ গেছে বলে মনে করি না।" ইত্যাদি অনেক কথাই বন্ধু বলিয়া চলিলেন।

বন্ধু থামিলে তরুণী মুখ খুলিলেন। কিন্তু জবাব যাহা দিলেন তাহা প্রশ্নকর্তার পূর্বপ্রশ্নের কোনটার সঙ্গেই খাপ খাইল না। তিনি বলিবেন—"আপনি যে সত্যিই শিলঙে আসবেন এ কথা আপনি বললেও আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।"

প্রশ্ন এবং প্রশ্নোত্তর যাহাই হউক, বন্ধুর আকস্মিক দিক্-পরিবর্তনের হেতুটা এইবার হৃদয়ঙ্গম হইল। হরিদ্বার, দেরাদুন, লছমনঝোলার কথাই অনেক দিন ধরিয়া হইতেছিল ; অকস্মাৎ বন্ধু শিলঙের দিকে ঝুঁকিলেন কেন তাহা এতদিন বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

মিষ্টার চাউড্রী এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সঙ্গে লইয়া আমাদের পান্থনিবাসে ফিরিলাম। চা খাইয়া বিদায় দিবার সময় তাঁহারা স্মরণ করাইয়া দিয়া গেলেন—আমরা যেন কল্য প্রাতঃকালেই সহর হইতে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে লাইতুমুখ্রার দিকে মাল্কী পল্লীতে তাঁহাদের বাসায় উদয় হইতে ভুলিয়া না যাই। পরদিন যথাসময়ে লেপের তলা হইতে গিরীন্দ্রনাথ হাঁকিলেন—"সুধাংশু আর ঘুমিও না, ওঠ। চৌধুরীর ওখানে আবার যেতে হবে।"

চোখ মেলিয়া দেখিলাম তখনও ভোর হয় নাই, চতুর্দিক্ কুয়াসাচ্ছন্ন। শীতে সর্বশরীর কন্ কন্ করিতেছে। শিলঙের শীতের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে যে এমন নিদারুণ তাহা জানাই ছিল না। সি-লেবেল হইতে মাত্র ৫০০০ ফিট উঁচুতে কার্তিকের প্রথমেই এত শীত পড়িবে, সে কথা ভাবি নাই। সারারাত্রি লেপের মধ্যে কুকুরের সেপ লইয়াও শীতে পীত হইয়া উঠিয়াছিলাম। ভোরের দিকেই একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। বন্ধুর আহ্বানে একটু বিরক্তি বোধ করিলেও উঠিয়া পড়িলাম। মিঃ চাউড্রীর বাড়ীর পথে গভর্ণমেণ্ট হাউসের সন্নিকটে 'ওয়ার্ড লেক' আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মানুষের হাতে

গড়া কৃত্রিম লেক, কিন্তু সৌন্দর্যে অনুপম। নানা জাতীয় বৃক্ষ ইহাকে বেষ্টন করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ঢালু পাড়ের উপর সবুজ রংয়ের ঘাস বিছান। নীল জলে গাছের ছায়া, উপরের বহুবাড়ীর প্রতিবিম্ব এবং চারিধারের ভ্রমণশীল নরনারীর প্রতিমূর্তি বুকে করিয়া সৌন্দর্য-গরিমায় লেক্ যেন হাসিতেছে। জলের মধ্যে ছোট ছোট কৃত্রিম দ্বীপ। একধারে জলের উপর ছোট একটি কাঠের পুল ব্যাণ্ড ষ্টাণ্ড অবধি গিয়াছে। এই লেকেরই ওধারে বাঁ দিকে বোটানিক্যাল গার্ডেন। বহু নর-নারী সকাল-সন্ধ্যায় এই হ্রদের তীরে বেড়াইতে আসেন। এখানে আসিলে সত্যিই মনে হয়, যদি কবি হইতে পারিতাম। রবীন্দ্রনাথের "অমিত-বন্যা" কবি; এইখানে বসিয়া তাহারা কবিতার মর্মফলকে পরস্পরের হৃদয় নিরীক্ষণ করিয়াছিল আর হ্রদের জল নিরীক্ষণ করিয়াছিল। আর দার্শনিক কবি, পলিতকেশ বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ সেই ছবি অলৌকিক নিপুণতায় আপন চিত্ত-পটে অঙ্কন করিলেন। আর অন্তরীক্ষে বসিয়া প্রেমের দেবতা সেই অপার্থিব প্রেমের সাক্ষী হইয়া রহিলেন। আমরা তাহা দেখিব কোন্ চোখ দিয়া?

একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম; হঠাৎ বন্ধুর চীৎকারে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম পশ্চিম পারের সেই ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডের মধ্য হইতে হাতছানি দিয়া বন্ধু আমাকে আহ্বান করিতেছেন। নিকটে যাইতেই একটু ভঙ্গিমা করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ও কবি! আর লেকের জলে আত্মহারা হয়ে কি হবে? এই দিকে এসে দেখ।" তাকাইয়া দেখি সেই জলের উপরে ভাসমান সেই পাটাতনের উপর একপাল মেয়ে—আধুনিকা। একটির সঙ্গে আলাপরত বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ। মনে হইল, হ্যাঁ গবেষক বটে! সবই কি এর পূর্বনির্দিষ্ট! নিকটে যাইতেই আলাপরতার দিকে অঙ্গুলী হেলাইয়া বন্ধু বলিলেন—"ইনি সেই অনি দি, যাঁর কথা বহুবার তোমাকে বলেছি। সেই যে সেই স্কটিস্‌চার্চ কলেজের! কলেজে এঁর খ্যাতি ছিল। তবে এঁর বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধির চটকই আমাদের চাঞ্চল্য ঘটাত বেশী। পোষাকের চটকে ফটক পর্যন্ত তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হতাম। এমন দামী জুতো পায়ে স্বামীর দেশে পাদচারণা করেন। কলকাতায় আর থাকেন না; কাজেই অনেক দিন সাক্ষাৎ নেই। আজ দেখা পেয়ে পুরোনো পরিচয়টা একটু ঝালিয়ে নিচ্ছি।"

একজন ভদ্রমহিলাকে জড়াইয়া এইরূপ রসিকতা কতখানি পরিচয় থাকিলে সহজে করা চলে, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। আমার একটু রাগই হইল। বেশ জোরেই বলিলাম—"চিরকাল বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে থাকলে সাধারণ বুদ্ধিটায় একটু মরচে ধরাই স্বাভাবিক। ওগো গবেষক কবি, এইবার তবে থাম।"

বন্ধুকে জবাব দিতে হইল না। জবাব দিলেন অনি দি—"না, না, ওর কথায় রাগ করিনে। ওঁর ওই ছেলেমানুষীই তো ভাল লাগে। কলেজে আলাপ-আলোচনা নিয়মবিরুদ্ধ, কিন্তু সুযোগ পেলেই ওঁর সঙ্গে কথা কইতাম। সাহস এবং সাহায্য দিত দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা!"

বিস্মিত হইয়াছিলাম বন্ধুর দুঃসাহসিক রসিকতায়। ততোধিক বিস্মিত হইলাম অনি দির সরলতায়। কোন বিবাহিতা বাঙালীর মেয়ে নির্ভীক সরলতায় তাহার পূর্ব পরিচিত পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে এতখানি সহজে কথা কহিতে পারে তাহা এই প্রথম দেখিলাম। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের অনেক কথাই হইল। তবে তাঁহারা বহুদিন অদর্শনজনিত কথা না-বলার ক্ষতিপূরণ করিলেন তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিলাম। উপসংহারে অনি দি' বলিলেন,—"আপনারা তাহলে যাবেন আমাদের বাসায় —লাবানে।"

লাবানই এখানকার বাঙালী টোলা। আমি বলিলাম, —"আমার আপত্তি নেই। বন্ধু যেখানেই যান গাধা-বোটের মত আমি পিছু পিছু যাই। কোন রকম খাবারের ব্যবস্থা থাকলে তো কথাই নেই।"

সহরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে লাবান এবং তাহারই একধারে অপেক্ষাকৃত ধনী বাঙালী এবং ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ের বাসস্থান।

চাউড্রীর বাড়ী যখন পৌঁছাইলাম তখন বেলা আটটা। চাউড্রী তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। ঘরের ভিতর রৌদ্র প্রবেশ করিয়া তাঁহার মুখে তাপ দিতেছে। আমাদের সারা পাইয়া মিঃ চাউড্রী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া—"আসুন, আসুন", করিয়া উঠিলেন। আমরা বসিলে একটু পরেই চাউড্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রী দুই থালা খাবার আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। যে জিহ্বা সজ্ঞানে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়, তাহাকে থামাইয়া রাখা সহজ নয়। কাজেই আহারে রত হইলাম। তারপর চাউড্রীকে সঙ্গে করিয়াই ভ্রমণে বাহির হইলাম। জোয়াই রোডের মোড়ের কাছে ক্রিপোলীন ফলস্ "স্প্রেড্ ইগ্‌ল" দেখিতে চলিলাম। সহরের উত্তরে পোলো ফিল্ড হইতে একমাইল দূরে এই ফল্‌স্। স্থানীয় লোকেরা এই ফল্‌সকে সতী ফল্‌স বলে। এই ফল্‌সের জল অনেক উঁচু হইতে গড়াইয়া নীচের দিকে একটি প্রস্তরফলকে প্রতিহত হইয়া ঈগল পাখীর বিস্তৃত ডানার আকার ধারণ করিয়াছে। তাই বোধ করি ওই নাম। এই সহরের চতুর্দিকে অসংখ্য 'জলপ্রপাত'—গানার্স ফল্‌স, ইলিসিয়াম, স্থইট, বিডন্, বিসপ ইত্যাদি।

শিলঙে বহু পুরাতন চাউড্রীই আমাদের গাইড হইলেন। ইহাকে লইয়া হ্যাপি ভ্যালি, পোলো ফিল্ড, লরোটো কনভেণ্ট, পাস্তুর ইনষ্টিটিউট্ প্রভৃতি দেখা শেষ করিতে লাগিলাম।

বহু খৃষ্টান ভদ্রলোক অক্লান্ত পরিশ্রমে এই খাসিয়া-জয়ন্তী পাহাড়ের বহু খাসিয়াকে খৃষ্টান করিয়া তুলিতেছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের চালচলন অনেকটা বৈদেশিক ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। এই খাসিয়া দেশের মেয়েরাই আমাকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করিয়াছিল। গায়ের রং ইহাদের ফরসা, দেহ সরল; আকৃতি খর্ব অনেকটা মঙ্গোলিয়ান টাইপের। ইহাদের দেখিলে মনে হয় এই মেয়েগুলিই এই জাতিটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহারা উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করে—যেমন কর্মী, তেমনি ইহারা সরল সদালাপী। উপযাচক হইয়া আলাপ করে না। আলাপ করিলে সকলের সঙ্গেই কথা বলে। পুরুষরা ঠিক ইহাদের উল্টা—আলস্যপরায়ণ, মদ্যপায়ী ও বিলাসী। স্ত্রী-স্বাধীনতার সর্বোচ্চ আদর্শ এই খাসিয়া মেয়েরাই স্থাপন করিয়াছে। শ্রমিক-মহলেও স্ত্রীলোক, বাজারের কেনা-বেচায় স্ত্রীলোক; আবার বাহিরের সাধারণ ভদ্রসম্প্রদায় গঠন করিয়াছেও এই স্ত্রীলোক! ইহাদের বহু মহিলা উচ্চাঙ্গের শিক্ষা লাভ করিয়াছে। অনেকেই ইংরাজি জানে, বাংলা ও হিন্দী অল্প বিস্তর জানে। ইহাদের নিজেদের ভাষা অদ্ভুত, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। বহু চেষ্টায় কয়েকটি কথা আয়ত্ত করিয়াছিলাম, যেমন—কাওআপ=মধু, সঞ্জামত্রা= কমলালেবু, কাকেৎ=কলা, ক্রুইড=দেশী মদ, উসলা-সা= চায়ের পাতা, হাওনে=এখানে ইত্যাদি।

চেরাপুঞ্জি এখান হইতে ৩৬ মাইল দূর। চেরাপুঞ্জির নাম আছে। বিশেষ করিয়া উহার নাম বারিপাতের এবং কমলালেবুর জন্য। শিলং হইতে একটা বাস সার্ভিস্ আছে—একবার যায় এবং আসে। ভাড়ার কিছু স্থিরতা নাই, দশ আনা এবং দুই টাকার মধ্যে ওঠানামা করে। পুজার সময়েই যে সর্বাপেক্ষা বেশী হয়, সে কথা না বলিলেও চলে। আমরাও পুজার ভিড়ে ভিড় জমাইয়াছি, কাজেই জনপ্রতি ২৲ দিয়া, হোটেলের আর কয়েকটি ভদ্রলোক, বন্ধু এবং আমি একটি শুভদিনে রওনা হইলাম। এ রাস্তাও অতীব মনোরম। অসংখ্য কমলা-লেবুর গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার একটা বিশেষত্ব দেখিলাম, পাহাড়গুলি সব মোচার মত সরু হইয়া উপরদিকে উঠিয়া যায় নাই। প্রায় সর্বত্রই চ্যাপ্টা; অত্যধিক বারিপাতই ইহার কারণ। ৯০৪" বারিপাতের রেকর্ড এখানে আছে। ছোট ছোট পার্বত্য নদী, নালা এবং ঝরণা যেখানে সেখানে দেখা যায়। এই স্থান হইতে শিলেটের সমতলভূমি বেশ পরিষ্কার পরিদৃশ্যমান—দূরে সবুজ রংয়ের সমতল ক্ষেত্র একধার হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যধার পর্যন্ত যেন অনন্তে বিলীন হইয়াছে; সে যেন স্বর্গবাসী সমস্ত দেবতাদের ক্রীড়া-ক্ষেত্র। মুস্মাই ফল্‌স্ পৃথিবীব্যাপী নাম ছড়াইয়াছে। উচ্চতায় এবং জলের পরিমাণে ইহা পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থস্থান অধিকার

করিয়াছে। আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম, সে প্রতাপ ইহার আর এখন নাই। ১৮০০ ফুট উঁচু হইতে জল পড়িতেছে বটে, কিন্তু জলের ধারা বেশ কমিয়া গিয়াছে। খুব কাছে যাইবার রাস্তা নাই। দূর হইতে সেই পাতাল-ছোঁয়া খাদের মধ্যে জলপড়া দেখিতে দেখিতে মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে। এখানে কয়েকটি স্বাভাবিক গুহা আছে। তাহার মধ্যে একটি খুবই বড়। আলো লইয়া তাহার মধ্যে নামিতে হয়। মানুষের হাতের কাজের মত বিচিত্র কারুকার্য ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নানা দিক্ হইতে ও নানা উপায়ে বারিপাতের এবং বারি-নিঃসরণের ফলে এইরূপ হইয়াছে। আমাদের চেরাপুঞ্জিবিহারী দুইটি বন্ধু পূর্ব হইতেই এই গুহার প্রতি লোভ পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন। বাস-ষ্ট্যাণ্ড হইতে সে প্রায় তিন মাইল দূরে। বন্ধুদ্বয় বাস হইতে নামিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন সেই গুহার উদ্দেশ্যে, অবশ্য একটি খাসিয়া গাইড সঙ্গে ছিল। পল্লী-অঞ্চলে ইহাদের ভাষা কিছু বুঝিবার উপায় নাই, আমাদের ভাষাও বুঝাইবার সুবিধা নাই। বন্ধুদ্বয় বোধকরি এক প্রকার মরিয়া হইয়া সেই নির্বান্ধব, বিদেশ-বিভুঁইতে একটি অল্পবয়স্ক গাইড সঙ্গে লইয়া এই দুঃসাহসের কার্য করিতে নামিলেন। বাস-চালক অনেক নিষেধ করিয়াছিল, কারণ বেশী সময় বাস এখানে দাঁড়ায় না—ওয়ান-ওয়ে রোড—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস ছাড়িতেই হইবে।

এখানে ছোট একটি বাজার আছে, নোংরা চায়ের দোকান আছে; ভূগর্ভে নয়—ভূপৃষ্ঠে কয়লার খনি এখানে দেখিলাম। কেমন স্তবকে স্তবকে কয়লা সাজান। রোপওয়েতে মালপত্র চলা-চলতি করিতেছে, তাহাও চমৎকার দেখিতে লাগিল। কিছু কলা এবং কমলালেবু কিনিয়া খাইলাম, এমন সময় বাসচালক ফিরিবার তাড়া লাগাইল। এ কি সর্বনাশ! বন্ধুদ্বয় যে এখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই। এখানে থাকিবার স্থান কোথায়? একটি অসজ্জিত, অযত্নরক্ষিত ছোট ডাকবাংলো আছে এবং রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের একটি হোমিও ডাক্তার—সঞ্জীবচন্দ্রের সেই "বঙ্গে শুধু প্রতিবাসীই দুষ্ট অসজ্জন। প্রবাসে বাঙালী সজ্জন সদালাপী", এখানে খাটে না। মাথা-খুঁড়িলেও ওই হোমিও ডাক্তার ছাড়া আর বাঙালী মিলিবে না। সজ্জন হউন অসজ্জন হউন আশ্রয় ঐ একটি। অনেক অনুনয়-বিনয়েও বাসচালককে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী রাখিতে পারিলাম না। সে হর্ণ বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িল। সুতরাং আমিও বন্ধুদ্বয়কে ফেলিয়া যানে আরোহণ করিতে বাধ্য হইলাম। তবে ফিরিয়া আসিয়া "উহাকে বাঘে খাইয়াছে" বলি নাই এবং বঙ্কিমচন্দ্রের তীর্থযাত্রীরা একটি নবকুমারকে দুর্ভেদ্য অরণ্যে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, আমরা দুর্ভেদ্য অরণ্যে ফেলি নাই, জনবিরল মাঠে, এবং একটিকে নয় দুইটিকে। সে 'নব-কুমার' পরার্থে কাষ্ঠ-সংগ্রহে গিয়াছিলেন, আমাদের নবকুমারদ্বয় পরার্থে নয়, আত্মার্থে এবং কাষ্ঠ-সংগ্রহে নয়, গুহা-দর্শনে গিয়াছিলেন। তবে সমস্ত দুঃখ সত্ত্বেও বঙ্কিমের নবকুমার 'কপালকুণ্ডলা'র সন্ধান পাইয়াছিলেন, আমাদের নবকুমারদ্বয় যদিও পাইয়া থাকেন সে কপাল-কুণ্ডলা নয়, রণচণ্ডিকা, কাজেই সে বিষয়েও বিশেষ ভরসান্বিত হইতে পারিলাম না। সমস্ত পথ একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে করিতে আসিলাম। খাইবার ব্যবস্থা না হয় ওই হোমিও ডাক্তারের গৃহে হইতে পারিবে কিন্তু এই দুরন্ত শীতে শুইবার উপায়ই বা কি আর উপকরণই বা কোথায়? ফিরিবার ব্যবস্থা আর কাল ঠিক এমনি সময়। আমরা বাসায় ফিরিলাম। সে রাত্রি সুনিদ্রা হইল না। উঁহারাই আমাদের আলাপ-আলোচনার বিষয় হইয়া রহিলেন।

পরদিন বন্ধুদ্বয় না ফিরিতেই চৌধুরী এবং কলিকাতা হইতে সদ্যঃ আগত একটি স্থূলকায় বাবু আসিয়া খবর দিলেন বিশপ এবং বিডন্ ফলস্ দেখিতে যাইতে হইবে। ইতিপূর্বে একাধিকবার গিয়াছিলাম। এই নবোদ্যমের হেতু ঐ নবাগত ভদ্রলোকটি। আপত্তি করিলাম না। শিলং হাইড্রো-ইলেকট্রিক কোম্পানী উপরি উক্ত এই দুইটি ফল্‌সের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ইহাদের পাওয়ার-হাউস্ এই ফল্‌সের নিম্নদেশে খাদের

মধ্যে। পাওয়ার হাউসের ঠিক সম্মুখ দিয়া এই মিলিত ফলসম্বয় নদী সৃষ্টি করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই নদীর এক পারে পাওয়ার হাউস্ এবং অপর পারে প্রকাণ্ড উঁচু পাহাড়। আজ খেয়াল চাপিল সেই পাহাড়ের শিরে দাঁড়াইয়া নূতনভাবে ফলস্ দেখিতে হইবে। অনেকটা ঘুরিয়া সেইখানে পৌছাইলাম। সেখানে যাইয়া মনে হইল ঐ নদী যেন সরুসুতার মত চলিয়াছে। চাউড্রি হঠাৎ বলিয়া বসিলেন—"পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে নদী পার হয়ে ইলেক্‌ট্রিক ওয়ার্কসপের মধ্য দিয়ে যাবেন?" বিদেশে আসিয়াছি—অ্যাডভেনচার করিতে হইবে। আমরা সকলেই একবাক্যে তাহাই সমর্থন করিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিতে আরম্ভ করিলাম। একটু পূর্বে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত খাড়াই রকমে ঢালু পাহাড়। কোন পায়ে-চলা পথও নাই। ছোট ছোট গাছপালা ঝোঁপ-ঝাড় আছে। কোনও প্রকারে সেইগুলিকে আশ্রয় করিয়া আমরা নামিতে লাগিলাম। কিন্তু যত যাই পথ আর ফুরায় না। এই মনে করি শেষ হয়, শেষ আর হয় না। এক এক স্থানে গিয়া এমন সঙ্কটে পড়িতে হইল যে কোন দিকে যাইবার উপায় নাই। নীচু দিকে আশ্রয়হীন অবস্থায় সোজা খানিকটা নামিতে পারিলে তবে একটু দাঁড়াইবার স্থান মিলিবে। তখন সকলে বেপরোয়া। ঘাড়ে খুন চাপিয়াছে আর না হয় ত ভূত চাপিয়াছে। পৃষ্ঠদেশ পাহাড়ের গায়ে সংলগ্ন করিয়া হাত পা ছাড়িয়া, কোন কোন স্থানে শুধু নীচের দিকে ঝোঁক দিয়া চলিতে লাগিলাম! সেই দুরন্ত শীতেও সকলের গায়ের জামা ঘামে ভিজিয়া উঠিল। বেলা আড়াইটায় নামিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম চারটায় অর্ধেকও নামিতে পারিলাম না। উৎসাহ সকলের বহুক্ষণ মাথায় উঠিয়া গিয়াছে, তখন কেবল প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা—সে যেন মুখোমুখি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। শেষে একস্থানে গিয়া আমাদের এই মৃত্যুজয়ী গতিও রোধ হইল। আর নীচের দিকে অগ্রসর হওয়া হিমালয় পর্বত লঙ্ঘনের মতই অসম্ভব। ফিরিয়া উপরে ওঠা মানে মৃত্যুর মুখে স্বেচ্ছায় লাফাইয়া পড়া। সেখান হইতে কোনও প্রকারে খসিয়া পড়িলে গঙ্গায় ফেলিবার মত অস্থিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যাহা হউক সকলে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া সেই মরণ-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। মৃত্যু যখন মানুষকে গ্রাস করিয়াছে, মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও তখন মানুষ প্রাণপণে যুঝিয়া দেখে, এ যেন তাহাই। কোনও প্রকারে গড়াইয়া গড়াইয়া যখন সেই পাহাড়ের পাদদেশে পৌছাইলাম তখন বেলা শেষ হইয়াছে। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলাম—এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা হইল। এখন সরু নদী পার হইয়া হাইড্রা-ইলেক্‌ট্রিকের ঘরের লোকের সঙ্গে মিশিব। তারপর যত রাত্রে হয় উঠিয়া যাইব।

বিপদ্ যখন ঘাড়ে চাপে এমনি করিয়াই চাপে। উপর হইতে যে নদী সূত্রবৎ মনে হইতেছিল পার হইতে গিয়া দেখি তাহা দুরতিক্রম্য, ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখীন হয়। ঐ অতখানি উঁচু পাহাড় হইতে জল নামিয়া যেন প্রলয়ের হুঙ্কারে ছুটিয়া চলিয়াছে। কি তাহার গর্জন, আর কি তাহার গতি! যেন ৬।৭ খানি দার্জিলিং মেল এক সঙ্গে চলিয়াছে। হাতে দুইটি টর্চ ছিল; নামিবার সময় নিজেদের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া তাহাদের রক্ষা করিতে পারি নাই। সেই জীর্ণ-শ্রান্ত দেহ লইয়া ক্রমাগত দেড় ঘণ্টা সেই সর্পসঙ্কুল পাহাড়ের গাত্রদেশ চষিয়াও ওপারে যাইবার পথ করিতে পারিলাম না। পরিসর অল্প হইলেও সেই জলের ধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া শিলাখণ্ড এড়াইয়া, বেড়াইয়া এমন বেগে ধাবিত হইতেছে যে পা ঠেকাইলেই তাহা সজোরে ছাড়িয়া দেয়। হাত-ধরাধরি করিয়া নামিবার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, অসম্ভব। কোনও প্রকারে ফসকাইলেই শিলাখণ্ডের উপর ছুড়িয়া চূর্ণ করিয়া দিবে। তখন রাত্রি নামিয়াছে, অন্ধকারের যবনিকায় ভূপৃষ্ঠ সমাচ্ছন্ন। সেই খাদের মধ্যে একেবারে পাতালপুরীর অন্ধকার। সেই ভীষণ অন্ধ-কারের গহ্বরে দাঁড়াইয়া সেই সরু নদীর শুভ্র জলধারা যেন মৃত্যু-রাক্ষসীর করাল দংষ্ট্রা-রেখার মত মনে হইতে লাগিল! পোষাক-পরিচ্ছদ ভিজিয়া গিয়াছে। শীতে রক্ত জমাট বাঁধিবার উপক্রম হইতেছে। 'শ্রীকান্ত'র দর্জিপাড়ার 'ঠং ঠং পেয়ালা' নতুনদার মত আমাদের এই

কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গ 'চল্‌বে ব্রজের কানাই' নতুনদার অবস্থাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া পড়িল। তিনি অ্যাড্‌ভেন্‌চার আরম্ভ করিবার সময় [সেই যে—চল্‌বে ব্রজের কানাই— বলিয়া গুনগুন স্বরে গাহিতে গাহিতে নামিয়াছিলেন, সে স্বর যে তাঁহার কখন মিলাইয়া মুছিয়া গিয়াছিল তাহা জানিতেও পারি নাই। তিনি এখন একেবারে কাদার মত এলাইয়া পড়িলেন। তাঁহার আর কোন সাড়শক্তি আছে বলিয়া মনে হইল না। বড় দুঃখে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—"মারা গেলাম তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু কারুর সঙ্গে যে আর দেখা হবে না।" একবার ভাবিলাম চারিজনে মিলিয়া এইখানে রাত্রি কাটাই। কিন্তু সেই হিমালয়-শীতে সেই কল্পনা কার্যে পরিণত করা অপেক্ষা দুরাশা আর কি হইতে পারে। তখন বীরচতুষ্টয়ের মিলিত বজ্রকণ্ঠ গুলিখাওয়া শিকারের প্রাণীর মত আকাশে বাতাসে শেষ-নিবেদন জানাইতে লাগিল। সে কি গগনভেদী চীৎকার! মৃত্যুকে জয় করিবার সে কি সম্মিলিত ভীষণ তোপধ্বনি! কিন্তু হইলে কি হয়, বিডন্ আর বিশপের সেই যমজ জলপ্রপাতের বজ্রগর্জনের গায়ে ঠেকিয়া তাহা শূন্যে মিলাইতে লাগিল। অপর পারে অদূরে ১০০ গজের মধ্যে ইলেক্‌ট্রিকের কারখানা, কিন্তু এই শব্দকে ছাপাইয়া মৃত্যুভীত চারিটি কঠিন কণ্ঠও কারখানার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না। সাহায্য পাঠাইলেন ভগবান্। নিকটেই একটি পাহাড়িয়া মেষপালক, হারাণ মেষ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। কোন প্রকারে তাহার কানে গিয়া পৌঁছিল আমাদের চীৎকার। সেই পাহাড়িয়া দৌড়াইয়া সংবাদ দিল পাওয়ার হাউসের লোকের কাছে। তাঁহাদের মধ্যে তিন জন ছিলেন বাঙালী। তাঁহারা মই লইয়া আসিয়া সেই নদীর দুই ধারে দুই শিলাখণ্ডে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। আমরা বহু সন্তর্পণে একে একে সেই নদী পার হইয়া গেলাম। ভগবানুকে ধন্যবাদ দিলাম। রক্ষকর্তাত্রয়কে ধন্যবাদ জানাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। অনন্ত কৃতজ্ঞতায় বাকশক্তি রোধ হইয়া রহিল। ঘরে আনিয়া আগুনের উত্তাপে গা সেকিয়া চা খাওয়াইয়া তাঁহারা আমাদেরকে উপর পর্যন্ত আগাইয়া দিলেন। মনুষ্যত্বের প্রতি তাঁহাদের এতটা অকুণ্ঠ কর্তব্যজ্ঞানে আমরা মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু এখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে কোন বাক্যই অকিঞ্চিৎকর। এইবার মনে পড়িল কল্যকার নব-কুমারদ্বয়কে। কিন্তু তাহাদের তুলনায় আমাদের অবস্থা যে কত ভীষণ তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেহ বুঝিবে না। বাড়ী যাইয়া তাহাদের মুখে তাহাদের কথাই শুনিলাম, কিন্তু আমাদের কথা ব্যক্ত করিলাম না। কারণ সে বিপদের এক সহস্রাংশও কোন লোককে বলিয়া বোঝান যাইবে না।

এই সংবাদ জানাইছিলাম শুধু অন্তদিকে। আরও কয়েক দিন কাটিল। দুর্গাপূজা দেখিলাম—১৭ খানা প্রতিমা, গুর্খা লাইনে গুর্খা নাচ, ছোরাখেলা, গুলিছোড়া, মহিষ বলি ইত্যাদি দেখিলাম। এক একটি মহিষ কুকরীর এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ১৫।২০টা মহিষ ছিন্ন কদলীর মত লুটাইয়া পড়িল। রক্তের নদী বহিয়া গেল। ধর্মের নামে একি ভয়াবহ হিংস্রতা! দেখিলে শিহরণ লাগে; ইহা ছাড়া হাস, পায়রা মোরগ, ছাগল ইত্যাদি কত প্রাণীই যে তাহারা কচুকাটা করিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই!

তারপর যেদিন বিদায়ের দিন আসিল অনি দি আসিলেন, মিঃ চাউড্রি আসিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী আসিলেন আর আসিলেন চেরাপুঞ্জির সেই নবকুমারদ্বয়। অনি দি কখনও একা চলেন না—সদলবলে। কাজেই উল্লিখিত সংখ্যা আসলের অনেক নীচে। বাসে বসিয়া বন্ধু চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"অনি দি, চললাম, তোমাকে ভুলবো না, আর ভুলবো না পাহাড় বেয়ে নামার অ্যাডভেঞ্চার। কবীন্দ্রের 'অমিত বন্যা'র সন্ধানের দুরাশা সে দিন হতে আর রাখি নি, সে ভার তোমাকে দিয়ে গেলাম দিদি, মনে রেখো।"

দিদি ছোট কথায় বলিলেন—"কবিত্ব রখো।"

তুলসী-সপ্তশতিকা

শ্রীরামচরণ দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৫৯)

বিমল বিলগ সুখ নিকট দুঃখ জীবন সমৈ সুরিতি।
রহিত রাখিয় রামকী তজেতে উচিত অনীতি॥

রামে প্রীতিহীন অনীতিনিরত,
নিকটে নিপট দুঃখ তাহার;
সুবিমল সুখ, সদা সঙ্গে তার,
রামপদে রতি সুরীতি যার।

(৬০)

জায় কহব করতুতি বিন জায় যোগ বিন ক্ষেম।
তুলসী জায় উপায় সব, বিনা রামপদ-প্রেম॥

কার্য বিনা কথা সকলি বিফল,
কিবা ফলযোগে বিহীন ক্ষেম;
কহিছে তুলসী, সর্বোপায় বৃথা,
যদি রামপদে না হল প্রেম।

(৬১)

তুলসী রামহি পরিহরৈ নিপট হানি শুনু মোদ।
জিসি সুরসরীগত সলিলবর, সুরা সরিস গঙ্গোদ॥

অপবিত্র জল, সুরসরিগত,
হইলে পরম পবিত্র হয়;
গঙ্গাছাড়া জল সুরাস্পর্শে সুরা,
রাম ছাড়া নর তেমনি হয়।

(৬২)

হরে চয়হিঁ তাপহিঁ বরে করে পসারহি হাত।
তুলসী স্বারথ মিত জগ পরমারথ রঘুনাথ॥

তরু পাতে চরে ফল হ'লে খায়,
তাপে ক্ষুপ্ত হয় জ্বলে যখন;
জগতের সব স্বার্থপর মিত্র,
পরমার্থ এক সীতারমণ।

(৬৩)

তুলসী খোটে দাস কর রাখত রঘুবর মান।
জ্যোঁ মূরখ পুরোহিত হিঁ দেত দান যজমান॥

বেশধারী ভক্ত হইলেও তাঁর,
রাম রঘুবর রাখেন মান;
কহিছে তুলসী মূর্খ পুরোহিতে
যজমান দেয় স-মান দান।

(৬৪)

জ্যোঁ জাগ বৈরী মীনকো আপু-সহিত পরিবার।
ত্যোঁ তুলসী রঘুনাথ বিন আপনি দশা বিচার॥

সহ পরিবার সংসারের সব,
মীনের বিপক্ষ নিজেও মীন;
রঘুনাথ বিনা, তুলসীদাসের,
মীনের সমান দশা মলিন।

(৬৫)

তুলসী রাম ভরোস শির লিয়ে পাপ ধরি মোট।
জ্যোঁ ব্যভিচারী নারী কহঁ বড়ী খসম কি ওট॥

রে তুলসীদাস, রাম-ভরসায়,
পাপ-বোঝা লও মাথায় ধ'রে;
দ্বিচারিণী নারী, পতি ঠিক রেখে
পাপ-পারাবার সহজে তরে।

(৬৬)

স্বামী সীতানাথ জী তুমলগ মেরী দৌর।
তুলসী কাক জাহাজকো সুঘত ঔর ন চৌর॥

তুলসীদাসের স্বামী সীতানাথ,
এই মাত্র জানি জানিনা আন;
জাহাজ উপরে উপবিষ্ট কাক,
জাহাজ ভিন্ন না দেখে স্থান।

(৬৭)

তুলসী সব ছল ছাড়ি কৈ কী জৈ রাম সনেহ।
অন্তর পতি সে হৈ কহা জিন দেখি সব দেহ॥
রে তুলসীদাস		সব ছল ছাড়ি
শ্রীরাম-চরণে করহ স্নেহ ;
কোন্ অঙ্গ পত্নী		পতিরে লুকাবে
দেখিছেন যিনি সকল দেহ।

(৬৮)

সবহিঁকো পরখে লখে বহুত কহে কা হোয়।
তুলসী তেরো রাম তজি হিত জগ ঔর ন কোয়॥
পরীক্ষা করিয়া		দেখেছি সকল,
অধিক বলিয়া আর কি হবে ;
রে তুলসী তোর		সীতানাথ ছাড়া,
হিতকারী কেহ নাহিক ভবে।

(৬৯)

তুলসী হম সোঁ রাম সোঁ ভলো বনো হৈ সুত।
ছাড়ে বসৈন সংগ্রহে জো খর মাহ কুপুত॥
বলিছে তুলসী,		শ্রীরামে আমাতে
মিলিয়া গিয়াছে উত্তম সুত্র ;
রাখিতে নারেন		ছাড়িতে নারেন,
তিনি পিতা আমি তাঁর কুপুত্র।

(৭০)

কোটি বিঘ্ন সঙ্কট বিকট কোটি শত্রু জো সাথ।
তুলসী বল নহি করি শকৈ জো সুদৃষ্টি রঘুনাথ॥
কোটি বিঘ্ন		কোটি বিকট সঙ্কট
কোটি শত্রু কেন থাকুক সাথ ;
তুলসীর কিছু		করিতে নারিবে,
সুদৃষ্টি করিলে জানকীনাথ।

(৭১)

লগন মুহুরত যোগ বল তুলসী গণত ন কাহি।
রাম ভয়ে জোহিঁ দাহিনে, সবৈ দাহিনে তাহি॥
লগ্ন কি মুহূর্ত		সংযোগের বল,
তুলসী কখন গণেনা কারে ;
রাম যার প্রতি		হন অনুকূল,
সব অনুকূল হইবে তারে।

(৭২)

প্রভু প্রভুতা জা কহঁ দই বোল সহিত গহি কঁহ।
তুলসী গাজত ফিরহিঁ রামছত্র কি ছাঁহ॥
বাহুতে ধরিয়া		শ্রীমুখে প্রকাশি,
দিয়াছেন প্রভু প্রভুতা যায় ;
কহিছে তুলসী		নির্ভয়ে সে ফিরে
শ্রীরাম-রাজার ছত্র-ছায়ায়।

(৭৩)

সাধন সাঁসতি সব সহত সুমন সুখদ ফল লাহু।
তুলসী চাতক জলাকা, রিঝি বুঝি বুধ কাহু॥
সুখরূপ ফল,		লাভের আশায়,
সকলে সহে সাধন-শাসন ;
কহিছে তুলসী,		চাতকের মত,
সুখ বুঝে কোন্ সুবোধ জন।

(৭৪)

চাতক জোবদ জলদ কহ জানত সময় সুরীতি।
লখত লখত দেখি পরত হৈ তুলসী প্রেম প্রতীতি॥
প্রাচীন চাতক,		ব্যবহার দেখি,
নূতনেরা শিখে রীতি-সময় ;
বলিছে তুলসী,		দেখিতে দেখিতে
রাম-প্রেম শিখে প্রেমিকচয়।

(৭৫)

জীব চরাচর জঁহ লগে হৈ সবকো প্রিয় মেহ।
তুলসী চাতক মন বশে ঘন সোঁ সহজ সনেহ॥
চরাচর জীব-		জগতে যে আছে
সকলেরই প্রিয় জলদ বটে ;
চাতক ছাড়িয়া		সহজ পিরিতি
কভু কারো ঘটে কভু না ঘটে।

(৭৬)

ডোলত বিপুল বিহঙ্গ বন পিয়ত পোখরী বারি।
সুযশ ধবল চাতক নবল, তোর ভুবন দান চারি॥

বিপুল বিহঙ্গ বিপিনে বিহরে,
খায় সরোবর-তড়াগে জল ;
কিন্তু হে চাতক, ভুবন ভরেছ
বিস্তারিয়া তুমি যশঃ বিমল।

(৭৭)

মুখ মীঠে মানস মলিন কোকিল মোর চকোর।
সুযশঃ ললিত চাতক চলিত রহো ভুবন ভরি তোর॥
মুখে মিষ্ট কথা মানস মলিন,
কোকিল, ময়ূর আর চকোর ;
কহিছে তুলসী, ললিত সুযশঃ,
জগতে বিদিত চাতক তোর।

(৭৮)

মাগত তোলত হৈ নহি তজি ঘর অনত ন জাত।
তুলসী চাতক ভক্তকো উপমা দেত লজাত॥
ভ্রমে সর্বস্থানে, মাগেনা কাহারে,
ছাড়িয়া যায়না আপন বাস ;
রামভক্ত সনে, চাতকে তুলিতে
তবু সঙ্কুচিত তুলসীদাস।

(৭৯)

তুলসী তিনোঁ লোক মহঁ চাতক হি কো মাথ।
শুনিয়ত জাসু ন দীনতা কিয়ে দুসরে নাথ॥
তিন-লোক-মাঝে, যত লোক আছে,
চাতকের মাথা সবার উঁচু ;
নিজ নাথ ছাড়া, অপরের কাছে,
কখনও প্রার্থনা করেনা কিছু।

(৮০)

প্রীতি পপিহা পয়দ কি প্রকট নই পহিঁ চানি।
যাচক জগত অধীন হস ফিরে কনৌড়ো দানি॥
পাপিয়া-পয়োদ- প্রীতি নিরখিলে,
নব রীতি এক প্রকাশ পায় ;
জগতে যাচক, দাতার অধীন,
চাতক কিনিয়া রাখে দাতায়।

(৮১)

উঁচি জাতি পপীহরা নীচো পীয়ত ন নীর।
কৈ যাঁচৈ ঘনশ্যাম সোঁ কৈ দুখ সহৈ শরীর॥
উন্নতহৃদয় যাচক চাতক,
নীচ হ'তে কভু লয়না নীর ;
হয় যাচে শ্যাম মেঘের নিকট
নয় দুঃখে লয় করে শরীর।

(৮২)

কৈ বরষৈ সমসময় নীর কৈ ভরি জনম নিরাশ।
তুলসী চাতক যাচক হি, তউ তিহারী আশ॥
সময়ে বরষে কিম্বা না বরষে
জন্ম ভরিয়া যদি জলধর ;
কহিছে তুলসী তথাপি চাতক,
আশা রাখে শুধু ঘন-উপর।

(৮৩)

চয়তন চাতক চিত কবহুঁ প্রিয় পয়োদকে দোষ।
যাতে প্রেম পয়োধিবর তুলসী যোগন দোষ॥
প্রিয় পয়োদের দোষ কোন কালে
চাতকের চিতে না পায় স্থান ;
এরূপ নির্দোষ প্রেম-সাগরের
করিছে তুলসী যশঃ কথন।

(৮৪)

তুলসী চাতক মাঁগনো এক এক ঘন দানি।
দেত সো ভূভাজন, ভরত লেত ঘুঁট ভরি পানি॥
চাতক যেমন যাচক প্রধান,
দানি শিরোমণি জলদও হয় ;
জলধর-দানে পূর্ণ ধরাতল,
চঞ্চুমাত্র জল চাতক লয়।

(৮৫)

হবৈ অধীন যাচত নহি শিশ নহি নহি লয়।
ঐ সে মানী মাগনহি কো বারিদ বিন দেয়॥
অধীন হইয়া যাচেনা কখন,
লয়নাকো দান নোয়ায়ে শির ;

ঐইরূপ মানী যাচক চাতকে
জলধর বিনা কে দেয় নীর ?

(৮৬)

পবি পাহন দামিনী গরজ অতি ঝকোর খর খিঝি ।
দোষন প্রীতম রোষ লখি তুলসী রামহি রিঝি ॥

করকা-প্রহারে, চপলা-চমকে
অতি বৃষ্টি আর বায়ু-তাড়নে ;
বজ্র আঘাতেও প্রিয়তম প্রতি
রোষ না জনমে চাতকমনে ।

(৮৭)

কোন জিয়ায়ে জগত মহঁ জীবন দায়ক পানি ।
ভয়ো কনৌড়ো চাতকহি পয়দ প্রেম পহিঁচানি ॥

কারেনা জীবিত রাখে জলধর
জীবন-স্বরূপ জীবন-দানে ?
কিন্তু প্রেমবশে চাতকের কেনা
জলদ, জগতে কেবা না জানে ?

(৮৮)

মান রাখিবো মাঁগিবো পিয় সোঁ সহজ সনেহ ।
তুলসী তিনো তব কবৈ জব চাতক মত লেহ ॥

প্রার্থনা করিব সম্মানও রাখিব
রবে প্রিয়তমে সহজ স্নেহ ;
রে তুলসী যদি এ তিনে শোভিবে
চাতকের ভাব হৃদয়ে লহ ।

(৮৯)

তুলসী চাতকহি কবৈ মান রাখিব প্রেম ।
বক্রবুঁদ লখি স্বাতিকো নিদরি নিবাহত নেম ॥

মান রাখা আর প্রিয়তমে প্রেম,
চাতকেই ভাল শোভিত হয় ;
স্বাতি-বিন্দু যদি বক্রভাবে পড়ে
চেষ্টায় চাতক তাহা না লয় ।

(৯০)

উপল বরষি গর্জত তরজি ডারত কুলিশ কঠোর ।
চিতব কি চাতক জলদ তজি কবহুঁ আনকী ওর ॥

গরজে তরজে, উপল বরষে,
কঠোর কুলিশ করে প্রহার ;
তথাপি চাতক, জলধর ত্যজি
অপরের পানে চাহে কি আর ?

(৯১)

বরষি পরুষ পাহন জলদ পক্ষ করৈ টুক্ টুক্ ।
তুলসী তদপি ন চাহিয়ে চতুর চাতকহি চুক ॥

কঠিন করকা বরষি জলদ
খণ্ড খণ্ড যদি করে পালক ;
কহিছে তুলসী, অন্যে না চাহিবে
যে হইবে ভাই চতুর চাতক ।

(৯২)

রটত রটত রসনা লটী তৃষা সুখি গো অঙ্গ ।
তুলসী চাতককে হিয়ে নিত নূতন হি তরঙ্গ ।

রটিতে রটিতে, রসনা স্থগিত,
পিপাসায় শুষ্ক সকল অঙ্গ ;
কহিছে তুলসী, চাতক-হৃদয়ে
তবু খেলে নব প্রেম-তরঙ্গ ।

(৯৩)

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সাত সিন্ধু ভরি পূরি ।
তুলসী চাতক কেমতে বিন স্বাতী সব ধুরি ॥

জাহ্নবী যমুনা আর সরস্বতী
সাতটি সাগর জলে পূরণ ;
কহিছে তুলসী চাতকের মতে
স্বাতি বিনা সব ধূলা যেমন ।

(৯৪)

তুলসী চাতককে মতে স্বাতী পিয়ত ন পানি ।
প্রেমতৃষা বঢ়তি ভলি ঘটে ঘটৈগী কানি ॥

বলিছে তুলসী চাতকের মতে
স্বাতিজল পূ'রে করোনা পান ;
প্রেম-তৃষ্ণা যত বাড়ে তত ভাল,
তৃষা-ক্ষয়ে প্রেম-ক্ষয়-বিধান ।

(৯৫)

সর সরিতা চাতক তজে স্বাতী সুধি নহি লেই।
তুলসী সেবক বশ কহা জো সাহেব নহি দেই॥

নদী-সরোবর ত্যজেছে চাতক
জলধরও যদি তত্ত্ব না লয়;
কহিছে তুলসী কি সাধ্য দানের—
যা করেন প্রভু তাহাই হয়।

(৯৬)

আশ পপীহা পয়দ কী সুহুহো তুলসীদাস।
জো অচবৈ জল স্বাতী কো পরিহরি বারহ মাস।

রে তুলসী দাস, চাতকের আশ,
জলদে যেমন তেমনি কর;
পিতে হয় যদি স্বাতি-বিন্দু পিও,
অন্য সকল জল পরিহর।

(৯৭)

চাতক ঘন তজি জিয়তন নাহ নারি।
মরত ন মাঁগে অর্ধজল, সুরসরিহুকো বারি॥

জীবন থাকিতে চাতক কখন,
অন্য জলে মাথা নোয়াবেনা;
মরণের কালে সুরধুনী জলে
অর্ধজলী হ'তেও চাহিবে না।

(৯৮)

ব্যাধা বধো পপীহরা পরো গঙ্গ জল জায়।
চোঁচ মুদি পীবৈ নহি ধিক্ পীবন প্রাণ জায়॥

ব্যাধ-শরাঘাতে ব্যাকুল চাতক,
গঙ্গা সলিলে পড়িবে যবে;
ধিক্ জল পানে নষ্টপণ ভয়ে,
চঞ্চু মুদি ঊর্ধ্ব আননে রবে।

(৯৯)

বধিক বধো পরি পুণ্য জল উপর উঠাই চোঁচ।
তুলসী চাতক প্রেম পট মরত ন লাহ খোঁচ॥

ব্যাধ-বাণাঘাতে পুণ্য জলে পড়ি,
চাতক চঞ্চু তুলিয়া রাখে;
কহিছে তুলসী প্রাণ দিল তবু
প্রেম-পটে দাগ কভু না আঁকে।

(১০০)

চাতক সুতহি সিখাব নিত আন নীর জনি লেহু।
য়হ মেরে কুলকো ধরম এক স্বাতী সোঁ নেহু॥

পাপিয়া প্রত্যহ, শিখায় বালকে,
"অন্য জল বাছা করোনা পান";
এই আমাদের কুলের ধরম
স্বাতি-জলে স্নেহ না চাহি আন।

(১০১)

দরশন, পরশন আন জল বিন স্বাতী শুহু তাত।
সুঝত চেঁচুয়া চিত চুভো শুনত নীতি বরবাত॥

"স্বাতি-জল বিনা অপর সলিল,
দর্শন স্পর্শন করোনা তাত";
বাল্যকাল হ'তে এ নীতি বচন
দৃঢ় ভাবে ধরে চাতক চিত।

(১০২)

তুলসী সুত সে কহত হৈ চাতক বারম্বারি।
তাতস তর্পণ কীজিয়ো বিনা বারিধর বারি॥

বলিছে চাতক নিজপুত্র প্রতি
বার বার কহি এই বচন;
"দেখ বাছা যেন বৃষ্টি-জল বিনা,
কখনও করোনা মম তর্পণ।"

(১০৩)

বাজ চঞ্চুগত চাতকহি ভই প্রেম কী পীর।
তুলসী পরবশ হাড় মম পরিহৈ পুহুমি নীর॥

কহিছে তুলসী বাজ-চঞ্চুগত
চাতক-চিতের প্রেমের ব্যথা;
"প্রাণ গেল হায়! পরবশ অস্থি!
ভূমিগত নীরে পড়িবে কোথা।"

(১০৪)

অণ্ড কোরি কিয় চেঁচুরা তুষ পরো নীর নিহারী।
গহি চঁগুল চাতক চতুর ডারো ঝহর করি॥

অণ্ডখণ্ড করি, বাহিরিল শিশু,
অণ্ডখোসা গিয়ে পড়িল জলে ;
অমনি চতুরা চাতকী আসিয়া
চঞ্চু দিয়া খোসা তুলিয়া ফেলে।

(১০৫)

দোষন চাতক পাতকী জীবন দানে ন মূঢ়।
তুলসী গতি প্রহ্লাদ কী সমুকি প্রেম পদ গূঢ় ॥
চাতক পাতকী নহে কোন মতে,
জলধর নহে কখনও মূঢ় ;
রে তুলসী বুঝ প্রহ্লাদের গতি,
রামপদে তার কি প্রেম গূঢ় ?

(১০৬)

তুলসী কে মত চাতক হি কেবল প্রেম পিয়াস।
পিয়ত স্বাতী জল জান জগ তাবত বারহ মাস॥
কহিছে তুলসী, মম মতে এই
চাতকে বিশুদ্ধ প্রেম-পিয়াস ;
বিশ্ববাসী জানে স্বাতি-জল পিয়ে
নতুবা তৃষিত রয় বারমাস।

(১০৭)

এক ভরোসো এক বল এক আশ বিশ্বাস।
স্বাতী সলিল রঘুনাথ বর চাতক তুলসীদাস॥
একই ভরসা, একমাত্র বল,
এক মাত্র আশা, এক বিশ্বাস ;
স্বাতির সলিল, সম রঘুনাথ
চাতক সমান তুলসীদাস।

(১০৮)

আল বাল মুক্তা হল নি হিয় সনেহ তরুমূল।
হেক্স হেক্স চিত চাতকহি স্বাতী সলিল অনুকূল ॥
মুকুতা নির্মল, হৃদি আলবালে,
চরম প্রেমতরু কর রোপণ ;
সে তরু-পোষণে সদা দৃষ্টি রাখ,
চাতকের চিত স্বাতিতে যেমন।

(১০৯)

রাম প্রেম বিন দুবরে রাম প্রেম সহ পীন।
বিসদ সলিল সরবর বরণ জন তুলসী মন মীন ॥
তুলসী-হৃদয়, সরোবর সম
রাম-প্রেম তাহে নির্মল জল ;
মন-মীন তথা পুষ্ট থাকে বেশ,
সলিল-সঙ্কোচে মীন দুরবল।

(১১০)

আপ বধিকবর বেষ ধরি কুহৈ কুরঙ্গম রাগ।
তুলসী জো মৃগসম স্থরৈ পরৈ প্রেমপটদাগ ॥
ব্যাধের সুবেশ. মৃগ আনে পাশে,
আত্মহারা শুনি কুরঙ্গ-রাগ ;
যদি প্রাণভয়ে মন-মৃগ ফিরে,
রে তুলসী প্রেমে পড়িবে দাগ।

ক্রমশঃ

মহেশ্বরী

শ্রীবলাইচাঁদ আঢ্য

গ্রাম্য দেবতা কৈলাসনাথের মন্দিরে অন্যান্য দিনের মত সন্ধ্যার সময় দূর হইতে দেবদর্শন করিয়া মাসী সুভদ্রার সহিত বাড়ী ফিরিবার পথে অবিবাহিতা ষোড়শী ব্রাহ্মণ-যুবতী মহেশ্বরীকে পিছন হইতে আক্রমণ করিয়া, চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে গুণ্ডার দল যখন ধরিয়া লইয়া অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল, তখন রতনপুর গ্রামে পুরুষের আকারবিশিষ্ট স্থবির মানুষের অভাব একেবারেই ছিল না। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সবেমাত্র পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিয়াছে। রতনপুর গ্রামের লোক তখনও কালনিদ্রার কোলে অভিভূত হইয়া পড়ে নাই—গ্রামের মন্দিরে তখনও সান্ধ্য আরতির শঙ্খরোলের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উঠিতেছিল।

ঘটনাস্থলের একটু দূরেই গ্রামের বারোয়ারী চণ্ডী-মণ্ডপে গ্রামের যত প্রবীণ মাতব্বর আর যত বর্ষিয়সী মহিলা তখন ভাব-গদ-গদ চিত্তে কথক বিষ্ণু ঠাকুরের শ্রীমুখে সীতাহরণের করুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে ভাবের আবেশে চোখের জলে বুক ভাসাইতেছিল—আর "কোথায় তুমি আর্য্যপুত্র! রক্ষা কর" সীতার এই করুণ বিলাপে শ্রোত্রীমণ্ডলীর কণ্ঠোচ্চারিত সমবেদনার অর্ধস্ফুট মৃদুগুঞ্জনে চণ্ডীমণ্ডপখানি ক্ষণে ক্ষণে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল।

গুণ্ডার দলের আকস্মিক আক্রমণে সহায়হীনা সুভদ্রার সচকিত করুণ আর্তনাদ ও সাহায্য-প্রার্থনা যে চণ্ডীমণ্ডপে সমাসীন ভক্তমণ্ডলীর কর্ণে পৌঁছায় নাই, এমন নহে। সেই মর্মভেদী আর্তনাদে মহাশক্তি বিশ্বেশ্বরের প্রতীক্ গ্রাম্য দেবতা কৈলাসনাথের সিংহাসন হয় তো টলিয়াছিল—দক্ষালয়ে সতীর অপমানে দেবাদিদেবের প্রচণ্ড রুদ্রমূর্তির স্ফুলিঙ্গ হয় তো সেই কৈলাসনাথের পাষাণ-মূর্তিকে আবার একবার উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু সেই আর্তনাদে

সুভদ্রা দুর্বল হস্তে মহেশ্বরীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া, তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু গুণ্ডার দলের ভদ্রবেশী অধিনায়কের হস্তে উত্তোলিত শানিত ছোরাখানি দেখিয়া সভয়ে বস্ত্রাঞ্চল ছাড়িয়া পিছাইয়া আসিল—গুণ্ডার দল এক প্রকার বিনা বাধায় মহেশ্বরীকে ধরিয়া লইয়া চকিতের মধ্যে অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল।

চমক ভাঙ্গিলে সুভদ্রা চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো, কে কোথায় আছ, আমার মহেশ্বরীকে বাঁচাও।"

সেই করুণ আর্তনাদ গ্রামপথের অসীম শূন্যতায় বারবার প্রতিধ্বনি তুলিয়া কৈলাসনাথের পাষাণ-মূর্তির পদতলে গিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। কিন্তু কলির দেবতাও আজ বুঝি এত শক্তিহীন যে অরাতি-দলনে দুর্বল-হস্ত দেবতা আর ত্রিশূল তুলিয়া ধরিতে পারে না; সতীর অপমানে দক্ষের যজ্ঞধ্বংসকারী রুদ্রমূর্তি শূলপাণি আজ নিজের অন্তর-নিরুদ্ধ গৈরিক জ্বালায় নিজেই পুড়িয়া মরে; প্রলয়সংঘটনকারী মহাশূল আজ বুঝি এতই জীর্ণ যে নিজের ভারে সে আজ নিজেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে!

সুভদ্রার চমক যখন ভাঙ্গিল, গুণ্ডার দল তখনও বেশী দূর যাইতে পারে নাই। সুভদ্রা স্পষ্ট শুনিতে পাইল মহেশ্বরী যেন তখনও চীৎকার করিতেছে—"রক্ষা কর, আমায় রক্ষা কর।"

সুভদ্রা আর স্থির থাকিতে পারিল না। গুণ্ডার দল যে পথে গিয়াছিল, উন্মাদিনীর মত সেই পথ অনুসরণ করিতে গিয়া—হঠাৎ তাহার মনে পড়িল গ্রামের চণ্ডী-মণ্ডপে সমবেত সেই জনমণ্ডলীর কথা—সেখানে গিয়া পড়িলে যদি কোনও উপায় হয়। কৈলাসনাথ কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না! কেহ কি এতটুকু দয়া করিবে না?

কথকচূড়ামণি বিষ্ণু ঠাকুর তখন দশাননের কবলগতা

এবং জটায়ুর অপূর্ব যুদ্ধের ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে পরকালের পথ পরিষ্কারের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণের কেহ দিয়াছে সীতার উদ্ধারকালে শ্রীরামের ব্যবহারার্থ রৌপ্যনির্মিত ধনুর্বাণ—কোনও মহিয়সী মহিলা দিয়াছেন সীতাদেবীর চরণের অলঙ্কার!

এই সকল মূল্যবান্ উপহার পাইয়া কতক ঠাকুরের ভাবের সীমা নাই—আশাতীত প্রাপ্তির আনন্দাতিশয্যে তিনি সুরে বেসুরে নানাভাবে সীতাহরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এমন সময় উন্মাদিনীর মত আর্তনাদ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের পাদদেশে, গ্রামের বয়োবৃদ্ধ সমাজপতি দ্বারকানাথ যেখানে বসিয়াছিলেন, তাঁহারই সম্মুখে আসিয়া সুভদ্রা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"ঠাকুর সর্বনাশ হয়েছে, আমার মহেশ্বরীকে বাঁচাও।"

চণ্ডীমণ্ডপ সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

সুভদ্রাকে দেখিয়া দ্বারকানাথ ত্রস্তভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিলেন—"কে? সুভদ্রা! তুমি সমাজ পরিত্যক্তা—যদি কোনও কিছু প্রার্থনা থাকে, দূরে দাঁড়িয়ে বল; আমাকে স্পর্শ করো না।"

সুভদ্রা আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল যে দূরবর্তী গ্রামের জমিদারপুত্র মহেশ্বরীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

সমস্ত শুনিবার পর দ্বারকানাথ বলিলেন—"শাস্ত্রকারগণ মূর্খ ছিলেন না। তাঁদের বিধান অগ্রাহ্য করে ব্রাহ্মণের গৃহে ষোড়শী যুবতীকে অবিবাহিত অবস্থায় রেখে দেওয়ায় এই প্রকার ফলভোগ করতেই হবে। মহেশ্বরী অপহৃতা হয় নি। জমিদারপুত্রকে করায়ত্ত করে কৌশলে গৃহত্যাগ করেছে। তার জন্য দুঃখ প্রকাশ বা তার উদ্ধারের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। রতনপুর গ্রামের কোনও ব্যক্তি—আমি যতদিন জীবিত থাকব সে চেষ্টা করতে পারবে না। ঋতুমতী হবার পূর্বে পাত্রস্থা না হওয়ায় মহেশ্বরী পতিতা—সেই সঙ্গে তুমিও সমাজচ্যুত। অধিকন্তু মহেশ্বরী পূর্ণযুবতী—সুতরাং তথাকথিত অপহরণকারীর হস্তে মহেশ্বরীর ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকবে না। অতএব তার প্রসঙ্গ সর্বতোভাবে পরিহার করাই বিধি।"

স্নেহকাতরা সুভদ্রা সমাজপতি দ্বারকানাথের শাস্ত্র-বাক্যের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না। সে অবনতমুখে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। শৈশবে পিতৃমাতৃহারা মহেশ্বরীকে সন্তানহীনা বালবিধবা সুভদ্রা যে এতকাল বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে!

দ্বারকানাথের এই অযাচিত উপদেশ শুনিয়া একটি যুবক—বয়স আন্দাজ বাইশ—চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল।

দ্বারকানাথের কথা শেষ না হইতেই সে বলিল—"তা হলে বিনা অপরাধে এই স্বভাব-দুর্বলা সহায়হীনা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে পরিত্যাগ করাই শাস্ত্রের বিধান?"

সভাস্থ সকলে চাহিয়া দেখিল যুবকটি সর্বানন্দ ঠাকুরের পুত্র শিবশঙ্কর।

দ্বারকানাথ বলিলেন—"বিনা অপরাধে নয়। অপরাধ গুরুতর। বয়স্থা হবার পূর্বে পাত্রস্থা হলে, মহেশ্বরীর কৌশলে গৃহত্যাগ করবার কোনও কারণই থাকত না।"

শিবশঙ্কর—"মহেশ্বরী কৌশলে গৃহত্যাগ করেছে, এই মিথ্যা অভিযোগ করবার পূর্বে একবার সকল কথা বিচার করে দেখার প্রয়োজন ছিল না কি? মহেশ্বরীর বিবাহ হয় নি অর্থাভাবে। আপনি সমাজপতি, সাধ্যমত চেষ্টা করে তাকে এতকাল কোনও যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করবার ব্যবস্থা করেন নি কেন? তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করবার পূর্বে এটা কি সমাজপতি আপনার কর্তব্য ছিল না?"

বৃদ্ধ দ্বারকানাথ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"শিবশঙ্কর, তুমি যুবক, অপরিণত-বুদ্ধি—সমাজধর্ম তুমি কি বুঝবে?"

অবিচলিতকণ্ঠে শিবশঙ্কর উত্তর করিল—"ধ্বংস হোক আপনাদের সমাজ-ধর্ম; মিথ্যা শাস্ত্রচর্চার পীঠস্থান এই চণ্ডীমণ্ডপ ভস্মস্তূপে পরিণত হোক। আপনারা শাস্ত্র নিয়ে থাকুন, আমার কর্তব্য আমি বুঝি। আসুন মা! সর্বানন্দ ঠাকুরের সন্তান আমি। স্বর্গগতা জননীর

নামে শপথ করে বলছি—জীবন পণ—যেরূপেই হোক মহেশ্বরীর উদ্ধার করে ফিরব।" বলিয়াই ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

দ্বারকানাথ চীৎকার করিয়া বলিলেন—"এ গ্রামে আর প্রবেশ করো না, করলে সবংশে সমাজচ্যুত করব।" শিবশঙ্কর তখন বহুদূরে।

শারদ সপ্তমী। দেবীর আগমনীগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সর্বানন্দ ঠাকুর সে গানে আত্মহারা। বহু দিবস পুত্রের অদর্শন তথাপি কোন চিন্তা নাই।

একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সর্বমঙ্গলদায়িনী, সর্বার্থসাধিকা মায়ের আগমনে পার্থিব সকল কথা ভুলিয়া মাতৃপূজায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতামহের স্মৃতি-বিজড়িত পবিত্র চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া শত্রুবধে দশপ্রহরণধারিণী সর্বাপদ-বিনাশিনী দেবীর অধিষ্ঠান—অশ্রুগঙ্গাজল মর্মব্যথা-চন্দন, আশার বিল্বদল ও ভক্তির ফুল্লকুসুমমাল্য আরাধ্যা দেবীর চরণে নিবেদন করিতে করিতে ঋষিকল্প বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সর্বানন্দ ঠাকুর দেবীর সম্মুখে করজোড়ে উপবিষ্ট।

মেঘমন্দ্রে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণ দেবীর চরণে অঞ্জলি দিলেন—

"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥"

সহসা প্রাঙ্গণে একটা কলরব উঠিল—সমাজপতি দ্বারকানাথের তীব্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"শিবশঙ্কর, তুমি সমাজদ্রোহী, পতিতার সংস্পর্শে তুমিও পতিত। গৃহ এখনই পরিত্যাগ কর, নইলে দেবীর পূজায় বিঘ্ন ঘটবে।"

সর্বানন্দ ঠাকুর ফিরিয়া দেখিলেন—সম্মুখে শিবশঙ্কর, সঙ্গে মহেশ্বরী।

ব্রাহ্মণের মুখে আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল। অকুণ্ঠিতচিত্তে তিনি পুত্রকে আহ্বান করিলেন—"সঙ্কুচিত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে কেন শিবশঙ্কর! উঠে এস।"

দ্বারকানাথ বাধা দিয়া বলিলেন—"তা কেমন করে হবে! মহেশ্বরী পতিতা—তার সংস্পর্শে তোমার পুত্রও পতিত।"

সর্বানন্দ—"না, মহেশ্বরী পতিতা নয়। উঠে এস শিবশঙ্কর, মহেশ্বরীকে সঙ্গে আন! মায়ের চরণে অঞ্জলি দেবার সময় উপস্থিত।"

দ্বারকানাথ বাধা দিয়া বলিলেন—"তা কখনও হতে পারে না।"

সর্বানন্দ—"বাধা দিও না দ্বারকানাথ! তাই হবে। উঠে এস শিবশঙ্কর! তোমাদের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করবার জন্য মা আমার উৎসুক নেত্রে চেয়ে আছেন।"

শিবশঙ্কর—"রাজকীয় বিচারে দোষমুক্ত হলেও আমি যে হত্যাকারী!"

সর্বানন্দ—"শত্রুবধে মা যে আমার দশপ্রহরণধারিণী। উঠে এস। চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

দ্বারকানাথ—"সর্বানন্দ, তুমি কি উন্মত্ত?"

তেজোদীপ্ত আদেশব্যঞ্জক জলদ-গম্ভীর স্বরে সর্বানন্দ বলিলেন—"পূজামণ্ডপের পথ ছেড়ে দাও দ্বারকানাথ! তুমি ভুল বুঝেছ। আমি ব্রাহ্মণ—আমার ধর্ম শুধু সমাজ-শাসন নয়,—সমাজ-পালন, সমাজ-গঠন, সমাজ-সংরক্ষণও আমার ধর্ম। ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষের দল আজ তার নারীজাতিকে রক্ষা করতে অশক্ত—সঙ্গে সঙ্গে পুরুষজাতি সমাজকে শাসন করবার অধিকারও হারা হয়েছে। আজ সমাজ-গঠন করবার সময় এসেছে। উঠে এস শিবশঙ্কর! কৈ মহেশ্বরী, নির্যাতিতা হয় হ'ক, তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ; আমি তোমার পিতা, আমার আদেশ—মহেশ্বরীকে তোমার ধর্মপত্নী বলে গ্রহণ কর। আজ বাংলার লাঞ্ছিতা নারীজাতিকে রক্ষা করবার জন্য অসুরনাশিনী, শক্তিরূপা সনাতনীর নিকট শক্তি ভিক্ষা কর। বাংলার ধর্ষিতা নারীত্বের প্রতীক্, দেবী মহামায়ার অংশসম্ভূতা তোমার এই ধর্মপত্নীকে সম্মুখে রেখে, নারীত্বের অমর্যদাকারী শত্রুর রক্তে রঞ্জিত হস্তে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দাও, বল—

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।

সর্বানন্দ ঠাকুরের তেজোদীপ্ত বাক্য শুনিয়া দ্বারকানাথ বিস্মিত-আতঙ্কে পথ ছাড়িয়া দিলেন। তারপর চমক ভাঙ্গিলে দেখিলেন শিবশঙ্কর ও মহেশ্বরী দেবীর সম্মুখে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে—

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

দেবীর মুখ আনন্দোজ্জ্বল। বরাভয়দায়িনী মহামায়ার কমলপাণি হইতে তাহাদের ভক্তি-অবনত-শিরে আশীর্বাদ ঝরিয়া পড়িল।

প্রাণসখা

শ্রীপঙ্কজরঞ্জন সোম

এখনো কেন তবে
এলো না প্রাণ সখা
ডুবিয়ে গেল যে গো
অস্ত-রবি-রেখা।
বিফল হ'ল সব
আনন্দ-কলরব,
সুখ-নিশা হ'ল গভীর কালো;
নিমেষে হ'ল হারা
হইনু পাগলপারা
নিভে গেল জ্যোছনার আলো।
এলো গো বিষাদ-হতাশার আশ
বহিছে দুখের মলয়-বাতাস
জীবন আমার বিফলে গেল
হইল বিষাদ-মাখা।
নিরদয় তবে
যুগ যুগ রবে
ব্যর্থ কি হবে তবে লগ্ন—
মিছে হল মোর
নিশি জাগা ভোর
ভাঙ্গিয়ে গেল যে স্বপ্ন!
শুকিয়ে গেল ফুলের ডালা
বিফল হ'ল গাঁথা মালা,
আসার আশায় কাটলো দিন
পেলাম না কো দেখা।

অমলার জীবন

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী সাহিত্যভারতী

সূতিকাগারে তিন দিনের মেয়ে অমলাকে রেখে যখন তার জননী কোন্ অসীমের রাজ্যে চলে গেল, তখন তার পিতামহী আঁচলে চোখের জল মুছে ঐ ফুলের কুঁড়ির মত মেয়েটিকে বুকে তুলে নিলে। পিতামহীর অসীম স্নেহে ও যত্নে অমলা শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার মত বেড়ে উঠলে। তার পিতাও মাতৃহীনা বালিকাকে বড় স্নেহ করত। ক্রমে ক্রমে সে বড় হল; তার বয়স বার বৎসর হলে তার পিতা ও পিতামহী পাত্র খুঁজতে লাগলেন। অমলা ছিল অতি সরলা;—ভালমন্দ কিছুই বুঝত না। গ্রাম্য বালিকার মত তার হৃদয়টা ছিল সারল্যে ভরা। পাছে পল্লীগ্রামে বিবাহ দিলে অমলা কষ্ট পায়, পুকুরে স্নান করে ম্যালেরিয়ায় ভোগে, এই সব ভেবে-চিন্তে কমলার পিতামহী কলিকাতাতেই তার বিবাহ স্থির করলেন। ঘটক-ঘটকীর কৃপায় পাত্রের অভাব হল না। কলিকাতায় পাত্রের দ্বিতল অট্টালিকা আছে; পাত্র গবর্ণমেণ্ট অফিসে চাকুরী করছে; অমলাকে এই পাত্রে বিবাহ দিলে সে সুখী হবে বলেই তার পিতামহী পিতার মত করিয়ে অমলার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর তাঁরা জানলেন অমলার স্বামী চরিত্রহীন মদ্যপ। তখন তাঁদের মনটা ব্যথায় ভরে গেল। তিনি ভাবলেন অমলা এখন ছেলে মানুষ বয়স্থা হলেই স্বামীর প্রেমভালবাসা পাবে। কিন্তু প্রাণের বিচার ও সমাজের মাপকাঠি এক নয়। অমলা ত্রয়োদশ বৎসরেই স্বামিগৃহে গেল কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে স্বামী বা শাশুড়ী-ননদ কেউ তাকে সুনয়নে দেখলে না। বিবাহ-সময়ে শুভদৃষ্টির সময় তার স্বামী সুরেন তাকে বোধ হয় শুভদৃষ্টির পরিবর্তে বিষ-দৃষ্টিতে দেখেছিল। সামাজিক বন্ধনে প্রাণের বাঁধন হয় না। সুরেন্ পত্নীকে ভালবাসত না। বিবাহ হয়ে বোধ

অধিকার করতে পারে নি। স্বামীর প্রেমভালবাসা এক দিনের জন্যও পায় নি! কুচরিত্র সুরেন প্রায়ই রাত্রে বাটীতে থাকত না। প্রত্যহই সন্ধ্যার পর বন্ধুবর্গ সহ নৃত্যগীত-সুরাপানে রাত্রি কাটাত আর কিশোরী অমলা নিজ গৃহ-কোণে একাকিনী দলিত বাসি ফুলের মত পড়ে থাকত। অশ্রুজলে তার উপাধান সিক্ত হত। শাশুড়ী বলত—"ও জানোয়ার বৌ নিয়ে ছেলে কি করবে, ওকে আমি আবার বিয়ে দিব।" শাশুড়ীর কথায় অমলার ডাগর ডাগর চোখ দুটি জলে ভরে উঠত। সে নীরবে নির্জনে অশ্রু মোচন করত। একদিন রাত্রে সে নিজগৃহে নিদ্রিতা ছিল। সহসা সুরেন এসে তাকে পদাঘাত করে বললে—"হারামজাদি একি তোর বাবার ঘর পেয়েছিস্ তাই আরামে ঘুমুচ্ছিস? দে হারামজাদি কোথায় তোর গহনাগুলা দে।"

ভয়ব্যাকুলা কিশোরী বধূ তাড়াতাড়ি গহনাগুলি এনে স্বামীর সুমুখে দিলে। নরাধম সুরেন সেগুলি কাপড়ে বেঁধে বারাঙ্গনার বাটী চলে গেল।

প্রত্যহ প্রাতে সে মদ খেয়ে আরক্ত চোখে বাটী আসত। বিনা কারণে সে অমলাকে প্রহার করত, লাঞ্ছনা তাড়না করত। সরলা কিশোরী নীরবে স্বামীর সকল অত্যাচার সহ্য করত। স্বামীর অনাদরে উপেক্ষায় তার শরীর ও মন ভগ্ন হল। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় কিছুকাল পরে তার দুই-চারটি পুত্রকন্যাও হল। ছেলে-মেয়েদের হাসিমুখ দেখে তাদের মধুমাখা 'মা মা' ডাক শুনে অমলা অনেকটা শান্তি লাভ করলে। কিন্তু পাপিষ্ঠ সুরেন ক্রমে ক্রমে পত্নীর এক এক করে সকল অলঙ্কারগুলি বেশ্যার পদে ডালি দিলে।

ক্রমে তার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীও স্বর্গগামী হলেন। দুর্দান্ত

স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে পথে বসালে; অমলা তখন দুই হাতে বুক চেপে ভূমে লুটিয়ে কাঁদলে ও মনে মনে বললে—"হে ঠাকুর একটু স্থান দাও; এই ছোট ছোট শিশুগুলি নিয়ে কোথায় দাঁড়াই, কোথা যাই।"

সুরেনের বাড়ী যারা খরিদ করলে তারা তার পত্নী, পুত্র-কন্যাদের তাড়িয়ে দিয়ে বাটী দখল করলে। অমলা শিশু পুত্র-কন্যাগুলির হাত ধরে পথে দাঁড়ালে। সুরেন তখন অনুপায় হয়ে একখানা খোলার ঘর ভাড়া করে দিলে অমলা পুত্র-কন্যার হাত ধরে সেই খোলার ঘরেই দিন যাপন করত। সুরেন সামান্য যাহা দিত তাতেই দুটি শাকান্ন রেঁধে পুত্রকন্যাদের খাওয়াত—ক্ষুধার তাড়না সহ্য করে সে নীরবে দিন কাটাত, তবু মুখ ফুটে কোন দিন কাহার কাছে আপন দুখের কথা বলত না। সে ভাবত আমার স্বামী মাতাল হউক, লম্পট হউক সে আমার স্বামী। আমি সন্তানগুলি নিয়ে কার আশ্রয়ে যাব—এই ভেবে কেঁদে দিন কাটাত। সহসা তার এক পুত্রের পীড়া হল। শিশু ঔষধ অভাবে শয্যায় ছটফট করছে, পথ্য অভাবে মারা যাচ্ছে, তবুও নরাধম সুরেনের দয়া হত না।

অমলার পিতামহী মধ্যে মধ্যে তাকে অর্থ সাহায্য করতেন, বস্ত্রাদি কিনে দিতেন। তিনি যখন শুনলেন, অমলার পুত্রটি অত্যন্ত পীড়িত তখন নিজে এসে ডাক্তার ডেকে ঔষধ-পথ্য দিয়ে তার সেবা করে তাকে সুস্থ করলেন। পুত্রের প্রফুল্ল মুখ দেখে অমলার আনন্দের আর সীমা রইল না।

অমলার পিতামহী অমলার যাতনায় ব্যথিত হয়ে মধ্যে মধ্যে তাকে পিতৃগৃহে আনিয়ে রাখতেন; আবার কিছুদিন পরে তাকে স্বামিগৃহে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু পুত্র-কন্যাগুলির গায়ে জামা নেই, অমলার পরিধানে শতছিন্ন বস্ত্র দেখেও পাপিষ্ঠ সুরেনের দয়া হত না, সে পত্নীর দুঃখে হাসত।

কিন্তু ভগবান্ ত আছেন; তিনি দেখলেন একটি নিরপরাধিনী রমণীর অসীম লাঞ্ছনা। ক্রমে ক্রমে অনাহারে অনিদ্রায় সে পীড়িতা হল। ঔষধ নেই, পথ্য নেই। শুশ্রূষা করবার কেহ নেই। মানুষের জীবনে আর কত সহ্য হয়। ভগবান্ তার দুঃখ দেখে দয়া করলেন। অমলা ঔষধ-পথ্য অভাবে দিন দিন দুর্বল হল, অনাহারে দেহ কঙ্কালসার হল। তার আয়ত চক্ষু দুইটি কোটরগত; তৈলাভাবে রুক্ষকেশভার লুটিয়ে পড়লে, ক্রমে সে শয্যাগত হল। তাহার নির্মম স্বামী একবার একটা মুখের কথা কইত না, একবার চেয়েও দেখত না। অনাদৃতা অভিমানিনী অমলা স্বামীকেও কোন দিন নিজের অসুখের কথা বলত না। কিন্তু মাতৃহীনা অভাগিনীর দুঃখ আর কেহ দেখলে না, দেখলেন নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান্।

অমলার দুর্বিষহ কষ্ট দেখে দয়াময় হরি তাকে যাতনা-মুক্ত করলেন। অমলার অত্যন্ত কষ্ট শুনে তার পিতামহী আবার তাকে নিজের কুটীরে আনলেন। ইচ্ছা অমলাকে এ জীবনে আর স্বামি-গৃহে পাঠাবেন না। অমলা তাঁর কাছে শাকান্ন খেয়েও থাকবে তথাপি সে নরাধম স্বামীর গৃহে আর যাবে না। কিন্তু মানুষ যত ভাবে ভগবান্ তার বিপরীত করেন, এইটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য!

অমলা সবেমাত্র পিতামহীর নিকট চার-পাঁচদিন এসেছে, সহসা তার একটি পুত্রের ব্যারাম হল। পিতামহী তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেন। ডাক্তার, ঔষধ, সেবা কিছুই বাকি রাখেন নি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে পুষ্প-কোরকের মত শিশুটি অজানার রাজ্যে চলে গেল। অমলা শোক কাহাকে বলে তাহা জানত না, পুত্রটির মৃত্যুতে তার মর্মান্তিক দুঃখ হল। দুই দিন পরে শোকের আতিশয্যে অমলার পীড়ার বৃদ্ধি-ভাব দেখা গেল। অমলার এই কঠিন পীড়া দেখে তার পিতামহী বড় বড় ডাক্তার এনে তাঁর প্রাণপণে সেবা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই অমলার জীবন রক্ষা হল না। সে তার স্নেহময়ী পিতামহীর কোলেই মাথা রেখে—তাঁর বড় স্নেহের, বড় যত্নের, বড় আদরের অমলা—চক্ষু মুদলে। তার পিতামহীকেই সে মা বলে জানত। তিনি বই তার এ জগতে কেহই ছিল না; দুই বৎসর পূর্বে অমলার পিতাও স্বর্গগামী

হয়েছিলেন। জগতে তার একমাত্র আপনজন ছিল পিতামহী—তাহা ছাড়া তার মুখে জল দিবার কেহ ছিল না। ভগবান্ তার দুঃখের নিশি অবসান করবার জন্যে তাকে মুক্তি দিবার ইচ্ছা করলেন। সে এ জগতের দুঃখ-বিড়ম্বনা আর সহ্য করতে পারলে না। একটা সংজ্ঞাহীন বিশ্রামের সঙ্গে তার অনন্তযাত্রার আয়োজন হল মৃত্যুর আড়ালে। দেখতে দেখতে তার শেষ নিশ্বাসটি বাতাসে মিলিয়ে গেল। শিশু পুত্র-কন্যাগুলিকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে সে চিরদিনের মত চক্ষু মুদলে। একটি তরুণ প্রাণ নির্যাতনে, লাঞ্ছনায়, প্রহারে জর্জরিত হয়ে অকালেই ভবের খেলা সাঙ্গ করলে। রইল শুধু নিয়তির অট্টহাসি আর পিতামহীর বুকফাটা আর্তনাদ !

দেবী-দর্শনে

শ্রীমণিমোহন মল্লিক

কেন রে অজস্র অশ্রু ঝরে অনিবার ?
তাতল সৈকত সম এ হৃদি আমার
ভিজিল না রসিল না হেরি মাতৃ-মূর্তি
ভাবের অভাব, নাহি হৈল ইষ্ট স্ফূর্তি।
অশিব নাশিতে শিবে অসুরনাশিনী
সিংহ-পৃষ্ঠে আবির্ভূতা জগতজননী।
দশভুজে, দশ ভুজে দশ প্রহরণ
ধরিয়াছ সাধিবারে ভক্তের কল্যাণ।
দেখিয়া বিরাট্ মূর্তি নাহি হয় ভয়
সর্ব শান্তি কর মাগো! দেছ বরাভয়।

সৌভাগ্যদায়িনী লক্ষ্মী শোভে ডানভাগে
বামে বাণী, পদে মতি এ অধম মাগে !
সিদ্ধিদাতা গণেশেরে সর্বাগ্রেতে পূজি
শক্তি-সঞ্চারের হেতু কার্তিকেয়ে ভজি।
তপ জপ ধ্যান জ্ঞান কিছু নাহি মোর
মায়ের মোহিনী মূর্তি হেরিয়া বিভোর।
আঁখি মুদি ভাবি কিবা রূপ চমৎকার
বুঝি মাত্র সর্বশক্তি করুণা-আধার।
আনন্দময়ীরে হেরি আনন্দে মগন
কৃপাকণা হেতু লই চরণে শরণ।

এইমাত্র অভিলাষ নিবেদি শ্রীপদে—
রতি মতি থাকে যেন সম্পদে বিপদে !
সাধক দিতেছে পদে জবা-বিল্বদল—
আমার কিছুই নাই বিনা অশ্রুজল।
তাই দিয়ে ধোয়াইব ও রাঙা চরণে
অভয়ে অভয় দাও জীবনে মরণে ॥

পরলোকে আচার্য সার জগদীশচন্দ্র বসু

বাংলার গৌরব, বাঙালীর গৌরব আচার্য সার জগদীশচন্দ্র বসু সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশের যে ক্ষতি হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। নিম্নে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল।

আচার্য জগদীশ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যেই তাঁহার মৌলিক প্রতিভার বিকাশ পরিলক্ষিত হইত, যে প্রতিভা পরে তাঁহাকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার ডারউইন নামে পরিচিত করে।

তাঁহার পিতার নাম ভগবান্‌চন্দ্র বসু। তিনি ফরিদপুরে সাবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন এবং পুত্রের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে বিশিষ্ট সতর্কতা ও সুবিবেচনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য জগদীশ পিতৃ-সম্পদে ভাগ্যবান্ ছিলেন বলা চলে, যেহেতু ভগবান্‌চন্দ্র শুধু চরিত্রবান্ ও উদ্যমশীল ছিলেন না, পরন্তু তাঁহার শিক্ষাও গভীর এবং ব্যাপক ছিল।

তাঁহার পিতা পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে দেশীয় প্রণালী ও পাশ্চাত্য প্রণালীর বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিলেন; ফলে বালক জগদীশ দেশীয় পাঠশালায় প্রেরিত হন। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, বালকের তত্ত্বাবধানের ভার কোন পশ্চিম দেশীয় দরওয়ানের হাতে না দিয়া একটি দুর্দান্ত দস্যুর হাতে অর্পণ করেন—এই দস্যুটি পূর্বে দস্যুদলের সর্দার ছিল; ফরিদপুরে সাবডিভিসনাল অফিসার থাকা কালীন ভগবান্‌চন্দ্র কৌশলক্রমে তাহাকে ধৃত করেন এবং কয়েক বৎসর শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা করেন; জেল হইতে ফিরিয়া দস্যুটি তাঁহার নিকট চাকুরীর জন্য উপনীত হইলে তিনি তাহাকে জগদীশের তত্ত্বাবধান কার্যে নিযুক্ত করেন। ইহাতে আশ্চর্য ফল ফলিল—দস্যু অত্যন্ত বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত ভৃত্যে রূপান্তরিত হয় এবং বন্যপথের মধ্য দিয়া বালক জগদীশকে লইয়া বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিত।

অবশেষে জগদীশচন্দ্র কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রেরিত হন ও তাহা হইতে তিনি ইংল্যণ্ড যাত্রা করেন। জগদীশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পিতা আপত্তি উত্থাপিত করেন। ফলে লণ্ডনে তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য তাঁহাকে কেম্বি্রজে বিজ্ঞান অধ্যয়নে নিযুক্ত করে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞানে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়া ক্রাইষ্ট কলেজ হইতে উপাধি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেন। ক্রাইষ্ট কলেজে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বৃত্তিলাভ করেন। পরবর্তী বৎসরে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি এস্-সি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিয়া জগদীশ প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক পদে বৃত হন। এই পদে কার্যকালে তিনি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ও দৃঢ় চরিত্রের লোকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তিন বৎসর পরে তিনি গবেষণার জন্য অধিকতর সুযোগ লাভ করেন এবং দশ বৎসর পরে নিজের একটি গবেষণাগার লাভ করিলেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি Journal of the Asiatic Society, Electrician প্রভৃতি পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন, ইহাতে সর্বত্র পরিচিত হইয়া পড়েন। রয়্যাল সোসাইটি তাঁহাকে উৎসাহিত করে, ইহাতে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের দিক্-বিচ্যুতি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার সুযোগ দান করেন।

কয়েক মাস অবিরাম-ধীর গবেষণার পর তিনি তাঁহার

অচিরে ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, এই ভারতীয় মনীষী বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য বিশিষ্ট বস্তু দান করিয়াছেন। শিক্ষিতমহলে তাঁহার নাম লইয়াই আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল; এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে বিজ্ঞানাচার্য (ডক্টর অফ্ সায়েন্স) উপাধি-বিভূষিত করিল।

ডক্টর জগদীশ পর বৎসর বিজ্ঞানের অন্য বিভাগে গবেষণা চালাইতে সুরু করিলেন। তিনি টেলিগ্রাফের চিহ্নসকল কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে প্রেরিত হইয়া তার ব্যতিরেকে অনন্ত শূন্যের মধ্য দিয়া গমন করতঃ গ্রহণ-যন্ত্রে ধরা পড়ে কি না, তাহা লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। অবশ্য ইহা তাঁহার পক্ষে একেবারে নূতন গবেষণা ছিল না; যেহেতু, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলার গভর্ণরের সম্মুখে যে পরীক্ষা দেখাইয়াছিলেন, তাহাও বিশিষ্ট গুণ-সম্পন্ন ছিল।

তিনি নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি প্রদর্শন করেন—ইটের দেওয়াল ও মনুষ্যশ্রেণী ভেদ করিয়া প্রেরিত ইথার-তরঙ্গ একটি প্রকাণ্ড ওজন স্থানচ্যুত করে, একটি ঘণ্টা বাজায় ও রুদ্ধ কক্ষে অবস্থিত বোমা বিদীর্ণ করে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রয়্যাল সোসাইটির সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন; অতঃপর বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে পুনরায় বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হন।

অবশেষে আচার্য জগদীশ উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগতের দিকে আকৃষ্ট হইলেন এবং উক্ত রাজ্যে তাঁহার জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিলেন।

উদ্ভিদের গবেষণা প্রাণি-জীবনের রহস্যের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইবে ভাবিয়া তিনি গবেষণা দ্বারা শরীর-তত্ত্বের যন্ত্রাবলীর সমতা প্রতিপন্ন করেন—কি উদ্ভিদ্-রাজ্যে, কি প্রাণিরাজ্যে।

তিনি দেখিলেন যে, বৃক্ষ অসংখ্য জীবিত এককের উপনিবেশমাত্র; এবং কোষসমূহ বহির্জগতের আঘাতে সাড়া দেয় কি না তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য তিনি "সূক্ষ্ম সঙ্কোচন-নির্ণায়ক" যন্ত্র আবিষ্কার করেন; ইহা দ্বারা কোষের সঙ্কোচন স্পষ্ট দেখা যায়।

তাঁহার একটি পরীক্ষা মৃত্যুর জন্য উদ্ভিদের সংগ্রামের ব্যাপার প্রতিপন্ন করে। তিনি ক্রমাগত জীবন্ত শাখার মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক আঘাত প্রেরণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার বৃহত্তর নির্ণায়ক যন্ত্রের সাহায্যে তিনি পরদার উপর দেখাইতে লাগিলেন, দুর্বল আঘাতে কাণ্ডটি কিরূপ-ভাবে পেশী সঙ্কোচ করে; পরে যখন প্রবল তরঙ্গ প্রেরণ করিলেন, তখন বৃক্ষকাণ্ডের স্পন্দন ভয়াবহরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। অবশেষে ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া বৃক্ষ মরিয়া গেল। তিনি আরও প্রতিপন্ন করেন যে, বৃক্ষের মানুষের মত হৃদয় আছে।

বৃক্ষে রস মূল হইতে ঊর্ধ্বে উঠে—এই সাধারণ ধারণা ভ্রমাত্মক বলিয়া তিনি প্রতিপন্ন করেন। তিনি প্রমাণিত করিলেন যে, উহা হৃদয় হইতে সর্বত্র বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। তাঁহার নির্মিত Sphygnograph যন্ত্র পরদার উপর প্রকৃত রস-বণ্টন প্রদর্শিত করে। তাঁহার নির্ণায়ক যন্ত্রের দ্বারা বৃক্ষ ইথার বা ব্রোমাইড অথবা সায়েনাইড মিশিত জলপানে কিরূপ অবস্থায় উপনীত হয়, তাহা তিনি প্রদর্শিত করেন।

তিনি গাজরকে মদ খাওয়াইয়া উহার মাতলামির চিত্র পরদার উপর দেখাইয়া ছিলেন। যখন জল দেওয়া হয়, তখন বৃক্ষের সাধারণ হৃদ্-স্পন্দন দেখা যায়। পরে ব্রোমাইড মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া রাখিলে যতই মৃত্যু ঘনাইয়া আসে, ততই স্পন্দন-ক্রিয়া ধীরে ধীরে নির্বাহিত হয়। ক্যাফিনে ডুবাইয়া রাখিলে পুনরায় জীবন ফিরিয়া আসে এবং হৃদ্-স্পন্দন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিয়া থাকে।

ঔষধ লইয়া আচার্য জগদীশের এই গবেষণা বহু মূল্যবান্ আবিষ্কারের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ভারতীয় গাছ-গাছড়ার যে সমস্ত আরক উদ্ভিদ্‌রাজ্যে ফলপ্রসূরূপে বিবেচিত হইয়াছে, তাহা বেঙের উপর প্রযুক্ত হইয়াছে এবং হৃদ্-স্পন্দন থামিবার পর উহাদিগকে জীবজগত আনয়ন করিয়াছে। তাহাদের ফল ইতিপূর্বে লব্ধ ঔষধের ফল অপেক্ষা অধিকতর এবং এই আবিষ্কার জগতের দুঃখ দূরীকরণে নূতন ফার্মাকোপিয়ার জন্মদান

করিবে। ফলে ভারতীয় গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুতের জন্য বিরাট্ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে।

আচার্য বসুর আবিষ্কৃত হৃদ্-যন্ত্রের উত্তেজক একটি ঔষধ অধুনা হাসপাতালসমূহে ব্যবহৃত হয়—উহার সমান শক্তিসম্পন্ন অন্য কোন ঔষধ দেখা যায় না।

তিনি বৃক্ষের নিদ্রা এবং জাগরণের সময়ও নির্ণয় করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাহারা পীড়িত বা ক্লান্ত হইলে শিরাসমূহ যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহাও স্বীয় নির্মিত ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্রে দেখাইয়াছেন যে, উহার কার্য-প্রণালী অনুরূপ।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিয়া বসু বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নাইট শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হন; তিনি গণিতশাস্ত্র ব্যতীত অন্য বিষয়ের জন্য নির্বাচিত প্রথম ভারতীয় ফেলো। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় আবিষ্কারসম্বন্ধে কলিকাতায় বক্তৃতা দান করেন। পরবর্তী বৎসরে প্যারিস এবং লণ্ডনেও তিনি বক্তৃতা দেন, ইহাতে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, বৃক্ষের অনুভবশক্তি মানুষের দশগুণ; কিন্তু উহার গতি খুব ধীর; সেই জন্য উহা শম্বুকাদি খোলাবিশিষ্ট প্রাণী ও উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যস্থলে অবস্থিত।

প্রাচীন প্রবাদ বাক্য—"স্ত্রী-লোককে ফুল দিয়ে মেরো না, কারণ কে জানে কে বেশী দুঃখ পাবে"—তিনি উহার সার্থকতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আলোর মধ্যে মানুষের চক্ষু লাল ও ভায়োলেট ইথার-তরঙ্গে সাড়া দেয় কিন্তু গাছ আলট্রা-ভায়োলেট তরঙ্গ ও বেতার তরঙ্গেও সাড়া দেয়।

তাঁহার আর একটি বিশিষ্ট আবিষ্কার এই যে, বৃক্ষের বৃদ্ধি বাড়ান বা কমান সম্ভব। ইহাতে ক্ষতিকর পতঙ্গের হাত হইতে বৃক্ষকে রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে।

'আজ বসু বিজ্ঞানমন্দির' আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান—প্রতিষ্ঠাতার শেষ স্মৃতিস্তম্ভ।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের দান

আচার্য সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় মোট ১৭ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের মধ্যে 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে'র জমির মূল্য ১৫০,০০০৲, গৃহনির্মাণের জন্য ৫০,০০০ ও উহার স্থায়ী ভাণ্ডারের জন্য ১০০,০০০৲ লক্ষ টাকা অন্তর্ভুক্ত। 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দির' আচার্য জগদীশ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম আরম্ভ করেন, উহা তিনি জাতিকে দান করিয়া গিয়াছেন। ৬৯৭,০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ, ৩০০,০০০৲ টাকার ভূসম্পত্তি 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে'র জন্য ট্রাষ্ট গঠন করিয়া তিনি ট্রাষ্টীর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন শিক্ষাবিষয়ক বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেও আচার্য জগদীশ ৪০০,০০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

উল্লিখিত বিষয় বসুবিজ্ঞানমন্দিরের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এ এন্ মিত্র মহাশয় সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন। তবে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম আইন সম্বন্ধীয় ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর প্রকাশিত হইবে।

মিঃ মিত্র আরও প্রকাশ করেন যে, আচার্য জগদীশ বার্ষিক ৫০,০০০৲ আয়ের মধ্যে ৪০,০০০৲ টাকা সঞ্চয় করিতেন এবং উহা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যয়িত হইত।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের অভিলাষানুযায়ী ৩৭১,০০০ টাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দানের কথা তাঁহার স্ত্রী লেডি অবলা বসু বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। উপরি লিখিত দান নিম্নরূপ :—

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকো-ফিজিক্যাল গবেষণার জন্য শতকরা ৩½ টাকা সুদী লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান।

(খ) বোটানি ও ফিজিয়োলজিতে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বৃত্তি দানের জন্য শতকরা ৩½ টাকা সুদী ৫০,০০০৲ কোম্পানীর কাগজ দান।

(গ) বিহার প্রদেশে মদ্যপান নিবারণের জন্য শতকরা ৩½ সুদী লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান। এই অর্থ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদকে ও তৎপরে অল ইণ্ডিয়া

কংগ্রেস-কমিটির তৎকালীন সভাপতিকে প্রদান করিতে হইবে। বাংলা ও বিহারের মধ্যে মিত্রতা ও সদিচ্ছার চিহ্নস্বরূপ এই অর্থ প্রদত্ত হইল।

(ঘ) বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য শতকরা ৩½ সুদী লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ বর্তমানে নারীশিক্ষা সমিতি ব্যয় করিবেন।

(ঙ) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শতকরা ৩½ সুদী ১০,০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান।

(চ) শতকরা ৩½ সুদী ৩০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার গবেষণা বিভাগে প্রদত্ত হইবে।

(ছ) রামমোহন লাইব্রেরীর পুস্তক ক্রয়ের জন্য শতকরা ৩½ টাকা সুদী ৩,০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ দান করা হইয়াছে।

(জ) কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে Cardiological গবেষণার্থ ল্যাবরেটারীর সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ৫,০০০৲ টাকা দান করা হইয়াছে। এই ল্যাবরেটারীর নাম তাঁহার সহিত জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ "সার নীলরতন সরকার" ল্যাবরেটারী নামকরণ করিতে হইবে।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

দুয়ার অঞ্চলে মাটির কেল্লা

বেঙ্গল ডুয়ারস্ রেলওয়ের ভোটপট্টি ষ্টেশনের নিকট কয়েকটি প্রাচীন মাটির কেল্লা পাওয়া গিয়াছে। তিব্বতের পথে যেরূপ মাটির কেল্লা দেখিতে পাওয়া যায় ইহা সেই আকারে ও একই নক্সায় প্রস্তুত। সেই ভোটপট্টি ষ্টেশনের অতি নিকটে কাঠামা রাজার কেল্লা ছিল। সেই রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করিলে তাঁহার কেল্লা ধ্বংস করা হয়। এই সকল কেল্লায় এককালে এক দলের সহিত অপর দলের যুদ্ধ হইত। একপক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও অপর পক্ষে ভুটান যুদ্ধ করিত। ১৭৭৪ সালে বৃটেনের সহিত এক সন্ধি হয় কিন্তু পার্বত্য জাতিদের সহিত সংঘর্ষের জন্য প্রায়ই অভিযান করিতে হইত ও কখনও সাময়িক ভাবে ও কখনও স্থায়িরূপে কতকস্থান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অধিকার করিত। ১৮৬৪ সালে দুই দেশে স্থায়ী ভাবে সন্ধি হয়; তখন ১১টি দুয়ার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করা হয়। শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতিতে ভুটানকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বৎসরে ৫০ হাজার টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

ঐ স্থানে অনেক কর্তিত প্রস্তর পাওয়া যায় তাহাতে সুন্দর খোদাই কার্য ও মূর্তি আছে। এই সকল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে সন্ধান করিলে প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার হইতে পারে।

সঞ্জীবনী

অতিভোজী কুস্তিগীর

হাঙ্গেরীর কুস্তিগীর Emile Cyayea সম্প্রতি কুস্তি-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য কলিকাতা আগমন করিয়াছেন। তিনি বিগত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে প্রাতর্ভোজনের জন্য ৪৮টি ডিম, একসের পেঁয়াজযুক্ত মাংস, ৫ খানি রুটি, অর্ধ সের মাখন, ৩টি আস্ত ঝলসান মুরগীর বাচ্চা এবং তিন পোয়া দুধ তিনটি ডিম ও একটু ব্রাণ্ডির সহিত ভোজন করিয়াছেন।

তিনি দুই জন সঙ্গী সহ পৃথিবীভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি ৬ ফিট ৩ ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু সাধারণ অপেক্ষা কম লম্বা বলিয়া মনে হয়, যেহেতু তাঁহার শরীর প্রস্থেও বিশাল। তাঁহার বুকের ছাতি ৫৭ ইঞ্চি এবং ঘাড় ২৮ ইঞ্চি।

অনেক সময় হোটেলে তাঁহার স্থান হয় না; তাঁহার নিজের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত বিছানা ও আসবাবপত্র আছে; সাধারণ আসবাব তাঁহার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি সাধারণত দশ জন লোকের সমান আহার করেন।

তিনি ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে মধ্যাহ্ন-জলযোগে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আহার করিয়াছেন:—

(১) বড় দুই প্লেট আলু

(২) তিনটি সিদ্ধ মুরগীর বাচ্চা

(৩) ৫টি মাংসখণ্ড
(৪) শাকশব্জী
(৫) ৪ খানি রুটি ও মাখন
(৬) তিন পোয়া দুধ
(৭) এক ডজন কলা
(৮) ৬টি কমলালেবু

যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—প্রকৃত উত্তম আহার কি, তিনি মৃদু হাস্য করেন—তাঁহাকে টিফিন করাইতে বলেন; তবেই তিনি দেখাইতে পারিবেন,—উত্তম আহার কি। যদি কেহ অস্বীকার করে, তবুও তিনি হাস্য করেন; কারণ তিনি জানেন—উহা ব্যয়সাধ্য।

ডিনার, টিফিন বা প্রাতর্ভোজন হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে; তবে উহাতে ৫০টি ডিম থাকে না। কিন্তু দুধ ও ব্রাণ্ডির সহিত তিনি ৩টি ডিম সর্বদা ভক্ষণ করেন। দুইটি ভোজনের মধ্যবর্তী সময়ও তিনি ফল বা অন্যান্য খাদ্য অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে, তাহা খাইয়া ফেলেন।

তিনি বুডাপেস্তের এক প্রসিদ্ধ কুস্তিগীরের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার মাতা সার্কাসে কাজ করিতেন। তাঁহার পিতা ও অন্যান্য দুইটি ভাইও সার্কাসে কাজ করেন।

প্রথম জীবনে তিনি সাধারণ লোকের মত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্বহস্তে গঠন করেন; ফলে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এখনও তিনি পিতার উপদেশানুযায়ী প্রত্যহ প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা ব্যায়াম করেন।

তিনি প্রথমে কয়েকটি কুস্তিতে পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু ছয় বৎসর তিনি কখনও পরাজিত হন নাই।

তাঁহার শারীরিক শক্তি অসাধারণ। সাধারণত তিনি "কিং কং" কুস্তিগীর নামে পরিচিত। কলিকাতার ট্যাক্সী-ওয়ালারা সঙ্গিদ্বয় সহ তাঁহাকে ট্যাক্সীযোগে বহন করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

পাঠাগার-সম্মেলন

গত ৫ই ও ৬ই ডিসেম্বর অর্থসচিব শ্রীযুক্ত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহের সভাপতিত্বে পাটনায় বিহার প্রাদেশিক পাঠাগার-সম্মেলনের অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। সমগ্র প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ডেলিগেটগণ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিং সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন,—"আমরা যে যুগে বাস করিতেছি তাহাতে আমাদের সম্মুখে যে কোন সামাজিক সমস্যাই উপস্থিত হউক, প্রত্যেকটি বিষয়েই সকলের স্বীয় অভিমত প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে। সুতরাং জনসাধারণ যাহাতে যে কোনও সমস্যা সম্পর্কে নির্ভুলভাবে তাহাদের মতামত গঠন করিতে সক্ষম হয়, এই উদ্দেশ্যে পুস্তক বা পত্রিকাদির সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। এই কারণে কোনও জাতির পক্ষে পাঠাগার অপরিহার্য্য।"

সভাপতি অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ হিন্দীভাষায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রাচীন যুগের নালন্দা, রত্নোদধি এবং বিক্রমশীল ও তক্ষশীলার পাঠাগারের বিষয় উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি বলেন,—"প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তন হইয়াছে এবং বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতির জন্য পাঠাগারসমূহ নূতন ভাবে সংগঠিত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে পাঠাগারসমূহের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—নূতন ভাবধারা ও নূতন আবিষ্কারসমূহ প্রচারে সাহায্য করা, এককথায় জনসাধারণকে যুগের সহিত সমভাবে চলিতে সাহায্য করা।

অন্যান্য দেশে পাঠাগারসমূহের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইলেও ভারতবর্ষ এ বিষয়ে অত্যন্ত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এ দেশে এমন সহর খুব কমই আছে, যাহা সুগঠিত খাঁটি পাঠাগারের গৌরব করিতে পারে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠাগার সম্বন্ধে বলিতেছি না। আমাদের যে কয়েকটি পাঠাগার আছে, তাহা সুসংগঠিত নয়। সম্প্রতি দেশের জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ আসিয়াছে। এখন বিভিন্ন দেশের সংবাদ প্রভৃতি জানিবার জন্য সাধারণের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। ইহার ফলে দেশে পাঠাগারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার ও পাঠাগারের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। যে স্থানের

অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত সে স্থানে পাঠাগারের কোনই সার্থকতা নাই। সুতরাং শিক্ষা-বিস্তারও পাঠাগারের অন্যতম কর্তব্য। নৈশ বিদ্যালয়ের সাহায্যে ইহা সম্ভব হইতে পারে। স্বাস্থ্য ও উন্নত ধরণের কৃষিবিদ্যা সম্পর্কীয় পুস্তক প্রভৃতি—যাহাতে স্থানীয় লোকের স্বার্থ রহিয়াছে—এইরূপ ধরণের পুস্তকই গ্রাম্য পাঠাগারসমূহে সংগৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা না হইলে, গ্রাম্য পাঠাগারসমূহ উপন্যাস ও গল্প পুস্তকের সাহায্যে উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হইবে না। যেরূপ পুস্তকের বিষয়-বস্তু গ্রাম্য লোকের স্বার্থের অনুকুল সেইরূপ পুস্তকই গ্রাম্য পাঠাগারে স্থান পাওয়া উচিত। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে গ্রামবাসিগণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রাম্য পাঠাগার স্থাপন করা উচিত।"

শিক্ষাসমাচার

দেশীয় রাজ্যে বিচারকের পদে নারী

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য মহীশূর ও বরোদা রাজ্যের ন্যায় দেশের সামাজিক কার্যে নানা দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সম্প্রতি ত্রিভ্যান্দ্রামের কেরল মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নারী ব্যবহারজীবী ৩২ বৎসর বয়স্কা শ্রীমতী আন চণ্ডীকে ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট মুন্সেফের পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি সাত বৎসর পূর্বে হাইকোর্টের উকিল হন ও কিছু কাল ত্রিবাঙ্কুর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিলে ত্রিবাঙ্কুরে সর্বপ্রথম নারী বিচারক হইবেন—কেবল ত্রিবাঙ্কুর কেন, সমগ্র ভারতে প্রথম নারী বিচারক হইবেন। ভারতের কয়েকটি সহরে নারী ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন কিন্তু নারী মুন্সেফ এ পর্যন্ত কেহ হন নাই।

সঞ্জীবনী

চট্টগ্রাম মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন

সভাপতি ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার অভিভাষণ

বিগত ২২শে নভেম্বর তারিখে চট্টগ্রাম মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন-উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ... সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা দ্বারোদ্ঘাটন কার্য নিষ্পন্ন করেন এবং ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রমহোদয়ও বক্তৃতা করেন।

উদ্বোধন-উৎসবে ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের প্রারম্ভে এই ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার উন্নতি ও সাফল্য কামনা করিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, এই ব্যাঙ্কের উন্নতি দেখিয়া তাঁহার আনন্দিত হইবার বিশেষ কারণ এই যে, প্রায় দশ বৎসর পূর্বে তিনি চট্টগ্রামে এই ব্যাঙ্কের নিজস্ব গৃহ-প্রবেশোৎসবে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন; তাই আজ তাহার উন্নতি দর্শনে তিনিও আত্মীয়তাবোধজনিত আনন্দ অনুভব করিতেছেন।

তিনি মনে করেন, এই ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র অংশীদারগণের লভ্যাংশ গ্রহণের কেন্দ্রমাত্রে পর্যবসিত প্রতিষ্ঠান নহে। পরন্তু ইহা একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান; কারণ আমাদের দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের পরিপুষ্টির জন্য ব্যাঙ্কের দরকার এবং এই ব্যাঙ্ক সেই কার্য সম্পন্ন করিতে সহায়তা করিতেছে।

তাঁহার আনন্দের অন্যবিধ কারণ এই যে, বাঙালীর বাণিজ্যের মূলে যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা বর্তমান। এই যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে চাই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসের ক্ষেত্র ব্যাঙ্কেই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক কারণ অংশীদার বিশ্বাস করিয়া অংশ ক্রয় করিবে, সাধারণ লোক বিশ্বাস করিয়া টাকা জমা রাখিবে এবং ব্যাঙ্কও বিশ্বাস করিয়া ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে টাকা ধার দিবে।

আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক-বিবর্তনে আর একটা বিষয় দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে, পূর্বে সাধারণত কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কলিকাতায় প্রধান কর্মক্ষেত্র নির্বাচিত হইত, এবং পরে মফস্বলে উহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইত; কিন্তু বর্তমান মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, কুমিল্লা ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ইহার ঠিক

মফস্বলে প্রধান কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরে কলিকাতায় উহার শাখা প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ইহাতে একটা বিষয় বিশেষ মঙ্গলপ্রসূ হইয়াছে যে, তাঁহারা প্রথমে মফস্বলে অল্প মূলধনে কাজ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন এবং পরে ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মূলধন বৃদ্ধি ও কারবারের বিস্তার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

অবশ্য কলিকাতায় শাখা প্রতিষ্ঠা ব্যবসার স্বাভাবিক পরিণতি, কারণ কলিকাতা সারা বাংলার ও বাংলার বাহিরের কয়েকটি প্রদেশের ব্যবসা-কেন্দ্র; সেই হেতু কলিকাতার সঙ্গে যোগাযোগ না থাকিলে কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে বলা চলে না।

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখা সফলতা লাভ করিবে তাহাতে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই; কারণ এই ব্যাঙ্কের পশ্চাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ গচ্ছিত মূলধন ও বহু বর্ষব্যাপী কর্মক্ষেত্রের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তিনি বলেন যে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ইহাকে বাণিজ্যব্যাঙ্করূপে পরিণত করিয়া মাল চলাচলের উপর টাকা প্রদান করিতেছেন, ইহা এই ব্যাঙ্কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ইহাতে ব্যাঙ্কের উন্নতি আরও শীঘ্র হওয়ার সম্ভাবনা।

পরিশেষে ডক্টর লাহা আশা করেন এই ব্যাঙ্ককে জাতীয় প্রতিষ্ঠান মনে করিয়া শুধু ব্যবসায়ী নহে, পরন্তু দেশের সকল শ্রেণীর লোকই ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও পোষকতা করিবে।

বক্তৃতার অবসানে ডক্টর লাহা শ্রীযুক্তা নেলী সেন গুপ্তাকে দ্বারোদ্ঘাটন করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি রৌপ্য নির্মিত চাবি দ্বারা দারোদ্ঘাটন করেন।

উদ্বোধনের অবসানে সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে চা ও জলযোগে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

নাস্তিক

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(১১)

দীর্ঘ বার বৎসর কেমনভাবে যে কালের কোলে মিলাইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে সুশান্তের কোন সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। এই কয় বৎসর সে ধ্যানমগ্ন যোগীর মত কঠোর সাধনায় নিরত ছিল অর্থোপার্জনে; সুতরাং কখন বর্ষ আসিল বা কখন চলিয়া গেল, সেই হিসাব তাহার অন্তর-ফলকে তেমন রেখাপাত করে নাই; তবে আর্থিক বর্ষমালার চক্রবৎ পরিবর্তন তাহাকে নব নব আশার বাণী শুনাইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে দিন সুশান্ত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যায়, সেই দিন আর যেদিন সে কলিকাতার উট্রামঘাটে জাহাজ হইতে অবতরণ করে—এই দুইটি দিনের মধ্যে দিনরাত্রির প্রভেদ, আকাশ পাতাল তফাৎ; যাত্রার মুহূর্তে ছিল ভয়-কম্পিত হৃদয়ের চকিত স্পন্দন; অবতরণ-কালে দেখা গেল জীবনে প্রতিষ্ঠিত সন্দেহমুক্ত বিশ্বস্ত প্রাণের উদাস স্থৈর্য।

কলিকাতায় সুশান্ত এক সপ্তাহ নীরবে অতিবাহিত করিল। ...

রাস্তায় বা বাগানে পায়চারি করিয়া ও ঘুমাইয়া কাটাইল। সে যে কি চাহে, কি তাহার প্রাণের কামনা তাহা সুশান্ত ঠিক বুঝিতে পারিল না।

মরিনোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সুশান্ত দেখিল দরজায় বাড়ী ভাড়ার বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে। পার্শ্ববর্তী বাড়ীতে খবর লইয়া জানিতে পারিল, মরিনো কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করত বাড়ীখানা ভাড়া দিবার জন্য টমাস কুকের উপর ভারার্পণ করিয়া সস্ত্রীক মিরাট চলিয়া গিয়াছেন।

তাহা শুনিয়া সুশান্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, কিন্তু মিরাটের কোন ঠিকানা কেহ বলিতে পারিল না। সুশান্ত ভাবিল টমাস কুকের অফিসে সন্ধান লইবার চেষ্টা করিবে।

সেই দিন অপরাহ্নে সুশান্ত মার্কেট হইতে অনেকগুলি টাটকা সতেজ অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ কুঁড়ি কিনিয়া একটি তোড়া বাঁধিল ও বহু মূল্যবান্ ফুলের দ্বারা খচিত একখানি মালাও ক্রয় করিল এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সার্কুলার রোডে লিলির সমাধি-স্থলের দিকে চলিল। সমাধিক্ষেত্রে গিয়া সুশান্ত দেখিল কত স্মৃতিস্তম্ভ যে এই দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে নির্মিত হইয়াছে তাহা গণনা করা সহজ নহে। অতি কষ্টে সে লিলির সমাধি-স্তম্ভ খুঁজিয়া বাহির করিল। স্তম্ভের গলদেশে মালাগাছি পরাইয়া পাদমূলে গোলাপগুচ্ছ অর্পণ করিল। স্তম্ভটি প্রায় ভগ্নাবস্থায় নিপতিত হইতে চলিয়াছে; ইহা দেখিয়া সুশান্তের প্রাণের বীণায় বাজিয়া উঠিল একটা করুণ শোকাবহ রাগিণী। সে সঙ্কল্প করিল বহু মূল্যবান্ মর্ম্মর প্রস্তরে সমাধি-স্তম্ভটি নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—যিনি তাহার উন্নতির মূলে—সেই ফাদারের সহিত দেখা হয় নাই। পরদিন প্রাতে সুশান্ত ফাদারের সহিত দেখা করিতে ছুটিল, কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিল, ফাদার ইংল্যাণ্ডে গিয়া চির-বিশ্রামের দেশে চলিয়া গিয়াছেন—মর্ত্ত্যের ধুলিমলিন মানব তাঁহার দেখা পাইবে না!

সত্যই এইবার সুশান্তের মনে বড় দুঃখের ছায়াপাত হইল। যাঁহারা তাহার উন্নতি দর্শনে সুখী হইতেন, এমন কাহারো সঙ্গে তাহার দেখা হইতেছে না—একি বিড়ম্বনা! আজ যে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী সে—তাহা ত একা ভোগ করা চলে না। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব—যে যেখানে আছে সকলকে এই ঐশ্বর্যের ভাগ দিতে পারিলেই হয় আনন্দ—নতুবা একা একা জীবন-পথের পাথেয় কুড়াইয়া পথ চলা যে কোন গতানুগতিক লোকই করিয়া থাকে।

আরও দুই সপ্তাহ সুশান্ত লিলির সমাধি-স্তম্ভের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিয়া কাটাইল। কিন্তু সময়ে সেই উত্তেজনাও ফুরাইয়া গেল। স্তম্ভটি ইতালিয়ান মর্ম্মর-ফলকে শোভিত হইল; স্তম্ভের শীর্ষে একটি মর্ম্মর-নির্মিত বালিকা-মূর্তি শুভ্রবসনে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দণ্ডায়মান—হস্তে বীণা—যেমনটি স্বপ্নলোকে সুশান্ত দেখিয়াছিল কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে; স্তম্ভটির গায়ে একটি ক্ষুদ্র কবিতা মুদ্রিত হইল। উহা নিম্নরূপ—

সংসার-পঙ্কিল-পথে চলিতে চলিতে
ফুটিল কুসুম এক অজানা ইঙ্গিতে;
কালবক্ষে মিশে গেল অমলিন বালা,—
তারি লাগি নিবেদন—এই অর্ঘ্য-ডালা।

সংবাদ-পত্রের বক্ষে স্তম্ভের উন্মোচন-দিন বিঘোষিত হইল না; জগতে কেহ জানিতে পারিল না—কিন্তু এই গৌরবময় কার্যের স্মৃতি দেশ-কালব্যাপ্তির ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া সুদূর পরলোকে ছুটিয়া গেল। তৃপ্ত হইল সুশান্ত; হয়ত তৃপ্তিলাভ করিল স্বর্গপুরের অম্লান কলিকা লিলি—কে বলিবে!

একদিন সুশান্ত হাওড়া ষ্টেসনে বেড়াইতে গিয়া হুইলারের বুকষ্টলে বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। হঠাৎ পেছন হইতে কে ডাকিয়া উঠিল—"কে রে? সুশান্ত?"

সুশান্ত পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল—কৈলাস। কৈলাস হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রে? চিন্তে পারিস?"

সুশান্ত কৈলাসের হাত ধরিয়া প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল—"তুই কি মনে করিস চিন্তে পার্ব না?"

কৈলাস—"আমার ত মনে হয় পারবি না।"

সুশান্ত—"কারণ ?"

কৈলাস—"আমি দীন দরিদ্র, আর তুই বড়লোক—প্রকাণ্ড ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিক।"

সুশান্ত—"ধরা যাক তোর কথাই সত্যি—কিন্তু তাতে কি হবে ? আমার কটা হাত বেরোবে আর কটা লেজ বেরোবে বল্‌তে পারিস্ ?"

কৈলাস—"তা বাহ্যিক আকারে না বেরোতে পারে; কিন্তু মনোজগতের দিক্ ধরলে ত বেরোবে।"

সুশান্ত—"কি রকম ?"

কৈলাস—"দেখ সেটা আমি তোকে ঠিক বুঝিয়ে বল্‌তে পার্ব না। তবে ভাই আমি দেখেছি—বড়লোক সহপাঠী গরিব সহপাঠীকে চিন্তে পারে না, দেখা হলে বিস্ময়ের ভাব দেখায়! কি জানি যদি কিছু চেয়ে বসে!"

সুশান্ত—"তুই কি আমাকেও সেরূপ মনে কর্‌ছিস ?"

কৈলাস—"ঠিক তা মনে না করলেও তুই যে বড়লোক তাই তোকে সমীহ করে কথা বলতে হয়, চলতে হয়।"

সুশান্ত—"কি করে জান্‌লি যে আমি বড়লোক ?"

কৈলাস—"সেকি! কে জানে না কলকাতা সহরে যে তুই বড়লোক ?"

সুশান্ত—"তুই কি বল্‌ছিস্! আমি ত নগণ্য দেশ-ত্যাগী ব্রাহ্মণ—তবে খৃষ্টানের ভাত খেয়ে জাত গেছে!"

কৈলাস—"তুই ত দেশত্যাগী নস্‌ই, বরং তুই দেশ-মাতৃকার সুসন্তান—বিদেশে কপর্দকহীন অবস্থায় গিয়ে কোটি কোটি টাকা নিয়ে দেশে ফিরেছিস্!"

কৈলাসের কথা শুনিয়া সুশান্ত বিস্মিত হইয়া গেল! সে প্রশ্ন করিল—"এসব কথা তুই কোত্থেকে শুন্‌লি ?"

সহাস্যে কৈলাস বলিল—"কেন ? খবরের কাগজে তোর আগমনবার্তা নিয়ে খুব লিখেছে। তুই তা পড়িস্ নি ?"

সুশান্ত—"কৈ ? না ? ইংরাজী কাগজে ত কিছুই দেখলুম না।"

কৈলাস—"ইংরেজী কাগজে দেবে কেন ? বাংলা কাগজে দিয়েছে তোর ছবি সমেত। দেখ্‌বি ?"

কৈলাস পকেট হইতে একখানা পুরাতন বাংলা খবরের কাগজের অংশ বাহির করিয়া সুশান্তের হাতে দিল। সুশান্ত উহা খুলিয়া দেখিল উপরে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইয়াছে—

"কৃতী বাঙালী যুবকের দেশে প্রত্যাগমন

সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় নামক এক অজ্ঞাতকুলশীল বাঙালী যুবক কলিকাতার রাজপথে খবরের কাগজ বিক্রয় করিতেন এবং ফুটপাথে শুইয়া রাত্রি কাটাইতেন। তিনি কোন জাহাজের কাপ্তেনের সহায়তায় বয়লারে কয়লা দেওয়ার খালাসীর কাজ লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন; পরে ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতা লাভ করিয়া সিঙ্গাপুর ও শ্যামদেশে বিস্তৃত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি আজ কোটি কোটি মুদ্রার মালিক। সম্প্রতি বহু কাল পরে তিনি দেশে ফিরিয়াছেন, ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দশের ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।"

সুশান্ত কাগজখানি পড়িয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"আচ্ছা ঐ সব মিছে খবর লিখ্‌তে কাগজওয়ালা-দের বাধে না ? কোন্ সম্পাদক কবে আমাকে খবরের কাগজ বিক্রী করতে আর ফুটপাথে পড়ে থাক্‌তে দেখেছে ? কোন্ জাহাজের কয়লা দেওয়া খালাসী আমি ছিলুম, তা সম্পাদক প্রমাণ করতে পারে ? মানহানির মামলায় পড়লেই সম্পাদক প্রভুদের চৈতন্য হবে!"

কৈলাস বিব্রত হইয়া প্রশ্ন করিল—"এঁদের কোন প্রতিনিধি কি তোর কাছে গেছ্‌ল ?"

সুশান্ত উত্তর করিল—"না, কোন প্রতিনিধিই আমার কাছে আসে নি, তবে আমার মনে হয় দুটি বাঙালী ভদ্রলোক জাপান থেকে ফিরছিলেন; আমি সিঙ্গাপুর থেকে উঠি; তাঁরা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে আর আমি প্রথম শ্রেণীতে। তাঁদের সঙ্গে আমার তেমন আলাপ হয় নি। খুব সম্ভবত তাঁরা কাপ্তেনের কাছ থেকে আমার সম্বন্ধে দু'চার কথা শুনে তাই নিয়ে এই আরব্য উপন্যাসের গল্প রচনা করেছেন!"

কৈলাস জিজ্ঞাসা করিল—"তোর সঙ্গে আলাপ হয় নি,

সুশান্ত উত্তর করিল—"সেটা খুব বড় কথা নয়। কাপ্তেন, পার্সার বা ষ্টুয়ার্ডের কাছ থেকে জান্‌তে পারে। হয়ত তাঁরা বলেছেন—আমি আগে গরিব ছিলুম ; পরে বড় লোক হয়েছি। এই কথাকে নিয়ে সম্পাদকের বা লেখকের বাহাদুরী নেবার সাধ হয়েছে ; কারণ যদি কেউ গরিব থেকে বড় লোক হয়, তবে তাকে শিশি-বোতল বা খবরের কাগজ বিক্রী করতেই হবে! নৈলে মহাভারত হবে অশুদ্ধ, ব্যক্তিগত উন্নতির প্রণালী হবে ব্যাহত। কাকে কি বল্‌ব! আচ্ছা এখন চল চা-টা খাবি।"

এই বলিয়া সুশান্ত কৈলাসকে লইয়া হোটেলে ফিরিল।

ঘরেই বয় চা, কেক, স্যাণ্ডুইচ্, আইসক্রিম প্রভৃতি দিয়া গেল, উভয়ে খাইতে খাইতে গল্প করিতে লাগিল।

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করিল—"তার পর? তোর খবর কি?"

মৃদু হাস্য করিয়া কৈলাস উত্তর দিল—"আমার আবার খবর? শা-ওয়ালেসের বাড়ী কেরাণীগিরি! আই এস্‌-সি ফেল করে ঢুকে পড়লুম। তারপর কোনমতে 'দিনগতে পাপক্ষয়' গোছ চলে যাচ্ছে।"

সুশান্ত—"বিয়ে থা করেছিস?"

কৈলাস—"তা করেছি বৈ কি।"

সুশান্ত—"ছেলে-পুলে কি?"

কৈলাস—"একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে।"

সুশান্ত—"সংসারটাকে কেমন বুঝছিস্?"

কৈলাস—"সত্যি কথা শুন্‌বি না অতিরঞ্জিত কিছু বল্‌ব?"

সুশান্ত—"সত্যি কথাই বল্। আমাকে অতিরঞ্জিত কথা বলে লাভ নেই।"

কৈলাস একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল—"শোন, প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল সংসারটা খুবই সুখের—যেন হাওয়ার তালে অপ্সরীরা নেচে বেড়ায়; গান গেয়ে যায় কিন্নর-কিন্নরী জীবনের ঊষর মরুভূমিকে শ্যামল-সরস করে ; ঝরে পরে দিকে দিকে চন্দ্র-

ধুলিতে ধূসরিত হয়ে আছি—তা ঠিক বল্‌তে পারতুম না। তারপর যখন মা-বাবা পরলোক চলে গেলেন ; সংসারে অভাব-অনাটন নব নব রূপে দেখা দিলে, তখনই আরম্ভ হল প্রকৃত বিড়ম্বনা!"

সুশান্ত—"কি রকম?"

কৈলাস—"অবশ্য সকলের অদৃষ্ট ত সমান নয় ; কাজেই বাল্যে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছি—এখন পরিণত বয়সে তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। বাবা-মা মারা যাবার পর সংসারে আমি হলুম কর্তা ; কিন্তু আমি কিছুই জানিনা বলে একজন নিকটতম আত্মীয় এসে জুড়ে বসলেন, তাঁর বাধ্য হয়ে পড়লেন স্ত্রী ; ফলে আমার পক্ষে সংসারে বাস করাই হ'ল এক রকম যম-যন্ত্রণা। কাজেই ভাই এখন বেশ আছি, যা পারি মাসে মাসে দেশে কিছু টাকা পাঠিয়ে দি। এখন বল্ তোর খবর কি?"

সুশান্ত—"আমার খবর তুই ত কিছু জানিস, যখন ক্যাম্বেলে পড়তুম। তারপর পাশ করে কিছুদিন কলকাতাতেই প্রাকটিস করি। পরে শ্যাম রাজ্যের প্রান্তে একটি রবার বাগানের ডাক্তার হয়ে চলে যাই। কাজেই দেখ্ তোর খবরের কাগজ যা লিখেছে সব মিথ্যে—ভুয়ো—এদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা।"

কৈলাস—"তারপর?"

সুশান্ত—"তারপর সে বাগানে কাজ কর্‌তে কর্‌তে অন্য একটা বাগানে অর্দ্ধেক অংশীদার হয়ে গেলুম, ক্রমে সে বাগানের সবটা কিনে ফেললুম। তারপর থেকে খুব লাভ হতে লাগলো। পরে শ্যামরাজ্যের একটা বনের ইজারা নিলুম। তাতে বেরুল টিনের খনি। সঙ্গে সঙ্গে বহু টাকার মালিক হয়ে পড়লুম। তারপর সব ব্যবস্থা করে দেশে ফিরেছি! বিয়ার খাবি?"

কৈলাস চুপ করিয়া রহিল। সুশান্ত বেল টিপিয়া বয়কে বিয়ার ও সোডা দিবার জন্য হুকুম করিল।

বিয়ার পান করিতে করিতে সুশান্ত বলিল—"দেখলুম জীবনের পথে কি অপূর্ব রহস্যময় মানুষের ইচ্ছাশক্তির

নিশীথ তারার দিকে চেয়ে রবার বাগানে অনিদ্রায় কেটেছে তার ঠিক নেই! শ্যামরাজ্যের বনের ইজারা নিয়ে একটা ফরাসী কোম্পানীর সঙ্গে কি রেষারেষিই না চলেছিল—পরিশেষে আমারই হল জিত,—তারা ঠিক সময়ে টাকা দিতে পারলে না—আমি টাকা জমা দিয়ে ইজারা নিলুম। তারপর যেদিন বেরোল টিনের খনি—উঃ সে দিনের কথা মনে হলে এখনও হৃদ্‌স্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম হয়—মনে হয় স্বর্গে মর্ত্যে যেন একটা প্রলয়-তাণ্ডব সুরু হয়েছে। ভীষণ ঝড় বৃষ্টি—বনের মধ্যে মূল্যবান কাঠের সন্ধানে বেরিয়ে পথ হারিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, সিক্তবস্ত্রে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘনিয়ে এল সাঁঝের আঁধার—দূরে বৃক্ষ-লতার ফাঁকে সামান্য নীল আকাশের বুকে দেখা যেতে লাগলো বিদ্যুৎকুমারীর চকিত চাহনি, কিন্তু তখনও পথ খুঁজে পাইনি। টর্চ জ্বালিয়ে বন্য হিংস্র জন্তুর হাত থেকে কোন মতে আত্মরক্ষা কর্‌বার চেষ্টা দেখছি। যেতে যেতে একস্থানে গর্তের মত একটা স্থান দেখলুম। তার ভিতরে টিনের সন্ধান মিললো আশ্চর্যভাবে; সারা রাত্রি সেখানে কাটিয়ে দিলুম অনাহারে অনিদ্রায়; তৎপরে প্রভাতে একটি বন্য শ্যামদেশীয় লোক পথ দেখিয়ে দিলে। উঃ সে কি কষ্ট! আর আজ সেই খনি থেকে আমার আয় বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা।"

কৈলাস প্রশ্ন করিল—"বিয়ে-থা করেছিস্?"

স্মিত হাস্যে সুশান্ত উত্তর করিল—"না ভাই, সে ফুরসত হয় নি। ছিলাম জঙ্গলে বন্য লোকের সংস্রবে দীর্ঘকাল—তখন বিয়ের কথা ভাববার অবসর হয় নি। এখনও তেমন কোন প্রয়োজন দেখ্‌ছি না। তবে যদি ভবিষ্যতে কোন দিন কোন প্রেরণা অনুভব করি বিয়ের জন্য, তখন না হয় বিয়ে করা যাবে। কিন্তু বিয়ে করে শেষকালে তোর মত অবস্থা হ'বে না ত?"

কৈলাস উত্তর করিল—"দেখ্ বিয়েটা দিল্লীর লাড্ডু; যে খায় সেও পস্তায়—যে না খায় সেও পস্তায়। তবে আমার মতে না খেয়ে পস্তানোর চেয়ে খেয়ে পস্তানোই ভালো।"

সুশান্ত উচ্চ হাস্যধ্বনি করিয়া উঠিল এবং পরে বলিল—"তুই বুঝি নিজে লাঙ্গুলহীন শৃগাল হয়েছিস বলে সকলকেই সেই পথে নিয়ে যেতে চাস্? তা হয় না। তবে প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছামত নিজের পথ বেছে নেবে। তাতে কেউ হবে রুষ্ট, কেউ হবে তুষ্ট। বিশ্বের সকলকে কেউ সন্তুষ্ট করতে পারে না—পারবেও না। তবে আমার নিজস্ব কোন মতামত নেই বিয়ের সম্বন্ধে—যখন যেমন অবস্থা দেখ্‌ব, ঠিক তেমন ব্যবস্থা কর্‌ব।"

কৈলাস বলিল—"কতদিন দেশে থাকবি?"

সুশান্ত উত্তর করিল—"তা এখনও ঠিক বল্‌তে পার্ব না, তবে যদি সম্ভব হয় আমার এখানে থাকারই ইচ্ছা, আর সিঙ্গাপুর বা শ্যামরাজ্যে যাওয়ার অভিলাষ পোষণ করিনে; তবে মনের অবস্থা কখন কি হবে জানিনে।"

কৈলাস বলিল—"তা বটে! ভগবান্ অলক্ষ্যে বসে কি যে করছেন, তা কেউ জানে না।"

সুশান্ত বাধা দিয়া বলিল—"ভগবানের কথা বলিস নে, আমি ভগবান্ মানি নে—আমার ও সব বাজে কথার উপর বিশ্বেস নেই। আমি বিশ্বেস করি নিজের শক্তির উপর। মানুষের ভিতর যে শক্তি লুপ্ত রয়েছে, তাকে জাগিয়ে তোল; ভগবানের কোন দরকার হবে না।"

কৈলাস—"তুই কি বল্‌ছিস?"

সুশান্ত—"যা বল্‌ছি তা সত্যি—তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। দেখ তোর ভগবানের উপর টেক্কা দিয়ে মানুষ চালাচ্ছে জল, স্থল ও শূন্য পথে বিশাল অর্ণবপোত, রেল-গাড়ী ও এরোপ্লেন। রুষ এঞ্জিনিয়ারের দৌলতে সাইবেরিয়ার তুষার-মরু আজ শস্য-শ্যামল প্রান্তরে রূপান্তরিত হয়েছে। মানুষের শ্রম সফল করে চলছে কলের চিমনীর ধূমরাশি, পলকে, মিনিটে হাজার হাজার নূতন নূতন দ্রব্য-সামগ্রী মানুষের প্রয়োজন বা বিলাসের উপাদান যোগাচ্ছে। আর ভগবান্ এর বেশী কি করেছেন?"

কৈলাস চুপ করিয়া রহিল।

সুশান্ত বিয়ারের গ্লাস শেষ করিয়া আবার চাহিল এবং বলিতে লাগিল—"তুই কি করে বুঝবি, মানুষের প্রতিভা

চলেছে। মানুষের চিন্তাধারা সভ্যজগতে যে কত প্রসারতা লাভ করেছে, দিনে দিনে পলে পলে যে কত নূতনভাব মানুষের মনে জাগ্‌ছে—কে তার খোঁজ-খবর নিচ্ছে, অথচ এই সমস্ত মনীষী মানুষের সভ্যতাকে পূর্ণতার উপকূলে টেনে নেবার জন্য যা করছে, তার কোন সংবাদই হয়ত ভারতের অধিবাসীর কাণে পৌছে না! একটা জগদীশ কি একটা রামণকে নিয়ে লাফালাফি করতে পারিস—কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখ্‌বি—নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে, কেবল ভগবান্ ভগবান্ করে ভারতবর্ষ সভ্যজগতের ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়ছে দিন দিন।"

কৈলাস বাধা দিয়া বলিল—"তবে সভ্যজগতের সেরা আমেরিকা স্বামী বিবেকানন্দকে মাথায় তুলে নিলে কেমন করে?"

সুশান্ত উত্তর করিল—"তাও সকলেই যে বিবেকানন্দকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে তা মনে করিস নি। তাদের মনের জোর আছে, ঘরে ভাত আছে—কাজেই সখের নেশাও মাঝে মাঝে জাগে। তাই দেখছিল—কালা আদমী কি বলে! তা ছাড়া আরও একটা দিক্ মানুষের আছে—যাতে মানুষকে করে ফেলে দুর্বল—অজ্ঞাত রাজ্যের বা বস্তুর একটা আকর্ষণ। মানুষ যতক্ষণ জানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, ততক্ষণ তার কৌতুহল ঠিক জাগ্রত হয় না; কিন্তু যেই একটা রহস্যময় বস্তুর ছবি চোখের সামনে ধরা গেল বা এমন কোন বিষয়ের কথা কেউ বললে, যাকে সাদা চোখে কেউ কোন দিন দেখেনি, অমনি মানুষের মন সেই দিকে ঢলে পড়লো! তাই স্বামী বিবেকানন্দ যখন একটা নূতন কথা বললেন, অমনি মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা আমেরিকাবাসী কারুর কারুর মনে আধিপত্য বিস্তার করলে—ফলে বিবেকানন্দ পেলেন কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা, এই পর্যন্ত। নতুবা পৃথিবীব্যাপী সভ্যতা যেভাবে পা ফেলে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে ভারতের দান নেই বললেও চলে। মানুষের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এডিসন বা মার্কোণি যা করে গেছেন, জগদীশ বা রামণের আবিষ্কারে তার কণামাত্রও পাবিনে। গাছ হাসে কি কাঁদে—না জান্‌লেও আমাদের জীবনের উপভোগে কোনরূপ গলদ্ দেখতে পাওয়া যায় না; সমুদ্রের জল কেন নীল দেখায় তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পেলেও জীবন বেশ চলে যাবে; কিন্তু বৈদ্যুতিক আলো বা বেতার-বার্তা না হলে যেন সভ্যতার অঙ্গহানি হয়!"

কৈলাস সুশান্তের কথায় একটু ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। সে মনে মনে ভাবিত, বিশ্বময় ভগবানের খেলা চলিতেছে। তাঁহারই ইচ্ছাবলে সে সামান্য কেরাণীগিরিতে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু সুশান্তের কথা যেন তাহার মধ্যেও একটা ওলট-পালট আনিয়া দিল। তাহার মানসিক সাম্যের ভার-কেন্দ্র বিগড়াইয়া গেল!

কৈলাস চেয়ার হইতে ঝুঁকিয়া জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া দেখিল দূরে গভর্ণমেণ্ট হাউসের চূড়ায় স্বর্ণরশ্মির মত রবির কিরণ শোভা পাইতেছে। কৈলাস সুশান্তের মুখের দিকে তাকাইল, দেখিল—সুশান্ত যেন কি একটা নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে।

কৈলাস বলিল—"বুঝলাম তোর কথা। কিন্তু যে যন্ত্র-দানব পৃথিবীর সম্পদ্‌বৃদ্ধির উপায় দেখিয়েছে, তাই ত মানুষকে মেরে ফেল্‌লে।"

সুশান্ত—"কি রকম?"

কৈলাস—"দেশে দেশে যে আজ বেকার-সমস্যা বিরাট্ আকার নিয়ে দেখা দিচ্ছে, তার কারণ ত তোর ঐ সভ্যতার মূলে বিদ্যমান। আগে লোকে হাতে কাজ করত; কাজেই প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ পেত—খেয়ে পরে কোন মতে দিন কাটাত; কিন্তু যেই তোর যন্ত্র-দানবের বিরাট্ মস্তক শূন্যে দেখা দিল, গেল তাদের পেটের ভাত ঐ যন্ত্রদানবের উদরে—মানুষের ঘরে ঘরে উঠ্‌লো হাহাকার। যাকে তুই বল্‌ছিস সভ্যতা, যাকে বল্‌ছিস্ উন্নতি, আমি দেখ্‌ছি তা হচ্ছে বর্বরতা, আর অধোগতি।"

সুশান্ত মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—"তা হলে কল্‌কাতায় পড়ে আছিস কেন? যা না সাঁওতাল-পরগণার জঙ্গলে। সুখে খাবি দাবি ঘুমোবি।"

কৈলাস দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিল—"ঠাট্টা করিস নে। সত্য কথা বল্‌ছি, তোর সভ্যতা যতটা ভাল করেছে, খারাপ করেছে তার দশগুণ।"

সুশান্ত—"কি রকম?"

কৈলাস—"কি রকম নয়? মানুষের সহজ-সরল জীবন-যাত্রাকে বিলাসিতার পঙ্কিল পথে চালিয়ে দিয়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে। দু'দশজন বড়লোক ঐশ্বর্যের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে; কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনটা একবার আলোচনা করে দেখ্। পেটে ভাত নেই, দেহে বস্ত্র নেই—তবু চলে যাচ্ছে গতানুগতিক জীবনের আহ্বানে, না আছে স্ফূর্তি, না আছে আমোদ, না আছে জীবনের প্রতি আগ্রহ। আজ যে দেশে এত আত্মহত্যার মাত্রা বেড়ে চলেছে—তার কারণ ঐ সভ্যতার অগ্রগতি!"

সুশান্ত বলিল—"তুই ভুল বুঝেছিস্।"

কৈলাস বলিল—"কিছু ভুল বুঝিনি। আগে আমাদের মধ্যে ছিল সত্যপরায়ণতা, বিনয়-নম্রতা, ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ-সহানুভূতি, পরার্থপরতা প্রভৃতি সদগুণ; আর আজ তা হারিয়ে আমরা বন্যপশুর চেয়েও হিংস্র, সর্পের চেয়েও কুটিল, শৃগালের চেয়েও ধূর্ত হয়ে উঠেছি। নির্বাসিত করেছি ভগবান্‌কে জীবন হতে—কিন্তু পেয়েছি কি?—অসার সভ্যতা, বিলাসিতা, নির্মম কঠোরতা—শূন্য প্রাণ-মন! তোর সভ্যতার পায়ে লক্ষ লক্ষ প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়!"

সুশান্ত বলিল—"যা কখনো কল্পনা করতে পারতিস্ না, তাই এখন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছিস, তাতেই তোদের চোখ টাটাচ্ছে।"

কৈলাস বলিল—"তা নয় সুশান্ত—তা নয়; যা দেখ্ছি তার মধ্যে সত্য দেখতে পাচ্ছি না—দেখছি মরীচিকা! জল নেই—ধূ ধূ বালুকারাশি দিগন্ত ব্যাপ্ত করে রয়েছে। তখন প্রাণে সুখ ছিল, শান্তি ছিল, গৃহ ছিল আনন্দের নিকেতন; আর আজ দেশে নেই সে আনন্দ-আরাম, খেলা-ধূলা, জীবনের অনাবিল স্বচ্ছতার বিকাশ। তুই ত আজ লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক—বল্‌তে পারিস সুদূর বাল্যজীবনে বনে জঙ্গলে শিকার খেলে, বন্যভাবে জীবন কাটিয়ে সভ্যতা থেকে দূরে বহু দূরে যে আনন্দ পেয়েছিলি, আজ ঐশ্বর্যের স্তূপে বসে তা পাচ্ছিস? প্রাণে কি তোর কোন আনন্দের ছবি জাগে সেই বাল্য জীবনের ছবি উপেক্ষা করে?"

সুশান্ত চুপ করিয়া রহিল।

কৈলাস আবার বলিতে লাগিল—"কি রে, বল্? চুপ করে রইলি কেন? সত্যি বল্‌তে কি তোর মনও হয়ত অলক্ষ্যে আমার কথায় সাড়া দিচ্ছে—জীবনে ঐশ্বর্য-সম্পদ্-বিলাসিতা একমাত্র কাম্য নয়—এর অন্তরালে আছে অন্য কিছু—সে ভগবান্। আমরা জানি এ জন্মের দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান হবে আগামী জন্মে ভগবানের করুণায়—তিনি এই পৃথিবীর দুঃখী পুণ্যবান্‌কে দেবেন আনন্দ; ধনী পাপীকে দেবেন শাস্তি। এই বিশ্বাস প্রাণে নিয়ে আমরা দিনের পর দিন সংসারের দুঃখ-দৈন্য বিঘ্নবিপদ্-সঙ্কট সহ্য করে যাব; কিন্তু তোর কি আছে—তুই কি নিয়ে দিন কাটাবি বল্‌তে পারিস?"

সুশান্ত বিশেষ কিছুই বলিল না। শুধু দূর শূন্যে অসীম নীলিমার বুকে অবস্থিত খণ্ড মেঘের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল—একি সত্য না মায়া!

ক্রমশঃ

কবিবর প্রিয়নাথ সেন

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(১৫)

বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৩৭ বৎসর পূর্বে প্রিয়নাথ তাঁহার "ফলিত জ্যোতিষ" প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠী বিচার করিয়াছেন। তিনি তৎকালে যেভাবে কবির কোষ্ঠী বিচারপূর্বক তাহার ফলাফল লিখিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে অনেকের কৌতূহল উদ্রেক করিবে। কারণ সে সময়ের রবীন্দ্রনাথ ও আজকালকার রবীন্দ্রনাথ, দুই সমান নয়। তখনকার রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও যশঃ বাংলা বা ভারতেই বিস্তৃত, আর এখন তাঁহার যশঃ ও খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীব্যাপী।

রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠী-বিচারের সূচনায় প্রিয়নাথ বলিতেছেন :—"এই জাতক যখন জন্মিয়াছেন, তখন পূর্বাকাশে মীনরাশি উদীয়মান; সুতরাং ইঁহার জন্মলগ্ন মীন। লগ্নে জাতকের আকৃতি, রূপ, স্বাস্থ্য, বল ও বংশ প্রভৃতি নিরাকৃত হয়। এই প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোষ্ঠী-বিচার হইতে পারে না এবং তাহা আমাদেরও উদ্দেশ্য নয়। তবে জাতক-জীবনে যাহা উল্লেখযোগ্য তাহাই বলিব এবং যে যে ভাব তাঁহাকে অপর সকল লোক হইতে বিশেষত্ব দিয়াছে, তাহা দেখাইব। এক কথায় উদ্ধৃত কোষ্ঠী জাতক সম্বন্ধে কি বিশেষ ভাগ্য নির্দেশ করে, তাহা বাস্তবের সঙ্গে মিলাইয়া ফলিত জ্যোতিষ যে ধ্রুববিদ্যা—উপন্যাস বা গালগল্প নহে,—তাহা বুঝাইব।" পৃঃ ২৪০

ইহার পর তিনি রবীন্দ্রনাথের জন্মকালীন রাশিচক্রে অবস্থিত গ্রহ এবং দ্বাদশ ভাবের বিচার করিয়াছেন। ইহা দীর্ঘ হইলেও, একজন বিশ্ববরেণ্য কবির অদৃষ্ট-বিচার বলিয়া আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিচারটি উদ্ধৃত করিবার পূর্বে আমরা কবির জন্ম-কুণ্ডলীটি প্রদান করিলাম :—

র লং
ম বু চ
কে শু ০
বৃ ০
শ রা
০ ০ ০
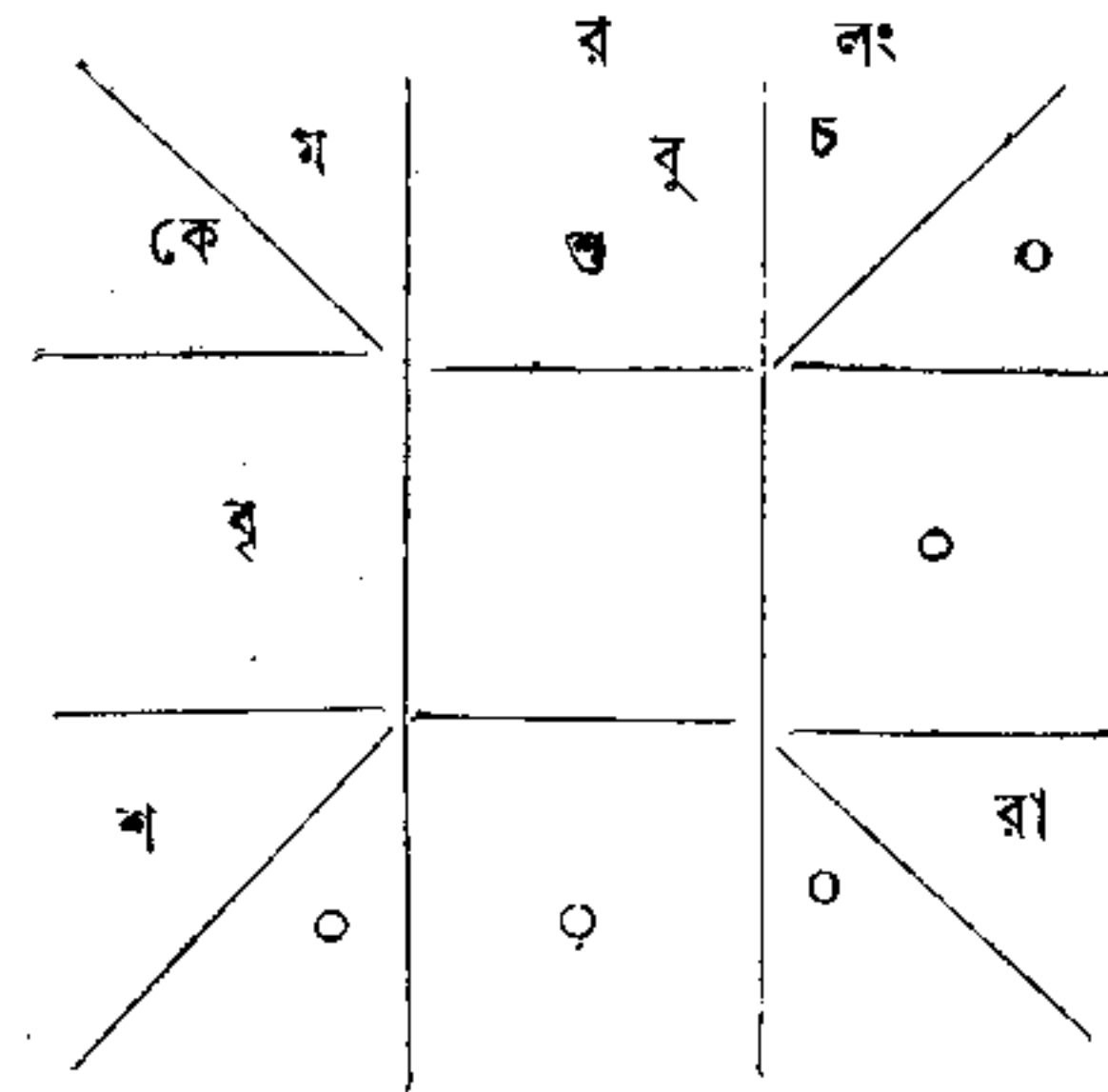
"জাতকের লগ্ন মীন, সর্বশ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বৃহস্পতির গৃহ। মীনরাশি স্বচ্ছবর্ণ সুতরাং জাতকের বর্ণ গৌর। সেখানে আবার গ্রহদিগের মধ্যে যে দু'টি গ্রহ গৌরবর্ণ, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি, তাহাদের পূর্ণপ্রভাব লক্ষিত হয়। চন্দ্র মীন রাশিতেই অবস্থিত এবং স্বামিগ্রহ* বৃহস্পতি লগ্নকে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে। তাহাতে বর্ণকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়াছে। রূপ এবং আকৃতি কান্ত, মনোহর এবং শোভন। স্বাস্থ্য এবং বল সম্বন্ধে ঐ কথাই খাটে। তিনি সুস্থদেহ এবং বলশালী। তাঁহার বংশ সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং উজ্জ্বল আভিজাত্য-গৌরবে অলঙ্কৃত। নৈসর্গিক তেজে সর্বাপেক্ষা তেজোময় গ্রহরাজ সূর্য, এবং সর্বাপেক্ষা শুভগ্রহ বৃহস্পতি,

---

* মীন রাশির অধিপতি বৃহস্পতি, সে হিসাবে ইহাকে 'স্বামিগ্রহ' বলা হইয়াছে।

উভয়েই তুঙ্গী* হইয়া জাতককে অপরদিক্ হইতে উচ্চ বংশ-গৌরব এবং সুস্থ সুন্দর দেহ, উন্নত মানসিক বৃত্তিসকল দিয়াছে। লগ্ন সম্বন্ধে জাতকের এই বিশেষত্ব।"

"২য় স্থান বা ধন সম্বন্ধে জাতকের এই অসামান্য সৌভাগ্য দৃষ্ট হয় না। তবে জাতক ধনহীন নহে। তিনি ধনী। তুঙ্গগ্রহ রবি দ্বিতীয়স্থ বলিয়া তাঁহাকে ধন দিয়াছে, কিন্তু ঐ রবি শত্রু ভাবের অধিপতি† বলিয়া মাঝে মাঝে ধনের হানি হইয়া থাকে। ধনভাবস্থ বুধ ও শুক্র দুইটি সৌম্যগ্রহও তাঁহাকে ধন দিয়াছে, শুক্রগ্রহ উত্তরাধিকারী-সূত্রে। কিন্তু তাহারা অস্তগত বলিয়া ধনের হানি করিয়াছে। পরন্তু ধন সম্বন্ধে জাতকের বিশেষত্ব এই যে, বুধ ও শুক্র দ্বিতীয়স্থ থাকায় তাঁহার স্বীয় বিদ্যাবলে ধন উপার্জন হইবে।"

"৩য় বা ভ্রাতৃস্থান অশুভ গ্রহ মঙ্গলযুক্ত এবং শনি কর্তৃক পূর্ণ বীক্ষিত; তজ্জন্য অনুজ না হইবার সম্ভাবনা, হইলেও তাঁহার মৃত্যু সম্ভাবিত; অন্ততঃ জাতকের অব্যবহিত অগ্রজ এবং কনিষ্ঠের অমঙ্গল স্পষ্টতঃ সূচিত।"

"৪র্থ অর্থাৎ মাতৃস্থান কেতু-যুক্ত। রাহু কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট। স্বামিগ্রহ বুধ অস্তগত এবং ষষ্ঠাধিপতি রবি এবং মরণাধিপতি শুক্রযুক্ত সুতরাং জাতক অল্প বয়সেই মাতৃস্নেহ-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। তাঁহার বন্ধুত্ব-সৌভাগ্যও স্থায়ী নয়। একাধিক বন্ধুর সহিত মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ বা অপ্রীতি ঘটিতে পারে।"

"৫ম স্থানে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়। 'বুদ্ধি-প্রবন্ধাত্মজ-মন্ত্রবিদ্যা'। মুনিঋষিগণ মানসপুত্র এবং ঔরসজাত পুত্রের কল্পনা একই স্থানে করিয়াছেন। এই ভাবে জাতকের অসামান্য সৌভাগ্য। ৫ম স্থান কর্কটরাশি, সৌম্যগ্রহ চন্দ্রের গৃহ এবং চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বৃহস্পতি যুক্ত। সুতরাং ৫ম স্থান 'সৌম্যস্বামিযুতেক্ষিত' বলিয়া জাতকের বিদ্যাবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। তাহাতে কর্কটরাশি বৃহস্পতির তুঙ্গ বা সর্বোচ্চ স্থান। সে কারণে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি গরীয়সী। সেই বৃহস্পতি আবার লগ্নাধিপতি হইয়া পঞ্চমে অবস্থিত; সুতরাং আজন্ম বিদ্যানুশীলনে ও জ্ঞান-চর্চায় রত এবং তাহাতে অসীম এবং অসামান্য সৌভাগ্য-শালী। এখনও শুভপ্রভাবের শেষ হয় নাই।‡ পঞ্চমাধিপতি চন্দ্র লগ্নগত। একে ত' 'লগনচাঁদা বেদ বাখানে' তাহাতে এ স্থানে লগ্ন এবং পঞ্চম ভাবে বিনিময়। ইহা একটি অত্যন্ত দুর্লভ এবং অমৃততুল্য যোগ। পঞ্চম ভাবে এতগুলি শুভযোগ হাজার, দশহাজার বা লক্ষেও ঘটে না। জাতকের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একটি কথায় এবং কেবল একটি মাত্র কথায় দেওয়া যাইতে পারে; তাহা প্রতিভা এবং লগ্নস্থ চন্দ্র তাঁহাকে সুন্দর এবং অনন্যসাধারণ কল্পনা শক্তি দিয়াছে।"

"৭ম অর্থাৎ জায়াভাবে তাদৃক্ সৌভাগ্য দৃষ্ট হয় না। জায়াভাব গ্রহশূন্য স্বামিদৃষ্টিবর্জিত। এবং সৌম্য গ্রহ-দিগের মধ্যে কেবলমাত্র বৃহস্পতি কর্তৃক পাদদৃষ্ট। যেমন জায়াভাব জায়াধিপতির দৃষ্টিরহিত—জায়াকারক গ্রহ শুক্রেরও দৃষ্টিরহিত। এবং জায়াধিপতি এবং জায়াকারক গ্রহ, উভয়েই অস্তগত। অধিকন্তু মঙ্গলের ক্ষেত্রে শুক্রের অবস্থান হেতু জায়াহানি সূচিত। এবং শুক্র মরণাধিপতি হইয়া জায়াপতি বুধের সহিত যুক্ত। এই সকল প্রবল কারণে জাতক দাম্পত্যসুখ বহুদিন ভোগ করিতে পারেন নাই।"

"৯ম বা ভাগ্যস্থান উৎকৃষ্ট স্বামিগ্রহ মঙ্গল এবং সৌম্যগ্রহ বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট। সুতরাং জাতক ভাগ্যবান্। অধিকন্তু ভাগ্যস্থান সর্বগ্রহ-বীক্ষিত বলিয়া জাতকের ভাগ্যের পরম উৎকর্ষসাধন করিয়াছে।"

---

* তুঙ্গী অর্থাৎ উচ্চস্থ।

† কবির ষষ্ঠস্থান সিংহ এবং সিংহরাশির অধিপতি রবি। ষষ্ঠস্থানকে "শত্রুক্ষেত্র" বলা হয়।

‡ প্রিয়নাথবাবু এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। এই প্রবন্ধটি ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার পর নোবেল-প্রাইজ প্রাপ্তি প্রভৃতি যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, তাহা সাধারণে বিদিত আছেন।

"১০ম, কর্ম এবং যশের স্থান। ইহার পরীক্ষা করিয়াই এই কোষ্ঠীর সাধারণ বিচার শেষ করিব। ১০ম স্থান বৃহস্পতির ক্ষেত্র, ধনুরাশি এবং যদিও উহা স্বামিগ্রহের দৃষ্টিবঞ্চিত—কিন্তু অপর সমস্ত গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইবার কারণ শুভ ফল-সূচক। পরন্তু ১০ম ভবননাথ বৃহস্পতি তুঙ্গী এবং ত্রিকোণস্থিত বলিয়া জাতক প্রসিদ্ধ 'ক্ষেত্র-সিংহাসন' যোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ফলে জাতকের বিশ্ববিখ্যাত কীর্তিলাভ করিবার কথা। তবে সে স্থানে রাহু অবস্থিত এবং বৃহস্পতির দৃষ্টি নাই বলিয়া সময়ে সময়ে জাতকের অপযশ ও অখ্যাতি ঘটে।"

"এই দশম স্থানে পিতৃ-প্রকৃতি নিরূপিত হয়। জাতকের পিতা পরম ধার্মিক উন্নত ও সাধুচরিত্র। এবং যে যে কারণে মধ্যে মধ্যে জাতকের যশের হানি হয়, সেই কারণে তাঁহার পিতারও সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং শারীরিক এবং মানসিক কষ্টও পান।" পৃঃ ২৪০-২৪৪

এই 'ফলিত জ্যোতিষ' প্রবন্ধের পর লেখকের একটি গল্প আছে। এ গল্পটি ১২৯২ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটি ছোট, দশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাকে ঠিক ছোট গল্প বলা চলে না, স্মৃতি-কথার আকারে ইহা একটি করুণ কাহিনী। এ কাহিনী পাঠে মর্মের অন্তস্তলে ব্যথা অনুভূত হয়। এমন করুণরসাত্মক কাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় ও অপূর্ব ভঙ্গীতে লেখা, খুব কমই পাঠ করিয়াছি। কাহিনী—পল্লীর একটী সরলা বালিকার—তাহারই নাম 'সুলোচনা'।

সুনিপুণ শিল্পী নিপুণতার সহিত এ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে ঘটনার কোন আড়ম্বর বা কোন বিশেষত্ব নাই। আছে দরদ দিয়া লেখা পল্লীর একখানি নিখুঁত চিত্র, সেই সঙ্গে একটি পল্লী বালিকার করুণ কাহিনী।

শৈশবের কথা বলিতে গিয়া কবি প্রিয়নাথ আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যবর্ষী লেখনীর মুখে সৌন্দর্য্য-ধারা ছড়াইয়া পড়িতেছে—কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"আহা সেই মধুর বালককাল। স্মৃতির আকাশ-পটে সেই মধুর তারকা! বর্তমান হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু স্মৃতিপটে তেমনি শোভন তেমনি উজ্জ্বল তেমনি মধুর! হারাণ মাণিক—যখন ছিল তখন ছিল বলিয়া আদর পায় নাই।······

"শৈশবকাল ইদন কানন! সে উদ্যানে অভাব নাই, সে উদ্যানে ক্লেশ নাই। এখন আমার ললিতমাংস, পলিত কেশ, সেই চঞ্চল ক্রীড়াশীল বালককে স্মরণ করিতেছে। আমার মন সেই সরল সহাস বালকাত্মার ধ্যান করিতেছে। লবণাক্ত সাগরগর্ভে নিমগ্না নদী সেই পর্বতবিহারিণী নির্ঝরিণীকে গভীর কল্লোলে ডাকিতেছে।

"কিন্তু সেই পর্বতবিহারিণী নির্ঝরিণী পর্বতবিহারী পবন সনে খেলিতেছে; মৃদুস্ফুট স্বরে গান গাহিতেছে, তীরস্থ প্রসূনমালে শ্যামকেশ বিলাইয়া নাচিতেছে, ভানুকিরণে ঈষৎ হাসিতেছে। সমুদ্র-কন্দর হইতে ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ করিয়া নদী ডাকিতেছে। নির্ঝরিণী খেলিতেছে, নাচিতেছে, মালা পরিতে পরিতে গাহিতেছে। হায় বালককাল, তোমাকে আর পাইব না।" পৃঃ ২৪৭-২৪৮

কি সুন্দর ও উপভোগ্য বর্ণনা! আর একস্থানে কবি প্রিয়নাথ পল্লী-প্রকৃতির একটি মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—"এইমাত্র বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। গাছের ভিজাপাতাগুলি সূর্যের আলোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আর্দ্র পল্লব হইতে রামধনুক কাটিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতেছে। নীল আকাশখানি—দিগন্তে শাদা মেঘগুলি ঘুমাইয়া রহিয়াছে। বর্ষা-বারিনিষিক্ত পৃথিবীর হৃদয় হইতে আনন্দ-বাষ্প উঠিতেছে। আমি সেই স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়া আছি। পুকুরের জলে নীল আকাশ কেমন হাসিতেছে।" পৃঃ ২৪৮-২৪৯

'সুলোচনা'র পরে আর একটি প্রবন্ধ আছে। ইহা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যের সমালোচনা। এই কাব্য ১২৮২ সালে, ইং ১৮৭৫ খৃঃ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি প্রকাশের পর দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার সমালোচনার জন্য প্রিয়নাথকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন :—

"ওঁ

জোড়াসাঁকো
২৯শে আষাঢ়

প্রিয় বন্ধু,

আমার "স্বপ্নপ্রয়াণ"খানি সমালোচনার অভাবে বেঘোরে পড়ে অকুল পাথারে হাবুডুবু খাইতেছে। এ বিপদে তোমা ভিন্ন তাহার গতি নাই। আমাকে যদি একবার অত্রভবনে চিরাভলষিত দর্শন দান কর, তবে পরম সুখী হইব। আশা করি, তুমি পূর্ববৎ স্বচ্ছন্দ শরীরে সাহিত্য-কাননে বিরাজ করিতেছ।

তোমার সৌহার্দ্যে বাঁধা
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
alias old বড় দাদা

সাহিত্য-রসের রসিক প্রিয়সুহৃৎ
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন
অভিন্নহৃদয়েষু"

এই গ্রন্থের প্রথম সর্গ বহুদিন পূর্বে ১২৮০ সালে দ্বিতীয় বৎসরের "বঙ্গদর্শনে" রচয়িতার বিনা নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থখানির সমালোচনা করিতে বসিয়া প্রিয়নাথ প্রসঙ্গক্রমে "বটতলা"র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই বটতলা এক সময় বাঙালা পুস্তক-প্রকাশের একটা বড় কেন্দ্র ছিল। শ্রীরামপুর যন্ত্র হইতে প্রাচীন ও নানাবিধ পুস্তকাদি প্রকাশ বন্ধ হইয়া যাইবার পর এই বটতলা হইতেই বহু প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন সুবর্ণ-বণিক্ ও তন্তুবায় বংশীয়েরাই এই কার্যে অগ্রণী হন। এখনও তাঁহাদের কৃতী বংশধরেরা এই পুস্তক প্রকাশের কাজ অব্যাহত রাখিয়াছেন। সে সময় বটতলায় শীল, বসাক ও দে মহাশয়েরা চেষ্টা না করিলে, আজ অনেক প্রাচীন গ্রন্থের অস্তিত্বই জানিতে পারিতাম্ না। প্রিয়নাথ বাবু এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"যখনই স্বপ্নপ্রয়াণের কথা উঠে, তখনই অবিচ্ছেদ্যবন্ধনে সেই স্মৃতি জাগ্রত হয়! প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই আমার বিশেষ সৌভাগ্যবলে একখানি পুস্তক নিতান্ত অসম্ভাবিত স্থানে আমার বিস্মিত লোলুপ নয়নকে আকৃষ্ট করে। মানস-সরোবরের তীরে নয়—বটতলার একটি সঙ্কীর্ণগৃহ দোকানে। অসম্ভাবিত কেনই বা বলি? সেদিনকার সময়ে কলিকাতার সারস্বত মন্দির বটতলায়ই ছিল। বাঙালা-সাহিত্যের অক্ষয়কীর্তি গোত্রপতিগণের সাক্ষাৎ তখন এই বটবৃক্ষের ছায়াতলেই লাভ করা যাইত। গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় শাস্ত্রের বহুল প্রচারের জন্য পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে ভক্তিপ্রণোদিত চিত্তে এই যুগের বেদব্যাসের আসনে বসাইয়াছেন। বটতলার একজন খ্যাতনামা প্রধান পুস্তক প্রকাশক এবং বিক্রেতা ৺নৃত্যলাল শীল বঙ্গসাহিত্যে বেদব্যাসানুরূপ যশের পাত্র না হউক, তাঁহার কিঞ্চিৎ নিম্নের আসন পাইতে পারেন। তাঁহার কল্যাণে আমরা কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, বৈষ্ণব কবিগণ প্রভৃতির পুস্তকসকল সেকালে দেখিতে পাইতাম। সেই সকল বঙ্গীয় সাহিত্য-গুরুদের অমূল্য গ্রন্থসমূহ, দেশী বিবর্ণ কাগজে ভাঙ্গা অক্ষরে—অনির্দেশ্য চিত্র-সম্পদে রঞ্জিত তৎকর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে (স্পষ্টবাদী দুষ্টলোকে বলিবেন, ভ্রমসঙ্কুল সংস্করণে) রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। বটতলা বঙ্গসাহিত্যের পীঠস্থান এবং পরলোকগত নৃত্যলাল শীল মহোদয় সেখানকার মন্দিরের একজন প্রধান পূজারী।" পৃঃ ২৫৬-২৫৭

ক্রমশঃ

রেলওয়ে এঞ্জিনের আবিষ্কারকমণ্ডলী

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

মানবীয় সভ্যতার বিকাশে রেলপথ

মানবীয় সভ্যতার বিকাশে রেলপথের অসামান্য দান উপেক্ষার বস্তু নহে; পরন্তু উহার উদ্ভব না হইলে মানব আদিম যুগের মানব-মানবীর মত পৃথিবীর এক এক প্রান্তে স্বীয় খণ্ড ক্ষুদ্র প্রদেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত; আজ পৃথিবীব্যাপী যে মানব-মানবীর মধ্যে ভাব-ভাষা-শিল্প-বাণিজ্যের বিরাট্ বিনিময় চলিতেছে তাহার মূলে বর্তমান রেলপথ-বিস্তার। যে মনীষিগণ রেলপথের প্রচলনের অগ্রদূত, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাঁহাদের নাম অগ্নিময় অক্ষরে লিখিত থাকিবে, সন্দেহ নাই। সাধারণত লোক-সমাজে জর্জ ষ্টিফেনসন রেলওয়ে এঞ্জিনের আবিষ্কারকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পূর্বে আরও দুইজন মনীষী রেলওয়ে এঞ্জিন নির্মাণে স্বীয় মৌলিক প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন; তাঁহাদের নাম যথাক্রমে উইলিয়াম মার্ডক ও রিচার্ড ট্রেভিথিক।

উইলিয়াম মার্ডক

অবশ্য জেমস্ ওয়াটের উদ্ভব বাষ্পশক্তির জয় ঘোষণা করে। জেমস ওয়াটের পর বাষ্পীয় এঞ্জিনের পরিকল্পনায় উইলিয়াম মার্ডকের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট স্কটল্যাণ্ডের আয়ারশায়ারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পিতার দ্বিতীয় সন্তান; তাঁহার পিতা কলের মিস্ত্রী ছিলেন। মার্ডক পিতৃ-ব্যবসায়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে বার্মিংহামে গমন করিয়া বোলটন ও ওয়াট কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে চাকুরী লাভ করিলেন। বোলটন এবং ওয়াট উভয়েই এই তরুণ যুবকের মধ্যে স্বভাবদত্ত শিল্পীর প্রতিভা নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হন। অতি অবিলম্বে তিনি কর্ণওয়ালের বিভিন্ন খনিতে

মার্ডক এই প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতিবিধান করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; পরন্তু তিনি উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হইয়া চলন্ত এঞ্জিন নির্মাণে ব্রতী হইলেন। বলা বাহুল্য, পূর্ববর্তী এঞ্জিনসমূহ স্থিতিশীল ছিল। সমস্ত অবসর সময় এই কার্যে ব্যয় করিয়া মার্ডক একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র তৈয়ারী করিলেন; উহা তিনটি চাকার উপর অবস্থিত ছিল; উচ্চতা ছিল এক ফুট; ইহার বয়লারের নিম্নে স্পিরিট ল্যাম্প দ্বারা জলকে বাষ্পে পরিণত করা হইত।

এক অন্ধকার রাত্রিতে খনির কার্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মার্ডক তাঁহার ক্ষুদ্র যন্ত্রের পরীক্ষায় ব্রতী হইতে ইচ্ছুক হন। তিনি ঠিক করিলেন, উহাকে সদর রাস্তায় পরিচালিত করিবেন, যাহা রেডরাথের বহির্ভাগে অবস্থিত গির্জার দিকে গিয়াছে। আবিষ্কারক কম্পিতহৃদয়ে ক্ষুদ্র স্পিরিট ল্যাম্প প্রজ্বলিত করিলেন; এবং ধীরভাবে জলের বাষ্পে পরিণতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রত্যাশিত সময়ের পূর্বেই জল বাষ্পাকার ধারণ করিল এবং এঞ্জিন হুস্ হুস্ শব্দ করিতে করিতে বেশ বেগে ধাবিত হইল এবং পশ্চাতে পশ্চাতে উত্তেজিত আবিষ্কারক দৌড়াইতে লাগিলেন।

হঠাৎ সম্মুখে মার্ডক দুঃখব্যঞ্জক চীৎকার-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন; কিন্তু উহা কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে, তাহা অন্ধকারের জন্য দেখিতে পাইলেন না। পরে যখন তিনি কোলাহলের উৎপত্তি-স্থলে উপনীত হইলেন তখন দেখিলেন প্যারিস-পুরোহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন যে, এক মুহূর্ত পূর্বে সয়তান ধূম ও অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছে!

চলন্ত এঞ্জিন আবিষ্কারে মার্ডকের প্রচেষ্টা শীঘ্রই অবসিত হইল, যেহেতু বোলটন ও ওয়াট তাঁহাকে এই

সুতরাং মার্ডক স্থিতিশীল এঞ্জিনের উন্নতিবিধানে মনোযোগী হন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মার্ডক পরলোক গমন করেন কিন্তু গ্যাসের আলোর উদ্ভাবন তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে।

সৌভাগ্যবশতঃ মার্ডকের উচ্চভিলাষ অন্য একজন কর্ণওয়ালবাসীর হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইল। তিনি রেলওয়ে এঞ্জিনের জন্মদাতা—

রিচার্ড ট্রেভিথিক

রিচার্ড ট্রেভিথিক ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল তারিখে কর্ণওয়ালের অন্তর্গত রেডরাথের নিকটবর্তী ইলোগ্যান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্য-কাল হইতে বাষ্পশক্তির প্রতি আকৃষ্ট হন। বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসকালে তিনি বাষ্পশক্তিকে নবভাবে প্রয়োগের সম্ভাবনার বিষয় লইয়া চিন্তা করিতেন এবং পৃথিবীর বুকে এঞ্জিনিয়াররূপে স্বীয় জীবন পরিচালিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে জেমস ওয়াটের এঞ্জিনের পেটেন্টের কাল অতিক্রান্ত হইল। এই সময় হইতে এঞ্জিনরাজ্যে নবযুগ দেখা দিল। ২৫ বৎসর বয়সে ট্রেভিথিক কতক-গুলি চলন্ত এঞ্জিনের আদর্শ তৈয়ারী করিয়াছিলেন; উহারা তাঁহার ক্যাম্‌বোর্ণস্থিত বাসভবনে আহারের টেবিলের চতুর্দিকে পরিভ্রমণে সমর্থ ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ট্রেভিথিক পূর্ণ আকারের বাষ্পীয় গাড়ী নির্মাণ করেন, এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দের বড় দিনের পূর্ব দিন তাঁহার আবিষ্কারের ব্যাবহারিক উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভে সমর্থ হইলেন।

বাষ্পীয় গাড়ীতে প্রথম মানবযাত্রী

এই বাষ্পীয়-শকট কেবলমাত্র ভূমিতে পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই; পরন্তু উহা প্রথম মানবযাত্রী বহন করিয়াছিল। যাত্রীরা তাহাদের অভিজ্ঞতার নবীনতায় আনন্দিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু পরে যখন তাহাদিগকে ভূতলে নামাইয়া দেওয়া হইল, তাহাতেও তাহারা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই।

চলন্ত এঞ্জিনের পেটেন্ট গ্রহণ

১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার আবিষ্কারের পেটেন্ট গ্রহণ করেন। এই আবিষ্কারকে কর্ণওয়ালের লোকেরা "শব্দকারী সয়তান" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় বাষ্পীয় শকট তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিলেন। এই এঞ্জিন তিনি জাহাজে করিয়া লণ্ডনে লইয়া গেলেন। ইহা লণ্ডনে সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শিত হইল। দলে দলে লোক এই অদ্ভুত যন্ত্র দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। ট্রেভিথিক ক্ষুদ্র রেলপথ সংস্থাপন করিয়া দুঃসাহসী দর্শককে এঞ্জিনের পশ্চাতে আবদ্ধ গাড়ীতে চড়াইয়া নবীন অভিজ্ঞতা দান করিতে লাগিলেন।

এই নবীন বাষ্পীয় শকট লণ্ডনে উপনীত হইবার কিছু পরে সার হামফ্রি ডেভি তাঁহার কর্ণওয়ালস্থ কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে লণ্ডনের রাস্তা কাপ্তেন ট্রেভিথিকের "ড্র্যাগন" নামক গাড়ী দ্বারা পূর্ণ হইবে।

অবশ্য এই এঞ্জিন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। ইহার গঠনে দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করিল এবং এই এঞ্জিন অবশিষ্ট জীবন স্থিতিশীল এঞ্জিনরূপে লৌহ-কারখানায় কল চালাইতে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় এঞ্জিন নির্মাণ

ট্রেভিথিক পরাজয় স্বীকার করিবার লোক ছিলেন না। তিনি দক্ষিণ ওয়েলসের পেন-ই-ডারাণ নামক স্থানে লৌহ-কারখানার জেনারেল এঞ্জিনিয়াররূপে অশ্ববাহিত ট্রাম লাইনে খনিজ পদার্থকে বহন করিবার জন্য এঞ্জিন নির্মাণে ব্রতী হইলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চলন্ত এঞ্জিন পূর্ণতা লাভ করিল এবং উক্ত বৎসরের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথম পরীক্ষা সংসাধিত হয়। ইহা অপূর্ব সফলতা লাভ করিল। ইহা দশ টন মাল ও ৭০ জন লোককে লইয়া লৌহ-রেলপথের উপর দিয়া শব্দ করিতে করিতে

অগ্রসর হইল। তখন ইহার গতি ছিল ঘণ্টায় ৫ মাইল। ট্রেভিথিক অতিরিক্ত প্রশংসায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু এই বিজয়-লাভও দীর্ঘস্থায়ী হইল না। কিছুকাল পরে এঞ্জিন দুর্ঘটনায় রেলচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়; ফলে ইহার অদৃষ্ট পূর্ববর্তীর অনুরূপ হইল—স্থিতিশীল যন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিল, যতদিন না কালবশে উহা জীর্ণ হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

অন্যবিধ পরিকল্পনায় ট্রেভিথিক

এই সময় হইতে ট্রেভিথিক চলন্ত এঞ্জিন নির্মাণের পরিকল্পনা পরিহার করেন এবং অন্যবিধ লাভজনক পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি একটি নূতন ধরণের এঞ্জিন তৈয়ার করিয়া বাষ্পীয় নাগরদোলা প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ভাবিলেন ইহাতে বুঝি তাঁহার কিছু আর্থিক ক্ষতি পূরণ হইবে। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিল। তাঁহার এই পরিকল্পনাও ফলপ্রসূ হইল না। তাঁহার টেমস নদীর সুড়ঙ্গ নির্মাণের পরিকল্পনা এবং পেরুর রূপার খনিতে বাষ্প দ্বারা কাজ চালাইবার পরিকল্পনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

বাস্তবিক জগতে এমন এক একজন মনীষী দেখা যায়, যাঁহারা কিছুতেই লক্ষ্মীর কৃপালাভ করিতে পারেন না; ট্রেভিথিকেরও সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনা দারিদ্র্যের অতল তলে ডুবিয়া গেল!

ফলে এই অসাধারণ প্রতিভাশালী মনীষী ভগ্নহৃদয়ে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার সহকর্মীরা দয়া না করিলে তাঁহাকে হয়ত কাঙালীর সমাধিতে সমাহিত করা হইত!

স্মৃতির সম্মান

পরবর্তীকালে লণ্ডনের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গির্জায় একটি জানালা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এইরূপে স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা না করিলেও পৃথিবীবাসীর হৃদয় হইতে তাঁহার নাম কোন দিন লুপ্ত হইবে না, যেহেতু তিনি ছিলেন প্রকৃতই বিস্ময়কর প্রতিভাশালী।

তিনি প্রথম ব্যাবহারিক উপযোগিতায় সমৃদ্ধ চলন্ত এঞ্জিনের গঠনকারী; তিনি ইহাও অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এঞ্জিনের চাকা মসৃণ লৌহ-রেলপথ কামড়াইয়া ধরিয়া চলিতে পারে, এমন কি ঢালু পথের ঊর্ধ্ব দিকে বোঝা টানিয়া তুলিতেও পারে।

কিন্তু তাঁহার মৃত্যু পরবর্তী আবিষ্কারকের পথ মুক্ত করিয়া দিল। তিনি

জর্জ ষ্টিফেনসন

মার্ডকের প্রচেষ্টা উৎসাহের অভাবে বিস্মৃতির অতল-তলে ডুবিয়া গেল; রিচার্ড ট্রেভিথিকের জীবনব্যাপী গবেষণাও অন্ধকার নিশীথে বিদ্যুৎ চমকের মত ক্ষণপ্রভা বিস্তার করিয়া নৈশান্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। পরিশেষে রেলওয়ে এঞ্জিনের ইতিহাসে নব সূর্যের আবির্ভাব হইল, যাঁহার যশোরাশি বাস্তবিক রবিকরের মত ভাস্বর, দীপ্ত ও মহিমময়। তিনি অদৃষ্টদেবীর বরপুত্র জর্জ ষ্টিফেনসন।

জন্ম ও বাল্য জীবন

জর্জ ষ্টিফেনসন ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে নিউক্যাসল-অন্-টাইনে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা খনির এঞ্জিনে কয়লা দেওয়ার কাজ করিতেন এবং সপ্তাহে ১২ শিলিং বেতন পাইতেন। উহাতে অতি কষ্টে এই পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ হইত। সার্ধ শতাব্দী পূর্বে ইংল্যণ্ডে মজুরদলের আর্থিক অবস্থা যে কত হীন ছিল, তাহা বর্তমানে কল্পনা করাও কষ্টসাধ্য। ষ্টিফেনসনের আরও ৫টি ভাই-বোন ছিল; কিন্তু দুঃখের সংসারে কেহই বিদ্যালয়ে গিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই। জর্জ নিজেও প্রথম বয়সে নিরক্ষর ছিলেন। ষ্টিফেনসন-পরিবার কাদার মেঝে বিশিষ্ট একটি ঘরে অতি কষ্টে বসবাস করিত।

জর্জ বাল্যজীবনে কোন পুস্তক হাতে করেন নাই বা কোন ছবিও দেখেন নাই; ইহাও বিস্ময়ের বিষয় যে, তিনি মার্ডক, ট্রেভিথিক বা জেমস্ ওয়াটের নাম পর্যন্ত শোনেন নাই; পরন্তু নিজে সহজাত সংস্কার বশে বা পূর্ব জন্মের সুকৃতিবশতঃ বাষ্পশক্তির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

তাঁহার জ্ঞানার্জনের একমাত্র পন্থা ছিল, কয়লার খনির স্থিতিশীল এঞ্জিন। এঞ্জিনের রহস্য উদ্ঘাটনের একমাত্র উপায় ছিল—শনিবার কার্যের অবসানে বাড়ী না গিয়া এঞ্জিনের প্রত্যেক অংশ খুলিয়া দেখা ও উহা পুনর্গঠন করা। তৎপূর্বে তিনি বাল্যকালে পিতার মধ্যাহ্নভোজনের খাবার এঞ্জিনগৃহে লইয়া যাইতেন এবং এই ভীমকায় দৈত্যের ক্রিয়াকলাপ বিস্ময়-কম্পিত হৃদয়ে নিরীক্ষণ করিতেন।

পরবর্তীকালে যখন তিনি নিজে এঞ্জিনে কয়লা দেওয়ার কাজে ভর্তি হইলেন, তখন রাত্রির পর রাত্রি বিভিন্ন অংশ খুলিয়া পর্যবেক্ষণ করত উহা পুনর্গঠিত করিতেন।

প্রথম বিদ্যালয়ে গমন

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে জর্জও পিতার মত এঞ্জিনে কয়লা দেওয়ার কাজে ভর্তি হন। তাঁহারও বেতন ছিল সপ্তাহে ১২ শিলিং এবং খাটিতে হইত প্রত্যহ ১২ ঘণ্টা। এই সময় তিনি নৈশ বিদ্যালয়ে বানান ও পড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে সপ্তাহে তিন পেন্স দিতে হইত।

বিবাহ

২১ বৎসর বয়সে জর্জ একটি চাকরাণীকে বিবাহ করেন। বিবাহ-রেজিষ্টারে নিজের নাম সহি করিবার গৌরব তিনি নিশ্চয় অনুভব করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি ৩০ বৎসর বয়সেও সামান্য পাটিগণিতের অঙ্ক লইয়া সমাধানে প্রবৃত্ত হইতেন। পরে যখন এঞ্জিন লইয়া এত ব্যস্ত হইলেন যে শিক্ষকের বাড়ী যাওয়ার অবসর মিলিত না, তখন তিনি শ্লেটে অঙ্ক কষিয়া উহা শিক্ষকের বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন, যেন তিনি কষা অঙ্কগুলি শুদ্ধ করিয়া দেন এবং সমাধানের জন্য নূতন অঙ্ক শ্লেটের অপর পৃষ্ঠে সন্নিবেশিত করেন।

অবিরাম পরিশ্রম

অবিরাম পরিশ্রমের জন্য জর্জ প্রতিবেশীর বিস্ময়ের বস্তু ছিলেন। কয়লার খনিতে দ্বাদশ ঘণ্টা পরিশ্রমে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; ফলে সন্ধ্যায় তিনি আবার কাজে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বুট জুতা তৈয়ারী ও মেরামত করিতেন; ঘড়ী সারাইতেন, বোনাবস্ত্র হইতে নমুনা কাটিয়া রাখিতেন যাহাতে তাঁহার স্ত্রী স্বামীর পোষাক বাড়ীতেই তৈয়ারী করিতে পারেন। সাধারণ অপেক্ষা বেশী কৌশলের এমন কোন বিষয় তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না, যাহা দ্বারা সপ্তাহে অন্তত দুই একটি শিলিংও উপার্জিত হয়।

প্রথম সুযোগ লাভ

জর্জের বাড়ীর সন্নিকটে, নিউক্যাসলের অনতিদূরে কিলিংওয়ার্থে একটি পাম্পিং ষ্টেসনের এঞ্জিন খারাপ হইয়া গিয়াছিল। উহা উক্ত স্থানে প্রায় বৎসরাবধি পড়িয়াছিল। জর্জ তৎকালে নিকটবর্তী খনিতে ব্রেক্‌স্ম্যানের কার্য করিতেন; তৎকালে তাঁহার বেতন সপ্তাহে এক পাউণ্ডের কিছু কম ছিল। কিলিংওয়ার্থ খনিতে যে সমস্ত লোক কাজ করিত, তাহারা অনেকে জর্জের পরিচিত ছিল; জর্জ তাহাদিগকে বলিলেন যে, তাঁহার মতে এঞ্জিন দোষযুক্ত; কিন্তু তিনি এই এঞ্জিন সারাইতে ও উহা দ্বারা সপ্তাহের মধ্যে খনির জল নিঃশেষ করিতে সমর্থ।

এই সংবাদ খনির কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তাঁহারা ষ্টিফেনসনকে তাঁহার গর্বপূর্ণ বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদনের সুযোগ দান করিলেন, কারণ তাঁহারা বহু চেষ্টা করিয়াও খনির জল নিষ্কাশন করিতে পারেন নাই।

জর্জ নিজে কর্মী পছন্দ করিয়া লইলেন; এঞ্জিনের বহু পরিবর্তন সাধন করিলেন এবং দুই দিনের মধ্যে খনির জল নিষ্কাশিত করিয়া দিলেন। ফলে স্থানীয় লোক এই

কার্যকে অলৌকিক শক্তির কাজ বলিয়া মনে করিল। কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া জর্জকে বেতন ব্যতীত আরও দশ গিনি পুরস্কার দান করিলেন। জর্জ জীবনে এত অধিক অর্থ ইতিপূর্বে দেখেন নাই।

এঞ্জিনে ধারাবাহিক গতি প্রদানে ষ্টিফেনসন

পরে যখনই এঞ্জিন খারাপ হইত, অমনি উহার মেরামতের জন্য জর্জের ডাক পড়িত। অবশ্য এঞ্জিনের দোষযুক্ত গঠনের জন্য উহা বার বার খারাপ হইত। ইহাতে অসাধারণ মনীষী জর্জের মনোজগতে যে অস্থিরতা এঞ্জিনে ধারাবাহিক গতি প্রদানের জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা এই এঞ্জিন মেরামতের মধ্যে অতিরিক্ত কাজ খুঁজিয়া পাইল। সৌভাগ্যের বিষয় ষ্টিফেনসন বিশিষ্ট সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং এই সাময়িক এঞ্জিন মেরামতের কাজ তাঁহার অবসর সময় গ্রহণ করিলেও ইহা তাঁহাকে ঠিক জীবিকা-নির্বাহ ও অর্থ সঞ্চয়রূপ ব্যাবহারিক কর্তব্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

পরবর্তী সুযোগ ও পুত্রের শিক্ষা

৩০ বৎসর বয়সে ষ্টিফেনসন যে খনিতে তিনি এঞ্জিন মেরামত করিতেন, তথাকার এঞ্জিন চালক নিযুক্ত হন। এই পদে তাঁহার বেতন হইল বার্ষিক ১০০ পাউণ্ড। তিনি ইতিপূর্বে যে সমস্ত অর্থ এইরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সবই সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা সবই ছিল গিনি। এই সময় সোনার দর বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি প্রত্যেকটি গিনি ২৬ শিলিং দরে বিক্রয় করেন। এই অর্থে তিনি পুত্র রবার্টকে নিউক্যাসলের উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন যাহাতে পুত্রের উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ হইতে পারে।

কিলিংওয়ার্থই পরে জর্জ ষ্টিফেনসনের কর্মক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইল; এই স্থানেই তাঁহার প্রতিভার মধ্যাহ্ন দীপ্তি বিকশিত হইয়াছিল। এই স্থানেই তিনি নবীনতম ধারণাকে কার্যে পরিণত করিবার উপযোগী উৎসাহ প্রাপ্ত হন; এই স্থানেই তিনি মনিবের প্রদত্ত অর্থে প্রথম চলন্ত এঞ্জিন তৈয়ারী করেন। এই স্থানে খনির স্বত্বাধিকারী ও কর্মচারীর মধ্যে এমন বহু হৃদয়বান্ লোক ছিলেন, যাঁহারা তাহাকে বিশ্বাস করিতেন; যদিও পৃথিবীর বহু লোক তাঁহাকে ভয়ানক ক্ষিপ্ত লোক বলিয়া আখ্যাত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

খনির রাস্তা ও চলন্ত এঞ্জিন

জর্জ ষ্টিফেনসন যে সমস্যার সমাধানে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে গেলে, আমাদিগকে তৎকালীন খনিপূর্ণ জেলার সাধারণত ব্যবহৃত রাস্তার কথা মনে করিতে হইবে। এই সমস্ত রাস্তায় প্রথমে কাঠ বিছান হইত; তদুপরি লৌহ রেল বিস্তৃত হইত এবং অশ্বের দ্বারা গাড়ীগুলি বাহিত হয়। এইরূপে গাড়ী গাড়ী কয়লা অতি সহজে খনি হইতে নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া চলিত, যাহা সাধারণ রাস্তায় বাহিত হওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ছিল।

ষ্টিফেনসনের প্রথম চলন্ত এঞ্জিন অত্যন্ত বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া নির্মিত হইল কারণ তাঁহার সাহায্যকারী ছিল কয়লার খনির কর্মকার যে তাঁহার আদেশ মত এঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ তৈয়ার করিয়াছিল। এঞ্জিনের গঠন-পারিপাট্য না থাকিলেও উহা তৎকাল পর্যন্ত নির্মিত যে কোন চলন্ত এঞ্জিনের অগ্রগামী ছিল এবং উহা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এই এঞ্জিনের নামকরণ করা হইল Blucher। ইহা দীর্ঘকাল কিলিংওয়ার্থে খনির রেলপথে কয়লা-বোঝাই রেলগাড়ী বহনে নিযুক্ত ছিল, যদিও ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম কাজে লাগান হয়।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় এঞ্জিন নির্মাণ করেন। ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে তৎকালে নিজে নিজে শিক্ষিত আবিষ্কারক আদিম যুগের এঞ্জিনে যে দুইটি মুলীভূত প্রণালী—নলের মধ্য দিয়া অবশিষ্ট বাষ্প বাহির করিয়া বংশীধ্বনি করা ও চালক-চক্রের সহিত সংযোজনকারী দণ্ডকে বহির্ভাগে গঠন—কখনও অদ্যাবধি কেহ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার পরবর্তীকালে নির্মিত সুপ্রসিদ্ধ এঞ্জিন "রকেটে" তিনি নলাকার বয়লার গঠনের প্রণালী

অবলম্বন করিয়াছিলেন, যদিও তিনি উহার মৌলিক আবিষ্কারক নহেন।

দীর্ঘকাল ষ্টিফেনসনের আবিষ্কৃত এঞ্জিন কিলিংওয়ার্থ খনিতে কয়লা বহনের কার্যে নিযুক্ত ছিল; কিন্তু তৎকালে অন্য কোন এঞ্জিনিয়ার এই বিষয় লইয়া ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নাই এবং সমগ্র দেশে ঐ একমাত্র চলন্ত এঞ্জিন কার্যে নিযুক্ত ছিল, বলা যায়।

অশ্ববাহী গাড়ী ও কাঠের রেলপথ

ষ্টকটন ও ডার্লিংটন রেলপথের নির্মাণের প্রস্তাব যখন গৃহীত হয়, তখন উহাতে অশ্ববাহিত গাড়ী ও কাঠের রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। ষ্টিফেনসন বন্ধুবর্গের ক্রোধ ও বিরক্তিকে উপেক্ষা করিয়া চলন্ত এঞ্জিন প্রচলনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কিন্তু বন্ধুবর্গ মনে করিতেন পীড়াপীড়ি না করিলেই তিনি ভাল করিবেন।

অবশেষে ষ্টিফেনসনের পীড়াপীড়িতে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের আইনে লিখিত হইল যে, চলন্ত এঞ্জিন ব্যবহার করা চলিবে। কিন্তু প্রথমে ডিরেক্টারেরাও ভাবিয়াছিলেন যে, উহাতে রেলপথের ভবিষ্য উন্নতি ব্যাহত হইবে। ষ্টিফেনসন বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড বেতনে এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইলেন। এইবার ষ্টিভেনসনের রেল নির্মাণের কার্য আরম্ভ হইল বলা যায়। তিনি এই নূতন রেলপথে কার্য করিবার জন্য তিনখানি চলন্ত এঞ্জিন তৈয়ারী করেন।

নূতন রেলপথ নির্মাণে ষ্টিফেনসন

ষ্টিফেনসন নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন কার্য করিতে পারিলেন না, ফলে ডিরেক্টারদের ভয় তাঁহাকে রেলপথের অংশবিশেষে অশ্ববাহন নিযুক্ত করিতে বাধ্য করিল। অশ্বটি গাড়ী কিয়দ্দূর টানিয়া লইয়া যাইত; পরে যখন গাড়ী রাস্তার ঢালু অংশে আসিত তখন অশ্বটিকে কম উচ্চতা বিশিষ্ট গাড়ীতে তোলা হইত ও উহা যাত্রিরূপে ঐ অংশ অতিবাহিত করিত। পরে যখন আবার সমতল অংশে গাড়ী আসিত, তখন অশ্বটিকে বাহির করিয়া গাড়ী টানা কার্যে ব্যবহৃত হইত। কোন কোন অশ্ব এই কার্যে এত অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, তাহারা চলন্ত গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিত।

লিভারপুল ও ম্যানচেষ্টার রেলপথ নির্মাণ ষ্টিফেনসনের পরবর্তী কার্য। এই স্থানেও তিনি ভীরু লোকদের জন্য সহজ সরলভাবে কাজ করিতে পারেন নাই। যখন গাড়ীর গতির কথা উঠিল, তখন ডিরেক্টারেরা ভয়ে ভয়ে বলিল যে, দশ মাইলের বেশী গতির কথা তুলিলে সমস্ত কাজ পণ্ড হইবে; সমস্ত দেশ ও পার্ল্যামেণ্ট তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।

এমন কি যখন তিনি রেলপথও নিজে নির্মাণ করেন তখনও ডিরেক্টারেরা সমগ্র পথকে বিভিন্ন ধাপে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক মাইলে স্থিতিশীল এঞ্জিন রাখিয়া উহা দ্বারা দড়ির সাহায্যে গাড়ী টানাইবার ব্যবস্থা করেন। শুধু ডিরেক্টারেরা কেন, জাতীয়খ্যাতিসম্পন্ন এঞ্জিনিয়ারগণও চলন্ত এঞ্জিন ব্যবহারের বিপক্ষে ছিলেন। ষ্টিফেনসন বলিলেন যে, তিনি নিজের কারখানায় ১৬খানা চলন্ত এঞ্জিন তৈয়ারী করিয়াছেন; কিন্তু কঠোরমস্তিষ্ক ব্যবসায়ীরা উত্তর করিল যে, চলন্ত এঞ্জিন ব্যবহার করা সম্ভব নহে, যেহেতু উহা বাঁক অতিক্রম করিতে পারিবে না, কারণ উহার গতি সোজা।

চলন্ত এঞ্জিনের সফলতা ও পুরস্কার লাভ

এই স্থলেও ষ্টিফেনসনের অত্যধিক আগ্রহ জয়লাভ করিল। লিভারপুল ও ম্যানচেষ্টার রেলপথের ডিরেক্টারেরা ৫০০ পাউণ্ডের পুরস্কার ঘোষণা করিলেন যে, যে চলন্ত এঞ্জিন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে ও ৫৫০ পাউণ্ডের মধ্যে উহার মূল্য হইবে, তাহাই উক্ত পুরস্কার লাভ করিবে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ষ্টিফেনসনের নিউক্যাস্‌ল্ কারখানায় নির্মিত "রকেট" এঞ্জিন এই পুরস্কার লাভ করে। এই পরীক্ষা কালে এই এঞ্জিন এক স্থানে ঘণ্টায় ২৯ মাইল বেগে চলিয়াছিল; তবে উহার সাধারণ গতি ঘণ্টায় ১৫ মাইল ছিল। কয়েক বৎসর পরে এই অদ্ভুত ক্ষুদ্র এঞ্জিন ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে চলিয়াছিল

ম্যানচেষ্টার রেলপথে Chat Moss নামক স্থানে সেতু নির্মাণ করেন; ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং বহু পূর্বে অসম্ভব বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।

রেলপথের সফলতা

প্রথম হইতে এই রেলপথ বিশেষ সফলতা অর্জন করিল। কোম্পানীর ডিরেক্টারেরা বেশী যাত্রীর আশা করেন নাই; তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন মাল-চলাচলে রেল-পথের লাভ হইবে, কিন্তু জনসাধারণ কোম্পানীকে বিস্মিত করিয়া নূতনভাবে স্থানান্তরে গমনে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিল।

ষ্টিফেনসন অনেক সময় বলিতেন যে, যদি তিনি সুযোগ পান, তবে তিনি দেখাইতে প্রস্তুত আছেন যে, হাঁটিয়া জুতা ক্ষয় করা অপেক্ষা চলন্ত এঞ্জিনের পশ্চাতে বসিয়া যাওয়া শ্রমিকদের পক্ষেও কম ব্যয়সাধ্য। অবশ্য তিনি নিজ জীবনে এই উক্তির সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

দেশের তৎকালীন অবস্থা ও রেলপথ

তৎকালে অন্য কোথাও চলন্ত এঞ্জিনবাহিত রেলগাড়ী ছিল না। ফলে দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে প্রতিনিধিগণ দলে দলে এই নবীন বিস্ময়কর বস্তু দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। প্রতিনিধিগণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, গাড়ীতে নরনারী পরস্পরের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ধাবিত হইতেছে! অথচ তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, যাত্রীরা মৃত্যু-পথযাত্রীর মত ভয়ে ভয়ে রেল গাড়ীতে যাতায়াত করিবে।

যখন ষ্টিফেনসন এই রেলপথ ও অন্যান্য রেলপথ নির্মাণের জন্য জরীপ কার্যে ব্রতী ছিলেন, তখন অনেক সময় দেশীয় লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বন্দুক ও গাঁতি লইয়া তাড়না করিত। কারণ তাহারা ঘোষণা করিয়াছিল যে, চলন্ত এঞ্জিনের শব্দে গরু ও ঘোড়া ভয় পাইয়া পলায়ন করিবে এবং কৃষিকার্য অসম্ভব হইবে;

অনেক জমির মালিক রেলওয়ের গৃহের জন্য গৃহীত জমির অধিক মূল্য পাইয়া বেশ বড়লোক হইয়া গেল; অথচ ইহারা রেলপথ নির্মাণে বাধা দিয়াছিল। সহরও দেখিল যে, রেলপথের সংযোগ না থাকায় তাহারা ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। ফলে সকলে রেলপথ নির্মাণে ব্রতী হইল। দেখিতে দেখিতে গ্রেটবৃটেনে রেলপথের বিপুল বিস্তার ঘটিল; অন্য দেশও গ্রেটবৃটেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। ফলে, হঠাৎ জর্জ ষ্টিফেনসন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রেলপথ-নির্মাতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। যেখানেই রেলপথের পরিকল্পনা চলিতে লাগিল সেখানেই ষ্টিফেনসনের ডাক পড়িতে লাগিল, এবং তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত চলন্ত এঞ্জিন সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইল।

লণ্ডন-বার্মিংহাম রেলপথ নির্মাণ

ষ্টিফেনসন যে সমস্ত রেলপথ নির্মাণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে লণ্ডন-বার্মিংহাম রেলপথ নির্মাণে তাঁহার কৃতিত্ব সমধিক পরিস্ফুট। এই রেলপথ নির্মাণে ষ্টিফেনসন তাঁহার পুত্র রবার্টকে কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই রেলপথ ১১২ মাইল দীর্ঘ; ইহাতে সেতু নির্মাণ, সুড়ঙ্গ তৈয়ারী প্রভৃতি সমস্ত কার্য করিতে হইয়াছিল। ইহাতে ২০,০০০ লোক ৫ বৎসর ধরিয়া খাটিয়াছে এবং যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইহা নির্মিত হয়, তাহাতে ইহা ইংল্যণ্ডে এঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময়রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল?

অন্যান্য রেলপথ নির্মাণ

ষ্টিফেনসন নিম্নলিখিত রেলপথগুলি নির্মাণ করিয়াছিলেন—ম্যানচেষ্টার লীড্‌স্ রেলপথ; নর্থ-মিডল্যাণ্ড রেলওয়ে; লীড্‌স্ ডার্বি রেলপথ; ইয়র্ক এণ্ড নর্থ মিড্‌ল্যাণ্ড রেলপথ; বার্মিংহাম ডার্বি রেলপথ ও শেফিল্ড রদারহ্যাম রেলপথ। ১৮৩৯ ও ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৩২০ মাইল রেলপথ জর্জ ষ্টিফেনসন তৈয়ারী করেন ও উহা মাল ও যাত্রী বহনের জন্য খোলা হয়। এই সমস্ত রেলপথ নির্মাণে আনুমানিক ১১০

সেফটি ল্যাম্প আবিষ্কার

ষ্টিফেনসন যখন কয়লার খনিতে কাজ করিতেন, তখন একবার খনিতে আগুন লাগে; তিনি নিজে খাঁচা নামাইয়া আনেন; উহা যখন খনির ভিতরে উপনীত হইল, মজুর-দল ঝড়ের মত উহা আক্রমণ করিল। তিনি সকলকে শান্ত করিয়া স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী আহ্বান করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হন। যেখানে আগুন লাগিয়াছিল সেখানে ষ্টিফেনসন স্বেচ্ছাসেবকগণের সহায়তায় দেওয়াল তুলিয়া আগুনের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করত খনিকে আগুনের হাত হইতে রক্ষা করেন।

তৎকালে মোমবাতি ও সাধারণ ল্যাম্প খনির কার্যে ব্যবহৃত হইত; ফলে বিস্ফোরণ নিত্য-ঘটনার অন্তর্গত ছিল বলা যায়। ষ্টিফেনসন এই দিকে আকৃষ্ট হইয়া রসায়নের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও "Geordie" সেফটি ল্যাম্প আবিষ্কার করেন। তিনি অন্ধকার খনিগর্ভে বিস্ফোরক বাষ্পের মধ্যে ঐ ল্যাম্প লইয়া পরীক্ষা করিতেন; যদিও তিনি জানিতেন যে, তাঁহার জীবন বিপন্ন হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, তথাপি তিনি পরীক্ষা করিতে ক্ষান্ত হইতেন না।

অবশেষে ল্যাম্প পূর্ণাবয়বে গঠিত হইল, এবং এই ল্যাম্পই সর্ব প্রথম খনিতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ঠিক এই সময় পৃথিবীখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার হামফ্রি ডেভি স্বতন্ত্রভাবে অনুরূপ সেফটি ল্যাম্প আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ষ্টিফেনসনকে সেফটি ল্যাম্প সম্পর্কিত পরিশ্রমের পুরস্কার দান করা হয়—নিউক্যাসলে তাঁহাকে ১০০০ পাউণ্ড প্রদান করা হইয়াছিল।

কয়লার খনি আবিষ্কার

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ষ্টিফেনসনের পুত্র রবার্ট লিষ্টার এণ্ড স্বানিংটন রেলপথে পিতার সুপারিশে এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন। রবার্টই এই রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ ও শেষ করেন। এই কার্যে যাতায়াতের সময় তিনি একটি জমি দেখিলেন যে, উহা বিক্রীত হইবে। তিনি উক্ত জমিতে কয়লা পাওয়া যাইবে মনে করিয়া তাঁহার পিতাকে দেখান। ফলে জর্জ ষ্টিফেনসন উহা ক্রয় করেন ও কয়লার খাদ খনন করেন। পরে উহা বিশেষ লাভজনক হইয়াছিল।

পিতার অনুরূপ পুত্র

জর্জ ষ্টিফেনসন তাঁহার পুত্র রবার্টের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। যখন তিনি সপ্তাহে ২।৩ পাউণ্ড উপার্জন করিতেন, তখনও পুত্রের শিক্ষার্থ অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পুত্রও বাল্যাবধি পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া চলন্ত এঞ্জিনের এঞ্জিনিয়াররূপে খ্যাতি অর্জন করে ও পিতার কার্য সুচারুরূপে চালাইতে থাকে।

ষ্টিফেনসনের প্রকৃতি

জর্জ ষ্টিফেনসন অত্যন্ত ব্যাবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি যাহা নিশ্চিতরূপে বুঝিতেন না, তেমন কোন পরিকল্পনায় হাত দিতেন না, নতুবা তিনি নিজে রেলপথ নির্মাণে ব্রতী হইলে অনেক বেশী লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি নিজে পরের অর্থে ধনবান্ হইবার আশা করিতেন না।

তিনি নিজে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি ও বহুবিধ ঐশ্বর্যের মালিক হইলেও সভাসমিতিতে নিজেকে সামান্য কারিগর বলিয়া উল্লেখ করিতেন—এমনই নিরহঙ্কার ছিলেন এই মনীষী।

অধ্যবসায় তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। বিশ বৎসর ধরিয়া তিনি অন্তর্বাণিজ্যে চলন্ত এঞ্জিন প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড অধ্যবসায়ই পরিশেষে জয়লাভ করিল এবং দেশে চলন্ত এঞ্জিন-চালিত রেলগাড়ী তাঁহার জীবদ্দশাতেই প্রচলিত হইল।

আজ অতীতের দিকে ফিরিয়া দেখিলে পৃথিবীর উপকারার্থ জর্জ ষ্টিফেনসনের দান তুলনাহীন বলিয়া প্রতিভাত হইবে। কিন্তু যশ ও ঐশ্বর্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি সমাজে মিশিতেন না; বলিতেন—সৌখীন লোকের দলে নিজকে কি মানাইয়া চলিতে পারিবেন না। কয়েকবার তিনি নাইট উপাধি

প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলিতেন যে, তিনি স্বীয় নামের আগে বা পরে কোন আলঙ্কারিক অক্ষর চাহেন না; তিনি জগতে জর্জ ষ্টিফেনসন নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছুক।

শেষ জীবন ও মৃত্যু

শেষ জীবনে তিনি রেলপথ নির্ম্মাণ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চুণের কারখানা ও কয়লার খনি তত্ত্বাবধান করিতেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তিনি রেলপথ নির্মাণের কোন কাজে আত্মনিয়োগ করেন নাই; পরন্তু দেশীয় ভদ্রলোকের জীবনযাপন করিতেন। তিনি উদ্যান-রচনা করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও নিজের গ্রীষ্ম-ভবনের উৎপন্ন দ্রব্যের গর্ব করিতেন।

তৎকালে যে সমস্ত শিল্পি-প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাদিগকে তিনি বিশেষ অনুরাগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেন, যেহেতু ইহাতে মজুরেরা আত্মোন্নতির সুযোগ পাইবে। তিনি অনেক সময় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিতেন। এই সমস্ত বক্তৃতায় তিনি তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেন, যেন তাহারা শিক্ষালাভের সুযোগ ত্যাগ না করে, শিক্ষা ও পরিশ্রমের দ্বারা নিজের কর্মকৌশল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে এবং বিঘ্ন যত বড়ই হউক না কেন, আরব্ধ কার্যে অধ্যবসায় অবলম্বন করে।

তিনি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, রেলপথের বিস্তারে ঘোড়ার ডাকের গাড়ী উঠিয়া গেল এবং দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ও সমৃদ্ধি বহু গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কারণ চলন্ত এঞ্জিনের রেলগাড়ীতে সস্তায় ও সুবিধায় মাল-চলাচল সম্ভবপর ছিল।

শেষ জীবনে তিনি অনেক সময় প্রথম জীবনের কর্মস্থলসমূহে পরিভ্রমণ করিতেন। একবার তিনি যে ক্ষেত্রে শীতকালে দৈনিক দুই পেন্স মজুরীতে শালগম তুলিতেন, সেই ক্ষেত্র দর্শনে গমন করিয়াছিলেন,—প্রথম জীবনের স্মৃতি তাঁহার নিকট এত মধুর ছিল!

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে চেষ্টারফিল্ডের নিকটবর্তী ট্যাপটন নামক স্থানে ৬৭ বৎসর বয়সে মহামতি জর্জ ষ্টিফেনসন পরলোক গমন করেন। তাঁহার দেহ চেষ্টারফিল্ডের ট্রিনিটিচার্চে সমাহিত করা হইয়াছিল।

জাতীয় সংবাদ

রায় গোপীনাথ সেন বাহাদুরের চিত্র-প্রতিষ্ঠা

বিগত ২৭শে আগষ্ট শুক্রবার অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকার সময় কলিকাতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের Issue Department অফিসে তত্রত্য কর্মচারি-সমিতির উদ্যোগে একটি সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর Sir J. B. Taylor মহোদয়কে সম্বর্ধনা ও ব্যাঙ্কের দেওয়ান রায় গোপীনাথ সেন বাহাদুরের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। সভায় বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ব্যাঙ্কের কেরাণীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং সকলের চিত্তবিনোদনের জন্য ঐক্যতানবাদন, সঙ্গীত, আবৃত্তি, ম্যাজিক এবং মিঃ Funnyman এর হাস্য-অনুকৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুধাকণ্ঠে একখানি সঙ্গীত গান করিয়া সভার উদ্বোধন করিলে ব্যাঙ্কের কর্মচারিগণের প্রদত্ত নিম্ন কবিতাটি পাঠ করা হয়—

লোকপালক মাননীয় দেওয়ান রায় গোপীনাথ সেন বাহাদুর
মহাশয়ের অবসর-গ্রহণকল্পে মর্মগাথা

করুণাপূর্ণ হৃদয়খানি পরের দুঃখে কাঁদিল প্রাণ
জগতে সত্য তুমিই মানব জগতে পূজ্য কত মহান্!
শৌর্যে বীর্যে অতুলন্ কর্মপথে কর্মবীর,
কর্ম-বাঁধনে ত্যাগ-সাধনে পরহিতব্রত করিলে স্থির।
অন্তরে ছিল পূর্ণ লক্ষ্য ধর্ম-সাধন কর্মপথে,
আজীবন তাই বুঝি প্রাণপণ লভিলে সত্য বরিয়া "সতে" ॥
"সৎ" যে কর্ম মিলায় ধর্ম কর্মই করে জীবকে "শিব,"
নশ্বর জীবের জীবন-পথে আত্মজ্ঞানই "মুক্তি-প্রদীপ" ॥
(সে) আত্মজ্ঞানের প্রতীক্ তুমি অসীম গুণের গুণমণি,
জীবনজয়ী হে বীর সাধক তোমার জয়ের উঠিছে ধ্বনি!
ছিন্ন করিতে কর্ম-বন্ধন "বিদায় কালে" পুরুষবর!
যত দিন সবে রহিব জীবিত ভুলিব না কভু স্নেহের কথা,
মহিমান্বিত হে মহাপ্রাণ তব প্রীতি-প্রেম-উদারতা।
কর্ম বহিবে কীর্তি তোমার, সুযশ ঘোষিবে বিশ্বপরাণ,
তব আদর্শ অন্তরে ধরি কর্মপথে হব আগুয়ান!
হে অন্নদাতা শিষ্টপালক অন্তরে তব ছিল না ছল;
বিদায়-পূজার নাহি অর্ঘ্য—অর্ঘ্য করেছি নয়নজল।
সেই জলে সবে করিব পূজা, ধরগো আজি পুরুষবর!
কর্মে বিদায়; রহিবে মর্মে আসন রেখেছি হৃদয়'পর!
রাজিবে চির মুরতি তোমার, লভিও শান্তি হইয়া অমর,
কৃত কর্ম আনিবে শান্তি যাচি বিভুপদে হও রাজ্যেশ্বর!!
যে ধর্ম পালনে হইয়া ব্রতী লভিলে আজি যে গুরুভার;
হে প্রভু মোদের বসি নিজাসনে ধর শিরে জয়মুকুট তাঁর!
শাসন-দণ্ড ধরি নিজ করে জয়ী হও এবে কর্ম-সমরে।
শান্তি আশা অটুট থাকুক মোদের জীবন উজ্জল করে!
শ্রীগুরুদত্ত আশীষ-বাণী বর্ম করিয়া লও তোমার!
হে শক্তিমান্ পুরুষপ্রধান গুরু-পদাঙ্ক কর গো সার।
ধর্ম-শক্তির পরশ মর্মে জাগরণ হয় জীবের কর্মে;
জীবের জীবন সার্থক হয় কর্ম পালনে সত্য ধর্মে।
সুযশ কীর্তি লভ গুরু সম শ্রীগুরু-করুণা লভ গো মহান্!
অমর হও ধর্ম পালনে ধর্মের রক্ষক নিজে ভগবান্।

তদনন্তর অনেকেই গোপীনাথ বাবুর জনপ্রিয়তা ও কর্ম-কুশলতার উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন। চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিবার পূর্বে সার জে বি টেইলার গোপীনাথ বাবুর কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরিশেষে রায় বাহাদুর সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, তাহার সম্মান তাঁহার অধস্তন কর্মচারিগণের সহায়তা এবং সহযোগিতার ফলস্বরূপ। তাঁহাদের সানন্দ এবং সাগ্রহ সমবেত সহযোগিতার জন্য তিনি সকলের নিকট

ও অবহিত হইতে উপদেশপ্রদান করেন। আমোদপ্রমোদ ও সঙ্গীতান্তে উপস্থিত সকলকেই জলযোগে পরিতুষ্ট করা হয়।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক্-সমাজ

বিজয়া-সম্মিলন

গত ২১শে কার্তিক রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় কলিকাতা প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটস্থ স্বনামধন্য এটর্ণি স্বর্গীয় নবীনচাঁদ বড়াল মহাশয়ের ভবনে সমাজের বার্ষিক বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সমাজের বহু সভ্য এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন এবং গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল (সুপ্রসিদ্ধ গায়ক স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের পুত্র) এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীযুক্ত বিষণচাঁদ বড়াল ও শ্রীযুক্ত রাইচাঁদ বড়াল সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীতাদির প্রচুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুমারী অঞ্জলি গাঙ্গুলীর প্রাচ্য নৃত্য, মিস মায়া ব্যানার্জি, মিস শিউলি সরকার প্রভৃতির সঙ্গীত, শ্রীযুক্ত আশুতোষ কুণ্ডুর স্বরদ বাদ্য প্রভৃতি সকলের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রথমে অরফিক ক্লাবের সভ্যগণ কর্তৃক ঐক্যতান বাদন হইবার পর শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সুধাকণ্ঠ সুরশিল্পী সুকণ্ঠে একখানি গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন সমাজের পক্ষ হইতে সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তদনন্তর পর্যায়ক্রমে নৃত্য-গীত-বাদ্য চলিতে থাকে এবং উপস্থিত সকলেই বিপুল আনন্দ অনুভব করেন। কুমারী কন্যাগণকে শ্রীযুক্ত কিষণ চাঁদ বড়াল এক এক খানি রৌপ্যপদক প্রদান করেন। সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দত্ত স্বরদ বাদককে একখানি পদক দানের প্রতিশ্রুতি দেন। পরিশেষে সকলকে জলযোগে পরিতুষ্ট করা হয়। শ্রীযুক্ত কিষণ চাঁদ বড়াল বহু পরিশ্রম সহকারে এবং বিপুল আগ্রহে সম্মিলনীর অনুষ্ঠান এবং সভ্যগণের মনোরঞ্জনের জন্য নিজ ব্যয়ে গীতবাদ্য ও নৃত্যাদি আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিয়া এবং সকলকে বংশোচিত বিনয়-ব্যবহারে আপ্যায়িত করিয়া সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

শোক-সভা

গত ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩৭ রবিবার, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে, ৬৩বি, নিমুগোস্বামী লেনস্থ (আহীরীটোলা) ৺গোপীনাথ জীউর ঠাকুরবাটীতে, সুবর্ণবণিক্-কুল-গৌরব স্বর্গীয় বলাই দাস শীল মহাশয়ের আত্মার প্রতি সম্মানার্থ, আহীরীটোলা পল্লীস্থ ব্যক্তিগণের উদ্যোগে, প্রায় তিন শতাধিক লোকের সমাগমে একটি সাধারণ শোক-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় কর্তৃক সময়োপযোগী নিম্নলিখিত উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইলে, সভার কার্য আরম্ভ হয়।

কে তুমি হে ত্যাগীবর !
এ ধরা-মাঝে এসেছিলে।
ছদ্মবেশে এসে তুমি,
(আজি) দীনের সাজে চলে গেলে ॥
দরিদ্র কুটীরে জনম ল'য়ে,
দুঃখ যাতনা আপনি স'য়ে ;
অনাথ জনের মরম ব্যথা,
(ওগো) প্রাণে প্রাণে তুমি বুঝেছিলে ॥
তাই বুঝি গো জীবন ভরি,
নিজ সুখ সাধ সব ত্যাগ করি,
স্বোপার্জ্জিত বিপুল অর্থ,
পরহিতে তুমি বিতরিলে ;
সুধামাখা কণ্ঠে করিয়ে গান,
তুষিতে তুমি গো সবার প্রাণ ;
শেষেতে করিয়ে সর্ব্বস্ব দান,
(তুমি) চির মনোসাধ মিটাইলে ॥
ধন্য ধন্য, তুমি হে ধন্য,
হে মহাজন ! হে বরেণ্য !
স্বরগ-ধামে নিত্য শান্তি,
লভ গো আপন পুণ্য ফলে ;
তোমার অমর মধুর স্মৃতি,
যেন গো হৃদয়ে জাগে নিতি নিতি

এই ভিক্ষা আজি, চাহি কর যোড়ে,
(মোরা) বিভুর চরণ-কমলে ॥

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শীল, বলাইবাবুর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন এবং আহিরীটোলা বঙ্গ-বিদ্যালয়ের সম্পাদক ডাঃ মাণিকচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়, বিদ্যালয়ে ৺বলাইবাবুর মাসিক ১০৲ হিসাবে সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহার নানা সদ্‌গুণের উল্লেখ করেন। সার হরিশঙ্কর পাল, কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র ধর বি ই, প্রমুখ বহু বক্তাগণ, বলাই বাবুর সাত্ত্বিক দানের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার আত্মার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করেন। কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ শ্রীপাট সপ্তগ্রামে অধিবেশন উপলক্ষে গমন করায় অনিবার্য কারণে অনুপস্থিতি জানাইয়া এবং ৺বলাইবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন উহা সভায় পঠিত হয়। মাননীয় সভাপতি মহোদয় তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতায় বলাইবাবুর অজস্র প্রশংসা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। পরিশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

৺বলাইবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আহিরীটোলা, ১৯নং বাবুরাম ঘোষ লেনস্থ একটি ক্ষুদ্র ভাড়া বাটিতে অতি দরিদ্রের সংসারে, সুবর্ণবণিক্ কুলে বলাইদাস শীল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এনগ্রেভিং কার্যে ও সঙ্গীত শিক্ষায় সুনিপুণ হইয়া ক্রমশঃ নিজ ঐকান্তিক চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হন।

বলাইবাবু চিরকুমার ছিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল। প্রথম প্রথম স্বদেশী যুগে বহু সাধারণ সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত বলাই বাবুর দ্বারাই গীত হইত। গ্রামোফোন রেকর্ডেও বলাইবাবু কয়েকটি গান দিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ডি এল রায় মহাশয়ের

অনেকদিন সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বলাইবাবু ব্রহ্মসঙ্গীতেরই আজীবন সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

তিনি শিশুকাল হইতেই দারিদ্র্যের সহিত সুপরিচিত থাকায় দরিদ্রের দুঃখ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী অতি কষ্টে অর্জিত শেষ কপর্দক পর্যন্ত যাবতীয় অর্থ, সুবর্ণবণিক্ সমাজের দরিদ্র ও অনাথ দুঃস্থগণের দুঃখমোচনার্থ এবং স্বজাতীয় দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণের বিনা বেতনে বিদ্যালাভের জন্য তাঁহার জীবদ্দশাতেই দফায় দফায় মোট ৪৩,৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ কলিকাতা ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির ইণ্ডিয়ান কমিটির কর্তৃপক্ষের হস্তে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দান করিয়া গত ৩রা ডিসেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

স্বর্গীয় বলাইবাবু সারা জীবন এত অদ্ভুতভাবে বিলাসিতা বর্জন ও সংযম সাধন করিয়াছিলেন যে, বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁহাকে কতকটা পাগল বা কৃপণ বলিয়া অনেকের ধারণা হইত। কিন্তু তিনি ছদ্মবেশীর মত নীরবে ও গোপনে দরিদ্রের দুঃখমোচন-ব্রতরূপ ধ্রুব লক্ষ্যের দিকে প্রতিমুহূর্তেই তাঁহার স্থির দৃষ্টি রাখিয়া, নিজের দৈনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা আদৌ না ভাবিয়া নৈষ্ঠিক কঠোর ত্যাগী সাধকের মত অতি দীনহীনভাবে সংসারে জীবন যাপন করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইতেন সে সমস্তই হাসিমুখে ও নিঃস্বার্থভাবে, একমাত্র কর্তব্য বুদ্ধিতে পূর্বোক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া হৃদয়ে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। দানবীর বলাইবাবুর ইহাই ছিল জীবনের সাধনা। তাঁহার মত আপন-ভোলা অদ্ভুত দাতা, এই ভোগ-সর্বস্ব সংসারে বড়ই বিরল। "দানের তুল্য ধর্ম নাই", এই মহাবাক্যের গূঢ় মর্ম তিনিই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

এ নশ্বর সংসারে দেহধারী মাত্রেরই তিরোধান অবশ্যম্ভাবী। বলাইবাবু তাঁহার জীবন-ব্রত-উদ্‌যাপন

বিচিত্র দানশীলতার অমর স্মৃতি এই পল্লীবাসী তথা সর্বজনসাধারণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা আন্তরিক প্রার্থনা করি, করুণাময় ভগবান্ তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন।

শোক-সংবাদ

চুঁচুড়া নিবাসী দুইজন স্বনামখ্যাত স্বজাতীয় খেলোয়ার অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন—একজন বলরাম গলি নিবাসী সন্তোষকুমার পাল (চুঁচুড়া টাউন ক্লাবের সদস্য) আর একজন মাধবীতলা নিবাসী বলাইচাঁদ দে (চুঁচুড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য)। উভয়েরই বয়স হইয়াছিল ৩৬ এবং এক মাসের মধ্যেই তাঁহারা স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ হউক।

চুঁচুড়া বড়বাজার নিবাসী কলিকাতার বিখ্যাত স্বর্ণব্যবসায়ী প্রসাদদাস সেন মহাশয় আর ইহলোকে নাই। বড়বাজারে বহু অর্থব্যয় করিয়া তিনি একটি সুন্দর স্নানঘাট নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মার কল্যাণ হউক।

মেদিনীপুর উত্তর রাঢ়ীয় স্বর্ণবণিক্ সমাজের প্রাচীন দলপতি শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ পাল মহাশয় সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে এক পুত্র, এক কন্যা ও পৌত্রী প্রভৃতি রাখিয়া গমন করিয়াছেন। তিনি জীবনে বহুবিধ ধর্মকার্য করিয়াছিলেন এবং স্বজাতীয় উন্নতির বিশেষ সহায়ক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে মেদিনীপুর একজন স্বজাতিবৎসল দলপতিহারা হইল। আমরা তাঁহার পুণ্যাত্মার অক্ষয় স্বর্গ কামনা করি।

BINAPANI BIDYA-NIKETAN, CHINSURAH SILVER JUBILEE

May I, on behalf of the Managing Committee of the school "Binapanj Bidya

contribution towards a suitable commemoration of the forthcoming Silver Jubilee of the school, by some urgent work of improvement of permanent nature, at a cost of about Rs. 3000/-

The school, with about 130 boys and girls, is **"one of the oldest and best of the kind in Chinsurah."** It was establishhd on the **5th February, 1915** and is **recognised** by the Education Department. This humble but useful institution is now on a sound and permanent footing being accommodated in a nice small building of its own, constructed according to a plan prepared by the Executive Engineer, Burdwan Division, on a plot of land acquired through the Government of Bengal, under Declaration No. 11390 L. A., of the 12th September, 1932. This building was opened on the 12th January 1936 by Rai S. B. De Bahadur in the immediate presence of Rai S. P. Ghose Bahadur, (District Magistrate of Hooghly) and other illustrious gentlemen.

It is pleasing that the school enjoys the confidence of the officials and the non-officials alike. Rai K. C. Ray Bahadur, Inspector of Schools, Burdwan Division, in his letter No. 688 of the 8th July, 1931, to the Director of Public Instruction, Bengal, observed that **'the school has been rendering great services.'** The school **'is one of the most well-managed'** thus observed Mr. S. P. Biswas (District Inspector of Schools, Hooghly). His successor Mr. P. N. Banerjee is also highly **'pleased'** with its working. Mr. S. W. Goode C I.E., I.C.S., (Commissioner, Burdwan Division and Chairman, Calcutta Improvement Trust) recorded that **'this is a most deserving institution'** while Mr. A W. Cook C.I.E., I.C.S. (Cammissioner,

was delighted with this '**flourishing**' school. Mr. P, C. De I.C.S., took '**much interest**' in it, while Mr. S. K. Haldar I,C.S., (District Magistrate of Hooghly) and Mr. J. N. Mitter (P. A.; Commissioner, Burdwan Division) were much pleased for its '**useful work**'. Rai M. C. Mitra Bahadur C.I.E., Mr. Harihar Set, Rai S. C. Mukherjee Bahadur, Mr. P. D. Mallik, Mr. T. N. Mukherjee M.B.E., and others '**keenly appreciated its usefulness**' and remarked that it '**deserves every sympathy and support**'. Mr. D. MacPherson I.C.S., (Dittrict Magistrate) observed that the school is '**doing excellent work**' and appreciated the '**laudable**' object of the proposed extension of the school-building and of getting some open space of land. Among others Mr. A. S. Larkin I.C.S., and Rai S. P. Ghose Bahadur also patronised the school.

A fund has just been opened for a suitable commemoration of the forthcoming Silver Jubilee by some urgent work of permanent improvement and Mr. L. B. Burrows C.B.E., Commissioner of the Burdwan Division and an ever-sympathetic patron of the institution, has kindly sanctioned in his letter No. 2377 L. S. G. of the 7th October, 1937, a sum of Rs. 100/- for purpose of acquisition of a plot of land for play ground, for which a formal proposal has already been forwarded to the educational authorities through the District Inspector of Schools.

And may I now respectfully appeal to your generosity to extend your patronage with a kind contribution for a successful commemoration of the forthcoming Silver Jubilee which will undoubtedly be a red letter day in the annals of this humble but most deserving institution. I sincerely pray that my fervent appeal will be generously responded to.

Any kind contribution will be most thankfully received and acknowledged by the undersigned.

Chowmatha Street,
Chinsurah,
Dist. Hooghly

Balai Chand Adhya
Honorary Secretary,
Binapani Bidya Niketan

পাত্র-পাত্রী সংবাদ

শিক্ষিতা, বয়স্থা, সুচিকার্যনিপুণা সঙ্গীতজ্ঞা, বনিয়াদী বংশীয়া পাত্রীর জন্য হৃদয়বান্, সংসাহসী, উপার্জনক্ষম পাত্র আবশ্যক। বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ আঢ্য
কর্ণেলগোলা, মেদিনীপুর

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক সমাচার

২২শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৪৪ সাল | ২য় সংখ্যা

স্বস্তি-বাচন

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

পাটলীপুত্রের মাঝে সুরধুনী পূর্ব-উপকূলে,
আত্মপর ভুলে,
অর্ঘ্য দিতে বাগ্দেবীর পুণ্য পাদমূলে,
হে প্রবাসী বঙ্গবাসী, সম্মিলিত আজ—
দীন হতে রাজ-অধিরাজ।
অব্যর্থ কুসুম-শরে যার
উচ্ছ্বসিত মহা পারাবার;
ধূর্জ্জটির ধ্যানভঙ্গ অতীতের কোলে
জাহ্নবীর মৃদু কলরোলে;
মহাতপা বিশ্বামিত্র বাঁধা পড়ে মেনকার ফাঁদে;
কোটি কোটি চাঁদে
আলো করে পদ-নখ যাঁর
মন্মথমোহন স্বচ্ছ প্রেম-পারাবার,
শ্রীরাধার প্রেমে হ'ল মদন-মোহিত
লাগি বিশ্বহিত।
সে মন্মথ-ফুলশর অব্যর্থ সন্ধানে
ভুলাইয়া জাতি-কুল-মানে
আকর্ষণ করিয়াছে দিক্-দিগন্তরে
প্রবাসের বাঙালীর অন্তরে অন্তরে।
সে শরের প্রবল আঘাতে
কম্প্রদেহে শিহরিত বাতে,
বাঙালার প্রান্ত হ'তে আসিয়াছি দরিদ্র ব্রাহ্মণ
করিবারে স্বস্তি উচ্চারণ।

মনে পড়ে দাঁড়াইয়া এই সভাতলে
একবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে মগধের পুণ্য কেন্দ্রস্থলে

বাণী-পীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের তরে
মিলেছিল বঙ্গবাসী প্রফুল্ল অন্তরে।
সেই দিন ধরাতলে 'পূর্ণেন্দু'র বিমল কিরণ
স্বচ্ছ স্নিগ্ধ স্নেহধারা করে বিতরণ।
লুপ্ত আজ পূর্ণ ইন্দু লোকালোক পর্বতের পারে,
মরতের আশারাশি যারে
পারিবে না ধরিতে কখন
সদা ক্ষুণ্ণমন।
'পূর্ণেন্দু' বিহনে ব্যথা করে নিবারণ
'মন্মথ' স্বজন ;
সঙ্গে আছে তাঁর
'প্রফুল্লচন্দ্রে'র রশ্মি উজলিয়া এ বিশ্ব-সংসার।
'প্রফুল্লচন্দ্রে'র বাণী প্রফুল্লিত করিবে হৃদয়
অন্তহীন সিন্ধু সম হেরি দূরে চাঁদের উদয় ;
অস্তাচলে যাত্রাকালে অভয়-নগরে
শেষ সম্বোধন তাঁর বাঙালীর ঘরে।

এই যে পাটলিপুত্র মগধের প্রিয় রাজধানী—
অন্তহারা অতীতের বুকে যার বাণী
মহাভারতের কোলে পেয়েছে আশ্রয়,
'গিরি-ব্রজপুর' নাম খ্যাত বিশ্বময়,
জরাসন্ধ-যজ্ঞস্থলে আপনি শ্রীহরি
উপনীত ব্রহ্মবেশ ধরি।

মগধের প্রান্ত হতে ফুটেছিল নির্বাণের বাণী
ত্যজি রাজ্য, ঐশ্বর্য-ভূষিত রাজধানী,
প্রিয়তমা পত্নী, পুত্র বালক রাহুল,
পিতা-মাতা ভুবনে অতুল,
যবে বুদ্ধ লভে সিদ্ধি নিরঞ্জনা-কূলে
বোধিদ্রুম-মূলে।
সে ধর্ম্মের প্রবল প্লাবন
হরেছিল একদিন এ বিশ্বের মন।

বাঙালা-মগধে মাখামাখি
ভাই বাঁধে ভ্রাতৃহস্তে রাখী ;

স্বপ্নময় অতীত কাহিনী
জাগায় হৃদয়-তলে স্মৃতির বাহিনী।

মগধের বিদ্যালয়ে বাঙালী শিক্ষক
নালন্দার বাণীপীঠে 'শীলভদ্র' অক্লান্ত রক্ষক,
যার যশ নিশীথের নীলিম অম্বরে
গ্রহতারা ঘোষে চরাচরে ;
প্রাচীমূলে উৎকুন্তলা উষা
পরি' ফুলভূষা
দিকে দিকে করিছে প্রচার
পাণ্ডিত্য-প্রতিভাময় যশোরাশি যাঁর।

বিক্রমশিলায়
আজও যশ গায়
প্রতিভার বরপুত্র দীপঙ্কর নাম—
গুণ-ধাম,
বাঙালার পল্লী-ক্রোড়ে লভিয়া জনম
মগধে লভিয়া ছিল সমাধি পরম।
প্রভাবে তাঁহার
শোভিল অরুণালোকে 'বিক্রমবিহার'।

আজও শুনি দেশে দেশে লোকে লোকে গায়
কভু হর্ষভরে, কভু দুঃখবেদনায়
জৈনাচার্য স্থূলভদ্র নাম—
অভিরাম ;
নিশীথের নদীকূলে সমীরের সনে
উচ্চারিত নাম ক্ষণে ক্ষণে ;
জোনাকীর চঞ্চল প্রভায়
যশোরাশি দিকে দিকে ধায়।

তারপর গয়াধামে নদীয়ার গোরা—
বাঙালীর হৃদিমনচোরা,
আবেশে অপূর্ব দৃশ্যে হ'ল আত্মহারা
বহে নেত্রে দরদর ধারা ;
গদাধর পাদপদ্ম-পাশে
সর্ব্ব অঙ্গে শিহরণ পুলক-প্রকাশে ;

মূর্চ্ছিত হইয়া বুঝি পড়ে ভূমিতলে,
লইল ঈশ্বর পুরী কোলে ;
হরিনাম-মহামন্ত্রে দীক্ষা লভে গৌরাঙ্গসুন্দর ;—
প্রেমের উদ্দণ্ড নৃত্যে কাঁপে ধরা—প্রশান্ত অম্বর ।

কোরাণ পড়িয়া হেথা 'শ্রীরামমোহন,'
দেশে আনে নব জাগরণ ।

'নিধু'র মধুর টপ্পা ছাপরা হইতে
নব সুরে ধরা দিল বাঙালীর চিতে ।

নাট্যকার 'দীনবন্ধু'-অমর-লেখনী
মগধের মাঝে বসি প্রসবিল 'কমলে-কামিনী' ।

'নবীনে'র বীণা-তারে গিরিব্রজপুরে,
অভিনব সুরে
ফুটিল কৃষ্ণের লীলা অমিয় ঝঙ্কারে,
'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্রে' নবীন আকারে ।

'তারকে'র 'স্বর্ণলতা' মগধের সীমান্ত হইতে
ঝঙ্কারে করুণ সুর বাঙ্গালীর চিতে ।

দেবভাষা-ছন্দ-পুষ্প করিয়া চয়ন,
পূজা করে 'বলদেব' বঙ্গভাষা-জননী-চরণ ।

ফল্গুতীরে দেখে "দ্বিজ" "মেবার পতন" ;
বিরচিল "দুর্গাদাস" অমূল্যরতন ;
দিল্লী-সিংহাসনে বসে অসামান্যা নারী—
জাহাঙ্গীর প্রাণমনোহারী—
"নুরজাহান" অলোকরূপসী—
স্বামিহন্তা বামে শোভে পূর্ণিমার শশী ।

আজি হেরি সভাতলে বাঙালার মনীষিমণ্ডলে,
ছায়াপথে জ্যোতিষ্কের দলে,
জাগে প্রাণে একি এ প্রেরণা—
নব উন্মাদনা,
জাহ্নবীর ছন্দে ছন্দে সে স্বর-লহরী
ছুটে যায় মর্ত্য পরিহরি,
উত্তরিয়া ব্রহ্মনদী কারণ-সাগর,
লঙ্ঘি যায় প্রশান্ত অম্বর ;
যেখানে বিরাজে ভূমা পরম মহৎ,
সৃষ্ট যাঁর এ বিশ্ব-জগৎ ;
আঁখি-কোণে ফুটে ওঠে লক্ষ লক্ষ তারা
ঢালে জ্যোতিঃধারা ;
আগম-নিগম-বেদ পুষ্পমালা চরণে যাঁহার,
সেই যজ্ঞেশ্বর হরি অসীম অপার
মোদের মিলন-যজ্ঞ পূর্ণ করি ভবে,
মাতাইয়া তুলিবেন অপূর্ব্ব গৌরবে ।

হে বাঙালি,
যাহারা মিলেছ আজি, অমিলিত রহিলে যাহারা,
এ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি লহ আজি সকলে তাহারা ।
ছন্দে-ছন্দে, লোকে-লোকে, দিবসে-নিশীথে,
এ মিলন-যজ্ঞবার্ত্তা হউক ধ্বনিত,
অনাহত অরূপ সঙ্গীতে ।*

* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের "পাটনা" অধিবেশনের প্রথম দিবসে পঠিত ।

সার জগদীশচন্দ্র বসুর তিরোধানে শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম্ বি এ এ, ও এ আর এফ্

মহাবৈজ্ঞানিক সার জগদীশচন্দ্র বসুর তিরোধানে সারা বৈজ্ঞানিক জগতে গভীর শোকের ছায়াপাত হইয়াছে। দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ এবং তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্র ও বন্ধুবান্ধব তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ বৈজ্ঞানিক, আর পাঁচজন সাধারণ বৈজ্ঞানিকের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। যে কএক জন মহাবৈজ্ঞানিক প্রকৃতির অন্তর-নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া লোক-লোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন তিনি ছিলেন তাঁহাদেরই এক জন, তিনি ছিলেন বাঙালী। বাংলা দেশের ঢাকা জেলার অন্তঃপাতি রাঢ়ীখাল গ্রামে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়, তাঁহার পিতা ছিলেন ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। শৈশবের শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন; ঐ সময়ে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে। এ দেশের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি বিলাতে গমন করেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের 'ট্রাইপোজ' ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর দেশে আসিয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কলেজেই তিনি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল অতিবাহিত করেন। এই কলেজই তাঁহার বিজ্ঞান-সাধনার কর্মক্ষেত্র ছিল। এইখানেই তিনি বিনাতারে সংবাদ আদান-প্রদানের সন্ধান পান, কিন্তু উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব ও আর্থিক অসুবিধার জন্য তাঁহাকে এই বিষয়ক গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে হয়। এই সময়ে ইতালি দেশের মার্কোণি নামক জনৈক বৈজ্ঞানিকও বিনাতারে বার্তা প্রেরণের কৌশল অবগত হন। এক দিকে ইতালির মার্কোণি যেমন বেতার-বার্তার আবিষ্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন, অন্যদিকে জগদীশচন্দ্রও পদার্থবিদ্যায় নব নব আবিষ্কার দ্বারা জগতে খ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জড় জগতের অন্তর্নিহিত রহস্য জানিবার জন্য তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত হন। জীবনের ধর্ম কি, জড় পরমাণু-সমূহ কি রূপে সংহত হইয়া প্রাণের সৃষ্টি করে, জীব-জগৎ ও জড় জগতের মধ্যে প্রাণের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য তিনি তপস্যায় নিযুক্ত হন। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি জড় জগতের প্রাণের স্পন্দন চাক্ষুষ দেখাইয়া দেন। কেহ কেহ বলেন তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ছিলেন তাহা সর্বজন-গ্রাহ্য হয় নাই। আমাদের মনে হয় এই সকল উক্তি কতকটা বিদ্বেষপ্রসূত। সত্যবটে তত্ত্ববিষয়ক কোন সিদ্ধান্তই কোন কালেই সর্বজনগ্রাহ্য হয় নাই, কিন্তু বিজ্ঞানের পরিদৃশ্যমান চাক্ষুষ প্রমাণগুলি সর্বত্রই সমাদৃত। যদি কেহ চাক্ষুষ দেখিয়াও বলেন—"নাঃ আমি ইহা মানিনা," তিনি কৃপার পাত্র। সুতরাং তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া তাঁহার সাধনা জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে নাই একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তিনি বিজ্ঞান-জগৎকে কি দিয়াছেন তাহারই আলোচনা করিব।

প্রকৃতির সন্তান আর্য্যঋষিগণ জীবন-প্রভাতে প্রকৃতির উপাসনা করিতেন। তাঁহারা ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে প্রকৃতির প্রাণের সাড়া উপলব্ধি করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া ছিলেন :—

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩।১৪।১)

এই সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে, এবং অন্তে তাঁহাতেই নিলীন হইবে। আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি এগুলি বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব যিনি উপাসক, তিনি

কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা অনুরাগ-ভাবাপন্ন না হইয়াই উপাসনা করিবেন।" তা'র পরে ঋষি-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

"প্রাণঃ ব্রহ্ম"

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৪।১০।৫)

"প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।" পৌরাণিক যুগের ঋষিগণ বৈজ্ঞানিক সাধনায় আরও উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহারা তাঁহাদের বিজ্ঞান-সাধনার ফল রূপকের আবরণে পুরাণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী বিজ্ঞান-সাধনার একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থে বিশ্বের আদিভূত এক মহাশক্তিকে দেবী কল্পনা করিয়া তাঁহার চরিত বর্ণনা করা হইয়াছে; তাঁহাকে বলা হইয়াছে, "আধারভূতা জগতস্তমেকা মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি"; তাঁহাকেই বলা হইয়াছে "ত্বয়ৈব ধার্য্যতে জগৎ"। এ সকলই তত্ত্ব বিষয়ে সত্য। জাগতিক বিষয়-বস্তুর মধ্য দিয়া আমরা এ সত্য উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু চাক্ষুষ দেখিতে পাই না। ইংল্যণ্ডের মহাবৈজ্ঞানিক সার আইজাক নিউটন জগদ্ধাত্রী এক মহাশক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন; ঐ শক্তি অন্ধ-জড়, কিম্বা চৈতন্যময়ী প্রাণময়ী, সে সম্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণের উপরে সে চিন্তার ভার দিয়াছিলেন।

মানব-জীবনের সহিত উদ্ভিদ্-জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জগদীশচন্দ্র তদ্বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। জীব যখন কোন বাহিরের আঘাতে আহত হয় তখন সে নানা রূপে সাড়া দিয়া থাকে, যদি কণ্ঠ থাকে চীৎকার করে, যদি মূক হয় তবে হাত পা নাড়ে; নয়ত অঙ্গবিক্ষেপ করে। চেতন রাজ্যের বাহিরে বাক্যহীন বেদনা আছে কি না জানিবার জন্য তিনি যন্ত্র সহযোগে বৃক্ষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাকে আঘাত করিয়া, তাহার দেহে বিষ প্রয়োগ করিয়া, তাহার জীবনের সাড়া, তাহার প্রাণের স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ লিপি বৃক্ষের স্বলিখিত—স্বাক্ষরিত। ইহাতে একমাত্র যন্ত্র ব্যতীত মানুষের কোন হাত ছিল না। প্রত্যেক অনুকূল, প্রত্যেক প্রতিকূল ঘটনার ছাপ, তাহার সহিত আলো ও অন্ধকারের ক্রীড়া, তাহার উপর পৃথিবীর টান ও ঝটিকার আঘাত, কতবিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, কত প্রকারের আঘাতের কত প্রকারের সাড়া তিনি তাঁহার স্ব-উদ্ভাবিত, স্বদেশের কারিগর দ্বারা নির্মিত তরুলিপি-যন্ত্রে, স্পন্দন-লিপি-যন্ত্রে, কুঞ্চনমান ও বৃদ্ধিমান-যন্ত্রে গ্রহণ করিয়া বৃক্ষের জীবন-কাহিনী অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই সকল যন্ত্রের কোন কোনটি এত সূক্ষ্ম যে, এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ সময়ের ঘটনাও তাহাতে লিপিবদ্ধ হয়। বৃক্ষের জীবন-কাহিনী অধ্যয়ন করিয়া তিনি প্রচার করেন, 'বৃক্ষ জীবন যেন মানব জীবনেরই ছায়া।*

তিনি একটি স্পর্শকাতর লজ্জাবতী লতা ও নৃত্যশীল বন চাঁড়ালের গাছ লইয়া সমগ্র সভ্য জগৎ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যখন যেখানে গিয়াছেন সেই খানেই বৈজ্ঞানিক সমাজের সম্মুখে তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে বিস্মিত করিয়াছেন।

তিনি জড় বস্তুর প্রাণের গোপন সাড়ারও সন্ধান লইয়াছিলেন। তিনি যন্ত্রযোগে দেখাইয়া দিয়াছেন মানবদেহে এক বিন্দু নাইট্রিক অ্যাসিড দিলে তাহার পেশিসমূহে যে প্রকার আক্ষেপ উপস্থিত হয়, একখণ্ড স্বর্ণ বা লৌহেও একবিন্দু নাইট্রিক অ্যাসিড দিলে ঠিক তদ্রূপ আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ ঘটে; মানব-দেহ যেমন বেদনা অনুভব করে জড় দেহও ঠিক তেমনই বেদনা অনুভব করে। ইহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাধনা, এই সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। জীব-জগৎ, উদ্ভিদ্-জগৎ, জড়-জগৎ একই প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছে। অতঃপর আমরা উপনিষদের ভাষাতেই বলিতে পারি:—

"ওঁ যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ।" (ছান্দো-

* জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার এই সকল উপকরণ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতি রূপে পঠিত তাঁহারই অভিভাষণ হইতে সঙ্কলিত।

গোপনিষদ্ ৫।১।১) "ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে প্রাণ বয়সে জ্যেষ্ঠ গুণেও শ্রেষ্ঠ। তাই যদি কেহ প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে তাহার উপাসনা করেন তাহা হইলে তিনি নিজেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন।" জগদীশচন্দ্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠজ্ঞানে প্রাণের উপাসক; তাই তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ।

জগদীশচন্দ্র কেবল বৈজ্ঞানিক ছিলেন না তিনি ছিলেন স্বাদেশিক, তিনি ছিলেন দানবীর। তিনি তাঁহার যন্ত্রপাতি বিলাতি কারিগর দ্বারা নির্মাণ করান নাই, এ দেশের কারিগর দ্বারা উহা প্রস্তুত করিয়া ছিলেন এবং স্বীয় মাতৃভাষায় উহাদের নাম রাখিয়া ছিলেন। বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে তিনি প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ-বাসরে সেদিন তাঁহার সহধর্মিণী পরলোকগত স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে বিভিন্ন সৎকার্য্যে আরও তিন লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা দান ঘোষণা করিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র সারা জীবন, অসামান্য প্রতিভায় জ্ঞানানুশীলন করিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞানের ও দানের গৌরব-জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ চির-ভাস্বর থাকিবে।

জগদীশচন্দ্রের তিরোধান আকস্মিক হইলেও অভাবনীয় নহে। তিনিই প্রকৃত সাধক ও তপস্বী যিনি মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করেন না। তিনি ছিলেন তপস্বী; তাপসের তিরোধানে শোক করিতে নাই। প্রকৃতির সাধক প্রাণের উপাসক জগদীশচন্দ্রের প্রাণ মহা-প্রাণে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি জগদ্বাসীর হৃদয়ে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর বিরাজমান থাকিবে। আমরা সকলে মিলিয়া সেই মহা-প্রাণের উদ্দেশ্যে সমস্বরে বলি—

জয় জগদীশ হরে!*

বেলা-শেষের গান

শ্রীযতীন্দ্রনাথ আঢ্য বিদ্যানিধি, সাহিত্যপুরাণরত্ন

তোমার চরণ তলে
আমারে অযোগ্য বলে
যদি বন্ধু না দাও আসন—
মন মোর না মেনে শাসন
যেতে চায় যদি ভুল পথে—
কেন তুমি পুনঃ ব্যথা হতে—
আশার আলোক প্রদর্শিয়া
পশ্চাতে টানিছ মায়া দিয়া?
নির্মম এ তব অভিমান
সহিতে রহিতে ক্ষুণ্ণ প্রাণ।
তোমার মলিন মুখ, কাতর নয়ন
অভিভূত করে মম মন।
হে প্রিয়, হে চপল সুন্দর,
নিঠুরতা কেন নিরন্তর?

বেলা-শেষে অপরূপ রূপ-গুণ লয়ে
কেবল কি মোরই পরাজয়ে
এসেছিলে স্নিগ্ধ মৃদু হাসিটুকু সহ?
প্রিয়তম সত্য কথা কহ—
যদি ঘৃণ্য, দীন, জরাজীর্ণে, দিতে ক্ষুণ্ণ সেবা-অধিকার
হে সখা আমার
কেন তারে দিলে আশা, ফিরালে পশ্চাতে?
পুষ্পমাল্য কেন লয়ে হাতে
অযোগ্যেরে করিলে আদর?
জানিতে বাসনা অতঃপর
কিশোরের উপাসক কবি একনিষ্ঠ সেবক যে হায়
প্রতি পলে ব্যর্থ করি তায়
কেন হেন কর নিপীড়ন?
হে দুর্লভ বৃথা এই ছলনা ভীষণ

---

* যশোহর পূর্ণিমা-সম্মিলনে পঠিত।
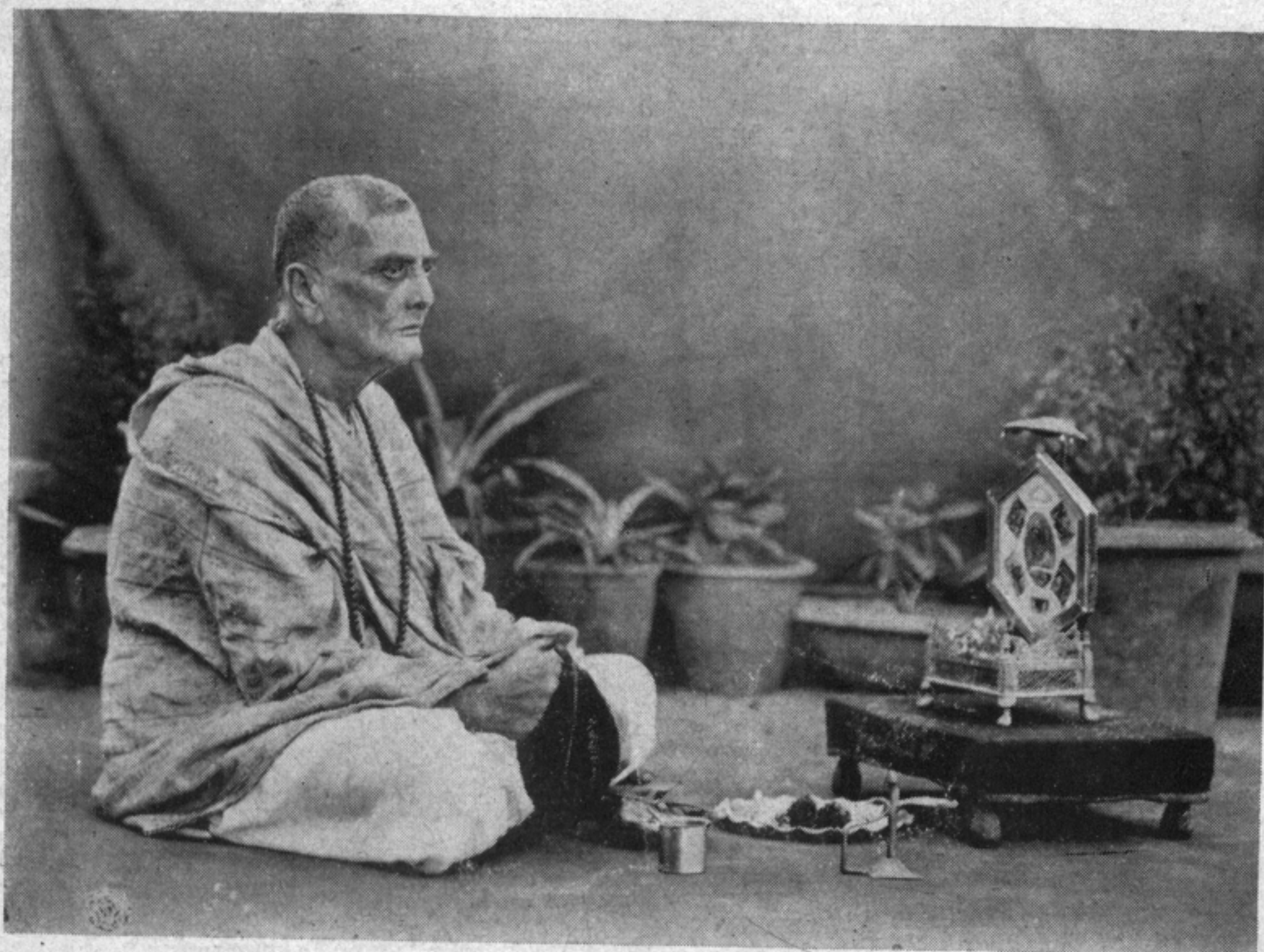
৺পান্নালাল মল্লিক

আর কেন আর কেন কর গো বান্ধব ?
তার চেয়ে শেষ হোক সব
দিবা-শেষে প্রজ্জলিত ছলনার আলো
নাহি লাগে ভালো ;
তার চেয়ে মৃত্যু দাও কর প্রত্যাখ্যান
বন্ধ হোক গান ;
তোমার উত্তরী-সঞ্চালনে
যে পবন জেগেছিল বনে
রিক্ত শাখা শ্যামল পল্লবে হয়েছিল সত্য সুশোভন
আজ তার নাহি প্রয়োজন ;
লুব্ধ প্রজাপতি সম ফুল হতে ফুলে
উড়ে উড়ে অজানার কূলে
যে মধুর করিছ সন্ধান ;
কণ্ঠে তব যার স্তুতি গান ;
জয় হোক্ সে ভাগ্যধরের।
বৃথা কেন অধমের—
যাত্রাপথে অভিযান-কালে
চন্দন-অলকা দিতে ভালে
মুগ্ধ কর, লুব্ধ কর, কর প্রতারণা—
তার চেয়ে স্পষ্ট সত্যে তারে খুলে বল
"করি তোরে ঘৃণা"।
অসাধ্য-সাধক যাক্ ফিরে, ব্যর্থতায় চিরসাথী করে
কিবা আসে যায় তার তরে ?
তাহার পূজার মূল্য থাক, নয়ন ধারার মূল্য নাই—
আশা তার করে দাও ছাই !
বিদায়—বিদায় দিয়ে তারে—
সুখী হও তারে লয়ে, প্রাণ চাহে যারে বারে বারে।

৬পান্নালাল মল্লিক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ

১১৭৬ সালের ২৬শে চৈত্র পান্নালাল মল্লিক মহাশয় তাঁহার মাতামহ সিংহবাহিনী মল্লিকবংশের অন্যতম কৃতী সন্তান ৬রামসেবক মল্লিক মহাশয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পান্নালাল বাবু জোড়াসাঁকোর ঘড়ীওয়ালা বাটীর প্রতিষ্ঠাতা ৬আশুতোষ মল্লিক মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন, বাল্যে বা যৌবনে তাঁহাকে দেখিলে ইয়োরোপীয়ান বলিয়া ভ্রম হইত। তাঁহার মাথার কেশ পর্যন্ত স্বর্ণবর্ণের ছিল।

পান্নালাল বাবু ধনিঘরের রূপবান্ পুরুষ হইলেও "নির্গন্ধাঃ ইব কিংশুকাঃ' ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই অনেক সদ্গুণ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তখন হইতেই, তাঁহার আত্মীয়স্বজন অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল; যে ঐ বালকের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে" এই মহাবাক্য তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা চলে। এই মল্লিক বংশের তখন উন্নতির চরম সীমা,—ধনে, বিনয়ে, পদমর্যাদায় কেবল কলিকাতায় নয় সারা বাংলার মধ্যে তাঁহারা বিখ্যাত ছিলেন। সেই সময় জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াও, তিনি বিলাসী হয়েন নাই। তাঁহার বাটীর অন্যান্য সমবয়স্ক বালকগণ যখন খেলায় মত্ত থাকিত, তখন পাছে কেহ পড়াশুনায় বিরক্ত করে এই ভয়ে, তিনি নির্জন ছাদে ঘড়ীর ঘরে একাকী বসিয়া নিজের পাঠাভ্যাস করিতেন। পাঠে তাঁহার অনুরাগ ছিল অসীম। এণ্ট্রান্স পাশ করিরা তিনি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেন, যখন তাঁহার পাঠ-লিপ্সা বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন তাঁহার চক্ষুপীড়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাঁহার চক্ষের পীড়ায় অল্প বয়স হইতেই তিনি মাঝে মাঝে

বিশেষ কষ্ট পাইতেন, সেইজন্ম তাঁহার স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে লেখাপড়া চিরকালের জন্য স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার অভিভাবক আত্মীয়গণও তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতেন। এই সকল পারিপার্শ্বিক বাধাবিঘ্নের কারণ ফাষ্টআর্ট পাশ করিয়া বি এ পরীক্ষায় প্রথমবার অকৃতকার্য হইতেই তাঁহার লেখাপড়া স্থগিত রাখিতে হয়। নচেৎ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া জীবনে উন্নতি করিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁহার কলেজের সহপাঠী বিচারপতি সি সি বোস, শ্রীযুক্ত স্মরেন্দ্রনাথ মল্লিক, সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সকলেই বঙ্গদেশের কৃতী সন্তান। তিনি যদি তখনকার দিনের তাঁহার পারিবারিক বাধানিষেধের আবেষ্টন উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন তাহা হইলে তিনিও বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিতে পারিতেন। তাঁহার উৎসাহ, কর্মশক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি—কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু কর্মজগতের পরিবর্তে তাঁহাকে ধর্মজগৎ সমধিকভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। কলেজে পড়ার সময় তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক রো সাহেব, টনি সাহেব প্রভৃতির চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের গৃহে তিনি যাইতেন ও তাঁহারাও পান্নালাল বাবুর বাটী আসিয়া তাঁহার পাঠ-কার্যে সহায়তা করিতেন। তাঁহার সরল ব্যবহার অতি বাল্যকাল হইতেই অপরিচিত ব্যক্তিকে তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু করিয়া তুলিত। এই ব্যবহার তাঁহার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সমান ভাবে ছিল। তাঁহাকে কলেজ ছাড়িতে হইলেও তিনি পাঠাভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই, সৎ বা ধর্মগ্রন্থ পাইলেই তাহা পাঠ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

সাধারণের সেবা করিবার সুযোগ তিনি ১৮৯৯ সালে একবার পাইয়াছিলেন। সেই সময় রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের অনুরোধে তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্বাচিত হন। সে সময় যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন সকলেই তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহাদের পারিবারিক অশান্তি, পার্টিশন ও বৈষয়িক কার্যে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। এই সময় তিনি তাঁহার বাল্যের ও যৌবনের আবাসস্থান ঘড়ীওয়ালা বাটী ছাড়িয়া, মাণিকতলা মল্লিকস্ লজে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি এই সময় একবার মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হইবার উদ্যোগ করেন কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় ৺গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ও পান্নালাল বাবুর সহপাঠী উপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে দ্বন্দ্বক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া উপেনবাবুকে বিনাবাধায় নির্বাচিত হইবার সুযোগ দেন। ৺সার গুরুদাস বাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"আমি তোমার পিতৃবন্ধু, তুমি এ বিষয় কিছুই জান না, এবং তোমার পিতা অসময়ে আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন তাই উপেনের সহিত তোমার বন্ধুত্বে আমি যথেষ্ট আনন্দ লাভ করি।"

পান্নালাল বাবু "মাণিকতলা করদাতা সমিতির" সহকারী সভাপতি বহু বৎসর ছিলেন এবং পল্লীর উন্নতি বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতেন। একবার যখন মাণিকতলায় অত্যন্ত কর বৃদ্ধি হয় সে সময় করদাতা সমিতিকে তিনি করবন্ধ করিতে পরামর্শ দেন, অবশ্য তখন মাহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের কথা কেহই জানিত না। ভয় যে কি বস্তু তাহা তিনি জানিতেন না। আলস্য বা দীর্ঘসূত্রতা, তাঁহার মধ্যে কেহ কখনও দেখে নাই। মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটি যখন কলিকাতার সহিত যুক্ত হয় তখন তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সাক্ষ্যই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া সংবাদপত্রাদিতে আলোচিত হইয়াছিল।

সুবর্ণবণিক্ সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা বড় কম ছিল না। কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের ১৯২৬ সালের বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় নিখিল বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর ত্রয়োদশ অধিবেশনে তাঁহাকে সভাপতি করা হয়। তাঁহার অভিভাষণ কেবল চিত্তাকর্ষক হয় নাই তাহাতে কর্মের এমন প্রবল প্রেরণা ছিল যে, তাহার অকাট্য যুক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রদ্ধেয় ৺গোকুলচাঁদ বড়াল প্রমুখ মহোদয়গণ

গ্রহণ আন্দোলন চালাইতে পারিয়াছিলেন। হয়ত অনেকে জানেন না যে, তাঁহার অভিভাষণে, সুবর্ণবণিক্ শিক্ষিত যুবকদিগের ইয়োরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া উচ্চ-শিক্ষা বা বিজ্ঞান-শিক্ষা লাভের ব্যয় বহনের জন্য ওভার সিস্ ফাণ্ড পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং সেই কল্পনা যাহাতে কার্যকরী হয় তাহার জন্য তাঁহার নিকট সমাজের বিশিষ্ট দুইজন নেতা ১০,০০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় সুযোগ্য কর্মীর অভাবে তাঁহার এই মহৎ কল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই।

তিনি বিদেশ ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার আজকালকার বাবুদের মতন 'চেঞ্জে' যাওয়ার বাতিক ছিল না কিন্তু তিনি যে কত তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। ভারতবর্ষে এমন কোনও তীর্থস্থান নাই যেখানে তিনি গমন করেন নাই। বৃন্দাবন, পুরী, বেনারস, বৈদ্যনাথধাম প্রভৃতি নিকটস্থ তীর্থস্থান ১০।১২ বার তিনি দর্শন করিয়াছেন। আজকাল দুর্গম প্রদেশেও যাতায়াত সহজ হইয়াছে বটে কিন্তু তিনি যে সময়ে তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন তখন সে সব স্থানে যাইতে হইলে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইত। ৺দ্বারকাধামে যাইবার পথে তখন রেলগাড়ী হয় নাই, ৩।৪ দিন গরুর গাড়ী করিয়া দুর্গম মরুপ্রদেশ অতিক্রম করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল কিন্তু শ্রীভগবানের বিগ্রহ দেখিবার আগ্রহে তিনি সে সব কষ্টদুঃখ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তাঁহার "বদরীকাশ্রম যাত্রীর ডায়েরী" ও "পশুপতিনাথ দর্শন" প্রভৃতি অভিজ্ঞতালব্ধ বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ "সুবর্ণবণিক্ সমাচারে" প্রকাশিত হইয়াছিল। কাশ্মীর ভ্রমণ ও অমর-নাথ তীর্থ দর্শনের ইচ্ছা বহু দিবস হইতেই তাঁহার ছিল কিন্তু উপযুক্ত সঙ্গী অভাবে তাহা কার্যকরী হয় নাই। এই বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর কেবল ৭ দিন পূর্বে তিনি কাশ্মীর ও অমরনাথ তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসেন। এই বৃদ্ধ বয়সে ঐ দুর্গম তীর্থস্থানে যাইতে তাঁহার পুত্র-কন্যারা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতা ও প্রবল আগ্রহে তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া যাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সঙ্গিগণ পথে অসুস্থ হওয়ায় মাত্র ৮।১০ মাইল দূর হইতে তাঁহাকে অমরনাথ দর্শন না করিয়া ফিরিতে হয়। তাঁহার এক সঙ্গীর ১০৩° ডিগ্রি জ্বর হয় এবং তিনি বলেন—"এই বরফের উপর ঠাণ্ডায় আর অগ্রসর হলে আমি মারা যাব"—একথা শুনিয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হয়।

তাঁহার ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দুঃখীর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল এবং তাহাদিগকে অযাচিতভাবে দান করিতেন। তীর্থস্থানে শ্রীভগবানের মন্দিরে ও তীর্থ-পাণ্ডাদিগকে তিনি প্রভূত দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুঃখি-ব্রাহ্মণের প্রতি নিস্বার্থ দান ও নিভৃতে দীন-দুঃখীর দুঃখমোচন সাধারণ লৌকিকদানের অপেক্ষা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য ছিল। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইতেই তিনি বৈষয়িক সকল কাজ তাঁহার ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া ধর্মকার্যে সময় যাপন করিতেন। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি প্রভুপাদ নীলকান্ত গোস্বামী প্রমুখ মহাত্মাগণের নিকট ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতেন। প্রত্যহ তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মপুস্তক পাঠ করিতেন; পরে সূর্যোদয় হইলে বাটীর সংলগ্ন বাগানে নিজ হস্ত-রোপিত পুষ্প-বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিরা ছাদের উপর তাঁহার নিভৃত সুসজ্জিত ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিতেন। তথায় দেবতার গৃহমার্জন, পূজা ও পাঠে প্রায় বেলা দশটা অবধি যাপন করিয়া পরে জলগ্রহণ করিতেন। তাঁহার এইরূপ ধর্মকার্য বাটীর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের নিকট ধর্ম-জীবনের উদাহরণরূপে রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার নিকটতম আত্মীয়-বন্ধুগণকে উপদেশচ্ছলে বলিতেন—"আর কেন, লোহার সিন্দুকের চাবি ছেলেদের হাতে দিয়ে একটু ধর্মকার্য কর, টাকা টাকা করে পাগল হয়ে গেলে টাকা কি তোমার সঙ্গে যাবে?" বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার এক আত্মীয় সেই অবধি প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে সন্ধ্যা অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করেন। শেষ বয়সে অর্থের উপর তাঁহার দারুণ বিতৃষ্ণা হইয়া গিয়াছিল। এই কালের এই অর্থলিপ্সার দিনে অর্থে তাঁহার অনাসক্তি

তাঁহার মাতৃভক্তি অসীম ছিল। অল্প বয়সে তিনি পিতাকে হারাইয়াছিলেন, ফলে মাতাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বহুবার আবেগপূর্ণ স্বরে বলিয়াছেন—"আমার মা'র মতন মানুষ হয় না, হতে পারে না।" তিনি তাঁহার মাতৃ-আজ্ঞা ঈশ্বরের আজ্ঞার ন্যায় পালন করিতেন। তাঁহার মাতা যে সকল বিষয় নিষেধ করিয়া গিয়াছেন তাহা মৃত্যুদিন পর্যন্ত পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অনন্যসাধারণ মাতৃভক্তিই তাঁহাকে এত সরল, বিনয়ী ও ধর্মকার্যে উন্নতি দান করিতে সমর্থ হইয়াছে। শেষ চার পাঁচ বৎসর তাঁহার নিজ গৃহদেবতার অন্নভোগই কেবলমাত্র তাঁহার আহার্য ছিল।

অমরনাথ দর্শনে ব্যর্থকাম হওয়ায় পান্নালাল বাবু অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছিলেন এবং নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই হঠাৎ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করেন। তিনি স্বহস্তে কাশ্মীর যাত্রা ও অমরনাথ ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন উহা যথাসময়ে "সমাচারে" প্রকাশিত হইবে। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে মাণিকতলা রেটপেয়ার্স অ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে নারিকেলডাঙ্গা সার গুরুদাস ইনষ্টিটিউটে এটর্ণি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এল সি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি শোকসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে পণ্ডিতপ্রবর রায় বাহাদুর গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গীতার একাদশ অধ্যায়োক্ত বিশ্বরূপ দর্শন পাঠ করিয়া মৃত মহাত্মার স্মৃতির তর্পণ করিয়াছিলেন এবং অনেকে বক্তৃতা করিয়া পান্নালাল বাবুর গুণকীর্তন করিয়াছিলেন। গত ২৪শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার তিনি পুত্র কন্যা ভ্রাতুষ্পুত্রাদি স্বজনগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সজ্ঞানে শ্রীভগবানের নাম করিতে করিতে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া নিজ সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

নূতন ও পুরাতন

শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ

নূতনেরা চারিধারে রাখে মোরে ঘিরে;
পুরাতন বলে—"ওরে আয় আয় ফিরে।"
নূতনের রাঙা রঙ মন-বীথিতলে,
জাগে যেন রবিকর স্ফুট শতদলে।
পুরাতন স্মৃতিটারে ভোলা নাহি যায়,
পিছু হতে টানে সে যে অরূপ ব্যথায়।
নবীন শোভন রূপে আপনার বলে,
গোপনে চরণ রাখে হৃদয়ের তলে।
অতীতের শত স্মৃতি মরমের গায়
মিশে রয় ছায়া সম শারদ জ্যোৎস্নায়।
স্মৃতির অথই জলে, ডুব দিয়ে মন
কি জানি কি খোঁজে কারে অরূপ রতন!
ঢাকিয়া রেখেছে কত অতীতের মায়া।
নূতনে মাতন লাগে মন-দরিয়ায়,
সেই স্রোতে পুরাতন ভেসে চলে যায়।
কি যে গেল, কতটুকু কে বুঝিবে তায়,
মনের শূন্যতা শুধু করে হায় হায়!
ভাষাহীন রিক্ত হৃদি রহি রহি কাঁদে
যুগ হতে যুগান্তরে বেঁধে মায়াফাঁদে।
নবীন জীবন মোরে টেনে টেনে চলে
কোন দূর অজানায় কত নব ছলে।
কেবা সেই, কোন জন, কিবা তার নাম,
কিছু তার মনে নাই—কতটুকু দাম।
তবু যেন মনে হয় কিছু কোথা ছিল—

ক্ষমা

শ্রীগুরুদাস রায়

"যাচ্ছি নির্মলা।"

"আচ্ছা, এসগে। আজ তোমার কটায় ছুটি ?"

"চারটেয়" বলে বিনয় হাতের 'রিষ্টওয়াচটার দিকে তাকিয়ে বল্লে,—"ওঃ, একটা বেজে গেছে, দেড়টার সময় ক্লাস।" বলে বেরিয়ে পড়ে।

কলেজে গিয়ে বিনয় মুহুর্মুহু ঘড়ির দিকে তাকায়। এক একটা ঘণ্টা যেন এক একটা বছর মনে হয়, তবুও কেটে যায়। বিনয় কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়ে। ছেলেরা সব তাকে ঘিরে ধরে বলে,—"আজ তোমার গেলে চল্‌বে না। এ মিটিংটায় তোমাকে থাকতেই হবে।"

মিনতিভরা দৃষ্টিতে বিনয় বলে—"না ভাই আজ আমি কিছুতেই থাক্‌তে পারব না, বাড়ীতে আমার কাজ আছে।"

তারা বলে—"রোজই তোমার কাজ থাকে, না? ও সব চল্‌বে না বাপু। তুমি গেলে আমাদের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে একটা কথা বল্‌তে পারে এমন কে আছে বল ? বেশি সময় তো নয়, মাত্র আধ ঘণ্টা, তাই তুমি অপেক্ষা করতে পার্‌বে না ?"

বিনয় বলে—"কি করে থাক্‌ব ? আমার যে কাজ !"

বিনয়ের হাত ধরে তারা বলে,—"আজ না হয় আমাদের কথাটা রাখ।"

"আজ আমাকে মাপ কর ভাই।" বলে বিনয় গিয়ে বাসে উঠে পড়ে।

* * *

"এর মধ্যেই উঠ্‌লে যে, আর পড়বে না ?"

"না, তোমার ঘুম পেয়েছে।"

"আমার ঘুম পেয়েছে তাতে তোমার কি ?"

একটু হেসে বিনয় বলে,—"বাঃ তুমি ঘুমিয়ে পড়্‌বে, তোমাকে মোটেই আদর করতে পারবো না।"

শ্লেষ-পূর্ণ স্বরে নির্মলা বলে,—"সারাদিন যে আদর কর তাতেও সাধ মেটে না ?"

"না" বলে বিনয় আলো নেবাতে যায়।

নির্মলা বাধা দিয়ে বলে,—"না পড়ার ক্ষতি করে আমায় আদর কর্‌তে হবে না।"

"আমার পড়ার কোন ক্ষতি হবে না।" বলে বিনয় আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্মলা ঘুমিয়ে পড়ে। বিনয় ডাকে,—"নির্মলা !"

নির্মলা একবার "হুঁ" করেই চুপ করে যায়।

বিনয় বলে,—"আচ্ছা নির্মলা, তুমি সারাদিন ঘুমোও তবু তোমার এত ঘুম পায়। আর আমি একটুও ঘুমোই না, তবু আমার মোটেই ঘুম পায় না।"

* * *

"বাঃ, বেশ সেজেছ তো, সত্যি আজ তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।" বলে বিনয় নির্মলার পাশে এসে বসে।

নির্মলা বলে,—"বারে, বস্‌লে যে! জামা-কাপড় ছাড়্‌তে হবে না ? আজ যে এত সকাল সকাল এলে ? তোমার আস্‌বার কথা তো ছিল সাড়ে তিনটায়। এখন তো মোটে দেড়টা।"

"তুমি সেজেছ বলে তাড়াতাড়ি এলুম।"

"আমি যে সেজেছি তা কি করে জান্‌লে ?"

"আমি যে আজ দেড়টার সময় আস্‌ব তা তুমি কি করে বুঝলে ?"

"তা তো আমি বুঝি নি।"

"না, বোঝ নি! তা হলে সাজলে কেন ?"

"এম্‌নিই, ইচ্ছে হল তাই।"

"সত্যি নির্মলা, তোমার এত ভাল ভাল কাপড় আছে, তবু তুমি পর না। কতদিন বলেছি, তাও পর না। আজ

পরেছ, কেমন স্নুন্দর দেখাচ্ছে। নির্মলা, রোজ এমনি ভাবে সেজে থাক্‌বে ; আমি কলেজ থেকে এসে দেখ্‌ব ; সাজবে তো ? আর যদি তুমি আমার কথা না শোন তবে কিন্তু আমার ভয়ানক রাগ হবে।”

“মোহনকে একটু দোকানে পাঠাতে হবে।”

“কেন ?”

“আজ যে বিশুদা আস্‌বে আমার সাথে দেখা করতে। তার জন্য কিছু মিষ্টি আনিয়ে রাখ্‌তে হবে না ?”

আনন্দের সাথে বিনয় বলে,—“তোমার বিশুদা আজ আস্‌বে ? অনেক দিন তোমার বিশুদাকে দেখি না। ওরে মোহন শুনে যা·········”

মোহন পয়সা নিয়ে মিষ্টি কিন্‌তে চলে যায়।

বিনয় বলে,—“কি করে জানলে যে, তোমার বিশুদা আজ আসবে ?”

“ফোনে বলেছে যে সে আজ দু’টার সময় আসবে।”

“যদি আমি আজ দেড়টার সময় না আস্‌তুম তবে তো বিশুর সঙ্গে আমার দেখাই হত না। সেই জন্যই বুঝি সেজেছ ? আমার বুঝি তোমায় এমনি দেখ্‌তে ভাল লাগে না ? আচ্ছা নির্মলা, বিশুদা তোমার কেউ নয়, তার জন্য এই রকম সেজেছ, আর আমি কতদিন বলেছি তাও সাজনি। সত্যি করে বল তো নির্মলা, বিশুদাকে তোমার বেশি ভাল লাগে, না আমাকে বেশি ভাল লাগে ?” বলে বিনয় হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে।

নির্মলা উত্তর দেয়,—“জানি না, যাও।”

বিনয় বলে,—“কিছু মনে কোনো না নির্মলা, ও আমি এম্‌নিই বললুম। ·········বাঃ এই যে বিশু। এস এস, বোস। সব ভাল তো ?”

“হাঁ ভাল” বলে বিশু একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে। নির্মলা মাথার কাপড় টেনে মুখ ঘুরিয়ে বসে।

বিনয় বলে,—“বিশুকে দেখেও আমার সাম্‌নে লজ্জা ? এ কিন্তু ভারী অন্যায় নির্মলা !”

কিন্তু নির্মলা সেই ভাবেই বসে থাকে।

অবাক হয়ে বিশু বলে,—“সে কি হয়। আপনি চলে যাবেন, আর আমি থাক্‌ব ?”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিনয় বলে,—“তুমি থাক্‌তে থাক্‌তেই আমি চলে আস্‌ব। এক ঘণ্টার বেশি আমার লাগ্‌বে না। আমার আজ একটা মিটিংএ যোগ দিতে হবে।” বলে সে বেরিয়ে যায়।

নির্মলা ঘোমটা ফেলে দিয়ে বিশুর পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে বলে,—“বিশুদা, আমাকে একেবারেই ভুলে গেছ !”

বিশু লজ্জিত হয়ে বলে,—“না, না ভুল্‌ব কেন ?”

“তবে এখানে এতদিন আসনি কেন ?”

“এম্‌নিই, হয়ত বা তুই আমাকে দেখে লজ্জা পাবি।”

নির্মলা লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু করে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলে,—“কি কর্‌ব বিশুদা, আমি পরাধীন। বিশুদা, তুমি একটা বিয়ে কর।”

বিশু উত্তর দেয়,—“আমি চিরকালই কুমার থেকে যাব।”

* * *

“বাঃ আজও তো বেশ সেজেছ ?” বলে বিনয় নির্মলার পাসে বসে পড়ে।

নির্মলা বলে,—“আজ আমি বিশুদার সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাব।”

“বেশ যেও, তোমার বিশুদা কখন আসবেন ?”

“চারটার সময়।”

বিনয় ঘড়ি দেখে বলে,—“আর মাত্র মিনিট দশ আছে। আমি এলুম, আর তুমি এখনই চলে যাবে ? বিশুদা এলেই তুমি যেও না, পাঁচটার সময় যাবে, কেমন ?” বলে সে মিনতিভরা দৃষ্টিতে নির্মলার দিকে তাকিয়ে বলে,—“দেখ, আজ একটা লেকচার মাটি করে, শুধু তোমার সাথে গল্প করব বলে এলুম। আর তুমি এখনই চলে যাবে ?”

বিশুর মোটর এসে গেটের সামনে দাঁড়ায়। বিশু

বিনয় বিষাদের হাসি হেসে বলে,—"আমার তো খুবই ইচ্ছে করে, কিন্তু কি করে যাই? আমি গেলে তো তোমার নির্মলার কিছুই দেখা হবে না, ঘোমটা দিয়ে বসে থাক্‌বে। একটু বোস।"

রিষ্টওয়াচ দেখে বিশু বলে,—"না ভাই বসবার টাইম নেই, চারটে বাজে, চল্‌রে নির্মলা।" বলে বিশু চল্‌তে থাকে। নির্মলা তার পিছু পিছু গিয়ে মোটরে উঠে, মোটর ছেড়ে দেয়, বিনয় হাঁ করে চেয়ে থাকে।

টং টং করে রাত্রি আটটা বেজে যায়। বিনয় বই রেখে ছাদের উপর চলে যায়, কিছুক্ষণ ছাদে ঘুরে আবার নেমে আসে। ঘরে ঢুকে একখানা উপন্যাস খুলে বসে। কিছুক্ষণ পড়বার পর তার আর ভাল লাগে না। সুইচ টিপে, বই তুলে রেখে শুয়ে পড়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুম আসে না, ঠাকুর অনেকবার খাবার জন্য ডাকতে এসে, ফিরে গিয়ে, শেষে বিরক্ত হয়ে, তার নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে নটা দশটা বেজে যায় তবু নির্মলা আসে না। বিনয় চিন্তিত হয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। একখানা ট্যাক্সি করে বিশুদের বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

বিশুর মা বলে,—"বিশু আর নির্মলা বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফিরে এসে থিয়েটার দেখতে গেছে, তাদের ফির্‌তে এগারটা হবে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিনয় বাড়ী ফেরে।

রাত্রি বারটা বেজে যায়। বিশুর গাড়ী এসে বিনয়ের বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়ায়। বিনয় তাড়াতাড়ি গেটের সামনে যায়, "গুড্ বাই" বলে বিশু গাড়ী ছেড়ে দেয়।

নির্মলাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বিনয় বলে—"সত্যি তোমার একটুও দয়া নেই, আমাকে এম্‌নি একলা ফেলে রেখে তুমি চলে গেলে………"

বিনয়ের কথা শেষ না হতেই নির্মলা নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ে।

বিনয় বলে—"বাঃ এখনই শুয়ে পড়লে যে, আমার যে

নির্মলা বলে—"যাও, তুমি খাওগে, আমার বড় ঘুম পেয়েছে।"

"তুমি খাবে না?"

"না, আমি বিশুদাদের বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি।"

"আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে আস্‌ছি, ততটুকু কাল তুমি জেগে থাক।"

নির্মলা পাশ ফিরে শুয়ে বলে,—"দেখ, তোমাকে আগে থেকেই বলে রাখছি, আজ রাত্রে আমাকে ঘুমুতে দিতে হবে। খেয়ে দেয়ে এসে যে বিরক্ত করবে তা হবে না।"

বিনয় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

* * * *

"বিশুদা হাজারীবাগ যাচ্ছে আমি তার সাথে যাব?"

বিনয় বলে,—"যেও, কদিন থাক্‌বে সেখানে?"

"বেশিদিন নয়, আমার শরীরটা একটু ভাল হলেই চলে আসব।"

"চল না, আমিও যাই; তোমাকে ছেড়ে আমার থাক্‌তে বড় কষ্ট হবে।"

"না, পড়া কামাই করে তোমার সেখানে যেতে হবে না। পরীক্ষা আস্‌ছে, এখন কিছুদিন একা থাক সেইই ভাল।"

বিনয় কিছু বলে না চুপ করে থাকে।

কিছুদিন পরে একদিন বিনয় বিষাদভরা মুখে হাওড়া ষ্টেশন থেকে বের হয়ে বাসে ওঠে।

* * * *

"এ তোর বড় অন্যায় নির্মলা, বিনয় এত করে বার বার চিঠি লিখ্‌ছে তাও তুই যেতে চাচ্ছিস্ না, কেন?"

"আমার তোমাকে বড় ভাল লাগে বিশুদা।"

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বিশু বলে,—"সংসারে অনেকেরই অনেককে ভাল লাগে। কিন্তু সংসারের নিয়ম মেনে চল্‌তে হলে অনেক সময়ই প্রিয়পাত্রকে ছেড়ে থাক্‌তে হয়। মনে দুঃখ করিস না নির্মলা, তুইও মরবি না, আমিও মরব না, মাঝে মাঝে দেখা হবেই। চল্ কালই তোকে

এস এস, বস। স্ত্রীর সাথে আলাপ কর, আমি আস্‌ছি।" বলে বিশু চলে যায়।

স্যুটকেশটা নামিয়ে রেখে বিনয় নির্মলার পাশে বসে পড়ে।

বিনয়ের প্রতি বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নির্মলা বলে,—"হঠাৎ, কলেজ কামাই করে চলে এলে যে?"

লজ্জিত ভাবে বিনয় বলে,—"আর থাক্‌তে পারলুম না নির্মলা, তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।"

"এই পনের দিন মোটে এসেছি, আমি এখন যাব না।"

মিনতি করে বিনয় বলে,—"এখন তুমি চল, আমায় আর কষ্ট দিও না। পরীক্ষা হয়ে গেলে আমি তোমায় হাজারীবাগ নিয়ে আস্‌ব। তোমার যতদিন ইচ্ছা থাক্‌বে, আমি কিছুই বল্‌ব না, আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি। তুমি এখন চল।" বলে জিজ্ঞাসু নয়নে নির্মলার মুখের দিকে তাকায়।

নির্মলা উত্তর দেয়,—"আমি এখন যাব না।"

"যাবে না?"

"না।" বলে নির্মলা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

হতভম্বের মত কিছুক্ষণ বসে থেকে বিনয় স্যুটকেশ নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে।

* * * *

"এটা কি তোমার উচিত হচ্ছে নির্মলা? তুমি তোমার স্বামীকে ছেড়ে আজ দেড় মাস হল এখানে আছো? তুমি যে কেন সেখানে যেতে চাইছ না, তা আমি বুঝি না। বাপ-মাকে ছেড়ে বিনয়ের কাছে যেতে পার্‌লে, আর আমাকে ছেড়ে বিনয়ের কাছে যেতে পার্‌বে না? তোমার কাছে কি আমি তোমার বাপমায়ের চাইতেও বেশী হলুম। এরকম করে তো তোমায় আর রাখতে পারি না। এবার তোমার কোন কথাই শুন্‌ব না। তোমাকে কল্‌কাতায় বিনয়ের কাছে দিয়ে আস্‌বো।"

নির্মলার চোখ জলে ভরে যায়। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় সে বলে,—"তুমি আমায় ভালবাস না বিশুদা, জান বিশুদা, তোমার জন্য আমি সব ছাড়তে পারি, ছেড়েছি। সব আশা ত্যাগ করে শুধু তোমার আশা কচ্ছি। তোমার কাছে ভালবাসা পাবার আশা কচ্ছি।"

"নির্মলা, তুই একি বলছিস্! তুই কি পাগল হয়েছিস্? তুই কি ভুলে গেছিস্ যে তোর বিয়ে হয়েছে?" বলতে বলতে বিশুর চোখ জলে ওঠে, ঠোট কাঁপতে থাকে, —"নির্মলা, আমাকে অত অমানুষ ভাব্‌বি না। আমার একটুও মনুষ্যত্ব আছে। তোর মনে যে এই ছিল, এ যদি জানতুম, তবে তোর সঙ্গে আর দেখাও কর্‌তুম না।"

নির্মলা বিশুর হাত ধরে বলে,—"বিশুদা আমায় পায়ে ঠেল না।" তার জলভরা দৃষ্টি মিনতিপূর্ণ।

বিশু হাত টেনে নিয়ে ডাকে,—"রাম সিং একখানা ট্যাক্সি নিয়ে এস তো।"

* * * *

"তোমার জিনিষ তুমি নাও ভাই, আমি এখন আসি।" বলে বিশু বিনয়ের বাড়ী থেকে বের হয়ে যায়।

বিনয় নির্মলার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটু হেসে বলে,—"নির্মলা তুমি এসেছ?"

নির্মলা কোন কথা বলতে পারে না। মুখ নীচু করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিনয় আবার বলে,—"এতদিন আমি কত কষ্টে ছিলুম। নির্মলা, তুমি ভাল আছ?"

নির্মলা উত্তর দিতে পারে না।

নির্মলাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বিনয় বলে,—"ওকি, তুমি কথা বল্‌ছ না কেন? এতদিন পরে এসেও আমার সাথে ভাল করে একটা কথা বল্‌বে না?"

নির্মলা বিনয়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বিনয় নির্মলার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে,—"ওকি নির্মলা, তুমি কাঁদ্‌ছ?"

এবার নির্মলা ভাঙ্গা গলায় বলে,—"তুমি আমাকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে?"

বিনয় একটু হেসে বলে,—"বরাবরই তো তোমাকে ক্ষমা করে আস্‌ছি নির্মলা!"

স্রোতস্বতী

শ্রীঅনাদিনাথ দত্ত

পর্বত উপরে পাথরের স্তরে
তোমার জন্মস্থান ;
নিরালায় বসে বায়ু যায় ভেসে
বহিয়া মধুর তান।
আপনার মনে তুমি সে বিজনে
খেলিতে যে সারা বেলা ;
যেদিকেতে ধাও যেদিকে তাকাও
দেখ সবুজের মেলা।
সেথা ফুলরাস ছড়ায়ে সুবাস
আপনি শুখায়ে যায় ;
তরুভরা পাতা ফুলেভরা লতা
ফুলবাসভরা বায়।
পাহাড়ে পাথরে খেলা করে করে
ত্যজিয়া আপন দেশ ;
নাচিয়া নাচিয়া হাসিয়া হাসিয়া
বহিয়া চলেছ বেশ।

তব বেগে বটে মাটি যায় ফেটে
তোমার পথের তরে ;
আর্দ্র করে ভূমি ভেসে যাও তুমি
কত দেশ ঘুরে ঘুরে।
কত ক্ষেতে গিয়া সলিল ঢালিয়া
সরস করেছ তারে ;
সুন্দর ফসল ফলেছে কেবল
তোমার মহান্ তীরে।
কত মনোহর নগরী-নগর
শোভিছে তোমার কূলে ;
মন্দিরাদি কত হয়েছে উন্নত
গগনে মস্তক তুলে।
এসব হেরিয়া চলেছ বহিয়া
সাধিতে আপন কাজ ;
যাও দ্রুতবেগে নিজ অনুরাগে
মিলিতে সাগর-মাঝ।

তুলসী-সপ্তশতিকা

শ্রীরামচরণ দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় সর্গ

(১)

খেলত বালক ব্যাল সঙ্গ পাবক মেলত হাত।
তুলসী শিশু পিতুমাতুবৈ রাখত সিয় রঘুনাথ॥
বালক যেমন করে কভু ধরে বিষধরে
কভু দেয় অগ্নিতে হাত ;
পিতামাতা রাখে তারে রাখেন এ তুলসীরে
মাতাপিতা সীতা-রঘুনাথ।

(২)

তুলসী কেবল রামপদ কোগৈ সরল স্নেহ।
তোথর খট বস কট মহঁ কতহুঁ রহৈ কিস দেহ॥
শ্রীরামচরণে মন যদি থাকে সদা লীন
কোন চিন্তা নাই তুলসীর ;
ঘরে বসে পথে ঘাটে বিপদসঙ্কুল মাঠে
যেখানেই থাকুক শরীর।

(৩)

কৈ মমতা করু রামপদ কৈ মমতা করু হেল।
তুলসী দো সই এক অব থল ছাড়ি ছল থল ॥
করহ রামে মমতা অথবা ছাড়ি মমতা
বিশ্বে কর সমতাচরণ ;
এ দুইএর মধ্যে ভাই যাহা ইচ্ছা কর তাই
ছল-ছায়া দিয়া বিসর্জন।

(৪)

কৈ তোহিঁ লাগহি রাম প্রিয় কৈতু রামপ্রিয় হোহি।
দুই মহঁ উচিত সুগম সমুঝি তুলসী করি তব তোঁহি ॥
রামে কর নিজ প্রিয় কিম্বা হও রামপ্রিয়
এই দুই জীবের উপায় ;
তুলসী, করি বিচার সেই পথ কর সার
সুগম বলিয়া বুঝ যায়।

(৫)

রাবণারিকে দাস সঙ্গ কায়রি চালহি কুচাল।
থর দূষণ মারীচ সম মূঢ় ভয়ে বশকাল॥
রাবণারিদাস সনে ব্যবহারে কিম্বা মনে
মন্দ ভাব রাখে যেইজন ;
নিশ্চয় জানিবে এই কালকবলিত সেই
যথা থর ত্রিশিরা দূষণ।

(৬)

তুলসী পতি দরবার মহঁকমী বস্তু কুছ নাহি ।
কর্মহীন কল্পত সিরত চুক চাকরী মাহিঁ ॥
কহিছে তুলসীদাস প্রভু রামচন্দ্র পাশ
কোন বস্তুরই কমি নাই ;
তবে যে বাসনা-বশে কর্মহীন ফিরি ক্লেশে
কর্তব্য হেলার ফল ভাই।

(৭)

রাম গরীব নিরাজ হৈ রাজ দেত জন জানি।
তুলসী মন পরিহরত নহিঁ থুরু বিনিয়াকী বাণী।
ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, জন জানি দেন রাম,
দীনে তাঁর দয়া অতিশয় ;
কিন্তু তুলসীর মন বাসনায় অনুক্ষণ

(৮)

ঘর কীহোঘর হোত হৈ ঘর ছাড়ে ঘর জায়।
তুলসী ঘরবস বীচহি রহৌ প্রেমপুর ছায় ॥
ঘর কর ঘর হবে ঘর ছাড় ঘর যাবে
কি হইবে জীবের উপায় ;
কহিছে তুলসীদাস ছাড়ি গৃহ বসবাস
থাক প্রেম-পুরের ছায়ায়।

(৯)

রাম নাম রটিবো ভলো তুলসী খতা ন খায়।
লেরিকা হতে পৈরব ধোখে বুড়ি ন জায় ॥
রাম রাম রাম রাম রট ভাই অবিরাম
রে তুলসী ক্ষতি নাই তায় ;
বাল্যকাল হ'তে যেই সাঁতার শিখেছে সেই
অগাধে পড়িলে ত'রে যায়।

(১০)

তুলসী বিলম্ব ন কিজিয়ে ভজি লীজে রঘুবীর।
তন তরকসতে জাতহৈ শ্বাস সারসো তীর ॥
বিলম্ব করোনা আর ভজে লহ বারবার
রে তুলসী রাম রঘুবীর ;
সারাংশ নিশ্বাস বায় তনু হ'তে চলে যায়
ধনু হ'তে ছোটে যথা তীর।

(১১)

রাম নাম সুমিয়ত সুফলভাজন ভয়ে কুজাতি।
কুতরু সুতরু পুর রাজ বন লহত ভুবনবিখ্যাতি ॥
করিয়া রাম-স্মরণ, হল সুফলভাজন
গুহক যে চণ্ডাল কুজাতি ;
কুতরু সুতরু হল, পুরি যে কানন ছিল
ত্রিভুবনে লভিল সুখ্যাতি।

(১২)

নাম মহাত্ম সাথি শুনু নরকো কেতিক বাত।
সরবর পর গিরিবর তরে জ্যোঁ তরুবরকো পাত ॥
নামের মহিমা যত কে বলিতে পারে তত
নর তরে কিবা বড় কথা ;
সাক্ষী সরোবর পর ভাসমান গিরিবর

(১৩)

জ্ঞান গরীবী গুণ ধরম নরম বচন নিরমোষ।
তুলসী কবহুঁ ন ছাড়িয়ে শীল সত্য সন্তোষ॥
ধরম, দীনতা, জ্ঞান, নম্র বাক্য অপমান,
শীলতা, সন্তোষ, সত্য, সব ;
জাত স্বত্ব গুণ হতে ছাড়িবেনা কোনমতে
তুলসী কহিছে হে মানব।

(১৪)

অশন বসন স্থত নারীসুখ পাপিহুকে ঘর হোয়।
সন্ত সমাগম রামধন তুলসী দুর্লভ দোয়॥
অশন, বসন, স্থত, দারা, ধন, সুখযুত
হয়ে থাকে পাপীরও ভবন ;
রে তুলসী, কোন কালে সহজেতে নাহি মিলে
সৎসঙ্গ রাম-ভক্তি-ধন।

(১৫)

তুলসী তীর হিকে বসে অবশি পাইয়ে থাহ।
বেগহি যাই ন পাইয়ে সর-সরিতা অবগাহ॥
তুলসী, যে বসে তীরে, সেই থাহ পায় নীরে
জলপূর্ণ সরোবর-মাঝে ;
হঠাৎ যে যেতে চায় কখনও না পার পায়
অবশ্য সংসার-নীরে মজে।

(১৬)

ডগ অন্তর মগ অগম জল জলনিধিজল সঞ্চার।
তুলসী করিয়ো কর্মবশ বুড়ত তরত ন বার॥
পরম অর্থের পথে এক পদ বাড়াইতে
আশা-নদী সম্মুখে অপার ;
তাহাতেই ডুবে যায় সে কেবল পার পায়
গুরুবাক্য নাবিক যাহার।

(১৭)

তুলসী হরি অপমানতে হোত অকাজ সমাজ।
রাজ করত রজ মিলি গয়ো সদল সকুল কুরুরাজ॥
কহিছে তুলসীদাস হরি-অপমানে নাশ
কাজ হয় অকাজ সমাজ ;
রাজত্ব করিতেছিল, রজসনে মিলাইল,
সকুলে সদলে কুরুরাজ।

(১৮)

তুলসী মীঠে বচনতে স্থখ উপজত চহুঁ ওর।
বশীকরণ মহমন্ত্রহৈ পরিহরু বচন কঠোর॥
মধুর বচন বলে, চৌদিকে স্থখ উথলে
বশীকরণ মন্ত্র ইহাই ;
কহিছে তুলসীদাস, যদি কর সুখ আশ
কঠোর বচন ছাড় ভাই।

(১৯)

রাম কৃপাতে হোত সুখ রাম কৃপা বিন জাত।
জানত রঘুবীর ভজনতে তুলসী শঠ অলসত॥
রামের কৃপায় সুখ, রাম কৃপা বিনা দুঃখ
কৃপা হয় করিলে ভজন ;
জানিয়া তুলসী শঠ আলস্যেতে কাল কাটি
কর নাই শ্রীরাম স্মরণ।

(২০)

সম্মুখ হৈ রঘুনাথকে দেহু সকল জগ পীঠি।
তজে কেঁচুরী উরগ কহঁ হোত অধিক অতি দিঠী॥
রামের সম্মুখে হও জগতেরে পিঠ দাও
শক্তি পাবে সত্য দরশনে ;
তুলসীদাসের কথা বিষধর ধরে যথা,
নবষ্টিদৃ কঞ্চুক মোচনে।

(২১)

মর্যাদা দুরহি রহে তুলসী কিয়ে বিচারি।
নিকট নিরাদর হোত হৈ জিনি স্থর-সরীবর বারি॥
সতত নিকট বাসে অবশ্য মর্যাদা নাশে,
কহিতেছে তুলসী বিচারি,
তীরস্থের অনাদৃত দুরস্থের সমাদৃত
জগত-পাবন গঙ্গাবারি।

(২২)

রাম কৃপানিধি স্বামী মম সব বিধি পূরণ কাম।
পরমারথ পর ধাম বর সন্ত স্থখদ বল ধাম॥
আমার স্বামী শ্রীরাম, কৃপানিধি পূর্ণকাম,
পরমার্থ পরধাম বর ;
জগতে সকলে জানে, স্থখ দেন্ন সাধু জনে
বলধাম রাম রঘুবর।

(২৩)

রামহি জানহি রাম রট ভজু রামহি তজু কাম।
তুলসী রাম অজান্‌ নর কিসি পাহবি পর ধাম॥
রামকে জানহ ভাই, রাম রট সর্বদাই
রামভজ পরিহরি কাম ;
তুলসীদাস বলিছে রামে যে না জানিয়াছে
কিরূপে সে পাবে পরধাম।

(২৪)

তুলসী পতিরতি অঙ্ক সম সকল সাধনা শূন।
অঙ্ক রহিত কছু হাত নহি সহিত অঙ্ক দশগুণ॥
রে তুলসী পতি প্রতি, অঙ্ক সম হয় রতি
শূন্য যেন সকল সাধনা ;
অঙ্কহীন হ'লে ভাই, শূন্যে কিছু হয় নাই
অঙ্কের সহিত দশ গুণা।

(২৫)

তুলসী অপনে রাম কহঁ ভজন করহু ইক অঙ্ক।
আদি অন্ত নিরবাহিবো জৈসে নবকো অঙ্ক॥
ভজরে তুলসী রামে, এইরূপ অনুক্রমে
জীবনে ধরিয়া এক অঙ্ক ;
এমন কর নিশ্চয়, আদ্যন্ত নির্বাহ হয়
যেমন অক্ষয় নয় অঙ্ক।

(২৬)

দুগুণে তিগুণে চৌগুণে পঞ্চষষ্ঠ ঔ সাত।
আঠৌতে পুনি নৌগুণে নৌকে নৌরহি জাত॥
দ্বিগুণ করিয়া দেখ, তিনগুণ করি লেখ,
চারি পাঁচ ছয় গুণ নয় ;
কিম্বা কর সাতগুণ, আটগুণ নয় গুণ
দশ গুণে নয় সেই হয়।

(২৭)

নবকে নব রহি জাতহৈ তুলসী কিয়ে বিচার।
রাম রাম ইসি জগতমে নহি দ্বৈত বিস্তার॥
তুলসী বিচারি কয়, নয় যথা নয় রয়
সেইরূপ জগতের মাঝে ;
যা দেখ সৃষ্টিবিস্তার, কিছু সত্বা নাই তার

(২৮)

তুলসী ! রাম সনেহ করু ত্যাগ সকল উপচার।
জৈসে ঘটত ন অঙ্ক নব নবকর লিখত পহার॥
রে তুলসী, রাখ স্নেহ, রামপদে অহরহ
পরিহরি সব উপচার ;
সাধনার লয় হয়, কেবল প্রেম অক্ষয়
নয় যথা নয় নাম তার।

(২৯)

অঙ্ক অগুণ আখর সগুণ সামুঝ উভয় প্রকার।
খোয়ে রাখে আনুভশ তুলসী চারু বিচার॥
তুলসী বিচারি কয় অক্ষর সগুণময়
বুঝি দেখ উভয় প্রকার ;
অঙ্ক গুণ নাহি দিলে, শূন্যে কিবা ফল দিবে
এই হয় উত্তম বিচার।

(৩০)

য়হি বিধিতে সব রাম ময় সমুঝহু সুমতি নিধান।
যাতে সকল বিরোধ তজু ভজু সব সুমুহআন॥
এইরূপে রামময় দেখ বিশ্ব সমুদয়
জগতে যে সুমতি নিধান ;
সকল বিরোধ ত্যজ, অবিরাম রাম ভজ,
কখনও বুঝনা কিছু আন।

(৩১)

রাম কামনাহীন পুনি সকল কাম করতার।
যা হিতে পরমাত্মা অব্যয় অমল উদার॥
কামনা বিহীন রাম, পুরাইতে সর্বকাম
রাম বিনা কর্তা নাই আর ;
তাই পরমাত্মা হয়, ব্যাপক এ বিশ্বময়
অবিনাশী অমল উদার।

(৩২)

জো কছু চাহত নো করত হরত ভরত গতভেদ।
কাহু সুখদ কাহু দুঃখদ জানত হৈ বুধ বেদ॥
তাঁর ইচ্ছা হয় যাহা, তখনি করেন তাহা
কাহারও হরেণ, দেন কারে ;
অজ্ঞান নরের কথা, রাম সুখদুঃখদাতা—

(৩৩)

সন্ত কমল মধুমাস কর তুলসী বরণ বিচার।
জগ সরবর ভর ভরণ কর জানহু জল দাতার॥
বিচারি তুলসী কয়,   জগ-সরোবরে রয়
সাধু মধুমাসের কমল;
যবে তাপ দুঃখরূপ,   শোষে জল সুখরূপ
রাম নাম মেঘে দেয় জল।

(৩৪)

এক সৃষ্টি মহঁ জাহি বিধি প্রকট তিনি তর ভেদ।
সাত্ত্বিক রাজস তম সহিত জানত হৈ বুধ বেদ॥
জানে সব বুধবেদ,   এক সৃষ্টি মাঝে ভেদ
তিনরূপ আছে প্রকাশিত;
কেহবা সাত্ত্বিক হয়,   কেহ রজোগুণময়
কেহ হয় তমো-গুণান্বিত।

(৩৫)

তা বিধি রঘুবর নাম মহঁ বর্ত্তবান গুণ তিন।
চন্দ্রভানু অপি অনল বিধি হরি হর কহ হিঁ প্রবীণ॥
সেইরূপ রামনামে,   তিন ভেদ দেখ ক্রমে
চন্দ্র, সূর্য, অনল আশ্রয়;
রামনাম অভ্যন্তর,   ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
ত্রিগুণে ত্রিদেবের উদয়।

(৩৬)

অনল রকার অকার রবি জানু মকার ময়ঙ্ক।
হরি অকার রকার বিধি ম সহোন নিহশঙ্ক॥
রকার অনলময়   অকার আদিত্য হয়
মকার সে সুধাকর সম;
পুনশ্চ অকার হরি,   রকার সে সৃষ্টিকারী
নিঃসন্দেহ মহেশ্বর ম।

(৩৭)

বন অজ্ঞান কহ দহনকর অনল প্রচণ্ড রকার।
হরি অকার হর মোহতম তুলসী কহ হি বিচার॥
বিচারি তুলসী কয়   রকার অনলময়
দগ্ধকরে অজ্ঞান-গহন;
অকারস্বরূপ হরি   জ্ঞানালোক দান করি

(৩৮)

ত্রিবিধ তাপহর শশী, সতর জানহু মর্ম মকার।
বিধিহরিহরগুণ তিনিকো তুলসী নাম অধার॥
নামের মকার শশী,   ত্রিবিধ তাপবিনাশী
এই মর্ম জানহ তাহার;
বলিছে তুলসীদাস,   বিধি হরি কৃত্তিবাস
এ তিনের রাম নামাধার।

(৩৯)

ভানু কৃশানু ময়াঙ্ককো কারণ রঘুবর নাম।
বিধি হরি শম্ভু শিরোমণি প্রণত সকল সুখধাম॥
রাম নাম রাঘবের   সূর্য অগ্নি শশাঙ্কের
কারণ জগত অভিরাম;
বিধিবিষ্ণুত্রিলোচন,   শিরোমণি তিনজন
নাম বলে ভক্ত সুখধাম।

(৪০)

অগুণ অনুপম সগুণ নিধি তুলসী জানত রাম।
কর্তা সকল জগত কো ভরতা সব মনকাম॥
রামনাম সর্ববিধি,   গুণাতীত গুণনিধি
মহিমা জানেন মাত্র রাম;
ভাবিয়া তুলসী কয়,   নাম বিশ্বকর্তা হয়,
পালক সকল মনস্কাম।

(৪১)

ছত্র মুকুট সম বিদ্ধিআন তুলসী যুগল হসন্ত।
সকল বরণ শিরপর রহত মহিমা অমল অনন্ত॥
তুলসী কহিছে সার   রেফ্ আর অনুস্বার
রাম নামে যুগল হসন্ত;
ছত্র মুকুটের সম,   বর্ণশিরে অনুপম
নিরমল মহিমা অনন্ত।

(৪২)

রামানুজ সতগুণ বিমল শ্যাম রাম অনুহার।
ভরতা ভরত সো জগত কো তুলসী লগত আকার॥
রামের অনুজ সম,   অনুরূপ বর্ণ শ্যাম
জগদ্ভর্তা সত্ত্বগুণময়;
ভরত সদৃশ ভাই,   অকার জানিবে তাই

(৪৩)

রাজত রাজসতা অনুজ বরদ ধরণীধর ধীর।
বিধি বিহরত অতি আশুকরি তুলসী জনগণ পীর॥
তাঁহার অনুজ যেই, রজোগুণ ময় সেই
বরদ ধরণীধর ধীর ;
ভক্ত-ভয় বিনাশিতে, বিরাজিত র রূপেতে
আত্মভু সৌমিত্রী মহাবীর।

(৪৪)

হরণ করণ শঙ্কট সতর সমর ধীর বলধাম।
মম মহেশ অরিদমন বর লক্ষণ অনুজ অরি কাম॥
সত্বর শঙ্কটহর, বলধাম রণধীর
শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ অনুজাত ;
মরূপ মহেশ হয়, কাম অরি তমোময়
রাম নাম মধ্যে বিরাজিত।

(৪৫)

রাম সদা সমশীল ধর সুখসাগর পরধাম।
অজ কারণ অদ্বৈত নিত সমতর পদ অবিরাম॥
সতত সম শ্রীরাম, শীলধর পর ধাম
অজাদ্বৈত বিশ্বের কারণ ;
সুখের সাগর রাম, নিত্য জগদভিরাম
ভক্ত সুখ সেব্য শ্রীচরণ।

(৪৬)

হোন্ হার সহজান সব বিভব বীচ নহি হোত।
গগন করিকে কবৈ তুলসী পঢ়ত কপোত॥
হইবার আছে যাহা, সঙ্গেই জনমে তাহা
তার বেশী কিছুই না হয় ;
শূন্য পথে বাজী দিতে, কে শিখায় পারাবতে
সহজাত জানিবে নিশ্চয়।

(৪৭)

তুলসী হোত শিখে নহি তমগুণ দূষণ ধাম।
ভষম শিখিনী কবনে কহুঁকে প্রকট বিলোকহুঁ কাম॥
তুলসী বিচারি কয়, শিক্ষায় কভু না হয়
গুণী কি নিগুর্ণ কোন জন ;
যবে শিখি নৃত্য করে, কে শিখায় শিখিনীরে
মখে রেত করিতে গ্রহণ।

(৪৮)

গিরত অণ্ড সপুট অরুণ জমত পক্ষ অভ্যাস।
অলখ সুনে উপদেশ কেহি জাতসু উলটি অকাশ॥
দেখহ অলখ পাখী, নিয়ত আকাশে থাকি
শূন্যেই প্রসব অণ্ড করে ;
অর্ধপথে অণ্ড ফোটে, পক্ষিশিশু শূন্যে ওঠে
উড়িবারে কে শিখায় তারে !

(৪৯)

বিবিধ চিত্র জলপাত্র বিচ অধিক ন্যূন সমশূর।
কব কৌনে তুলসী রচে কেহি বিধি পক্ষ ময়ূর॥
প্রতিভাত সৌর করে, নদী হ্রদ সরোবরে
কি বিচিত্র চিত্র দেখা যায় ;
দর্শকের চিত্তহারী, আহা মরি চিত্রসারী
কেবা লেখে শিখির পাখায় ?

(৫০)

কাক সুতা গ্রহণা করে অহ অচরজ বড় বায়।
তুলসী কেহি উপদেশ শুনি জনত পিতাঘর জায়॥
বল কার উপদেশে, কোকিলা কাকের বাসে
অণ্ড রাখি সন্তান পালয় ;
তুলসীদাসের কথা, কোকিলার চতুরতা
কোন কালে কেহ কি শিখায় ?

(৫১)

সুপথ কুপথ সিহো জনিত স্ব স্বভাব অনুসার।
তুলসী শিখরত নাহি শিশু মুষক হনন মজার॥
স্বভাবের অনুসারে, সুপথ কুপথ ধরে
শিখাইতে নাহি হয় কারে ;
কহিছে তুলসীদাস, মুষিকের প্রাণনাশ
করিতে কে শিখায় মার্জারে ?

(৫২)

তুলসী জানত হৈ সকল চেতন মিলত অচেত।
কীট জাত উড়ি তিয় নিকট বিনহি পঢ়ে রতি দেত॥
কি চেতন, অচেতন, স্ত্রী পুরুষ সম্মিলন
কেহ নাহি শিখায় কাহারে ;
পতঙ্গ কামের বশে, উড়ে যায় স্ত্রীর পাশে

(৫৩)

হোন হার সব আপতে বৃথা শোচ কর জৌন।
কঞ্জ শৃঙ্গ তুলসী মৃগণ কহহুঁ অমেঠত কৌন ॥
হবার আছে যে সব, আপনি হবে সে সব
তাহে শোক করা অকারণ ;
রাত্রে পদ্ম মুকুলিত, মৃগ-শৃঙ্গ শাখান্বিত
রে তুলসী. করে কোন্ জন ?

(৫৪)

সুখ চাহত সুখমে বসত হৈ সুখ রূপ বিশাল।
সন্তত জা বিধি মানসর কবহুঁন তজত মরাল ॥
সুখ চাহে যেই জন, সুখে বসে সেই জন
সুখের স্বরূপ সুবিশাল ;
বারেক যে তাহা পায়, কখনও না ছাড়ে তায়
যে প্রকার মানস মরাল।

(৫৫)

নীতি প্রীতি যশ অযশ গতি সব কহ সুখ পহিচান।
বস্তী হস্তী হস্তিনী দেতন পতি রতিদান ॥
সকলই নীতি প্রীতি, যশ অযশের গতি
ভালরূপে বুঝিবারে পারে ;
লজ্জা অযশের ভয়ে, হস্তিনীও লোকালয়ে
রতিদান করেনা হস্তীরে।

ক্রমশঃ

বিবাহে লৌকিকতা-গ্রহণ

শ্রীবলাইচাঁদ আঢ্য

আজকাল প্রায় জাতি-নির্বিশেষে কোনও বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলেই তাহার নিম্নদেশে একটি "বিশেষ দ্রষ্টব্য" বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, নিমন্ত্রণকারী "লৌকিকতা-গ্রহণে অক্ষম"। বহু জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই লৌকিকতা-গ্রহণ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন এবং তদনুসারে অনেকে লৌকিকতা দান বা গ্রহণ করেন না। কিন্তু নিকট আত্মীয়গণের মধ্যে লৌকিকতা আদান-প্রদান সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে, বন্ধ হইয়াছে বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে।

এই সামাজিক আদানপ্রদানের বহু কালের প্রাচীন প্রথাটা যিনি যে কারণেই বন্ধ করুন না কেন—একটি কথা অতীব দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইলাম যে, সামাজিক মর্যাদার আবরণে এই প্রথার মধ্যে যে সমাজসেবার উচ্চ আদর্শ আমাদের সে যুগের সমাজ-নিয়ন্তাগণ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি বা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সভ্যতার নূতন তত্ত্বে

আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছি যে আমাদের এই বাঙালী হিন্দুর যাহা কিছু রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সমস্তই নিরর্থক—অতএব তৎসমস্তই সর্বদা বিষবৎ বর্জনীয়। কিন্তু একটু বিচার করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই লৌকিকতা আদান-প্রদানের বিধান যাঁহারা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সত্যই দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল।

আজ আমরা একটা নূতন কথা শিখিয়াছি সমবায় নীতি। এই নীতির উদ্দেশ্য যে ভাল এবং এই নীতি সফল করিবার চেষ্টাও যে সর্বদা যুক্তিসঙ্গত, এ বিষয়েও কোন মতভেদ নাই। কিন্তু আমাদের এই লৌকিকতা প্রথাটাও কি ঐ সমবায় নীতির রূপান্তর বা নামান্তর নয়? সমবায় নীতির মূল উদ্দেশ্য পরস্পরের অর্থ পরস্পরের সাহায্যকল্পে নিয়োগ করা। এই লৌকিকতাই বা কি? একজনের পুত্র বা কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণকারিগণ লৌকিকতার আবরণে অর্থ, বস্ত্র বা

পরিমাণ লঘু করিতেন, তাহা কি উপেক্ষার বিষয় ছিল? পাঁচের লাঠি একের বোঝা ছিল—এই পাঁচজনের সাহায্যে অল্পায়াসের মধ্যেই ক্রিয়া বেশ সম্পন্ন হইয়া যাইত। এই ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তি আবার প্রতিদানস্বরূপ সাহায্যকারিগণের পুত্র বা কন্যার বিবাহে লৌকিকতা দান করিয়া ঠিক তেমনই ভাবে সাহায্য করিতেন। এই প্রকারে পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরের ব্যয়বহুল ক্রিয়াকলাপ অল্পায়াসে উদ্ধার হইয়া যাইত। সমবায় আর কাহাকে বলে? তবে আমরা সমবায়ের এত প্রশংসা আর লৌকিকতার নামেই বা নাসিকা সঙ্কুচিত করি কেন? ইহা বুঝিবার ভুল নহে কি?

যাহা হউক, লৌকিকতা প্রথাটা অনেকেই সমর্থন করেন না। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিদেশের আদব-কায়দাই আমাদের এই চিরাচরিত রীতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। অথচ একটু চেষ্টা করিলেই আমরা এখনও এই সনাতন সামাজিক সমবায় পদ্ধতিটাকে সমাজের যথেষ্ট উপকারে লাগাইতে পারি। অধিকন্তু আমার বিশ্বাস তাহাই করা উচিত। এখন আমরা সভ্য হইয়াছি! ব্যাঙ্ক হইতে পরের টাকা ঋণ করিয়া ব্যয় করিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করি না, অথচ সামাজিক মর্যাদার নামে আত্মীয়-স্বজনাদির স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য গ্রহণে আমাদের যেন মাথা কাটা যায়! সভ্য হইয়া আমাদের কি সুন্দর মর্যাদা-জ্ঞান হইয়াছে!

আমরা হিন্দু, আমরা জানিতাম যে কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনও পরিশোধ করা যায় না। কিন্তু এখন আমরা ইংরাজী আদব-কায়দায় একটি "ধন্যবাদ" দিয়া সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিয়া হিসাব-নিকাশ করিতে শিখিয়াছি। পূর্বে রাম শ্যামের কন্যার বিবাহে লৌকিকতা দানে সাহায্য করিলে, শ্যাম সেই সাহায্যের প্রতিদান দিবার জন্য একটা যোগ্য সুযোগের বা রামের পুত্র বা কন্যার বিবাহের অপেক্ষা করিতেন—তাহা ৫, ৭ বা ১০ বৎসর পরে হউক, কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি দিল না। কিন্তু এখন সঙ্গে সঙ্গে দানের প্রতিদান না করিতে পারিলে সত্যই আমাদের সুনিদ্রায় বিঘ্ন ঘটে—লৌকিকতা যিনি দিলেন তিনিও সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রতিদান না পাইলে কর্মকর্ত্তা তাঁহাকে "ফাঁকি দিলেন" বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইহার ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, লৌকিকতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-লৌকিকতা করিয়া হিসাব-নিকাশ করিতে গিয়া আবার নূতনতর ব্যয়ের জালে জড়াইয়া পড়িতে হয়। ইহা আমাদের সমাজে বর্তমান সভ্যতার এক নূতন আমদানি। বর্তমান সভ্যতার এই নূতন মায়া যদি কাটাইতে না পারি, তাহা হইলে এই লৌকিকতার আদান-প্রদান রহিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় কিন্তু এই লৌকিকতার অন্তর্নিহিত সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়া যদি আমরা সঙ্গে সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করিবার লোভটুকু সম্বরণ করিতে পারি, তবে তাহা আমাদের সামাজিক জীবনে বাস্তবিকই অনেক উপকারে আসিবে এবং তাহাই কাম্য।

আলোক

শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষাল

তমোময়ী জননীর নির্বাপিলে অন্তরের শোক
হে নির্মল সুন্দর আলোক।
বাজিয়া উঠিল শঙ্খ দিকে দিকে প্রচারিত করি
তোমার মঙ্গল গীতি ; বাজিয়া উঠিল নানা ভেরি
তুচ্ছ করি নিখিল ধরণী ;
সে গৌরবে তুষ্ট তুমি নিলে জন্ম হে চিরসুন্দর!
চিন্তি তোমা উল্লাসেতে বসুধার ব্যথিত অন্তর
নাচিল অমনি।
পবিত্র জ্যোতিটি তব জ্বলে উঠে দিগন্তের কোলে
মুছাইতে মাতৃ-অশ্রুজলে।
হরিতে ধরিত্রী-ব্যথা হে মহান্ জনমিলে তুমি।
নামাইল বক্ষ হতে হাসি রাত্রি তব মুখ চুমি,
দাঁড়াইলে সম্মুখে তাহার ;—
উঠিল জগত ব্যাপি তোমার বন্দনা-গীতিখানি ;
তোমার নবীন মূর্তি নবীন আনন্দ দিল আনি
মরমে সবার।
রাত্রি-কোলে জন্ম লভি ছড়াইয়ে দীপ্ত রশ্মি-শিখা
জগতে দেখালে পথ-রেখা।
তোমার উদয়-পূর্বে যেন কোন অজ্ঞাত কুমারী
বক্ষ দুরু দুরু তার তমোময়ী রাত্রিরে নেহারি
উজ্জ্বল প্রদীপ ধরি হাতে
ধীরে ধীরে যেতেছিল সম্মুখের অন্ধকার পানে
ভীতবক্ষে ম্লানমুখে নতচক্ষে কম্পিত চরণে ;
সুদূর পথেতে

এল ঝড় অট্টহাস্যে আশঙ্কিত করিয়া তাহারে
নিভাইল প্রদীপ-শিখারে ;
চমকি কাঁদিল হেরি চতুর্দিকে নিবিড় আঁধার
থমকিয়া মধ্যপথে থামাইল এযাত্রা তাহার ;
ব্রহ্মাণ্ড কাঁদিল তার দুখে ;—
সেইক্ষণে সে মুহূর্তে জন্ম লভি অজ্ঞান বালক
নাশিলে বিশ্বের ব্যথা প্রকাশিয়া তোমার আলোক।
ধরার সুমুখে
সেইদিন সেই নারী কি অজ্ঞাত পুষ্পে পূজি তোমা
স্বর্গে দিল তোমার উপমা।
স্বর্গ প্রতি ঘরে ঘরে মুক্ত করি অর্গল সকলে
তোমারে হেরিতে আলো স্থির দৃষ্টে চাহিল ভূতলে,
অপ্সরা কিন্নরী আদি করি ;
তোমার অপূর্ব শোভা মর্তে স্বর্গ করিল স্থাপন ;
দিগন্ত লভিল চক্ষু—ধরা দিল নূতন জীবন
তব রূপ হেরি।
তোমার সুন্দর রূপ ত্রিভুবনে করিল মোহিত ;
বিশ্ব হল ক্রন্দনরহিত ;
রাত্রির কলঙ্ক নাশি উদিলে হে অকলঙ্ক ফুল
বিশ্বমাঝে কেহ নহে হে আলোক তব সমতুল।
তুমি একা ত্রিভুবনজয়ী।
অনন্ত করুণা তব দিল প্রাণ মুমূর্ষু জগতে,
জাগ্রত করিলে তারে সীমাহীন সুপ্তি ঘোর হতে
তুমি ধরাজয়ী।

সার জন ফ্র্যাঙ্কলিন

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

সূচনা

জগতে যত প্রকার কীর্ত্তি-গরিমা মানুষের ললাট-ফলকে বিম্বিত হইতে পারে তন্মধ্যে অজানা রাজ্য আবিষ্কার করিয়া সেই দেশে দেশীয় পতাকা উড্ডীন করাই শ্রেষ্ঠ। ঠিক এমনি এক চিরজীবনব্যাপী যশের তুঙ্গ শিখর অধিগত করিবার প্রেরণা দান করিয়াছিলেন "ইন্‌ভেষ্টিগেটর" জাহাজের কাপ্তেন ম্যাথু ফ্লিণ্ডার্স এক তরুণ যুবককে, যখন তিনি সেই তরুণ যুবককে "ইউনিয়ান জ্যাক" পতাকা হাতে দিয়া নিউ হল্যাণ্ডের অজ্ঞাত উপকূলে অবতরণের আদেশ দিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, উহা কেবলমাত্র সঙ্কেত জ্ঞাপনার্থ ব্যবহৃত হইবে। এই তরুণ যুবকের নাম জন ফ্র্যাঙ্কলিন—ইনি পরবর্ত্তীকালে উত্তর মেরু আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় পৃথিবীব্যাপী খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

জাহাজের একখানি নৌকা ৮জন নাবিক সহ ডুবিয়া গিয়াছিল। ফ্র্যাঙ্কলিন ও অন্যান্য কয়েকজন এই অজ্ঞাত উপকূলে উক্ত নাবিকদিগের মৃতদেহ আবিষ্কারার্থ অবতরণ করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা কোন নাবিকের মৃতদেহ সমুদ্র-তরঙ্গে নীত হইয়া উপকূলে পড়িয়া আছে দেখিতে পান, তবেই উক্ত পতাকা সঙ্কেত জ্ঞাপনার্থ ব্যবহার করিবেন।

ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক তরুণ যুবকের পুরোভাগে বিশাল দেশ তাঁহার দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য অপেক্ষমান; ইহা এক বিষম সমস্যা—এক দিকে দেশপ্রীতি অন্য দিকে কাপ্তেনের আদেশ পালন; দুই এক সেকেণ্ড ইতস্তত করিয়া তিনি বৃটিশ পতাকা উড্ডীন করিলেন এবং উহা বাতাসে পত্ পত্ শব্দে উড়িতে লাগিল। শীঘ্রই জাহাজ হইতে নৌকা ছাড়া হইল; এইবার ফ্র্যাঙ্কলিন অবস্থা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন। এইবার হয় তিনি কোন মৃতদেহ দেখাইবেন অথবা নিজের স্বাধীন [illegible] নিকট বুদ্ধি-বিবেচনাকে বলিদান করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিবেন। সময় ঘনাইয়া আসিল; তিনি যে পাহাড়ের শিখরদেশে দাঁড়াইয়াছিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তে নৌকা উহার নিকটবর্ত্তী হইতেছিল।

যখন পরস্পরের কথাবার্ত্তার দূরত্বের মধ্যে নৌকা উপনীত হইল; তখন তিনি উপকূলের সন্নিকটস্থ একটি বস্তুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, ফলে ঊর্দ্ধতন কর্ম-চারীর সন্দেহ উদ্রিক্ত হইল না, এবং তিনি উল্লিখিত বস্তুর দিকে নৌকা চালনা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে, ফ্র্যাঙ্কলিন যাহাকে মৃত-দেহ বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন, উহা পাহাড়ের অংশবিশেষ; অবশ্য ততক্ষণে ফ্র্যাঙ্কলিনের কৌতূহল কেবলমাত্র বাহ্যাচারে পরিণত হইয়াছিল।

বহু বর্ষ পরে যখন ফ্র্যাঙ্কলিনের নাম পৃথিবীর উভয় গোলার্দ্ধে বিখ্যাত, তখন নিউ হল্যাণ্ডের উপরিলিখিত স্থানের ঔপনিবেশিকগণ জানিতে পারেন যে, এই বিখ্যাত আবিষ্কারকই তাঁহাদের দেশে প্রথম বৃটিশ পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। অবশ্য অপর কোন ব্যক্তিকে এই সম্মান দান করা চলিত না। পরবর্ত্তীকালে কার্য্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি হেতু ফ্র্যাঙ্কলিন এই যৌবনোচিত অনিষ্টাচরণে ক্ষান্ত দিলেন; কিন্তু ইহা তাঁহাকে কোন দিন পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি যে সমস্ত কার্য্য সংসাধিত করিয়াছেন, তাহা বিচার করিলে ইহা বলা অসঙ্গত নহে যে, তাহার মত সময় সময় অবিবেচক না হইলে উক্ত কর্ম্মাবলী সংসাধন করা সম্ভবপর হইত না।

জন্ম ও বাল্যজীবন

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে সার জন ফ্র্যাঙ্কলিন লিঙ্কনশায়ারের অন্তর্গত স্পিল্‌স্‌বি নামক স্থানে

ছিল, এমন কি কয়েকবার জীবনের আশাও পরিহার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের অপার করুণায় পারিবারিক চিকিৎসকের ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যর্থ করিয়া ফ্র্যাঙ্কলিন ধীরে ধীরে একটি সুস্থ-সবল যুবকে রূপান্তরিত হইলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল গোলাকার, আকৃতি গম্ভীর ও ওজন ১৫ ষ্টোন ছিল। তিনি পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন; কিন্তু ঠিক তদনুরূপ সুনজরে কেহ তাঁহাকে দেখিত না; বিশেষত কোন আগন্তুকের সম্মুখে তাঁহাকে বাহির করা হইত না; কারণ অন্যান্য ভ্রাতাভগ্নীর মত তিনি পোষাক-পরিচ্ছদে ও আকৃতিতে ঠিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রতীয়মান হইতেন না।

বাল্যকাল হইতে ফ্র্যাঙ্কলিন অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। অবশ্য যে বালক পরবর্তীকালে আবিষ্কারকরূপে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিবে, তাহার পক্ষে অন্যরূপ আশা করাই বিড়ম্বনা, কিন্তু একদিন পিতামাতার আদেশ অমান্য করিয়া যখন তিনি নিজের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য কোন প্রতিবেশীর অনিষ্ট সাধন করিলেন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করেন। তবে পিতা-মাতার ঔদাসীন্য বা তিরস্কার তাঁহাকে কৌতূহল চরিতার্থ হইতে বিরত করিতে পরিল না—এতই গভীর ছিল তাঁহার কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা।

লাউথ গ্রামার স্কুলে তিনি কিছু সময় পাঠ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে এই স্কুল হইতে অ্যালফ্রেড টেনিসন বিশিষ্টতা অর্জন করেন। এই স্কুলে পাঠ করিবার সময় তিনি একবার একটি বন্ধুর সমভিব্যাহারে সমুদ্র-উপকূলে ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন; সমুদ্র দেখিয়া তিনি মোহিত হইলেন; ফলে সমুদ্রের উপর প্রগাঢ় অনুরাগ লইয়া তিনি ছুটির পর ফিরিয়া আসেন। ইহাতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন—নাবিকের জীবনযাপন করিবেন।

নাবিকের বৃত্তি গ্রহণে বাধা

সংসারে যত প্রকারের নাটক অভিনীত হয়, তাহার মধ্যে একটি বিশেষত্ব দেখা যায় যে, একটা না একটা দুষ্ট চরিত্রের লোক তাহাতে থাকে। ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবন-নাটকেও তাহার অভাব পরিলক্ষিত হইল না—তাঁহার পিতাই উক্ত দুষ্ট লোকের ভূমিকা অভিনয় করিয়া চলিলেন। পিতা পুত্রকে ধর্মযাজকের পদের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন; কিন্তু যখন ফ্র্যাঙ্কলিন পিতার নিকট নাবিকের বৃত্তি গ্রহণের জন্য অনুমতি-প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি পুত্রের কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুই বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল; পরিশেষে যে বাণিজ্য-জাহাজ হাল্ ও লিসবনের মধ্যে যাতায়াত করে, তিনি পুত্রকে সেই জাহাজে চাকুরী করিয়া দেন। তবে তিনি মনে মনে এই আশা পোষণ করিতেন যে, নাবিক-জীবনের কঠোরতা অসহ্য হইলে ফ্র্যাঙ্কলিন নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে,—মানুষের মন কত ভ্রমপূর্ণ স্বপ্নই না দেখে!

নাবিক-জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার ফল

নিম্নপদস্থ নাবিকের প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত নীরস ও কঠোর। কিন্তু এই কঠোরতা সত্ত্বেও ফ্র্যাঙ্কলিন অধিকতর দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া ফিরিলেন। ফলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে নাবিক-জীবন গ্রহণের জন্য মত দিলেন। ইহার দুই বৎসর পরবর্তী কোন চিঠিতে এই জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত হইয়াছে—তিনি লিখিয়াছেন—"আমার নাবিক-জীবন গ্রহণ কোন সাময়িক উত্তেজনা বা খেয়ালের বশে হয় নাই বা নাবিকের চমকপ্রদ পোষাক বা বিদ্যালয়ে না যাওয়ার আনন্দও উহার মূলে নাই; আমি নাবিক-জীবনের সুখ ও দুঃখ সমভাবে মানস-যবনিকায় বিম্বিত করিয়াছিলাম, যদিও তৎপূর্বে কেহ আমাকে ঐ বিষয়ে কোন কথা বলে নাই। এইরূপ তুলনামূলক বিবেচনার পর আমি সমুদ্রযাত্রায় দৃঢ়সঙ্কল্প হইলাম এবং উহা পরিহার করিয়া ব্যবসায় বা অন্য কোন কার্যে আত্মনিয়োগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইল না।"

নাবিক-জীবনের প্রারম্ভে

১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ ফ্র্যাঙ্কলিনের নাবিক-জীবনের প্রারম্ভ বলা চলে; এই দিন তিনি "পলিফেমাস্" জাহাজে প্রথম শ্রেণীর স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদান করেন। এই

সময় তাঁহার মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়স ছিল; কিন্তু কিশোর স্বেচ্ছাসেবক অবিলম্বে নব কর্তব্যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিল; এই সময় তিনি বাড়ীতে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পিতামাতার মনের সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল যে, স্বীয় নির্দেশিত বৃত্তি পরিহার করিয়া বালক কখনো গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে না।

ঠিক এক বৎসর জাহাজে বাস করার পর ফ্র্যাঙ্কলিন অগ্নিমন্ত্রে প্রথম দীক্ষা-লাভ করিলেন। ইহা কোপেন-হেগেনের যুদ্ধ—বীরবর নেলসনের অসামান্য প্রতিভার দীপ্ত বিকাশ। এই যুদ্ধে "পলিফেমাস" বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে এবং যুদ্ধের ভীষণতার ছবি নিশ্চয় বালকের মনে চিরতরে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু বালক কোনরূপ ভীতির চিহ্ন প্রকটিত করে নাই, বৃটেনের জয়ে গর্ব ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল মাত্র। এই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাতেই তাঁহার পরবর্তী দুঃসাহসিক কার্যপূর্ণ জীবনের প্রথম প্রভাত; আর ইহা তাঁহার উপযুক্তও বটে।

কোপেনহেগেনের যুদ্ধের পূর্বেই ফ্র্যাঙ্কলিন সংবাদ পাইলেন যে, দক্ষিণ-সমুদ্রে অভিযানের জন্য জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে। তিনি আবিষ্কারে বহির্গত হওয়ার কার্যকে সাদরে অভিনন্দিত করিলেন এবং ঠিক সময়ে "পলিফেমাস্" দেশে ফিরিয়া আসায় তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার ভ্রাতা কাপ্তেন ম্যাথু ফ্লিণ্ডার্সের অধীনে "ইনভেষ্টিগেটর" জাহাজে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারে যাত্রা করেন। এইরূপে খুব অল্প বয়সে তাঁহার ভবিষ্য গৌরবময় জীবনের সূত্রপাত হইল।

ফ্লিণ্ডার্সের সহায়তা-লাভ

গণিত জ্যোতিষের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ বশতঃ ফ্র্যাঙ্কলিন অভিযানের একজন বিশিষ্ট সাহায্যকারী ব্যক্তিরূপে প্রতিভাত হইলেন। দ্বিতীয়ত নিজের অধ্যবসায় ও উদ্যমের প্রভাবে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর এত প্রিয়পাত্র হইলেন যে, ঊর্ধ্বতন কর্মচারী বলিলেন—"আমি জানি না কি করিয়া ঠিক ফ্র্যাঙ্কলিনের প্রশংসা করিব।"

এই সময় কাপ্তেন ফ্লিণ্ডার্স এই তরুণ নাবিককে বহুবিধ সদুপদেশ ও উৎসাহ দান করেন। এই উপদেশ ও উৎসাহ ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনযাপনে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল সন্দেহ নাই, যেহেতু এইরূপে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তুলনাহীন বলা যায়। এই তরুণ যুবক—কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ, সরল উদার আকৃতি, উৎসাহ-প্রফুল্ল আশাভরা প্রাণ, সমুজ্জ্বল জীবনের মূর্ত প্রতীক, সবল মাংসল দেহ,—ফ্র্যাঙ্কলিন কাপ্তেন হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত সকলের প্রিয় ছিলেন। তবে তাঁহার প্রধান দুঃখ এই ছিল যে, তিনি বৈদেশিক ভাষায় কোনরকম দক্ষতা অর্জন করেন নাই।

অভিযানের অবসান ও দেশে প্রত্যাবর্তন

সুদীর্ঘ কয়েক মাস ধরিয়া এই জাহাজ অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলে আবিষ্কারে ব্রতী ছিল। এই সময় ফ্র্যাঙ্কলিন নাবিক-জীবনের সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ অবিচলিতচিত্তে সহ্য করেন। পরে যখন "ইন্ভেষ্টিগেটর" জাহাজ জীর্ণ ও অকর্মণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইল, এবং অভিযানের অপ্রত্যাশিত অবসান ঘটিল, তখন বোধ হয় ফ্র্যাঙ্কলিনের মত কেহই দুঃখিত হন নাই। দুঃখভারাক্রান্তহৃদয়ে তিনি "পরপইস" নামক জাহাজে উঠিয়া দেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তখন তিনি জানিতেন না যে, এমন দুঃসাহসিক কার্য পুরোভাগে অপেক্ষমাণ, যাহা তাঁহার মত লোকের কৌতূহলও পরিতৃপ্ত করিবে।

পথে বিপদ্

সাতদিন চলিবার পর জাহাজ জলমগ্ন শৈলে আট্কাইয়া গেল। উহাকে আর কিছুতেই ভাসান গেল না। একটি রাত্রি দুঃখ-কষ্ট ও ভীষণ দুর্ভাবনায় অতিবাহিত করিয়া নাবিকদল একটি বালির চড়ায় উপনীত হইল। এই নাবিকদলের সঙ্গে তিন মাসের উপযোগী খাদ্যসম্ভার ছিল। এই খাদ্যভাণ্ডার সম্বল করিয়া সাধারণ নাবিকের গমন-

বহির্ভূত সমুদ্রের মাঝে কোন একটি বন্ধুভাবাপন্ন জাহাজের অপেক্ষায় দিনাতিপাত করা ব্যতীত এই নাবিক-দলের সম্মুখে অন্য কোন পথ উন্মুক্ত ছিল না। কিন্তু পরিশেষে অদম্য সাহসী ফ্লিণ্ডার্স একখানি ক্ষুদ্র নৌকা সজ্জিত করিয়া সাহায্যলাভার্থ যাত্রা করেন এবং ৭৫০ মাইল বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া সাহায্যলাভে সমর্থ হন।

ক্যান্টনে পৌঁছিয়া ফ্র্যাঙ্কলিন একদল পণ্যবাহী জাহাজের সঙ্গে মিলিত হন। এই জাহাজসমূহ নাথা-নিয়েল ডান্সের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। কয়েক দিন যাত্রার পর ফ্র্যাঙ্কলিন একটি ভীষণ জলযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। ডান্স দেখিলেন অনেকগুলি ফরাসী যুদ্ধজাহাজ তাঁহার পথ রুদ্ধ করিয়া বর্তমান; তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার সামান্য পণ্যবাহী জাহাজ দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু ডান্স ভাবিলেন সহজে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া জীবনপাত করা শ্রেয়; ফলে তিনি বৃটিশ নাবিকের প্রত্যুৎপন্নমতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুপক্ষকেই প্রথমে এমন কৌশল ও তৎপরতার সহিত আক্রমণ করিলেন যে, ফরাসী যুদ্ধজাহাজগুলি ভয়ে পলায়ন করিল। ফ্র্যাঙ্কলিন এই যুদ্ধে তাঁহার উদ্যম ও তৎপরতার জন্য প্রশংসা লাভ করিলেন। পরবর্তীকালে ফ্র্যাঙ্কলিন যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তিনি প্রথম জীবনে ডান্স ও ফ্লিণ্ডার্সের নিকট হইতে অধিগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ট্রাফালগার যুদ্ধে ফ্র্যাঙ্কলিন

বৃটিশ যে জলযুদ্ধে অজেয় বলিয়া বর্তমান জগতে বিখ্যাত, তাহা প্রধানত দুইটি জলযুদ্ধের পরিণাম-ফল। প্রথম যুদ্ধ রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে সার ফ্র্যান্সিস ড্রেক কর্তৃক স্প্যানিস আর্মাডার পরাজয়; দ্বিতীয় যুদ্ধ মহাবীর নেলসনের অগ্নিময়ী প্রতিভার বিকাশ—ট্রাফালগার যুদ্ধ—এই যুদ্ধে ফরাসী ও স্পেনের সম্মিলিত নৌসৈন্য

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ফ্র্যাঙ্কলিন এমন এক যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন, যাহা সাধারণ জীবনকে দুঃসাহসিক কার্যের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ করিতে সমর্থ, অথচ তখন তিনি মাত্র গৌরবময় জীবন-পথে পদার্পণ করিতেছেন।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া ফ্র্যাঙ্কলিন "বেলারো-ফোন" জাহাজে কার্যে নিযুক্ত হন। অবশ্য এই কর্ম গ্রহণে তাঁহার নিজের কোন হাত ছিল না; কিন্তু একথাও অবিসংবাদিত সত্য যে, তিনি নিজে স্বীয় জাহাজ নির্বাচন করিলেও এতদপেক্ষা অধিক সুযোগলাভ করিতে পারিতেন না, কারণ এই জাহাজ ট্রাফালগার যুদ্ধক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

তিনি জাহাজে সঙ্কেতজ্ঞাপক মিড্‌শিপম্যানরূপে নেলসনের সুপ্রসিদ্ধ পতাকা স্বীয় কাপ্তেনের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা নিশ্চিত যে, ফ্র্যাঙ্কলিন যুদ্ধ যেখানে ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সেখানে ছিলেন; তবে মাত্র দৈবানুগ্রহে তিনি স্বীয় জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে অবিরাম কামান-গর্জন তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করিয়াছিল এবং তিনি কতকটা "কালা" হইয়া গিয়া-ছিলেন।

যুদ্ধের অবসানে ফ্র্যাঙ্কলিন

সুদীর্ঘ ছয় বৎসর অবিরাম দুঃসাহসিক কার্যের অবসানে ফ্র্যাঙ্কলিন ছয় বৎসর অনুরূপ কর্মহীনতার মধ্যে অতিবাহিত করিলেন। অবশ্য এই বিশ্রাম তাঁহার শরীর ও মনের পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়াছিল বলা যায়, তথাপি তিনি ইহাতে তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার ভ্রমণশীল প্রকৃতি মনের গোপন স্তরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। ফলে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তিনি নব নব দেশ আবিষ্কারের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। দক্ষিণ সমুদ্রের নবীন অনাবিষ্কৃত দেশের সন্ধানে পুনরায় যাত্রা করিবার উৎসাহ তাঁহার অন্তরলোকে দেখা দিল; সুতরাং তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্য কোন অভিযানের

লিখিলেন, কিন্তু প্রত্যেক পত্রেই তাঁহার আশাভঙ্গ হইতে লাগিল—সকলেই নৈরাশ্যজনক উত্তর দিল।

আমেরিকার যুদ্ধে ফ্র্যাঙ্কলিন

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্র্যাঙ্কলিনের দীর্ঘ কর্মহীন জীবনের মধ্যে সামান্য কর্মের রেখা ফুটিয়া উঠিল। এই সময় তাঁহার জাহাজ "বেডফোর্ড" আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আমেরিকা যাত্রার আদেশ পাইল। তৎকালে ফ্র্যাঙ্কলিন লেফ্‌টেন্যান্ট পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া আমেরিকা মহাদেশে উপনীত হন এবং নিউ অর্‌লীন্‌সের যুদ্ধে যোগদান করেন। এই যুদ্ধে তিনি সামান্য আহত হন কিন্তু যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য মেডেল প্রাপ্ত হইলেন এবং সরকারী কাগজপত্রে তাঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হইল।

যুদ্ধের অবসানে তিনি ইয়োরোপে ফিরিয়া আসেন।

উত্তর মেরু আবিষ্কারে যাত্রা

আরও তিন বৎসর অতিবাহিত হইল। এই দীর্ঘকাল ফ্র্যাঙ্কলিন আপন মনে পৃথিবীর ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে লাগিলেন। তিন বৎসরের পর তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধির মন্দির-তলে উপনীত হইল।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটার্লু যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবীর নেপোলিয়ানের পরাজয়ের পর যুদ্ধের উদ্বেগ দূরীভূত হওয়ায় গভর্ণমেন্টের মনে উত্তর মেরু আবিষ্কারের কথা জাগিয়া উঠিল। ফলে অভিযান প্রেরণের বন্দোবস্ত হইল এবং এই অভিযানে ফ্র্যাঙ্কলিন অধ্যক্ষের নিম্নস্থ পদলাভ করিলেন। উত্তর মেরু আবিষ্কার এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। কাপ্তেন ডেভিড বুকান এই অভিযানের সর্বময় কর্তা ছিলেন; এই অভিযানে দুই বৎসরের উপযোগী খাদ্যসম্ভার ও দুইখানি জাহাজ প্রদত্ত হইল; প্রথম জাহাজ ডোরোথিয়া, ইহার অধ্যক্ষ কাপ্তেন বুকান স্বয়ং; দ্বিতীয় জাহাজ ট্রেণ্ট; ইহার অধ্যক্ষ হইলেন ফ্র্যাঙ্কলিন ...

উভয় জাহাজ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল অশুভমুহূর্তে টেমস নদী হইতে যাত্রা করে।

ডেভিডের উপর আদেশ ছিল—স্পিট্‌স্‌বার্জেন ও গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া গিয়া সুবিধাজনক অবস্থায় মেরু প্রদেশে উপনীত হওয়া ও যদি সম্ভব হয়, তবে বেরিং প্রণালীর দিকে যাত্রা করা। এই অভিযানে প্রথম হইতে অশুভ লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল; ফ্র্যাঙ্কলিনের জাহাজে জল-প্রবেশ করিতে লাগিল; এই জল প্রবেশের কারণ অনুসন্ধানে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল; তৎপরে দেখা গেল একটি অসতর্ক নাবিক একটি বল্টু খুলিয়া ফেলিয়াছে।

এই অভিযানে ফ্র্যাঙ্কলিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাহা আদৌ সুখকর ছিল না; কিন্তু এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী অভিযানে তুলনাহীনরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

তুষার-স্তূপের সহিত রোমাঞ্চকর ঘটনা

একবার তিনি একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় করিয়া বিস্তৃত তুষার-ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। হঠাৎ কর্ণ-বধিরকারী শব্দ চতুর্দিক্ বিদীর্ণ করিল। চমকিত ফ্র্যাঙ্কলিন দেখিলেন যে, একটি বিরাট্ তুষার-স্তূপ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখন পলায়নের অবসর ছিল না; ফলে ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর দেখা গেল না। ভীষণ গর্জন সহকারে তুষার-স্তূপ সমুদ্রে নিপতিত হইল; এবং অবিলম্বে ক্ষুদ্র নৌকাকে গ্রাস করিবার সম্ভাবনা দেখা গেল। সামান্য সময় অতিবাহিত হইবার পর ভীমকায় তুষার-স্তূপ আবার দেখা দিল, তৎকালে উহা জলের উপরিভাগে ১০০ ফিট উচ্চে অবস্থিতি করিতেছিল। জলরাশি ভীষণভাবে আন্দোলিত করিয়া ইহা নূতনভাবে গঠিত তুষার-স্তূপের মত সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল। আশ্চর্যের বিষয় এই ভয়াবহ অবস্থাতেও ফ্র্যাঙ্কলিনের ক্ষুদ্র নৌকা রক্ষা পাইল। এমন কি ফ্র্যাঙ্কলিন বা তাঁহার সহযাত্রিদলের দেহে একটি আঁচড়ও লাগে নাই—ইহাই ভগবানের

দেশে প্রত্যাবর্তন

উভয় অধ্যক্ষ অচিরে উপলব্ধি করিলেন যে মেরু প্রদেশে যাওয়ার সহজ রাস্তা নাই। চতুর্দিকে তুষার ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতে বা পশ্চাতে হটিতেও সমর্থ ছিলেন না—তাঁহাদের জাহাজ আটকাইয়া গিয়াছিল। বিশেষত মেরু প্রদেশের ভীষণ তুষার-ঝড় কয়েক দিন ধরিয়া অবিরাম কষ্ট দিতেছিল। সুতরাং তুষার-ঝড়ের প্রকোপ হ্রাস-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বুকান দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন। ফলে মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর ডোরোথিয়া ও ট্রেন্ট নিরাপদে দেশে ফিরিয়া ডেফট্‌ফোর্ড বন্দরে নঙ্গর ফেলিল।

অভিযানের কার্যাবলী

যদিও এই অভিযান স্বীয় উদ্দেশ্য—মেরু প্রদেশ আবিষ্কার—সংসাধিত করিতে পারে নাই; তথাপি ইহা বহু প্রয়োজনীয় কার্য সংসাধিত করিয়াছে। এই অভিযান সপ্রমাণ করিল যে, এখনও এমন লোক বর্তমান যাহারা মানবজাতির উন্নতির জন্য যে কোন দুঃখ-ক্লেশ, যে কোন কঠোরতা বরণ করিতে পারেন; এমন কি প্রয়োজন হইলে হাসিমুখে প্রাণসমর্পণেও কাতর নহেন। এইরূপ লোকের অগ্রণী ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন। তিনি বৃথাই বুকানকে তাঁহাকে মেরু প্রদেশে অবস্থানের অনুমতি দানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাহাতে যখন জলবায়ুর অবস্থা অনুকূল হইবে, তখন মেরু-প্রদেশ আবিষ্কারের চেষ্টা করা চলিবে।

ফলে ফ্র্যাঙ্কলিনের তীব্র অনুরাগ এবং অধ্যক্ষজনোচিত গুণাবলীর দ্বারা মুগ্ধ গভর্ণমেণ্ট পুনরায় তাঁহার অধীনে অভিযান প্রেরণের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল উত্তর আমেরিকার অজ্ঞাত উত্তর উপকূলের আবিষ্কার এবং যদি সম্ভব হয়, তবে স্থলপথে কপারমাইন নদীর নিকটবর্তী উত্তর মেরু প্রদেশে গমন।

বৈজ্ঞানিক ডক্টর জন রিচার্ডসন এবং জর্জ ব্যাক ও রবার্ট হুড। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে এই অভিযান ইংল্যণ্ড পরিত্যাগ করে। তবে সকলে অভিযানের সফলতা বিষয়ে কৃতনিশ্চয় ছিল।

অভিযানে কষ্ট

আগষ্ট মাসের শেষভাগে অভিযান "হাডসন বে"তে উপনীত হইল। কয়েক দিন পরে ফ্র্যাঙ্কলিন সদলবলে মহাদেশের উপর দিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। যাত্রা পথে তাঁহারা সঙ্গে কয়েকখানি বহনক্ষম ডোঙ্গা লইয়া ছিলেন। যাত্রার বিভিন্ন স্তরে তাঁহাদের সঙ্গে রেড্ ইণ্ডিয়ান শিকারী ও এস্কিমো দোভাষী ছিল। ফ্র্যাঙ্কলিন দ্রুত সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এত আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, শীতের মধ্যভাগে যাত্রা চলিতেছিল। অবশেষে ১৫০০ মাইল চলিবার পর "ফোর্ট এণ্টারপ্রাইজ" নামক স্থানে বিশ্রামশিবির সংস্থাপিত হইল। খাদ্য-হ্রাস, থার্মোমিটারের পারা জমিয়া যায় এমন প্রচণ্ড শীত এবং সঙ্গে সঙ্গে মশকের উপদ্রব যাত্রাপথের দুঃখকষ্ট বাড়াইয়া তুলিল। একবার ফ্র্যাঙ্কলিন একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া খরস্রোতা স্রোতস্বতী অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ পদস্খলন হয় এবং তিনি ভীষণ স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতে থাকেন; পিচ্ছল তীরে তিনি ধরিবার মত কিছুই পাইলেন না; ফলে স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন; অবশেষে জলের উপরিভাগে অবস্থিত একটি বৃক্ষশাখা ধরিয়া ঝুলিতে থাকেন; অবশেষে তাঁহাকে উদ্ধার করা হয়।

নূতন খাদ্য-সরবরাহের প্রচেষ্টায় ব্যাক

শীতাবাসে অবস্থান কালে খাদ্যভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত হইল। সুতরাং অন্য কোন আবাসস্থলের দিক্ হইতে নূতন খাদ্য-সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল। অসমসাহসী ব্যাক এই কার্য-সংসাধনের ভার লইলেন। এই অভিযানের প্রত্যেক পদে তাঁহার বীরত্বময় কার্যকলাপ

উপবাসী থাকিয়াও ৪ মাসে প্রায় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেন। অতঃপর তিনি সুচারুরূপে নিজের অভীষ্টসিদ্ধি করেন।

বসন্তের আগমনে ফ্র্যাঙ্কলিন "কপারমাইন" নদীর মোহনা পর্যন্ত গমন করেন এবং আমেরিকার মেরু প্রদেশের উপকূলভাগ আবিষ্কার করেন, এই কার্যে তিনি আরও বহুবিধ মূল্যবান্ আবিষ্কার কার্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। যখন ঋতুর বৈপরীত্যের জন্য তিনি প্রত্যাগমনে বাধ্য হন, তখন তিনি ভিন্ন পথে "ফোর্ট এণ্টারপ্রাইজ" নামক শিবিরে উপনীত হইবার জন্য যাত্রা করেন এবং এই যাত্রায় তিনি একটি নূতন নদী আবিষ্কার করিয়া স্বীয় উদারস্বভাবের পরিচয়ে রবার্ট হুডের নামানুসারে উহার "হুড" নামকরণ করেন।

ক্ষুধার তাড়নায় পুরাতন জুতা ভক্ষণ

পরবর্তী কয়েক মাস অভিযানকারিগণ ক্ষুধায় ও শীতে মৃত্যুর সঙ্গে তীব্র সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ দুঃখ-কষ্টের কাহিনী খুব বহুল নহে। তবে এই মানব-ক্লেশের চরম সীমায় কয়েকজন স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষের নাম উল্লেখযোগ্য এবং তাঁহারা মানবের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ তাঁহারা একপ্রকার বন্য তরুর উপর নির্ভর করেন। কয়েক দিন তাঁহারা কোন রকম খাদ্যদ্রব্যই পাইলেন না; এমন কি সময়ে সময়ে ক্ষুধার তাড়নায় তাঁহারা পুরাতন জুতা উপাদেয় বোধে গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন!

এইরূপে যখন তাঁহারা ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেন; তখন ভীষণভাবে তুষার-ঝড় বহিতে সুরু করিল এবং তাঁহাদিগকে তৃণের মত উড়াইয়া লইয়া চলিল। ফলে ফ্র্যাঙ্কলিন বাধ্য হইয়া অভিযানকে বিভক্ত করিলেন। প্রথমে ব্যাককে পাঠাইয়া দেওয়া হইল; তাঁহার পশ্চাতে ফ্র্যাঙ্কলিন ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সর্ব পশ্চাতে ৮জন লোক রহিল, তন্মধ্যে ডক্টর রিচার্ডসন ও সবল নাবিক জন হেপবার্ণ জীবিত ছিলেন। লাগিল, এমন সময় ব্যাক খাদ্য ও কয়েকজন ইণ্ডিয়ান সহ অপ্রত্যাশিতভাবে উপনীত হইয়া সকলের জীবন রক্ষা করেন।

অতঃপর ফ্র্যাঙ্কলিন সদলবলে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

সম্মান-লাভ

দেশে ফিরিয়া ফ্র্যাঙ্কলিন জানিতে পারিলেন যে, তিনি কম্যাণ্ডার পদে উন্নীত হইয়াছেন এবং তাঁহার পুরস্কারস্বরূপ অ্যাড্‌মিরাল্‌টি তাঁহাকে কাপ্তেনের শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আরও বহু সম্মান-লাভ তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল, তন্মধ্যে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো পদ উল্লেখযোগ্য।

এই সময় কম্যাণ্ডার প্যারি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাকে ফ্র্যাঙ্কলিন সকল সম্মানের পুরোভাগে স্থান দান করেন। প্যারিও একজন উত্তর মেরুর আবিষ্কারক। তিনি লিখিলেন—"তুমি ও তোমার দলের লোকের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের অতি মহৎ দৃষ্টান্ত সুপরিস্ফুট। আমি সেটল্যাণ্ডে তোমার চিঠি পাই; অবশ্য আমি বলিতে লজ্জিত নহি যে, উহা পাইয়া আমি বালকের মত ক্রন্দন করিয়াছিলাম। আমি যে অশ্রু-বিসর্জন করিয়াছিলাম, তাহা গর্ব ও আনন্দের—গর্ব এই জন্য যে, আমিও তোমার স্বদেশবাসী, সহকর্মী এবং বন্ধু।"

বিবাহ

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে ফ্র্যাঙ্কলিন Eleanor Anne Porden নাম্নী মহিলাকে বিবাহ করেন। তিনি এই মহিলার নামানুসারে উত্তর মেরু প্রদেশে আবিষ্কৃত কয়েকটি দ্বীপের নামকরণ করিয়াছিলেন। বিবাহকালে উভয়ে এই সর্তে সম্মতি দান করিয়াছিলেন যে, যদি ভবিষ্যতে কখনো আবিষ্কারার্থ প্রেরিত অভিযানে তাঁহাকে অধ্যক্ষ মনোনীত করা হয়, তবে এই বিবাহ তাহাতে বাধাস্বরূপ দাঁড়াইতে পারিবে না। ইহাতে তাঁহার মহতী কর্তব্যপরায়ণতা প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহা

যখন এই সর্তের পরীক্ষাকাল সমাগত হইল তখন দেখা গেল স্বামি-স্ত্রী উভয়ে উহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনে ইচ্ছুক। দুঃখের বিষয় পরে এই বিচ্ছেদ নির্মম বিয়োগান্ত ঘটনায় পর্যবসিত হইয়াছিল!

নবীন অভিযান ও স্ত্রীর মৃত্যু

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে আবার কর্তব্যের আহ্বান কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইল। দুঃখের কথা, তখন তাঁহার স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি পুনরায় ব্যাক ও রিচার্ডসনের সঙ্গে ইংল্যণ্ডের উপকূল ত্যাগ করেন, তখন তিনি মনে মনে অনুভব করিয়াছিলেন যে, হয়ত ফিরিয়া আসিয়া আর স্ত্রীর দেখা পাইবেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অন্তরের বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছিল। তখনও তিনি বহুদূর গমন করেন নাই—স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ উপনীত হইল।

ইংল্যণ্ড ত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার হাতে একখানা রেশমী ইউনিয়ান জ্যাক পতাকা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহা যেন মেরু প্রদেশে উড্ডীন করা হয়। ফ্র্যাঙ্কলিন স্ত্রীর শেষ অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

অভিযানের সফলতা

এই অভিযান প্রথম হইতে সফলতা অর্জন করে। নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা করিয়া ফ্র্যাঙ্কলিন গ্রেট শ্লেভ লেক অভিমুখে গমন করেন; তৎপরে ম্যাকেঞ্জী নদীর দিকে অগ্রসর হন। এই নদী ধরিয়া নিম্নদিকে ফোর্ট নরম্যান নামক স্থানে উপনীত হন। পরে ব্যাক শীতকালীন শিবির নির্মানের জন্য গ্রেট বেয়ার লেকে যাত্রা করেন এবং ফ্র্যাঙ্কলিন ম্যাকেঞ্জী নদীর মোহনা পর্যন্ত গমন করিলেন। অতঃপর ফোর্ট ফ্র্যাঙ্কলিনে শীতকালের জন্য ফিরিয়া আসেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে অভিযান ম্যাকেঞ্জী নদীর বদ্বীপে অবতরণ করে; এই স্থান হইতে ব্যাক ও ফ্র্যাঙ্কলিন পশ্চিম দিকে ৪০০ মাইল উপকূল আবিষ্কার করিলেন। [illegible]

উপনীত হন এবং উত্তরে "ওলাষ্টন" ল্যাণ্ড দেখিতে পান। দুই বৎসর পরে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ১০০০ মাইল উপকূল আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। অবশ্য কোন আবিষ্কারক দুইবার অভিযানে এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এতদ্ভিন্ন বহু নূতন উপসাগর, অন্তরীপ প্রভৃতি আবিষ্কার করেন, এই সমস্ত আবিষ্কারের কতকগুলিতে তাঁহার নাম সংযুক্ত আছে, তবে তাহাতে তাঁহার নিজের কোন হাত ছিল না; বন্ধু ডক্টর রিচার্ডসনের আগ্রহই উহার মূলে বর্তমান। যদিও পুনরায় মশার উপদ্রব, রেড্ ইণ্ডিয়ান ও এস্কিমোদিগের আক্রমণ অভিযান ব্যাহত করার চেষ্টা করে, তথাপি তিনি সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া সদলবলে দেশে ফিরিয়া আসেন। এই অভিযানে তিনি যে বহুমূল্য ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কার্য নিষ্পন্ন করেন, তজ্জন্য তিনি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নাইট শ্রেণীতে উন্নীত হন।

দ্বিতীয়বার বিবাহ

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে নাইট শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার কয়েক-মাস পরে তিনি Jane Griffin নাম্নী মহিলাকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন; এই মহিলা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন।

এইরূপ দীর্ঘ ভ্রমণের অবসানে ফ্র্যাঙ্কলিন অনেকটা নীরব জীবনযাপন করিতে থাকেন। রেইনবো নামক জাহাজের অধ্যক্ষরূপে তিনি ভূমধ্যসাগরে কার্য করেন; তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীরা তাঁহাকে এত ভালবাসিত যে, তাঁহার জাহাজকে তাহারা ফ্র্যাঙ্কলিনের স্বর্গ বা স্বর্গীয় রামধনু আখ্যা দান করিয়াছিল।

১৮৩৬ হইতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভ্যান ডিয়েমেন্স্ দ্বীপের লেফ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর ছিলেন।

তৃতীয় অভিযানে যাত্রা

ফ্র্যাঙ্কলিন যখনই কোন কাজ গ্রহণ করিতেন, সেই

প্রয়োজনীয় কার্যে প্রয়োজন হয়, তবে তিনি পদত্যাগ করিতে পারিবেন। তখনও তাঁহার মধ্যে বালককালের ভ্রমণস্পৃহা বর্তমান ছিল; তখনও অন্তরলোকে উঁকি মারিয়া যাইত রমণীয় মেরু প্রদেশের অজ্ঞাত দেশের ছবি; তখনও অজানার কৌতুহল তাঁহাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিত।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফ্র্যাঙ্কলিন সংবাদ পাইলেন যে, গভর্ণমেণ্ট উত্তর-পশ্চিম পথের পূর্ণ অনুসন্ধানের জন্য আবার অভিযান প্রেরণ করিবেন। অবশ্য অভিজ্ঞতায় তাঁহার মত উপযুক্ত লোক অভিযান-পরিচালনার্থ কেহ ছিল না, কিন্তু তিনি জীবনের সায়াহ্নের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং গভর্ণমেণ্ট একজন তরুণ নেতার সন্ধান করিতেছিলেন। উহা শুনিয়া ফ্র্যাঙ্কলিন অন্য কাহাকেও অভিযানের অধ্যক্ষ পদ প্রদানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেন, ফলে তাঁহাকে অ্যাড্‌মির্যালটি বিভাগ সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করিল। প্রথম লর্ড সাক্ষাতের সময় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি প্রকৃতই এই বয়সে এই কঠোর শ্রম-সাধ্য অভিযানে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন কি না; কারণ লর্ড জানেন যে, তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর। ইহার উত্তরে ফ্র্যাঙ্কলিক বলিলেন যে, তাঁহার বয়স ৬০ নয়, মোটে ৫৯ বৎসর! বলা বাহুল্য তিনিই অভিযানের অধ্যক্ষ মনোনীত হইলেন।

সমস্ত প্রস্তুত হওয়ার পর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে Erebus ও Terror নামক দুইখানি জাহাজে ১৩৪ জন লোক সহ ফ্র্যাঙ্কলিন উত্তর মেরুর দিকে যাত্রা করিলেন। তিন বৎসরের উপযোগী খাদ্যসম্ভার, অতিরিক্ত এঞ্জিন প্রভৃতি সমস্তই দেওয়া হইল। গ্রীনল্যাণ্ড অতিক্রম করার পর ২৬শে জুলাই তাঁহাদিগকে ইয়োরোপীয়েরা দেখিয়াছিল; তৎপরে আর তাঁহাদের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। দিন মাসে বিলীন হইল; মাস বৎসরে লুকাইয়া গেল—কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিন-অভিযানের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। ইহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও লোকসকল শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ফলে সাহায্য-অভিযানের জন্য জন-সাধারণ অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল।

অভিযানের পরিণাম

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম সাহায্য-অভিযান প্রেরিত হইল; ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে অন্য একটি অভিযান প্রেরিত হয়; ঐ বৎসরে আরও দুইটি অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহই কোন সন্ধান পাইল না। অবশেষে তাঁহাদের আশা পরিহার করিয়া ইংল্যণ্ড ও আমেরিকা হইতে অনুসন্ধান-অভিযান প্রেরিত হয়। এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ২০,০০০ পাউণ্ড ও ফ্র্যাঙ্কলিনের স্ত্রী ৩০০০ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১২খানি জাহাজ ফ্র্যাঙ্কলিনের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করে। অবশেষে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ম্যাক্‌ক্লিন্‌টক্ ফ্র্যাঙ্কলিনের পরিণাম সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ দূরীভূত করিতে সমর্থ হন। ফ্র্যাঙ্কলিনের ল্যাফ্‌টেন্যাণ্ট "গ্র্যাহাম-গোর" লিখিত সংবাদে সব খবর পাওয়া যায়। উপরিলিখিত সহচরের লিখিত অন্য একখানি কাগজও পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত ছিল যে, যে প্রণালী উত্তর আমেরিকাকে কিং উইলিয়্যাম ল্যাণ্ড এবং ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ড হইতে পৃথক করিয়াছে, তিনি সেই প্রণালীর মধ্য দিয়া গিয়াছেন। এই আবিষ্কার ফ্র্যাঙ্কলিনের মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে ঘটে। ফ্র্যাঙ্কলিন ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুন Erebus জাহাজে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কিন্তু কোন কোন লেখক বলেন যে, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফ্র্যাঙ্কলিন সদলবলে জাহাজ পরিত্যাগ করেন এবং ব্যাক্‌স্ ফিস্ নদীর দিকে যাত্রা করেন; একটি এস্কিমো নারী বলিয়াছিল, তাঁহারা হাটিতে হাটিতে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছিলেন।

এইরূপে এই অসমসাহসী নাবিকের জীবন-নাট্যে মৃত্যুর যবনিকা নিপতিত হইল।

ফ্র্যাঙ্কলিনের চরিত্র

অসমসাহসী নাবিক ফ্র্যাঙ্কলিন প্রকৃতিতে বালকের মত সরল ছিলেন। কিন্তু সুদৃঢ়সঙ্কল্প, ব্যক্তিগত বিপদে ঔদাসীন্য অনেক সময়

নির্ভীকতা, বিপদে চতুরতা ও কৌশল অবলম্বনের ক্ষমতা, আবেশময় অধ্যক্ষের ভাব এবং সাহস সহকারে বিপজ্জনক কার্যে অগ্রগামী হওয়া প্রভৃতি ফ্র্যাঙ্কলিনের চরিত্রের বিশেষত্ব।• এই সমস্ত সদ্‌গুণের প্রভাবে তিনি জীবনে সিদ্ধির পথ কুসুমাকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সমস্ত গুণাবলী একমাত্র নৌসেনাপতি নেলসনের চরিত্রে প্রতিভাত হয়; সুতরাং বলা চলে, যদি ফ্র্যাঙ্কলিন আবিষ্কার-কার্যে অগ্রসর না হইয়া নৌসৈন্যরূপে জীবন অতিবাহিত করিতেন, তবে তিনিও হয়ত রণ-প্রতিভার দীপ্তরশ্মি বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইতেন।

কবিবর প্রিয়নাথ সেন

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(১৬)

প্রথম সংস্করণের "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্য আমরা পাইয়াছি। ইহা ১৭৯৭* শকাব্দায় "বাল্মীকি যন্ত্র" হইতে প্রকাশিত। ইহা একখানি রূপক কাব্য। তাই প্রচ্ছদপত্রের পর দুই পৃষ্ঠায় লেখক "রূপকের দুর্বোধ অংশের তাৎপর্য" প্রদান করিয়াছেন। তারপর "সংক্ষিপ্ত বচনের উচ্চারণ পদ্ধতি" (তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী) দেওয়া হইয়াছে। সচরাচর এ জিনিসটি কোন পুস্তকে দেখা যায় না। এই অধ্যায়-শীর্ষে লেখক বলিতেছেন—"নিম্নলিখিতের স্থূলমর্ম আয়ত্ত না করিলে গ্রন্থ অধ্যয়নের সময় অনেকের অনেক স্থানে ঠেকিবে।" ইহাতে একচল্লিশটি মূল বচনের 'সংক্ষিপ্ত বচন' ও 'উচ্চারণ' নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া হইয়াছে :—

"মূল বচন	সংক্ষিপ্ত বচন	উচ্চারণ
বইস	ব'স	বোসো
বসিও	বস্তো	বোসো
আইস	এ'স	এসো
আসিও	এস্তো	এসো"

পুস্তকখানি ডিমাই আট পেজী আকারে ২৪৩ পৃষ্ঠায় এবং সাতটি সর্গে সমাপ্ত। সর্গগুলি নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত :—

প্রথম সর্গ—মনোরাজ্য-প্রয়াণ	...	১	হইতে	৮ পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় সর্গ—নন্দনপুর-প্রয়াণ	...	৮	,,	৫৭ ,,
তৃতীয় সর্গ—বিলাসপুর-প্রয়াণ	...	৫৭	,,	১০৪ ,,
চতুর্থ সর্গ—বিষাদপুর-প্রয়াণ	...	১০৫	,,	১২৯ ,,
পঞ্চম সর্গ—রসাতল-প্রয়াণ	...	১২৯	,,	১৬৬ ,,
ষষ্ঠ সর্গ—সমর-প্রয়াণ	...	১৬৭	,,	১৯৮ ,,
সপ্তম সর্গ—শক্তি-প্রয়াণ	...	১৯৯	,,	২৪৩ ,,

প্রথম প্রকাশের ৪০ বৎসর পরে এই গ্রন্থের নবম সংস্করণ হয় এবং সেই সময়ে প্রিয়নাথ বাবু ইহার সমালোচনা-কার্যে ব্যাপৃত হন। কিন্তু দুঃখের সহিত এখানে বলিতে হইতেছে, প্রিয়নাথ বাবু ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

প্রিয়নাথ বাবুর রচনাবলীর পরে প্রায় ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি 'পরিশিষ্ট' অংশ আছে। এই অংশ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) বিভাগে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়গণের পঁচিশখানি মূল্যবান্ পত্র এবং প্রিয়নাথ বাবুর একখানি পত্র (রবীন্দ্রনাথকে লেখা) স্থান পাইয়াছে। (খ) বিভাগে প্রিয়নাথবাবুর পরলোক-গমনের পর তাঁহার সাহিত্যবন্ধুরা এবং সংবাদপত্রসমূহ

* ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ বা ১২৮২ সাল।

যাহা লেখেন তাহা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই সাহিত্য-বন্ধুদিগের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী ও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর নাম উল্লেখযোগ্য। আমরা এখানে সুলেখক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"৺প্রিয়নাথ সেন

সকল দেশে সকল যুগেই এমন জনকতক লোক থাকেন, যাঁরা পাঠক সমাজের কাছে বিশেষ পরিচিত না হলেও, সে যুগের লেখক সমাজের কাছে সুপরিচিত। এ শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের মনের ছাপ সাহিত্যের উপর নয়,—সাহিত্যিকদের উপর রেখে যান। এঁরা লেখকদের সহজ বন্ধু এবং এঁদের সঙ্গে আলাপে নবীন লেখকেরা আনন্দও পান, শিক্ষাও লাভ করেন। ৺প্রিয়নাথ সেন এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। বাংলা দেশে এ জাতীয় লোক নিতান্ত দুর্লভ, সুতরাং তাঁর অভাবে তাঁর লেখক বন্ধুরা যেরূপ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, নিজেদের সেইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত মনে করলেন। লেখক হিসাবে যাঁরা ৺প্রিয়নাথ সেনের নিকট ঋণী আমি তার মধ্যে একজন।

আজ ছাব্বিশ কি সাতাশ বৎসর পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে সঙ্গে করে প্রিয়নাথ সেনের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর ঘরে প্রবেশ করবামাত্র আমি বুঝলুম যে তিনি আর আমি, আমরা দু'জনেই জীবনের সেই এক পথের পথিক, যে পথ সকলে অবলম্বন করেন না; সুতরাং আমাদের উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তা জন্মাতে বাধ্য।

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক টাকা ভালবাসে—আর কিছু ভালবাসে না। কিন্তু সকল দেশের সকল সমাজেই এমন জনকতক লোক থাকেন, টাকার একান্ত মায়া যাঁদের ধাতে নেই। তাঁরা হয় টাকা ভালবাসেন না, নয় টাকা ছাড়া আরও কিছু ভালবাসেন—এবং সম্ভবতঃ তা টাকার চাইতে ঢের বেশী পরিমাণে। এ জাতের অনুরাগকে বৈষয়িক লোকেরা নেশা বলে থাকেন। আমাদের দেশে কারও কারও গানবাজনার নেশা আছে। বিলেতের লোকদের গানবাজনা ছাড়া আরও পাঁচরকমের নেশা আছে। সে দেশে কেউবা ফুল ভালবাসে, কেউবা ছবি, কেউবা শিকার, কেউবা কুকুর।—কিন্তু বই ভালবাসে এমন লোক সব দেশেই কম—এবং আমাদের দেশে নেই বল্লেও হয়। বিলেতে সকলে সরস্বতীর পূজা করুন আর না করুন, ঘরের এক কোণে তাঁর ঠাট্ সাজিয়ে রাখতে বাধ্য হন। তার কারণ, সে দেশে যাঁর বৈঠকখানায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের অন্ততঃ দু'একশ বই না থাকে, তিনি ভদ্রসমাজে ভদ্রলোক বলে গণ্য হন্ না। এদেশে ঠিক তার উল্টো। আমাদের সমাজে যিনি বই ভালবাসেন, বুদ্ধিমান্ লোকেরা তাঁকে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখেন; বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির যে কোন সম্পর্ক আছে, বিজ্ঞ লোকেরা তা সহজে স্বীকার করেন না। এঁদের মতে বই পড়াটা একটা বাতিকের মধ্যে। বই পড়াটা না হো'ক কেনাটা যে একটা বাতিক, এ কথা আমরা সকলেই স্বীকার করি। এ বাতিক আমারও আছে, এবং ৺প্রিয়নাথ সেনেরও যে পুরোমাত্রায় ছিল, তার প্রকৃষ্ট ও অপর্যাপ্ত প্রমাণ তাঁর গৃহে প্রবেশ করবামাত্রই পাওয়া যেত। একেবারে আসবাবহীন তাঁর ঐ ছোট কুটরীটি আমার চোখকে যে পরিমাণ আনন্দ দিয়েছিল, তার সিকির সিকি আনন্দও এ দেশের বিলাতি-আসবাব-সঙ্কুল, চিত্রবিচিত্র রাজপ্রাসাদ দর্শনে আমি কখনও পাই নি।—সেকালে গৃহাভ্যন্তরে পুস্তককে উচ্চ আসন দেবার ফ্যাসান আমাদের ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল না,—আজকাল হয়েছে। লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা এবং প্রিয়পাত্রেরা যে সরস্বতীর হস্তের বীণার না হো'ক, পুস্তকের আদর করতে শিখেছেন, এ অবশ্য অতীব সুখের বিষয়। কিন্তু বই কেনার ফ্যাসান ও তার ব্যসনের মধ্যে অনেকটা প্রভেদ আছে।

ধনী লোকদের পোষা লাইব্রেরীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে, তা সরস্বতীর মন্দির নয়,—সমাধি-মন্দির। মনে হয়, ও-সব ক্ষেত্রে পুস্তকাবলী যেন মলাটের কফিন-বন্দী হয়ে চিরশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয়

নিয়েছে। ৺প্রিয়নাথ সেনের বই যে গৃহসজ্জার জন্য সংগৃহীত হয় নি, সে যে ধনীর নয়, গুণীর হাতের বই,—তা বুঝতে কারও দেরি হত না। কেন না তাঁর বই দেওয়ালের গায়ে ছবির মতন সাজানো থাকত না, আশেপাশে ছড়ানো থাকত। মেঝের উপর, ঘরের কোণে, বেঞ্চের উপর, যেখানে চোখ পড়ত সেইখানেই দেখা যেত, অসংখ্য বই স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। গৃহস্বামী যে সেগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তার প্রমাণ তাদের বিপর্যস্ত অবস্থার ভিতরেই পাওয়া যেত। এই অনাদরই তাদের যথার্থ আদরের পরিচয় দিত।—আর সেই পুস্তকরাশির অধিকাংশ সেই জাতের, যাদের দর্শন কলিকাতার কোন বইয়ের দোকানে কিম্বা ধনিলোকের পুস্তকাগারে দু'বেলা মেলে না।—অর্থাৎ ইয়োরোপের নব সাহিত্যে তাঁর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল।

এই বই ভালবাসাটা সাহিত্যানুরাগের বাহ্য লক্ষণ হলেও, একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যাঁরা যথার্থ সাহিত্য ভালবাসেন, তাঁরা সাহিত্যের শুধু রস নয়, রূপও ভালবাসেন।

আমরা উভয়ে একই রসের,—সাহিত্য-রসের,—রসিক বলে, সেই প্রথম সাক্ষাতে আমাদের উভয়ের মধ্যে যে আত্মীয়তা জন্মায়, তা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। যদিচ তখন আমি কলেজের ছাত্র, এবং তিনি সাহিত্য-সমাজে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তবুও পাঁচ মিনিটের আলাপে আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠলুম। তার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। পৃথিবীতে যিনি বিষয়-সম্পত্তি ছাড়া অপর কোনও বস্তুতে সুখ পান, তিনি আর পাঁচজনকে সে সুখের ভাগ দিতে চান্। সংসারে যে আমাদের দুঃখের দুখী, সেই যেমন আমাদের যথার্থ বন্ধু—মনোরাজ্যে তেমনি যে আমাদের সুখের সুখী, সেই আমাদের যথার্থ বন্ধু। ৺প্রিয়নাথ সেন ফরাসী সাহিত্যের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। ফরাসী সাহিত্যের প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল বলে, প্রথম থেকেই তিনি আমাকে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুশ্রেণীতে ভুক্ত করে নেন্।

আমি পূর্বে বলেছি—৺প্রিয়নাথ তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের মনের উপর তাঁর মনের ছাপ রেখে গেছেন। এর কারণ, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ appreciation ছিল।

তিনি সাহিত্যের একজন যথার্থ গুণগ্রাহী ছিলেন। কাব্যের সর্ব্বপ্রধান গুণ যে তার রস, এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, এবং আমার বিশ্বাস কাব্যে তিনি এই রস ব্যতীত অপর কোনও গুণের সন্ধানে ফিরতেন না। আমাদের পাঁচজনের আর পাঁচ বিষয়ে মন আছে,—যথা রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি,—কিন্তু ৺প্রিয়নাথ সেন এ সকল বিষয়ের আলোচনায় কখনও নিজের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতেন না। একমাত্র সাহিত্যের প্রতিই তাঁর ঐকান্তিক প্রীতি ছিল, এবং তিনি তাঁর সকল মন সকল প্রাণ দিয়ে আজীবন একমাত্র সাহিত্যের চর্চা করেছেন। সাহিত্যের এই একাগ্র চর্চার ফলে তাঁর সহজ রসবোধ যেমন পরিপুষ্ট হয়েছিল, কাব্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতও তেমনি উদারতা লাভ করেছিল। তিনি জানতেন যে, সাহিত্যজগতে এমন কোনও কষ্টিপাথর নেই, যার সাহায্যে সকলপ্রকার কাব্য সমান যাচিয়ে নেওয়া যেতে পারে। রূপে গুণে Shelleyর কবিতার সঙ্গে Gautierএর কোনও সাদৃশ্য না থাকলেও,—এ দুই যে কাব্য, এবং উঁচুদরের কাব্য, এ জ্ঞান আমাদের সকলের নেই; তাঁর ছিল। তাঁর মন সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও তৈরী মতামতের অধীন ছিল না বলে, তিনি সাহিত্যে নববস্তুর গুণগ্রহণ করতে পারতেন,—অবশ্য তাতে যদি কোনও গুণ থাকত। তাই আমাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের লেখা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতুম, এবং সে লেখা তাঁর মনোমত হলে আশ্বস্ত হতুম।

৺প্রিয়নাথ সেনের অভাবে তাঁর লেখকবন্ধুরা যে নিজেদের একান্ত ক্ষতিগ্রস্ত মনে করছেন, তার কারণ,—সাহিত্যে সুরের কাণ সকলের নেই; শুধু তাই নয়, কাব্যকে কাব্য হিসেবে না দেখে,—দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি কিম্বা সমাজনীতির অঙ্গ হিসাবে দেখবার এবং সেই হিসেবে বিচার করবার সহজ পদ্ধতিটি অবলম্বন করাটাই একালের দস্তুর হয়ে উঠেছে।

৺প্রিয়নাথ সেন আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে যে বিশেষ কিছু ধনরত্ন রেখে যান নি,—অর্থাৎ তিনি যে একজন বড় লেখক হন নি,—তার কারণ তিনি ছিলেন একজন বড় পাঠক। সাহিত্যের স্ফূর্তি ও উন্নতির জন্য লেখকও চাই, পাঠকও চাই; কেননা এ উভয়ের মনের সংযোগ না হলে সাহিত্য বাড়্‌তে পারে না। এবং এ দেশে এ যুগে, গুণী লেখকের মত, সমজদার পাঠকও শতেকে জনেক হয়। সেই একশ'র মধ্যে একজনের মৃত্যুতে সাহিত্য-সমাজের একটি উচ্চ আসন শূন্য হয়ে পড়ে। তাই ৺প্রিয়নাথ সেন আমাদের সাহিত্য-সমাজে একটি বড় ফাঁক রেখে চলে গিয়েছেন।" সবুজ পত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২৩

সমাপ্ত

বাংলা-মায়ের রূপ

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রাঙাপাড়া ও তেজপুর

রাঙাপাড়া ঠিক বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা আসামের কুক্ষিগত একটি ক্ষুদ্র স্থান। ব্যবসাবাণিজ্যের পক্ষে রাঙাপাড়া তেমন উপযোগী নহে, যেহেতু ইহার এমন কোন বৈচিত্র্য চোখে পড়িল না, যাহাতে রাঙা-পাড়াকে কেন্দ্র করিয়া ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব।

রাঙাপাড়া নর্থ তেজপুর-বালিপাড়া রেলপথ ও ই বি রেলপথের সংযোগস্থল। সেই জন্য ষ্টেসনটি একটি গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ষ্টেসনকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র একটি বাজার, একটি হিন্দু হোটেল ও রেলকর্মচারীর আবাসস্থান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। কিছু দূরে মেঘ-সদৃশ পাহাড়ের অবস্থিতি স্থানটিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে।

তেজপুর-বালিপাড়া লাইন মাত্র ১৯ মাইল রাস্তা; গাড়ীগুলি কলিকাতার ট্রামের মত; দুই পাশে কোনরূপ আচ্ছাদন নাই; গতিও মন্থর। মধ্যপথে "বিন্দুকুড়ির হাট" নামক একটি জনবহুল ষ্টেসন চোখে পড়ে।

রাঙাপাড়া হইতে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত ডরং জেলার প্রধান সহর তেজপুর। মনে পড়ে দীর্ঘকাল পূর্বে উদ্বোধন পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয় তাঁহার আসাম-ভ্রমণে তেজপুরকে রমণীয় উদ্যানের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। সেই হইতে তেজপুর দর্শনের অভিলাষ আমার অন্তরলোকে চিরজাগরুক ছিল। তাহার পর ভগবানের অপ্রত্যাশিত করুণায় ইতিপূর্বে দুইবার তেজপুর দর্শনের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তেজপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপরিস্থিত পার্বত্য নগর। বহু প্রবাসী বাঙালী তেজপুরের অধিবাসী। এক সময় তেজপুরে বাঙালীর প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল; কিন্তু বর্তমানে আসামীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সে প্রভাব অনেকটা হ্রাস-প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। তথাপি এখনও বাঙালী ডাক্তার, বাঙালী উকিল তেজপুরে বেশ দুপয়সা উপার্জন করে।

তেজপুরে কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। তন্মধ্যে উষা পাহাড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্থান ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক রক্ষিত। প্রাচীন প্রবাদ যে, এই স্থানে বাণরাজার রাজ্য ছিল; উক্ত উষা পাহাড়ে বাণরাজার প্রাসাদ ছিল; এখনও বহু খণ্ডিত ভগ্ন

প্রস্তর বুকে কত কারুকার্য লইয়া যে বিরাজমান, তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। পাহাড়টি খুব বেশী উচ্চ নহে; উপরিভাগে ভগ্ন বাটিকার চিহ্ন বিদ্যমান। লোকে উহাকে বাণরাজার পুরী বলিলেও আমার কিন্তু উহাকে বৌদ্ধ-বিহার বলিয়া মনে হইয়াছে। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ব লইয়া গবেষণা করিতেছেন, তেজপুর তাঁহাদের কিছু খোরাক যোগাইতে পারিবে। উষা-অনিরুদ্ধের প্রেমলীলা-ক্ষেত্ররূপে এই পাহাড় আমার নিকট প্রতিভাত হয় নাই; আমার মনে হইয়াছে যে কোন অতীত কালে এই স্থান ছিল সংসারত্যাগী নিস্পৃহ উদাসীন শ্রমণের আবাসভূমি; যেখানে প্রাতে ও সন্ধ্যায় অবলোকিতেশ্বরের উদ্দেশে উচ্চারিত স্তোত্র ব্রহ্মপুত্রের কলকল্লোলে মিশিয়া দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িত; যেখানে "অহিংসা পরমো ধর্মে"র বাণী প্রতি প্রস্তরখণ্ডের অঙ্গে অঙ্গে খোদিত ছিল; ধীর সমীরণ যেখানে শান্তির বার্তা বহন করিত, চন্দ্রকিরণে শ্যামলশোভা-পল্লবে অহিংসার ছবি বিম্বিত দেখা যাইত; যেখানে সাধক সাধনভূমের উচ্চ স্তরে অধিরোহণ করিয়া জন্মজরাব্যাধিমৃত্যুর নিরসনকল্পে নির্বাণের অমৃতময় প্রতিচ্ছবি গ্রহ-তারকার মৃদু আলোকে নিরীক্ষণ করিত! আজ আর কিছুই নাই—উষা-অনিরুদ্ধের প্রেমকাহিনী পুরাণের অন্তর্গত হইয়া হয়ত বাঁচিয়া আছে; কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুর কোন নিদর্শন আজ আর পাওয়া যায় না! কে বলিবে কোন্‌টা সত্য—এক দিকে নরনারীর প্রেমলীলা—অন্য দিকে যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত জ্ঞানাগ্নির তীব্র শিখায় ইন্দ্রিয়-সংযমের বিচিত্র চিত্র!

উষা পাহাড়ের পাশেই ভৈরবী পাহাড়। এই পাহাড়ের অবস্থান অতীব মনোরম। ইহা উষা-পাহাড় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইয়াছিল। ভৈরবী পাহাড়ের শীর্ষে ভৈরবীর মন্দির। চারি দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় নীল আকাশ দিক্‌চক্রবাল-রেখায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমে তরঙ্গিত গিরিশিখরমালা; দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ভীষণ ঘূর্ণি রচনা করিয়া বহমান; উত্তরে তেজপুর সহরের বাজার-অফিস-আদালত, লোকজনের বসতি। এই নির্জন ভৈরবী পাহাড় আমাকে খুবই মুগ্ধ করিয়াছিল। মনে হয় যেন কতকাল ধরিয়া এই স্থানে কত যোগী পরব্রহ্মের সাধনায় জীবনাতিপাত করিয়াছেন।

ভৈরবী পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীর ধরিয়া কত বন্য কণ্টকতরুগুল্ম ভেদ করিয়া ছুটিলাম "নরবলি" পাহাড় দেখিবার জন্য। পথ নাই বলিলেও চলে; সামান্য পথরেখা—তাহাও তৃণ-গুল্মে আচ্ছন্ন। দেহ ক্ষতবিক্ষত হইবার আশঙ্কা প্রতিপদে; ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি আমরা কয়েকজন উৎসাহী দর্শক; তন্মধ্যে একটি মহিলা বিশেষ সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং খুব সম্ভবত আমার যতদূর মনে হয় তিনিই অগ্রে সেই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন।

'নরবলি' পাহাড়ে একটি প্রস্তর-খণ্ডে কুণ্ডের মত গর্ত আছে; তথা হইতে জলনির্গমের পথও বর্তমান। পুরোভাগে প্রস্তরের যূপকাষ্ঠ। দেখিলে প্রাণে সত্য সত্যই ভীতির উদ্রেক হয়। তবে প্রকাশ্য দিবালোকে অনেক-গুলি লোক এক সঙ্গে থাকায় তেমন ভয় প্রাণের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে নাই। জনপ্রবাদে প্রকাশ, পূর্বে ঐ স্থানে মানুষ ধরিয়া বলি দেওয়া হইত।

কে জানে হয়ত কত হতভাগ্যের শোণিতে ঐ শিলাকুণ্ড পূর্ণ হইত; আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের ক্ষীণ প্রচেষ্টা হয়ত বৃক্ষরাজির শ্যামল পল্লবে, বল্লরীর লুলিত কুন্তলে কত করুণার রেখাই না আঁকিয়া গিয়াছে! স্থানটি দেখিয়া আমার মনে হইল যেন কোন অশরীরী প্রাণী এখনও ঐ স্থানের আকাশ-বাতাস করুণ ক্রন্দনে ভারাক্রান্ত করিতেছে! কে বলিবে—হয়ত যে সমস্ত হতভাগ্য ঐ প্রস্তর-যূপকাষ্ঠে স্বীয় মস্তক দান করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই হয়ত আসক্তির নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া ঐ স্থানে বিচরণ করে! আর তাহাদের মর্মন্তুদ মৃত্যুর স্মৃতি সহানুভূতিসম্পন্ন দর্শকের চিত্ত-বীণায় অজানা ঝঙ্কার তোলে!

বেশীক্ষণ দেখিতে ইচ্ছা হইল না। তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলাম।

সহরের মধ্যে কয়েকটি সুন্দর উদ্যান ও পদ্মপুষ্পসমন্বিত

দীর্ঘিকা বিদ্যমান। শরতের ফুল্লচন্দ্রকর যখন প্রস্ফুটিত কমলদলের মুদিত নয়নে প্রতিফলিত হয়, তখন যে স্বর্গীয় সুষমা পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসে, তাহার সহিত তুলনা করিলে জাগতিক সব কিছুই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। একটি উদ্যানে উষা পাহাড়ের কয়েকটি ভগ্ন মূর্তিও স্থান পাইয়াছে দেখিলাম।

জেলখানার পাশে "অব্‌জারভেটরী হিল"; উহা সহরের অধিবাসীর ভ্রমণের স্থান। পাহাড়টি ঠিক ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি ভেদ করিয়া উঠিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। স্থানে স্থানে ভ্রমণকারীর উপবেশনার্থ কয়েকখানা বেঞ্চিও বিন্যস্ত আছে। এক রমণীয় সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন ভ্রমণকারী এই স্থানে ভ্রমণার্থ সমাগত হইয়াছিলাম; "নরবলি" পাহাড়ের সঙ্গিনী মহিলাটিও ছিলেন। তখন আকাশে জ্বলিয়া উঠিয়াছে লক্ষ তারার দীপ কোন্ অজানা মহামহানের মঙ্গলারতির জন্য; নিম্নে ব্রহ্মপুত্রের নির্মল সলিলে তাহার প্রতিচ্ছবি শোভা পাইতেছে; দিগন্তের পরিমলবাহী মন্দ সমীরণ ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়া আমাদের দেহে স্নেহ-স্পর্শ বুলাইয়া দিল, মনে হইল যেন পৃথিবীর দুঃখ-দারিদ্র্যের সীমা ছাড়াইয়া কোন্ সুদূর নক্ষত্রলোকে উপনীত হইয়াছি, যেখানে নাই কোন গ্লানি, অশান্তি-অতৃপ্তির তীব্র আরাব, অভাব-অভিযোগের মর্মদাহী জ্বালা। এই শান্ত সন্ধ্যার ভ্রমণের স্মৃতি আমার দীর্ঘকাল মানস-মুকুরে বিম্বিত থাকিবে।

সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি শিবমন্দির বিদ্যমান। এক সন্ধ্যায় সেই শিবমূর্তি দর্শনেও গিয়াছিলাম। দীর্ঘায়ত রসাল বৃক্ষের বিস্তীর্ণ উদ্যান-বাটিকা অতিক্রম করিয়া মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলাম। রাত্রি একটু অধিক হইলেও আমার সৌভাগ্যবশত মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত ছিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিরাট্ শিবমূর্তি দর্শন করিলাম। পূজারী নির্মাল্য ও চরণামৃত দিল। গ্রহণ করিলাম। সামান্য কিছু দক্ষিণাও দিয়াছিলাম।

তেজপুরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা রহিয়াছে। অনেক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীও আছে। একটি মাড়োয়ারী মোটর মেরামতের কারখানা খুলিয়াছে। জনৈক বাঙালী ভদ্রলোক ঐ কারখানার ম্যানেজার ছিলেন। অবশ্য বর্তমানে তিনি সেই কাজ ছাড়িয়া দিয়া অন্য কাজে ব্যাপৃত আছেন। বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত একটি থিয়েটার হলও রহিয়াছে। এই থিয়েটার হলে সময় সময় আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতিযোগিতা হয় এবং মাঝে মাঝে অভিনয়ও হইয়া থাকে। স্বর্গীয় বিমলাচরণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের আপ্রাণ চেষ্টাতেই এই থিয়েটার হল প্রতিষ্ঠিত হয়। থিয়েটার হলে তাঁহার ফটো স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বিরাজমান।

আনারসের চাটনীর কারখানা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা

তেজপুরে একটি বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—উহা তেজপুরের সুবৃহৎ সুরসাল সুমিষ্ট আনারস। ভারতের বিভিন্ন স্থানের আনারস ভক্ষণের সুযোগ আমার অদৃষ্টে জুটিয়াছে। কিন্তু তেজপুরের মত সর্বগুণসম্পন্ন আনারস চোখে পড়ে নাই। অথচ দামও খুব সস্তা। সিঙ্গাপুরের আনারস অপেক্ষাও তেজপুরের আনারস গন্ধ ও রসে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আনারসকে ঠিক ইংরেজ ব্যবসাদারের মত কোন বাঙালী আর্থিক সুযোগের জন্মদাতারূপে গ্রহণ করিতেছেন না! কিছু দিন পূর্বে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত লিখিত "মলয় ভ্রমণে" দেখিয়াছিলাম যে, তিনি সিঙ্গাপুরে আনারসের "চাটনী" তৈয়ারীর কারখানা দর্শনে গিয়াছিলেন। ঠিক অনুরূপ কারখানা—অনুরূপ কেন—অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ কারখানা এই তেজপুরে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। অথচ সেই দিকে কাহারো দৃষ্টি পড়িতেছে না!

যদি কেহ তেজপুরের আনারসকে চাটনী তৈয়ারী করিয়া বা বায়ুশূন্য কৌটায় সুরক্ষিত করিয়া ব্যবসা চালান, তবে তিনি অচিরে বহু টাকার মালিক হইতে পারিবেন, একথা করকোষ্ঠী বা জন্মপত্রিকা না দেখিয়াও বলা যাইতে পারে। কারণ, আনারসের চাটনী বা সুরক্ষিত আনারসের চাহিদা পৃথিবীব্যাপী; যদি লোকে একবার আসামের আনারসের চাটনী বা সুরক্ষিত আনারস আস্বাদনের সুযোগ পায়, তবে আসামের আনারস যে সিঙ্গাপুরকে

পিছনে ফেলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তবে এই দিকে আত্মনিয়োগ করিতে হইলে কিছু মূলধনের দরকার। "অন্তভক্ষ্যঃ ধনুগুর্ণঃ" যাহাদের অবস্থা, তাহাদিগের একক চেষ্টা সম্ভব নহে; তবে সমবায় নীতিতে প্রচেষ্টা অবশ্যই চলিতে পারে এবং তাহা বাঞ্ছনীয়ও বটে।

রাঙাপাড়া ত্যাগ

এইবার আমার তেজপুর যাওয়া সম্ভব হয় নাই। রাঙাপাড়া হইতেই দিনাজপুর যাওয়া স্থির করিয়াছিলাম। সুতরাং অপরাহ্ণ চারিটার গাড়ীতে রাঙাপাড়া ত্যাগ করিয়া চলিলাম। ফিরিবার পথে সঙ্গী হইল কয়েকটি ঢাকা জেলার মুসলমান; তাহারা তেজপুরে ব্যবসা করে। উহারা সকালের ট্রেণে যাইবার জন্য আসিয়াছিল কিন্তু "বিন্দুকুড়ি"র হাটের অনতিদূরে তেজপুর-বালিপাড়া রেলপথের এঞ্জিন লাইনচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাওয়ায় তাহারা সকালের গাড়ী রাঙাপাড়ায় ধরিতে পারে নাই; কাজেই অপরাহ্ণের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।

আমাকেও রাঙাপাড়ায় কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। কলের জলে স্নান কার্য সমাপ্ত করিয়া চা, রুটি, আনারস দ্বারা মধ্যাহ্নের ভোজন শেষ করিলাম। এই স্থান হইতে দিনাজপুরের জন্য দুইটি আনারস ক্রয় করিলাম; দেখিতে খুব বৃহৎ—তবে কাঁচা—দাম দিতে হইল চারি আনা।

অপরাহ্ণ তিনটা পনের মিনিটে তেজপুর হইতে গাড়ী রাঙাপাড়া পৌঁছিল। উক্তদিবস লক্ষ্মীপূর্ণিমা হইলেও বহুযাত্রী তেজপুর হইতে আসিয়াছে দেখা গেল। কয়েক-জন যাত্রী আমাদের কামরায় উঠিল।

অবশেষে নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ী রাঙাপাড়া ত্যাগ করিল।

দিনাজপুরে কয়েক ঘণ্টা

রাঙাপাড়া ছাড়িয়া পূর্ববর্ণিত পথে পার্বতীপুর পৌঁছিলাম পরদিন সকাল ৬টায়। গাড়ীর যে কক্ষে ছিলাম, তাহা ত্যাগ করিয়া ভিন্ন কক্ষে আরোহণ করিলাম; কারণ যে গাড়ীতে আমি ছিলাম উহা রাঙাপাড়া-পার্বতীপুর থ্রু ক্যারেজ। উহা পার্বতীপুরে কাটিয়া রাখা হয় এবং অন্য গাড়ীগুলি বরাবর কাটিহার হইয়া লক্ষ্ণৌ চলিয়া যায়। দিনাজপুর পার্বতীপুর-কাটিহার লাইনের একটি ষ্টেসন। পথে মন্মথপুর, চিরির বন্দর প্রভৃতি ২।৩টি ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া বেলা ৭টা ৪৫ মিনিটে দিনাজপুর ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম।

দিনাজপুর একটি ক্ষুদ্র সহর। আমি বালুবাড়ীতে ছিলাম। বালুবাড়ী, গণেশতলা প্রভৃতি পল্লী সহরের অংশরূপে বিরাজমান। দিনাজপুরের মহারাজার বাড়ী সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে। সহরে বৈদ্যুতিক আলো নাই, কিন্তু রাজার বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলো আছে। রাজবাড়ীর "কালিয়াজি" নামক ঠাকুর না কি খুব জাগ্রত এবং প্রসিদ্ধ। দিনাজপুর বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণীর নায়িকার কর্মক্ষেত্র ছিল বলিয়া প্রকাশ। মালদুয়ার নামক স্থানে আজও দেবীরাণীর প্রতিষ্ঠিত দস্যুর কালীমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়; উহার অনতিদূরে কাঁটা-বাঁশের ঝাড় আছে; তাহাতে প্রবেশ করা দুরূহ। দস্যুদল ঐ সমস্ত স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধি করিত।

দিনাজপুরে বিশেষ ব্যবসার কোন কেন্দ্র আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে প্রত্নতত্ত্বের দিক্ দিয়া দিনাজপুর জেলা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি বাংলার মধ্যে বৃহত্তম বলিয়া খ্যাত। দিনাজপুরের চাউল খুব উৎকৃষ্ট; তবে উহা দ্বারা ব্যবসা চলিতে পারে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার।

দিনাজপুরের যেখানে সেখানে ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। যদি কোন অনুসন্ধিৎসু পরিব্রাজক উহাদের পরীক্ষা করিয়া প্রত্নতত্ত্বের দিক্ দিয়া নবীন আবিষ্কারে মন দিতে চাহেন, তবে তিনি সফলকাম হইতেও পারেন। এখানেও মাড়ওয়ারী আড্ডা গাড়িয়াছে, বাঙালী ব্যবসা-ক্ষেত্র হইতে অবসর লইতেছে বলিলেও চলে।

কামাখ্যার পথে

সন্ধ্যা ৬টার গাড়ীতে দিনাজপুর ত্যাগ করিয়া কামাখ্যার পথে চলিলাম। গাড়ীতে খুব ভিড়। পার্বতীপুরে ভিড়ের মাত্রা খুব বাড়িয়া গেল। গৈরিকবসনপরিহিত একটি ভদ্রলোক ও অনুরূপ রূপধারিণী একটি মহিলা গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহারা উঠিয়া জিনিষপত্র কোন মতে তুলিয়া গাড়ীতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিলাম। আমি কিঞ্চিৎ শয়নের স্থান পাইয়াছিলাম, আমার সম্মুখের বেঞ্চে একটি হিন্দুস্থানীও খানিকটা জায়গা জুড়িয়া স্বীয় বিপুল দেহ বিস্তৃত করিয়াছিল। আমি উঠিয়া হিন্দুস্থানটিকেও উঠাইয়া উভয়ের বসিবার স্থান করিয়া দিলাম। পরে এই সাধু ব্রাহ্মণ-দম্পতির সঙ্গে আমার খুব আলাপ পরিচয় হইয়াছিল এবং কামাখ্যায় আমরা একই পাণ্ডার বাড়ীতে ছিলাম। ভদ্রলোকের নাম শ্রীঅমরেশ্বর রায় চৌধুরী। হুগলী বালীতে থাকেন ও মিসন স্কুলে হেড পণ্ডিতের কার্য করেন। কামাখ্যা মহাপীঠে কিছু তান্ত্রিক সাধনার জন্য গমন করিতেছেন; খুব সম্ভবত মাসাধিককাল অতিবাহিত করিবেন।

গাড়ী ছাড়িবার তখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে; এমন সময় একটি গৌরবর্ণ ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের কেউ কি কামাখ্যা যাবেন?"

আমি উত্তর দিলাম—"আমরা তিনজন যাব।"

ভদ্রলোক—"আপনাদের কি পাণ্ডা ঠিক আছে?"

আমি—"না।"

ইহা শুনিয়া ভদ্রলোক এক একখানি ছাপান কার্ড আমার ও অমরেশ্বর পণ্ডিতজির হাতে দিয়া বলিলেন—"আপনাদের যখন কোন পাণ্ডা নাই, তখন দয়া করে আমাদের বাড়ী যাবেন। আমাদের বাড়ী মায়ের মন্দিরের খুব নিকটে।"

কার্ডে দেখিলাম লেখা আছে—কামাখ্যার পাণ্ডা সর্বানন্দ কালিকানন্দ দেব শর্মা। যিনি কার্ড দিলেন, তাঁহার নাম কালিকানন্দ; তাঁহার বড় ভাই সর্বানন্দ কামাখ্যাতেই আছেন।

অমরেশ্বর পণ্ডিতজী বলিলেন যে তিনি একমাস থাকিবেন, তাহাতে পাণ্ডাজী বলিলেন—"আপনার কোন অসুবিধা যাতে না হয়, আমি তার বন্দোবস্ত করে দেব। আপনার বাসের জন্য স্বতন্ত্র একটা কক্ষ দেওয়া হবে।"

ইহা শুনিয়া অমরেশ্বর পণ্ডিতজিও কালিকানন্দ পাণ্ডাজির বাড়ী যাইতে সম্মতি দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আমিও চলিলাম।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে একবার কামাখ্যা দর্শন ঘটিয়াছিল; তখন ছিল আমার বাল্যাবস্থা আর আজ বার্ধক্যের উপকূলে দাঁড়াইয়া নবীনভাবে কামাখ্যা দর্শনে চলিয়াছি। তখন গিয়াছিলাম আসাম-বেঙ্গল রেল পথে লামডিং জংসন হইয়া; আর আজ চলিয়াছি ই বি রেলপথের আমিনগাঁও দিয়া। এই উভয় যাত্রায় কি বৈষম্য!

গাড়ী ছাড়িয়া দিল, সারারাত্রি প্রায় বসিয়া ও ঈষৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাটিয়া গেল। প্রভাতের রক্তরাগের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় দেখা গেল। পণ্ডিতজি ও তাঁহার স্ত্রী পাহাড় দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। যথা সময়ে গাড়ী আমিনগাঁও ষ্টেসনে থামিল। আমরা নামিয়া ষ্টীমারের উদ্দেশে চলিলাম। ষ্টীমারে উঠিয়া একস্থানে দাঁড়ান গেল, অমনি দেখি খাতা বগলে পাণ্ডাপুঙ্গরেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিল—"পাণ্ডা কে?"

উত্তর দিলাম আমি—"পাণ্ডা সর্বানন্দ কালিকানন্দ।"

বলা বাহুল্য ষ্টীমারে উঠিবার পূর্বেই সর্বানন্দের সঙ্গে আমাদের দেখা হইয়াছিল। তিনি আমাদের অদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন।

এক দল সরিয়া গেল, অন্য দল তাহার স্থান অধিকার করিয়া আবার জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিল। এই দল পাণ্ডার নাম শুনিয়াও নিরস্ত হইতে চাহিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"বাড়ী কোথায়?"

পণ্ডিতজি বলিলেন—"ফরিদপুর কোটালিপাড়া।"

পাণ্ডা—"কোন বাড়ী?"

পণ্ডিতজি—"রায় চৌধুরী বাড়ী।"

অমনি খাতা হইতে কোটালিপাড়া রায় চৌধুরী বাড়ীর কয়েকটি যাত্রীর নাম করিয়া পাণ্ডাপ্রবর

পণ্ডিতজিকে তাঁহার যজমান সাব্যস্ত করিয়া বলিলেন—"দেখুন আপনার আত্মীয় আমার যজমান; সুতরাং আপনিও আমার যজমান।"

পণ্ডিতজি অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন—"এঁরা আমার ঠিক নিকটতম আত্মীয় কেউ নন; দূরতম সরিক মাত্র। সুতরাং তাঁরা এসেছেন বলে আমিও যে যাব তার কোন কারণ নেই, বিশেষত আমি যখন প্রথম এক ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি।"

অগত্যা এই দলও রণে ভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেল কিন্তু যাইবার সময় বলিয়া গেল—"হবে না, পার্বতীপুর থেকে ধরেছে যে!"

ষ্টীমার ব্রহ্মপুত্রের বক্ষ ভেদ করিয়া পরবর্তী তীরের দিকে চলিল। ষ্টীমারে বেশ চা'র দোকান আছে—হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দুর ষ্টলে চা পান করিলাম। চা'র কাপগুলি খুব বৃহৎ, অনেকটা চা ধরে।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকদল পাণ্ডা পণ্ডিতজিকে যজমান করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া ফিরিয়া গেল, কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দিয়াছিল কি না জানি না।

পাণ্ডুঘাটে ষ্টীমার থামিল। প্রায় সমস্তযাত্রী নিঃশেষে চলিয়া যাওয়ার পর আমরা অবতরণ করিলাম। পাণ্ডুঘাট হইতে শিলঙের মোটর যাতায়াত করে। আসাম-বেঙ্গল রেল-পথের গাড়ীও এইস্থান হইতে ছাড়ে।

এই স্থান হইতে মোটর বাস গৌহাটি সহর পর্যন্ত যায়, পথে কামাখ্যা পাহাড়ের পাদমূলে যাত্রী নামাইয়া দিয়া থাকে, ভাড়া দুই আনা। আমরা বাসে উঠিতে যাইতেছিলাম; কিন্তু পাণ্ডাজি বলিলেন যে, পদব্রজে সমস্ত পথটা যাওয়া চলে; উহা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। দ্বিতীয়ত বাসের রাস্তায় পাহাড় চড়া কষ্টকর,—বন-পথে অনেকটা সোজা, সুতরাং ছয় আনায় একটি কুলী ঠিক করিয়া উহার ঘাড়ে বোঝা চাপাইয়া দিয়া আমরা পদব্রজে কামাখ্যা পাহাড়ে উঠিতে চলিলাম।

কামাখ্যায় একদিন

গৌহাটি-শিলঙ রোড় ধরিয়া আমরা চারিটি প্রাণী চলিয়াছি। রাস্তা খুব ভাল, মনে পরে পূর্বে ম্যাঙ্গালোর হইতে উদিপি যাইবার পথে এইরূপ রাস্তা চোখে পড়িয়াছিল। এক পাশে পাহাড়, অন্য পাশে রেলপথ; তাহার পরে শ্যামল শস্যক্ষেত্র—এই উভয়ের মধ্য দিয়া আমাদের যাত্রাপথ বিস্তৃত।

প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শিলঙ্ রোড ছাড়িয়া বন্য পথে পা দেওয়া গেল। এই পথ সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথ; অযত্নসম্ভূত তৃণগুল্মে স্থানে স্থানে পথ সমাচ্ছাদিত; কোথাও বিশালকায় বনস্পতির পল্লব-ঘন ছায়া, কোথাও কুসুমিত বল্লরীর মনোরম শোভা, ক্ষুদ্রা স্রোতস্বিনীর উচ্ছলছন্দে দূরদূরান্তরে ধাবন, তদুপরি স্বচ্ছন্দগতি বনবিহঙ্গের মধুর কলকাকলি—সব মিলিয়া এই পথ-চলাকে স্বর্গ-গমনের মত মনোরম করিয়া তুলিল। ভুলিয়া গেলাম পথের কষ্ট, রাত্রি জাগরণের গ্লানি, ক্ষুৎ-পিপাসার কাতরতা। দেহে জাগিয়া উঠিল নব বল। পাণ্ডাজির পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিতে লাগিলাম আমরা তিনটি প্রাণী। কিয়দ্দুর গিয়া একস্থানে পথরেখা দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে; সেই সংযোগস্থলে কয়েকটি সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছেন। অমরেশ্বর পণ্ডিতজি ও তাঁহার স্ত্রী কিছু পিছনে পড়িয়াছিলেন বলিয়া আমি ও পাণ্ডাজি তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ন্যাসিদলের সঙ্গে আলাপ জমিল; একজন দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি অসুস্থ। কিন্তু কোথাও বিশ্রাম করিবার মত স্থান মিলিতেছে না!

আবার পথ চলিতে লাগিলাম। আরও কিছুদূর উঠিয়া ব্রহ্মপুত্রের জলধারা নয়নগোচর হইল—এত উচ্চ স্থান হইতে উহাকে দেখাইতে লাগিল যেন একটি রৌপ্য-সূত্র বসুধার কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে। দূরে দূরে আরও কত শ্যামল পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে; তদুপরি বিকসিত শরতের রৌদ্রকরোজ্জ্বল ঘননীল আকাশ—যাহা কিছু ক্ষুদ্রতা, যাহা কিছু ভেদ-বিভিন্নতা, যাহা কিছু বৈষম্য—সব বিলীন হইয়া গিয়াছে অসীমের বিরাট্ দেহে। অথচ এই আকাশ কিছুতেই লিপ্ত নহে। এমনি করিয়াই ভগবান্ সমস্ত অসামঞ্জস্যকে ঘনীভূত করিয়া

লইয়াছেন; নিজের সাম্যের বিরাট্রূপে আকাশ-ভুবন ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান। অথচ তিনি নির্বিকার, সাক্ষী মাত্র, নিত্য উদাসীন। মনে পড়িল উপনিষদের বাণী—

"সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥"

ধীরে ধীরে বনরাজ্য অতিক্রম করিয়া লোকালয়ের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত গৃহাবলী বেশ মনোরম মনে হইল। দ্বিতল ত্রিতল গৃহও বর্তমান। অবশেষে মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া, সৌভাগ্য কুণ্ডের ধার দিয়া, অনেকগুলি বাড়ী অতিক্রম করিয়া পাণ্ডাজীর গৃহে উপনীত হইলাম। কিন্তু তখনও কুলী মালপত্র লইয়া উপনীত হয় নাই।

পাণ্ডাজি জিজ্ঞাসা করিলেন—"চার ব্যবস্থা কর্‌ব কি?"

পণ্ডিতজি ও তাঁহার স্ত্রীর আপত্তি না থাকায় অবিলম্বেই ব্যবস্থা করিবার জন্য বলিলাম।

একটি চাকর হাতমুখ ধুইবার জল দিয়া গেল। সামান্য বিশ্রাম করিয়া হাতমুখ ধুইয়া লইলাম। ইত্যবসরে চা আসিয়া হাজির। অবশ্য সভ্য জগতের উপযোগী পাত্রে নহে—কাঁসার গ্লাসে। চা পান করিয়া শ্রান্তি দূর করিবার জন্য আমি হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলাম।

কিছুক্ষণ পরে কুলী মালপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। তখন স্নানার্থ গমন ও শৌচ-কার্যাদির প্রয়োজন অনুভূত হইল। পাণ্ডাজি কি একটা কাজে চলিয়া গেলেন, তাঁহার পুত্রকে আমাকে দেবদর্শন করাইবার ব্যবস্থার ভার দিলেন, কারণ আমি আজই চলিয়া যাইব। সময় সঙ্কীর্ণ,—থাকিবার উপায় নাই।

শৌচকার্যাদি শেষ করিয়া সৌভাগ্য কুণ্ডে স্নানার্থ চলিলাম। পণ্ডিতজি আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবেন। স্নান সারিয়া দেবদর্শনে চলিলাম। একস্থানে দুইটি পয়সা দিতে হইল। মন্দিরের অভ্যন্তরে অন্ধকার, তবে স্বল্প দীপালোকিত স্থল দিয়া নিম্নে অবতরণ করত যোনিপীঠ দর্শন ও স্পর্শ করা গেল। ফুলনির্মাল্য লইয়া বাহিরে আসিয়া কালী, তারা প্রভৃতির মন্দির দেখিয়া ভুবনেশ্বরীর মন্দির দর্শনে যাত্রা করিলাম। পাণ্ডাজির পুত্র গেলেন না; আমাকে পথ দেখাইয়া দিলেন।

আমি চলিলাম। স্থানে স্থানে কয়েকটি কুটির দেখিলাম, তাহাও পাণ্ডার গৃহ বা যাত্রিনিবাস। অবশেষে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের নিকট উপনীত হইলাম, দেবী দর্শন করা গেল। কিন্তু দেবী অপেক্ষা এই স্থানের নৈসর্গিক দৃশ্য আমাকে বেশী তৃপ্তি দান করিল। দূরে গৌহাটি সহর বেশ একখানি মনোরম আলেখ্যের মত শ্যামল সবুজ আস্তরণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দূরে পাণ্ডুঘাট; আরও দূরে উমানন্দ শিবের মন্দির ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী দ্বীপে বিরাজমান। উমানন্দ শিবের মন্দির ও মূর্তি নিকটে গিয়া দর্শন এই যাত্রায় হইল না; অবশ্য পূর্ববর্তী যাত্রায় হইয়াছে, বলা বাহুল্য।

কয়েকটি বাঙালী ভদ্রলোকের সহিত এই স্থানে আলাপ হইল, তাঁহারাও আমারই মত দশ টাকার মোসাফের; আজই আসিয়াছেন এবং আজই সন্ধ্যায় চলিয়া যাইবেন। দেখিলাম রেল কোম্পানীর এই নব সুযোগ প্রদানে কামাখ্যায় যাত্রীর সংখ্যা বেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

কিছুক্ষণ চিত্রাপিতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনরায় নামিয়া আসিলাম।

পাণ্ডাজির বাড়ী পৌছিয়া দেখি অমরেশ্বর পণ্ডিতজি ও তাঁহার স্ত্রী স্নান করিবার জন্য যাইতেছেন। আমাকে খাবারার্থ আহ্বান করা হইল। আমি আহারে চলিলাম,—ডাল, ভাত, চচ্চড়ি, অম্বল সহযোগে অন্ন আহার করিয়া কিছুক্ষণ নিদ্রাদেবীর আরাধনায় কাটাইবার চেষ্টা করিলাম, কারণ রাত্রে হয়ত শয়নের স্থান মিলিবে না—কে জানে! কিন্তু ঘুম আসিল না, পাণ্ডাজির একটি ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত—বয়স বছর পাঁচ—আলাপ করিয়া সময় কাটাইলাম।

ইতিমধ্যে অমরেশ্বর পণ্ডিতজি ও তাঁহার স্ত্রী দর্শন করিয়া বাসায় আসিলেন এবং হোম করিতে বসিলেন। দেখিলাম এই সাধুপ্রকৃতি দম্পতির পরস্পর নির্ভরতা। উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া হবি

সহযোগে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন; বৈশ্বানর লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত হবি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঈশ্বর-নিষ্ঠা আমার খুবই ভাল লাগিল, অথচ আজ নবযুগের প্রভাবে, নব প্রগতির উদ্ভবে ভারতীয় দম্পতির বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। আজ দেখিতেছি—স্ত্রী সহধর্মিণী নহে,—বিলাসের সঙ্গিনী মাত্র! আমরা ভুলিতে বসিয়াছি স্বামিস্ত্রীর প্রকৃত সম্বন্ধ—কেবলমাত্র আহার-বিহারের জন্য চুক্তি মাত্র নহে—পরন্তু জন্মজন্মান্তর-ব্যাপী যোগসূত্র,—জীবনে মরণে অবিচ্ছিন্ন বন্ধন। এই সাধক-দম্পতির হোমশিখার অন্তরালে আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল ভারতের বৈদিক যুগের চিত্র—এমনি পাশাপাশি বসিয়াই স্বামি-স্ত্রী হয়ত অগ্নিতে আহুতি দান করিতেন।

আজ হোমানলে আহুতি প্রদান নাই বটে, কিন্তু বায়স্কোপে ছবি দেখা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আদালতে বিবাহবন্ধন ছেদনের জন্য নূতন আইন-প্রবর্তনের চেষ্টাও চলিতেছে। কে জানে ইহার পরিণতি কোথায়!

আজ এই হেমন্তের পীতরৌদ্রভূষিত আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে পড়িল—কি উচ্চ ছিল আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ। স্বামি-স্ত্রী দুই দেহ বিভিন্ন বটে, কিন্তু মন প্রাণ আত্মা এক—উভয়ের উদ্দেশ্য এক। স্বামী জরা-গ্রস্ত, মূর্খ, গলিত কুষ্ঠরোগী হউক, কোন ক্ষতি নাই; তথাপি সেই স্বামীই স্ত্রীর নিকট দেবতা; জীবনে-মরণে একমাত্র কাম্যবস্তু। স্বামীকে ছাড়িয়া সাধ্বী স্ত্রী স্বর্গ-সুখভোগেও বিমুখ; কি অপূর্ব, কি মহান্, কি মর্মস্পর্শী! আর আজ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে চুক্তি—তুমি খাইতে-পরিতে দাও, সুখে স্বচ্ছন্দে রাখ; তোমার নিকট থাকিব; নতুবা যেইদিন তুমি আমার অভিলাষ পরিপূরণে অক্ষম, ভোগবিলাসে পরিতৃপ্ত করিতে অক্ষম, অমনি তোমাকে রম্ভা প্রদর্শন করিয়া বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিব! পূর্বে বিবাহে ছিল স্বামীর পরিতৃপ্তি-বিধান; আর আজ দেখা যায় আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাঞ্ছা; তখন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রেম; আর আজ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে ঘৃণিত কাম। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাকবি সাধক-প্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এই কাম-প্রেমের পার্থক্য নির্ণয় করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
* * * *
কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর।"

সুতরাং এখন বিবাহে প্রেমের কবিতা ছাপা হয়—এবং প্রীতি-উপহার রূপে বিতরিত হয় সত্য, কিন্তু প্রেম তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; নতুবা শিক্ষিতা বধূর জননী তাহাকে স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া শিক্ষকতা-কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার উপদেশ দেয় কেমন করিয়া, তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হয় না। এমন ঘটনাও আমার জানা আছে যে, কোন শিক্ষিতা মহিলাকে তাঁহার পিতামাতা স্বামীর বিরুদ্ধে খোরাকী ও আইনানুগ বিচ্ছেদের (Judicial Separation) জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এবং আদালতের বিচারের সময় সমস্ত ঘটনা জেরার মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

এই ত আমাদের বর্তমান সমাজের অবস্থা। সুতরাং এই অবাধ মেলামেশা ও প্রগতির দিনে এই ব্রাহ্মণ-দম্পতির প্রাচীন ঋষিজনোচিত ব্যবহার বড়ই চিত্তহারী-রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

হোমের অবসানে পণ্ডিতজি ও তাঁহার স্ত্রী আহারার্থ গমন করিলেন। আহারের পর তাঁহারা পূর্ব কক্ষে ফিরিয়া আসেন এবং আমাদের বিশ্রম্ভালাপে সময় কাটিয়া যায়; অবশেষে আমার বিদায় লইবার সময় ঘনাইয়া আসে। আমি পণ্ডিতজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পাণ্ডাজিকে কি দেওয়া যায়; কারণ কামাখ্যার পাণ্ডা কিছুই প্রার্থনা করে না। পণ্ডিতজির স্ত্রী বলিলেন—"একখানা সিকি দিলেই ত যথেষ্ট হবে।"

সুতরাং স্নেহশীলা মহিয়সী জননীরূপা দেবীর বাক্যে পাণ্ডাকে সিকি দিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি কামাখ্যা

মায়ীর নির্মাল্য, রক্তবস্ত্র প্রভৃতি দিলেন, পরে বিদায় লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম।

পণ্ডিতজি ও তাঁহার স্ত্রীর নিকটও বিদায় লইলাম। তাহাতে প্রাণের তারে একটু দুঃখের বাণী ঝঙ্কৃত হইল; এই একদিন একরাত্রি একত্রাবস্থানে আমরা যেন কত নিকটতম আত্মীয়ে রূপান্তরিত হইয়াছিলাম। আর তাঁহাদের সহিত দেখা হয় নাই; জীবনে হইবে কি না, জানিনা। কিন্তু তাঁহাদের স্বল্পসন্তুষ্ট ঋষিজনোচিত জীবন-যাপন আমার চিরদিন মনে থাকিবে।

কামাখ্যা ত্যাগ

বিদায়কালে পণ্ডিতজি ও তাঁহার স্ত্রীও দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে উভয়কে বিদায়-প্রণাম জানাইয়া পথে নামিলাম। সেই পূর্ব পথে অবতরণ স্থুরু করিলাম। যাত্রাকালে সঙ্গী ছিলেন পণ্ডিতজি ও তাঁহার স্ত্রী; এখন কেহ নাই—আমি একা সেই দীর্ঘ বনপথে নিম্নাভিমুখে চলিয়াছি।

ধীরে ধীরে লোকালয় পশ্চাতে পড়িয়া রহিল; নিবিড় বনশ্রেণীর ভিতর দিয়া পথ অতিক্রম করিতে করিতে চলিলাম। তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে; সেই অস্তাচলগামী সূর্যের খর কিরণজাল আমার মুখে ও দেহে বক্রভাবে নিপতিত হইয়া শরীরকে ঘর্মাক্ত করিয়া তুলিল। উহা অগ্রাহ্য করিয়া যাত্রাপথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অবশেষে শিলঙ্ রোড্ দেখা গেল এবং আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পাণ্ডুঘাটে উপনীত হইলাম এবং খেয়াপারের ষ্টীমারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর বন্ধুবর কৃষ্ণবাবুর সঙ্গে দেখা হইল; তিনি শিলঙ্ গিয়াছিলেন। কয়েক দিন শিলঙ বাসের পর ফিরিয়া চলিয়াছেন।

এক সঙ্গে চা পান করা গেল। তৎপরে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া আমিনগাঁও রেল ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। অদূরবর্তী দোকান হইতে খাবার সংগ্রহ করিয়া নৈশ ভোজন শেষ করা গেল।

অতঃপর আসাম মেলে উঠি ও সারারাত্রি জাগরণের অবসানে পরদিন বেলা একটার কিছু পরে কলিকাতা উপনীত হইয়া স্বীয় বাসকক্ষে প্রবেশ করিলাম।

ক্রমশঃ

স্বর্গীয় কানাইলাল চন্দ্র

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(১৩৪৩ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(২)

'শ্রীশ্রী৺ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির অপ্রাকৃতত্ব স্থাপনা' গ্রন্থখানি ডিমাই ১২ পেজী আকারে ৪২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থকার কানাইলাল চন্দ্র মহাশয় এই গ্রন্থের দুইটি অধ্যায়ে দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন; একটি—'বস্ত্রহরণ; এ প্রাকৃত বস্ত্র নহে' এবং দ্বিতীয়টি—'রাসলীলা বিহার সম্বন্ধীয়'।

প্রথম অধ্যায়ে তিনি ব্রজগোপিকাগণের বস্ত্রহরণ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তাঁহারা (অর্থাৎ গোপ-বালিকারা) অগ্রহায়ণ মাসের অতি প্রত্যূষে অরুণোদয়ে নিদ্রোত্থিত হইয়া পরস্পরে শ্রীযমুনার অতি শীতল জলে স্নান করতঃ, বালুকানির্মিত কাত্যায়নী প্রতিমার পূজা, দিবসে হবিষ্যান্ন ও রাত্রিতে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করেন।" (পৃঃ ১) ব্রজজনজীবন শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার অভিলাষেই তাঁহাদের এই কঠোর ব্রত

গ্রহণ। মন্ত্র তন্ত্র তাঁহারা বিশেষ কিছুই জানিতেন না। এস্থলে কানাইলাল বলিতেছেন—"কিন্তু কৃষ্ণপূজার মন্ত্র বড় আবশ্যক হয় না; নির্মল মন ও অনুরাগ তাহার মন্ত্র। পিতৃলোকেরা মন্ত্র অপেক্ষা করেন, কিন্তু দেবতারা মন্ত্র চাহেন না, কেবল মন চাহেন। গোস্বামী পাদেতে কহিয়াছেন যে, ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আকর্ষণীয় মন্ত্র আর নাই; এই হেতু ইহা বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণ পাইবার এমন সহজ উপায় আর নাই, এবং এমন কঠিনও আর নাই।" (পৃঃ ২) এই উপায় একাধারে সহজ ও কঠিন কেন, তাহা গ্রন্থকার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি এবং চিত্তকে স্থির করা, গ্রন্থকারের মতে, এই দুইটি অমোঘ উপায়েই গোপিকারা কৃষ্ণলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কাত্যায়নী-পূজা সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"গোপবালিকারা ব্রতপ্রসঙ্গে কাত্যায়নী পূজা করিত। পূজা কাত্যায়নীর বটে, কিন্তু ধ্যান কৃষ্ণের উপর। কার্যতও তাহাই দেখা যায় যে, তাহাদের ব্রত উদ্‌যাপনের দিন তাহারা কাত্যায়নীর দেখা পাইল না, পরন্তু কৃষ্ণ আসিয়া তাহাদের বস্ত্রহরণ করতঃ কৃষ্ণময়ী গোপবালিকাদিগের নয়ন-পথবর্তী হইলেন। বস্তুতঃ যখন কোন কামনা করিয়া আমরা দেবদেবীর পূজা করি, তখন ইহা বুঝিতে হইবেক যে, সে পূজা দেবদেবীর নয়, আমরা সেই কামনার পূজা করিতেছি।" (পৃঃ ৩) গ্রন্থকারের এই উক্তির দ্বারা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের এই কাত্যায়নী-পূজা কৃষ্ণ-পূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইখানে তিনি আরও বলিতেছেন—"গোপবালিকাদিগের আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ। কৃষ্ণভক্তি নয়, কৃষ্ণ দর্শন নহে—কৃষ্ণকে আলিঙ্গন।" পৃঃ ৪

গোপিকারা কৃষ্ণকে পতি-রূপে কামনা করিয়া কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিতেন, তাহা তাঁহাদের কৃত নিম্নলিখিত স্তব হইতেই বুঝা যায়:—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥"

তাঁহাদের এই একাগ্র ভক্তি ও কামনার বলেই তাঁহারা পতিরূপে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। এই ভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"কৃষ্ণ সকলে পায় না, যে ভক্ত সেই পায়।" তবে তাঁহার মতে—"ভক্তির ও প্রেমের বিপরীত গতি; প্রাকৃত অবস্থায় চক্ষু উন্মীলন করিলে আমাদিগের দৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃতে চক্ষু মুদিয়া গোপিকারা কৃষ্ণকে দর্শন করিতেন।" পৃঃ ৫

বস্ত্রহরণের সময়—"শ্রীকৃষ্ণেরও বয়ক্রম শৈশব-সীমা উত্তীর্ণ হয় নাই, এই নিমিত্ত কুমারীদিগের সহিত এই ক্রীড়া। বস্ত্রহরণের সময়ে তিনি চারিটি শিশু বালক সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ঐ বালকেরা এত শিশু যে, বস্ত্র পরিধান করিতে জানিতেন না।" পৃঃ ৮ এই চারিজনের নাম—দাম, সুদাম, বসুদাম ও কিঙ্কিনি। গ্রন্থকার ইঁহাদের স্বরূপ পরিচয় দিবার ব্যপদেশে বলিতেছেন—"ইহারা ভগবানের অন্তঃকরণের চারি অংশ। স্বাভাবিক আমাদিগের অন্তঃকরণ চারিভাগে বিভক্ত; চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন। ... ... গোপবালিকাদিগের কঠোর ব্রতাচারে কৃষ্ণ তাহাদিগের এত বশীভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তঃকরণের চারি অংশকে পূর্ণ করিয়া, তিনি তথায় আগমন করতঃ গোপিকা-দিগের বস্ত্র লইয়া বৃক্ষে উঠিলেন, আর তাহাদিগকে ডাকিলেন যে তোমরা আমার নিকটে আসিয়া তোমাদিগের স্বীয় স্বীয় বস্ত্র দেখিয়া লও।" (পৃঃ ৮-৯) কিন্তু তখনও গোপিকাদিগের লজ্জা ছিল, তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে বস্ত্রহীন অবস্থায় তাঁহার নিকট গিয়া স্বীয় স্বীয় বস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। গ্রন্থকার-উক্ত—"অপ্রাকৃত ভগবানের সহিত বিহারে আমাদিগের মায়া-আবরণ ত্যাগ না হইলে কখন জীবাত্মার পরমাত্মাতে সংযোগ সম্ভবে না।"—খুবই সত্য কথা। বস্ত্রাদি ছিল গোপিকাদিগের মায়া-আবরণ, সেই মায়া-আবরণ ঘুচাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মিলনের পথ খুলিয়া দিলেন, তারপর পুনরায় তাঁহাদিগকে বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া গৃহে যাইতে বলিলেন। এখানে গ্রন্থকার প্রশ্নোত্তরস্থলে কয়টি কথা বলিতেছেন—"এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে গোপিকারা একবার আবরণ ত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণ-প্রেমের কৃপাপাত্রী হইয়া কিরূপে আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আবরণ ঘুচাইয়া পুনর্বার

বাস সকল কেন প্রদান করিলেন। ইহার উত্তর এই যে, মায়া-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জীবাত্মা যদি পরমাত্মাতে সংযুক্ত হয় সে সংযোগে আর মায়া তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।" পৃঃ ১২

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদিগের যে আসক্তি তাহা তাঁহাদের অকপট ভক্তি ও নির্মল প্রেমেরই পরিচায়ক। এবং এই কারণেই কৃষ্ণও তাঁহাদের ভক্তি ও প্রেমে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ। গ্রন্থকার বলিতেছেন—"এ কাম নয়, এ প্রেম। দুইই এক বর্ণ বটে কিন্তু এক জাতি নহে। উহা জীবের উপর পতিত হইলে কাম, কৃষ্ণের উপর হইলে প্রেম। কাম এক স্থানে স্থায়ী নহেন, প্রেম কৃষ্ণ প্রতি লীন হইলে, প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই।" পৃঃ ১৩

অনেকের মনে হইতে পারে যে, হেমন্তকালের প্রাতে শীতল জলে অবস্থান হেতু গোপিকাদিগের কষ্ট হইয়াছিল কিন্তু কোন কষ্টই তাঁহাদের হয় নাই—তাহা গ্রন্থকার যুক্তি সহ নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"এমন কি যতক্ষণ তাহারা (অর্থাৎ গোপিকারা) সলিলনিমগ্না ছিল, তাহাতেও তাহাদিগের কোন ক্লেশ ছিল না, কেন না তাহারা কৃষ্ণদর্শনে যে পরিমাণে আনন্দ পাইয়াছিল, তাহাতে হেমন্তকালের প্রাতে শীতল জলে অবগাহন-জনিত কষ্টকে তাহাদের কষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় নাই। আনন্দ ও দুঃখ দুইটি বিপরীত ভাব, যেমন জল ও অগ্নি। উভয়ের উভয়কে নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু যিনি প্রবল হইবেন, তিনি তাঁহার বৈরীকে নাশ করিতে পারিবেন; যদি অগ্নির ভাগ অধিক হয়, জল শুষ্ক হইবে, কিম্বা জলের ভাগ অধিক হইলে, অগ্নিকে নির্বাণ করিবে। এখানে কৃষ্ণ দর্শনে গোপিকাদিগের এত অধিক সুখবোধ হইয়াছিল যে, তাহারা কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে নাই। ... আমরা যেমন সূর্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে আলোক ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাই না, তেমনি নিত্যানন্দের সম্মুখে থাকিলে আনন্দলাভই হইয়া থাকে।" পৃঃ ১৫

গোপিকারা আদর্শ ভক্তিমতী ছিলেন এবং ভক্তিযোগের সাধনায় তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করেন। তাই তাঁহারা মায়া ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে লীন হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত এবং লীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের দীনভাব ঘুচে নাই। উদাহরণ স্বরূপে গ্রন্থকার কৃষ্ণভক্ত উদ্ধবের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন—"উদ্ধব মহাশয় ভগবানের একজন প্রধান সখা, আর যতদূর জ্ঞানী হইতে হয় তাহা ছিলেন, কিন্তু যখন কৃষ্ণ তাঁহাকে যোগ উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি স্পষ্টই কহিয়াছিলেন যে, তিনি এরূপ উচ্চ উপদেশের যোগ্য পাত্র নহেন। অতএব ভগবানের কৃপাপাত্র হইলেই তাহাকে দীন ভাবাপন্ন হইতে হইবেক।" পৃঃ ১৭

ভক্তই একমাত্র ভক্তির দ্বারা ভগবানকে বাঁধিতে সমর্থ হয়। জাগতিক সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য তাঁহার বিরাট্ ও অনন্ত ঐশ্বর্যের নিকট ম্লান ও হীন হইয়া যায়। মানুষের নির্মল মন ও ঐকান্তিক ভক্তিই তাঁহাকে বাঁধিতে সমর্থ হয়। যতক্ষণ মানুষ সবল থাকে, ততক্ষণ সে তাঁহাকে ধরিতে পারে না। গ্রন্থকারও বলিতেছেন—"বল থাকিতে কৃষ্ণ পাইবার সম্ভব নাই। যখন মা যশোমতী (কৃষ্ণকে) বন্ধন করিবার আশা প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ দয়াভাবে মায়ের মনোরথ পূর্ণ করিয়া দামোদর নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।" পৃঃ ১৮

যশোমতী বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন, কিন্তু পঞ্চ রসের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ—সেই মধুর রসের দ্বারা গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন—লজ্জা, মান, ভয় বিসর্জন দিয়া একান্তভাবে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন—ইহার ফলেই তাঁহাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ বাঁধা পড়েন। অধ্যায়-শেষে গ্রন্থকার ভক্ত-সাধক দরাফ্ খাঁর কৃষ্ণস্তুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও এক স্থানে গোপিকার প্রেমের কি সুন্দর অভিব্যক্তি রহিয়াছে—"হে প্রভু তোমার সকল বৈভবই আছে, আমি তোমাকে কি উপহার দিয়া পূজিব, তাহা স্থির করিতে পারি না। কিন্তু আমি দেখি তোমার এক অভাব আছে। সে অভাব কি? তোমার মন। তোমার মন শ্রীবৃন্দাবনে গোপিকারা হরণ করিয়া লইয়াছে। অতএব আমার মন তোমাকে অর্পণ করি, তাহাই গ্রহণ কর"। পৃঃ ১৮

ক্রমশঃ
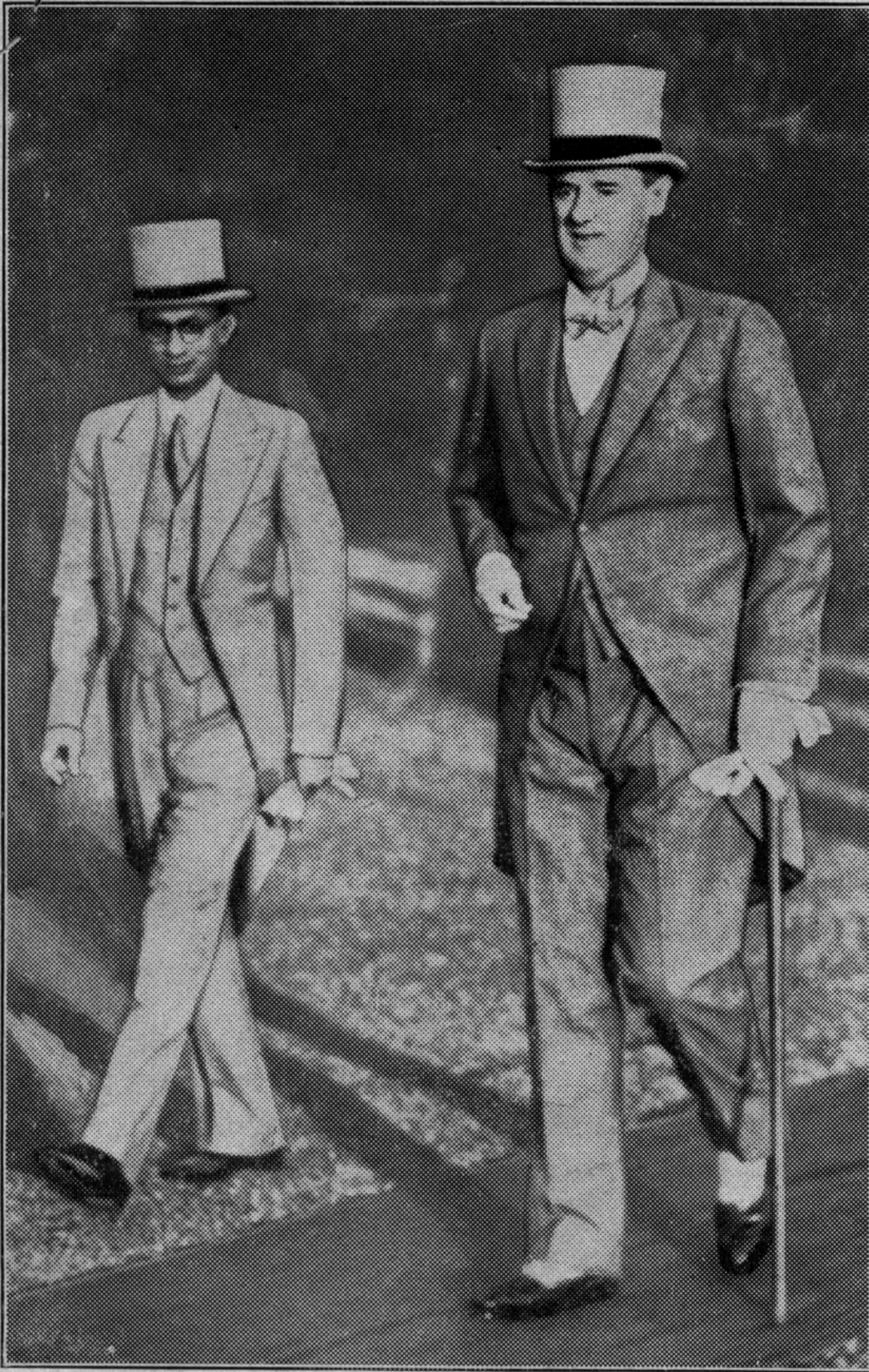
কলিকাতার সেরিফ ডক্টর সত্যচরণ লাহা ভারতের রাজ প্রতিনিধি লর্ড লিংলিথগো

("ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে"র সৌজন্যে)

ভারতের রাজপ্রতিনিধির আপ্যায়নে উদ্যান-সম্মিলন

কলিকাতার সেরিফ ডক্টর সত্যচরণ লাহা প্রদত্ত প্রীতিভোজ

বিগত ১৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে কলিকাতার সেরিফ ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিংলিথগো ও লেডি লিংলিথগোকে রয়্যাল অ্যাগ্রি-হর্টিকাল্‌চ্যারাল সোসাইটির উদ্যানে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করিয়াছেন। বাংলার গভর্ণর লর্ড ব্র্যাবোর্ণ এবং তাঁহার পত্নী লেডি ব্র্যাবোর্ণও এই প্রীতিভোজে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই সমিতির উদ্যানে এই প্রকারের সম্মিলন এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। এই উপলক্ষে সমগ্র উদ্যান-বাটিকা সুরুচি-সঙ্গতভাবে সজ্জিত এবং আলোকিত হইয়াছিল।

সমাগত জনমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য :—বাংলার চিফ্ জাষ্টিস্; আর্ল অফ্ হোপটুন; লেডি এল্ হোপ; লর্ড ও লেডি সিংহ; দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ; বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ; কলিকাতার আর্ক বিশপ; মহারাজা ঠাকুর; মিঃ এন্ আর সরকার; সার কে নাজিমুদ্দিন; নবাব মুসারফ হোসেন; মিঃ নৌসের আলি; মিঃ প্রসন্নদেব রায়কত; মিঃ মুকুন্দ-বিহারী মল্লিক; মাননীয় খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক; সার লিওনার্ড ও লেডি কষ্টেলো; সার জন ও লেডি লর্ট-উইলিয়াম্‌স্; সার রবার্ট জ্যাক; মিঃ জাষ্টিস ও মিসেস এস কে ঘোষ; মিঃ জাষ্টিস এইচ্ আর প্যাংক্রিজ; মিঃ জাষ্টিস ও মিসেস প্যাটারসন; মিঃ জাষ্টিস ও মিসেস আমির আলি; মিঃ জাষ্টিস এস্ সি ঘোষ; মিঃ জাষ্টিস নাসিম আলি; মিঃ জাষ্টিস্ ম্যাকনেয়ার; মিঃ জাষ্টিস্ ও মিসেস হ্যাণ্ডারসন; মিঃ জাষ্টিস রূপেন মিত্র; মিঃ জাষ্টিস বিজন মুখোপাধ্যায়; মিঃ জাষ্টিস ও মিসেস এজলি; মিঃ জাষ্টিস বিশ্বাস; মিঃ জাষ্টিস ও মিসেস খোন্দকার; মেজর জেনারেল জি এম্ লিণ্ডসে; সার জেমস্ ব্রেড টেইলার; মিঃ ও মিসেস জে রীড্ কে; সার জি ক্যাম্পবেল; সার টমাস ও লেডি এল ডারটন; মিঃ টমাস ল্যাম; সার এ কে রায়; সার চার্লস আর্থার; সার হুসেন সুরাওয়ার্দি; সার এ এইচ গজনভি; মিঃ এফ্ টি ও মিসেস হোমান; মিঃ এইচ্ এইচ্ বার্থ; লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এইচ এইচ্ ষ্টেবল ও মিসেস ষ্টেব্‌ল্; কর্ণেল ও মিসেস আর বি বাট্‌লার; সার ওঙ্কারমল জেঠিয়া; সার বদ্রিদাস্ গোয়েন্‌কা; মিঃ ও মিসেস এস্ জি পিনেল; মিঃ ও মিসেস এল্ এইচ্ কলসন্; মিঃ জি বি নর্টন; মিঃ জে এইচ্ এস রিচার্ডসন; মিঃ ও মিসেস গ্র্যাহাম; মিঃ আর হেউড্; মিঃ সি ই এল্ মিল্-রবার্টসন; মিঃ এ ডানকান; কম্যাণ্ডার নরকক্; মিঃ এস্ এল বুথরয়েড্; সার ডেভিড এজরা; মিঃ ডি পি খৈতান; মিঃ ডি সি ঘোষ; মিঃ বি এন্ রায়চৌধুরী; মিঃ এ কে এম্ ঝাকারিয়া; সার জ্যোৎস্না ঘোষাল; মিঃ পুলিনবিহারী মল্লিক; মিঃ পার্শি ব্রাউন; মিঃ আর সি বোনার্জি; মিঃ সতীনাথ রায়; রায় বাহাদুর বনবিহারী মুখোপাধ্যায়; রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদার; মিঃ ই হডসন; বর্ধমানের মহারাজ কুমার; মিঃ এস বসু; মিঃ জ্ঞানাঙ্কুর দে; মিঃ এ কে বসু; মিঃ তুষারকান্তি ঘোষ; মিঃ বি সি চট্টোপাধ্যায়; মিঃ এন্ কে বসু; মিঃ আফজল আলি ও মিঃ এবং মিসেস পার্শি ল্যানক্যাষ্টার।

কে ও এস্ বি রেজিমেণ্টের ব্যাণ্ডদল সুনির্বাচিত বাদ্য দ্বারা সমাগত সকলের চিত্তবিনোদন করিয়াছিল।

চা পানের পর রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহার পত্নী অভ্যাগত-মণ্ডলীর সহিত অবাধে আলাপ-পরিচয় করিয়াছিলেন।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

বিগত বড় দিনের অবকাশে পাটনা সহরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হুইলার সেনেট হলে সম্পন্ন হইয়াছে। সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহা

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন, মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন আচার্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বেদগানে সভার উদ্বোধন হয় এবং উদ্বোধন করেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু মহাশয় স্বস্তি-বাচন পাঠ করেন। এই স্বস্তিবাচন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। প্রবাসী বাঙালীর শ্রেষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে পত্র পণ্ডিত মহাশয়কে লেখেন, তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত হইল।

"মানুষ নলিনীরঞ্জন

প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নলিনী—

আমি কেবল বয়সেই বেড়েছি—এখন জরাজীর্ণ। তোমার কথা পড়েছি, শুনেছি—তোমাকে দেখার সৌভাগ্য আমার অল্পই ঘটেছে। তোমাকে আমি 'আপনি আপনি' বলে পর করতে পারব না, তাতে সুখও পাব না।—আত্মার সঙ্গে লৌকিকতা চলেনা—আত্ম-প্রবঞ্চনায় সুখ নাই।

তুমি কত বড়—সে-কথা বলবার অবকাশ ভগবান্ রাখেন নি ; সহস্র মর্মাসনে বসে স্বয়ং তিনি তাঁর নিজের সেই সহস্র মুখ দিয়ে তা ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতন রহস্যপ্রিয় ব্যথার ব্যথী আর ত নাই। তাঁর কৃপা, তাঁর ভালবাসা—দুঃখের পথ ধরে' আসে, রহস্য এইখানে। অগ্নি-সংস্কারেই সোনার পরিচয় ফোটে। তুমি সাগ্নিক—তোমাকে নমস্কার করি।

দুঃখই মানুষের পরম ঐশ্বর্য ; যে দুঃখের স্বাদ পায় নাই, সে কৃপার পাত্র। মা যেমন ছেলের ধাত বুঝে ব্যঞ্জনে নুন-ঝাল দেন, ভগবান্‌ও বিভিন্ন দুঃখ দিয়ে সকলকেই সচেতন রাখেন,—মানুষ হ'তে সাহায্য করেন—পথ দেখিয়ে দেন।

তখন অল্পদিন মাত্র কাশী এসেছি, সাধুর সন্ধানে বেড়াই। দশাশ্বমেধে দাঁড়িয়ে ভাবছি—'কি করেই বা মহাপুরুষ চিনব! সাধুরাই সাধু চিনিয়ে দিতে পারেন।' এমন সময় একটি পূর্বপরিচিত বৃদ্ধ সাধুর সঙ্গে দেখা। চক্ষে 'ক্যাটার‍্যাক্ট',—ঝাপ্‌সা দেখছেন। প্রণাম করে বললুম—'কাশীর পথ-ঘাট নিরাপদ নয়। এখন একটি আস্তানায় কিছুদিন বিশ্রাম করুন। বেরুলে—সঙ্গে কেউ থাকা দরকার।' বললেন—'ভগবানকে এত' বোকা ভাবিস্ কেন? মালিক নিজের মালের খোঁজ নেবে না? যার মাল—সে সামলাবে না!—নিজের বুদ্ধির গর্ব ছাড়।' যাক্।

তুমি নবদ্বীপের মাটিতে গড়া ছেলে,—ত্যাগ তোমার ধর্ম। তোমাকে কি দুঃখবরণ শেখাতে হয়! অন্যের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদবে না তো কার প্রাণ কাঁদবে,—সে দুঃখ যে তোমার। সে দুরূহ ঐশ্বর্যের অধিকারী—'লাখে না মিলে এক!'

পাগলের মনস্তত্ত্ব আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। তোমার মত সাহিত্য-পাগলও ত নজরে পড়ে না। তোমার সাহিত্য-সেবা সাহিত্য-সৃষ্টিতে নয়—সাহিত্যিক সৃষ্টিতে, সাহিত্যিকদের সেবায়, সাহিত্যানুষ্ঠানের সেবায়, সাহিত্যিক বানানয়।

তুমি আমাদের সাহিত্যোদ্যানের মালী। সযত্নে যে সব গাছ তয়ের করেছ, তারা এখন ফলে-ফুলে—বাণী-মন্দিরে অর্ঘ যোগাচ্ছে। বৈষ্ণব কৃষ্ণ-ছাড়া কথা কন না ; যেই প্রাণের বিষয়টি পেয়েছ—দরদ আপন সুরে সাড়া দিয়ে উঠেছে, অশ্রুপ্লাবন এসেছে—তোমার লেখনী স্থির থাকতে পারেনি,—প্রাণ তীর্থে গিয়ে পৌঁছেছে।

আমরা কান্তকবি রজনীকান্তকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পেরেছি। কই সে ভার ত অন্যকে দিতে পারনি! তেমনটি আর কে পারত! দরদী যে তার অধিকারী ;—ভিন্ন গোত্রে সম্প্রদান যে নিষিদ্ধ। তোমার আহূত-অনাহূত সাড়া দিয়েছে। পাগল আত্ম-প্রকাশ করে এইভাবে। প্রকৃতিক পরিচয় এইখানে পাই। ভাবুক—কে বলে তুমি সাহিত্য-সৃষ্টি কর নাই?

আত্মভোলা, তুমি অন্যের জন্যই কেঁদেছ ; করুণাময়ের মূলধন পেয়েছ। অন্যকে সুখী করতে পারলেই তোমার সুখ। ঐশ্বর্য আর কাকে বলে? আবার বন্ধু কি চাই?

কি ছাইভস্ম লিখব! বাংলার বহু খ্যাতনামা, উচ্চশিক্ষিত, সর্বপরিচিত ও সুপরিচিত আমার শ্রদ্ধেয়

(উপবিষ্ট) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

("সচিত্র ভারতে"র সৌজন্যে)

নমস্য মনীষিগণ হতে আরম্ভ করে, আমার মত মধ্যবিত্ত বহু সাহিত্যসেবীরা যাঁর গুণমুগ্ধ; যাঁর উদ্দেশে অকপট ভাষায় তাঁরা আশীষ, শ্রদ্ধাঞ্জলি, ভক্তি-অর্ঘ ও ভালবাসা বর্ষণ করেছেন,—কয়জন ভাগ্যবান্ তা অর্জন করতে পেরেছেন, তা জানি না। তাই আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি—কোন্ গুণে নলিনী এত বড়! এ সম্মান যে প্রতিভাবান্ সাহিত্যিককে, মহাপণ্ডিতকে, দেশপ্রাণকে, মুক্তহস্ত দাতাকেও পেতে দেখিনি। তাঁরা সকলেই আমার নমস্য, তাঁরা বিশেষ-বিশেষ বিষয়ে কীর্তিমান্ দিক্‌পাল, দেশের রত্ন। কিন্তু নলিনী?

নলিনী যে কাকেও পর ভাবে নি। ছোট-বড়, ধনি-দুঃখী সে যে সকলের। সে-পরীক্ষা যে সকলের প্রাণের নিকটে হয়ে গিয়েছে।—নলিনী অভেদে সকলের আত্মীয়—ত্যাগে, সেবায়, সাহায্যে, ভালবাসায়। তাই নলিনী এত বড়। তাই সকলের প্রীতি-অর্ঘ সহজেই নলিনীর প্রাপ্য হয়েছে।

হে ব্রাহ্মণ, হে দরদী, তুমি আমায় মুগ্ধ করেছ। তোমায় বার বার নমস্কার করি।

গুণমুগ্ধ
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়"

মূল সভার অধিবেশনের অবসানে মহিলা সভার অধিবেশন হয়। রাণী সুচারু দেবী অনুপস্থিত থাকায় শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার সভানেত্রী-পদে বৃত হন। সন্ধ্যায় শ্রীমতী অপর্ণা দেবী সঙ্গীত-বিভাগে সভানেত্রী ছিলেন, তাঁহার অভিভাষণ ও কীর্তন সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

অর্থনীতিতে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঘোষ ও সাহিত্যে শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বৃহত্তর বঙ্গশাখার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী সভাপতি হন। পাটনার বাবু কালীকিঙ্কর দত্ত অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথমে বাংলার বাহিরে বাঙালীর কীর্তি সম্বন্ধে বলেন। দ্বারভাঙ্গার শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুরের বনফুল, ছাপরার শ্রীরামনারায়ণ রায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। রামনারায়ণ বাবু বলেন, বাংলার বাহিরে বাঙালীর উচিত আপনাকে প্রবাসী মনে না করিয়া সেই দেশের লোকের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা। শ্রীশিবদাস সুর ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হন। তিনি ছায়াচিত্রের সাহায্যে বক্তৃতা করেন। ক্যাপটেন অরুঞ্জয় সহায় বর্মা, শ্রীঅমরেশচন্দ্র রায় ও অধ্যাপক উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহাদের প্রবন্ধ যথাক্রমে "গ্রামে স্বাস্থ্যোন্নতির পরিকল্পনা", "বিষাক্ত গ্যাস হইতে আত্মরক্ষার উপায়" ও "নভোমণ্ডলের নক্ষত্রমালা"।

ললিতকলা শাখায় ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হন। ইতিহাস শাখায় সভাপতি হন বাবু ননীগোপাল মজুমদার। রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় "সভ্যতার জন্ম ও উন্নতি" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডাঃ কালীকিঙ্কর দত্ত, শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার, শ্রীচিন্তনারায়ণ ব্যানার্জি, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখার্জি ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রবন্ধ পাঠ করেন।

দর্শন শাখায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী। সার লালগোপাল মুখার্জি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ সুনীতিকুমার চাটার্জি বিদ্যাপতির মূল পদাবলী আবিষ্কার করার প্রয়োজন সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বাংলা ও মৈথিলী ভাষার সংমিশ্রণে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়। শ্রীভোলানাথ দাস, অধ্যাপক রঙ্গীন হালদার ও শ্রীহরেকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আলোচনায় যোগ দেন।

বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের শেষ দিন সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনুপস্থিতিতে সার লালগোপাল মুখার্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রিপোর্ট পঠিত হইলে জানা যায় যে সম্মেলনের সদস্য-সংখ্যা মাত্র ৭২ জন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সমগ্র অংশ গীত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রবাসী বাঙালী ও সাহিত্য সমিতি সকলকে এই বঙ্কিম শতবার্ষিকীতে সহযোগিতা

ও সহায়তা করিতে অনুরোধ করা হয়। ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিবার ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং বলা হয় যে যতদিন তাহা না হয় ততদিন আই এ ও বি এ পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে অন্ততঃ একটি পুস্তক বাংলা ভাষায় পাঠ্য হউক। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতির ন্যায় বাংলাও একটি বিষয় হউক; লক্ষ্ণৌর বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সঙ্ঘের অতুল সমিতি নামকরণ হউক; নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল ফাইন্যাল ও হাইস্কুল পরীক্ষা বাংলায় লইবার ব্যবস্থা হউক; প্রবাসী বাঙালীদের প্রত্যেকের তথ্য সংগ্রহ করা হউক। প্রকাশ এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়। আগামী অধিবেশনে ছাত্রদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিতে বলা হয়। পরবর্তী অধিবেশনে সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকের মধ্যে পরিচয়ের জন্য আলোচনাদির ব্যবস্থা করিতে বলা হয়।

আগামী বৎসর গৌহাটিতে অধিবেশন করার জন্য আমন্ত্রণ হয়।

ভারতে কাপড়ের কল

ভারতে কাপড়ের কলসমূহের এক বিবরণী বোম্বাই মিল মালিকগণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে ভারতে ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ৩৭০টি কাপড়ের কল আছে। ইহার পূর্ব বৎসর ৩৭৯টি কল ছিল। যে সকল মিলে ৫০টির কম তাঁত সেগুলিকে ধরা হয় নাই; সেজন্যই সংখ্যায় কম হইয়াছে। বোম্বাইর দুইটি ও আমেদাবাদের তিনটি মিল কার্যের অনুযুক্ত বলিয়া উহার কার্য বন্ধ আছে।

বঙ্গদেশে আলোচ্য বর্ষে দুইটি মিল বাড়িয়াছে! বাংলা দেশে ২৬টি মিলে কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। মধ্য প্রদেশ, বেরার ও যুক্ত প্রদেশে মিলের সংখ্যা বাড়ে নাই। মাদ্রাজে দুইটি ও পাঞ্জাবে একটি নূতন মিল হইয়াছে। ভারতে টাকুর সংখ্যা ৯৭৩১০০০ ও তাঁতের সংখ্যা ১১২৮১০। এবৎসর টাকু ১১৬০০ ও তাঁত ২২৫২টি কমিয়াছে। ৩১ এ আগষ্ট কাপড়ের কলসমূহের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৩৯৮২০০০০০ টাকা ছিল। আলোচ্য বৎসর ১৫৭৩০০০ কেণ্ডি (১৭ মণ ১২ সের) তুলা ব্যবহৃত হয়; গত বৎসর একই পরিমাণ তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। গত বৎসর মিলসমূহে প্রত্যহ ৪ লক্ষ ৭০ হাজার শ্রমিক কার্য করিয়াছে।

সঞ্জীবনী

অধ্যাপক এফ্ ডব্লিউ টমাসের অভ্যর্থনা

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা কর্তৃক সান্ধ্য চা-ভোজ আপ্যায়ন

বিগত ৮ই জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব বোডেন অধ্যাপক প্রফেসার এফ্ ডব্লিউ টমাস সি আই ই মহাশয়কে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্, ইণ্ডিয়ান্ হিষ্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় তাঁহার ৮নং প্রিটোরিয়া ষ্ট্রিটস্থ ভবনে অপরাহ্ন চা-ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

এই ভোজে উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য :—

শ্রীযুক্ত এল্ এম্ বসু, ডক্টর ইউ এন্ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বি এন্ দত্ত, ডক্টর কে ডি নাগ, ডক্টর ও সি গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত এম্ এইচ কৃষ্ণন্, অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী, রায় আর পি চন্দ বাহাদুর, ডক্টর এল্ কে দত্ত, ডক্টর এস্ কে চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর আর জি বসাক, ডক্টর এন্ আর রায়, ডক্টর এন্ দত্ত, অধ্যাপক বি কে সরকার, ডক্টর বি এম্ বড়ুয়া, অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়, ইউনাইটেড প্রেসের শ্রীযুক্ত সেন, শ্রীযুক্ত জে এম্ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নির্মল ঘোষ।

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে এবং সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের পক্ষ হইতে অধ্যাপক টমাসকে প্রীতিময় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে উঠিয়া বলেন যে, অধ্যাপক টমাস নিজেও ভারততত্ত্ববিদ্ এবং সেই সমুদয় সুপ্রসিদ্ধ মনীষীর অন্তর্গত যাঁহারা জীবনব্যাপি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বিবিধ
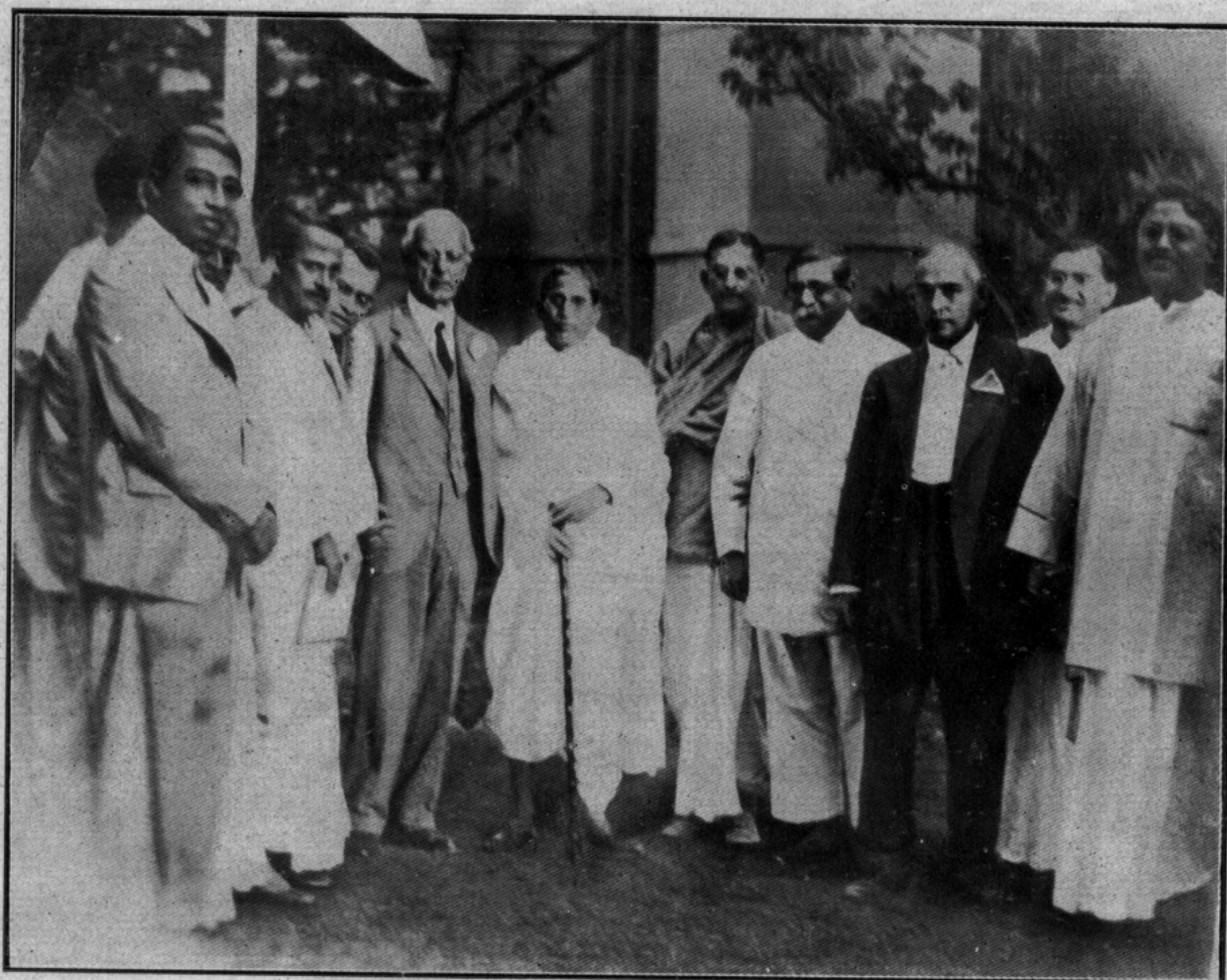
মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান (বামদিক্ হইতে) অধ্যাপক টমাস, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা

বিষয়ক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তকাবলীর দ্বারা ভারতের অতীত যুগ সম্বন্ধে ও বৃহত্তর ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এই সমুদয় মনীষী ভারততত্ত্বের রাজ্যে এমন এক পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি প্রয়োগ করিতেছেন, যাহা ভৌগোলিক বাধা এবং জাতিবর্ণ প্রভৃতির ভেদ-বৈষম্য তিরোহিত করিয়া বর্তমান এবং উহাই কোন জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতাকে প্রকৃত সমাদর করিবার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশের বহু সুপ্রসিদ্ধ ও আগ্রহশীল পণ্ডিত প্রাত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, ক্ষোদিতলিপি ও মূলগ্রন্থ লইয়া গবেষণা করিতেছেন এবং আমাদের দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ডক্টর লাহার মতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পক্ষপাতশূন্যমনে এবং সুদৃঢ় অনুরাগসহকারে গবেষণা করত যে সমাদর এবং প্রশংসা করেন, তাহারও প্রয়োজন আছে; কারণ, তাহা পাশ্চাত্য দেশের লোকের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের নিকট ভারতীয় মনীষীর ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখ-যোগ্য বলিয়া অনুভূত হইবে। এইরূপ সহযোগিতা দুই গোলার্ধের লোকের পক্ষে পরস্পরের কৃষ্টি ও সভ্যতার মধ্যে যাহা মহৎ, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া পরস্পরের প্রতি সমাদর ও মৈত্রীর ভাব বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই দিক্ ধরিয়া বিবেচনা করিলে অধ্যাপক টমাসকে পাশ্চাত্য-দেশ-প্রেরিত কৃষ্টিদূতরূপে অভ্যর্থনা করা যাইতে পারে; এবং ইহাও সৌভাগ্যের বিষয় যে অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্সের উদ্যোক্তাগণ ত্রিবাঙ্কুর অধিবেশনে তাঁহাদের চিন্তাধারা পরিচালনা করিবার জন্য অধ্যাপক টমাসকে নিজেদের মধ্যে পাইয়াছিলেন।

অধ্যাপক টমাসের জ্ঞান ও মনীষার সমাদরকল্পে স্কটিশ-চার্চ কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক পণ্ডিত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য ও মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর ডক্টর কালিদাস নাগ মহাশয় অধ্যাপক টমাসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন এবং এই প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমানে প্রাচ্য-বিদ্যার গবেষণায় ডক্টর লাহা কেন্দ্রস্থানীয়; তিনি বিগত চতুর্দশ বর্ষ ধরিয়া পরিচালিত ইণ্ডিয়ান্ হিষ্টরিক্যাল কোয়ার্টালি নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানসমৃদ্ধ পত্রিকার মারফৎ ভারতের প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্‌গণকে তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত করিতেছেন।

প্রত্যুত্তর দান করিতে উঠিয়া অধ্যাপক টমাস্ তাঁহার ভারত-ভ্রমণে যে বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে প্রদত্ত স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কৃত বক্তৃতা দাক্ষিণাত্যে শ্রবণ করিয়াছেন ও বর্তমান সভায় শ্রবণ করিলেন, তাহার উল্লেখ করেন। ইহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এখনও ভারতে এমন সংস্কৃতের চর্চা হয়, এবং ইহার উৎকর্ষও অদ্যাপি রক্ষিত হইতেছে, তাহাতে তিনি আশা করেন যে, একদিন সংস্কৃত ভাষা ভারতের সাধারণ ভাষারূপে উহার যোগ্য স্থান লাভ করিবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কৃষ্টিবিষয়ক বিভিন্নতার উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক টমাস বলেন যে, কিপ্‌লিঙের মতবাদ সর্বত্র নিন্দিত হইয়া বর্তমানে বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়াছে। অধ্যাপক টমাস মানবের বুদ্ধি-বিবেচনায় আস্থাবান্ এবং এই আশার বাণী হৃদয়ে পোষণ করেন যে, অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে ও পুনঃ পুনঃ সংস্রবের ফলে সর্ব মানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ভাব আপনা-আপনি জাগিয়া উঠিবে এবং তাহাতে যুক্তিবিরুদ্ধ ভেদ-বিভিন্নতার দ্বারা পরিপুষ্ট অমঙ্গলরাজি তিরোহিত হইবে।

কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে সমাগত অভ্যাগতগণের আনন্দ বর্ধন করা হইয়াছিল এবং ডক্টর লাহা স্বয়ং ও শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দত্ত অভ্যাগতগণের আদর-আপ্যায়নে সবিশেষ অবহিত ছিলেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস

কলিকাতা অধিবেশন

বিগত ৩রা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর্ দি অ্যাড্‌ভান্সমেণ্ট অফ সায়েন্সের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের জুবিলি অধিবেশনের উদ্বোধন

ভারতের রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সার জেমস জীন্‌স্ এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন।

বঙ্গদেশের গভর্ণর ভারতের রাজপ্রতিনিধির আগমনের পাঁচ মিনিট পূর্বে আগমন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় সেক্রেটারী এবং মেজর জেনারেল জি এফ্ লিণ্ডসে সি বি, সি এম্ জি, ডি এস্ ও, কম্যাণ্ডার প্রেসিডেন্সি ও আসাম জেলা, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

ভারতের রাজপ্রতিনিধিকে বাংলার গভর্ণর লর্ড ব্র্যাবোর্ণ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত এস্ পি মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা করেন এবং তিনি মেজর জেনারেল লিণ্ডসের সমভিব্যাহারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোর সৈন্যদল দ্বারা গঠিত গার্ড-অফ-অনার দর্শনার্থ গমন করেন।

পরিদর্শনের অবসানে ভারতের রাজপ্রতিনিধি, বাংলার গভর্ণর বাহাদুর এবং সভাপতি সার জেমস্ জীন্‌স সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের সঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ছিলেন :—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত এস পি মুখোপাধ্যায়; বাংলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত এ কে ফজলুল হক; বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসনের সিনিয়ার জেনারেল অফিসার অধ্যাপক পি জি এইচ বস্‌ওয়েল; রাও বাহাদুর টি এস্ ভেঙ্কটরমন; সার পি সি রায়; লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল আর বি সেমুর সিউওয়েল; অধ্যাপক এম্ এন্ সাহা; অধ্যাপক জে এল সাইমনসেন; সার এল এন্ ফারমোর; বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি সার ইউ এন্ ব্রহ্মচারী; বাংলার মন্ত্রী মাননীয় এন্ আর সরকার; মাননীয় এইচ এস সুরাওয়ার্দি; মাননীয় এম্ বি মল্লিক; মাননীয় সৈয়দ নৌসের আলি; মাননীয় মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী; মাননীয় নবাব মুসারফ হোসেন; কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলারদ্বয় সার নীলরতন সরকার ও সার হাসান সুরাওয়ার্দি; বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখাসমূহের সভাপতিগণ ডক্টর সি ডব্লিউ বি নরম্যাণ্ড; মিঃ ডি এন্ ওয়াডিয়া; অধ্যাপক বি সাহনি; অধ্যাপক এস্ এস ভাটনগর; ডক্টর এ এম্ হেরণ; অধ্যাপক জি মথই; ডক্টর বি এস গুহ; লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল আর এন্ চোপরা; ডক্টর জি বসু; অধ্যক্ষ বি এম্ সেন এবং অধ্যাপক এস কে মিত্র স্থানীয় সম্পাদকদ্বয়; অধ্যাপক জে এন্ মুখোপাধ্যায় এবং মিঃ ডব্লিউ ডি ওয়েষ্ট জেনারেল সম্পাদকদ্বয় এবং জে ভ্যানমেসন কার্যকরী সম্পাদক।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতের রাজপ্রতিনিধিকে সভার উদ্বোধন করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা করেন।

ভারতের রাজ প্রতিনিধি উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন :—

"আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসনের জুবিলী অধিবেশনের উদ্বোধন করিবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম।

এই অধিবেশন ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা এবং আমি উদ্বোধন মন্তব্যের প্রারম্ভে অ্যাসোসিয়ে-সনকে ইহার দীর্ঘ ও কার্যকরী জীবনের এইস্তরে সফলতার সহিত উপনীত হওয়ার জন্য আমার সাগ্রহ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

এই অধিবেশনের যাঁহারা উদ্যোক্তা তাঁহাদিগকেও আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা যে কলিকাতায় অধিবেশনের স্থান নির্ণয় করিয়াছেন এবং বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসনের সদস্যগণকে ও অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এই দিক্ দিয়া তাঁহারা খুবই ভাগ্যবান্।

কলিকাতায় স্থান নির্বাচন খুবই সুসঙ্গত হইয়াছে, কারণ এইখানেই এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে ১৯১৪ সালে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় বলিতে পারি যে, বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি ইহার সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে এই দেশে বিভিন্ন রকমের বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানে প্রেরণা দানের প্রধান উৎস ছিল।

আমার বোধ হয় যদি আমি এইখানে বঙ্গীয় রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির নিকট বর্তমান অ্যাসোসিয়েসনের

হইবে না, যেহেতু এই অ্যাসোসিয়েসনের শৈশবে এসিয়াটিক সোসাইটিই ইহার পালক-পিতা ছিল এবং বর্ত্তমানেও সাহায্যকারী সদয় আত্মীয়রূপে বর্ত্তমান।

কলিকাতার সহিত সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ এবং বর্ত্তমান অ্যাসোসিয়েসনের প্রথম সভাপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম সংশ্লিষ্ট। আমার মনে হয়, যদি আমি বলি যে, এই অ্যাসোসিয়েসনের প্রারম্ভ এবং ক্রমবিকাশ তাঁহার উৎসাহ এবং আগ্রহের এবং ইহার শৈশবে তিনি যে প্রেরণা দিয়াছিলেন, তাহার ফল, তাহা হইলে আমার মনে হয় আমি খুব অতিরঞ্জিত কিছু বলি নাই।

বৃটিস অ্যাসোসিয়েসনের সুপ্রসিদ্ধ প্রতিনিধিবর্গের এবং অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণের আগমন এই অ্যাসোসিয়েসনের ইতিহাসে এই জুবিলি অধিবেশনকে একটা বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে; সমস্ত অভ্যাগতবর্গকে আমি সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিতেছি। আমরা ভাগ্যবান্, আপনাদের আগমনকে মহান্ অনুগ্রহ বলিয়া বিবেচনা করি। বাস্তবিক ইহা তদপেক্ষাও বেশী; ইহা যেন ভারতের বৈজ্ঞানিক যুগের প্রারম্ভের স্বীকৃতি এবং ভারতবর্ষ ও বহির্দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিভাগে ঘনিষ্ঠতর সহযোগের সূচনা।

লর্ড রাদারফোর্ডের অকাল মৃত্যুতে আমাদের গভীর দুঃখ প্রকাশ না করিয়া আমি এই সুযোগকে অতিক্রান্ত হইতে দিতে পারি না। এই সম্মিলিত অধিবেশনের আলোচনায় তাঁহারই সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে কেবলমাত্র যে একজন সভাপতিকে হারান গেল তাহা নহে, যিনি স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও বিশাল মনের ছাপ এই সম্মিলনের উপর অঙ্কিত করিতেন; পরন্তু আধুনিক যুগের সর্বপ্রধান ব্যাবহারিক পদার্থ-বিদ্যাবিদের মৃত্যুতে পৃথিবীর ক্ষতি হইল।

সার জেমস্ জীন্‌কে তাঁহার স্থলে পাইয়া আমরা ভাগ্যবান্। নাক্ষত্রিক পদার্থবিদ্যায় তাঁহার দান পৃথিবীবিখ্যাত, এবং আমাদের বর্তমান শূন্যময় জগতের জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার সমুজ্জ্বল ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ যে কোন লোকের নিকট পরিচিত।

যদি আমি এক্ষণে ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সার জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে আমরা যে তীব্র দুঃখ অনুভব করিতেছি, তাহার উল্লেখ না করি, তবে আমি আমার কর্ত্তব্যে অবহেলা করিব। তাঁহার কার্যাবলী পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আরও দুঃখের বিষয় যে, বিগত ২৫ বৎসর ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার বিকাশ লক্ষ্য করিবার জন্য যে অনুষ্ঠান তাহাতে যোগ দিবার জন্য তিনি জীবিত নাই,—এই বৈজ্ঞানিক বিকাশে তিনি নিজেও একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনিই গভর্ণমেণ্টের বৈজ্ঞানিক বিভাগের বহির্দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রেরণা দান করেন; এবং যদি আমি তাঁহাকে ভারতে পদার্থবিদ্যায় বৈজ্ঞানিক গবেষকের অগ্রদূত বলিয়া উল্লেখ করি, তবে আমি অতিরঞ্জিত কিছু বলিব না।

যে সমস্ত ব্যক্তি ও ঘটনা দ্বারা এই কালবিভাগ বিশেষভাবে চিহ্নিত, যাহার জুবিলি উৎসবে আমরা সমবেত, এই প্রসঙ্গে তাহাদের উল্লেখের প্রলোভন খুবই স্বাভাবিক; ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসনের এই ২৫ বৎসর, উভয় দিক্ হইতেই সমৃদ্ধিশালী। যদি কেহ বিগত ২৫ বৎসরে পৃথিবীর ইতিহাসের বিকাশ লক্ষ্য করে, এবং তাহাতে যদি এই অ্যাসোসিয়েসন কোন রূপ ছায়া প্রতিফলিত না করে তবে তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুতরূপে প্রতিভাত হইবে। কিন্তু সময়াভাবে আমি ঐতিহাসিক দিক্ বর্ণনে বিরত রহিলাম।

যে উদ্দেশ্যের জন্য এই অ্যাসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত, সেই উদ্দেশ্য উহা কতদূর সংসাধিত করিয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিয়া আমি পারি না। বিগত শতাব্দীর সপ্তমদশকে তরুণ ভারতবাসী বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী হয়, এবং ভারতের বাহিরে যাইতে আরম্ভ করে, তৎকালে ইহা দুঃসাহসিক কার্য বলিয়া ধরা হইত।

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব অনুভূত হইল, যেখানে বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা মিলিত হইতে পারে; যেখানে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে পরস্পর ভাব-বিনিময় চলে;

যেখানে বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সংশ্রবের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে; যেখানে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য উপায় নির্ধারণ করা চলে এবং যেখানে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যাঁহারা সাহায্য করিতে সমর্থ, এই সমিতির কার্য ও অভাব-অভিযোগ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করা যাইবে।

তিনটি উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রথমত—গবেষণায় উৎসাহ দান ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকমহলে ভাবি গবেষণার ফল প্রচার; দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক সাহায্যের সুযোগ দান; তৃতীয়ত বিজ্ঞানে জনসাধারণের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করা। এই সমস্ত উদ্দেশ্য বিশদভাবে সংসাধিত হইয়াছে।

আমি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কি উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে তাহা দেখাইব;—এই সমিতির প্রথমদিকে মাত্র পাঁচটি শাখা ছিল—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও মানবজাতিতত্ত্ব; সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১০৯ এবং ৩৬টি প্রবন্ধ পড়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরের অধিবেশনে ১৩টি শাখা ও ১৬০৮ জন সদস্য বর্তমান; এতদ্ভিন্ন ৮০০ প্রবন্ধ পড়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

বিভিন্ন শাখার মধ্যে ২২টি আলোচনা বৈঠক বসিবে এবং ১০টি সম্মিলিত বৈঠক বসিবে; এই সম্মিলিত বৈঠক একাধিক শাখার সহিত সংশ্লিষ্ট। আমি জানি যে, সকলে একমত হইবেন যে, এই বিকাশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোনরূপ জোর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

আমার মনে হয় যে, কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, এই সমিতি ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে বার্ষিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রেরণা দানের বিশিষ্ট মূল্যবান্ কাজ করিয়াছে, এবং বৈজ্ঞানিক কর্মিদলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও অবিরত সহযোগিতা দ্বারা বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে; পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক কার্যে পরস্পরের অজ্ঞতা এবং প্রচেষ্টার অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তি দূরীভূত করিয়াছে।

এই সমিতি গবেষকগণের কার্যাবলী ধারাবাহিকভাবে পাঠাইবার সর্ত রচনা করিয়া ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণকে বহির্জগতের দৃষ্টিপথে আনয়ন করিবার কার্য সংসাধিত করিয়াছে। এই জন্য ভারতবর্ষ সমিতির নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ভারতবর্ষ বর্তমানে বহু বৈজ্ঞানিকের দাবী করিতে পারে যাঁহাদের মৌলিক গবেষণা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে এবং বর্তমান অনুষ্ঠানে বিদেশের বৈজ্ঞানিকের সমাবেশ ভারতীয় বিজ্ঞানকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার পদ দান করিয়াছে।

আমার মনে হয়, আমরা ভারতীয় বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উৎসাহজনক বলিয়া অনুভব করিতে পারি। ভারতবর্ষ দেখাইয়াছে যে, ভারতে কার্য করিতে ইচ্ছুক শক্তিমান্ লোকের অভাব নাই; এবং যদি আমরা এই দেশে লোক তৈয়ারী করিয়া যাঁহারা প্রত্যেক মহাদেশে কি বিশুদ্ধ কি ব্যাবহারিক মানবীয় জ্ঞানের সীমাবৃদ্ধির জন্য নিযুক্ত, সেই সমস্ত দেশের লোকের মধ্যে স্থান গ্রহণার্থ উক্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণকে নিযুক্ত করি, তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, ভারতবর্ষও মানবের উন্নতির জন্য এবং জ্ঞানের সৌকার্যার্থ অসীম সুবিধা দান করিবে।

সর্ববাদিসম্মতিতে আমাদের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য—আর্থিক জগতে কৃষিজীবী লোকদের অদৃষ্ট উন্নীত করা, তাহাদের জীবন-যাত্রা প্রণালীর উন্নতি সাধন। এই প্রচেষ্টায় সিদ্ধিলাভ আমাদের প্রত্যেক বিভাগে উন্নতির মানদণ্ডরূপে ব্যবহৃত হইবে।

সভাপতি মহাশয়, আমি অধিবেশনের বিভিন্ন শাখার বিষয়বস্তুর তালিকা দেখিয়াছি; তাহাদের মধ্যে খুব কম বিষয়ই উক্ত উচ্চ আদর্শের পরিপূরণে অক্ষম বলিয়া প্রতিভাত হয়। আজ আমাদিগের চারিদিকে পার্থিব উন্নতির যে বহুবিধ সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাদের সমাধানকল্পে মস্তিষ্ক এবং আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ অপেক্ষা বর্তমান ভারতের তরুণ বৈজ্ঞানিকের কর্মক্ষেত্রে মুগ্ধকরী আহ্বান আর কিছু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনুমানে আশাপ্রদ হইলেও অন্যান্য

দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কর্মকৌশলের উপায় বিধানে যে আনুষ্ঠানিক বিঘ্ন পরিদৃষ্ট হয়, ভারতও তাহার সম্মুখীন হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের শ্রমহেতু বিভাগে বিভিন্ন কর্মপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা এই যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন পক্ষান্তরে বিশিষ্ট বিজ্ঞানের জন্য সংগঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন,—দেরাদুনের ফরেষ্ট রিসার্স ইন্‌ষ্টিটিউট, দিল্লীর ইম্পিরিয়্যাল অ্যাগ্রিকালচ্যারাল রিসার্স ইন্‌ষ্টিটিউট, কশৌলীর সেন্‌ট্র্যাল মেডিকেল রিসার্স ইন্‌ষ্টিটিউট, কলিকাতার অল ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান—ব্যবহারিক বিজ্ঞানে গবেষণা চালাইয়া থাকে।

কিন্তু এই গবেষণায় আর্থিক সমস্যার সমাধানের ভার অবিলম্বে বা অবশেষে গভর্ণমেণ্টকেই গ্রহণ করিতে হয়; গবেষণা-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট দ্বারা পরিচালিত; বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায়ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন; আমার মতে ইহা সমীচীন ব্যবস্থা নহে যে, গভর্ণমেণ্ট বিভিন্নরূপে আর্থিক সমস্যার সমাধানে ভারাক্রান্ত হইয়াও এই দিকের প্রধান ব্যয়ভার বহন করিতে বাধ্য।

কি ব্যাবহারিক, কি বিশুদ্ধ—বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নহে। আমার বিবেচনায়, ব্যক্তিগত বদান্যতার দায়িত্বও কম নহে, যাহাতে এতদিন গভর্ণমেণ্ট ব্যগ্রভাবে সাহায্য দান করিয়াছেন এবং এখনও প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেই সাহায্য বিশেষভাবে করিতেছেন। আমি যখন এই কথা বলিতেছি, তখন গবেষণার বিভিন্ন দিকে এবং বর্তমান অনুষ্ঠানে ভূতপূর্ব ও বর্তমান দাতাগণ যে অমূল্য সাহায্য দান করিয়াছেন, আমি তাহাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছি না।

আমার আবেদনের ক্ষেত্র বিস্তৃত; বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধাও বৃহৎ; আবিষ্কারের ক্ষেত্র বিপুল করিবার মত অবশিষ্ট কাজও অনেক। আমি বিশ্বাস করি যে, যে আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধির জন্য আমি বলিতেছি, এবং যাহা এতদিন ধরিয়া উদারহৃদয় দানশীল লোকেরা দিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে প্রয়োজনানুরূপ ও সুযোগের অনুযায়ী সাড়া পাওয়া যাইবে।

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্র মহিলাবৃন্দ, এই বৈঠকের অনুষ্ঠান, এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একত্র সমাগম কেবলমাত্র ভারতীয় বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকগণের স্বীকৃতিমাত্র নহে; ইহা আরও অধিক; ইহা ভারতীয় চিন্তাধারার বিকাশে পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দের অনুরাগের প্রকাশ, এইরূপ উৎস হইতে অনুরাগের উৎপত্তি ভারতের পক্ষে বর্তমানে অমূল্য রূপে প্রতিভাত হইতেছে এবং আমার বোধ হয় ভবিষ্যতেও উহা সেইরূপ প্রতিভাত হইবে।

ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্তব্য নহে যে, ভারত বর্তমানে রূপান্তর-প্রাপ্তির স্তরে রহিয়াছে, বর্তমানে ভারত নবযুগের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। আমরা আশা করিতে পারি যে, অধুনাতন রাজনৈতিক সংস্কারের দ্বারা ভারতবাসীর মধ্যে এই ধারণা দৃঢ়তর সঙ্কল্পে প্রতিফলিত হইবে যে, ভারত অধিকতর পরিমাণে পৃথিবীর ইতিহাস ও ভাবে নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বব্যাপী বৈশিষ্ট্য দান করিবে।

সে দানের প্রকৃতি কি ও উহার পরিমাণ কিরূপ, বর্তমানে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস অপেক্ষা বহু পশ্চাতে চলিয়া যায়। ভারতের মহৎ নাম সেই দীর্ঘকাল ধরিয়া ধর্মে, রহস্যবাদে, দর্শনে ও ললিতকলায় সংশ্লিষ্ট ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্থনীতি কৃষি-বিষয়ক ছিল এবং অদ্যাবধি উহা সেইরূপ রহিয়াছে। ইহা সরল, সহিষ্ণু, নিয়মানুগ, এবং সঞ্চয়শীল জীবন বুঝায়।

সময়ে পাশ্চাত্যের প্রভাব অনিবার্যরূপে দেখা দিয়াছে; এবং আজ ভারত পুরাতন কাঠামোর উপর পাশ্চাত্যের নবীন রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির আকার দান করিতেছে, তাহার মানস জীবনে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের স্থান, উহার প্রচলিত চিন্তা ও অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সতেজে খুঁজিয়া বাহির করিতে ব্যস্ত।

সুতরাং পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক অধিনায়কগণের এবং বর্তমানকালে পাশ্চাত্য দেশের উন্নতির প্রধান বিশেষত্ব-

স্বরূপ অনুরূপ কার্যের প্রভুদের অনুরাগ, সহযোগিতা ও ঐক্য বর্তমান সময়ে ভারতের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়।

তর্কস্বরূপ বলা চলে যে, সকল লোকের মধ্যে তাঁহারাই বৈজ্ঞানিক যাঁহারা এই বিষয়ে খুবই কম সাহায্য করিতে সমর্থ; কারণ তাঁহারা বিশ্বের ভাষায় কথা বলেন এবং পৃথিবীব্যাপী সর্বত্র বিজ্ঞান—বিজ্ঞান; কিন্তু—আমি সাধারণ লোকের মত কথা বলিতেছি—যখন কোন দেশ ও উহার সভ্যতার সম্বন্ধে কথা উঠে, তখন বৈজ্ঞানিক যে পটভূমিকার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া কাজ করেন, তাহা হইতে এবং কালের বিকাশের উপর তাঁহার কার্যের প্রভাব হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করা কষ্টসাধ্য।

বৈজ্ঞানিকের আসন কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক জগতে নহে; পরন্তু অখণ্ড সমাজে। যে পটভূমিকার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কার্য করেন, তাহা বিভিন্ন; এবং তাঁহাদের আবিষ্কারমালার প্রভাবও প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু সেই বিভিন্নতা, ভারতে আমাদের নিকট, যাঁহারা বিজ্ঞানের অন্যান্য স্তরে সম্ভাবনা ও সীমারেখার দর্শনলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশ, পরিজ্ঞাত অনুরাগ এবং বিশাল ও বহুমুখী অভিজ্ঞতার মূল্যকে কিছুতেই হ্রাস করে না।

আপনাদের জ্ঞান, আপনাদের অভিজ্ঞতা, ভারতীয় পটভূমিকা হইতে আপনাদের দূরে অবস্থিতি,—যে সমস্যা বর্তমানে আমাদের পুরোভাগে বিদ্যমান, তাহার বিশ্লেষণে বিশিষ্ট মূল্য দান করিবে। আপনাদের বিবেচনায় যে ভাবে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালাইলে সফল হইবে বলিয়া প্রতিভাত হইবে, সে সম্বন্ধে ইঙ্গিতেরও বিশিষ্ট মূল্য আছে।

আমার বিশেষভাবে বলিবার দরকার হইবে না যে, যে সমস্ত সমস্যা আপনাদের পুরোভাগে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হইবে, তাহার সমাধানে যাহারা আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে আপনাদের উপস্থিতি উৎসাহের উৎসরূপে ফুটিয়া উঠিবে এবং বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের যে সমস্ত সাধারণ মীমাংসার বিষয়ে আমরা সকলে সংশ্লিষ্ট ও যাহা ভারত নিজের ভাবে সমাধানে চেষ্টিত, ইহার সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে একদল জ্ঞানী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিমত ক্রমবর্ধমান যাঁহারা ভারতের দৃশ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ—এই অনুভূতিও ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে উৎসাহিত করিবে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস এই পরিদর্শনের ফলমাত্র এক দিকে অনুভূত হইবে না। এমন কি পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎসাহশীল বিশ্বাসী লোকও অবসন্ন হইয়া পড়িবেন, যখন তিনি দেখিবেন যে, পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিফলতায় পর্যবসিত হইতেছে এবং এমন এমটি সমাজ গঠন করিতে পারিতেছেন না যেখানে আর্থিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সুখেস্বচ্ছন্দে হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইবে।

সম্ভবত পাশ্চাত্য দেশ ভারতের সরলতার উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার উপর এবং বস্তুনিচয়ের আধ্যাত্মিক পরিসমাপ্তির উপর নিশ্চিত সত্যের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে, যাহা পাশ্চাত্যের অত্যন্ত উন্নতমনা মনীষিমণ্ডলী বর্তমানে আবিষ্কার করিতেছেন।

ইহা আশা করা কি খুব বেশী যে, আপনারা ভারতের পথস্বরূপ হইবেন, যাহার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ অধিক পরিমাণে পাশ্চাত্যে ও পৃথিবীর চিন্তাধারায় স্বীয় বৈশিষ্ট্য দান করিবে, যাহা, আপনারা, যাঁহারা ভারতকে ভাল বাসেন এবং জানেন ও বিশ্বাস করেন যে ভারত পূর্ণভাবে প্রদানে সমর্থ?"

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি সার জেম্‌স্ জীন্‌স্, ডি এস-সি, এস-সি ডি, এল্-এল্ ডি, এফ্ আর এস মহাশয় নিম্নলিখিত উদ্বোধন-অভিভাষণ পাঠ করেন:—

"কয়েক সপ্তাহেরও আগে আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, আমরা এমন এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের সভাপতিত্বে এই স্থলে সমবেত হইব, যিনি সমস্ত কালের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাঁহার আকস্মিক তিরোধান কেবলমাত্র আমাদের, যাহারা ইয়োরোপ হইতে আসিয়াছি এবং তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে জানি, দুঃখের কারণ নহে, পরন্তু উপস্থিত সকলের মনে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার কার্যের দ্বারা তিনি আমাদের সকলের পরিজ্ঞাত

ছিলেন। যখন তাঁহার শক্তি পূর্ণতা লাভ করিল, তখন তিনি আমাদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন—পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন, স্মৃতিস্তম্ভসদৃশ একটি পরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ জীবনের কার্যাবলী। এইরূপ কার্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই বলিলেও চলে। কিন্তু একটা অনুভূতিও তাঁহার পশ্চাতে রহিয়াছে যে, তিনি হয়ত আরও অধিক কার্য করিতে পারিতেন এবং সম্ভবত যদি তিনি আরও কয়েকটি বৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে আরও বৃহত্তর কার্য সম্পন্ন করিতেন।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব মানুষ হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের সমান ছিল। আমরা তাঁহার মহৎ উৎসাহ-পূর্ণ উচ্ছ্বসিত ব্যক্তিত্বে অনাড়ম্বর জীবনযাপন, সরলতা, চরিত্রের নির্মল স্বচ্ছ সততা, তাহার বন্ধুত্ব এবং সঙ্গী লাভের প্রতিভার কথা স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করি এবং চিরদিন করিব।

সমস্ত প্রকারের সম্মান তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছে; সুতরাং পৃথিবীর লোক তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিত, তাহা তিনি জানিতেন; তথাপি তিনি ছিলেন সরল এবং আড়ম্বরহীন এবং যদি তাঁহার ছাত্র বা সহকর্মীর মধ্যে অভিজ্ঞতাহীন নূতন লোকও তাঁহাকে কিছু বলিত এবং যদি তাহা কেবলমাত্র সরলভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসন্ধানের জন্য হইত, তবে তিনি তাহাও ধীরভাবে শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশিষ্ট তালিকা প্রদানের ইহা সময় এবং স্থানও নহে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্যাবিদ Niels Bohr বোলোগ্নার বিজ্ঞান-কংগ্রেসে রাদারফোর্ড সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্যাবলী এত বৃহৎ যে, বর্তমান সভার মত পদার্থবিদ্যাবিদ্দের সম্মিলনে যে সমস্ত আলোচনা হইবে, তাহার প্রত্যেক কথাটি তাহার মধ্যে বর্তমান। বোলোগনায় যাহা বলা হইয়াছে, কলিকাতাতেও তাহাই বলা চলে। আমাদের পদার্থবিদ্যাশাখার কার্য-তালিকা, রাদারফোর্ড যদি না জন্মিতেন, তবে যেরূপ হইত, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে। এবং ইহাও দুঃখের বিষয় যে, এই কার্যতালিকা, তিনি কয়েক মাস বেশী বাঁচিয়া থাকিলে যেরূপ হইত, তাহা হইতেও বিভিন্ন হইবে; কারণ তাহা হইলে আমরা তাঁহার উৎসাহপূর্ণ আবেশোদ্দীপক ব্যক্তিত্বের দর্শন পাইতাম; তাঁহার বিশাল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আমাদের বাদানুবাদকে সজীব করিয়া তুলিত। সুখের বিষয় যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে আমাদের এই সভা হইতে অনুপস্থিতও থাকিতে পারিবেন না; তিনি নিশ্চয় আগ্রহ ও অনুরাগের সহিত এই অনুষ্ঠানের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন; এবং ইতিপূর্বেই তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ লিখিয়াছেন, উহা আমি অনতিবিলম্বে আপনাদের নিকট পাঠ করিব।

ইহাতে তিনি নবীন স্পর্শমণিতত্ত্ব বা পদার্থের রূপান্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; শুধু ইহাই তাঁহাকে পদার্থবিদ্যাবিদের পুরোভাগে উপস্থাপিত করিত; অথচ ইহা মাত্র তাঁহার জীবনের সমগ্র কার্যের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

যখন প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে আমি তাঁহার সহিত প্রথম পরিচিত হই, তখন তিনি বেতারবার্তা লইয়া গবেষণা করিতেছিলেন; তাহাতে তিনি নিজের তৈয়ারী গ্রহণ-যন্ত্র ব্যবহার করিতেন এবং তৎকালীন বৃহত্তম দূরত্ব ১½ মাইলের ব্যবধানে বিকিরণ করিতেন। এই সময়কে তিনি পদার্থবিদ্যার বীরযুগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে "রয়্যাণ্টগ্যান আলো" আবিষ্কৃত হইয়া গ্যাসে বৈদ্যুতিক পরিচালনের নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল; ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইল; এবং মনে হইল যে পদার্থের গঠন সম্বন্ধীয় যুগব্যাপী রহস্য মীমাংসিত হইতে চলিল; রেডিয়ো কর্মশক্তি আবিষ্কৃত হইল, এবং তাহাতে পদার্থবিদ্যার সুপ্রতিষ্ঠ আইনসমূহ যেন অবহেলিত হইল বলিয়া প্রতীয়মান হইল; এবং এমন এক নবীন পথের সন্ধান দিল, যাহা কোথায় গিয়াছে কেহই জানে না—কিন্তু উহা বাস্তবিকই উনবিংশ শতাব্দীর শ্রমলব্ধ বহু আবিষ্কারের জনক পদার্থবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাজ্যে।

রাদারফোর্ড তাঁহার বিপুল উৎসাহ পর্যায়ক্রমে এই

সমস্ত নবীন সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। খুব সহজ সরল অথচ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তথ্যানুসন্ধানের ফলে তিনি রেডিয়ো কর্মশক্তির মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম আনয়ন করেন। 'গতির' সহযোগে তিনি এই শৃঙ্খলা ও নিয়মের ব্যাখ্যা করেন; তাঁহারা দেখিলেন এই রেডিয়ো-কর্মশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত আণবিক বিস্ফোরণের ফলে এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে রূপান্তরের বার্তা ঘোষণা করিতেছে।

অতঃপর রাদারফোর্ড আণবিক বিস্ফোরণের সময় যে সমস্ত পদার্থ প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই সমস্ত অজ্ঞাত কণা লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি উহা দ্বারা অণুকে আঘাত করেন এবং এই আঘাতের কালে অণুর গঠনের নিয়ম অবগত হন। পরিশেষে তিনি দেখাইলেন কি প্রকারে এইরূপ আঘাত অণুর গঠন পরিবর্তিত করিয়া পদার্থের রূপান্তর সংসাধনে সমর্থ। এতদিন পরে স্পর্শ-মণিতত্ত্ববিদের স্বপ্ন সফলতার তীরে উপনীত হইল।

সম্ভবতঃ এইগুলিই তাঁহার জীবনের বহিঃপ্রকৃতির সীমারেখা, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেকটি গবেষণাই কুঞ্চিকার অনুরূপ; প্রত্যেকটি পরিকল্পনায় সরল, কার্যকারিতায় শ্রেষ্ঠ, ফলে বহু দূরব্যাপী। তাঁহার কৃত-কর্ম বিপুল; এই বিপুল কর্মের ব্যাখ্যা দেওয়া কেবল এইভাবে চলিতে পারে যে, তিনি সহকর্মীর উপর অপ্রয়োজনীয় কর্মভার ন্যস্ত করিতেন এবং এই সহকর্মীকে স্বীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিতেন। ঠিক পথে রহস্য-মীমাংসার দিকে অগ্রগতি, এবং আক্রমণের সোজাসুজি ভাব—এই দুই বিষয়ে তিনি কতকটা মাইকেল ফ্যারাডের সহিত তুলনীয়। ফ্যারাডে অপেক্ষাও তাঁহার দুইটি সুবিধা বেশী ছিল,—একটি উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য; দ্বিতীয়তঃ একদল উৎসাহী সহকর্মীকে পরিচালনা করিবার শক্তি ও সুযোগ। ফ্যারাডের কৃত-কর্মও বিশাল সন্দেহ নাই; কিন্তু রাদারফোর্ডের কৃতকর্মের সহিত তুলনা করিতে হইলে আমাদিগকে নিউটনের নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে।

ভলটেয়ার নিউটনের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, নিউটন অন্য বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ভাগ্যবান্ যেহেতু যে নিয়মে বিশ্ব পরিচালিত তাহার আবিষ্কার মাত্র একজন লোকের ভাগ্যে ঘটিল। যদি ভলটেয়ার আরও কিছুদিন বাঁচিতেন, তবে তিনি রাদারফোর্ড ও তাঁহার সূক্ষ্ম জগতের সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তি করিতেন। অধিকন্তু, রাদারফোর্ডের জীবনে নিউটনের মত স্পর্শমণির সন্ধানে সময় কর্তনের দৃষ্টান্ত মিলে না; কিম্বা নিউটনের ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি-বিজ্ঞানের মতবাদেরও প্রশংসা করা চলে না; কিম্বা তাঁহার সম-সাময়িক ব্যক্তিবর্গের সহিত তীব্র কলহেরও সমর্থন করা যায় না। পক্ষান্তরে রাদারফোর্ড সুখী যোদ্ধা—তিনি কর্মে সুখী, কার্যের ফলে সুখী, এবং মানবের সংস্রবেও সুখী।

মৃত্যুর বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়া আজ আমি আপনাদের সম্মুখে সভাপতিরূপে উপস্থিত হইয়াছি। আপনাদের এই নির্বাচনে আমি যে কিরূপ সম্মানিত বোধ করিতেছি তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু যে মহাপুরুষকে আমাদের মধ্যে পাইবার আশা করিয়াছিলাম, সেই প্রকৃত মহাপুরুষের স্থলে নিজেকে প্রতিনিধিরূপে ভাবিয়া নিজের অক্ষমতার বিষয়ে অভিভূত হইতেছি।

তথাপি আমি আমার দ্বিতীয়ভাবে—বৃটিশ অ্যাসো-সিয়েসনের প্রতিনিধিবর্গের মুখপাত্ররূপে—নিজের উপস্থিতির কথা বিস্মৃত হইব না। ১৯৩৪ সালে বর্তমান কলিকাতা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার নিমন্ত্রণ যখন পাই, তখন আমি বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি ছিলাম; আমার বেশ মনে আছে, আপনাদের প্রতিনিধিগণ আমাদের আগমন কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নহে পরন্তু আমাদের পক্ষে আনন্দজনক করিবার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমি নিশ্চিত যে, আমি সমস্ত ইয়োরোপীয় প্রতি-নিধির পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আপনাদের এই সযত্ন-রচিত প্রাচুর্যপূর্ণ আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অবশ্য আমাদের কয়েকজনের পক্ষে ভারতবর্ষ সুপরি-জ্ঞাত দেশ; অন্যান্য সকলে—খুব সম্ভব অধিকাংশ—এই প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। এই ভারতীয়

অ্যাসোসিয়েসনের পঞ্চ বিংশতি বার্ষিক উৎসবে উপনীত হইয়া আমরা বিশেষ অনুরাগী হইয়াছি। আপনাদের জীবনের ২৫ বৎসরে বিজ্ঞানের সর্বদিকে বিরাট্ উন্নতি দেখা যাইতেছে; অবশ্য আমার নিজের বিভাগে কম উন্নতি দেখা দেয় নাই। ২৫ বৎসর পূর্বে গণিত জ্যোতিবী এই লইয়া তর্ক করিতেন যে, ঘোরাল নীহারিকা ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত কি বহির্ভূত; এই সমস্ত নীহারিকার দূরত্ব নির্ণয়ে অন্তত পক্ষে ১০০টি গুণনীয়ক ব্যবহৃত হইত; এবং ছায়াপথের বহির্ভূত বিশাল জগৎ তখনও লোকের জ্ঞাননেত্রের সম্মুখীন হয় নাই। আইনষ্টাইনের প্রতিভা আমাদিগকে সীমানিরূপক অন্যোন্যসাপেক্ষত্ব মতবাদ দান করিয়াছে;—এই মতবাদ মিচেলিন-মর্লি পরীক্ষার পরিণামফল—তদপেক্ষা জটিল আকর্ষণীয় মতবাদ এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। আমরা তখনও এই লইয়া মাথা ঘামাইতাম যে, বিশ্ব সসীম কি অসীম এবং দেশ কাল প্রকৃত কি অপ্রকৃত। পদার্থবিদ্যায় প্ল্যাঙ্ক আমাদিগকে প্রাথমিক পরিমাণ মতবাদ দান করেন; কৃষ্ণদেহের তাপ বিকিরণ হেতু উহার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু আণবিক পদার্থবিদ্যায় তখনও উহার প্রয়োজন দেখা যায় নাই। রাদারফোর্ডের যুগ-প্রবর্তক আবিষ্কার—অণুর অজ্ঞাত কণা বিকিরণ—অণুকে বর্তমানে আমরা যেভাবে দেখি ঠিক সেই ভাবে দেখাইয়াছে—অণু একটি ভারি অন্তরকোষ; যাহার চতুর্দিকে হাল্কা ইলেকট্রনের মেঘ পুঞ্জীভূত অবস্থায় বিদ্যমান। বোর অবিলম্বে এই ভাব গ্রহণ করেন এবং ইহাকে আরও বিকশিত করেন। তিনি প্রমাণিত করেন কি প্রকারে পরিমাণবাদ মেঘপুঞ্জ সদৃশ ইলেকট্রনের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে, এবং ইহাকে আণবিক স্পেকট্রার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই ভিত্তির উপর প্রাথমিক পরিমাণবাদ ও পরবর্তী বিশাল পরিমাণবাদ এবং তরঙ্গ-বলবিজ্ঞান গঠিত। অবশেষে নবীন নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা উদ্ভূত হয়, উহা রাদারফোর্ডের ব্যক্তিগত সৃষ্টি। * * *

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই রোমাঞ্চকর স্তরে ভারতবর্ষ চুপ করিয়া বসিয়া নাই। এই ২৫ বৎসর এই অ্যাসোসিয়েসন নগণ্য অবস্থা হইতে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। অন্যান্য দেশও ভারতের বৈজ্ঞানিক জাতিরূপে বিস্ময়কর বিকাশ দেখিয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কোন ভারত-সন্তান রয়্যাল সোসাইটির ফেলো ছিলেন না; আজ সেখানে ৪জন ভারতীয় রয়্যাল সোসাইটির ফেলো। ১৯১১ সালে রয়্যাল সোসাইটি কোন ভারতবাসীর প্রবন্ধ প্রকাশ করে নাই; ১৯৩৬ সালে দশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। হিসাব শুষ্ক পদার্থ; উহাকে যত বৃহত্তর করা যাউক না কেন। বাস্তব উদাহরণ অপেক্ষা উহা কম স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এইরূপ দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব বিভাগে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাই। অঙ্কশাস্ত্রবিদ্গণ ও পদার্থবিদ্যাবিদ্গণ বিশুদ্ধগণিতে রামানুজমের প্রতিভায় ও মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার আবিষ্কারে চমকিত হইবেন; সার ভেঙ্কট রমণের আবিষ্কার—রমণ-এফেক্ট—পৃথিবীবিখ্যাত; রমণ ও অন্যান্য অনেকে ধ্বনি ও সঙ্গীতে বহুবিধ আবিষ্কার করিয়াছেন। অ্যাষ্ট্রো-ফিজিক্সে সাহার আবিষ্কার গণিত জোতিষে বিশাল নবীন ক্ষেত্রের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে; বিশেষত চন্দ্রশেখর ও কোঠারির তারকার অভ্যন্তর সম্বন্ধীয় গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার মনে হয় শুধু অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ও পদার্থবিদ্যাবিদ্ নহেন, পরন্তু সকল বিভাগের কর্মীই বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিবেন, স্বর্গীয় সার জগদীশচন্দ্র বসুর পরীক্ষামূলক কৌশল ও বিরাট্ প্রতিভার অবদান।

যদি এই সমস্ত নাম ও তাঁহাদের কার্যকলাপের দান বিজ্ঞানের মাত্র একটি বিভাগে মনে পড়ে, তবে পরিপূর্ণ বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ কত সমৃদ্ধিশালী তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সমস্ত বিষয় ভাবিয়া আমরা বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে সর্বান্তকরণে আমাদের ভ্রাতৃ-প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দিত করিতেছি; ইহা যে আপনাদের ২৫ বৎসর পরিপূর্ণতায় তাহা নহে, পরন্তু এই বিগত ২৫ বৎসরে আপনারা যে বিশাল সমৃদ্ধি আহরণ করিয়াছেন, তাহার জন্য।"

অভিভাষণের অবসানে জেমস্ জীন্স্ লর্ড রাদারফোর্ডের অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতি

পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষিমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানসমূহ যে অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন। ভারতের রাজপ্রতিনিধি তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসনের জুবিলী সদস্যপদ প্রদান করেন :—

সার জেমস্ জীন্স, সার পি সি রায়, সার আর্থার এডিংটন, সার এম্ বিশ্বেশ্বরীয়, (অনুপস্থিত), অধ্যাপক সি জি জাং, সার সি ভি রমণ (অনুপস্থিত), ডক্টর এফ ডব্লিউ অ্যাষ্টন, অধ্যাপক এম্ এন্ সাহা, অধ্যাপক এল্ এফ্ দে বোফোর্ট, সার ফ্রেডারিক হ্বাবডে, অধ্যাপক জে এল্ সাইমনসেন ও অধ্যাপক এ এইচ্ আর বুলার।

স্থানীয় সেক্রেটারী অধ্যাপক এস কে মিত্র, ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও বাংলার গভর্ণর বাহাদুরদ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ ডব্লিউ ডি ওয়েষ্ট স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং অধ্যক্ষ বি এম্ সেন ও অধ্যাপক এস্ কে মিত্রের কার্যের বিশিষ্ট প্রশংসা করেন।

ষ্টেট্স্ম্যান্

জাতীয় সংবাদ

শ্রীপাট সপ্তগ্রামে বার্ষিক মহোৎসব

বর্ত্তমান বর্ষে ১৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীশ্রীমদ্ নিত্যানন্দপার্ষদ দ্বাপরের সুবাহুনামা পঞ্চম গোপাল সুবর্ণবণিক্কুলপাবন উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে ১৪ই পৌষ বুধবার রাত্রে অধিবাস কীর্ত্তন দ্বারা সাম্বাৎসরিক স্মরণমহোৎসব আরম্ভ হইয়া ১৮ই পৌষ রবিবার সমাধা হয়। ১৪ই পৌষ রাত্রে শ্রীপাট বাঘনাপাড়া নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নেতৃত্বে কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দাস বাবাজী এবং ভক্তগণ কর্ত্তৃক অধিবাস কীর্ত্তন দ্বারা মহোৎসব সূচিত হয়। তৎপরদিবস তিথি আরাধনা উপলক্ষে শ্রীবিগ্রহের ষোড়শোপচারে পূজা এবং ভোগরাগ হয়। মধ্যাহ্নে বিখ্যাত নাম প্রচারক শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহাভাগ সপার্ষদে শ্রীপাটে আগমন করেন এবং তাঁহার মধুময়কণ্ঠে হরিনাম সংকীর্ত্তনের লহর তুলিয়া শ্রীপাট মুখরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়োন্মাদকারী নামগান এবং দত্তঠাকুরের মহিমা আস্বাদন করিবার জন্য ঐদিবস প্রায় দুই সহস্র নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সেবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা হইয়াছিল। কীর্ত্তনান্তে গোস্বামী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভক্তগণ এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইয়াছিল। যাত্রিগণের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ঐ দিবস অপরাহ্নে রেল কোম্পানী ত্রিশবিঘা হইতে একখানি স্পেশ্যাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

১৬ই পৌষ শুক্রবার সমস্ত দিবস নাম কীর্ত্তন এবং লীলা গান হইয়াছিল। রাত্রে স্থানীয় অভিনয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্বর্গীয় পান্নালাল শীল বিরচিত ভক্তিরসাত্মক "উদ্ধারণ দত্ত" নাটক অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়ে নাচ গান ও কথকতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল এবং অভিনেতাগণের মধ্যে সকলেই স্বীয় স্বীয় অংশ অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সুদূর পল্লীপ্রান্ত হইতে সমাগত বহু নরনারী শীতের নিদারুণ কষ্ট উপেক্ষা করিয়া বহুরাত্রি পর্য্যন্ত নাট্যাভিনয়ের আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

১৭ই পৌষ শনিবার ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীঅষ্টপ্রহর নাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় এবং অহোরাত্র মধুর নাম গানে শ্রীপাট ধ্বনিত হইয়া ভক্তগণের হৃদয়ে ভাবলহরী প্রবাহিত করে এবং পর দিবস প্রাতঃকালে নামের বিরাম হয়। বেলা নয়টার সময় বিরাট্ নাম সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় ধুল্লটকীর্ত্তনে শ্রীপাটের গগন-পবন পবিত্রীকৃত করতঃ এবং শ্রীপাটের

চতুষ্পার্শ্ব পরিক্রমণ করিয়া কৃষ্ণপুরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাটে গমন করেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ধুলট উৎসব সমাধা করেন।

১৮ই পৌষ রবিবার বেলা একটার সময় উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সমিতির অষ্টাত্রিংশ সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র মল্লিকের প্রস্তাবে এবং কুমার শ্রীযুক্ত কার্তিকচরণ মল্লিকের অনুমোদনে শ্রীপাটের অন্যতম ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দত্ত বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নটবরচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মল্লিক, মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত নীলরতন বড়াল প্রভৃতি কার্যবিবরণী সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং যাহাতে শ্রীপাটের আয় বর্ধিত হয় তাহার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। শ্রীপাটের নানা বিষয়ে বৃত্তি বাবদ আয় কমিয়া যাওয়ায় কয় বৎসর যাবৎ স্থায়ী সেবাভাণ্ডারের সঞ্চিত কোম্পানীর কাগজের সুদ হইতে ব্যয় সংকুলান করা হইতেছে। কোম্পানীর কাগজের সুদ স্থায়ী সেবা-ভাণ্ডারে পরিণত হওয়া উচিত কিন্তু নানা-বিষয়ে বিশেষতঃ বার্ষিক মহোৎসবের ব্যয় উত্তরোত্তর বর্ধিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষগণকে বাধ্য হইয়া সুদের টাকা খরচ করিতে হয়। ইহার প্রতিবিধান ও বিহিতকল্পে বাক্স, বিবাহ ও অন্যান্য বৃত্তি যাহাতে বর্ধিত এবং নিয়মিতভাবে সংগৃহীত হয় তাহার জন্য বক্তাগণ সকলকে যত্নবান্ হইতে অনুরোধ করেন।

কুমার শ্রীযুক্ত কার্তিকচরণ মল্লিক প্রস্তাব করেন যে, শ্রীপাটের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যাবতীয় বৃত্তি আদায়ের সুব্যবস্থা এবং বিভিন্নস্থানে গমন করিয়া স্থায়িসেবাভাণ্ডার পুষ্টি করিবার জন্য দুইটি স্বতন্ত্র সাব-কমিটি গঠিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হয় এবং উহার সভ্য মনোনয়ন করিবার জন্য কার্যনির্বাহক সমিতিকে অনুরোধ করা হয়। কুমার শ্রীযুক্ত কার্তিকচরণ মল্লিকের পক্ষ হইতে উপেন্দ্র বাবু গত বৎসরের প্রতিশ্রুতি বাবদ নগদ একশত টাকা সেবাভাণ্ডারে দান করেন।

কলিকাতা মলঙ্গা লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দত্তের ভগ্নী শ্রীমতী প্রভাবতী দাসীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত একশত টাকা সেবাভাণ্ডারে দানের প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞাপিত করেন।

ঠাকুর বাটীর কার্য এবং পরিচালকগণের পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের উল্লেখ করিয়া সভাপতি সংক্ষেপে বক্তৃতা প্রদান। করেন পরিশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

অপরাহ্নে সমাগত ভক্ত অতিথি অভ্যাগত ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবান্তে উৎসব সমাধা হয়। এই দিবস কিঞ্চিদধিক দ্বিসহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং অনেক মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। এই দিবসও ই আই রেল কোম্পানী ত্রিশবিঘা ষ্টেশন হইতে একখানি অতিরিক্ত ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়া যাত্রিগণের প্রত্যাবর্তনে সহায়তা করিয়াছিলেন। ত্রিশবিঘা ষ্টেশনেই গাড়ীখানি পূর্ণ হইয়া যায়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য ষ্টেশনে অতিরিক্ত কর্মচারী প্রেরণ এবং সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিয়া রেল কোম্পানী সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। মেলার শান্তিরক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া মগরা পুলিশের কর্মাধ্যক্ষগণ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থার জন্য হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্যগণ শ্রীপাট সমিতির অশেষ এবং বিশেষ ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছেন।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজ

সাম্বাৎসরিক অধিবেশন

গত ২৮শে কার্তিক রবিবার অপরাহ্ন ৬টার সময় কলিকাতা ৪নং সিকদারপাড়া ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত গদাধর মল্লিক মহাশয়ের ভবনে সমাজের সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। সমাজের বহু সভ্য এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। দলপতিগণের অন্যতম প্রবীণ ও মহানুভব শ্রীযুক্ত নন্দলাল মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রারম্ভে সম্পাদক

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন সভার পক্ষ হইতে সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া সভাপতি বরণের প্রস্তাব করেন এবং কুমার শ্রীযুক্ত কার্তিকচরণ মল্লিক উহা অনুমোদন করেন।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার দত্ত বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করিলে সভায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নটবরচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং যাহাতে প্রস্তাবিত সমাজ-ভবন নির্মাণের কার্য সত্বর অনুষ্ঠিত হয় তাহার জন্য সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। সভাপতির শারীরিক দুর্বলতাপ্রযুক্ত তাঁহার নিম্নলিখিত অভিভাষণ তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক পাঠ করেন।

সমবেত ভদ্রমহিলা, ভদ্র মহোদয় এবং সমাজহিতৈষী বন্ধুগণ,

আপনারা আমাদের সমাজের অগ্যকার এই বার্ষিক সভায় আমাকে সভাপতিরূপে বরণ করে, যে মর্যাদা এবং সম্মান দেখিয়েছেন তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট চির ঋণ এবং কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকব। আমি জানি যে আমি একজন ভাল বক্তা নই, বিদ্বান্ নই কিম্বা সমাজ-নীতিজ্ঞ নই,—তথাপি আপনারা কেন যে আমাকে সভাপতির স্থান দিয়েছেন—তা আমি জানিনা। তবে এইটুকু আমি খুব ভাল করেই জানি যে যদিও আমি একজন বক্তা, বিদ্বান্ বা সমাজ-নীতিজ্ঞ নই,—নির্লিপ্ত এবং অক্লান্তভাবে সমাজ-সেবার দ্বারা আমি আমার সারা জীবন কাটিয়েছি, এবং বাকিটুকু কাটাতে চাই। এবং আমার মনে হয় এবং বিশ্বাস যে, এই নির্লিপ্ত ভালবাসা বা সমাজ-সেবাই বোধ হয় একমাত্র কারণ, যার ফলে আপনারা আমাকে সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। আমার আরও মনে হয় যে, এই ভালবাসা বা সমাজ-সেবার আন্তরিক ইচ্ছার প্রয়াসই বোধ হয় একটা সুগভীর আকর্ষণ, যার টানে আমাকে আমার বার্ধক্যজনিত শারীরিক দুর্বলতাকেও তুচ্ছ করে আপনাদের সম্মুখে আজ টেনে এনে হাজির করেছে। আমি অল্পদর্শী হতে পারি, আমার সমাজনীতি জ্ঞান বা বুদ্ধি নাও থাকতে পারে, কিন্তু আমার প্রাণ আছে—সমাজের জন্য অফুরন্ত দরদ বা ভালবাসা আছে। আজ নীতিজ্ঞানের পরিবর্তে আমি এই ভালবাসা-দরদেরই প্ররোচনায় আপনাদের সামান্য কিছু বলব।

আমি বিশেষ আনন্দ এবং পরিশ্রম সহকারে আমাদের সমাজের অষ্টাবিংশ এবং উনত্রিংশৎ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেছি।

প্রথমেই আপনারা আমাদের পরলোকগত দয়ালু সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশ করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, স্বর্গগত সম্রাটের প্রতি চূড়ান্ত অনুরাগ প্রকাশ করার পন্থা কেবল শোক প্রকাশের দ্বারা নয়। সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর আদর্শ, তাঁর বাণী, তাঁর বিধান, তাঁর rules and constitution মেনে চলা। এই rules এবং constitution আর কিছুই নয়, এর সংক্ষেপ অর্থ হ'ল loyalty and allegiance; তাই তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বর্গগত আত্মার শান্তি কামনা করে আমরা নূতন রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করছি। এবং constitution অনুযায়ী আজ সকলে সমস্বরে বলছি, 'The King is dead'; 'Long live the King'।

আমরা আজ গভীর দুঃখ সহকারে স্মরণ করছি আজ আমাদের সমাজের এবং দেশের অনেক হিতৈষী এবং মহানুভব উদার ব্যক্তি আমাদের ভিতর নেই। আমরা তাঁদের স্বর্গীয় আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করছি,—এবং আরও প্রার্থনা করি যেন তাঁদের আত্মত্যাগ, সমাজের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থভাবে সমাজের প্রতি একনিষ্ঠ সেবার গৌরবান্বিত দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজের কিশোর এবং যুবক সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করে, সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করে ভবিষ্যতে যেন তাদেরও সমাজের এবং দেশের একনিষ্ঠ সেবক করে তোলে।

আমাদের সমাজের কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি যেমন ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা, কুমার কার্তিক মল্লিক,

ডক্টর সত্যচরণ লাহা প্রভৃতি মহোদয়গণ গভর্ণমেণ্ট তরফ হতে উচ্চ সম্মান এবং মর্যাদা প্রাপ্ত হয়ে আমাদের সমাজের মুখোজ্জ্বল করেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন তাঁরা আরও উত্তরোত্তর সম্মান এবং গৌরব লাভ করে সমাজকে মহৎ হতে আরও মহত্তর পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হন।

আমি গভীর আনন্দ সহকারে লক্ষ্য করেছি যে, সমাজ কয়েকটি কল্যাণকর কর্মে হস্তক্ষেপ করেছে, তার দ্বারা জাতির ভবিষ্যৎ গৌরবময় হবে।

উদ্যান-সম্মিলন এবং বিজয়া-সম্মিলন প্রভৃতি কয়েকটি প্রীতিমূলক অনুষ্ঠানের দ্বারা সমাজের সভ্যগণের ভিতর পরস্পর ভাব ও ভালবাসার আদান-প্রদানের পথ সুপ্রশস্ত হয়েছে। সর্বোপরি তাঁরা বুঝেছেন যে শিক্ষার প্রভাবকে কেহ কখনও তুচ্ছ করতে পারে না। যে দেশে এবং যে সমাজে শিক্ষার প্রভাব যত বেশী সেই দেশ এবং সেই সমাজ তত বেশী উন্নত। ইহা অতি আনন্দ এবং আশার লক্ষণ যে, আমাদের সমাজের কর্মিগণ বৃত্তি, অর্থ-সাহায্য প্রভৃতি দ্বারা সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন। তাঁদের চেষ্টা যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, ইহা আমাদের সকলেরই দেখা একান্ত কর্তব্য এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তাঁদের এই গৌরবজনক প্রচেষ্টা পূর্ণমাত্রায় সফলতা লাভ করে।

মানুষ মাত্রেই জানে যে, ইহা প্রকৃতির একটা বিধান যে মানুষ সমাজপ্রিয়। সে সমাজে একতা এবং সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালবাসে। ইহাই প্রকৃতির সনাতন এবং চিরন্তন প্রথা; কিন্তু নিয়তির কি কঠোর পরিহাস। বর্তমানে প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে আরম্ভ করেছে। মানুষের সমাজে আর পূর্ববৎ একতা, আনন্দ বা প্রীতি নেই, তার সমাজে ঈর্ষা, কলহ এবং দলাদলি ঢুকেছে। আমাদের চেয়ে এখন পশুরাই শ্রেষ্ঠ। তাদেরও সমাজ আছে। সিংহরা কিরূপ দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। বাঘেদের সমাজ আলাদা। শিকারিদের মুখে শুনতে পাই তারা কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করে। কিন্তু মানুষ সমাজ ভুলেছে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকবার লিপ্সা আর তাদের নেই।

বাস্তবিক ইহা অতীব লজ্জা এবং দুঃখের কথা যে, মানুষ সমাজ ভুলেছে, সমাজে থেকে পরস্পর 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' এর স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করতে চায় না।

তাই আজ মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তোলবার নিমিত্ত, প্রীতি এবং একতার আদর্শে গড়ে তোলার নিমিত্ত, সমাজকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের সমাজের অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্মিগণ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, কুমার কার্তিকচরণ মল্লিক, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রভৃতি মহোদয়গণ অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে একটি জমি কিনেছেন এবং সেখানে একটি সমাজ-ভবন গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন; তাঁদের এই মিলন-মন্দির গড়ে তোলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যাতে শারীরিক ও আর্থিক সাহায্যের অভাবে বিফল না হয়, তৎপ্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি রাখা সকলের একান্ত কর্তব্য। আমি আপনাদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে আমার দিক্ দিয়ে আমার শারীরিক ও আর্থিক সাধ্যানুযায়ী আপনাদের এই শুভ এবং সৎকার্যে সাহায্য করতে চেষ্টা করব, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সকল সমাজহিতৈষী ও বন্ধুগণকে এই অনুরোধ করি যেন তাঁরাও বিশেষ সাহায্য এবং সহযোগিতার দ্বারা এই মহৎ প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করে তোলেন।

সভান্তে ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং সম্পাদক গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত গদাধর মল্লিক, প্রিয়লাল মল্লিক, এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণকে ধন্যবাদ দেন। সভান্তে গৃহস্বামী কর্তৃক আয়োজিত জলযোগে সকলকে পরিতুষ্ট করা হয়।

দান

ডক্টর বিমলাচরণ লাহা মাননীয় বড়লাট পত্নীর আবেদনানুসারে মহামান্য ভারত সম্রাটের পরিকল্পিত

ক্ষয়রোগ চিকিৎসা ভাণ্ডারে ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মিঃ জি সি শীল দান করিয়াছেন ১০১৲ টাকা।

রায় শশিভূষণ দে বাহাদুর কলিকাতা শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের গৃহনির্মাণ ভাণ্ডারে ১০০১৲ টাকা দান কলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তুলসীদাস দে দান করিয়াছেন ১৫০৲ টাকা এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক ও দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রত্যেকে দান করিয়াছেন ১০০৲ টাকা হিসাবে।

শ্রীবলাইচাঁদ আঢ্য

বীরভূম সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে সুবর্ণবণিক্ জাতির উল্লেখ

বাংলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বীরভূম জেলা সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে ঐ রিপোর্টের লেখক সেটেলমেণ্ট অফিসার রায় বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় সুবর্ণবণিক্ জাতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সুবর্ণবণিক্ জাতির মর্যাদাহানিকর বিবেচনায় তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আমাদের স্বজাতীয় কর্মী চৌমাথা ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ আঢ্য মহাশয় বাংলা সরকারের রাজস্ব-বিভাগীয় মন্ত্রী এবং পরে মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরের সেক্রেটারীর সহিত যে সকল পত্রব্যবহার করিয়াছিলেন—সরকারী উত্তর সমেত ঐগুলি নিম্নে প্রকাশিত হইল। আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করিলাম যে, সুবর্ণবণিক্‌জাতির মর্যাদারক্ষাকল্পে বলাই বাবুর চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং সরকার ঐ আপত্তিকর অংশ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

বলাই বাবু প্রথমে রাজস্ব-বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট এই পত্রখানি লিখেন—

"Chowmatha Street,
Chinsurah,
August 20, 1937

To
The Hon'ble Member in charge of the
Revenue Department,
Government of Bengal

Dear Sir,

On behalf of the Subarna Banik caste in Bengal and elsewhere, I may be kindly permitted to invite a personal reference to your Resolution No. 13824LR of the 12th July, 1937, giving cover to the Final Report on the Survey and Settlement Operations in the disirict of Birbhum, at page 13 whereof it has been stated that 'of all the castes of the 1st four groups except Subarna Banik. water can be accepted by the highest', meaning thereby that the Subarna Baniks are untouchable.

At the first instance, I feel bound to lodge my most emphatic but respectful protest against such a baseless, humiliating, damaging and defamatory insinuation against the Subarna Banik caste, which admittedly belongs to the Vaishya Barna or one of the three highest castes among the Hindus. The learned writer of the Report appears to be ignorant even of the meaning and significance of the word "Banik" in the term Subarna Banik. I fail to see if it was within the legitimate scope of a Settlement Report to record such a remark in respect of a caste. I do not also understand if in the whole of the district of Birbhum, there is no other caste which is untouchable and if so, why the Subarna Banik caste which is no less advanced than the Brahmins, was singled out by the writer for such a black reference. It is not also understood what is the basis of such a remark as the personal experience gained by humble self and other workers of my caste in course of social propaganda work in Birbhum tells just the opposite tale.

That the Subarna Baniks are Vaishyas, was very lucidly explained at length with copious authoritative quotations to the Superintendent of the Census Operations, Bengal, by Raja Hrishikesh Law C. I. E., President of the All-Bengal Subarna Banik Conference, in his letter of the 27th September, 1921, in reply to which the

Superintendent was pleased to assure in his letter No. 3690 of the 18th October, 1921,* that his report "shall contain no suggestion that the Subarna Baniks cannot be associated with the Vaishya Barna". In your letter No. 150 Jur., of the 12th January, 1933, † you were pleased to assure me that the Subarna Banik caste has not been included in any list of depressed or backward classes. Besides, Government Notification No. 1070 A. D., of the 21st June, 1935,‡ did not include the Subarna Banik caste in the list of scheduled or depressed classes. It is not therefore clearly understood how in the face of these definite statements made from time to time by the Government of Bengal, the said Settlement Report could make such highly objectionable remark against the Subarna Banik caste.

In the second place, one of the castes whom the writer of the Report has been pleased to allot a higher place than that of the Subarna Baniks, appears to have been actually included in the list of scheduled and depressed classes enumerated in the Notification of the 21st June, 1935, cited before. It is not understood how the Report could allot the higher Subarna Banik caste a place lower than even the said depressed class.

From all points of view, therefore, the remark made against the Subarna Banik caste, is not only unjust but is uncalled for, damaging and defamatory. It has no justification whatsoever.

In the circumstances, I would again lodge my most emphatic protest against the remark which prejudices the status of the caste and humiliates it in the estimation of the public and would request that the remark may be kindly withdrawn and deleted by the issue of a necessary correction slip at the earliest possible date.

With thanks in anticipation and awaiting the favour of an early reply

I remain, Sir,
Yours faithfully,
Sd. Balai Chand Adhya"

এই পত্রের কোনও উত্তর না পাইয়া তিনি বাংলার মাননীয় শাসনকর্তা বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট নিম্নলিখিত পত্র লিখেন :—

"Chowmatha Street,
Chinsurah,
October 14, 1937

To
The Private Secretary to
His Excellency the Governor of
Bengal

Dear Sir,

With due respect, I beg to enclose herewith a copy of my letter of the 20th August last to the Hon'ble Member in charge of the Revenue Department, requesting him to delete from page 13 of the Report on the Survey and Settlement Operations in the district of Birbhum, published with the Revenue Department Resolution No. 13824 L. R., of the 12th July, 1937, some highly objectionable remarks lowering down the social status of the Subarna Banik caste and classifying it as the only untouchable one in the said district. I regret to note that having failed to get any reply from the Hon'ble Member, I referred the matter to the Hon'ble Premier on the 22nd September, 1937, with no better result.

* সুবর্ণবণিক্ সমাচার, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮
† সুবর্ণবণিক্ সমাচার, মাঘ, ১৩৩৯
‡ কলিকাতা গেজেট, ২১শে জুন, ১৯৩৫

Being aggrieved, I may be kindly excused if I would hereby respectfully request you to submit the matter for the kind information of His Excellency and for favour of passing such orders as His Excellency may be pleased to think fit, thereby earning the sincere and heartfelt gratitude of the Subarna Banik caste of Bengal and elsewhere.

I beg to submit that as detailed in the enclosed copy of my letter to the Hon'ble Member, Government of Bengal have from time to time, been pleased to make very clear announcements that the Subarna Banik caste has never been included in any list of backward, depressed or scheduled castes. In view thereof, as also having regard to the fact that it was absolutely beyond the legitimate scope and function of the Settlement Report, the writer thereof has exceeded his legitimate rights in making the said irrelevant remarks lowering the social status of the Subarna Banik caste in contravention of the clearly expressed Government views and furthermore in placing the Subarna Banik caste even below the rank and social status of a caste which has actually been included in the list of scheduled castes published with the Government Notification of the 21st June, 1935, referred to in my letter to the Hon'ble Member.

In the circumstances, I would most respectfully pray and appeal to His Excellency to pass such orders as His Excellency may be graciously pleased to think fit and necessary for remedying the grievance and for which act of kindness, the Subarna Banik caste would ever pray for His Excellency.

Awaiting the favour of an early reply

I remain, Sir,
Yours obediently,
Sd. Balai Chand Adhya"

এই পত্রের উত্তরে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাওয়া যায় :—

"Government House,
Darjeeling.
D.O. No. 2934 27th October, 1937

Dear Sir,

I am desired to refer to your letter dated the 14th October, 1937, regarding Final Report on Survey and Settlement Operations in the district of Birbhum and to say that the matter is under consideration in the Revenue Department of this Government and a reply may be expected from that Department in due course.

Yours faithfully,
Sd. R. J. Pringle,
Asstt-Secretary to Governor"

Babu Balai Chand Adhya

সর্বশেষ রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারি মহোদয় নিম্নে মুদ্রিত পত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলাই বাবুকে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন :—

"Government of Bengal,
Revenue Department,
Land Revenue Branch.
No. 21256 L. R.

From
O. M. Martin Esqr., C. I. E., I. C. S.,
Secretary to the Government of Bengal
To
Babu Balai Chand Adhya,
Asst. Secy., Chinsurah Subarnabanik Samiti, and Member, Central Working Comittee of the All-Bengal Subarnbanik Conference, Chowmatha Street, Chinsurah

Calcutta, 21st December, 1937

Sir,

I am directed to refer to your letter dated the 20th August, 1937, addressed to the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department regarding the remark made in the Final Report on the Survey and Settle-

ment Operations in the district of Birbhum that high class Hindus do not take water from a Subarnabanik.

In reply, I am to say that although Government cannot acquiesce entirely in the observations made in your letter under reference, they agree that the remark is unnecessary and that it should be expunged. Steps are accordingly being taken to delete the following lines from page 13 of the said Report:—

"Of all the castes of the 1st four groups except Subarnabanik, water can be accepted by the highest."

I have etc.,
Sd. O. M. Martin.,
Secy. to the Government of Bengal"

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্-সম্মিলনী

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্-সম্মিলনীর ঝরিয়া অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইয়াছে :—

১। (ক) এই সম্মিলনী নিম্নলিখিত স্বজাতি মহোদয়গণের মৃত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন :—

রাজা হৃষীকেশ লাহা (কলিকাতা)
ডাঃ অক্ষয়কুমার নন্দী ,,
কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা ,,
ডাঃ সত্যরঞ্জন সেন ,,
অধ্যাপক রজনীকান্ত দে ,,
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ লাহা ,,
,, বাসুদেব সেন ,,
,, শ্যামল কিশোর আঢ্য ,,
,, হরিচরণ মল্লিক (হাওড়া)
,, রমেশচন্দ্র মণ্ডল (চুঁচুড়)
,, প্রসাদদাস সেন ,,
,, বৃন্দাবনচন্দ্র দত্ত ,,
,, সূর্যনারায়ণ দে (বাঁকুড়া)
,, কেদারনাথ দে ,,
শ্রীযুক্ত সূর্যনারায়ণ দে মুখ্যা—বিষ্ণুপুর
,, মনোহর দত্ত—দুবরাজপুর
,, ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র—ধানবাদ (নির্শাচটী)
,, কালাচাঁদ দে—বালেশ্বর
,, রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে—(ঝাদলা) বর্ধমান

(খ) এই সম্মিলনী জগদ্বরেণ্য বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পরলোক গমনে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন।

২। সামাজ-হিতকর অনুষ্ঠানে দান করার জন্য নিম্নলিখিত স্বজাতি মহোদয়গণকে এই সম্মিলনী অভিনন্দিত করিতেছেন—

(১) রায় শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে বাহাদুর। (২) ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা ও (৩) ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা।

৩। সুবর্ণবণিক্ জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য এই সম্মিলনী এই নিয়ম করিতেছেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত চারিটি প্রথা—যথা, আশীর্বাদ, গাত্রহরিদ্রা, অধিবাস ও ফুলশয্যা উভয় পক্ষ পালন করিবেন এবং ব্যাবহারিক আদান-প্রদানের বাহুল্য ও অতিরিক্ত ব্যয় বর্জনার্থ নিম্নলিখিত এই নিয়ম সম্মিলনী প্রচার করিতেছেন, ধান ও দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করা হউক এবং গাত্রহরিদ্রা, অধিবাস ও ফুলশয্যা উপলক্ষে প্রয়োজনীয় যৎসামান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য, (যথা, দধি, মৎস্য, আশীর্বাদী নথ), বর-কন্যার ব্যবহারের জন্য যে সকল কাপড়, গহনা ও তৈজসাদি যাহা স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে একেবারে দেওয়া হইবে, তাহা ব্যতীত অন্য কোনও দ্রব্য পাঠান বন্ধ করা হউক।

৪। বিবাহ উপলক্ষে বা তৎপরে কন্যাপক্ষ স্বেচ্ছায় কন্যাকে যাহা দিবেন তাহাই গ্রহণ করা হউক। কন্যাপক্ষের নিকট হইতে ফুরণচুক্তির দ্বারা নগদ টাকা, অলঙ্কার বা অন্য কোন দ্রব্য বরপক্ষের গ্রহণ করা অতিশয় গর্হিত, নিন্দনীয় ও সমাজের অনিষ্টকর। সেইজন্য এই সম্মিলনী সকলকে চুক্তিমূলক বিবাহে যোগদান করিতে নিষেধ করিতেছেন।

উপার্জনক্ষম বা স্বাবলম্বী ও অচুক্তিমূলক বিবাহ না হইলে কোন সুবর্ণবণিকের বিবাহ করা উচিত নয়।

৫। ১৪ বৎসর বয়সের পূর্বে কেহ কোনও স্থানে কন্যার বিবাহ দিতে প্রয়াসী হইলে কেন্দ্র সমিতি বা তত্রত্য স্থানীয় সমিতি তাহা প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিবেন।

৬। ভারতের বিভিন্ন স্থানের বৈশ্যজাতির সহিত সুবর্ণবণিক্‌গণের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।

৭। (ক) জাতীয় সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনার্থ বালক ও বালিকাদিগের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান, শিল্প, নীতি, ধর্ম, স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা এবং যুবকগণের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা ও কৃষি, শিল্প, বয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা এবং সুবর্ণবণিক্‌গণের পুরোহিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্altবিধ শিক্ষা এবং ধর্মকার্যের সৌকর্যার্থ সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তারকল্পে সমগ্র সুবর্ণবণিক্ সমাজের বিশেষ সহানুভূতি ও চেষ্টা আবশ্যক ও তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

(খ) উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থ আগামী বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ২৫,০০০৲ টাকার একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করা হউক।

উক্ত ভাণ্ডার গঠন করিবার জন্য নিম্নলিখিত ভদ্র-মহোদয়গণকে লইয়া একটি অনুসমিতি গঠিত হইল। এই অনুসমিতি ইচ্ছা করিলে নবগঠিত কেন্দ্র সমিতি হইতে নূতন সভ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১) সভাপতি (কেন্দ্র সমিতি) (২) সম্পাদক (কেন্দ্র সমিতি) (৩) শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মল্লিক—কোষাধ্যক্ষ (হুগলী) (৪) শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ দত্ত (ধানবাদ) (৫) শ্রীযুক্ত নটবরচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা) (৬) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাল (বিষ্ণুপুর) (৭) শ্রীযুক্ত নীলরতন বড়াল (বহরমপুর) (৮) ডাঃ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দাস (বীরভূম)।

এক তৃতীয়াংশ সভ্যের উপস্থিতিতে উক্ত অনুসমিতির অধিবেশন হইতে পারিবে।

(গ) বিভিন্ন স্থানের দরিদ্র শিক্ষার্থিগণকে অর্থ-সাহায্য করিবার জন্য কেন্দ্র সমিতি ও তত্রত্য সমিতি কর্তৃক অর্থ-

৮। এই সম্মিলনী পূর্ব পূর্ব অধিবেশনে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিতেছেন—

(ক) বৈষয়িক কলহ যথাসম্ভব আপোষে বা উপযুক্ত সালিশ দ্বারা মিটাইয়া লওয়া হউক এবং যদি কোন স্থানে কোনও কারণে সামাজিক অপ্রীতি জন্মে ও স্থানীয় লোকের দ্বারা তাহা নিষ্পত্তি না হয়, তবে ইহার মীমাংসার ভার কেন্দ্র সমিতির উপর অর্পণ করা হউক।

(খ) সনাতন বৈষ্ণবধর্মের বহুল প্রচারকল্পে ও জাতীয় ধর্মভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে হরিসভা স্থাপন, ভাগবতাদি পাঠ ও অন্যান্য ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করা হউক।

(গ) সুবর্ণবণিক্-কুলোজ্জ্বলকারী শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে সুবর্ণবণিক্‌বহুল প্রত্যেক স্থানে মহোৎসবের আয়োজন করা হউক।

(ঘ) সুবর্ণ-বণিক্‌গণ বৈশ্যবর্ণোচিত সংস্কার গ্রহণ এবং বৈশ্যবর্ণোচিত কুলসম্মান রক্ষা করুন।

৯। সুবর্ণবণিক্ জাতির মধ্যে স্বজাতি-প্রীতির উন্মেষ করিবার জন্য, জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলন একান্ত প্রয়োজন বোধ হওয়ায়, এই সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছেন যে, আমাদিগের পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষগণ ও বর্তমান স্বজাতিবৃন্দ—সাহিত্য, শিল্প, মনোবিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, দান, শিক্ষাবিস্তার, দেবালয় স্থাপন প্রভৃতি যে কোন জনহিতকর অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহাদের নাম ও ইতিহাস যে কোন সুবর্ণবণিক্ সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্র সমিতির নিকট প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

১০। সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত কার্য-বিবরণী গৃহীত হইল এবং ১৯৩৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয়ের দ্বারা পরীক্ষিত হিসাব নূতন কেন্দ্র সমিতি-সম্পাদকের নিকট দাখিল করা হইবে স্থির হইল।

১১। (ক) ১৯৩৫ সালের কেন্দ্র-সমিতির নিম্নলিখিত কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র আঢ্য—সম্পাদক

সহঃ সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল (কলিকাতা)
ডাঃ ,, বিধুভূষণ দাস (বীরভূম)
,, নিতাইলাল দত্ত (মানভূম)
,, প্রসাদদাস মল্লিক (হুগলী)—কোষাধ্যক্ষ

(খ) ১৯৩৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কেন্দ্র-সমিতির সভ্য নির্বাচিত করিয়া নির্বাচিত সভ্যগণের নাম ও ঠিকানা সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

১২। সুবর্ণবণিক্‌গণের মধ্যে যাঁহারা অদ্যাবধি উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণ করেন নাই, এই সম্মিলনী তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন, যেন তাঁহারা অবিলম্বে উক্ত সংস্কার গ্রহণ করেন।

১৩। এই সম্মিলনী সুবর্ণবণিক্‌কুলোজ্জ্বলকারী শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের লীলাভূমি শ্রীপাট সপ্তগ্রামে বার্ষিক তিরোভাব মহোৎসব উপলক্ষে সকলকে গমন ও দর্শনাদি করিতে ও দেবসেবার আনুকূল্যে যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

১৪। এই সম্মিলনী স্বজাতিমাত্রকেই স্বদেশজাত বস্ত্র, খদ্দর ও শিল্প-দ্রব্যাদির ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

১৫। সুবর্ণবণিক্ সমাজে অসন্তানবতী বাল-বিধবার বিবাহ প্রচলন, এই সম্মিলনী সমর্থন করিতেছেন এবং বিপত্নীকের পক্ষে বিধবা-বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। সুবর্ণবণিক্ মহিলাবৃন্দকে সম্মিলনীর কার্যে ও অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য এই সম্মিলনী বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

১৭। সুবর্ণবণিক্‌গণের গ্লানিসূচক কোনও বিষয় কোনও স্থানে প্রকাশিত বা প্রচারিত হইলে, প্রত্যেক সুবর্ণবণিক্‌ই তাহার প্রতিবাদ করিবেন এবং তদ্বিষয়ে কেন্দ্র সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন।

১৮। বিগত আদমসুমারি বিবরণীতে সুবর্ণবণিক্-গণকে পৃথক জাতি হিসাবে স্বীকৃত ও লিপিবদ্ধ না করাতে এই সম্মিলনী বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন।

আগামী ১৯৪১ সালের আদমসুমারীর বিবরণীতে সুবর্ণবণিক্‌গণ যাহাতে এক স্বতন্ত্র বিশিষ্ট জাতি বলিয়া উল্লিখিত ও পরিগণিত হন, তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হউক।

১৯। ত্রিশবিঘা (ই আই আর) ষ্টেশনের নাম পরিবর্তন করিয়া "সপ্তগ্রাম" করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হউক।

সুবর্ণবণিক সমাচার

২২শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৪৪ সাল | ৩য় সংখ্যা

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ

এমনি করিয়াই মানবজীবনের অবসান হয়। এমনি করিয়াই সবাই একদিন চলিয়া যায়। কিন্তু "সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।" শরৎচন্দ্র সেই ভাগ্যবান্দের একজন। তাই তিনি মরিয়াও অমর। জাতির অন্তরে তিনি চিরস্থায়ী। এই কর্মময় বিশাল পৃথিবীর বিরাট্ ধ্বংসযজ্ঞে কে কার খোঁজ রাখে! ধ্বংসের লীলা চলিয়াছে। অনন্তের পথে চিরচলমান উচ্চচূড় রথচক্রতলে কত মানব-হৃদয় পিষ্ট হইয়া কাঁদিয়া মরিয়া যায়, তাহাদের সেই মর্মান্তিক আর্তকলরব, এই বিশাল রথচক্রের যে ঘর্ ঘর্ ধ্বনি পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত উঠিয়া যাইতেছে সেই ধ্বনিকে ছাপাইয়া আমাদের কর্ণকুহর পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। কিন্তু এক একটি মানব-হৃদয়ে থাকে অমিত তেজ, অফুরন্ত জ্যোতিঃ। সেই মহৎ প্রাণ মহা-আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে আকৃষ্ট করিয়া রাখে সমগ্র জাতির প্রাণকে আপনার দিকে। সেই প্রাণ যখন দেহবিমুক্ত হইয়া অনন্তে বিলীন হয়, সেই বিরাট্ ক্ষতি সমগ্র জাতির অন্তর-মূলে হানিতে থাকে বেদনার কুঠার। সে অসীম জোরে জানাইয়া যায়—কি গেল, কে গেল এবং কতটুকু গেল।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বাঁশী যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়, ফেটে গিয়ে সঙ্গীত নীরব হ'তো তার।" এই সত্য হৃদয়-স্পন্দন দিয়া এমন করিয়া নাড়ীর তালে তালে কখনও অনুভব করি নাই। যে বেদনা সমগ্র ইন্দ্রিয়-নিচয়ের উপর একযোগে একই সময়ে প্রভাব বিস্তার করিয়া আড়ষ্ট করিয়া ধরে সে বেদনার অমোঘ শক্তি আমাদের মনের উপর এতখানি চাপ রাখে যে, তখন পরিস্ফুট বাক্যের সাহায্যে কোন কিছু প্রকাশ করিয়া দিবার সাধ্য আমাদের থাকে না। আজ বহু লোক কাঁদিতেছে। মহতের জন্য,

সতের জন্য, বড়র জন্য এমনি করিয়া সবাই কাঁদে। কিন্তু সে বেদনা ঠিক এ বেদনা নয়। একান্ত প্রিয় একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের অন্তরের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে, এ যেন তাহাই। আর আমরা যাহারা তাঁহাকে সত্যিকারের ভালবাসিতাম,—সেই আমরা এই নিদারুণ দুঃখ জানাইবার ভাষাও খুঁজিয়া পাই না, শক্তিও নাই। জানাইয়া লাভও নাই, ইচ্ছাও নাই। ভূগর্ভের সঞ্চিত অন্তর্জ্বালা যেমন নিঃশব্দ-নীরবতায় ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় বস্তুকে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া ধরিত্রীর মর্মবেদনার বিরাট্ প্রকাশ বাহিরে আনিতে থাকে, আমাদের অন্তর-বেদনাও আজ তেমনি নিষ্ফল চেষ্টায় বাহিরে পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া হৃদয়দ্বারেই আছাড় খাইয়া ফাটিয়া পড়িতেছে। ইহা যেন শুধু প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যথাই নহে; ইহার সঙ্গে জড়ান রহিয়াছে এমনি একটা ক্ষতির উদ্বেগ, এমনি একটা অপূরণীয় অভাবের হাহারব যে, সে যেন আমাদের মনকে চারিদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া শুধু পিষিতেছে, বত্রিশ-নাড়ীর সঙ্গে ইহার সংযোগের কথা জানাইয়া দিতেছে প্রতি পলে, প্রতি দণ্ডে।

অধুনা বঙ্গের সাহিত্যাকাশে কিরণ দান করিতেছিলেন যেই দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—রবি এবং শরৎচন্দ্র—অকস্মাৎ তাহার একটি খসিয়া পড়িল। বিধাতার আশীর্বাদে রবি রহিলেন। যে চন্দ্র আজ সমস্ত বঙ্গসন্তানকে শোকে মুহ্যমান এবং নিরানন্দের গ্লানিমায় আচ্ছন্ন করিয়া অস্তশৈলের অন্তরালে আত্মসমাহিত হইলেন, উদয়শিখরের পানে তাকাইয়া যুগযুগান্তরেও আমরা এমন একটি চন্দ্রের উদয়-আভাস পাইব কি না সে বিষয়ে মন সন্দেহে ভরিয়া রহিল।

শরৎচন্দ্রের নিকট বঙ্গের কথাসাহিত্য যে কি চিরঋণে আবদ্ধ হইয়া রহিল তাহার হিসাব করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইবার সাধ্য আমার নাই। সমস্ত বড় লেখককেই বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অনেক বিদ্রূপ, গ্লানি এবং বিদ্বেষের মধ্য দিয়া পথ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের শরৎচন্দ্র প্রথম হইতেই তাঁহার পাঠক-পাঠিকাবর্গের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার যুগ-প্রবর্তনের বার্তা শুনিয়া বৃথা আক্রোশে শাসাইয়া চেঁচাইয়া নাচিয়া কুঁদিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে গেলেন, তাঁহারাও তাঁহার রচনার সহিত সম্যক্ পরিচয় লাভ করিয়া যেন যাদুবিদ্যার প্রভাবে সম্মোহিত হইয়া রহিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যে প্লাবন আনিয়াছিল। তৎপরে রবীন্দ্রের অমিত তেজ আমাদের কঠিন গাত্রাবরণ ভেদ করিয়া প্রাণের উপর স্পর্শ বুলাইয়াছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে যেদিন "পল্লীসমাজের" ভিতর দিয়া প্রথম চিনিলাম সেদিন একেবারে মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া গেলাম। একটা অনায়াস-লব্ধ আনন্দে অন্তর-বাহির একাকার হইয়া রহিল। অকস্মাৎ মনে হইল কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত বৈচিত্র্য, এত বেদনা-বোধ, এতখানি মর্মনিপীড়ন-করা সোহাগ-ভালবাসা! এতবড় আত্মার আত্মীয় কে সে? এ সাধক না-জানি কত যুগ ধরিয়া কোন্ হিমাচলের বিশাল অরণ্যে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিবেশ করিয়াছিলেন! পরিপূর্ণ সাধনার শেষে বাণীর বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া দেবতার আশীর্বাদের মত আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। মুষলধারে ভাব-বর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাস-নির্ঝরিণী পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এ ভাব, এ ধারা সাহিত্যরসপিপাসুদের প্রাণের মূল পর্যন্ত গতি প্রসারিত করিয়া দিল। বঙ্গের উপন্যাস যেন এক অশ্রুতপূর্ব দৈববলে নব ভাবোদ্গমের শুভ্র আলোকে জল্ জল্ করিয়া উঠিল। মনে হইল শরৎচন্দ্র যেন মানুষের মনোরাজ্যে বিচরণ করিয়া করিয়া নূতন মনস্তত্ত্বের সন্ধান আনিয়াছেন। তাহা না হইলে মানব-মনের এমন সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, এমন নিবিড়তম উপলব্ধি সম্ভব হইল কি করিয়া? আজ নানা লেখা নানা মত নানা দিক্ হইতে বিবিধ প্রকারে বঙ্গসাহিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জুলুম চালাইতেছে। কিন্তু ঐন্দ্রজালিক শিল্পী শরৎচন্দ্র যে ভাবধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা চিরনূতন অবিনশ্বর। একটা অলৌকিক মৌলিকতায় এবং অনাবিল স্বাতন্ত্র্যে উহা চিরমহিমান্বিত চির-উজ্জ্বল।

জাতির একটা প্রাণ আছে। সেই জাতির প্রাণের গতিতে এক এক সময় এমন জড়তা এবং নিশ্চলতা আসে যে, তাহার অন্তরের ভাষা বদ্ধতার চাপে নিপীড়িত হইয়া অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার ক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হইয়া নিষ্ফল বেদনায় রোদন করিতে থাকে, তখন আবির্ভাব হয় এক একজন প্রতিভাশালীর ব্যক্তির। তাঁহার কল্যাণ করস্পর্শে সেই অপ্রকাশিত বেদনা পূর্ণ অনুভূতিতে দিকে দিকে স্ফূর্তি লাভ করিয়া আমাদের নিদ্রাঘোর বিদূরিত করিয়া দেয়। তখন নানা ভাবে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে রুদ্ধপ্রাণ জাতির অন্তরের তীব্র বেদনা। বর্তমান যুগে দেশের অন্তরে সমাজের স্তরে স্তরে যে আকাঙ্ক্ষা, যে বেদনা প্রকাশের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হইয়াছিল, শরৎচন্দ্র দিয়াছেন সেই সকল বেদনার মুখে, আকাঙ্ক্ষার মুখে প্রকাশের ভাষা; আলোকিত করিয়া গিয়াছেন তিনি দেশের নিরুদ্ধ হৃদয়দরীতল।

শরৎচন্দ্র বাংলার বর্তমান সমাজ-চিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিতে সমাজে যাহা ছিল, যাহা দৈনন্দিন ঘটিতেছিল তাহা ততটা দেখিতে পাই নাই যতটা পাইয়াছিলাম সেই কালের লোকের অন্তরের আদর্শের এবং দূরাগত আকাঙ্ক্ষার অগ্রিম মূর্তি। কিন্তু শরৎ-সাহিত্য প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়া দিল যাহা আছে, যাহা নিরন্তর ঘটিতেছে তাহাই। বঙ্কিমের মধ্যে এতখানি প্রত্যক্ষদর্শিতা দেখিতে পাই নাই। তিনি দেখাইয়া ছিলেন যাহা হওয়া উচিত অর্থাৎ হইলে ভাল হয়। শরৎচন্দ্র আঁকিলেন সমাজের সকল দিক্‌কার খুঁটিনাটি সহ পরিপাটি বর্তমান ছবি একটা অপূর্বতার আমেজ লাগাইয়া। তাঁহার 'পল্লীসমাজ' সমগ্র পল্লীর নিখুঁত চিত্র। চিত্র বলিতে যাহা বুঝা যায় সে ফটোগ্রাফ নয়। চিত্রের অন্তরে 'চিত্ত' কথাটি লুকান আছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"অন্তর বাহিরকে রূপ দেয় এবং বাহির অন্তরকে গড়িতে থাকে।" বাহিরের যে বস্তু আমাদের চিত্ত-সরসীতে প্রতিবিম্বিত হয়, রসের আলোক ফেলিয়া আরও কিছু "অকথিতবাণী" এবং "অগীত-গানের" সংস্পর্শের মাখামাখি করিয়া একটা সর্বাঙ্গপুষ্ট অঙ্কন-বৈশিষ্টে পরিপূর্ণ ছবিকে চিত্র কহে। এমনি যে বস্তু চিত্র তাহা অঙ্কন করিতে হইলে প্রখর অন্তর-চক্ষু চাই—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় আন্তর চক্ষুঃ প্রভূত ক্ষমতার তীক্ষ্ণতায় সমস্ত তমসা এবং জড়িমার আবরণ ভেদ করিয়া মানুষের অন্দর-মহলের চোরকোঠা পর্যন্ত অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, অথবা যাহা অপ্রতিহত আকর্ষণ-বলে বাহিরের যাহা কিছু সব অন্তর চক্ষুতে প্রতিফলিত করে। এতখানি প্রখরতা এবং ক্ষমতার তীব্রতা শরৎ-চক্ষুতে অবস্থান করিত। আর তাহা করিত বলিয়াই তাঁহার অঙ্কিত সমাজ-চিত্র এমন সুন্দর, এমন মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। তাঁহার সর্বাপেক্ষা সুন্দর পুস্তক এবং প্রধানতম সৃষ্টি "শ্রীকান্ত"। ইহার মধ্যে উচ্চাঙ্গের রসধারা এবং স্বাধীনতাকামী উন্নতমনের ধীরোচিত উদারতা এবং উদ্দামতা এমন সুন্দর করিয়া, উজ্জ্বল করিয়া গ্রন্থকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, উহা পাঠ করিয়া শুধু আনন্দিতই হইতে হয় না, বিস্মিতও হইতে হয়। শ্রীকান্তের সখা, গুরু, ইন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি। ইন্দ্রনাথের মধ্যে আধুনিক বাঙালীর নব-যৌবন রূপপরিগ্রহ করিয়াছে। মুক্তবন্ধন আপনাতে-আপনি-সম্পূর্ণ ইন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ যৌবনবেগে ছট্‌ফট্‌ করিয়া ছুটিতেছে সার্থকতার জন্য। বহু শতাব্দীব্যাপি সংস্কার-বন্ধনের ভারে নিষ্পেষিত মুমূর্ষু বাংলার যৌবন সকল সংস্কার, বাঁধন ছিঁড়িয়া কাটিয়া অক্লান্ত উদ্যমে, আনন্দের আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে কোন্ অজানার পথে। ইন্দ্রনাথ নির্ভীক। সমস্ত বিপদের উপর দিয়া সে তাহার বিজয়-কেতন উড়াইয়াছে, কঠিন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছে। এক কথায় শ্রীকান্তের মধ্যে শরৎচন্দ্র বাংলার নবযুগের যৌবনকে মূর্ত করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেই মাছ ধরা, সেই সাপ লইয়া খেলা, সেই গঙ্গার মোহনা, সেই নির্ভীক নৌকাচালনা, সেই অন্নদাদিদি, সেই সাহজী—কিছুই আমরা ভুলিব না। ভুলিব না তাঁহার ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের করাল ছবি। আর ভুলিব না রাজলক্ষ্মীর অন্তর ভেদ করিয়া যে সেবা-যত্নের কাকুতা শ্রীকান্তকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া স্বর্গ-সুষমা সৃষ্টি করিয়াছিল।

অনেকে বলেন শরৎচন্দ্র সমাজ-সংস্কারক বড় জটিল

সামাজিক সমস্যার তিনি সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে সমাজসংস্কারক বলিব না। আমরা বলিব সমাজের রূপপ্রকাশক। সমাজ-সংস্কারক হইলে তিনি রমা এবং রমেশের মত দুইটি মহাপ্রাণ নরনারীর জীবনের ব্যর্থতার ছবি অঙ্কিত করিতেন না। মানবের রুদ্ধ হৃদয়-দ্বারে বেদনার এই বস্তুটুকু পৌছাইবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। সমাজে যাহারা উৎপীড়িত এবং লাঞ্ছিত তিনি তাহাদের জীবন অতিশয় গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহাদের বেদনা-আকাঙ্ক্ষা সহজবোধ্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পর্যবেক্ষণ-গভীরতা, বিশ্লেষণের পুঙ্খানুপুঙ্খতা এবং বর্ণনপটুতা অতুলনীয়। তিনি প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন। সমস্যার মীমাংসা করিতে কিছু চেষ্টা করেন নাই। শেষ প্রশ্নের জবাব তিনি দিয়া যান নাই। দলিত প্রপীড়িতদের হৃদয়ে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাহাদের তরফ হইতে প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, যে-সমাজ ক্ষমা জানে না, সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না, নারীকে রক্ষা করিবার শক্তি যাহার নাই, শুধু ভণ্ড সাজিয়া দণ্ড দিতেই জানে, তাহার মধ্যে সত্যিকার গৌরব কোথায় ? তাহার জবরদস্তি, বিধি-নিষেধ এবং বিধান-আধানের মূলে যদি কোন শক্তি থাকে তো তাহার মূল্য কি ?

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের আসল স্রষ্টিকর্তা বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি আদর্শ। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন নাই। তিনি প্রচলিত ধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখিয়া নরনারীর হৃদয়ের ছবি সমগ্র ভাবে দেখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল দেবতাসম্ভব আদর্শচরিত্র সৃষ্টি করিয়া আমাদের সম্মুখে শূন্যমার্গে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র সেইগুলিকে নিখুঁত খাটি মানুষ বানাইয়া আমাদের পুরোভাগে মর্তে কিছু দুরধিগম্য স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। যে চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র আঁকিয়াছিলেন শরৎ-সাহিত্যে তাহারই পুনঃপ্রকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু শরৎচন্দ্র সে চরিত্রের একেবারে রূপ বদলাইয়া দিয়াছেন। প্রতাপ এবং দেবদাসের জীবনে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। নিরবচ্ছিন্ন পীড়নে। উভয়ের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে ব্যর্থতার টানে আসিয়া-পড়া মৃত্যুতে। কিন্তু এই দুইটি জীবনের চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রতাপ চিত্তজয়ী ইন্দ্রিয়সংযমী ; মনের পাষাণ-ফলকে তাহার আঁচড় কাটিবার সাধ্য কোন নারীর নাই। সে শৈবলিনীর সঙ্গে বাল্য প্রেমের লীলা সাঙ্গ করিয়া, অন্তরের সমস্ত লিপ্সাকে পদদলিত করিয়া নিঃসঙ্কোচে রূপসীকে বরণ করিয়া লইল। তাহার সেই পারার মধ্যে সঙ্কোচহীনতার পরিচয় রহিল যথেষ্ট কিন্তু অনায়াসসম্পন্নতার পরিচয় বা প্রমাণ নাই। দেবদাস তাহা পারিল না। বাল্যের পরি-বর্ধমান মনের ফলকে যে ছবি দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল, প্রাণের রসে মিলাইয়া মিশাইয়া একেবারে একাকার করিয়া সে যাহাকে আপনার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাকে মর্মমূল ছিন্ন করিয়া আর বিদায় দিতে পারিল না। দোষেগুণে মেশান মানুষ সে ; সমগ্র ইন্দ্রিয়ের শ্বাসরোধ করিয়া আকাঙ্ক্ষার মস্তকে কশাঘাত লাগাইয়া মনকে সেই একান্ত আন্তরিক বস্তু হইতে অন্তর করিয়া পরজন্ম অথবা পরকালের বৃহত্তর সুখের আশায় ইহজীবনের নিশ্চিত ছোট সুখের কথা একরাত্রির মধ্যে বিস্মৃত হইয়া আপনাকে বঞ্চনাপূর্বক আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়া স্থির লক্ষ্যে চলিতে পারিল না। পারিল না, তাহার কারণ বোধ করি পরকালের যে বৃহত্তর সুখের পানে তাকাইয়া ইহকালের প্রেমের মস্তকে পদাঘাত করিবে সেই পরকাল সম্বন্ধেই সে বিধিমতে ওয়াকিফ্-হাল ছিল না। অন্তরের অন্তস্তল ভেদ করিয়া যে স্বতস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাকে নিরুদ্ধ করিবেই বা কোন্ মহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় ? রবীন্দ্রনাথের সহিত একমত হইয়া সে যদি বলে—"রুদ্ধ করি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার যে মুক্তি সে মুক্তি আমার নহে।" তাহা হইলে তাহাকে নিন্দাবাদে ডুবাইয়া গ্রামছাড়া করিবই বা কোন্ পথে ? যাহাকে সর্বস্ব দিয়া ভালবাসিল, যে আসন নিভৃত অন্তরের একান্তে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল সে আসন টলাইবে কোন

করাই ত দেবদাসের কাছে রীতিমত নৈতিক অবমাননা, একটা গুরুতর পাপ। মনের মধ্যে যে এক হইয়া রহিল তাহাকে বাহ্যত ঠেলিয়া দূরে রাখিয়া আনুষ্ঠানিক সম্বন্ধের সূতা জড়াইয়া, মুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া টানিয়া, নানা ছঁদে বিনাইয়া কথার জাল বুনিয়া অন্য নারীকে শুধুমাত্র মৌখিক ভদ্রতা এবং সৌজন্যের খোঁচায় সে নিরন্তর ব্যঙ্গ করিয়া ফিরিবে কোন্ আত্মসংযমের বলে? তাহা অপেক্ষা আত্মপ্রবঞ্চনাই বা আর কি আছে? তাই বলিতে ছিলাম বঙ্কিম সংযমের জয়গান করিয়াছেন আর শরৎ মানব-হৃদয়ের দুর্বলতাকে বেদনা এবং সহানুভূতির চক্ষে উপলব্ধি করিয়াছেন। বঙ্কিমের প্রতাপ—"প্রেমের আবশ্যক নাই, সমাজ এবং আভিজাত্যের গরিমা বাঁচাই" বলিয়া যে প্রেমের মস্তকে সজোর পদাঘাত করিয়া রূপসীর রূপ-মহলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তারপর সেই কুপিত প্রেম কোন অজ্ঞাত অন্তরগুহা হইতে জাগ্রত হইয়া প্রতাপের মর্মস্থলে দংশন করিল কি না, তাহা হয়ত ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই! শিরায় শিরায় সুখ-মন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুনের প্রবাহ বহিল কি না তাহার খোঁজ লইতেও বোধ করি সাহিত্য-সম্রাট্ সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আরামের ফুলশয্যা চিতাশয্যার মত প্রতাপকে দগ্ধ করিয়াছিল কি না তাহাও বঙ্কিম ভাবিয়া দেখেন নাই। আর হতভাগ্য শৈবলিনীর উপেক্ষিত পদদলিত বিদীর্ণপ্রায় নারীহৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া তাহার অন্তর্যামীর চরণে যাহা নিবেদন করিয়া দিল তাহা তাহারই একান্ত বাঞ্ছিত প্রতাপের জীবন-যাত্রার পথে আশীর্বাদ আকর্ষণ করিল কি অভিশাপের বীজ বপন করিল তাহাও তো ভাবিবার বিষয়।

প্রতাপ ও দেবদাসের জীবনের পরিসমাপ্তিও হইয়াছে বিভিন্ন উপায়ে। প্রতাপের মৃত্যুর পর বলা হইয়াছে—"তবে যাও প্রতাপ, অমরধামে। যাও যেখানে ইন্দ্রিয় জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও। যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না সেই মহৈশ্বর্যময় লোকে যাও। লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালবাসিতে চাহিবে না।" যেন ভালবাসাই অপরাধ, পাপ। যে ভালবাসাকে ইংরাজি সাহিত্য মুখর-অন্তরের সর্বপেক্ষা বড় ইন্‌স্‌টিংক্‌ট বলিয়া স্বীকার করে, সেই ভালবাসার মূলচ্ছেদ করা হইয়াছে। স্বর্গে উহা নাই। মর্তে ওসম্বন্ধে অন্তরকে বিধিবদ্ধ নিয়ম মানিয়া সমাজ-নির্দেশিত বাঁধান রাস্তায় চলিতেই হইবে। ভালবাসাই যত অনর্থের মূল, কাজেই স্বর্গেও বস্তুর বালাই নাই। আবার এদিকে মর্তের সমাজ কি যে মানব-জীবনে মানসিক দিক্ দিয়া সুখকর, তাহার রাস্তা বাতলাইতে পারে নাই; শুধু গতানুগতিক পথে চলিয়া আইস বলিয়া আহ্বান করিয়া অর্ধপথে কাদায় ডুবাইয়া ছাড়িয়াছে।

আর দেবদাসের মৃত্যুতে গ্রন্থকার উপসংহার করিলেন পরিপূর্ণ সহানুভূতিতে—"তোমরা যে কেহ এই কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মত হতভাগ্য অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও আর যাহাই হউক যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময় যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে—যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও একফোঁটা চোখের জল দেখিয়া মরিতে পারে।" বঙ্কিম চন্দ্রের ও শরৎচন্দ্রের রচনায় পার্থক্য এইখানে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। একজন ইহকালের নিষ্ফলতা এবং ব্যর্থতাকে তুচ্ছ বস্তু মনে করিয়া পরকালকে বড় করিয়া দেখিলেন। আর একজন ইহকালকে অবহেলায় উড়াইয়া পরকালের বৃহত্তর সুখের মুখ চাহিয়া আশান্বিত হইতে পারিলেন না; ইহকালের ব্যর্থতার জন্য চরম বেদনা বোধ করিলেন।

বহুকাল আগের সেই পুরাতন রীতি এখন আর

অশ্লীলতার অর্থ আধুনিক সাহিত্য একটু পরিবর্তিত করিতে চাহিয়াছে। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক "আনাতোল ফ্রান্সে"র রচনায় ইহার সূচনা রহিয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ চরিত্র Jerome Cognardএর মধ্যে ইহা স্পষ্ট স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। বর্তমান যুগের সাহিত্য দেখাইতে চাহিয়াছে যে, আমরা যাহাকে নীতি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তাহার মূলে রহিয়াছে শক্তিশালীর আধিপত্যের রাস্তা সুগম করিবার প্রচেষ্টা। শক্তিমান পুরুষ নারীর উপর অবাধ কর্তৃত্ব চায় বলিয়াই নারীর ধর্ম ইহকালের এবং পরকালের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রকমে বাঁধা আছে। নারীকে ধর্ম হারাইতে বেশী কিছু করিতে হইবে না, একবার মাত্র ভুলক্রমে অন্য পুরুষের কথা চিন্তা করিলেই যথেষ্ট। শাস্ত্রশ্লোকের গ্রন্থি দিয়া উত্তমরূপে আটঘাট বাঁধিয়া কসিয়া একদল অজ্ঞ ব্যক্তিকে অঙ্গুলি নির্দেশে সরু পথে হাটাইতে পারিলে পুরুষের যথেচ্ছাচারের রাস্তাটা একটু প্রশস্তই থাকে, কাজেই বালবিধবা রোহিণী যদি ভুলক্রমে গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়া ফেলে তো তাহাকে পিস্তলের গুলিতে মরিতে হইবে। সে আর বেশী কথা কি? নিশাচর, দিবাচর আর না হয় দিবাকরই হউক যে কেহ একজন উপলক্ষ হইয়া তাহার মৃত্যুর এই পথটুকু জ্যোৎস্নাময় করিবেই। অন্ধকারে, আন্দাজে গুলি চালাইলে, গুলি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়? কাজেই যে রোহিণী গোবিন্দলালের প্রতি একান্ত একনিষ্ঠ প্রেমের প্রাণান্ত বেদনায় বারুণীর জলে দেহ বিসর্জন দিতে গিয়াছিল, তাহার একাগ্র প্রেমের গভীরতা চক্ষের পলকে হালকা করিয়া নিশাকরের বৈদ্যুতিক শক্তিযুক্ত আকৃতির আকর্ষণে রোহিণীকে ধরা দেওয়াইতেই হইবে। কারণ, সে বেচারা গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়া যে মহাপাপ করিয়াছে তাহার একটা প্রায়শ্চিত্ত চাই তো! অতখানি পাপের প্রায়শ্চিত্ত যদি নিজের প্রাণাহুতি দিয়া না করিল, তো প্রায়শ্চিত্ত হইবে কি? আর সমাজই বা তাহা মানিয়া লইবে কেন? সমাজ মানিবে না বলিয়াই উপন্যাস-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র দণ্ডের ভার গ্রহণপূর্বক সেই প্রেমের জ্যোতি বাহির হইয়া গোবিন্দলালের বিচার-বুদ্ধি ঝলসাইয়া দিয়াছিল, লাগাইয়া দিলেন সেই বক্ষ লক্ষ্য করিয়া এক মর্মভেদী গুলি। তখনকার দিনের সমাজের রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাহিত্য-সম্রাট্‌কে ইহা বাধ্য হইয়াই করিতে হইয়াছিল। তাহা না হইলে চতুর্দিক্ হইতে এমন রৈ, রৈ, হৈ, হৈ শব্দ এবং নিন্দাবাদ প্রচণ্ডরবে আরম্ভ হইয়া যাইত যে, বঙ্কিমের সাহিত্যের সুর সে বজ্রকোলাহলের তলে চপা পড়িয়া মরিয়া যাইত। এদিকে রোহিণীও মরিয়া বাঁচিল; তাহা না হইলে তাহার বিধবা-হৃদয়ের যে প্রেম-সাগর কালাকাল, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়াই থৈ থৈ করিয়া উঠিয়া একেবারে প্লাবন-প্রবাহে গোবিন্দলালকে ভাসাইয়া লইয়া যশোহরের কোন এক অখ্যাত পল্লী-কিনারা পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছিল, সেই প্রেম-সাগর মধ্যেই 'নাকানি চোকানি' খাওয়াইয়া তিলে তিলে ক্ষীণ করিয়া তাহাকে একদিন ডুবাইয়া মারিতেই হইত। অতবড় পাপের একটা শাস্তি চাইই। না হইলে গ্রন্থ শিক্ষাপ্রদ হইবে না। আর শিক্ষাপ্রদ না হইলেই তখনকার দিনে জনসাধারণ মানিবে না। কাজেই "পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়" অক্ষয় রাখিতে গিয়া গ্রন্থকারকে হয়ত বা রোহিণীর কাঁধে ঝোলা চাপাইয়া বড়বাজারে অলিতে গলিতে একমুঠো উদরান্নের জন্য পাঠাইতে হইত। তাহার চাইতে পিস্তলের একটি গুলি তাহারই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর গোবিন্দলালের হাতে—অনেক ভাল। একটু অসুবিধা ঘটিয়াছে বর্তমান কালে আমাদের; তাহাও আবার বর্তমান যুগের সাহিত্যের পথ বাহিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গোবিন্দলালের প্রতি যে ভালবাসার টানে রোহিণী বেচারা ব্যাঘ্রের গুহা হইতে উইল টানিয়া আনিয়াছিল, সেই ভালবাসার এতটুকু মর্যাদা দেখিতে পাইলাম না। বরঞ্চ রোহিণীকে হত্যা করিয়া সেই ভালবাসাকে গলা টিপিয়া মারা হইল। রোহিণীর দুর্ভাগ্য, সে গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার চাইতে দুর্ভাগ্য বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠক-পাঠিকাদের যে, যে রোহিণীর গোবিন্দলালকে ভালবাসিবার শক্তি অসাধারণ,

যতবড় অপরাধই করিয়া ফেলুক, তাহার চাইতে ঢের বড় বিশ্বাসহন্ত্রীর অপরাধ বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুকালে সেই হতভাগিনীর কপালে অঙ্কিত করিয়া দিলেন আর একবিন্দু সহানুভূতি হতভাগ্য রোহিণীর প্রতি শেষ পর্যন্ত কেহই পোষণ করিতে পারিল না! নীতি বাঁচাইতে গিয়া গ্রন্থকার প্রীতি হারাইলেন। পাপিষ্ঠা রোহিণী মরুক, তাহাতে আপত্তি নাই, সহানুভূতিও নাই। কিন্তু কেবল মাত্র নীতিমূলক উপন্যাসের খাতিরে গোবিন্দলালের মত প্রিয়তমকে পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষণিকের দেখা একজন অপরিচিতকে সুপুরুষ গোবিন্দলাল অপেক্ষা শতগুণে সুন্দর দেখিয়া বেচারা যখন প্রাণ হারাইল, তখন তাহার মৃত্যুর সঙ্গে যে সত্য-সুন্দর আর্টেরও মৃত্যু ঘটিল সেই একটু দুঃখ।

আর দুর্দান্ত গোবিন্দলাল—যাহার জন্য রোহিণী বারুণীর জলতলে ডুবিয়াছিল সে একেবারে মুসোলিনী! গোবিন্দলাল মুসোলিনী কিম্বা হিটলারই হউক তাহাতে আপত্তি নাই। কারণ তাহার দিক্‌টা স্বাভাবিকই হইয়াছে। যাহার জন্য সে "রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য, প্রাণপ্রিয় ভ্রমর" ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার ঐরূপ বিশ্বাসহীনতায়, গোবিন্দলালের উদ্ধত আহত পৌরুষ উহা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিত না। রোহিণী এইখানে আর পূর্বের রোহিণী নাই। সেকাল আর একালের সাহিত্যেও বিরোধ ঘটিয়াছে এইখানে। এই অসঙ্গতি, এই জবরদস্তিই আধুনিক সাহিত্য স্বীকার করিতে চাহে না। ভালমন্দের ওকালতি শরৎ-সাহিত্য হাতে নেয় নাই। দুর্নীতিও প্রচার করিতে চাহে নাই। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে, দেখা যাইবে যাহাকে দুর্নীতি বলা হইতেছে সেই সাহিত্যিক দুর্নীতির মূলে একটা কথাই পরিস্ফুট হইতেছে যে, এই সাহিত্য মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের অভয়া পরকালের উজ্জ্বলতর জীবন এবং বৃহত্তর সুখের আশায় আপনার অন্তর-মানুষকে সমাজের যূপকাষ্ঠমূলে এবং লোক-চক্ষুর বিষ-কটাক্ষতলে বলি দিতে পারিল না। সে স্বামি-দেবতার চরণাঘাত আর লগুড়াঘাত হজম করিতে অপারগ হইয়া অন্য যুবকের একনিষ্ঠ পরিপূর্ণ ভালবাসার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া লোক-নিন্দার ভয়ে সাগরপারের দেশ রেঙ্গুনে গিয়া আত্ম-গোপনের এবং রক্ষণের চেষ্টা করিল। অথচ আমরা, যাহারা সমাজ-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অনুশাসক এবং পরিপোষক, সেই আমাদের কাহারও হস্তে পিস্তল দিয়া সুদূর রেঙ্গুন পর্যন্ত ধাবিত হইয়া পাপিষ্ঠা অভয়ার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইবার ব্যবস্থা শরৎচন্দ্র করিয়া দিলেন না। তবু শরৎ-সাহিত্য বাঁচিয়া রহিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারি সাহিত্যের রূপ বদলাইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যে মানুষের হৃদয়াবেগ-স্ফূরিত রোমান্সের চেয়ে, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সঙ্গে মানব-মনের মিলন-সংঘর্ষের কথা আর চিরাচরিত নীতির ভিত্তিহীনতার প্রতি কটাক্ষ ফুটিয়াছে সব চেয়ে বেশী। শরৎচন্দ্র প্রমুখ আধুনিক সাহিত্যিকরা দেখাইতে চাহেন যে, নীতির জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই নীতি; মনুষ্যত্বকে অবহেলা করিয়া ধর্ম নয়, মনুষ্যত্বের জন্যই ধর্ম। বহু ব্যক্তিকে তুচ্ছ করিয়া নীতিকে সম্মুখে আনিয়া যে সমাজ বিচারহীন নিষ্ঠুর পীড়নে মানুষের "অন্তরের ঠাকুরে" অপমানে অবহেলায় দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল শরৎ-সাহিত্য সর্বপ্রথম এবং সর্বাপেক্ষা প্রবল জোরে। শরৎ-সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে সমাজ-শক্তির প্রভাব দেখান হইয়াছে বাহিরের শক্তি হিসাবে নয়। তাহাও নরনারীর মনের মধ্যে নীড় বাঁধিয়াছে। তবে প্রণয়াকাঙ্ক্ষা মানব-হৃদয়ের নিজস্ব সম্পদ্; ধর্মবুদ্ধি তাহার সংস্কার হইতে পাওয়া। বিশেষ করিয়া নারীর অন্তরে এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তিনি তাহাকেই রূপ দিয়াছেন। এবং রূপ দিতে গিয়া তিনি তাহার অন্তরের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে মলিন করিয়া দেন নাই। স্ত্রীধর্মের বর্মতলে নারীত্বকে ঢাকিয়া রাখেন নাই।

শরৎচন্দ্র সূক্ষ্মদর্শী বিচারবুদ্ধি লইয়া নরনারীর অন্তরের প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কোন একটি বিশেষ প্রবৃত্তির প্রাধান্যে, তাঁহার নায়কনায়িকার চরিত্র আচ্ছন্ন,

আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই। এই জন্যই তাঁহার রচনায় মানসিক দ্বন্দ্ব এবং পরিবর্তনের চিত্র হইয়াছে খুবই জীবন্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মানসিক দ্বন্দ্ব এবং পরিবর্তনের চিত্র কমই আছে এবং যাহা আছে তাহাও এত দ্রুত এবং আকস্মিক যে মনে হয় যেন একটি চরিত্র রূপান্তরিত হইয়া অন্য একটি পৃথক চরিত্রে পরিণত হইয়া গেল, যেন পূর্ব চরিত্রের সঙ্গে তাহার কোন মিল বা সামঞ্জস্যই নাই। শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের মত মহামানব সৃষ্টি করেন নাই। শরৎ-সাহিত্যের নায়কনায়িকা অতীব সাধারণ লোক। গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তাঁহার রচনায় জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানব-হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশে সচেতন ও অচেতন মনের নিরন্তর যে দ্বন্দ্বের নিষ্পেষণ চলিতেছে, তাহার অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শুধু শরৎ-সাহিত্যেই সম্ভব হইয়াছে। সবার উপরে মানুষ সত্য এবং মানুষের অন্তর সত্য এই নীতির প্রশ্রয়ে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যে ধর্ম মানুষের অন্তরের ঠাকুরে অপমান এবং অবিচারে দূরে ঠেলিয়াছে তাহার মধ্যে কোন্ কল্যাণ নিহিত থাকিতে পারে? শরৎ-সাহিত্যের আসল রস উপলব্ধি করিতে হইলে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে শরৎচন্দ্র বর্তমান যুগের সাহিত্যিক। সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে যে নিদারুণ অভিযোগ বিদেশীয় সাহিত্যে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাঁহার রচনায় তাহারই আলোক আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি সমাজ-শক্তির নিষ্পেষণে এবং নীতির অনুশাসনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অপমানিত করেন নাই। শরৎচন্দ্র সমাজ-শক্তিকে আক্রমণ করিয়াছেন বিশেষ করিয়া তাহার নীতির দিক্ দিয়া; তাহার অর্থ নৈতিক এবং শ্রেণীগত পার্থক্য, দারিদ্র্যের নিপীড়ন ও মহাজনী জবরদস্তিকে বড় করিয়া দেখেন নাই। সমাজের অন্যান্য খুঁটিনাটি উৎপীড়ন—শ্রমিক-ধর্মঘট, ব্রাহ্মণের আধিপত্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবী বিশেষভাবে তাঁহার বিচারাধীন হইয়া উঠে নাই। তাঁহার আরও একটি বিশেষত্ব এই যে—ইয়োরোপীয় সাহিত্যে সমাজ-শক্তির প্রকাশ হইয়াছে একটা নিষ্পন্দ জড়পিণ্ডরূপে। মানব-মন নিপীড়নে বিধ্বস্ত হইয়াছে, সেই নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে, কিন্তু ইহা প্রাণহীনের সঙ্গে প্রাণবানের লড়াই। কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে সমাজ-শক্তি, সংস্কার, নরনারীর অন্তরের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া একটা মৌলিক সত্তায় প্রাণবন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহা নির্জীব রূপহীন শক্তিমাত্র নহে। মানুষের অন্তরের রসে ইহা প্রাণময়। নীতির বচনগুলি খুব স্থূল। ইহা যে কোন শ্রেণীর লোকের পক্ষে প্রযোজ্য। সাহিত্যে প্রত্যেক নায়কনায়িকার মর্মকথা। তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখের প্রকাশস্থল। যাহা সাধারণ্যে প্রযোজ্য, তাহা এত ব্যাপক যে, তাহার মধ্যে রূপগ্রাহ্য সৌন্দর্যের অবকাশ নাই। শরৎচন্দ্র এইরূপ গ্রাহ্য সৌন্দর্যকে ব্যক্তিগত অনুভূতির রসে রঞ্জিত করিয়া জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। মানবমনের জটিলতা অন্তহীন, বিরামহীন। সেই জটিলতার তিল-তিল বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন।

সংস্কার অনুভূতির সঙ্গে মিশিয়া—বিশেষ করিয়া নারী হৃদয়ে—প্রাণবন্ত হয় এবং নারী-অন্তরের সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে ছাড়াইয়া বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়। তাহারই উদাহরণস্বরূপ অনুরূপা দেবীর "মন্ত্রশক্তি"র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বাধীনচেতা আভিজাত্যগর্বী বাণী প্রতাপশালী জমিদার-কন্যা, জমিদারীর ভবিষ্যৎ মালিক। "উইলের" জালে জড়ান জমিদারী বাঁচাইতে আর বৃহৎ কৌলিন্য বাঁচাইতে বিবাহ হইল তাহার, পুরোহিত-পুত্র গরিব ব্রাহ্মণ অম্বরের সঙ্গে। মন মানিল না—মিলনের পথে বিঘ্ন ঘটাইয়া দিল। তবে বিবাহ-রাত্রিতে বেদমন্ত্র-পাঠ নারায়ণশিলা সাক্ষী প্রভৃতি নানা আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালন পূর্বক কার্য সমাধা হইয়াছিল। তাহারা ছাড়িবে কেন? মিলন ঘটাইয়া তবে ছাড়িল। আমাদের মুস্কিল হইল—আমরা ঠিক ঐরূপ ভাবিতে পারিলাম না। অন্তরের যে অজেয় দুর্বলতা বিবাহ-রাত্রিতে উচ্চারিত বেদমন্ত্রের দৈবী শক্তিরূপে জমিদার-কন্যা বাণীর উন্নত মস্তক দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া অম্বরের পাদমূলে আভূমি আনত করিয়া দিল, তাহা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইতে পারে যে, অভ্যন্তরভাগে থাকিয়া অলক্ষ্যে কাজ

করিয়াছে সংস্কার এবং সমাজ-শক্তি। ঘটনা-পরম্পরার ভিতর দিয়া নারী-অন্তরের বিশেষ কোন সহজাত প্রবৃত্তি ইহার মধ্যে স্ফূর্ত হইয়া উঠে নাই। আভিজাত্য-বন্ধনে সে যখন আর যৌবনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, তখন সে চোখ মেলিয়া দেখিল ঐ একপথ ছাড়া আর নাই। উপায় কি ?

কিন্তু মানবের সমস্ত ধ্যান-ধারণার অন্তরালে এক আত্মা আছে, উহা অবচেতন কিন্তু উহার প্রভাব অপ্রতিহত। উহা আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে সংগোপনে অবস্থান করে এবং অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে সেই স্থান আলোড়িত করিয়া তোলে। সেই আলোড়ন হইতে যে আবেগ উত্থিত হয় তাহাই জীবনের গভীরতম বেদনা। বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ্ ফ্রয়েড় ইহার আবিষ্কর্তা। উহা বুদ্ধির অতীত একক। সংস্কারের বাহিরে উহার স্থান। দুই অনুভূতি—বুদ্ধি, সমাজ ও সংস্কার হইতে পাওয়া আর অবচেতন মনের প্রেরণা-প্রসূত অন্তরের গভীরতমপ্রদেশের অনুভূতি—প্রভাবে আমাদের মন নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং ব্যাঘাত-সংঘাতের নিয়মে জোয়ার এবং ভাটার স্রোত খেলাইয়া চলে। কোন একটি বিশেষ বস্তুকে স্থির নিশ্চয় করিয়া মানিয়া এবং কোন একটি বিশেষ পাওয়াকে চরম পাওয়া বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া আমৃত্যু কাটাইয়া দিতে পারে না। শরৎ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে এই পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বের চিত্রাঙ্কনে এবং এই জন্যই তাঁহার রচনায় নারী-চরিত্রই শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছে। সমাজ-সংস্কার নারীর অন্তরের জিনিষ—অন্তরের প্রবৃত্তির বিরোধী বহিঃশক্তি মাত্র নহে। তাই ত একান্ত ভালবাসার জন শ্রীকান্তকে অন্তর্নিহিত ভালবাসার আকর্ষণে রাজলক্ষ্মী যেমন কাছে টানিয়াছে তেমনি আবার সমাজ-সংস্কারের বিষাক্ত দশনাগ্রে রক্তাক্ত করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। ট্র্যাজেডি বলিতে যাহা বুঝা যায় সে মৃত্যুর মধ্যে নাই, আছে এই দুই উভয়মুখী প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে মানবজীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য, মহিমা, আশাভরসা, সার্থকতা নিঃশেষে অতলে ডুবিয়া যাওয়ার মধ্যে। তাহাই শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের মত তিনি শুধু মৃত্যুর মধ্যে ট্র্যাজেডির স্থান নির্দেশ করেন নাই। ভালবাসার শক্তি শক্তিশালী চুম্বকের মত দুর্বার, আবার তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তিও পর্বতনিস্থত প্রবাহের মত দুর্দমনীয়। তাই বলি, চরম ট্র্যাজেডি জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে, মৃত্যুতে নয়। প্রেমবেদীমূলে দেবদাস আপনার প্রাণবলি দিল। একটা ভীষণ আঘাত আপনার বুক পাতিয়া লইয়া সকল জ্বালার অবসান করিয়া গেল। প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের মর্মন্তুদ ঘাত-প্রতিঘাত ইহার মধ্যে নাই। তাহা আছে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মধ্যে। একদিনের ভ্রান্তি দেবদাসের জীবনের মর্মশিরে সর্পাঘাত করিল। অবস্থা হইল—"শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথা বাঁধবি তাগা ?" কিন্তু সচেতন ও অবচেতন মনের দুর্দাম সংগ্রামে নারী-হৃদয়ের চরম দুর্ভাগ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে রাজলক্ষ্মীর জীবনে। সে অর্থের পাহাড় বানাইয়াছে, গায়িকা হিসাবে দেশজোড়া নাম কিনিয়াছে, তবু শান্তি পায় নাই। তাহার একান্ত কামনার ধন শ্রীকান্তকে সে কাছে টানিয়াছে, আবার নিজেই দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। অনন্ত বেদনার সংঘাত আপনার বক্ষ পাতিয়া লইয়াছে, বাহিরে তাহার প্রকাশ হইতে দেয় নাই।

পাটনার বাড়ীতে রাজলক্ষ্মীর সেবাযত্ন ও চিকিৎসার ব্যবস্থায় শ্রীকান্তর জ্বর বিদায় লইল এবং অমনি সেই দুর্বলদেহ শ্রীকান্তকে বিদায় দিতেও রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বাহিরের তাড়না নাই, পল্লী-সমাজের নীতির গদা ভীমবাহুর উপরে উদ্যত হইয়া সেখানে ছিল না। তাহার আন্তরিক ভাললাগায়, প্রাণের ইচ্ছায় বাধা দিল তাহার মাতৃহৃদয়। "তাহার অসংযত কামনা ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যত অধঃপথেই তাহাকে ঠেলিতে চাহুক কিন্তু একথাও সে ভুলিতে পারে না যে সে একজনের মা এবং সেই সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোন মতেই অপমান করিতে পারে না।" যে শ্রীকান্তকে সে প্রাণপণে চায় সেই শ্রীকান্তকে সে আর সহ্য করিতে পারে না। অকস্মাৎ বঙ্কুর মা বাহির হইয়া অনতিক্রম্য পাষাণ-প্রাচীর রচনা করিয়া রাজলক্ষ্মীর

পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। শ্রীকান্ত ব্যথিতচিত্তে—বিনিদ্ররজনী যাপনের জন্য—আপনার শয়নকক্ষে গেল; রাজলক্ষ্মী নিতান্ত গোপনে আসিয়া আন্তরিক সেবা-যত্নের সঙ্গে আপন মনে শ্রীকান্তের প্রতি খানিকটা কর্তব্য সম্পাদন করিয়া গোপনেই পলাইয়া গেল। রাজলক্ষ্মীর মাতৃহৃদয় শ্রীকান্তকে ধাক্কা দিয়া প্রেমময়ী রাজলক্ষ্মীর অন্তরে বেদনার সঞ্চার করিয়াছিল। নিভৃতে অন্ধকারে সেই প্রেমময়ী রাজলক্ষ্মী জাগ্রত হইয়া গোপন সেবায় সেই বেদনা ঘুচাইল। শ্রীকান্ত নিজেই বলিল—"যে গোপনে আসিয়াছিল, তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন নিশীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।"

ইহার পর শ্রীকান্ত জানাইল বর্মাগমনের ইচ্ছা। জানাইল তাহার বিবাহের কথা। সে সম্বন্ধে চিঠি দেখাইল। চাক্ষুষ প্রমাণ হইয়া গেল বিবাহ। রাজলক্ষ্মী বাহিরে বিরাট্ ঔদাসীন্যের ভান করিয়া কিন্তু অন্তর দিয়া প্রাণান্ত করিয়া বুঝিল শ্রীকান্ত তাহার কতখানি। "শ্রীকান্ত" হইতে পংক্তি কয়েক উদ্ধৃত করিয়া সমগ্রটুকু অবস্থা সহজে বুঝান যাইবে। "পলকের জন্য দুজনে চোখোচোখি হইল এবং পরক্ষণেই সে বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়ীটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুকফাটা অভিনয় আজ যেন অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে।" এই বুকফাটা বেদনার রোদন তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য-গরিমার অন্তরালে আবাল্য সঞ্চিত হইয়াছিল। আজ তাহা বাঁধ ভাঙ্গিয়া উত্তাল স্রোতের উন্মত্ত বেগে বাহির হইয়া আসিল। ইহা আবশ্যকহীন উচ্ছ্বাসের হাওয়ায় ফেনাইয়া ওঠা কান্না নয়। এ কান্না কান্না। রাজলক্ষ্মীর জীবনের ট্র্যাজেডি ট্র্যাজেডি, ইহা মর্মের আসল মর্মজ্ঞাপক হৃদপিণ্ডবিদারক উৎকট বেদনা নয়, ইহা সমগ্রজীবনব্যাপী হৃদয়-সমুদ্র মন্থন করিয়া উত্থিত হইয়াছিল যে বেদনার কালকূট তাহারই পুঞ্জীভূত একত্র সন্নিবেশিত সমগ্র মূর্তি। শ্রীকান্ত এবং রাজলক্ষ্মীর ভালবাসা গভীরতায় অতলস্পর্শী। এমন পরিপূর্ণ সৌন্দর্য এবং সঙ্গতির সহিত এই ভালবাসা উভয়ের জীবন-ইতিহাসের পথ করিয়া চলিয়াছে, যে কোথাও এতটুকু বেখাপ লাগিবার উপায় নাই, কোথাও এতটুকু অস্বাভাবিকতার ছোপ লাগিতে পারে নাই।

লেখার মধ্যে সমস্ত কিছু বাদ দিয়াও আর একটি বস্তু ভাষা। এই ভাষার সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠবতা ফুটাইতে শরৎচন্দ্রের জোড়া খুব কম মিলে। তাঁহার ভাষা ছন্দোবদ্ধ বাক্যের ন্যায় সুমধুর। তাঁহার রচনায় বাক্য-সমষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে এমনই একটা সামঞ্জস্য এবং সমন্বয় রহিয়াছে যাহা খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়; এ তাঁহার নিজস্ব সম্পদ্। স্থানে স্থানে উহা এমন মাধুর্যময় যে কবিতা পাঠের মত সুমিষ্ট লাগে। শরৎচন্দ্রের রচনা হইতে লাইন কয়েক উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিই—

"বাহিরের মত্তরাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারংবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল জলঝড় তেমনি ভাবেই সমস্ত প্রকৃতি লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুটি অভিশপ্ত নরনারীর অন্ধহৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতেছিল তাহার কাছে এ সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।"

বঙ্গ-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। আত্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁহাকে কোন দিন সমালোচকের দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। তাঁহার যশঃসৌরভ আপনা হইতেই দিক্ হইতে দিগন্তরে ছুটিয়াছিল। উপন্যাসরসপিপাসুদের উপর তিনি যতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তত আর কেহই পারে নাই। মনে প্রাণে শরৎ ছিলেন বাঙালী। বাংলার নর-নারীর হৃদয়রাজ্যের সন্ধানী তিনি। শরৎচন্দ্র যুব-সম্প্রদায়ের অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। একবার ইণ্টারমিডিয়েটের বাংলার প্রশ্ন-পত্রে

প্রশ্ন ছিল—কোন্ বাঙালী লেখক ছাত্রদের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তাহার উত্তরে দেখা গিয়াছিল—শতকরা ৯৮ জন ছাত্র শরৎচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছে। কলেজে একদিন আমাদের অধ্যাপক প্রশ্ন করিলেন—বাঙালী ও ইংরাজ লেখকদের মধ্যে কাহাকে বেশী ভাল লাগে না? মনে পড়ে শতকরা ৭৫ জন ছাত্র বলিয়াছিল—"শরৎচন্দ্রকে।"

শরৎ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উৎস ছিল তাঁহার স্বদেশ-প্রেম। দেশ ও জাতিকে তিনি সমগ্র অন্তর দিয়া ভালবাসিয়া ছিলেন। তিনি ভালবাসা, দরদ এবং আপনার মর্ম দিয়া দেশের চিত্ত জয় করিয়া ছিলেন। দেশ এবং দশের দুর্দশার বিরুদ্ধে তাঁহার ভাষা অগ্নিময় জ্বালা উদ্গীরণ করিয়াছে। বহু দুঃখীকে তিনি গোপনে দান করিতেন অথচ তিনি দানের বিষয় কখনও বিজ্ঞাপন-সাহায্যে প্রচার করেন নাই। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শুধু সাহিত্যেরই ক্ষতি নয় দেশেরও ক্ষতি হইল। শরৎচন্দ্রের সহিত যাঁহারা আন্তরিক ভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারাই বলেন—তাঁহার মত অমন সদাহাস্যময় অমায়িক সদালাপী মানুষ অত্যন্ত বিরল। খুব ছোট অবস্থা হইতে বড় হইয়াছিলেন এবং হৃদয় দিয়া পরের দুঃখ-দুর্দশার কালিমা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ করি তিনি আভিজাত্যের বেড়া দিয়া আপনাকে সাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন নাই। বহু অর্থের মালিক হইয়াও দীনবন্ধু শরৎ নিরালা দরিদ্র-পল্লীতে বাস করিতে ভালবাসিতেন। সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তি এবং পল্লীকৃষক ছিল তাঁহার পারিষদ্।

আমাদের কর্তব্য কি? আমাদের কর্তব্য আজ এই যে বঙ্গভাষা বিশেষ করিয়া বাংলা উপন্যাস তাঁহার কাছে যে চিরঋণে আবদ্ধ হইয়া রহিল তাহা যেন আমরা কোন কালেই বিস্মৃত না হই। যে ভাষাকে তিনি মর্ম নিংড়াইয়া দরদ দিয়া ভালবাসিয়া গিয়াছেন, সেই বঙ্গভাষা আজ শরৎ-চন্দ্রের তিরোধানে তাঁহারই জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিতেছে। তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের বহুদূরে শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন। দুঃখ, বেদনা এবং বিক্ষোভ তাঁহাকে আর স্পর্শ করিতেছে না। আজ তিনি নির্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। সেই আনন্দোজ্জ্বল প্রসন্ন মূর্তি বিরাট্ প্রতিভার আধার শরৎচন্দ্র আর আমাদের মধ্যে নাই। তিনি আমাদের অন্তরে যে মূর্তিতে বিরাজ করিতেছেন, এই শোকে, এই ভক্তিতে, এই বেদনায় সেই আদর্শ প্রতিমা উজ্জ্বলতর এবং স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রস্তর-মূর্তি প্রতিষ্ঠার সম্পত্তি এবং সঙ্গতি যদি আমাদের নাই থাকে তাঁহার মহত্ত্ব এবং প্রতিভার দীপ্তি আরও গভীর করিয়া, নিবিড় করিয়া সর্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তরের স্মরণ-স্তম্ভে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখি। জগৎ পরিবর্তশীল। মানুষ মৃত্যুর অধীন। এই পৃথিবীতে কত বস্তু, কত লোক আসিতেছে, যাইতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিতেছে। কিন্তু যিনি আপন প্রতিভাবলে জাতির অন্তরে নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন, জাতির কল্যাণে সাহিত্য-সাধনায় আপন জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলেন, তাঁহার আসন টলিবার নয়। যিনি মাতৃ-ভাষার মধ্যে কল্যাণকর এক নূতন ভাবধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, এই হতভাগ্য বিক্ষোভিত দরিদ্র দেশ-বাসীদের অমূল্য সম্পদ্ দান করিয়াছেন, তিনি আমাদের শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের রিক্ততায় সৌন্দর্যের অমিয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আজ সেইটুকুই আমাদের শোকের একান্ত সান্ত্বনা, নিরাশার মধ্যে আশার অপূর্ব আলোক।

আমাদের পল্লী

শ্রীইন্দ্রজিৎ পাঠক

চলে আমাদের পল্লীতে চাষীদের হল্লা,
নাই সেথা ভেদাভেদ পুরু'তের মল্লা,
পূরবে উদয়-গিরি—পশ্চিমে সিন্ধু,
একঠাঁই ভুজনায় মুস্‌লিম হিন্দু,
রাজপুত-গৌরব এই আরাবল্লী,—
আমাদের পল্লী ভাই আমাদের পল্লী।

হেরি প্রভাতের আগমনী সন্ধ্যে বিদায়,
গাঁ বেয়ে কুলু কুলু নদী বয়ে যায়,
কোকিল কূজন শুনি ঝিল্লী ঝাঁঝর
বছরেতে ষড় ঋতু অতি মনোহর।
তুলনা নহেক তার আগ্রা কি দিল্লী,—
আমাদের পল্লী ভাই আমাদের পল্লী।

তথা ধান-ক্ষেতে শোভে মার শ্যামল চিকুর,
গোধুলী উষায়—হেরি সিঁথির সিঁদুর,
হাস্‌নাহানাতে আর তরলিত জ্যোৎস্নায়
ক্ষরিছে মায়ের স্নেহ যেন লাখ্ রোস্‌নায়,
পরাণমাতানো ভাই এই না সে পল্লী ?—
আমাদের পল্লী ভাই আমাদের পল্লী।

এর জেলে ভাই বারমাস যোগাইছে মৎস্য,
কাঠুরিয়া কাটে কাঠ চাষী দেয় শস্য,
মুচী ভায়া জুতা বোনে—সুতা দেয় তাঁতিতে,
নিতি নব ফুল ফল যোগাইছে মহীতে,
কোথা লাগে এর কাছে সে ত্রিচীনাপল্লী—
আমাদের পল্লী ভাই আমাদের পল্লী।

সেথা জ্যোৎস্না-সুশোভিনী মধুময়ী যামিনী,
গিরিমালা আনে নব রূপ মনোহারিণী,
হেথা নদী নিরবধি পণ্যসম্ভারে,
দূরকে নিকট করে বিনিময়-হারে,
বিজনে নিশুতি রাতে গাহে গান ঝিল্লী,—
আমাদের পল্লী ভাই আমাদের পল্লী।

লুণ্ঠন-ষষ্ঠী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়

(১)

"বোদে—ওরে বোদে—ওরে বেটা বোদে !",

"কি যে সকালবেলা বোদে বোদে করে। আমার যার বলে মনটা সকালবেলাই একেবারে মিইয়ে রয়েছে।"

শ্যামপুকুরের বাসাবাড়ীর তেতলার বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসিয়া নিমাই চাঁদ বসু বেঙ্গল কেমিক্যালের এ্যাণ্টিসেপ্টিক টুথপাউডার ও ব্রাস সংযোগে দাঁত মাজিতে ছিলেন। নিমাইচাঁদের বয়স ত্রিশ। তিনি একজন হাণ্ডনোট ও মর্টগেজের বিখ্যাত দালাল। এই কর্মে তিনি যথেষ্ট উপার্জন করেন। লোকটি বিশেষ রহস্যপ্রিয় ও রসজ্ঞ। তিনি রসিকতা করিয়া সময় সময় এক একটা হাস্যজনক অসমসাহসিক কার্যে ব্রতী হইতেন ও

সেগুলি কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিতেন। সেই কারণে বন্ধুরা তাঁহার নাম দিয়াছিল দিগ্বিজয়ী নিমাইচাঁদ। তাঁহার সহকারী ছিলেন বৈদ্যনাথ ঘোষ, বয়স চব্বিশ, জাতিতে গোপ। ইনি একাধারে নিমাইচাঁদের শিষ্য-বন্ধু-ভৃত্য-কনিষ্ঠ। বৈদ্যনাথ নিকটে বসিয়া বিড়ি ফুঁকিতেছিলেন, নিমাইচাঁদ পুনরায় ডাকিলেন—"ওরে বদ্যিনাথ, ওরে দেওঘর, ওরে বালানন্দ স্বামীর শ্রীপাটভূমি।"

"ওগো দেওঘর নয় গো, দেওঘর নয়—শ্বশুরঘর।"

"বটে—বটে রে বেটা সকাল বেলাই ইস্তিরির বাবার বাড়ী ভাবছ। বেটা আমার মোটে মাগ নেই পুত্তুর শোকে কাতর!"

"আরে না গো আজ যে ষষ্ঠী।"

"কি ষষ্ঠী রে! পুকুর-ষষ্ঠী না লুণ্ঠন-ষষ্ঠী।"

"না গো জামাইষষ্ঠী, তবে ব্যাপারটা লুটপাটেরই বটে!"

"বলিস কিরে বেটা! দুহিতার স্বামী জামাতা, তস্য অর্চনা ষষ্ঠী!"

"আজ্ঞে যারে ষষ্ঠীবাটা বলে।"

"আরে দৌড়-দৌড়, বেটা দৌড়—তুরন্ত লেয়াও—ডোণ্ট ডিলে।"

"লাও! এবার নিজ মূর্ত্তি ধরেছেন। সাড়ে বত্রিশ ভাজা বুলি ছুটেছে। কোন মুখে দৌড়াব গো?"

"ওরে বেটা পাঁজি-পাঁজি।"

"সকাল বেলা গাল পাড়্তে সুরু কর্‌লে। পাজি ত আমি চিরকালই।"

"তা নয় রে তুই যা তাতে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে নিয়ে আয়।"

"বিন্দু ঝি এখনো আসে নি। মাপ কর বড়বাবু এই প্রাতঃকালে সেই পীঠস্থান বিন্দুর মন্দিরে আমি যেতে পারব না।"

"ওরে বেটা পঞ্জিকা—পঞ্জিকা!"

"সকাল বেলাই টান্‌বে নাকি! তবেই হয়েছে!"

"ওরে-বেটা গঞ্জিকা নয়—পঞ্জিকা—পাঁজিখানা নিয়ে আয়।"

"এই ত বাবু লক্ষ্মী ছেলের মত সিধে কথায় বল্লেই ত হয়।"

বদ্দিনাথ পঞ্জিকা আনিয়া নিমায়ের হাতে দিয়া বলিল—"এইবার অ্যাষ্ট্রলজার মশাই সৌরমণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে পড়লেন।"

"আরে বেটা বোদে সকাল বেলাই কি বাজে বুকনি ঝাড়ছ।"

"ঝাড়্‌ব না ত কি! আমি তোমার বাপ-মার আশীর্বাদে গাঁয়ের মাইনর স্কুলের পড়া শেষ করে যেদিন পাস দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেড়িয়ে এসে ঠাকুরমার পায়ের ধুলো নিলুম, সেদিন ঠাকুর মা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বল্লেন,—'বেঁচে থাক ভাই, আমাদের সাত পুরুষের বাপের ঠাকুর তুমি। যখন গাঁয়ের ইংরিজি স্কুলকে পাশিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছ তখন তুমি আমার আশীর্বাদে অক্লেশে পেটের ভাত করে খেতে পারবে'।"

নিমাইচাঁদ পয়লা জ্যৈষ্ঠ হইতে পৃষ্ঠা উন্টাইতে উন্টাইতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"পোড়া কপালে জামাইগুলোর সৌভাগ্যযোগ বহু দূরে একেবারে সংক্রান্তিতে গিয়ে ঠেকেছে রে বোদে!"

"আর যার বরাতে যাই হোক বড় বাবু, তোমার আমার বরাতে এহেন ষষ্ঠীবাটা—তাতে না মিলবে একটা আমের বোঁটা না মিলবে একটা মাছের কাঁটা।"

"দুঃখ করিসনে বাবা বোদে, দুঃখ করিসনে। আজ তোকে আমার মথুরাপুরী তুল্য শ্বশুরবাড়ীতে ঘৃতপক্ক শ্বেতচক্রাঙ্গ চক্রবর্তীর সহিত মানরাজ রোহিত-মৎস্য-মুণ্ডের কারী, শ্রীমান্ অজরাজের কোমলাঙ্গের কোর্মা—তস্য শালীপতি ভ্রাতা শ্রীমান্ মেষেশ্বরের মটন চপ, শ্রীশ্রীসীতাপতি বিহঙ্গমের কাটলেট—শ্রীমতী কুক্কুটি দেবীর অণ্ডের সহিত ভগবতী গাভী মাতার দুগ্ধসঞ্জাত ছানা সহিত ইক্ষু দণ্ডের শর্করা সংযোগে পুডিং—রাবড়ী মালাই সংযোগে খণ্ড আম্র—রসরাজ রাজভোগ—ছত্রপতি আবার খাব ইত্যাদি দ্বারা তোর বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের রাজসিক পিণ্ড তোর স্বহস্তের দ্বারা বারংবার বদনবিবরে 'গয়া

গঙ্গাং গচ্ছ' বলে তোমার স্বর্গারোহণের পথ উদ্ঘাটন করে দেব। অতএব যাও বৎস শুভ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।"

"আজ্ঞে গুরুদেব। যা আজ্ঞে করেছেন ও গঙ্গার জল গঙ্গায় রইল, পিতৃ-পুরুষ উদ্ধার হল। আপনার মুখে আর আমার কাণে ইত্যাদি সুশৃঙ্খলে সমাপ্তি হল।"

"ওরে বেটা বদ্দিনাথ—ওরে বেটা দেওঘর ওরে—বেটা সাঁওতাল পরগণার সাব্‌ডিভিসন স্মরণ রেখ আমি যে স্বয়ং নিমাইচাঁদ। আমার কথার কোনদিনই অন্যথা হবে না।"

"আজ্ঞে নদের নিমাই বলুন! কাজেই মালসা ভোগের বেশী আর আশা করতে পারিনে হুজুর।"

"আরে নারে বেটা! শীঘ্র আমার একপ্রস্থ—এক নম্বর ধোপদস্ত বাবু স্যুট বার কর। বুঝেছিস নব্য জামাই সাজতে হবে।"

"আহা বাছা আমার মোটে তিন দশেকে পা দিয়েছেন, উলুখড়ের মত দেড় হাত করে খোঁচা খোঁচা গোঁফ নিয়ে নব্য জামাই সাজবেন! জামায়ের পিতে সাজতে পার ত বল।"

"বৎস অবধান কর। মোচমুণ্ডনে যৌবনের শেষ প্রান্ত হতে দ্বাদশ বৎসর নিম্নে তরুণ অবস্থায় অবতরণ করা যায়। শহরের পথিমধ্যে এরূপ বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসীর দর্শন বিরল নয়।"

"এতে আর পরামাণিক বেচারারা দর বাড়াবে না কেন! তখন দাড়ি কামিয়ে একটা পয়সা পেলে তারা হেসে চলে যেত এখন একজোড়া গোঁফ একটা দাড়ি বার করে বস্‌লেন। তারা তিন পয়সা নেবে না কেন! এদের সঙ্গে পড়ে আমাদের মত গরীব গেরস্থরা মারা গেল আর কি! তারা যখন এক ক্ষুরে মাথা মুড়োবে তখন কি আর ছাড়ে।"

"ভোঃ ভোঃ বৈদ্যনাথ—ভোঃ ভোঃ আয়ুর্বেদ-ধুরন্ধর তুমি এগুপ্ত রহস্যের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত নও। আধুনিক প্রচলনে মোচ-মুণ্ডনে চির যৌবন প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

"আজ্ঞে গোঁফে যে রং ধরেছে! তা না হলে উপায় কি হুজুর।"

"ধরতে দাও ধরতে দাও বৎস! জ্ঞান-বুদ্ধিতে পাক্ ধরাতে ধরাতে কেশপক্ক হ'ক, দন্ত অন্তপ্রাপ্ত হ'ক—বার্ধক্য নিকটবর্তী হক—তাতে ক্ষতি নেই।"

"বৃদ্ধের আর তরুণী ভার্যায় ক্ষতি কি! তবে মেয়ের বাপগুলো ত আর রাতকানা নয় তাদের কাঁচা চুলের বুদ্ধি বলে,—কহে শুভ্র কেশ ঐ তোরে ডাকিছে শমন।"

"তথাপি দারপরিগ্রহ হল হিন্দুর ধর্ম।"

"ক্ষিপ্রগতিতে শমনের ডাকে সাড়া দেবেন।"

"শমনের ডাকে সাড়া দিতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভীত হবেন কেন? ইন্সিওরেন্স করে মরেও জীবিত থাকবেন।"

"পেটের ভারটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীকে দিয়ে গেলেন, আর বাকীটা পূরণ করবে কে?"

"বাবা বদ্দিনাথ! তুমি বৈদ্যিদের নাথ হয়ে নিমাই-চাঁদের প্রিয় শিষ্য ও দক্ষিণ হস্ত হয়ে আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে নব্য জামাতার সভ্যভব্য খান্‌সামা হবার জন্যে ফরসা ধুতী, ফতুয়া, চাদর বার কর আর তার সঙ্গে ঐ 'গোটস' বিয়ারড্ সমেত গোঁফ জোড়াটিকে অধরোষ্ঠ থেকে নাবিয়ে ফেল।"

"বল কি গোঁসাই! আমার যে বাপ-মা দুই জল-জেন্ত বসে আছেন গো!"

"ওরে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা পুত্রপিণ্ড-প্রয়োজনম্। তোর না আছে মাগ, না আছে ছেলে তোর পিণ্ড কে দেয় তাই আগে দেখ। কথায় বলে,—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। ওরে বেটা সারা গব্য রসের মালিক হয়ে তুমি এই রসাস্বাদটুকু গ্রহণ করতে পারছ না। অদ্য সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে বিনা ওজর আপত্তিতে আপনার এই রাজসিক পিণ্ডটি দিয়ে ফেল পরে বাপের পিণ্ডির কথা বিবেচনা করা যাবে।"

"যেদিন তোমার মত গোঁসাইয়ের শিষ্য হয়ে গৃহত্যাগী হয়েছি সেই দিন তারাও হাঁড়ি ফেলে গঙ্গাস্নান করে এসেছে।"

"সাধু! সাধু! তাঁরা বিচক্ষণ লোক উত্তমই করেছেন। তার জন্য দুঃখ করোনা—বৎস বদ্দিনাথ! অদ্য আমি শ্রীমান্ নিমাইচাঁদ গোস্বামী অতি সুন্দর উচ্চ

শ্রেণীর উপাদানে তোমার পারত্রিক ব্যাপারটা সুসম্পন্ন করে দোব—দোব—দোব।"

(২)

সভ্য-ভব্য-নব্য ফুট্‌ফুটে জামাইবাবু নিমাইচাঁদ রিহার্সাল-দুরন্ত সুযোগ্য লাংবোট ঘুট্‌ঘুটে খান্‌সামার সহিত যখন শ্যামবাজারের মোড়ে ফুটপাথের উপর একটি গ্যাসপোষ্টের ধারে দাঁড়াইয়া কোন দিক্ জয় করিতে যাইবেন ভাবিতেছিলেন, সেই সময় দুইটি ভদ্রলোক—পরেশ ঘোষ আর ভোলানাথ বসু—সেই গ্যাসপোষ্টের অপর পার্শ্বে তাহাদের দিকে পিছু হইয়া কথা বলিতেছিলেন। ইঁহারাও গুরুশিষ্য সেই বাক্যসুধারস তৃষ্ণাতুরের ন্যায় পান করিতে লাগিলেন।

পরেশবাবু বলিলেন—"শ্বশুর মহাশয়ের ব্লাডপ্রেসার ছিল, কাল হঠাৎ পড়ে গিয়ে 'প্যারালিসিস' অ্যাটাক করেছে। অবস্থা অত্যন্ত খারাপ কোন রকমে রাতটা কেটেছে, আজ আর কাটবে বলে বোধ হয় না। এই ফার্ষ্ট অ্যাটাকেই শেষ হবে কোন সন্দেহ নেই। আমার স্ত্রী তাঁর একমাত্র সন্তান। কাজেই বাধ্য হয়ে সকলকে সেথায় হাজির থাকতে হয়েছে।"

"তা বেশ জলেই জল বাধে। তোমার অভাব কি পরেশ বাপের এক ছেলে পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি সবই তুমি একাই পেয়েছ নিজেও এঞ্জিনিয়ারিং কাজে যথেষ্ট রোজগার করেছ—এখনও করছ। তোমারও সন্তানের মধ্যে একটি ছেলে রতন আর একটি মেয়ে বাণী তবে অমৃত খেতে অরুচি কার? আবার শ্বশুরের সর্বস্ব এসে ঢুকল।"

"সে ত পরের কথা—ভাই ভোলানাথ! উপস্থিত তুমি না দাঁড়ালে ত আমার মান রক্ষা হয় না। আট দিন পূর্বে জামাইকে ষষ্ঠীবাটার নিমন্ত্রণ করেছি। উদ্যোগ-আয়োজনও সমস্ত করা হয়েছে। কেবল আমরাই কেউ থাকতে পারছি না। জমিদারের সুশিক্ষিত এম এ পাশ করা ছেলে উপস্থিত "ল" পড়ছে। তার খাতির-যত্ন যাকে তাকে দিয়ে হতে পারে না।"

"তা ত বটে। আমার কিন্তু ভাই আঁধারে ঢিল ছুড়তে হবে। বৈশাখ মাসে তোমার বীণার বিয়ের সময় আমি রাঁচিতে ছিলাম। জামাইকে আজ পর্যন্ত একবারের জন্যও চক্ষে দেখিনি, তবে জামায়ের নাম নিকুঞ্জ চৌধুরী এটা তোমার মুখেই শুনেছি।"

"এমন গোলযোগে পড়েছি। পুরোণো লোকজন একটাও নেই। পুরোণো চাকর বেহারীর স্ত্রী মর-মর। টেলিগ্রাম এল, তারা বাপ-বেটায় একসঙ্গে বাড়ী চলে গেল। পুরোণো ব্রাহ্মণ হাত-পা পুড়িয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় কলেজে পড়ে আছে। পুরোণো ঝিটা আমাদের সঙ্গে ভবানীপুরে, এখানে নূতন ঝি-চাকর-বামুন, মায় দারোয়ানটি পর্যন্ত অফিসের।"

"তবে ত সোনায় সোহাগা। কে কাকে আইডেন্টিফাই করে ঠিকানা নেই।"

"অদৃষ্টের ফের শ্বশুর মহাশয় তখনও বেশী রকম অসুস্থ ছিলেন। শ্বশুর-শাশুড়ী কারও ভাগ্যে এখনও নাত্-জামাই দর্শন ঘটে নি। জামায়ের দশটায় আস্‌বার কথা। তবে যদি পূর্বের ট্রেণ ধরতে পারে নয়টায় এসে পড়বে। চল তোমাকে সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে আসি। এতক্ষণে হয়ত দশবার ফোন এসে গেল। হাঁ তবে টম্যাটো দেবী বলে এক বেটী কদিন ধরে এসে জুটেছে, বাড়ী ছাড়্‌তে চায় না। অফিসে টাইপিষ্টের কাজ চায়, কিন্তু আমি ও মাগীগুলোকে একেবারে পছন্দ করি নে। সেও বাড়ী ছাড়্‌বে না। সে বলে, 'আমি আজ রইলেম, জামাইবাবুর খাতির-যত্ন করব।' দেখো তাকে যদি কোন কাজে আন্‌তে পার।"

এই টম্যাটো দেবী বরিশালের কুম্‌ড়োবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা অলাবু শর্মার কন্যা। তাহার পিতা যৌবনে অদৃষ্টের উপদ্রবে স্ত্রী বার্তাকু দেবীর সহিত সস্ত্রীক একাদশী উপবাসের দীক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। একাধিক সহস্র দিবসের একাদশীর পর শ্রীমতী বার্তাকু দেবী কুলকুণ্ডলিনীর পিতৃপুরুষের উদ্ধার সহ্য করিতে না পারিয়া অকালে পটল উৎপাটন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। অবশেষে কেরোসিনের সাহায্যে বার্তাকু দগ্ধা হইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। অনাথ অলাবু শর্মা টম্যাটোকে

মাতুলালয়ে রাখিয়া নির্বিকারচিত্তে শ্যালকের রসাল কাষ্ঠের ক্যাসবাক্সে ছেনীহাতুরীর আঘাত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহপূর্বক সর্বদেশের বুভুক্ষু উপবাসীদের পারণা সংগ্রহের উদার মুক্তলক্ষ্মীর ভাণ্ডার পশ্চিমবঙ্গের যোগনগরী কলিকাতা ধাম লক্ষ্য করিয়া কুমড়োবাড়ী হইতে একটি ছোটখাট লম্ফ প্রদান করিলেন—একেবারে বেলেঘাটার দোকড়ি সেনের বাসা। চালের দালাল দোকড়ি সেন স্বদেশবাসীর একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী-পৃষ্ঠপোষক বন্ধু। দুই হাতা ভাত আর এক হাতা ডালের মালিক। দুইদিন এক সন্ধ্যা সেইখানে পথ্য পাইবার পর দোকড়ি সেন পোস্তার মহাজনদের ধরিয়া পোস্তার রাজবাটীতে অলাবুর একটা পনের টাকা বেতনের সরকারী চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দিলেন। রাজবাড়ীর আবহাওয়ায় অতি অভাগ্যেরও ভাগ্য খুলিয়া যায়। একবৎসরের মধ্যে অলাবুর উপরিতন কর্মচারীর হঠাৎ মৃত্যু ঘটায় সে পনের টাকা হইতে কুড়ি টাকায় উন্নীত হইল এবং কাঁচা বাজার-সরকারের পদ দখল করিয়া বসিল। অলাবু আনন্দে মাচার নীচে দোল খাইতে খাইতে রাজবাড়ীর ঠিকা ঝি পটলমণির আগ্রহে আপন কন্যা টম্যাটোকে এই বাসায় আনিয়া তুলিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে টম্যাটো পড়াশুনায় উন্নতি করিয়া দুইবার ফেল করিয়া বার বার তিনবারের বেলায় দুইবৎসর পূর্বে বেথুন কলেজজিয়েট স্কুল হইতে বাইশ বৎসর বয়সে থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কাশ রোগীর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দেহ লইয়া ক্ষুদ্রতম চক্ষু-গবাক্ষের উপর একজোড়া সার্শি বসাইয়া টাইপ-রাইটিং শিক্ষা করিয়া চাকুরীর উমেদারীতে ঘুরিতেছেন।

টম্যাটোর মাতা-পিতা আপনাদের নামের পর্যায়ক্রমে কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন উচ্ছারাণী। টম্যাটো বড় হইয়া বুঝিলেন, স্ত্রীলোকের নামের মধ্যে এত তিক্তরস পরিপূর্ণ থাকিলে অবোধ পুরুষগুলা অতি অন্যায়রূপে তাহার অর্থ করিয়া বসিবে। একদিন বাজারের ঝুড়ীর মধ্যে সুদর্শন, রক্তবর্ণ টম্যাটো দেখিয়া বুদ্ধিমতী বালিকা পিতামাতার ইচ্ছামত ফোরের বাজরার অন্তর্গত থাকিয়া আপনার অভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য নিজের নামকরণ করিলেন টম্যাটো দেবী।

ভদ্রলোক দুইজন বাড়ীমুখো হইলেন। নিমাইচাঁদ বলিলেন—"শুনলি রে বোদে! আমাদের গুরুশিষ্যের কি রকম বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের বিরাট্ আয়োজন শ্বশুর মশাই করেছেন। যাও বৎস যাও! শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে গিয়ে শ্বশুরালয়টি চিনে এসো।"

"আজ্ঞে কার ?"

"আ মলো! কার কিরে বেটা—"

"আজ্ঞে দুজনেই ত সেজেছি। একযাত্রায়—"

"তবে রে বেটা হারামজাদা"

নিমাই বদ্দিনাথকে শিক্ষা দিবার জন্য ছড়ি উঠাইলেন। সেও এক ছুটে অদৃশ্য হইল। ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—"বড়বাবুগো—বড়বাবু! কি শ্বশুরালয় গো বড়বাবু! যমালয়কে ঝক মেরে দিয়েছে।"

(৩)

নিমাইচাঁদ কায়দার উপর একবার পথের দুধারে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র চক্ষের ইঙ্গিতে একজন পাঞ্জাবী ট্যাক্সিওয়ালা নিমাইকে সেলাম করিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। কায়দা-দুরস্ত নিমাইচাঁদ একটু সাহেবী ধরণে ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার অভিবাদন গ্রাহ্য করিয়া অম্লানবদনে গাড়ীতে উঠিয়া বদ্দিনাথকে ড্রাইভারের পার্শ্বে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বদ্দিনাথের গুরুজীর ট্যাকের দৌড় জানিতে বাকী ছিল না। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বলিল,—"কর কি! কর কিগো বড়বাবু। এযে হাওয়া-গাড়ীর ট্যাক্সি! যমদূত-চালিত কাপ্তেন বাবুদের মুণ্ডপাত করবার আঁকসি! শ্বশুরালয় ত এটায় দেখা যায় গো।"

"দেখ বাবা বোদে! ভালয় ভালয় একটু সিধে হয়ে চলো। নিমাইচাঁদের সুশিক্ষিত শিষ্য তুমি, গুরুর কার্যে বিঘ্ন হয়ে উপস্থিত অন্ন ষষ্ঠীবাটায় কণ্টক হয়ো না।"

"আজ্ঞে গুরুর চরণে প্রণাম! গোঁসাইকে আগুনে ঝাঁপ দিতে দেখে একটু ভয় পেয়েছিলাম-! আর শ্বশুরালয় যথেষ্ট নিকটে তাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।"

"কেন বৎস তুমি কি এই আধুনিক প্রচলিত কালের গুপ্ত রহস্য কথা অবগত নও। জামাইবাবু আর আর্টিষ্ট বাবুরা এই আশু ধান্যোৎপন্ন নূতন চাল চালতে বাধ্য। কারণ বাবুদ্বের মুখে একটি পাসিংসো সিগারেট আর ট্যাকে একটি মাত্র সিকি সম্বল। পকেটে এক পয়সার গোলাপী আতর মেখে রুমাল বাবাজী অবস্থান করছেন। তা ছাড়া, একটি পাই পয়সাও পাওয়া যায় না। শ্বশুরালয়, ষ্টুডিও যেতে হলে মোড়ের মাথা থেকে চার আনা ফুরণের ট্যাক্সিতে আগমন করে তাঁদের নব্য-সৌন্দর্য-বর্ধনকারী কদমচাল বজায় রাখতে হয়।"

"আজ্ঞে গুরুদেবের অবস্থা ততোধিক। সিকিবিহীন ট্যাকে ফের্তার পর ফের্তা ছাড়া আর কিছুই নাই জেনে পাছে এই আকালী নৃসিংহের হাতে হিরণ্যকশিপুর অবস্থা প্রাপ্ত হন, পাছে আমাকে প্রহ্লাদের মত জোড় হস্তে দাঁড়িয়ে গুরুদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র পাঠ করতে হয়, পাছে থিয়েটারওয়ালারা নব প্রহ্লাদ-চরিত্রের অভিনয় সুরু করে দেয় সেই কারণে—"

"বৎস! তুমি এখনও নিমাইচাঁদের প্রথম শ্রেণীর শিষ্যত্বে উন্নীত হতে পার নি। গুরুদেবকে এত অর্বাচীন বিবেচনা করলে, তাঁর মহিমান্বিত কার্যে অন্ধবিশ্বাস না জন্মালে তোমার আলোক দর্শনে বহু বিলম্ব ঘটবে।"

ট্যাক্সিওয়ালা বলিল—"বাবু দেরী মাত কর।"

নিমাইচাঁদ বেশ ভারিক্কি চালে গম্ভীর স্বরে বলিলেন —"উস্কা মগজ খারাপ হায়, পাকাড়কে উঠায় লেও।"

পাঞ্জাবী হুকুম পাইবামাত্র এক হাতে বদ্দিনাথের গর্দান আর এক হাতে কোমর ধরিয়া একেবারে আল্‌-গোছা আসমানে তুলিয়া আপনার পার্শ্বে বসাইয়া লইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বদ্দিনাথ বিকট ভঙ্গীতে—"গেল, গেল, গেল গো বড়বাবু," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই সময় ট্যাক্সি পরেশবাবুর বাড়ী অতিক্রম করিয়া যায় দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল—"হায় গেল—হায় চলে গেল—শ্বশুরালয় পার হয়ে গেল যাঃ যাঃ! আণ্ডা-ওয়ালা তপ্‌সে মাছের ফ্রাই, বড় বড় লবষ্টারের কাটলেট ঠাণ্ডা হয়ে গেল, চা জুড়িয়ে জল। প্রথম নম্বরেই জলযোগটা মাটী হল!"

ট্যাক্সি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে। নিমাইচাঁদ সিগারেট মুখে গদীর উপর একেবারে রাজকেতায় আড় হইয়া পড়িয়া ঘন ঘন রিষ্টওয়াচ দেখিতে দেখিতে হুকুম করিলেন—"ভিক্টোরিয়া যাও।"

বাবা বদ্দিনাথ একটু চিন্তিত। অনেক ভাবিয়া বুঝিল, গুরুদেবের মস্তিষ্কের নিকট তাহার ছোট মাথাটির নাগাল না পাইবারই কথা।

কিন্তু বায়ুবেগধারী ট্যাক্সির সম্মুখে বাস কিংবা ট্রাম পড়িলে,—"থামাও, থামাও! রক্ষে কর বাবা, আজকের দিন আর অপঘাতটা ঘটিও না", এই বলিয়া বদ্দিনাথ চীৎকার করিয়া উঠে।

তাহার ভঙ্গীমা দেখিয়া ট্যাক্সি ড্রাইভার বলিল—"আরে পাগল বাবু! তোমারা নাম কেয়া।"

"আরে এই ত দেখছি জানতে পেরেছ তরে আর জিজ্ঞাসা কেন? তোম্‌লোককা বাড়ীমে হামলোককা বিবাহ হোগা না কি?"

"হাঁ, হাঁ ভাই নাম বলো?"

"আরে সে বাত ভুলে যাও! আমার নাম শ্রীমান্ আরে বদ্দিনাথ ঘোষ। গুরুর কৃপায় অদ্য সদ্য বিবাহ মায় ষষ্ঠীবাটা পর্যন্ত সারতে চলেছি!"

পাঞ্জাবী খুব ভারী গলায়—"বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা" বলিয়া বাম হস্ত বাড়াইয়া বদ্দিনাথের পিঠ চাপড়াইয়া দিল।

"হায় গোঁসাই! তুমি সেই পরম দয়াল নিত্যানন্দের বংশধর হয়ে আমাকে এই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পাপিষ্ঠের পাশে জায়গা দিলে।"

"বৎস! হিন্দু শাস্ত্রে বলে,—দুঃখভোগই সৌভাগ্যের কারণ।"

ট্যাক্সি ড্রাইভার বলিল—"ইয়ে কেয়া বল্‌তা হায় বাবুজী?"

"বল্‌ছি আপনার ইস্ত্রীলোক আত্মহত্যা করেছেন।"

"কাহে হো বাবুজী।"

"এমন সুন্দর সুপুরুষ বিভীষণের বংশধরকে স্বামিরূপে প্রাপ্ত হয়েও এখনও ইঁদারায় ডুবে দেহত্যাগ করেন নি!"

"নেহি ভাই!"

"গলায় দড়ি দিয়ে—"

"নেহি দাদা!"

"যখন এই গয়াসুরের পাদপদ্মে আত্মদান করতে বাধ্য হয়েছেন, তখন তার মরাই হয়েছে, কি বলেন?"

"হাঁ, হাঁ জরুর ভাই—জরুর।"

দেখিতে দেখিতে ট্যাক্সি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। নিমায়ের রিষ্টওয়াচ্ তখনও আটটা চল্লিশের অধিক বলে না। কাজেই ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন—"লেক যাও।" আজ্ঞামাত্র ট্যাক্সি লেকের দিকে ছুটিল। বদ্দিনাথ বলিল—"সেখান থেকে কি একটি গুরু-গৃহিণী তুলে নেবেন নাকি?"

"বৎস! তোমার গুরুদেব ত যে সে গুরু ন'ন তিনি হলেন মহান্ত মহারাজ। তাঁর ত গৃহিণী নিয়ে সংসার করবার কোন অধিকার নেই।"

"কাজেই তিনি এখন সন্ধ্যার আবছায়ায় শ্বশুরালয়ে চলেছেন।"

"বৎস! সেই কারণে মাষ্টার কাণা হরিদাসের স্কুলে প্রত্যেক ক্লাশটি তিন বৎসর করে লীজ নিয়ে দস্তুর মত গ্রামারখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করে হংসরাজের মত তার সার পদার্থ এই বুঝে নিয়েছি যে, সমস্ত জীবনটা থার্ড পার্সন, সিঙ্গুলার নাম্বার হয়ে থাকব। সম্পূর্ণ অস্ত্রীকভাবে বাসাড়ে জীবনে সংসার-ধর্ম নির্বাহ করব। সেই কারণে দিন-শেষে গোধূলি সমাগমে এই হ্রদ-রাজপথে কিংবা মহারাণীর মৃত্যুর স্মৃতি-চিহ্নের পাদমূলে বায়ু সেবন করতে আসি।"

"কি লেকই বানিয়েছে মুরুব্বিরা! উর্বর মস্তিষ্ক বটে! বেঁচে থাক ষষ্ঠীর বাছারা—এযে একেবারে—তা না হলে এমন সুরবালা-বাঞ্ছিত লেকের ফন্দী মাথায় আসে? এ যেন এক ঢিলে দু'পাখী মারা!"

"বৎস! তুমি সৎগুরুর শিষ্য না হলে এতটা উর্বর মস্তিষ্কের পরিচয় দিতে পারতে না।"

"হে গুরুদেব! হে মুক্তকচ্ছ মহান্ত মহারাজ তাহলে খাঁটি সরিষার তৈল প্রত্যাশীরা পুনরায় মহান্তের তৈলের আর আশা করতে পারেন না।"

গাড়ী তখন লেক প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় ধর্মতলার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। নিমাইচাঁদ হুকুম করিলেন—"শ্যামবাজার যাও।" দেখিতে দেখিতে ট্যাক্সি শ্যামবাজারের পরেশবাবুর ফটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বেলা তখন ৯টা। ভোলানাথ বাবু, মিস্ টম্যাটো দেবী, জমাদার রাম খেলোওয়ান পাঁড়ে ফটকে দাঁড়াইয়া জামাই বাবুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"ঐ এসেছেন।" জমাদার প্রথম অগ্রসর হইয়া ট্যাক্সির দরজা খুলিয়া দিয়া একটি ভোজপুরী সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। জমিদার-পুত্র জামাইরূপী নিমাইচাঁদ পুরাদস্তুর কায়দায় হেলিতে দুলিতে ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভোলানাথ বাবু স্নেহসম্ভাষণে বলিলেন—"এস বাবাজী! আমরা তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে!" নিমাইচাঁদ ভোলানাথ বাবুকে একটি ছোটখাটো রকমের নমস্কার করিলেন। জমিদার-পুত্র ইহা অপেক্ষা অধিক ঘাড় নত করিলে জমিদারের মান ত থাকিতেই পারে না, হয়ত সেই পাপে জমিদারী লাটে উঠিয়া পড়িতে পারে।

টম্যাটো দেবী যথেষ্ট ভক্তিসহকারে দুই হাত জোড় করিয়া একটি নমস্কার করিয়া বলিলেন—"সুন্দর, সুন্দর, সুপুরুষ। আমাগোর বাবুর চয়েস থায়ে, বীণাপাণির যোইগ্য সভা উইজ্জ্বল করা জামাতা করছেন।"

ভোলানাথ বাবু বলিলেন—"তাহলে আটটা দশের গাড়ীতেই আসা হয়েছে?"

টম্যাটো দেবী কহিলেন—"তাহলে জামাই বাবু ভারী সময়নিষ্ঠ দেহি। আর জমিদারগোর তা না হলেই চল্‌তি পারে না। আপনাগোর নিকট আমরা রায়ত মানুষ! আমাগোর শিক্ষা করতি হয়।"

ভোলানাথ বাবুর ইসারায় টম্যাটো দেবী ট্যাক্সির মিটার দেখিয়া ঈষৎ মুখ সিটকাইয়া কহিলেন—"দশটাহা চৌদ্দ আনা।"

নিমাইচাঁদ তাড়াতাড়ি জমিদারের ট্রেজারী দরাজ ঝুখেয়াপূর্ণ পকেটে হাত পুরিয়া বলিলেন—"ট্যাক্সি ফেয়ার আমিই দোব, ক জায়গায় ঘুরে এলেম কি না।"

ভোলানাথ বাবু শশব্যস্ত নিমায়ের হাত ধরিয়া বলিলেন —"সেকি! আজকের দিনে তাও কি হয়। আর তুমি দিলেও যা, তোমার শ্বশুর দিলেও তাই।"

নিমাই একটু কিন্তভাবে ঘাড় নত করিয়া বলিলেন—"সেটা কি ভাল দেখায়?"

ভোলানাথ বাবু কহিলেন—"সেকি কথা বাবাজী! যাও জমাদার সরকারবাবুকো বলো ভাড়া মিটায় দেগা! চল বাবাজী উপরে চল।" সকলেই উপরতলায় ডাইনিং রুমে গিয়া বসিলেন।

নিমাইচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্বশুরমশায়কে দেখতে পাচ্ছিনা যে, তাঁর শরীর-গতিক ভাল তো?"

"পরেশ বেশ ভাল আছে। বাড়ীর আর সকলেও ভাল তবে তার শ্বশুর—তোমার দাদাশ্বশুর মশায়ের বড় অসুখ। বোধ হয় এযাত্রা আর রক্ষা পান না।"

ভোলানাথ বাবু ভবানীপুরের সমস্ত সংবাদ দিয়া বলিলেন—"সেইখানেই সকলকে উপস্থিত থাকতে হয়েছে। তোমার শ্বশুর আমার ইন্‌টিমেট্ ফ্রেণ্ড এ্যাণ্ড নেক্সট ডোর নেবার।"

নিমাইচাঁদ বলিলেন—"তাই আপনার উপর এই ভার-টুকু চাপাতে পেরেছেন।"

"বাই চান্স আই ওয়াজ প্রেজেণ্ট হিয়ার। আমি বড় কলকাতায় থাকি না।"

"বেহারী খানসামা কোথায়। আমি এলে সে ত কোথাও থাকবার পাত্র নয়।"

"সে দেশে গিয়েছে। বেলা হয়েছে, চায়ের ব্যবস্থাটা করে দিই; তারপর বসে কথাবার্তা কওয়া যাবে।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। কিঞ্চিৎ পরে টম্যাটো দেবী কেটলি, ডিস, কাপ, চামচে বসান একখানি ট্রে লইয়া টেবিলের উপরে রাখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর একখানা প্লেটে নানান রকম ফ্রাই, টোষ্ট রুটি আর মাষ্টার পট, একজন চাকর দুইখানা প্লেটে ফল মিষ্টান্ন হাজির করিল। টম্যাটো দেবী সেগুলি নিমায়ের সম্মুখে গুছাইয়া দিয়া চা ঢালিলেন।

নিমাই বলিলেন—"আপনি কি আমাদের খাতির শেষ করে তবে—"

"নিশ্চয়ই—সার্টেন্‌লি সো!"

নিকটে দাঁড়াইয়া বদ্দিনাথ টেবিলের উপর নিমাইচাঁদের প্রাতরাশের প্রচুর আয়োজন দেখিয়া সতৃষ্ণনয়নে সেই দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া নিমাই টম্যাটোকে বলিলেন —"আমার এই চাকরটির কাল উপবাস গেছে ওর জন্যও কিছু বন্দোবস্ত করে দিন।"

তখনি বেহারারা আর একপ্রস্থ প্লেট লইয়া হাজির করিল।

নিমাইচাঁদ বলিলেন—"তবে ওকে আমার সামনে এই বেঞ্চের উপর খেতে দিন। কারণ ওবেচারা বড় লাজুক।"

এইবার নিঃশব্দে বিনা বাক্যব্যয়ে গুরুশিষ্যে অতি বিচক্ষণতা ও তৎপরতা সহকারে জামাইষষ্ঠীর প্রথম পর্যায় সমাপ্ত করিলেন। টেবিলের উপর পূর্ব হইতেই রূপার কৌটার মধ্যে মিঠা পানের খিলি, গোল্ডফ্লেক সিগারেটের কৌটা, দিয়াশলাই রাখা হইয়াছিল। নিমাই-চাঁদ দুখিলি পান মুখে পুরিয়া একটি সিগারেট বার করিয়া বার কতক ঠোকাঠুকির পর তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া বাবা বদ্দিনাথ সহ তাড়াতাড়ি নীচের তলায় নামিয়া একেবারে সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া কিছু উদ্বিগ্নচিত্তে ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতে দেখিতে সিগারেট ফুঁকিতে লাগিলেন।

ঠিক দশটা পাঁচ মিনিটের সময় একখানি ট্যাক্সি আসিয়া ফটকের সম্মুখে লাগিল। ভিতরে আসল জামাই নিকুঞ্জ চৌধুরী আর সাম্‌নে তাহার পুরাতন ভৃত্য জীবন। ট্যাক্সি ড্রাইভার দরজা খুলিবার পূর্বেই নিমাইচাঁদ দ্রুত-পদে গাড়ীর নিকটবর্তী হইয়া বলিলেন—"এই যে গুড-মর্ণিং; আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। পরেশ বাবু তাঁর শ্বশুরের ইচ্ছামত এই ষষ্ঠীবাটার আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারটা তাঁর টালিগঞ্জের বাড়ীতেই আয়োজন করেছেন। আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী, বীণাপাণি, রতন সকলেই সেই বাড়ীতে আছেন। আপনি কাইণ্ডলি এই

ট্যাক্সিতেই সেখানে চলে যান। সেইখানেই তাঁরা ভাড়া চুকোবেন ; নম্বরটা স্মরণ রাখবেন, ২২নং টালীগঞ্জ রোড। আপনার একটু কষ্ট হল কিছু মনে করবেন না। আমি পরেশবাবুর নেক্সট ডোর নেবার তাই আমার উপর এই ভারটি দিয়ে গেছেন। আমার নাম ভোলানাথ।"

"ড্রাইভার ২২নং টালীগঞ্জ রোডমে লে যাও।" "গুড্ বাই দেন" বলিয়া নিমাই ভিতরে হাত বাড়াইয়া নিকুঞ্জের সহিত করমর্দন করিয়া গাড়ীর দিকে পিছু হইয়া ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন, ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল।

নিমাইচাঁদ জমাদার রাম খেলোয়ানের নিকটবর্তী হইবামাত্র সে জামাইবাবুর নিকট বখশিস্ মিলিবার আশায় তাহার মন জোগাইতে অগ্রসর হইয়া কহিল—"হাম জান্‌তা, বাবুজী হুজুরকা কোই দোস্ত হোগা।"

"বাবু হামারা মথুরাপুরীকা ভাগীদার হায়! তোম্ উস্‌কো পছন্‌তা নেহি, এই হামারা গুরুবল হায়। বিহান বাবুসে এই হিস্‌সাদারী লেকে হাইকোর্ট চলেগা।"

"এসা ভদ্দর আদ্‌মী হোকে য্যায়সা বাত!"

"বাবু এত্তা রোজ হাম্‌কো ফাঁকী মার্‌কে এক্‌লাই সমুচা ভোগ দখল করতা থা। আজ হামারা নিদ্রাভঙ্গ হুয়া, হাম্ আয়কে খাড়া হোগিয়া।"

"বহুত আচ্ছা কিয়া হুজুর! হাম্‌কো আবি হুকুম মিল্‌নসে চোট্টাকা গর্দানা পাকাড়কে উতার লেতা। শারাউ বহুত ভারী জুয়াচোর হায়।"

"চোট্টাকো আজ আচ্ছাসে ঘোল খিলায় দিয়া।"

"ঘোল্‌কা সরবত! তব্‌ত বেচারা একদম্ ঠাণ্ডা হো গিয়া হুজুর।"

"পাক্কা চোট্টা একই রোজমে দুরস্ত হো যাগা।"

"ডাকু-ডাকু। ও শরাউকো আজ জরুর সিধা করিয়ে হুজুর।"

এই বলিয়া জমাদার নিমাইচাঁদকে একটি সেলাম দিল। কায়দা-দুরস্ত জামাইবাবু ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া ইঙ্গিতে তাহার উত্তর দিয়া বরাবর তাহার পিতৃকালের মথুরাপুরী তুল্য শ্বশুরবাড়ীর উপরতলায় উঠিয়া গেলেন।

বদ্দিনাথ তখন একটু দূরে দাঁড়াইয়া একটি সিগারেট সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। তাহাকে একটু পিছনে পাইয়া জমাদারজি জামাইবাবুর পুরাতন ভৃত্যের সহিত একটু রসালাপ করিতে অগ্রসর হইয়া কহিল—"আরে রাম-রাম, তুমি কেমন আসে ভাই বদ্রিনারায়ণ।"

"আরে রাম নাম সত্য হায়, তোমার দেখছি কলেজের ফিরৃতি কাশী মিত্তিরমে গর্ত হায়।"

"ভাল আসত ভাই বদ্রিনারায়ণ।"

"গোঁসায়ের কৃপায় দিনগুলো কেটে যাচ্ছে মন্দ নয়। তবে আজ তোমার মনিবের ঘাড়ে ভর করে খোদা যেন ছাপ্পর ফুরে দিচ্ছেন ভাই লছমনঝোলা।"

"হামার নাম লছমনঝোলা না আসে। আমার নাম রাম খেলোয়ান পাঁড়ে।"

"ও তোমার বাসা ছিল সেই তেঁতুল গাছে খালের ধারে। হাল সাকিম বুঝি এই মিত্তিরদের পগারে।"

"সবেরে চা জলখাবার কেমন হল ভাই।"

"হায় ফার্ষ্ট কেলাস।" গুরুর উদ্দেশে হাত জোড় করিয়া বলিল—"আহা গুরুদেব তুমি ধন্য। এ বেটা ভুট্টাখোরও দেখছি আমাদের দেবসেবা তুল্য ভোগরাগ দেখে হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে।"

"ফিন্ ভাতকা সাথে পোলুয়া কালুয়া মাংস-মস্‌লি বহুত জোর খাওয়া হোবে।"

"আহা দুঃখ করবেন না, দুঃখ করবেন না। কি জানেন জমাদার সাহেব, যে যেমন বরাত করে এসেছে, আপনার ছাতুটাতু গেলা হয়ে গেছে? আজকাল ক'সের করে চল্‌ছে? তার সঙ্গে ক'গণ্ডা কাঁচা লঙ্কার আবশ্যক হয়, ক'কলসী পাণি টানতে হয়, আমি এখন উপরে চল্লেম, এখুনি বাবুর ডাক পড়বে।"

বদ্দিনাথ দুটি শেষ টান দিয়া সিগারেটটি নিঃশেষ করিয়া উপর তলায় চলিয়া গেল।

(৪)

নিকুঞ্জ চৌধুরীর ট্যাক্সি যখন ২২নং টালিগঞ্জ রোডে আসিয়া লাগিল, বাড়ীর কর্তা সুবল বাঁড়ুজ্যে তখন অফিসে। একমাত্র পুত্র অতীন্দ্র কলেজের ছাত্র সেও বাহির হইয়া গিয়াছে। ফটকের সংলগ্ন ছোট কম্পাউণ্ডটির

সামনে সুবলবাবুর বৃদ্ধা জননী একটি নাতীকে লইয়া রাস্তার গাড়ী দেখাইতেছিলেন। ফটকে ট্যাক্সি লাগিবা-মাত্র নাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সুশে ঐ দেখ দেখ তোর, শ্বশুরবাড়ীর গাড়ী এসেছে তোকে নিতে, ষষ্ঠীবাটায় নিমন্ত্রণ খেতে যাবি।"

দূর হইতে নিকুঞ্জ উৎকণ্ঠিত কর্ণে শুনিলেন, ঐ বীণার শ্বশুরবাড়ীর গাড়ী এসেছে, নাতজামাই এল ষষ্ঠীবাটা খেতে। জীবনকে বলিলেন—"যা একবার খবর নে, এই বাড়ী কি না।"

জীবন বৃদ্ধার নিকটবর্ত্তী হইয়া একটি গড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এইটা কি পরেশবাবুর শ্বশুর বাড়ী।"

বৃদ্ধা কহিলেন—"হাঁ পরেশ আমার জামাই! সে এখন আমাদের কালীঘাটের মনোহরপুকুর রোডের বাড়ীতে আছে। উটি কে, তার জামাই না?"

"আজ্ঞে হাঁ! আজ তাঁর হোথা ওঁর নিমন্ত্রণ আছে।"

"তা আমি জানি! আজ যে ষষ্ঠীবাটা। নতুন জামাই নিমন্ত্রণ করবে না। নাত-জামাই একবার আমাদের এখানে নাবলে হত না।"

"আজ বেলা হয়ে গেছে, আবার সেখানে যেতে হবে।"

নিকুঞ্জ বাবু গাড়ীতে বসিয়া সকল কথাই শুনিতে-ছিলেন। বৃদ্ধাকে গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া ভিতর হইতেই একটি নমস্কার করিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন—"ভাল আছ? বেঁচে থাক ভাই, বেঁচে থাক দিদিশাশুড়ীর বাড়ী একবার নামলে হত না? তা থাক, আজ লক্ষণের দিন আজ আর কাজ নেই, আমি একদিন আলাদা করে বলে পাঠাব। তোমরা দুজনে এস ভাই।"

নিকুঞ্জ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের বাড়ীর সব মঙ্গল। ওবাড়ীর ঠিকানাটা কি?"

"হাঁ ভাই সকলে ভাল আছে।" বাড়ীর ঠিকানা বৃদ্ধা কহিলেন—"তেত্রিশ নং মনোহরপুকুর রোড।"

নিকুঞ্জ উপযাচিকা দিদিশাশুড়ীকে আর একটি নমস্কার করিয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে মনোহরপুকুর রোড যাইতে বলিলেন। ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল এবং দশ মিনিটের মধ্যে তেত্রিশ নং মনোহরপুকুরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর হিন্দুস্থানী ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া সেলাম দিল। জীবন বলিল—"খবর দাও, জামাইবাবু এসেছেন।"

চাকরটি ছুটিয়া গিয়া খবর দিল। সঙ্গে সঙ্গে এক পাল ছেলেমেয়ে "জামাইবাবু এসেছে" বলিয়া গাড়ীর নিকট ছুটিয়া আসিল। নিকুঞ্জ সেই পঙ্গপালের দলকে দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন; ভাবিলেন এই সামান্য দিনের মধ্যে এই উলুর বোঝা কোথা হইতে গজাইয়া উঠিল। বড়রা নিকুঞ্জকে দেখিয়া মুখ সিটকাইয়া পিছু হটিল। ছোটরা ট্যাক্সির পা-দানীতে উঠিয়া সুর করিয়া ছড়া কাটিতে সুরু করিল—

ছিল জৈষ্ঠী মাসে ষষ্ঠীবাটা শ্বশুরবাড়ীর দোরটি আঁটা
ওগো হরি-মটরের দেশে।
জামাইবাবুর মস্ত ভুঁড়ি আম কাঁটাল রাখার ঝুড়ি
ক্ষুধায় কাঁদেন দোরে বসে॥

একটি ছোট ছেলে নিকুঞ্জের হাত ধরিয়া টান দিবামাত্র নিকুঞ্জ দরজা খুলিয়া নামিয়া বরাবর বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। ইত্যবসরে বড়রা বাড়ীর ভিতর খবর দিল,—"কে একজন বাবু এসেছে, ছুখিয়া বেটা এমনি বোকা এসে বলে কি না জামাইবাবু এসেছে।"

একটি যুবক ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া নিকুঞ্জকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কাকে চান?"

কি অবাক্ সৃষ্টি! নিকুঞ্জ ত নির্বাক হতবুদ্ধির মত যুবকের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। যুবক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কাকে খুঁজছেন?"

"পরেশবাবুকে।"

"পরেশচন্দ্র কি?"

"পরেশচন্দ্র ঘোষ।"

"এত পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী।"

কি সর্বনাশ! সত্যসত্যই ত যুবকের গলায় যজ্ঞোপবীত। নিকুঞ্জের মুখ এতটুকু হইয়া গেল। লজ্জায় ঘাড় নত হইয়া পড়িল। বেচারা আসন ছাড়িয়া ধীরে ধীরে বাহির হইল। পিছন হইতে যুবক বলিল—"যাচ্চোলে লুচিটা ফসকে গেল।"

ছেলেমেয়েরা সমস্বরে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিকুঞ্জ এক গা ঘামিয়া উঠিয়াছে। বেচারা টলিতে টলিতে আসিয়া ট্যাক্সিতে বসিয়া পড়িল। জীবন বলিল—"কি কুযাত্রা!"

নিকুঞ্জের মাথাটা স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে অনেকটা সময় লাগিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন—"দেখ জীবন, আমার যেন মনে হচ্ছে আমি দুএকবার শুনেছি, দাদাশ্বশুরের বাড়ী ভবানীপুরে।"

জীবন বলিল—"কলকাতার নম্বর ঠিকানা ঠিক না জানা থাকলে কিছুতেই বাড়ী খুঁজে পাবার যো নেই, যেন বাঁশবনে ডোম কানা!"

ট্যাক্সিওয়ালা পাইয়া বসিয়াছে। সে যখন এমন হীরার অঙ্গুরী-বোতামওয়ালা শাঁসাল কাপ্তেনবাবুকে আসামী পাইয়াছে তখন জরুর চল্লিশটি টাকা বেওজর কামাইয়া লইবে। বলিল—"কুচপরোয়া নেহি—চলিয়ে, সার্চ করনেসে সব শ্বশুরাকো মিল যায়গা।"

পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল। নিকুঞ্জ আর জীবন ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতেছিল। কেহ কোন উচ্চবাচ্য করিল না। ট্যাক্সি আশু মুখার্জীর রোড, জগুবাবুর বাজার, হরিশ মুখার্জীর রোড প্রভৃতি স্থানে দুই ঘণ্টা যাবৎ ঘুরিয়া চেষ্টা করিল, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। নিকুঞ্জ ঘড়ী দেখিলেন বেলা একটা। সঙ্গে এত টাকা নাই যে ভাড়া চুকাইয়া ট্যাক্সি ছাড়িয়া দেন।

ক্রমে যত বেলা হইতে লাগিল, বিপদও সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। নিকুঞ্জের সর্বাঙ্গে শুভ ষষ্ঠীবাটার চট্চটে আটা বেশ জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এত ষষ্ঠীবাটা খাওয়া নয়, যেন দক্ষিণ হস্তের দ্বারা কি একটা অভক্ষ্য বস্তু খাওয়া হইয়াছে। জীবনে কখনও আর ষষ্ঠীবাটার নিমন্ত্রণে আসিবেন না। এটর্ণী হইয়া আইনের মধ্যে ফেলিয়া এই গুষ্টি ভদ্রলোকের অপমানসূচক জামাইষষ্ঠীটা পঞ্জিকা হইতে ক্ল্যাচ করাইয়া তবে ছাড়িবেন। নিকুঞ্জ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখেন গাড়ী একেবারে লেকের ধারে আসিয়া উপস্থিত। সচকিতে বলিয়া উঠিলেন—"ইধার কাহে আয়া?"

ট্যাক্সিওয়ালা অম্লানবদনে বলিল—"যেত্না বড়া বড়া শ্বশুরালোক হিয়াই কোঠী বানায়া।"

মনের ধিক্কারে নিকুঞ্জ আর কথা কহিলেন না। ড্রাইভার আপন ইচ্ছামত যেখানে একখানা বড় বাড়ী দেখে সেই স্থানেই গাড়ী রাখিয়া নামিয়া পরেশ বাবুর তল্লাস করে। আর পনের বিশ মিনিট করিয়া ওয়েটিং চার্জের হিসাব রাখে। অবশেষে ধর্মতলার মোড়ে আসিয়া বলিল—"আউর কাঁহা যাইয়েগা বাতাইয়ে।"

নিকুঞ্জ অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন,—"শ্যামবাজার।"

ট্যাক্সি যখন শ্যামবাজারের পরেশবাবুর ফটকের সম্মুখে আসিয়া লাগিল, তখন আমাদের নদের নিমাই, তস্য ভৃত্য বাবা বদ্দিনাথের সহিত মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পান-সিগারেটের আত্মশ্রাদ্ধ সারিয়া আরামে একটু দিবা-নিদ্রা দিতেছিলেন। কোল্যাপ্সিব্ল্ গেটে তালাবদ্ধ করিয়া রাম খেলোওয়ান বেঞ্চের উপর চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিল।

জীবন ট্যাক্সি হইতে নামিয়া বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবুরা ভবানীপুর থেকে এসেছেন জমাদারজী।"

জমাদার চক্ষু মুদিয়াই বলিল,—"নেহি"।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল,—"ভবানীপুরের বাড়ীর নম্বর ঠিকানাটা জান কি?"

জমাদার বিরক্ত হইয়া বলিল,—"নাই হো।"

জীবন পুনরায় বলিল,—"যদি জান ত বল না, আমরা এখনও বাড়ী খুঁজে পাইনি।"

এবার জমাদার হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল,—"আরে যাও যাও লম্বর লেনেওলা।"

জীবন ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"বাবুরা এখনও ফিরে আসেন নি। জমাদার ঠিকানা জানে না।"

নিকুঞ্জ একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া হুকুম দিলেন,—"বড়াবাজার সোনাপটী যাও।" ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল।

(৫)

বনিয়াদী বড়লোকের সুসজ্জিত বৈঠকখানা; চারিদিকে কৃতী পূর্বপুরুষদিগের বড় বড় অয়েলপেন্টিং, ব্রাকেট সহ

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আয়না, কাচ-গেবাসের মূল্যবান পঁচিশ ত্রিশ বাতির ঝাড়, ঘরজোড়া ইটালিয়ন কার্পেট। তার মধ্যে মধ্যে সুন্দর সাটিনের তাকিয়া-বালিশ। বনিয়াদী ঘরে এখনও ফক্কেকারী কৌচ-কেদারা ঢুকিয়া বৈঠকখানার মর্যাদা নষ্ট করিবার সুযোগ পায় নাই। সিগারেট মুখে নিমাইচাঁদ একটি তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। বাবা বদ্দিনাথ পদ-সেবায় নিযুক্ত। সম্মুখে রূপার পালবোটে পান, চাঁদির সিগারেট কেশ ভরা সিগারেট, চাঁদির অ্যাশট্রে সাজান রহিয়াছে। সম্মুখে টমাটো দেবী জামাই বাবুর মনোরঞ্জনের জন্য উপস্থিত আছেন। কোন ত্রুটী হইতেছে কি না কিম্বা কোন দ্রব্যের আবশ্যক আছে কি না জিজ্ঞাসা করিছেতেন। নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার পূরো নামটি কি ?"

"মিস্ টম্যাটো দেবী।"

"এই টুকটুকে সেভেন্টিফাইব পারসেণ্ট ভিটামিনওয়ালা নামটি এই ক্ষীণ ফ্রেমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে কে ?"

"আমিই সিলেক্ট করেছি।"

"বোধকরি একজন চিরসঙ্গীও সিলেক্ট করে রেখেছেন ?"

"আমাগোর পিতাঠাকুর পাত্র স্থির করি থুইছিলেন কিন্তু—"

ঠিক সেই সময় দালাল রোহিণী কুমার সুটকেশ হস্তে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"গুড্ মর্ণিং জামাইবাবু। এককালে বৈঠকে ঢুকিয়াই দর্শন লাভ কর্লাম। ইয়ে কয়ডারে আসা হইছে। দেশের সংবাদ মঙ্গল! ইয়ে হুজুরের শরীর গতিক ভালই হইব! ফাষ্ট ক্লাসে আসা হইছে! ইয়ে পথে কোন অসুবিধা না হইবারই কথা! ইয়ে পরেশবাবু মিস্ টম্যাটোরে আপনগোর পরিচর্যায় নিযুক্ত কইর্যা বিবেচকের পরিচয় দেহেন।"

টম্যাটো দেবী চলিয়া গেলেন।

নিমাই—"আপনি কে চিন্‌তে পার্‌লুম না।"

বদ্দি—"দেখুন—দেখুন হাওয়া-গাড়ীর ড্রাইভার নয় ত! কথার তোড় দেখছেন না। এখুনি একনিশ্বাসে ধর্মতলায় হাজির করে দেবে।"

রোহিণী—"ইয়ে সুটকেশ হস্তে—উল্টা কলার ছাফ্ সার্টের ছাতির মধ্যি ফাউন্টেন—খাকি হাফ্‌পেণ্ট—জুতার মধ্যি খড়িমাটীর পের্‌লেপ দেখ্‌লেই বুঝতি হবে ইয়ে ভদ্রলোক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর দালাল—ইয়ে আমাগোর ইউনিফরম। হুজুর এককালেই সরল মানুষ তাই যা কন।"

নিমাই—"আমি সরল সরের কাটী।
আঁকা বাঁকা আঁচর কাটী।"

রোহিণী—"আরে বাঃ বাঃ! হুজুরের ইয়ে কবিত্ব-শক্তি বড় প্রবল দেহি। কালে হুজুর ইয়ে একজন কবীন্দ্র কিংবা বক্তৃতার হইবার আশা রাখতি পারেন।"

নিমাই—"তা ত পারি! কিন্তু মশায়ের আমার উপর এতটা আবিষ্ট হবার কারণটা ত আবিষ্কার করতে পাচ্ছিনা।"

"ইয়ে কলম্বস সাহেব যহন এত অল্প আয়াসে আমেরিকা আবিষ্কার করি সারছেন, তহন ইয়ে এই অনুগত জনে আবিষ্কার কর্‌তি হুজুরের ইয়ে বিলম্ব হইবার কারণ দেহি না।"

"তা ঠিক বলেছেন—বরং কোর্টের ভিতর জজ সাহেবকে খুঁজে বার করা কঠিন, মঠের ভিতর দেব-বিগ্রহ খুঁজে বার করা কঠিন, কিন্তু শ্মশানে মশানে মাঠে ঘাটে এই হাটের নেড়া ইন্সিওরেন্সের দালাল খুঁজে বার করা বিন্দুমাত্র কঠিন নয়।"

"আপনি ধনী মানুষ! ইয়ে তামাসা কর্‌লিও কর্‌তি পারেন কিন্তু ইক্ষেত্রে দালালের ইজ্জতের কথা কিছু না কইয়া থাক্‌তি পার্‌লুম না। আমাগোর দেশের কালির দালাল ছুকড়ি সেনেরে ক্ষণজন্মা ভাগ্যবান্ পুরুষ কওয়া যাতি পারে। কারণ দুই হাতে উপায়ও কর্‌তিছেন বড় আর খরচও করতিছেন বেখবর তাগোর বাসায় দিবারাত্র অন্নছত্র খুলাই আছে।"

বদ্দি—"আহা! গুণধরই বটে!"

রোহিণী কহিলেন—"এহন দুটা কাজের কথা কইমু! আপনাগোর ওহানে কোন তারিখে যামু কন্।"

নিমা—"যবে ট্রেণ ভাড়ার পয়সা সংগ্রহ করতে পারবেন।"

রোহি—"আপনারে এই দরিদ্র মাইনুষের উপর কিছু দয়া কর্‌তি হইব।"

বদ্দি—"আহা উনি দয়াময়! গরিবের মা-বাপ!"

নিমা—"আমি আপনার জন্য যথেষ্ট কর্‌তে পারব। আমার আর আমার ফাদারের দশ হাজার করে দুখানা আর খুড়ো মশায়ের পাঁচ হাজারের একখানা এই পঁচিশ হাজারের জন্যে পাকা কথা দিলেম। যখন আপনার সঙ্গে একটু ফ্রেণ্ডশিপ করা গেল তখন আপনার কিছু না কিছু উপকার আমি করবই।"

রোহি—"থ্যাঙ্ক ইউ—মেনি থ্যাঙ্কস্। ইসে দেহেন উপস্থিত বৎসর পঞ্জিকায় লেখছে, অগ্নি-বিবীষিকা বড়ই প্রবল হইব।"

নিমা—"মশাইদের অনুগ্রহে সাহেবদের চোক খুলেছে। জ্যোতিভূষণদের যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থা করেছেন আর কি!"

রোহি—"ইসে সেই কারণে ইবৎসর অগ্নিবীমায় বঙ্গবাসী এককালে ঝাঁপায়ে পড়ছে। আপনাগোরও কিছু ফায়ার ইন্সিওরেন্স করাইমু। বড়ই সেফ—বড়ই সেফ—অগ্নি হইতে নিশ্চিন্তি হইবার একটি অতি আবশ্যকীয় উপায়।"

নিমা—"জোঁকের রক্ত ডাশে শুষছে। বাঙালীর ঘাড় বাঙালীই ভাঙ্গছে। এমন সুবুদ্ধির জাত ত আর নাই। তবে কি জানেন সাহেবদের ধরে বাঙালী কেরাণীদের উদরাগ্নি হতে মুক্তিলাভ বলে যদি একটা ইন্সিওরেন্স খোলাতে পারেন তা হলে অনাহার-ক্লিষ্ট জীর্ণ কেরাণীদের অকালে স্বর্গারোহণটা কমে আর তাদের জীবদ্দশাতেই তাদের পুত্র-পরিবারেরা ক্ষুধার জালা থেকে অব্যাহতি পায়।"

রোহি—"আপনি দেহি একজন মস্ত ফিলোজফার—স্বজাতির লৌকিক—পারলৌকিক বিষয়ে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখছেন। সমিস্যার কথা বটে। ইসে পলিসিখান্ হইব কার নামে?"

নিমা—"কেন প্রথমটি করে দেবেন পাঁচ হাজারী পুত্রদের পিতার নামে, দ্বিতীয়টি করবেন, দয়াবতী শাশুড়ী ঠাকরাণীর নামে।"

রোহি—"বাঃ বাঃ চমৎকার। ইসে দেহি চার্বাক-পরাজয়ী গৌতম মুইনির ন্যায় শাস্ত্র, যারে লজিক কইছে। দেহেন দলালের উপর বিশ্বাস না রাখলি কোন কার্যেই লাভবান হতি পারা যায় না। এই দেহেন অয়েল মার্চেন্ট বিপিনবাবু আমাগোর হাত দিয়া প্রিমিয়ম জমা দেছেন তিরিশ টাহা।"

এই বলিয়া সুটকেশ খুলিয়া তিনখানি দশ টাকার নোট দেখাইয়া তাহা পুনরায় সুটকেসের মধ্যে রাখিয়া চাবিটি কেশের হ্যাণ্ডেলে বাঁধিয়া বলিলেন—"এই চারটা দশের ট্রেণে হুগলী যামু। সেহানের জমিদার যতীন্দ্র মইল্লিক মহাশয় পত্র লেখছেন তাঁগোর এক কোয়ার্টারের প্রিমিয়ম আমাগোর হাত দিয়া জমা দিতি চান। যাওন-আসন রাহা খরচা পায়। কাল দুই দফা টাহা এককালেই অফিসে জমা দিমু। বিশ্বাসী আর কামের মাইনুষ পাইয়া হক্কলেই অল্প-বিস্তর চাপ দিছেন আর যথেষ্ট বালও বাইসে থাহেন। বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়ছি একটু বিশ্রামের ফুরসদ নাই।"

নিমা—"তাই ত চোখ যে জড়িয়ে আসছে দেখছি।"

রোহি—"একটা গোড়াগোড়েন দিয়া নিমু। তিনটা ত্রিশ হলেই আপনগোর খাইনসামারে আমারে জাগাইতে ক'বেন।"

রোহিণী সেই কোমল কার্পেটের উপর গা ঢালিয়া দিল এবং শীঘ্রই তাহার নাসিকাধ্বনি শোনা গেল। নিমাই মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে সুটকেশটি দেখাইয়া বদ্দিনাথকে ইসারা করিলেন। বদ্দিনাথ মৃদুস্বরে "সর্বনাশ" বলিয়া খানিকটা পিছু হটিয়া গেল। নিমাইচাঁদও মৃদুস্বরে বলিলেন—"বৎস। বিলম্বে কার্যহানি হইবার আশঙ্কা।"

বদ্দিনাথ ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল—"গুরুদেবের এ বিদ্যে আবার কতদিন?"

নিমা—"বৎস! বহুদর্শী এবং সর্বগুণে গুণান্বিত না হলে গুরুগিরী চলে না। গুরুর এই মহীষ্ঠ বিদ্যার নাম গুরুগ্-গাঁই। ক্ষিপ্রহস্তে অগ্রসর হও বৎস!"

বদ্দিনাথ দূর হইতে গুরুকে একটি প্রণাম করিয়া বলিল—"[illegible]"

নিমাইচাঁদ বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"অর্বাচীন।" পরে অবিলম্বে অম্লানবদনে সুটকেশ খুলিয়া তিনখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া ট্যাঁকে গুজিলেন এবং সুটকেশ বন্ধ করিয়া চাবিটি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ক্রমে তিনটি চল্লিশ হইলে একেবারে রাগিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হারামজাদা বেটা! এখনও ওঁরে ডেকে দিলি নে! ভদ্রলোকের ট্রেণ ফেল হলে তুই কি তার খেসারত দিবি।"

সেই চীৎকারে রোহিণীকুমার উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন—"আরে মশয়! হচ্ছে কিতা! ফায়ার-ফায়ার নাকি! ইসে সেই কারণেই আপনাগোর সেফ্‌সাইডের জন্য ফায়ার ইন্সিওরেন্স কর্‌তি পরামর্শ দিছিলাম।"

নিমা—"দেখুন, আমার এই হতভাগ্য চাকরটি ফায়ারের বাবা কচ্ছপ। আপনার অপেক্ষা কুড়ে, মেড়ার তুল্য অকর্ম্মণ্য। ওর উপর কোন কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জোটি নেই। একটা ভাল-মন্দ কাজ বল্লেই ওর হাত কাঁপতে সুরু করে। বেটার কোন কাজে হাত-সাফাই নেই। এই দেখুন না তিনটে চল্লিশ হল, আপনার দশ মিনিট লেট করে দিলে। যান্ যান্ আর বিলম্ব করবেন না। ট্রেণ-টাইম বলে কথা।"

রোহিণীকুমার রিষ্টওয়াচ দেখিয়া তাড়াতাড়ি সুটকেশ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"তা হলে আমি আগামী সপ্তাহে আপনগোর ওহানে যামু। গুডবাই দেন।" বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন। নিমাইচাঁদ বদ্দিনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বাবা বদ্দিনাথ! কিছু মনে করোনা বৎস! গুরুশিষ্য-সংবাদে হরেক রকম নরম-গরম প্রথা প্রচলিত আছে। আর এই ভদ্রলোকের কাছে তাঁর কিছু উপকার কর্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম, কিরূপে তার অন্যথা করি। তাহলে কলি দেবতার অমান্য করা হয়। তোমার গুরুদেবের বেদতুল্য বাক্য মিথ্যা হয়।"

(৬)

আসল জামাইবাবু নিকুঞ্জ চৌধুরী যখন দ্বিতীয়বার হতাশ হইয়া শ্যামবাজার হইতে ট্যাক্সি ছাড়িয়া সোনাপটি পৌছিল, তখন বেলা দেড়টা বাজিয়া গিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে সোনাপটির বিখ্যাত ব্যাঙ্কার গভর্ণমেণ্ট পেপার ও সুবর্ণ-ব্যবসায়ী মেসার্স বড়াল এণ্ড ব্রাদার্সের দোকানের সহিত পরিচয় থাকায় তাঁহাদের নিকট হাতের হীরক অঙ্গুরিটি বন্ধক রাখিয়া চল্লিশ টাকা কর্জ্জ চাহিলেন।

দোকানের কর্ম্মাধ্যক্ষ অতি ভদ্রতার সহিত নিকুঞ্জ বাবুকে অঙ্গুরীটি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"আপনার পিতা আমাদের পরিচিত এবং গ্রাহক। এ জাতির মধ্যে এখনও এতটা নীচতা প্রবেশ করে নি যে সামান্য চল্লিশটি টাকার জন্য তাঁর পুত্রের হাত থেকে অঙ্গুরীটি খুলে নেব। আপনি টাকা নিয়ে যান। সুবিধামত পাঠিয়ে দেবেন।" নিকুঞ্জবাবু একটি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নমস্কার করিয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

নিকুঞ্জবাবু ধর্ম্মতলায় উপস্থিত হইয়া বত্রিশ টাকা ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া ট্রামওয়ে কোম্পানীর সেডের ভিতর দাঁড়াইয়া অদৃষ্টচক্রের ভীষণ বিদ্রূপের কথা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। কিন্তু জীবন কোন মতে ছাড়িল না। তাহাকে দ্বারিক ঘোষের দোকানে টানিয়া লইয়া গেল। সেখানে দাদাবাবুর মুখ-হাত-পা ধোয়াইয়া তাহাকে কিছু জলযোগ করাইল। গ্রহবৈগুণ্যে ষষ্ঠীবাটায় আমন্ত্রিত জমিদারের পুত্র বড়লোকের জামাতার জীবনের স্মরণীয় দিবস এই সন ১৩৪৪ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের বেলা চার ঘটিকার সময় নিকুঞ্জ চৌধুরীর মুখে জল পড়িল। একেই বলে—'যার ধন্ তার নয় নেপোয় মারে দই।'

(৭)

ভোলানাথবাবু অপরাহ্নের চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। ডাইনিং রুমে মিস টম্যাটো দেবী নিমাইচাঁদের সঙ্গে বসিয়া গল্পসল্প করিতেছেন, এমন সময় টেলিফোনের বেল বাজিয়া উঠিল। টম্যাটো দেবী ছুটিয়া গিয়া রিসিভার ধরিলেন—"হ্যালো…আপনি কোন চিন্তা করবেন না। জামাইবাবু এইবার বৈকালীন চা পানে বসবেন… জামাইবাবুর সাথে কথা বলতি চান?"

টম্যাটো নিমাইকে কহিলেন—"আসেন পরেশবাবু আপনারে চান।"

নিমাই ছুটিয়া গিয়া রিসিভার ধরিলেন—"হ্যালো… আজ্ঞে হাঁ আমি নিকুঞ্জ নমস্কার করছি…না কোন অসুবিধা হয় নি। ভোলানাথ বাবু, টম্যাটো দেবী যথেষ্ট কেয়ার নিচ্ছেন ইনি এখন কেমন আছেন…বলেন কি! অবস্থা একেবারেই ভাল নয়…না না এ অবস্থায় রোগী ফেলে আপনার এখানে আসবার কোন প্রয়োজন নেই! আমি একবার ওখানে যাব কি? হাঁ আজ একটা লক্ষণের দিন তাই মেয়েরা বারণ করেছেন …আপনি দশটার পূর্বে না আসতে পারিলেও কোন ক্ষতি হবে না তবে আমার ৯টা দশের ট্রেণ…আজ্ঞে হাঁ তা না হলে একেবারে এগারটা চল্লিশ…ওখানের খবরটা যেন কাল পাই আর আমি আবার দু-তিনদিনের মধ্যেই আসছি।…হাঁ চা তৈরী…হাঁ নমস্কার।"

এবেলা নিমাইচাঁদের অনুরোধে ভোলানাথবাবু তাহার সহিত চায়ে বসিলেন। বাবা বদ্দিনাথকেও সমানভাবে পরিবেশন করা হইল। নিমাইচাঁদ কহিলেন—"এতক্ষণ শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল।"

ভোলা—"বটে! পরেশ কি বললে।…"

নিমাই—"দাদাশ্বশুর মশায়ের অবস্থা একেবারে ভাল নয়। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ডাক্তারদের কন্‌সাল্টেসন চলবে।"

ভোলা—"তাই না কি, তারপর?"

নিমাই—"তারপর যদি তিনি একবার বাড়ীতে আসতে পারেন। কিন্তু আমায় ৯টা দশের ট্রেণ ছাড়তে নিষেধ করলেন। কেন না পরের ট্রেণ একেবারে এগারটা চল্লিশ।"

ভোলা—"না না অত রাত্তিরে কি যাওয়া চলে! আমি সকাল সকাল আটটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে দোব।"

নিমাই—"শ্বশুরমশাই তাই আপনার নাম করে বলছিলেন যে, যার হাতে তোমার খাতির-যত্নের ভার দিয়ে এসেছি তাতে আমাতে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নেই।"

ভোলা—"পরেশের মত বন্ধুলাভ পরম সৌভাগ্যের কথা। আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হলে আমরা যেন স্বর্গ-সুখ অনুভব করি।"

নিমাই—"ঠিক কথা! ফ্রেণ্ডশিপ ইজ দি ষ্টিমুলেণ্ট অফ ম্যান্‌স লাইফ।"

ঠিক সেই সময় মিস টম্যাটো দেবী আসিয়া বলিলেন—"জামাইবাবুর চানির কারণে বাতরুমে সাবান তোয়ালি, ফুলেল তৈল সকলি কমপ্লীট রাখছি। এদিকেও হাফপাষ্ট ফাইভ। ইচ্ছা করলি আসতি পারেন।"

ভোলানাথবাবু বলিলেন—"তাই যাও বাবাজি, স্নানটা সেরে নাও গে। আমিও যাই—যাতে সকাল সকাল তোমায় ছেড়ে দিতে পারি তার ব্যবস্থা করি।" তিনি প্রস্থান করিলেন। নিমাইচাঁদ টম্যাটোকে বলিলেন—"আপনি আমার জন্য যে রকম কষ্ট স্বীকার করছেন, সে জন্য আমি আপনার কি করতে পারি বলুন।"

টম্যাটো—"দেহেন জামাইবাবু! আপনি বড় লোক ঐশ্বর্যশালী সৌভাগ্যশালী। আপনি সকলি করতি পারেন। আমাগোর মধ্যি যিনি যতই চাল মারেন না ক্যান, সইত্য কথা কতি গেলে আমাগোর এহন চলতিছে দুর্দশার সাথে সমান সমর। পৃষ্ঠপোষক ভিন্ন কারও এতটুক শক্তি নাই। অমাগোর এক সহপাঠী বগ্নি অবশ্য তিনি এহন এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন।"

নিমাই—"স্ত্রীলোকদের এঞ্জিনিয়ারিং পড়বার কোন প্রয়োজন হয় না! তাঁরা ত এঞ্জিনিয়ার হয়েই জন্মগ্রহণ করেন—তবে তাঁরা ভাঙ্গতে পারেন ঘর, আর গড়্‌তে পারেন হাঁড়ি।"

"কি রকম!"

"ধরুন। পাঁচটি সহোদর এক অন্নে বাস করছিলেন, পাঁচটি বধূ এসে ঘরটি ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে পাঁচটি হাঁড়ী নিয়ে পূর্ত কার্যের যথেষ্ট পরিচয় দিলেন। বিধবা কন্যারা বাপের বাড়ী এলে আর পরিবারের মাতা শাশুড়ী-ঠাকুরাণীরাও জামাই বাড়ীতে ঢুকতে পারলে এই এঞ্জিনিয়ারিং কার্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়ে থাকেন। যাক্—আপনার ভগ্নীর কথা কি বলছিলেন?"

"এক ভদ্রলোক তার যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

তাঁরই সাহায্যে উমাদিদি পড়াশুনায় অনেক দূর অগ্রসর হইছিলেন তবে শ্যাষটা— ।”

“শেষটা আপন অভীষ্ট পূর্ণ করে পৃষ্ঠপোষক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন !”

“হাঃ—হাঃ—হাঃ ।”

অতঃপর নিমাইচাঁদ টম্যাটো দেবীর সহিত স্নানার্থ গমন করিলেন ।

আহারের পূর্বে ভোলানাথ বাবু নিমাইচাঁদকে লইয়া পরেশবাবুর তোষাখানায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—“এইবার কাপড়টা ছেড়ে নাও বাবাজী ! আজকের দিনে বিশেষ বিবাহের প্রথম বৎসর শ্বশুর-প্রদত্ত নূতন কাপড় পরে আহারে বস্‌তে হয় ।”

নিমাই ও বদ্দিনাথ দেখিলেন জামাইবাবুর জন্য পূরা-দস্তর বাবুকোঁচা করা মূল্যবান ঢাকাই ধুতি, সিল্কের গেঞ্জি, পান্নার জড়োয়া বোতাম সহ সিল্কের পাঞ্জাবী, সিল্কের চাদর, মোজা, জুতা, ভেল্‌ভেটের বাক্সের মধ্যে একটি মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী ও কলাপাতে মোড়া একগাছি প্রকাণ্ড গোড়ের মালা। পার্শ্বে একখানি টুলের উপর ভৃত্যের জন্য ভাল বাসন্তী মিলের ধুতি-চাদর লংক্লথের পাঞ্জাবী ও বখশিসের দুইটি টাকা সাজান রহিয়াছে ।

নিমাইচাঁদ একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—“এ বৎসর এ বিষয়ে আমায় মাপ করবেন। মাথার উপর এত বড় একটা বিপদ্ ঝুলছে, কখন কি খবর আসে! আর আমি বেহায়ার মত এইগুলো পরে গায়ে ফুঁ দিয়ে চলে যাব ! তা হতে পারে না। আপনারা বরং সময়মত এগুলি পাঠিয়ে দেবেন ।”

মহান্ত মহারাজের এত ত্যাগ, এত লোভ-সংবরণে বিরক্ত হইয়া বাবা বদ্দিনাথ কতবার গলার সাড়া দিলেন, চক্ষের ইসারা করিলেন কিন্তু গুরুদেব অটল-অচল। ভোলানাথ বাবুর কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবল ফুলের মালাটি হাতে করিয়া তোষাখানা হইতে বাহির হইয়া গিয়া মালা ছড়াটি গলায় পরিয়া আহারে বসিলেন। বদ্দিনাথ আর কোন চেষ্টা করিল না তাহাকে বাধ্য হইয়া গুরুদেবের মস্তিষ্ক তাহার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও উর্বর ।

রাত্রি ৮৷৷৹টার মধ্যে বদ্দিনাথ সহ নিমাইচাঁদের শেষ প্রস্থ আহার সমাপ্ত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বদ্দিনাথ সরকার বাবুর নিকট হইতে নোট তিনখানি ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকায় পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল; সেগুলি সন্ধ্যা হইতে নিমাইচাঁদের পকেটের মধ্যে নানারূপ চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর টুন্‌টুন্-ঝুন্‌ঝুন্ রবে ধ্বনিত হইয়া ঘোষ বাড়ীর ছোট বড় কর্মচারীদের যথেষ্ট আশার সঞ্চার করিয়াছিল।

যাত্রার কিঞ্চিৎপূর্বে নিমাইচাঁদ বদ্দিনাথের দ্বারা বাড়ীর সমস্ত কর্মচারীদের ডাকাইয়া বক্‌শিস বিতরণ সুরু করিলেন। টম্যাটো দেবী পাঁচ টাকা, সরকার মশাই চার টাকা, জমাদার তিন টাকা, দুজন রসুয়ে ব্রাহ্মণ দুইটাকা হিসাবে চার টাকা, বাকী ঝি-চাকর সাতজনকে এক টাকা হিসাবে সাত টাকা দিলেন। তাহারা সকলেই হাস্যবদন—কেহ নমস্কার, কেহ সেলাম, কেহ দণ্ডবৎ করিয়া জামাই বাবুকে আশীর্বাদ করিল।

এইরূপে দাতাকর্ণ নিমাইচাঁদ রোহিণী দালালের ত্রিশ টাকার মধ্যে তেইশ টাকা বিতরণ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি-সঞ্চয় করিলেন এবং ভোলানাথ বাবুকে রীতিমত আপ্যায়িত করিয়া বিদায় লইয়া বাবা বদ্দিনাথ সহ ট্যাক্সিতে যাইয়া বসিলেন। ভোলানাথ বাবুর নির্দেশ মত সরকার মশাই বদ্দিনাথের হাতে ট্যাক্সি ভাড়ার দুইটি টাকা দিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

(৮)

জলযোগের পর নিকুঞ্জ বাবু একখানা অমৃত বাজার পত্রিকা লইয়া বিশ্রামের জন্য মনুমেণ্টের ধারে গিয়া বসিলেন। নানারূপ চিন্তার ভিতর দিয়া মনঃস্থির ও মাথা ঠাণ্ডা করিতে রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। নিকুঞ্জ বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু জীবনের পরামর্শে একবার শেষ চেষ্টার জন্য শ্যামবাজারের বাস-যোগে পুনরায় শ্বশুরালয়ের দ্বারে উপস্থিত হইলেন !

আধপোয়াটাক ভাঙ্গ গিলিয়া তাহার উপর খৈনী চড়াইয়া কোল্যাপসিব্‌ল্ গেট ভিতর হইতে তালাবদ্ধ করিয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া মৌজ করিতেছিল। জীবন বাহিরে দাঁড়াইয়া হাঁক দিল—"জমাদারজী! ওগো জমাদারজী—"

জমা—"আরে কোন্ হ্যায় রে! দিনভর জামাই বাবুকা ঝামেলামে শ্বাস ছোড়্‌নেকা ফুরসৎ নেহি মিলা! রাত দশবাজনে যাতা হ্যায় আবিভি জমাদারজী।"

জীব—"কি বসে বসে সাপের মন্তর ঝাড়্‌ছ, ফটক খোল না।"

"আরে তোম কোন্ হ্যায়! যাও ঝুটমুট দিক্ মাত কর।" মনিব ভৃত্য উভয়েরই লজ্জায় মাথা হেঁট।

কি বলিয়া এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় এই রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সামান্য একটা কুড়ি টাকা বেতনের দ্বারবানের নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া জামাই বাবু বলিয়া পরিচয় দিবে। জীবন বলিল—"বাবু বাহারমে খাড়া থাক্‌তা হায়—দরজা খোল ভিতরমে যাগা।"

"আরে কোন বাবু আছে রে! হামরা বাবুকা একটো হাপিস দিনভরমে একশ কেলানী দরখাস্ত লেকে তেল লাগানে আতা হ্যায়—আরে ভাইএ লোক্‌কা সরম্ ভি কুছ্ নেহি। রাত বারা বাজে আয়া নোক্‌রি লাগানে।"

জামাইবাবু একটু রাগতস্বরে বলিলেন,—"এই জমাদার জল্‌দি ফটক খোল!"

জমা—"আরে দেখে দেখে তোমারা স্বরত্—এসা গরম কেলানীকা স্বরত্ ভি জবর হোগা।"

জমাদার সাহেব উঠিয়া অনেক চেষ্টার পর চক্ষু খুলিয়া দেখিল; সারাদিনের ক্লান্ত রুক্ষকেশ শুষ্কবদন নিকুঞ্জ-বিহারী কাগজ হাতে দাঁড়াইয়া আছে। বলিল—"আয়ে বারে বাবু! আয়াতো নোক্‌রীকা উমেদারী করনে—হাতজোড়কে বাত বোলেগা, বক্‌শিস্ আমরা দেগা—এত্তা গরম!"

নিকু—"তোম্‌তো আচ্ছা বেয়াকুব হায়!"

দর—"আপ্‌সে কুছ্ কম্‌তি বাবুজী! হামরা জিন্‌গি ভরমে নোক্‌রীকা বাস্তে কৈলানী লোক্‌কা এসা রাত বারা বাজে দরজা দরজা হাত জোড়্‌কে নৈহি ঘুমা হ্যায়।"

জীব—"ছিঃ ছিঃ! কি বিপদেই পড়া গেল—ওগো জমাদারজী! বাবু কেরাণী নয় দরজা খুল্লেই বুঝ্‌তে পারবে।"

দর—"আরে হামকো ঠক্‌লানা তোম্‌সে না হই! হুরমিলার কোম্পিনীমে রহা। হাতমে দরখাস্ত লেকে কেলানী দেখ্‌তে দেখ্‌তে হাম্ বুড়া হো গিয়া।"

জামাইবাবু রাগিয়া হাতের খবরের কাগজখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"দরখাস্ত না তোমারা শির! ভিতর কোন্ হ্যায় জল্‌দি বোলাও বোলাও কেয়া কহেগা।"

দর—"কেয়া কহেগা—বড়ালাট আয়া নেহি ছোট লাট।"

নিকু—"তোমরা নোকরী হাম্ জরুর খায়েগা।"

দর—"ঠিক্ বাত্ বাবু! এই বাজারমে কেলানীগিরী আউর না চলি। হামারি তক্তামে বৈঠ্ যাও ইজ্জতভি মিলেগা তোমরা এসা হাজারো কেলানি আয়কে হাত জোড়েগা।"

নিকু—"কর্তা বাবু, রতন বাবু গিন্নীমা কোইভি নেহি আয়া?" যে ব্যক্তি রতনবাবু গিন্নীমার খবর লইতেছে সে অবশ্য বাবুর কোন আত্মীয় হইবে। জমাদার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"কোই বাবু তো আভি আয়া নেহি—ভোলাবাবুভি ঘর চলা গিয়া। টম্যাটো দেবী হ্যায়।"

জামাই বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"হ্যায় উস্‌কো বোলাও।"

দ্বারবান ফটক খুলিল না—ভিতরে গিয়া টম্যাটো দেবীকে ডাকিয়া আনিল। টম্যাটো চশমার ভিতর হইতে নানা ভঙ্গীতে জামাই বাবুকে দেখিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না।

জীবন বলিল,—"নাকের উপর পরকলা আঁটা কাণা দিদিমণি যে গো! দেখ উনি আবার কি আইন পাশ করেন।"

টম্যাটো জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে?"

"উপস্থিত অনুগ্রহ করে ফটকটা খুলে দিলে বিশেষ বাধিত হব।"

"আপনি বাধিত হতি পারেন কিন্তু আমাগোর একটা রেস্‌পন্‌সিবিলিটি আছে। নেগ্‌লিজেন্স অফ্ ডিউটিতে জমাদার বরখাস্ত হতি পারে! অনুমান করি, আপনি সুদূর পল্লীবাসী কলিকাতার উপস্থিত হাল চাইল অবগত নহেন। ইহানে চুরিচামারী, মোটর ডাকাইতি হরদম চল্‌তিছে। এত রাত্রের সময় অপরিচিতেরে বাড়ীর মধ্যি প্রবেশ কর্‌তি দিতি পারি না।"

জীবন উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"শোন তোমাদের মনিবের জামাইবাবু অনেকক্ষণ পথে দাঁড়িয়ে আছেন, ভাল চাও ত দরজা খুলে দাও।"

"আরে জামাইবাবু! ইযে দেহি ষষ্ঠীবাটার মুরস্থমে জামাইবাবুগোর হুড়াহুড়ি লাগ্‌ছে হাঃ—হাঃ হাঃ।"

টম্যাটোকে হাসিতে দেখিয়া সিদ্ধিখোর জমাদার বিকট কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল—"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।"

টম্যাটো কহিল,—"জাল উইল, শুন্‌ছি—জাল দলিল শুন্‌ছি ইসে ষষ্ঠীবাটার মুরস্থমে জাল জামাইবাবুও চাক্ষুষ কর্‌লাম্। হাঃ হাঃ হাঃ।" জমাদারও সেই হাসির প্রতিধ্বনি তুলিল—"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।" এই তীব্র পরিহাসজনক হাস্যধ্বনি নিকুঞ্জের অসহ্য বোধ হইল। তিনি একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মনে মনে বলিলেন,—"কেবল ভদ্র সন্তান বলে নয়—ষষ্ঠীবাটার নিমন্ত্রিত নূতন জামায়ের শ্বশুরবাড়ীর দরজায় এ অপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনা আর কিছু হতে পারে না। ওঃ ইচ্ছা হচ্ছে শ্বশুরবাড়ীর দরজায় ধুলাথি দিয়ে জন্মের মত সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে চলে যাই।"

জীবন পুরাতন চাকর; দাদাবাবুর আরক্ত মুখের উপর সজল চক্ষু দুইটি দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া বাস ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। এমন সময় পরেশবাবুর মোটর আসিয়া ফুটপাতের ধারে লাগিল। তিনি নামিয়া সম্মুখে নিকুঞ্জকে এই অবস্থায় দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"একি! বাবাজী তুমি এখনও এখানে—এত শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌ছি কেন!" এই বলিয়া জামাতার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। জীবন নত হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল,—"কি আর বলব বাবু! বেলা দশটা থেকে এখনও পর্যন্ত দাদাবাবু আপনার বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌তে পারলেন না।"

পরেশ—"কেন—কেন কি হয়েছে?"

জীব—"সারাদিন মাথায় তেল-জল নেই, পেটে অন্ন নেই, কেবল শ্যামবাজার—বালীগঞ্জ—কালীঘাট—ভবানী-পুর—কেল্লার মাঠ করে বেড়িয়েছেন।"

পরে—"বল কি হে! আমি যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোন করেছি ভোলানাথ—টম্যাটো দেবী বলেছে,—এই জামাই-বাবুর চা খাওয়া হোল—এই জামাইবাবু ভাতে বসেছেন—এই বৈকালের জল খাওয়া হল—"

জীব—"বলেন কি বাবু!"

পরে—"এই আধঘণ্টা পূর্বে বলেছে জামাইবাবুর রাত্রের আহার হয়ে গেল তিনি বাড়ী যাচ্ছেন।"

জীব—"তা হলে তামাসা মন্দ নয় বাবু! ছিঃ ছিঃ এমন কুযাত্রা ঘট্‌বে জান্‌লে কর্তাবাবু ওঁকে কিছুতেই আস্‌তে দিতেন না।"

পরে—"কি সর্বনাশ! কে যে কি বলে বোঝবার জো-নেই, নিকুঞ্জ তুমিও না একবার ফোন্ ধরেছিলে—একি ম্যাজিক নাকি!"

এই বলিয়া তিনি জামাতার হাতখানি আরো চাপিয়া ধরিলেন। ঠিক্ সেই সময় রোহিণী দালাল কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া একবার পরেশবাবুর একবার জামাইবাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—"ইসে পরেশবাবু—ইসে আমাগোর সর্বনাশ হইতেছে ইসে আপনাগোর ইসে ছাই আমাগোর রইক্ষা করেন, ইসে জামাইবাবু—ইসে অনুমান করি হুজুর গরিবের সাথে তামাসা করছেন—ইসে পরেশবাবু এ অধীন আপনাগোর চাকর-বাকর সামিল, ইসে জামাইবাবু আমি আপনাগোর জুতা বরাবর মানুষ—ইসে আমারে রইক্ষা করেন।"

কি বিপদ! একে জামাতার দুরবস্থা দর্শনে পরেশ-বাবুর মাথা ঘুরিতেছিল। আবার এ কি আপদ্! রোহিণী পাগল হইল নাকি। তিনি আর কাহাকেও কোন কথা

ঐ বলিয়া দুই হস্তে দুই জনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

এদিকে টম্যাটো দেবী ও জমাদার ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ফটক খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা নিশ্চল-নিস্পন্দ-নির্বাক্। শুষ্ক কণ্ঠে সাড়াশব্দ নাই। তাহারা বেশ স্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, যাহাকে তাহারা উমেদার কেরাণী বোধে নানারূপ বিদ্রূপ বাক্যে অপদস্থ করিয়াছে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মনিবের কোন পরম আত্মীয় হইবে।

(৯)

রাত্রি তখন দশটা। শ্যামপুকুরে বাসাবাড়ীতে গোড়ের মালা গলায় জামাইরূপ নিমাইচাঁদ আপন বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া একখানি চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়া আছেন। পদতলে বাবা বদ্দিনাথ। বন্ধুরা বদ্দিনাথের মুখে অদ্যকার লুণ্ঠনষষ্ঠীর বিজয়াবহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলে সমস্বরে তিনবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "থ্রী চিয়ার্স ফর্ জামাতারূপী দিগ্বীজয়ী নিমাই-চাঁদ।"

সুরেশবাবু বলিলেন,—"সারাদিন শ্বশুরবাড়ীর রাজ-ভোগে ব্যস্ত রইলে! আমি দুবার এসে ফিরে গেলাম। আজ যে তোমার ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব স্কুলের চাঁদাটা দেবার কথা ছিল। তোমার জন্যে আমার টাকাটাও জমা দেওয়া হল না।"

নিমা—"মাপ কর ভাই! একটা নূতন খেয়ালে পড়ে খেয়াল হারিয়ে ফেলেছিলুম্। বোদে! দুটো টাকা বার করে দে!"

বদ্দিনাথ তখুনি ট্রাঙ্ক খুলিয়া দুইটি টাকা বাহির করিয়া সুরেশবাবুকে দিল। নিমাইচাঁদ আপনার ট্যাক হইতে সাতটি টাকা বাহির করিয়া বলিলেন,—"দেখো এই পাঁচটা টাকা * * * নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের বাবু পরেশচন্দ্র ঘোষের নামে ডোনেশন বলে জমা দেবে। বলে দিও তাঁরা যেন এই ডোনেসনের উল্লেখ করে তাঁকে মান্থলি সাবস্‌ক্রাইবার হবার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু তাঁদের বেশ করে সাবধান করে দিও এর মধ্যে যেন তোমার আমার নামের গন্ধমাত্র না থাকে। আর তুমি নিজে হাতে এই ছটাকার সন্দেশ কিনে নিয়ে পরেশবাবুর নাম করেই ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করবে।" এই বলিয়া তাঁহার হাতে সাতটি টাকা দিলেন।

বন্ধুরা সকলে গোলযোগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সর্বনাশ করলে! নিজের বেলায় শ্বশুরবাড়ী সাত-সাঙ্গে উনপঞ্চাশবার দেবসেবা নিয়ে এলেন আর আমরা এতগুলা লোক সতৃষ্ণনয়নে ঐ বক্রী সাতটি টাকার দিকে চেয়ে বসে আছি একটা ফিষ্ট লাগাব বলে আর দাতা কুম্ভকর্ণ নিদ্রাঘোরে বন্ধুদের চিন্‌তেই পারলেন না।"

নিমা—"বন্ধু চেনা বড় শক্ত দাদা! চিন্‌তে একটু সময় লাগে—"

নীলকান্ত—"কত সময় চাই আজ্ঞে করুন।"

নিমা—"চাণক্য পণ্ডিতের মতে মানুষ যখন চারপাই চড়ে শ্মশান যাত্রা করেন সেইটাই তার বন্ধু চেন্‌বার যথাযথ সময়।"

নীলকান্ত—"নিজের বেলা হাতে পাঁজি মঙ্গলবার আর আমরা থাব পরলোকে বসে—"

নিমা—"দেখ নীলে—আমোদ করে এসেছি লোভের ধার ধারি না। ভোলা বোস বহু বহু মণিকাঞ্চনের প্রলোভনে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু নিমাইচাঁদ ফাঁদে পদার্পণ করতে শিক্ষা লাভ করেন নাই, তবে রোহিণী দালালের অহঙ্কারটা অসহ্য বোধ হয়েছিল বলে তাকে এক হাত নিয়েছি যদিও সে মারা যাবে না শ্বশুর মশাই কেবল বড়লোক নন শুনেছি তাঁর রসবোধও যথেষ্ট আছে। আজকের সারাদিনের নিমাইলীলা শুনে সুরসিক বলে আমার তারিফ্ করতে বাধ্য হবেন। আর এই ব্যাপারে তাঁর যে টাকাটা খরচ হয়েছে সেটা নেহাৎ অপব্যয় হল বলে দুঃখ করবেন না।"

নীল—"তা ত সব বুঝলুম্; কিন্তু 'মুই ভুখা হুঁ' তার কি করছ বল।"

নিমা—"খাবি তার জন্য কি হয়েছে। বোদে শীঘ্র দশটা টাকা বার করে এদের সাম্‌নে রাখ।"

বদ্দিনাথ পুনরায় ট্রাঙ্ক খুলিয়া একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে রাখিল। বন্ধুরা

সানন্দে পুনরায় তিনবার "থ্রী চিয়ার্স ফর জামাইরূপী নিমাইচাঁদ" বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। বদ্দিনাথ করজোড়ে কহিলেন—"গুরুর কৃপায় এমন ষষ্ঠীবাটাটা যদি নিত্যি নিত্যি হত—"

নিমা—"বৎস! পূর্বেই বলেছি তুমি যে গুরুর শিষ্য তিনি সদানন্দময়। লোভ আর অভাব বলে কোন বস্তু তাঁর ঝুলির মধ্যে নেই। লোভে পাপ আছে—অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। তিনি অকৃতদার অথচ সংসারী—তিনি রোজকারী কিন্তু নিরহঙ্কারী—তিনি ভোগী অথচ নির্লোভ। তার শিষ্য হতে গেলে তাঁর এই মূল্যবান তত্ত্বার্থপূর্ণ বচন স্মরণ রাখতে হবে—

কব্ ভি ঘিউ ঘানা, কব্ ভি মুঠ্ ঠিভর চানা,
যব ওভি নেহি মিলে, তব ঘুট পানি পি-লেনা।
বৎস! উপযুক্ত শিষ্য গুরুর অর্ধাংশ বিশেষ।
যেমন—আমি দধি তুমি ঘোল
আমি মৎস্য তুমি ঝোল।"

বদ্দি—"তুমি নদের নিমাই! হরি-হরিবোল—হরি-হরিবোল।"

"সাধুরঞ্জন সংহিতা আদিশূর-বল্লাল উপাখ্যান"

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

এই গ্রন্থখানি হুগলি ঘুটিয়াবাজার নিবাসী স্থবর্ণবণিক্-কুলোদ্ভব মধুসূদন মল্লিক কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ১২৯৬ সালে (১৮৮৯-১৮৯০ খৃঃ) ইহা বাহির হয়। ৩৭৭নং আপার চিৎপুর রোডস্থ (জোড়াসাঁকো) আর্ট ইউনিয়ন প্রেসে শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত। গ্রন্থখানির মূল্য চারি আনা মাত্র।

পুস্তকখানি ৫৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থের প্রারম্ভে "গীত-বন্দনা" অধ্যায়ে গ্রন্থকারের স্বরচিত চারিখানি গান রাগরাগিণী সহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে সমগ্র গ্রন্থখানি রচিত।

গান চারখানি পাঠ করিয়া মনে হয়, গ্রন্থকার একজন ভক্ত। একখানি গান এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"রাগিণী পিলু
হরি নিত্যানন্দ শিবানন্দ চিদানন্দময়।
জগত ব্রহ্মাণ্ড অন্তে মার্তণ্ড উদয়॥
হরি সর্ব সাক্ষ্য জ্ঞান অক্ষ বিশুদ্ধ চিন্ময়।
হরি সর্ব জীবে আবির্ভাব বেদান্তে নির্ণয়॥
সর্বাত্মা জীবাত্মা রূপে দেহীর দেহে রয়।
হরি বাসুদেব বিশ্বম্ভর বারিতে আশ্রয়॥
সৃষ্টি স্থিতি সৃষ্টিনাশ পলকে প্রলয়।
সর্ব সঙ্গ এক অঙ্গ কল্পাগ্নি সময়॥
জীবশক্তি মায়াশক্তি চিৎশক্তি চৈতন্য।
জীবে শিবে সম ভাব যদি মায়া ভিন্ন॥
হরি নির্বিকার নিরাকার নিত্য নিরঞ্জন।
ইচ্ছা হলে করেন হরি সংসার সৃজন॥
দয়াময় দয়া করে মায়া কর ক্ষয়।
সূদনের এই ভিক্ষা হওহে সদয়॥"

আনন্দ ভট্ট বিরচিত "বল্লাল-চরিত" অবলম্বন করিয়া মধুসূদন বাবু এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি স্থান পাইয়াছে ঃ—

১। উৎসর্গ পত্র
২। সনকের স্বদেশ ত্যাগ ও বঙ্গে আগমন
৩। রাজবাটী প্রবেশ ও পরিচয়
৪। রাজাকে উপঢৌকন প্রদান ও সুবর্ণবণিক্ উপাধি এবং স্বর্ণগ্রাম জায়গীর প্রাপ্তি
৫। কুঠি নির্মাণ
৬। আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ
৭। যজ্ঞ আরম্ভ

৮। বল্লাল উপাখ্যান

৯। লক্ষ্মণ সেন

১০। মণিপুর যুদ্ধ

১১। বল্লাল সেনের ডোমকী হরণ

১২। ডোমের উৎপাত

১৩। ডোমনী

১৪। অভিনয়—ডোমনীর প্রবেশ

১৫। ডোমের প্রবেশ

১৬। নাচ

১৭। গীত

১৮। মহারাজার প্রবেশ

১৯। বল্লাল সেনের প্রায়শ্চিত্ত ও যজ্ঞ

২০। নাট্যশালা—অভিনয়

২১। উপসংহার

উৎসর্গ-পত্রে গ্রন্থকার মধুসূদন মল্লিক মহাশয় নিজের ও নিজ গোষ্ঠীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আবশ্যক বোধে আমরা নিম্নে ইহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"মহামতি গোষ্ঠীপতি বাস গঙ্গাতীরে।
ধর্মে রতি কর্মে প্রীতি হুগলি নগরে॥
বিষ্ণুসেবা রাত্রিদিবা হরিনাম জপ।
হরিভক্ত প্রেমাসক্ত হরিকথা তপ॥
বহু গোষ্ঠী দীর্ঘ দৃষ্টি সর্বদা বিনয়।
মিষ্টভাষী গুণরাশি সরল হৃদয়॥
নিত্য মান করে দান বণিক্‌সকল।
গোষ্ঠীপতি এই খ্যাতি মর্যাদা সম্বল॥
সেই অংশে এই বংশে আমি অকিঞ্চন।
ভজনিক দে মল্লিক শ্রীমধুসূদন॥
সদাচারী আজ্ঞাকারী পণ্ডিত চরণে।
জ্ঞানহীন বুদ্ধি ক্ষীণ ক্ষমা কর দীনে॥
পতিরাজ দেবরাজ কর্জনাতে বাস।
আদি পুরুষ সে মানুষ আমি তাঁর দাস॥
বৈশ্য জাতি কৃষ্ণগতি বেদ বিধি মানে।
আর্য অংশে অবতংস সর্বদা ভজনে॥
ধন্য মান্য অগ্রগণ্য দেবপতি-রাজ।
অদ্যাবধি এ অবধি মানিছে সমাজ॥
রাঢ়ে বঙ্গে কত শত তোমারি সন্তান।
হাজার হাজার পুত্র নাহি পরিমাণ॥
সহস্রেক বর্ষ গত তব কুলের সূত্র।
এ পর্যন্ত ভোগ করে যত তব পুত্র॥
পরিণামে সপ্তগ্রামে মল্লিকসকল।
রাঢ় ধারে বাস করে যতেক মণ্ডল॥
মানযুক্ত কৃষ্ণভক্ত তোমার পুণ্যেতে।
আশীর্বাদ করি সবি নিবেদি পদেতে॥"

পৃঃ—১-২

ইহার পরে গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

"বৈশ্য-কুলোদ্ভব কুশল আঢ্য সে বণিক্।
হীরামুক্তা প্রবালাদি প্রচুর মাণিক॥
রজত কাঞ্চনের কথা নাহি পরিমাণ।
কুলের তুল্য ধনাগার বণিক্-প্রধান॥
অযোধ্যা দেশেতে আছে রামগড় স্থান।
সেই স্থানে বাস করেন উক্ত মতিমান॥" পৃঃ ৩

এই কুশল আঢ্যের পুত্র সনক আঢ্য। বৌদ্ধ-বিপ্লবে কাতর হইয়া ইনি দেশত্যাগ করেন। ছয়চল্লিশ জন বণিক্, গুরু-পুরোহিত, বন্ধুবর্গ ও দাসদাসী লইয়া ইনি বাংলা দেশে আগমন করিলেন। রাজার মত বৈভব ও বহু ধনসম্পত্তি লইয়া ইনি দেশত্যাগ করিলেন :—

"সঙ্গে পরিবার সবার আর দাসদাসী।
পদাতিক আশোয়ার অযোধ্যানিবাসী॥
ধনরাশি আনিতেছে শত শত গাড়ী।
তাম্বু কাণাৎ বহিতেছে কত শত করী॥" পৃঃ ৩

বঙ্গে আগমনের পূর্বে ইনি নানা তীর্থ-ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গোকুল, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, বারাণসী, গয়া, প্রভৃতি স্থান দর্শন এবং ঐ সকল স্থানে তিনি নানা দেবতার পূজা, দানধ্যানাদি কার্য্য সমাপন করিলেন। তারপর—

"উতরিল পূর্ববঙ্গে ধন অধিকারী।
সনক কনক দাতা বৈশ্য শুদ্ধাচারী॥"

পৃঃ ৪

পূর্ববঙ্গের রাজধানী তখন বিক্রমপুরে এবং তাহার রাজা আদিশূর। আসিয়াই তিনি পাত্রমিত্র ও স্বগণ সহিত রাজবাটিতে গমন করিলেন। রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে—

"রাজা বলে কেবা তুমি, পরিচয় চাহি আমি,
কোথা বাস, কি নাম তোমার।
কি কারণে এলে হেতা, কহ মোরে সত্য কথা,
কিবা জাতি তনয় কাহার ॥"

পৃঃ ৫

ইহার উত্তরে—

"সনক কহিছে সার, শুন রায় সমাচার,
কহি আমি যথার্থ কাহিনী।
অযোধ্যাতে বাস মম, পিতা কুশল উত্তম,
বৈশ্য জাতি গুণে গুণমণি ॥
সনক আমার নাম, শুন নৃপ গুণধাম,
ছাড়িয়াছি অযোধ্যা নগর।
সর্বজাতি ধর্মভ্রষ্ট, অযোধ্যাতে পাই কষ্ট,
সর্ব লোক বৌদ্ধ ব্যবহার ॥
তাই আমি এই দেশে, শুন রায় সবিশেষে,
বাণিজ্য করিব এই স্থানে।
বণিক্ সকল আসে, দাঁড়াইয়া মম পাশে,
সকল ইহারা গুণ জানে ॥
তুমি রাজা ধর্মপুত্র, শুনিয়াছি এই সূত্র,
বঙ্গে নাহি অধর্ম আচার।
নৃপতি তোমার যশ, পূরিয়াছে দিক্ দশ,
শুনিলাম সুসূক্ষ্ম বিচার ॥
তাই লই তবাশ্রয়, ভাবিয়াছি এ নিশ্চয়,
পদাশ্রয় দাও দয়া করে।
আমি যে হইব ধন্য, তুমি জগতের মান্য,
রাজরাজেশ্বর বিক্রমপুরে ॥"

পৃঃ ৫-৬

তারপর সনক আঢ্য রাজাকে হীরা মাণিক প্রভৃতি নানা মূল্যবান্ উপঢৌকন দিলেন। এই উপঢৌকন পাইয়া রাজা বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের তটে বাসের ও কারবারের জন্য সনক আঢ্যকে সুন্দর ভূমি দান করিলেন। সুবিজ্ঞ রাজা বুঝিলেন, যদি সনক তাঁহার রাজধানীতে বাস করিয়া বাণিজ্য চালায়, তবে তাঁহার নিজের ও রাজ্যের অনেক উপকার হইবে। তাই তিনি যে স্থান সনককে বাস ও কুঠি নির্মাণের জন্য দিলেন, সেই স্থানের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"সেখানে অনেক বেণে ব্রহ্মদেশ হতে।
রজত কাঞ্চন আনে ব্যাপার করিতে ॥
চীন দেশ হইতে আসে বড় সওদাগর।
হিরণ্য রজত আনে শুনেছি বিস্তর ॥
সেই স্থান যোগ্য বটে মহাজনের তরে।
কুঠি কোঠা কর তথা যাহা মনে ধরে ॥
তুমি এইখানে থাক ইহা করি আশা।
তোমার সাহায্য চাহি আমার ভরসা ॥"

পৃঃ ৬

তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞ,—বাংলাদেশে তোমার মত লোক দেখি নাই। তুমি আমার 'সৎসখা'; আর মনে রাখিয়ো আমার এ রাজদরবার তোমারই। রাজার মেলানি পাইয়া সনক রাজ-দত্ত ভূমিখণ্ডে বাসোপযোগী গৃহ ও কুঠি নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ছত্রিশটি বাড়ী, তাহার চতুর্দিকে প্রাচীর ও গড়খাই নির্মাণ করাইলেন। এই নব-নির্মিত নগরের খুব প্রচার হইল। বহু দোকানপশারী ও লোকজন আসিয়া সনকের এই নগরে বাস করিতে লাগিল। ইহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"মাঠে ঘাটে হইল এই প্রকৃত সহর।
বিক্রম অপেক্ষা এই উত্তম নগর ॥
দোকানী পশারী আসি ভরিল এই স্থান।
কারবারে সীমা নাই হস্তিনা সমান ॥
চীন মগ ভোট আর যত সব বেণে।
রজত কাঞ্চন তারা সকলেতে কেনে ॥" পৃঃ ৭

এই সমস্ত অবলোকন করিয়া রাজা অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি সনক ও তাঁহার স্বজাতির 'সুবর্ণবণিক্'

নামকরণ করিলেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম দিলেন—"স্বর্ণগ্রাম"। তাম্রফলকে এই নামকরণ তিনি উৎকীর্ণ করিয়া সনককে স্বর্ণগ্রাম জায়গীর-স্বরূপ উপহার দিলেন।

"রাজার দরবারে ইহা হইল পোষণ ॥
আনন্দ ভট্টের লিপি তাহার প্রমাণ।
তাম্রফলক বণিক্ হস্তে নাহি বিদ্যমান ॥"

পৃঃ ৭

খুব খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সহিত স্বর্ণগ্রামে সনক গ্রাম-অধিপতির ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। লোক মধ্যেও তিনি ক্রমে জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। বিক্রমও তাঁহার যথেষ্ট বাড়িয়া গেল, কেন না তিনি—

"আদিশূরের প্রিয়সখা মন্ত্রী শুদ্ধমতি ॥"

নিজের বিষয়কর্ম্ম ও ব্যবসা চালাইয়া—

"কখন কখন তিনি রাজ-সভায় যান।
আদিশূর মহারাজা করেন সম্মান ॥"

পৃঃ ৭

ক্রমশঃ

মনোমেধ-যজ্ঞ

শ্রীগৌরভূষণ দে

(যবে) স্বরগের আমি মরতে আসিনু হাসিনু বিমল হাসি।
জ্ঞানের মুকুট পরাল শীর্ষে অচিন সে যুবা আসি' ॥
কাঁপিল আমার সকল শরীর ধরমের রাজা হ'য়ে।
ছুটিল শোণিত শিরায় শিরায় ভাবের প্রবাহ ল'য়ে ॥
মায়া-মমতার আলোক আঁধারে আপনার জনে বরি'।
দাম্ভিকতার জয়-লিপি দিনু মনে হয় শিরোপরি ॥
বিজয়োল্লাসে ঘোষণা করিনু শকতি আছে গো যার।
রাখুক ধরিয়া মন-হয় মোর দিয়া শৃঙ্খল-ভার ॥
আপনার মনে ছুটে যায় হয় নব নব কত দেশে।
রোধিতে পারে না কেহ তার গতি ঘরে ফেরে অবশেষে ॥
তাও কি কখন হয় এ জগতে তাও কি কখন হয়?
জয়-পরাজয় বিধাতার রীতি—অলীক স্বপন নয়!
জড় প্রকৃতির বাসনার ফাঁসে সুখে তারে বাঁধে লোভ।
শিরে রাজ-রোষ তবু আপ্ শোষ, তবুও বেদনা, ক্ষোভ ॥
আমার মরমে পশিল সে বাণী, ধৈর্য-সেনানী সনে।
বাজী জিনিবারে চলিলাম স্তবে সাজিয়া সাধন-রণে ॥
গভীর নিনাদে প্রকাশি বীর্য আপন শকতি-বলে।
ধৈর্য সেনানী সাধন-সমরে বাজী জিনে মহীতলে ॥
আকাশে বাতাসে মিশে গেল এই আশার বিজয়-বাণী।
আপনা হারায়ে রাজা চ'লে যান মনের গরব মানি' ॥
সসীম হইতে অসীম অবধি ভ্রমিয়া আসিলে হয়।
নহবতে বাজে করুণ সাহানা দশ দিশি ঘোষে জয় ॥
একটি বরষ হ'ল অবসান এ ভাব-প্রবাহে আজ।
যজ্ঞের হোতা বিবেক প্রধান ধীরে ক'ন সাজ, সাজ ॥
বাজিল শঙ্খ কাসর ঘণ্টা স্ফুরিল অনিলে মন্ত্র।
অসীম পুলকে ঝঙ্কারে ঐ হৃদয়ের মহাযন্ত্র ॥
চন্দন ধূপ উশীর গন্ধে মাতিয়া উঠিল প্রাণ।
ছন্দ-মুখর কবির চিত্ত গাহিল সাম্য গান ॥
হোম শেষে হ'ল হয়-বলিদান আহুতি দিলেন হোতা।
স্থূল কারণের ঘুচে গেল ভেদ সূক্ষ্ম হ'লেন শ্রোতা ॥
যাগ শেষে আসি' সার্বভৌম ঋত্বিকে তুষি' দানে।
জগতে অতুল নিষ্কাম প্রেম ঢালিল সবার প্রাণে ॥
সে ক্ষণে টলিল স্বরগ-আসন কাঁপিল রমার প্রাণ।
অমিয় বচনে কহিলেন ধীরে,—"একি হ'ল ভগবান্?"
হাসিলেন তিনি, কহিলেন তাঁরে, "আমার প্রিয় সে আমি।
(আজি) যজ্ঞের ফলে ভক্তি-রাজ্যের সার্বভৌম স্বামী ॥

(তারে), নন্দন বায়ে করিবে ব্যজন পারিজাত দিবে হার।
হেনা, বেলা, যুথী বিলাবে সুবাস, গোলাপ শুধিবে ধার॥
হীরা-মাণিকের জ্যোতিতে রঙ্গিন সুর-বেদী সভাতলে।
নাচিবে গাহিবে অপ্সরী সবে তুষি' তারে প্রিয় ব'লে॥
কুসুমে-সাজান প্রেম-চিত্রিত জীবনের মহারথ।
(আজি), গোলক হইতে ভূতলে নামিয়া
দেখাবে মুক্তি পথ"॥

সহসা ধ্বনিল আকাশে সে বাণী,—"ওহে রাজ অধিরাজ,
মিলনের দেশে মুক্তি লভিতে ত্বরা করি এস আজ"॥
সে মহান্ রথ নামিল তখনি আরোহিয়া তায় আমি।
চলিলাম হেসে সে মিলন-দেশে সহ মোর প্রিয় স্বামী॥
কোকিল গাহিয়া পাপিয়া হাসিয়া জানাল কতনা সুখ।
স্বপন-আলোক-মাখান জগতে রয়ে গেল স্মৃতিটুক্॥

স্বর্গীয় কানাইলাল চন্দ্র

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

"শ্রীশ্রী৺ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির অপ্রাকৃতত্ব স্থাপনা" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে কানাইলাল চন্দ্র মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই ভাগের নাম—"রাসলীলা বিহার সম্বন্ধীয়।" শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ভগবান্ যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই রাসলীলাই শ্রেষ্ঠলীলা কিন্তু সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য।

ভগবানের মহিমা ও মাধুর্য প্রকটিত হয়—এই লীলার মধ্য দিয়াই। সাধারণ জীব এই লীলার মধ্যেই তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারে। তাই লীলামুগ্ধ ভক্তেরা, তাঁহার ষড়ৈশ্বর্যময় মূর্তি না দেখিয়া, তাঁহাকে 'লীলাময় বিগ্রহ' রূপে দর্শন করেন। গোলোকের ঠাকুর নরলোকে আসিয়া তাঁহার সৃষ্ট নর ও পশুপক্ষীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া যে লীলা করেন, সেই লীলাই স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেয়—জীব তাঁহার কত আপনার। তাঁহার সহিত জীবের যে একটা মধুর ও নিকট সম্পর্ক আছে, তাহা এই লীলার মধ্যেই মূর্ত হইয়া উঠে। ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র না হইলে, এই লীলা কেহ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। তাই গোপবালকগণের সহিত তাঁহার গোষ্ঠলীলা দর্শন করিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাকৃত দেহ অবলম্বন করিয়া, সেই অপ্রাকৃত দেহী লীলার মধ্যে আপনাকে সহস্রদলে বিকশিত করিয়া তুলেন। ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ তাহার যথার্থ রস ও মাধুর্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না।

আলোচনার প্রারম্ভে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ভগবানের আবির্ভাব যদিও লীলাবশতঃ তত্রাচ অপ্রাকৃত। যদিও সগুণ কেন না লীলা হেতু রূপধারণ, কিন্তু প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে। মাংস, মূত্র, পুরীষ ও অস্থিতে যে দেহ, তাহা এ দেহ নহে। কেবল চৈতন্যময় পদার্থ, ভক্তের মনোরঞ্জন হেতু ভগবান্ দেহী হইয়া বহুবিধ লীলা করিয়াছেন।" (পৃঃ ২০) গ্রন্থকারের মতে ইহা দ্বারা ভগবানের প্রাকৃত শরীরের কোন মতে স্থাপনা হইতে পারে না। ইহার কতকগুলি কারণ তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রথম কারণ। "আবির্ভাব-দেহ প্রাকৃত পুত্রের মত জন্ম নহে।" (পৃঃ ২০) এইখানে পাদ টীকায় গ্রন্থকার তাঁহার উক্তির সমর্থনকল্পে লিখিতেছেন—"৺ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব অতি আশ্চর্য। চতুর্ভুজ মূর্তি হইয়া উপস্থিত হইলেন, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বলয়। পরিধানে পীতবস্ত্র এবং গলদেশে বনমালা ও কৌস্তুভমণি শোভমান। কারাগারের প্রহরী সকলেই মায়ানিদ্রাতে অচেতন।" ইত্যাদি—

দ্বিতীয় কারণ—"লীলা আদি সকলি অপ্রাকৃত। সঙ্কটাশুর বধ ইত্যাদি।"

তৃতীয় কারণ—"শ্রীশ্রীরাসলীলাতে অন্তর্ধান ও আবির্ভাব অপ্রাকৃত।"

চতুর্থ কারণ—একই সময়ে একই দেহ লইয়া বিভিন্ন স্থানে অবস্থান। "রাত্রিযোগে মাতা যশোমতী দেখিতেন, তাঁহার ক্রোড়ে তাহার গোপাল নিদ্রিত আছেন; কিন্তু রাধার সহিত ও গোপীমণ্ডলীর সহিত তিনি সমস্ত রাত্রি বিহার করিতেন।" পৃঃ ২১

পঞ্চম কারণ—"প্রাকৃত হইলে তাঁহার দেহ পাঞ্চভৌতিক হইত এবং আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন শূন্য হইত না; কিন্তু যাহা অপ্রাকৃত বস্তু, কেবল ঘন চৈতন্য ও তেজোময়, তাহা এ সকলের অতীত।" ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রন্থকার বলিতেছেন—"অপ্রাকৃত দেহেতে কোন কর্ম করিতে হয় না, কিন্তু কর্মের ফল হয়। যেমন দুর্বাসার পারণে লোক দেখাইবার জন্য এক কণামাত্র খাইয়া ভগবান্ ক্ষুধা তৃপ্তি করিলেন ও ষাট হাজার ঋষিদের ক্ষুধা তৃপ্তি করাইলেন।" পৃঃ ২১

আরও অনেকগুলি কারণ গ্রন্থকার দিয়াছেন। সকল গুলিরই প্রতিপাদ্য বিষয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ অপ্রাকৃত। তিনি যোগেশ্বরেশ্বর, যে শরীর ইচ্ছা তিনি তাহাই ধারণ করিতে পারিতেন এবং যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই প্রবেশ করিতে পারিতেন। সাধারণ মানুষ বা প্রাকৃত দেহীর পক্ষে ইহা সম্ভবে না।

এক স্থানে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"এই যে জড় দেহ, ইহা আহার ব্যতীত রক্ষা পায় না; কিন্তু অপ্রাকৃত দেহ যাহা কেবল চৈতন্য ঘন মাত্র, সে দেহ রক্ষা হেতু আহারের আবশ্যক হয় না। কারণ উহার ধ্বংস নাই; তবে যে ভগবানের আহারাদি ও দেহের বাহ্যিক কার্যের বিষয় পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, তাহা সকলই ইন্দ্রজালের ন্যায়।

……যদিও তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত ও নির্গুণ, তত্রাচ দেহের কার্য সকল না হইলে, লীলা স্থাপন হয় না।" (পৃঃ ২৫) এই লীলা স্থাপনের জন্যই অনেক স্থলে, অপ্রাকৃত দেহী হইলেও প্রাকৃত দেহীর ন্যায় ভগবান্‌কে কার্য করিতে হইয়াছে।

তাঁহার রাসলীলা সম্বন্ধে একটি কথা আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের অংশ ও কণা ও রাধিকা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি। গোপিকা ও রাধার সহিত রাসে বিহার অর্থে তাঁহার নিজেরই অংশ-কণা ও শক্তির সহিত তিনি বিহার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়াদির আকাঙ্ক্ষা-বিরহিত হইয়া কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে বিহার করিয়াছেন এবং যে প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া গোপিকারা কৃষ্ণের সহিত রাসে সম্মিলিত হন, সে প্রেম কামগন্ধহীন। তাই তাঁহারা বিভূতি, বীর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ষড়ৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ কৃষ্ণের সহিত লীলা করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

গ্রন্থকার অন্য একস্থলে শ্রীমতী রাধিকাকে মহাভাবের মূর্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা উপলক্ষে তাঁহাকে একটি সুন্দর পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করিতে হইয়াছে—"একদা নারদ ভগবানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে বড় কে? তিনি জানিতেন যে ভগবান্ বারম্বার কহিয়াছেন যে সৃষ্টির মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এখানে নারদের প্রতারণা দেখ; ভগবান্ যদ্যপি আপনাকে বড় বলেন, তাহা হইলে আত্মশ্লাঘা হয়; যদ্যপি অন্য কাহাকে কহেন, তাহা হইলে মিথ্যা হয়। এখানে উভয় সঙ্কট; কিন্তু ভগবানের নিকট নারদের চাতুরী খাটিল না। তিনি কহিলেন, হে নারদ এই ব্রহ্মাণ্ডে তুমিই বড়। নারদ কহিলেন, সে কি প্রভু, আমি আপনার সম্মুখে কিরূপে বড় হইলাম বুঝিতে পারিলাম না; অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বুঝাইয়া দিন। ভগবান্ কহিলেন দেখ নারদ,, প্রথমতঃ আমি দেখিতেছি যে, সকল অপেক্ষা পৃথিবীকে বড় বলিতে

হইবেক, যে হেতু পৃথিবীর ভিতর আমরা সকলে আছি, কিন্তু পৃথিবী আবার সমুদ্রেতে বেষ্টিত। অতএব তাহা অপেক্ষা সমুদ্র বড়। সমুদ্রকে অগস্ত্য মুনি পান করিয়াছিলেন, তবে সমুদ্র হইতে অগস্ত্য বড়। ঐ অগস্ত্য আকাশমণ্ডলে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মধ্যে গণনীয়; সুতরাং অগস্ত্য অপেক্ষা আকাশ বড়। ঐ আকাশ আমার বামন অবতারে একটি পায়ের দ্বারা আমি ব্যাপ্ত করিয়াছিলাম, তবে আকাশ অপেক্ষা আমাকে বড় বলিয়া মানিতে হইবেক। কিন্তু আমি এত বড় হইয়াও তোমার হৃদয়ে অবস্থিত আছি। এই বিচারে তোমাকে আমি বড় বলিলাম।" (পৃঃ ২৮-২৯) ইহার পর গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন—"ভগবান্ ভক্তির বশ। এই ভক্তিরশ গাঢ় হইলে উহাকে প্রেম কহে, যাহা প্রেমরস অপেক্ষা গাঢ় তাহা ভাবরস। ভাবরস গাঢ় হইলে তাহাকে মহাভাব কহে। এই মহাভাবের মূর্ত্তি শ্রীরাধা। এই রসে গঠিত মূর্ত্তিতে কোন অসার পদার্থ নাই ও তাঁহার লীলা ৺ভগবানের সহিত কেবল সম্ভবে, যে হেতু তিনি সাক্ষাৎ আনন্দের মূর্ত্তি।" পৃঃ ২৯-৩০

ব্রজগোপিকাদিগের প্রকৃত কাম্য কি ছিল, তাহা ভক্ত গ্রন্থকার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"তাহারা সকলে সমর্থ অর্থাৎ কেবল কৃষ্ণ সুখে সুখী। সময়ে সময়ে কৃষ্ণ-বিরহে তাহারা জীবন্মৃত হইয়া থাকিত, তত্রাচ কৃষ্ণের সুখের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য না ঘটে তাহাদের তদ্বিষয়ে যত্ন থাকিত।......কৃষ্ণ-বিরহ তাহাদিগের সহ্য হইল না।" পৃঃ ৩১

"মহারাসে যতগুলি গোপী কৃষ্ণকেও ততগুলি মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইল। ইহার কারণ কি? গাঢ় প্রেম। এ প্রেম আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশা মিটিত না এবং গোপিকাদিগেরও আশা মিটিত না।..... শ্রীমতীর রস আস্বাদনে বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না ও ভগবানেরও রস প্রদান করিয়া আশা পূর্ণ হয় না।" (পৃঃ ৩১-৩২) শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া রাধার আশা মেটে না, আবার রাধিকাকে দেখিয়া দেখিয়াও কৃষ্ণের নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না। তাই ভক্ত মহাকবি তাঁহার অমর লেখনী-মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরাপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল।"

রাধাকৃষ্ণের এ প্রেম সুরনরবাঞ্ছিত; এমন কি "শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীও বৃন্দাবন-বিহার দেখিয়া ঐ সুখ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।" পৃঃ ৩৫

গ্রন্থকার পরিশেষে বলিতেছেন—"রাসলীলার আধ্যাত্মিক ভাব এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের পরমাত্মা, তাঁহার শক্তি কিম্বা প্রকৃতি আমাদিগের জীবাত্মা। ইহারা দুইজনে আমাদিগের অন্তরে বিরাজ করেন। পরমাত্মা জীবের সুখদুঃখের ভাগী নন; কিন্তু জীবাত্মা জীবের সুখদুঃখভাগী। যদিও জীবাত্মা পরমাত্মার শক্তি, তত্রাচ জীবের সুখদুঃখ ভোগের নিমিত্ত তিনি স্বামিছাড়া ও পরম সুখে বঞ্চিত। জীবের স্বামীতে তাঁহার স্বামিবোধ, জীবের পুত্রে তাঁহার পুত্রবোধ, জীবের সুখে তিনি আনন্দিত ও জীবের দুঃখে তিনি দুঃখিত।... জীব যদ্যপি তাঁহার জীবাত্মাকে সংযত করিয়া পরমাত্মাতে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তাহার ফলে দেখিবেন যে, মহারাসেতে যেমন মহা আনন্দের উদ্ভব হইয়াছিল, ইহাতেও তাহা হইবেক। পরমাত্মার সহিত বিহারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই অধিকার আছে। স্থূল শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ আছে, কিন্তু আত্মাতে সে ভেদাভেদ নাই।" পৃঃ ৩৯-৪০

কানাইলাল বাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থ "জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ —উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ।" এ পুস্তকখানিও ছোট। ডিমাই ১২ পেজী আকারে ত্রিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা ব্যতীত চারিপৃষ্ঠাব্যাপী একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ গ্রন্থের ও দুইটি সংস্করণ হয়। আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের একখানি পুস্তক পাইয়াছি। গ্রন্থের ভূমিকাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"ভূমিকা

জীব অনাদিকাল অবধি অদৃষ্টবশতঃ ভ্রমণ করিতেছে, এবং অশীতি লক্ষ যোনি গমনাগমন করিয়া অবশেষে মনুষ্য-

জন্ম প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য-জন্ম অতি দুর্লভ জন্ম, কারণ এ জন্ম ব্যতীত অন্য কোন নিকৃষ্ট জন্মে ভগবানকে জানিবার উপায় নাই। পশ্বাদি প্রভৃতির আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পরিতৃপ্ত হইলেই তাহারা সুখী। মনুষ্যেরও এ চারি ধর্ম আছে এবং উহাদিগের সন্তোষের নিমিত্ত বিচরণ করিতে হয় বটে, কিন্তু কেবল ঐ চারিটি যাহাদিগের লক্ষ্য তাহাদিগের মনুষ্য কহা যাইতে পারে না।

'আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥'

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এ চারি গুণ মনুষ্যতে ও পশুতেও আছে। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যে, তিনি ভগবৎ ধর্ম আচরণ করিতে পারেন। অতএব যে মনুষ্য-ধর্মবর্জিত, তাহাকে পশুর সমান গণনা করা যাইতে পারে।

দেব নারায়ণ আত্মশক্তি—মায়া দ্বারা বৃক্ষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি শরীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহার চিত্ত সন্তুষ্ট হইল না। কারণ তিনি দেখিলেন যে, এই সকল শরীরে ব্রহ্মদর্শন হইতে পারিবে না। যেমন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার পুত্রদিগের কষ্ট নিবারণের ও সুখ বৃদ্ধির জন্য ধনসঞ্চয় দ্বারা আয় বৃদ্ধি করিয়া সন্তোষ লাভ করেন, সেইরূপ অবশেষে ভগবান্ মনুষ্য শরীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহার চিত্ত সন্তুষ্ট হইল; যেহেতু এই মনুষ্য জন্ম মুক্তির দ্বার ও সেই দ্বার সর্বদা খোলা থাকিবে। কিন্তু ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তির ব্যক্তির পুত্রেরা যদ্যপি সুচরিত্র না হয়, সেই ধন কোন মতে রক্ষা হয় না, সেইরূপ জীব যদ্যপি কেবল বিষয়াসক্ত থাকেন ও ইন্দ্রিয় পুষ্টির নিমিত্ত অন্ধ হইয়া বিচরণ করেন, সেই মুক্তির দ্বার তাহার নয়নগোচর হয় না, এবং প্রতিফল এই হয় যে নিশ্চয় পুনঃ অধঃপতন। অতএব এই সংসারে মনুষ্যের সর্বপ্রকারে ধর্মানুশীলন করা উচিত; কিন্তু এই অনুশীলনের দুই পন্থা আছে, এক যোগ ও আর এক ভক্তি। প্রাচীন যোগী ঋষি ও মুনিগণ যোগের দ্বারা তাঁহাদিগের জীবন সার্থক করিয়াছেন। কিন্তু কালপ্রভাবে এক্ষণে দুইই সম্যক্‌রূপে সমাধা হইতে পারে না। স্থির-মনাঃ ব্যক্তি বড় বিরল এবং সম্পূর্ণ মনঃস্থির ও মায়া ত্যাগ না হইলেও যোগে কিরূপে আরূঢ় হওয়া যাইতে পারে।

ভক্তি পক্ষে, শ্রীচৈতন্য দেব স্বয়ং কহিয়াছেন যে যথার্থ ভক্তি দূরে থাকুক্, ভক্তির আভাসমাত্রও আমার মিলিল না। ইহার অভিপ্রায় কি? অভিপ্রায় এই যে, তিনি স্বয়ং অবতার হইয়াও যখন এ উক্তি করিয়াছেন, তখন সাধারণ জীবের পক্ষে অসাধ্য, তাহার সন্দেহ কি; কিন্তু তত্রাচ কলির জীবের পক্ষে তিনি এক প্রকার উপায় রচনা করিয়া দিয়াছেন। কিয়দংশে মনঃস্থির করিয়া জীব যদ্যপি ৺ভগবানের নামের শরণাগত হয়, ও সদ্‌গুরুর সঙ্গ লাভ করিতে পারে, তবে তাহাদিগের পরিশ্রম নিশ্চয়ই সফল হইবেক।

যোগ ও ভক্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা, বর্ণনা ও তুলনা মহামহা পণ্ডিতের পক্ষেও অসাধ্য, যেহেতু এই দুই প্রকরণ ৺ভগবানের শ্রীমন্দিরের পথ। আমি যদিও এ বর্ণনে কোনমতে উপযুক্ত নহি, তথাপি এ পুস্তকে ভগবানের নামের উল্লেখ থাকাতে পাঠকগণের পরিত্যাজ্য হইতে পারিবে না; যেমন কোন হীন জাতির অগ্নি হইতে হোমাদির অগ্নি প্রতিষ্ঠা হইলে কোন দোষ পৌছে না, কিম্বা সেই অগ্নি অনায়াসে সুবর্ণকে খাদ হইতে শোধন করিতে পারে, তেমনি জ্ঞানী কিম্বা যথাযোগ্য ব্যক্তিদিগের এ পুস্তক পাঠে তাঁহাদিগের স্বার্থলাভ ব্যতীত কোন হানি হইবে না।"

ক্রমশঃ

তুলসী-সপ্তশতিকা

শ্রীরামচরণ দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৫৬)

তুলসী অপনে দুঃখতে কো কহু রহে অজান।
কীশ কুম্ভ অঙ্কুর বনহি উপজত করত নিদান॥
নিজ নিজ দুঃখ-জ্ঞান, সর্ব জীবে বর্তমান,
কেহ নয় তাহাতে অজ্ঞান;
কহিছে তুলসীদাস, কণ্টকাদি করি নাশ,
বানরও বিরচে বাসস্থান।

(৫৭)

যথা ধরণী সব বীজময় নক্ষত নিবাস অকাশ।
তথারাম সব ধর্মময় জানত তুলসীদাস॥
সকল বীজধারিণী, যেরূপ দেখ ধরণী,
আকাশ নক্ষত্র-বাস হয়;
সেইরূপ মনে প্রাণে, এ তুলসীদাস জানে,
শ্রীরাম সকল ধর্মময়।

(৫৮)

পুহুমী পানি পাবকহু পবনহু মাহ সমাত।
তাকঁহ জামত রাম অপি বিনুগুরু কিসিলখি যাত॥
ভূমি জল হুতাশন, আকাশ কিম্বা পবন,
সবে জানে এরা অচেতন,
চেতন করেন যিনি, মধ্যে থাকি, রাম তিনি
গুরু বিনা না পাই দর্শন।

(৫৯)

অগুণ ব্রহ্ম তুলসী সোই সগুণ বিলোকত সোই।
দুখ সুখ নানা ভাঁতি কো তেঁহি বিরোধতে হোই॥
রে তুলসি! যে নির্গুণ, দেখিছ তাঁরে সগুণ
সগুণে নির্গুণে ভেদ নাই;
ভুঞ্জ নানাবিধ সুখ, পাও নানাবিধ দুঃখ,
কেবল বিভিন্ন ভাবি তাই।

(৬০)

শূর যথাগণ জীতি অরি পলটি আব চলি গেহ।
তিসি গতি জানহি রাম কি তুলসী সন্তসনেহ॥
যোদ্ধা যথা নিজগণ, সহিত করি গমন,
শত্রু জিনি ফিরে নিজ ঘরে,
রে তুলসি সন্তস্নেহ, সৈন্যগণ সঙ্গে লহ,
যুদ্ধ জিনি যাও রামপুরে।

(৬১)

পরমাতমপদ রামপুনি তীজে সন্তসুজান।
যে জগমহ বিচরহি ধরে দেহ বিগত অভিমান॥
এক পরমাত্মারূপ, দ্বিতীয় শ্রীরামরূপ,
তিন ভক্তরূপ ভগবান্,
যাঁরা এইধরা 'পরে, পরমানন্দে বিচরে,
দেহ ধরে' বিগতাভিমান।

(৬২)

চৌথি সংজ্ঞা জীব কি সদা রহত রত কাম।
ব্রাহ্মণ সেতন রামপদ নিশি বাসর বশবাম॥
চতুর্থের জীবনাম, সদারত রহে কাম,
পরিহরি শ্রীরামচরণ,
পাইয়া ব্রাহ্মণ-দেহ, রঙ্গরসে নারী সহ,
করে দিবা-যামিনী যাপন।

(৬৩)

সুখপায়ে হর্ষত ইসত খীঝত লহে বিষাদ।
প্রকটত দুরত নিরয় পরত কেবল রত বিষস্বাদ॥
সুখ পেয়ে হর্ষে হাসে, কাঁদে যবে দুঃখে ভাসে
জন্মে মরে নরকেতে যায়,
ত্যজি রাম-আরাধন, বিষয়-বিষাস্বাদন

(৬৪)

নানা বিধি কি কল্পনা নানা বিধি কো শোক।
সুক্ষ্ম অরু অস্থূলতন কবহু তজত নহি রোগ॥
স্থূলদেহে করে ভোগ, নানাবিধ শোক রোগ,
সূক্ষ্ম দেহে বিবিধ বাসনা;
শ্রীরামবিমুখ জন, তাই দুঃখী সর্বক্ষণ;
রোগ তারে কখনো ছাড়েনা।

(৬৫)

যৈসে কুষ্ঠীকো সদা গলিত রহত সবদেহ।
বিন্দু কি গতি তৈসিয়ে অন্তরহুঁ গতি রেহ॥
কুষ্ঠ রোগে স্থূলদেহ, গলে যথা অহরহ,
শুক্রগতি সন্তানেও পায়;
সেরূপ মানস রোগ, সূক্ষ্ম দেহে করে ভোগ,
জন্মে জন্মে নিস্তার কোথায়?

(৬৬)

ত্রিধা দেহ গতি এক বিধি করহুঁ নাগতি আন।
বিবিধ কষ্ট পাওত সদা নিরখহি সন্ত সুজান।
স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ, তৃতীয় কারণ-দেহ
তিনগতি সম নহে আন;
বিবিধ যাতনা পায়, দেখেনা মুগ্ধ মায়ায়
দেখে যেই ভকত সুজান।

(৬৭)

রামহিঁ জানে সন্তবর সন্তহ রাম প্রমাণ।
সন্তন কেবল রামপ্রভু রামহি সন্তন আন॥
রামে জানে ভক্তবর, ভক্তে জানে রঘুবর
সন্তের কেবল প্রভু রাম;
জানিয়া অনন্যগতি, ভক্ত প্রতি সীতাপতি
কোন কালে নাহি হন বাম।

(৬৮)

তাতে সন্ত দয়ালবর দেহি রামধন রীতি।
তুলসী অহ জীব জানি কৈ করিয় বিহঠি অতিপ্রীতি॥
তাই সন্ত দয়াবান্, রামভক্তি করে দান,
এই হয় তাঁহাদের রীতি;
তুলসি! জানিয়া মনে, ঠেলিলেও শ্রীচরণে,
রামভক্ত সনে কর প্রীতি।

(৬৯)

তুলসী সন্তসু অংবতরু ফুলি ফরহি পর হেত।
হত সে বে পাহন হনৈ উতসে বে ফল দেত॥
সন্ত আম্রতরুবর, হয় ফুল-ফলধর,
সে কেবল পরের কারণ;
পাথর প্রহারে কায়, ক্ষুব্ধ না হইয়া তায়
ফল দানে তুষে তার মন।

(৭০)

সুখ দুখ দোনোঁ একসম সন্তন কেমন মাহিঁ।
মেরু উদধি গত মুকুর জিসি ভার ভিজিবো নাহি॥
সন্তের হৃদয়-মাঝে, সমতা সদা বিরাজে
সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ নাই;
দর্পণ হৃদয়-পরে, ভূধর সাগর ধরে,
ভারে জলে ভাঙ্গে ভিজে নাই।

(৭১)

তুলসী রাম সুজন কো রাম জানাবৈ সোই।
রামাহিঁ জানৈ রামজন আন কবহুঁ নহি হোই॥
তুলসী রাম সুজানে, কেবল সেজন জানে,
রাম যারে দেন জানাইয়া;
সে কেবল রামজন, জন্মে নাই অন্য জন,
ভবে সেই সৌভাগ্য লইয়া।

(৭২)

সো গুরু রাম সুজান সম নহি বিষমতালেশ।
তাকি কৃপা কটাক্ষতে রহেন কঠিন কলেশ॥
সেই গুরু রাম সম, যাঁর হৃদে ভার সম,
বিষমতা লেশ মাত্র নাই;
তাঁর কৃপা-বিলোকন, নাশে জনম-মরণ,
আর যত ভব রোগ ভাই।

(৭৩)

গুরু কহ তব সমুঝে শুনৈ নিজকরতব কর ভোগ।
কহ তব গুরু কর তব করৈ মিটি সকল ভব শোগ।
গুরু-উপদেশ যাহা, শুনিলে বুঝিলে তাহা,
নিজ কর্মভোগ মিটে নাই;
উপদেশ মত চল, তবে মিটিবে সকল,
ভবশোক যত আছে ভাই।

(৭৪)

শরণাগত তেহি রামকে জিহ্ন দিয়ধী সিয়রূপ।
জা পত্নীঘর উদয় ভয় নাশৈ ভ্রমতম কূপ॥
বুদ্ধি সীতারামে দাও, চরণে শরণ লও
বুদ্ধি রাম-প্রিয়া ভক্তি হবে ;
যে ভক্তি উদয় হলে, বিবেক-আলোক-বলে
মোহতম দূরে পলাইবে।

(৭৫)

জাপদ পায়ে পাইয়ে আনন্দ পদ উপদেশ।
সংশয় মনন নশায় সব পাবৈ পুনিন কলেশ॥
পাইলে যাঁহার পদ, মিলে সদানন্দ-পদ
নষ্ট হয় মনের সংশয় ;
দূরে যায় সব দুঃখ, জন্মে সুবিমল সুখ
পুনঃ ক্লেশ পাইতে না হয়।

(৭৬)

মেধা সীতা সম সমঝু গুরু বিবেক সম রাম।
তুলসী সিয় রাম সো সদা ভয়ো বিগত মহাবাম॥
মেধা জানকীর সম, বিবেক গুরু শ্রীরাম
সেই সীতা-রামে ভক্তি যার ;
কহিছে তুলসীদাস, ছাড়িয়া সকল আশ
সে ক'রেছে রাম-ভক্তি সার।

(৭৭)

আদি মধ্য অবসান গতি তুলসী এক সমান।
তেই সন্ত স্বরূপ শুভ যে অনীত গত আন॥
শৈশব যৌবন জরা, তিনকালে সম যারা
একমাত্র রঘুবর গতি ;
কহিছে তুলসীদাস, যে ছেড়েছে অন্য আশ
সেই সাধু মঙ্গলমূরতি।

(৭৮)

যেই শুদ্ধ উপাসনা পরাভক্তি কী রীতি।
তুলসী অহিমগ পণ্ড ধরে রহি রামপদপ্রীতি।
কহিলাম পূর্বে যাহা শুদ্ধ উপাসনা তাহা
এই হয় পরাভক্তি-রীতি ;
রে তুলসি! এই মত, পথে চল অবিরত
রামপদে রহিবেক প্রীতি।

(৭৯)

তুলসী বিন গুরুদেবকে কিসি জানৈ কহু কোর।
জহতে জো আয়ো সো হৈ জায় জহাঁ হৈ সোয়॥
যথা হতে যেই আসে, জান ভাই সেই আসে
যে যার সে সেই তথা যায় ;
তুলসি! গুরু বিহনে, এই সত্যতত্ত্বজ্ঞানে
অন্য কিছু নাহিক উপায়।

(৮০)

অপগত থে সেই অবনী সো পুনি প্রকট পতাল।
কহা জন্ম অপি মরণ মপি সমুঝহি সুমতি রসাল॥
শূন্যে যায় সিন্ধু হ'তে, পড়ে আসি ধরণীতে
স্রোতে বহে যায় রসাতল ;
কোন স্থানে জনমায়, কোথায় মরণ পায়
জল কিন্তু সদা সেই জল।

(৮১)

সঙ্গ দোষ তে ভেদ অস মধু মদিরা মরকন্দ।
গুরু গম তে দেখহি প্রকট পূরণ পরমানন্দ॥
মকরন্দ মধু মদ্য ভেদ সঙ্গ-দোষে সদ্য
বস্তুতঃ প্রভেদ কিছু নাই ;
দেখে যে গুরু কৃপায়, বিজ্ঞান-লোচন পায় ;
পূরণ পরমানন্দ ভাই।

(৮২)

ঢাবর সাগর কূপগত ভেদ দেখাই দেত।
হৈ একৈ দুজো নহি দ্বৈত আন কে হেত॥
ডোবা কূপ সরোবর, নদী হ্রদ কি সাগর
সকলেই এক সেই জল ;
সঙ্গ-ভেদে অল্প কোথা আবার কোথা বহুতা
দ্বৈত বুদ্ধি সমল নির্মল।

(৮৩)

গুণগত নাশ ভাঁতি তেহি প্রকটিত কাল হি পায়।
জ্ঞান জায় গুরু জ্ঞান তে বিন জানে ভরসায়॥
যখন যে গুণগত, প্রকাশিত সেই মত
কাল প্রাপ্তে সময় সময় ;
গুরু জ্ঞানে জানা যায়, নাহিক অন্য উপায়
অজ্ঞানের সব ভ্রান্তিময়।

(৮৪)

তুলসী তরু ফুলত ফলত যা বিধি কালহি পায়।
তৈ সেহি গুণ দোষ তে প্রকটত সময় সুভায় ॥
পল্লব, প্রসূন, ফল, প্রকাশ পায় সকল,
তরুতে সময় অনুসারে ;
কহিছে তুলসীদাস, সে রূপ গুণ-প্রকাশ,
কালপ্রাপ্তে দোষের মাঝারে।

(৮৫)

দোষহু গুণকী রীতি অহ জাসু অনল গতি দেখি।
তুলসী জানত সো সদা জেহি বিবেক সুবিশেষি ॥
দোষের গুণের রীতি, দেখি অনলের গতি,
শিক্ষা কর বিবেকী মানব ;
পরশিলে অঙ্গ জ্বলে, সর্বস্ব দহে অনলে,
সেই করে শীত-পরাভব।

(৮৬)

গুরুতে আবত জ্ঞান উর নাশত সকল বিকার।
যথা নিলয় গতি দীপকৈ মিটত সকল আঁধিয়ার ॥
দীপ-শিখা যে প্রকার, বিনাশিয়া অন্ধকার,
গৃহস্থিত বস্তু পরকাশে ;
সেইরূপ জ্ঞান-রশ্মি, সকল বিকার নাশি,
আত্মতত্ত্ব মানসে বিকাশে।

(৮৭)

যদ্যপি অবনী অনেক সুখ তোয় তামরস তাল।
সংতত তুলসী মানসর তদপি ন তজহি মরাল ॥
যদিও অবনী-তলে, বহুসরঃ পূর্ণ জলে,
কত ফুল্ল সরোজ সহিতে ;
মানসের পদ্মবন, পরিহরি হংসগণ,
তবু তাহে না চাহে যাইতে।

(৮৮)

তুলসী তোরত তীরতরু মানস হংস বিডার।
বিগত নলিন অলি মলিন জল সুর সরীহু বঢ়িআর ॥
বানরেরা নানা রঙ্গে, তীর-তরুগণ ভাঙ্গে,
উড়াইয়া দেয় হংসদলে ;
হইলে নলিনীহীন, অলি কি কখন লীন,
হয় সুপবিত্র গঙ্গাজলে ?

(৮৯)

জো জল জীবন জগত কো পরশত পাবন জোন।
তুলসী সো নীচে চরত তাহি নেবারত কৌন ॥
জগত-জীবন জল, যার স্পর্শে নিরমল,
জগতের পদার্থসকল ;
তুলসী সে নীচে যায়, কেবা নিবারিবে তায়
জীবগতি এই অবিকল।

(৯০)

যো করতা হৈ করম কো সো ভোগত নহি আন।
ববন হার লুনি হৈ সোই দেনী লহৈ নিদান ॥
কর্মের যে কর্তা হয়, ফল ভুঞ্জে সে নিশ্চয়,
কখন না ভুঞ্জে অন্য জন ;
ক্ষেত্রে যে বপন করে, সেই ভিন্ন কভু পরে,
করে নাহি ছেদন-গ্রহণ।

(৯১)

রাবণ রাবণ কো হন্যৌ দোষ রাম কহ নাহি।
নিজহিত অনহিত দেখু কিন তুলসী আপহি মাহিঁ ॥
রাবণ রাবণে মারে, দোষ নাহি রঘুবরে
বিচারিয়া দেখ মতিমান্ ;
তুলসী কহিছে সার, হিতাহিত আপনার,
আপনারই মধ্যে বিদ্যমান।

(৯২)

সুমিরু রাম ভজু রামপদ দেখু রাম শুনু রাম।
তুলসী সমুঝহু রাম কহ অহনিশি অহ তব কাম ॥
কর শ্রীরাম-স্মরণ, ভজ শ্রীরাম-চরণ,
দর্শন শ্রবণ কর রাম ;
রে তুলসি ! মনে মনে, বুঝ সদা রামধনে,
দিবানিশি এই তব কাম।

(৯৩)

রজ অপ অনল অনিল নভ জড় জানত সব কোই।
অহ চৈতন্য সদা সমুঝু কারজ রত দুঃখ হোই ॥
ক্ষিতি, জল, হুতাশন, নভঃ আর সমীরণ,
এরা জড় সকলেই জানে ;
সদা দুঃখ পায় সেই, কার্যে রত হয় যেই
জড়কে চেতন করি মানে।

(৯৪)

নিজকৃত বিলসত সো সদা বিন পায়ে উপদেশ।
গুরু পগ পায় সুগম ধরৈ তুলসী হরৈ কলেশ॥
নিজকৃত কর্ম যাহা, সদা ভোগ করে তাহা
অভাবে গুরুর উপদেশ ;
গুরুর কৃপায় যবে, দেখে পন্থা এই ভবে,
তাহা ধরে' হরে সর্বক্লেশ।

(৯৫)

সলিল শুক্র শোণিত সমুঝু পল অরু অস্থি সমেত।
বাল কুমার যুবা জরা হৈ সু সমুঝু করু চেত॥
সলিল শুক্র শোণিত, মাংসাদি অস্থি সহিত,
বুঝ কিসে শরীর গঠন ;
বাল্য কৌমার যৌবন, ভাব বার্ধক্য মরণ,
সব বুঝে হও সচেতন।

(৯৬)

ঐসিহি গতি অবসানকী তুলসী জানত হেত।
তাতে অহগতি জানি জিয় অবিরল হরিচিত চেত॥
পূর্ব দেহ অবসান, পরের হেতু প্রমাণ,
তুলসী জেনেছ যদি মনে ;
ছাড়িয়া বাসনা যত ; মনে প্রাণে অবিরত
রত হও শ্রীহরি স্মরণে।

(৯৭)

জানৈ রাম স্বরূপ যব তব পাবৈ পদ সন্ত।
জন্ম মরণ প্রদতে রহিত সুষমা অমল অনন্ত॥
অমল অনন্ত শোভা, শ্রীরামস্বরূপ আভা,
যবে হৃদে প্রকাশিত হবে ;
রহিত জন্ম-মরণ, সন্ত পদে উন্নয়ন
কহিছে তুলসী হবে তবে।

(৯৮)

দুঃখদায়ক জানে ভলে সুখদায়ক ভজি রাম।
অব হম কো সংসার কো সব বিধি পূরণ কাম॥
ভাল জানিয়াছি, সব দুঃখপ্রদ
ভজ মন সুখদায়ক রাম ;
হয়েছিও আমি, সংসারে এখন,
সকল প্রকারে পূরণ-কাম।

(৯৯)

আপুহি মদকো পান করি আপুহি হোত অচেত।
তুলসী বিবিধ প্রকার কো দুখ উত পতি অহি হেত॥
নিজে পিয়ে মদ, নিজে অচেতন,
বলিছে তুলসী তেমনি ভাই ;
নিজ মোহ বশে, হইয়া অজ্ঞান,
বিবিধ প্রকার যাতনা পাই।

(১০০)

যা সোঁ করত বিরোধ হঠি কহ তুলসী কো আন।
সো তৈঁ সম নহি আন তব না হক হোত মলান॥
যার সনে তুমি, বিরোধ করিছ,
কহিছে তুলসী সে কি হে আন ?
অকারণে হও, বিষণ্ণ মানব,
সে আর তুমি দুই সমান।

(১০১)

চাহসি সুখ যে হি মারি কৈ সো তোঁ মরি ন জায়।
কৌন লাভ বিষতে বদলে তৈঁ তুলসী বিষ খায়॥
যাহারে মারিয়া, সুখ চাহ তুমি,
তোমার প্রহারে মরে না সে ;
কহিছে তুলসী, বুঝি না কি ফল
বিষের বদলে ভক্ষণে বিষে।

(১০২)

কোহ দ্রোহ অঘ মূল হৈ জানত কো কহু নাহি।
দয়া ধর্ম কারণ সমুঝি কো সুখ পাবত নাহি॥
ক্রোধ দ্রোহ দুই, পাপ মূল হয়,
কে না জানে দয়া, ধর্ম কারণ ;
তবে কেন দুঃখ, পাইবারে চাহ,
অবিরত করি পাপাচরণ।

(১০৩)

বনো বনা য়ো হৈ সদা সমুঝ রহিত নহি শূল।
অরুণ বরণ কেহিঁ কামকো বিনা বাস কো ফুল॥
জ্ঞান ভক্তি হীন, মানবসকল,
দেখি সুখে সদা, করে বিচরণ,
দেখিতে সুন্দর, অরুণ-বরণ,
সুগন্ধবিহীন ফুলের মতন।

ক্রমশঃ

অনাদৃত

শ্রীযতীন্দ্রনাথ আঢ্য, বিদ্যানিধি, সাহিত্যপুরাণরত্ন

বন্ধুর সাদর আমন্ত্রণের আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে পূজার বন্ধে সেবার হুগলী জেলার ছোট একটি গ্রামে পাড়ী দিতে হয়েছিল। দীর্ঘ বন্ধ, পিতৃপক্ষ থেকে আরম্ভ করে রাসযাত্রার পর পর্যন্ত সেখানেই কাটাতে হবে এই সর্তে যেতে হয়েছিল পুলিনের সঙ্গে। বাড়ী থেকে মা বাবা সম্মিলিত ভাবে জানিয়েছিলেন এবার বন্ধে তাঁরা পুরীতে চলেছেন ভ্রমণ আর দর্শন সকলরকম কামনা নিয়েই। পথে ভুবনেশ্বর, ওয়ালটেয়ার, চিল্কা সমস্তই সেরে ফিরবেন, আমার ইচ্ছা হয় ত কলেজ বন্ধ হলেই আমিও যেন তাঁদের সহযাত্রী হই। কিন্তু ওসব ঠাঁইগুলো বেশ লোভনীয় হলেও এর আগে কেবল একবার নয় কয়েক বারই আমার ঘোরা আছে। কাজেই এবার একটু গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে পরিচয় করতে সহজেই পুলিনের ডাকে সাড়া দিলাম। সংবাদটা যথা সময়ে বাড়ীতে জানিয়ে দেবীপক্ষের দ্বিতীয় দিনে পুলিনের সঙ্গে হাওড়া ষ্টেসনে এসে ট্রেনে চাপলাম। ট্রেনে কিন্তু বেশী দূর আমাদের আসতে হোলোনা গুরুপে ট্রেন ছেড়ে ষ্টেসনের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বেশ হৃষ্টপুষ্ট একজন গাড়োয়ান পুলিনকে এসে প্রণাম জানিয়ে বললে —"বাড়ীর থেকে কর্তা গরুর গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন দেরী না করে আমরা গিয়ে অনায়াসে চাপলেই পারি, একে অন্ধকার রাত্রি তার উপর জলকাদার পথ দেরী করা মোটেই ভাল নয়।"

আমরা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, পুলিন আমার হাত ধরে আর অপর হাতে আমাদের দুজনকারই প্রসাধন-সামগ্রী ভরা স্যুটকেসটা নিয়ে গাড়ীতে চেপে বসলে। গাড়োয়ানটা স্বয়ং বিছানা-পত্তর আর কাপড় চোপড়-ভরা তোরঙ্গটা নিয়ে গাড়ীতে তুলে দিলে। ধীর মন্থর ভাবে কখনও বা সাধ্যমত দ্রুতভাবে গাড়ী আমাদের মেঠোপথ ভেঙ্গে খাল, বিল, জলা আর ঝোপ জঙ্গলের ঠিক মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চললো। গভীর অন্ধকারে বাইরের সমস্ত দৃশ্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার প্রথমেই সহরের বাজারে বিক্রিত কুমড়ো-ফালির মত যেটুকু চন্দ্রোদয় হয়েছিল কয়েক মুহূর্ত পরে তাও ডুবে গেল। কেবল অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল ছোট বড় তারাগুলো আর গরুর গাড়ীর করুণ সেই একঘেয়ে শব্দ আমাদের যাত্রাপথ ভরে রইলো। গাড়ীর ভিতর বসে আমরাও সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে জানা অজানা দেশী বিদেশী নানা প্রকার আলোচনায় সবশেষ সঙ্গীতের সঙ্গতে আত্মনিয়োগ করলাম।

পুলিনের বাড়ীতে এসে আমার খাতিরের সীমা ছিল না, জানিনা পুরাকালে শিষ্যবাড়ী গুরুদেবও এতখানি আদর পেতেন কি না। গ্রামটি এদের বেশ সুন্দর; একটি কুলুকুলুনাদিনী ছোট নদীর বাঁকের মাথাতেই ছবিটির মত গ্রামখানি। আমরা প্রতিদিনই এসে নদীর বালুচরে বসে সান্ধ্য সৌন্দর্য উপভোগ করতে চেষ্টা পেতাম। সহরের বিরাট্ কোলাহল, বিপুল ধূম-ধূলির আওতা থেকে এই জনবিরল নীরব নিরালা ঠাঁইটি বেশ যেন একটু শান্তি এনে দিত; তবুও যেন কেমন কিসের একটা অভাবে দৈন্যে বুভুক্ষু অন্তর আই ঢাই করে উঠত। যাই হোক বন্ধুর নিকট যখন প্রতিশ্রুত—তখন অসোয়াস্তির মধ্যেও অতিবাহিত করতেই হবে দীর্ঘদিন—এই দৃঢ়তা দিয়ে শিকড় গেঁড়ে বসেছিলাম নন্দনপুরে।

পূজোর তখন আর কয়েকদিন মাত্র দেরি; পুলিনদের বাড়ী মহাধুমধামের সূচনা হয়ে গেছে। সেদিন পুলিনও তাই বাড়ীর বোধ হয় কি একটা কাজে পাশের গ্রামে চলে গিয়েছিল, কাজেই বিকেলের দিকে বাধ্য হয়ে একলা আমাকে বেড়াতে বেরুতে হয়েছিল। কি আর করি

বেশী দূর আর না গিয়ে নদীর চরের ছাতনা গাছটির তলাতেই নিত্যকার মত এসে আসন পাতলাম। শরতের পূর্ণাঙ্গী নদীটির পানে বিহ্বল দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পর বাঁশীটি তুলে নিয়ে ফুঁ দিলাম। ধীরে ধীরে আরম্ভ করে ক্রমোচ্চে সুর সাধনা সমাপ্ত করে যখন বাঁশী নামালাম মুখ থেকে তখন শুক্লাষষ্ঠীর চন্দ্রালোকে সমস্ত বসুধাবক্ষ প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। পুলিনদের বাড়ী বোধনের বাদ্যে তখন সমস্ত গ্রামকে কাঁপিয়ে তুলছে! আস্তে আস্তে উঠে ফিরবার জন্য পথে পা দিলাম। কিন্তু একি! আকস্মিক ভাবে ঠিক আমার পিঠে ঠেশ দিয়ে রাখা গাছটার গোড়া থেকে ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলে নাদুশ নুদুশ ঠিক যেন পাথরে খোদা মূর্তির মত একটি ছোট্ট নয়ন-মোহন শিশু ছুটে পালিয়ে গেল। অজানার স্বপ্রকাশে অনিশ্চিত আশঙ্কায় বুকটা অকস্মাৎ ছাৎ করে উঠলো। পরক্ষণেই আত্মসম্বৃত হয়ে চেয়ে দেখি বনমৃগের মত লাফিয়ে লাফিয়ে শিশুতনুটি আমার আগে আগে ছুটে চলেছে। আশ্চর্য, কে এ শিশু? বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তার পানে তাকিয়ে থেকে ডাক দিলাম—"খোকা, এই খোকা।"

খোকা কিন্তু আর কিছু সাড়াশব্দ না দিয়ে কেবল একটু মৃদু হাসি হেসে ছুটে তেমনই চলতে লাগলে, খুব ঘন লোকালয় না থাকলেও বাঁকের মোড়ে এসে সে কতক-গুলি ঝোপের মাঝে কোথায় যে লুকিয়ে গেল কিছুতেই আর দেখা পেলাম না তার; পিছন ফিরে ফিরে কয়েকবার তাকালাম কি জানি কোন এক অজানা মোহের টানে, কিন্তু সে কই? তবে বোধহয় কোন একটি শাখাবহুল অথবা লতা বেষ্টিত গুল্মের পেছন থেকে দুটি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে সে তখন পর্যবেক্ষণ করছে আমাকে।

যাই হোক গ্রাম্য বালকটির এই আকস্মিক আচরণের আলেখ্য অন্তরে এঁকে জমিদার বাড়ীর উৎসব-মুখরিত দিব্যালোকিত প্রাঙ্গণে ফিরে এলাম। তখন কিন্তু একেবারে তার স্মৃতি কি জানি কেন মন থেকে সবটুকু মুছে ফেলতে পারছিলাম না। এই কৌতুহল নিয়েই অষ্টবার পরদিন সেখানে গেলাম। আজ যদি পূজা সেদিন, কাজেই সেদিনও পুলিন যেতে পারলে না আমার সঙ্গে, আর আবশ্যকও ছিল না মোটে তার, কেন না সমস্ত পথ ঘাটগুলি একরকম মোটামুটি পরিচিত হয়ে পড়েছিল আমার চোখে। আজকে আর নদীর পানে মুখ ফিরিয়ে না বসে ছাতনা গাছটির তলায় আড়া-আড়ি ভাবে বসলাম। কিন্তু কই ঠিক সন্ধ্যা উত্তরে গেলেও সেদিন আর দেখা পেলাম না তার। নিরাশ মনে ফিরে চলে ছিলাম সেদিন; হঠাৎ পেছন থেকে দুপ দুপ পায়ের শব্দ পেলাম কা'র। ফিরে চেয়ে দেখি অদূরে সেই শিশু-মূর্তি। মুখটি তার মধুর হাস্যালোকিত; আমিও ছোট ছেলের মত তার পথ ঘিরে দাঁড়িয়ে বললাম—"এইবার?" বেচারা যেন কিছুক্ষণের জন্য নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে, তারপর চট করে চপল ভাবে পেছন দিকে ফিরে ছুট দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল—কোথায় কে জানে। অনেক দূর পেছিয়ে এসে অনেক অনুসন্ধান তার করলাম কিন্তু নিষ্ফল হয়ে ফিরে আসতে হোলো, চকিতে সে যে কোথায় অন্তর্ধান করল কিছুই তার ভেবে পেলাম না। তবুও অজানা এই মায়াবী বন্য মৃগটির জন্য কেমন যেন একটু আগ্রহ বেড়েই গেল। কিন্তু এর পরদিনই এমন-তর ভাবে একটি ঘটনা ঘটে গেল যার তরে নিজেই সেই চঞ্চল হরিণ এসে স্বেচ্ছায় ধরা দিল। অষ্টমী পূজার দিন পুলিনদের নাটমন্দিরে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন সকাল থেকেই চলছিল। পুলিনই ছিল সেই আয়োজনের প্রধান উদ্যোগী।

আমাকেও সে সেই সোর গোলের মাঝে ধরে রাখতে চাইছিল আমি কিন্তু উপেক্ষা করে বাঁশিটি হাতে নিয়ে বিকেলের দিকে বের হয়ে পড়লাম। সেদিন সকালের দিকে একটা অসহ্য গুমোটের পর দুপুরে বর্ষার ধারাতে ধরণী স্নাতা হয়ে গিয়েছিল। বিকেলে কিন্তু শরতের শান্ত উজ্জ্বল রৌদ্রপ্লাবনে সমস্ত শ্যামলা প্রকৃতি যেন হেসে উঠছিল। নদীর চরের কাশ গাছগুলির ফুলের উপর বৃষ্টি ধারাতে রোদ লেগে এক অপূর্ব সুষমাময় হয়ে উঠেছিল। ওপাশেই চোখ মেলে তন্ময় হয়ে বসেছিলাম।

গাছের যে শিকড়টির উপর বসেছিলাম ঠিক তার নীচেই বর্ষার জলে ধুয়ে গিয়ে বালুর চরে অনেকখানি খাল হয়েছে। হঠাৎ পেছন থেকে এক আচমকা ধাক্কা খেয়ে সেই খালের মধ্যে আমি চট করে পড়ে গেলাম। ব্যাপার কি? বড় রাগ হোলো কে আমাকে এমনভাবে ঠেলে দিলে? তাড়াতাড়ি কাদামাখা শরীর নিয়ে উঠে দেখি এ যে সেই শিশু। বিস্ময়ে, লজ্জায় আর রাগেও বটে তার পানে চাইতেই দূর থেকে এক টুকরা পাথর কুড়িয়ে স্বভাবসুলভ হাসতে হাসতে সে বললে—"রাগবেন পরে, আগে মারুন, মারুন, এই নিন ঐ যে"—এই বলে ঠিক আমি যেখানে বসেছিলাম তারই মাথার উপর পুষ্পভারাবনত শাখাগ্রটি সে দেখিয়ে দিলে। সমস্ত রাগ আমার এক নিমেষে জল হয়ে গেল; ভয়ে সকল শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। একি এযে এক বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত সর্প। বোধ হয় আমার মাথাতেই তার দংশন করা উদ্দেশ্য ছিল। পাথর টুকরা নিয়ে ছুড়ে মারা মাত্র মাটির উপর পড়ে গেল বেচারা। তারপর অনবরত ঢেলার উপর ঢেলা মেরে তার পরলোকগমনের সহায়তা করে দিলাম। আমি কেবল ঢেলা ছুড়েছি মাত্র, সংগ্রহ করে পর পর আমার হাতে সমস্ত যোগাড় করে দিয়েছে সেই শিশু।

আনন্দে, আগ্রহে, কৃতজ্ঞতায় ছুটে গিয়ে হাতখানি চেপে ধরলাম তার। "তোমার নাম কি ভাই?" জিজ্ঞাসা করতে না করতেই সে বলে উঠলে—"আঃ কি করেন ছাড়ুন ছাড়ুন হাতটা যে ভেঙ্গে যাবে আমার।"

কি জানি কি অজ্ঞাত আশঙ্কায় যেমন ছেড়ে দিয়েছি অমনি আবার সেই খিল খিল করে হাসতে হাসতে ছুটে পালাল সে। এই ক্ষুদ্র দাতাটির কাছে চতুরতায় ঠকে গিয়ে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি কিছুক্ষণ। তারপর মনে হল—না এর সন্ধান আজ নিশ্চয় আমাকে বা'র করতেই হবে। সহরের শিক্ষিত যুবা হয়ে এই গ্রাম্য শিশুর অবহেলা আর যেন কিছুতেই বরদাস্ত হচ্ছিল না আমার। এই বয়সে এত উদার এত মহৎ এমন চপল সে, একে আমার যে কোন উপায়ে চেনা চাইই চাই।

সহরের লোক আমরা আর এই সরীসৃপপূর্ণ স্থানে বসতে কিছুতেই মন চাইল না আমার। তাছাড়া ঐ মনোহারী শিশুটির পেছনে ছুটতেই চিত্ত যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বাঁশিটি হাতে তুলে নিয়ে ফুঁ দিতে দিতে গ্রামের পথে ফিরলাম। মুখ যদিও বাঁশীতে ছিল চোখ আমার পড়েছিল গ্রাম্য কাদাভরা পথের উপর ছোট ছোট পায়ের দাগের দিকে। গোয়েন্দা-বিভাগের পুলিশ কর্মচারীর মত সেই পায়ের রেখাগুলির অনুসরণ করেই সাবধানী দৃষ্টিবিক্ষেপে সব শেষ যেখানে এসে পৌছালাম দেখি সেটি ছোট ধীবর-বস্তি। গুটি কয়েক ঝিটাবেড়ার দেওয়ালে মাটির লেপ দিয়ে তার মাথার উপর খোড়োচাল সৃষ্টি করে এদের আশ্রয় স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে প্রস্তুত হয়েছে। এর উপর প্রত্যেক ঘরটির খোড়োচালার উপর মাছধরার পর শুকনো করবার জন্যে জালগুলি সযত্নে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে এসেই মানবত্বের খাতিরে বাঁশী বাজান বন্ধ করতে হয়েছিল আমাকে। তবুও চোখ আমার প্রত্যেক ছোট কুটিরগুলির অভ্যন্তর ভাগের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করে যেন কেবলই খুঁজে চলেছিল সেই নিটোল শ্যামতনু আশ্চর্য্য প্রাণদাতা শিশুটিকে। একটু পরেই আশা সফল হোলো আমার। একটি গোময়মৃত্তিকা লেপে নিকানো তকতকে ছোট ঘরটির ঠিক সামনের বাইরে ছোট একটু মাটির মঞ্চে তুলসীমূলে সন্ধ্যা দিয়ে প্রণাম করতে ঝুঁকে পড়েছিল একটি লোলচর্মা বৃদ্ধা, শিশুটি তারই পেছনে দাঁড়িয়ে পাশের বাঁশ-কঞ্চির বেড়ার উপরের মুকুলিত মাধবীলতার দু চারটা করে কুঁড়ি আনমনে ছিড়তে ছিড়তে চকিত-কৌতুকভরা তার দৃষ্টি মেলে বুঝি আমারই আসার অনুসন্ধান করছিল। একেবারে চারচোখে চাওয়া চাওয়ী হওয়ার পর চপল শিশু কিছুতেই আর সেখান থেকে পালাতে না পেরে তার সজল-কাজল ডাগর চোখ দুটি আমার মুখের উপর জিজ্ঞাসুভাবে প্রসারিত করে যেন নীরব নিশ্চল মৃণ্ময় মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল; আর আমিও যেন বিস্ময়াবিষ্ট তন্ময় হয়ে তার পানে চেয়েই শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম সেখানে। আমাদের উভয়ের এই বিস্ময় ভাব বিদূরিত করে প্রথম সেই বৃদ্ধা নারীটি

কথা কইলে—"এস বাবা ওখানে কেন? এখানে এস।"

অগ্রপশ্চাৎ কিছু ভাববার বা হাঁ না বলবার কোন যোগ্যতা আমার যোগাল না। মন্ত্রে চালিত মানবের মত অবনতমস্তকে এসে বৃদ্ধার আদেশ পালন করলাম। তার পর সেই শিশুটিকে আদেশ হোলো—"কৈরে বাদল! এখনও তোর কাকাবাবুকে প্রণাম করলি না।" এ আদেশ পালন হতেও দেরি হোলোনা মোটেই। ছোট, নধর তনুটি আমার চরণ-তলায় লুটিয়ে পড়ছিল আমি তার নরম হাতটি ধরে পাশে এনে টেনে বসিয়ে বললাম—"ছিঃ ছিঃ কাদার উপর ভূমিষ্ঠ হয়ে আর নমস্কার করে না।"

মাথাটি বিনীতভাবে নত করে বেচারা আমার পাশে বসে পড়লে। তখন শুক্লাষ্টমীর চাঁদের আলোতে শরতের ধৌতা পুষ্পিতা ধরিত্রী ঝলমল করছে আর তারই মাঝে ধীবর-কুটীর থেকে সন্ধ্যার শঙ্খ বেজে প্রকৃতিকে মুখরিত করে তুলছে।

"কাকাবাবু!" কথাটা শুনে অন্তরের অন্তস্তলে একটা অতীতের অভিনয়ের যবনিকা উত্তোলিত হয়ে গেল। তাই তো "কাকাবাবু?" হুঁ সেও এই নামেই ডাকত আমাকে। বেশিদিনের কথা নয় এই তো সেবার সেও এক দুর্গাপুজার ষষ্ঠীর দিন তার নিজের কাকা ছেলেমানুষের মত গভীর আকুল ক্রন্দনে নিজেকেও ব্যাকুলিত করে তার মেঝকাকার সঙ্গে করে তাকে নিয়ে গিয়ে নদীর বালুচরে সমাহিত করে রেখে এসেছি। তাই সেই খোকন সোনাই বা কোথা আর আজ তার ছোট কাকা—জগতের সকল স্নেহাস্পদের চেয়েও অধিক ভালবাসতো—সে কাকাও আজ অজানিত কত সুদূরে। বুকের ভিতরটা একটা প্রচণ্ড আঘাতে দগ দগ করে জ্বলে উঠলো। "কাকা কাকা" না "কাকা" ডাকা ভাল নয়। সে বেঁচে থাকলে আজকে সেও এত বড়টি হত নিশ্চয়। নিজের কথা আর কত ভাববো কেবলই ভাবছিলাম—"না কাকা ডাকা ভাল নয়।" একটা টিকটিকি বিশ্রীভাবে টকটক করে উঠলো। এক খণ্ড পাগলা মেঘ অনাবশ্যকভাবে চাঁদটাকে ঢেকে অন্ধকার করে তুললে, আর দূর থেকে কালপেঁচা একটা ডাকতে ডাকতে ঠিক আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। সমস্ত মনটা কেমন যেন একটা অজ্ঞাতে আতঙ্কে শিউরে উঠলো। মনে আবার ভাবলাম না বাদলকে কাকা বলে ডাকতে নিষেধ করে দিতে হবে। "দূর দূর" শব্দে পেঁচাটার উদ্দেশ্যে গাল দিয়ে হরিনামের মালার ঝুলিটি হাতে করে আমার সামনে বুড়ীও এসে বসলে।

প্রথমেই সে বল্লে—"আর কতদিনথাকা হবে?" ছোট এই প্রশ্নটি করে মেয়েলী গল্প আরম্ভ করে দিলে। হায় বেচারা এক নিমেষেই আমাকে একান্ত আপন ভেবে নিজের আত্মকাহিনী সুরু করে দিলে নিতান্ত অনাড়ম্বরভাবে। কথা কইতে কইতে চোখ দুটো তার কেবলই বেদনার বারিতে টবটবে হয়ে উঠছিল প্রতি মুহূর্তে। প্রকৃত কাহিনীটিও অতি করুণ। কথা শুনে তার আমারও কেবলই মনের ভিতর নয়, চোখ দুটোও সজল হয়ে উঠছিল অবাধ্যভাবে। বুড়ী নিজের শৈশব, কৈশোর যৌবন সমস্ত কথা শেষ করে শেষ জীবনের কাহিনীতে উপস্থিত হোলো। তার স্বামীর শেষ দান একমাত্র তার নয়নের নিধি বাদলের বাবার কথাও বললে। তার অসাধারণ পরিশ্রমের শক্তি, অতুল মাতৃভক্তি প্রভৃতি বলতে বলতে বুড়ী আকুল হয়ে উঠলে। তারপর কয়েক সন্তানের অকাল মরণের পর তারকেশ্বরের কাছে মানত করে বাদলের জন্ম হোলো। এর পরই কিন্তু অকস্মাৎ কয়েকদিনের জ্বরে বাদলের বাবা অবিনাশ, মায়ের হাতে সুন্দরী পত্নী আর শিশুপুত্রের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে দেহ ত্যাগ করে। তখন তো আর ঘরে পুরুষ জন কেউ নাই, জাত ব্যবসাও চলে না তাছাড়া যোয়ান বৌকে আর হাটে বাজারেও পাঠানো যায় না অথচ পেট ভারি শত্রু, কাজেই স্বয়ং বুড়ীকে লোকের বাড়ী কাজ কর্ম করে তিনটি পেটের খোরাক যোগাড় করতে হোতো। কিন্তু এইটুকু সুখও বোধ হয় নির্মম বিধাতার চোখে সহ্য করা কঠিন হোলো।

একদিন বুড়ীর এক ভাইপো এসে তাদের ঘরে অতিথি হোলো। আর তারই দুতিন দিন পরে বৌটা তার সঙ্গে বাদলকে শুদ্ধ নিয়ে অন্তর্ধান। বুড়ী তার শেষ বয়সের

অবলম্বন যথাসর্বস্ব বিক্রি করে অনেক অনুসন্ধানের পর কলকাতাতে গিয়ে তার ভাইপো আর বৌয়ের দেখা পেলে। অনেক সাধনা করেও বৌটা আর ফিরে এলোনা। কোনমতে বাদলকে নিয়ে বুড়ী ফিরে এল গ্রামে। কিন্তু এসেই কঠিনভাবে সে কলেরা রোগে পড়লে। জাত কুটুম্ব, পাড়া, পড়সী কেউই মুখ চাইলে না তার। তবে আয়ু থাকলে খণ্ডন করে কা'র সাধ্য? এই সময় কোথা থেকে আমারই মত কে একটি অজানা ভদ্রলোকের ছেলে গ্রামে এসে হাজির হোলো, তারই সেবা-যত্নে বুড়ীও সেরে উঠলো আর এই অবোধ ছেলেটা তাকে "কাকা কাকা" বলে তার ন্যাওটো হয়ে উঠলো অসম্ভবরকম। সেই ওকে দু বৎসর ধরে কোলেপীঠে করে মানুষ করেছিল। তার বাঁশী বাজান শুনলে ও যেন সব ভুলে যেত। তারপর একদিন হঠাৎ সে যেমন আকস্মিকভাবে এসে হাজির হয়েছিল তেমনই আকস্মিকভাবে বিদায় নিয়ে গেল। কিন্তু তারপর থেকে সেই যে এই অভাগা বাপমা-খেকো ছেলেটা কেমন হয়ে গেল তা আর বলা যায় না। দিন রাত উদাসভাবে বসে থাকে আর বিকেল হলেই রোজ সে ছেলেটি যেখানে বসে বাঁশী বাজাত ঠিক সেইখানে ছুটে যায়।

এর পর হঠাৎ সে পরশু দিনে ছুটে এসে বুড়ীকে খবর দিয়েছে তার কাকা না হোক নিশ্চয়ই তার কাকার কোন ভাই বোধ হয় আবার এসেছে। বুড়ী কিন্তু চেষ্টাচরিত্র করে সন্ধানও নিয়েছে; এ কাকাও নয় আর তার ভাইও নয় তবে এ ঠিক তারই মত বটে, জমিদারের বড় ছেলে পুলিনের বন্ধু পুজোর বন্ধে বেড়াতে এসেছে এখানে। তবে কথাটা খুলে জানিয়ে বাদলের মনে ব্যথা দিতে আকাঙ্ক্ষা নাই তার—অনেক ব্যথাই পেয়েছে বেচারা এই বয়সে। আহা তাকে কাকা ভেবে সে যদি তৃপ্তি পায় তাই হোক না। তারপর আমার আর কোন কথাই চলতে পারে না। তাই অশুভ ভেবে যে সম্বোধন থেকে তাকে বিরত করতে ইচ্ছা করেছিলাম সেইটাই স্বেচ্ছায় তাকে প্রদান করে গভীরভাবে তাকে আলিঙ্গন করে বুকের মাঝে টেনে নিলাম আর তার ঘন কৃষ্ণ কোঁকড়া কেশগুচ্ছের উপর চুম্বন করে তাকে স্বীকার করে নিলাম। আমার আর কোন পরিচয়ই দিতে হোলো না এদের, কেন না এরা আগের থেকেই সংগ্রহ করে নিয়েছিল স্বয়ং তার অনেকটা। আমি তাই তাদের একজনকার কাকা আর একজনের ছেলে সেজে নিত্যই তাদের ঘরে আসা যাওয়া করে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তুললাম।

রোজই তাদের বাড়ী আসি যাই শুনে বন্ধুবর কিন্তু আমার কেমন যেন আতঙ্কে "ছোট লোক" তার উপর "গরিব প্রজা" বলে চমকে উঠেছিল। তবুও আমি প্রত্যহই ওদের কুটীরে না যেয়ে পারতাম না। আর ওদের ছোঁয়া দুধ,আমসত্ব, রুটি, গুড় খেয়ে বিজয়াতে জেলে বুড়ীকে নমস্কার করতেও দ্বিধা করলাম না। এর উপর বাদল হয়েছিল আমার প্রতিদিনকার বৈকালিক ভ্রমণের সাথী, বাঁশী শোনার একনিষ্ঠ ভক্তশ্রোতা। দেখে শুনে পুলিন বলেছিল—"ঠকবে।" ঠকলামও খুব বলতে হবে।

সেদিন ছিল হৈমন্তিকী শুক্লা নবমী। পুলিনদের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে জগদ্ধাত্রী পূজার জমজমাট আয়োজন। বলির জন্য ছাগ, মেষ, মহিষ, আক, কুমড়ো এক পাশে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত। আর এক পাশে হোমের জন্য বড় বড় শালের কাঠ ভেঙ্গে ছোট ছোট করা হচ্ছিল, বাইরে শানাই মধুরে বেজে চলেছে। জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর সৌম্য মূর্তির সম্মুখে পুরোহিত নবমী পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। সম্মুখস্থ অঙ্গনে কলাপাতার উপর মাটির সরাতে বাতাসা, সুপুরি ও কলা রেখে পশুর রক্ত নিবেদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলি দেখতে ও অঞ্জলী দেওয়ার জন্য পুলিন আমাকেও সেখানে এনে হাজির করলে। এর অনেক আগের থেকে ওদের বাড়ীর আরও সকলে এসে হাজির হয়েছিল। শরীরটা দিন দুই ভাল না থাকায় বেড়াতেও যেতে পারিনি, বাদলের সঙ্গেও দেখা হয় নি। মনটা বড় ঠিক ছিল না। যাই হোক বন্ধুর আকর্ষণেই এখানে এসেছিলাম তবুও। কিছুক্ষণ সেখানে আমি দাঁড়িয়ে থাকার পর শুনতে পেলাম মৃদু স্বরে ডাকছে—"কাকাবাবু!"

"আরে একি বাদল যে আয় আয় এখানে আয় না।"

বেচারা মণ্ডপ থেকে অনেক নীচে অনেক তফাতে দাঁড়িয়েছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। আমার মনে হোলো দুদিন দেখা না পাওয়ার অভিমানে হয়ত গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও।

তাই আবার তাকে ডাকলাম—"আয় না ভয় কি? আমার কথা শুনবি না?"

আর বুঝি সে অবাধ্য হয়ে থাকতে পারলে না। ধীরে ধীরে এসে ধোয়া সিঁড়িগুলো বেয়ে মণ্ডপে উঠে আসতে লাগলে সে। এমন সময় মস্ত একটা হৈচৈ বেধে গেল সেখানে—"গেল গেল—সব গেল ব্যাটা ছোটলোকের ছেলে উঠে যাচ্ছে মণ্ডপে। দূর দূর মার মার, মেরে দূর করে দাও।"

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। আর বেচারা বাদল ভয় পেয়েই বোধ হয় ছুটে তাড়াতাড়ি আমার কাছে আশ্রয় পেতে এগিয়ে আসতে লাগলে। অমনি হোমের সেই একটা প্রকাণ্ড চেলা কাঠ নিয়ে পুলিনের কাকা গজেন সরকার প্রচণ্ডভাবে এসে অকস্মাৎ পেছন থেকে মারলে বাদলকে এক ঘা। আঘাত পেয়ে মর্মর পাথরের মেজেতে বেচারা লুটিয়ে পড়লে আবার তার উপর আর এক ঘা। শিশুর রক্ত-স্রোতে শুভ্র প্রস্তর-অলিন্দ রক্তাক্ত হয়ে উঠলো, আর সরকার মশায় ছোট লোকের ছেলের এই অমার্জনীয় অপরাধের যথেষ্ট শাস্তি প্রদানে সক্ষম জ্ঞানে বীরত্ব-গর্বে তার চতুর্দশ পুরুষের হীনতার কাহিনী ব্যক্ত করতে করতে স্বস্থানে ফিরে এলেন। এক নিমেষের মধ্যে কোনখান দিয়ে কি যে সব কাণ্ড ঘটে গেল দাঁড়িয়ে দেখেও আর তার এক রকম স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা হয়েও প্রতিকার করতে সমর্থ না হয়ে বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে অনুতপ্ত দশরথের মত জ্ঞানহীন রক্তাক্ত বাদলকে নিয়ে সরকার বাড়ী ত্যাগ করলাম। কয়েকবার ডাকতে লোক এসেছে আমাকে ফিরে যেতে আর ইচ্ছা হয়নি সেখানে। কেবল নিজের সুটকেশটা চেয়ে আনিয়েছিলাম। পুলিনও আর আমার সামনে আসতে সাহস পায়নি বোধ হয়। সেদিন সমস্ত রাত্রি ধরে বুড়ীতে আর আমাতে বেচারা বাদলের যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা করলাম। কিন্তু জ্ঞান আর তার ফিরে এলোনা। কেবল মাঝে মাঝে বিকারের ঘোরে—"ওগো আর মেরোনা আমার কাকাবাবুর কাছে যাব"—এই বলে ডুকরে কেঁদে কেঁদে উঠেছে সে। বুড়িকে সেদিন আর কিছু খাওয়াতে পারিনি। রাত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাদলের আত্মাও নশ্বর দেহের মায়া পরিত্যাগ করে কোন অজানা দেশে চলে গেল। তখনও সরকার বাড়ীতে ভোরের সানাই বিসর্জনের সুর ঢালছিল।

নিজের হাতেই বাদলকে নিয়ে গিয়ে আর একজনের মত মাটির তলায় শুইয়ে দিয়ে এলাম। বুড়ীকে এসে জিজ্ঞাসা করলাম সে যদি যায় তো আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। নীরব নিথর পাথরের মত বুড়ী ধীরে ধীরে বললে—"না বাবা আর নয় যেখানে সকলে শুয়ে শেষ নিশ্বাস ফেলেছে সেখানে থেকেই আমি যাব। যে কদিন আছি শ্বশুরের ভিটায় প্রদীপ আমি জ্বালিয়ে যাই।"

এরপর আর কিছু বলা চলে না। সুটকেশ হাতে নিয়ে একলাই দীর্ঘপথ পাড়ি দিলাম। হেমন্তের দীপ্ত রৌদ্রে, দুদিনের অসুস্থতায় পথ হাঁটার শ্রমে, আর এত বড় একটা মানসিক আঘাতে ষ্টেসনে এসে যখন পৌঁছালাম তখন মাথাটা ভয়ানক ধরে উঠেছে। তাড়াতাড়ি সুটকেশ খুলে খানিকটা অডিকলন মাথায় মেখে ষ্টেসনের কলের জলে মাথা পেতে দিলাম। তবুও মাথার সঙ্গে দেহ ও মনটাও অনেকটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে জুড়িয়ে গেল। টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসলাম। হু হু শব্দে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরের বুক দিয়ে ট্রেণখানা ছুটে চলেছিল, তন্দ্রায় আমার চোখ দুটো জড়িয়ে আস-ছিল। কে একজন বাইরে তখন গাইছে—

"[illegible]

ম্যাক-অ্যাডাম, টেলফোর্ড ও মেটকাফ্

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম এ, বি এল্

সূচনা

ইংল্যাণ্ডের রাস্তা দিয়া যখন লোক পদব্রজে, অশ্বারোহণে বা শকটযোগে যাতায়াত করে, তখন ঐ সুন্দর মসৃণ অনায়াসগম্য রাস্তা দেখিয়া কোন পথিকের কি একবারও মনে পড়ে যে, উহারা সার্ধ শতাব্দী পূর্বে কিরূপ ছিল? অনেক দিন পূর্বে এই সমস্ত প্রথম শ্রেণীর রাস্তাকে লোকে "ম্যাক্-অ্যাডাম" রাস্তা বলিয়া অভিহিত করিত। অবশ্য "ম্যাক-অ্যাডাম" নাম লোকের নিকট অনেকটা পরিচিত বলিয়া মনে হইলেও, যিনি পৃথিবীর রাস্তা-নির্মাণে নবযুগের প্রবর্তক, যাঁহার নাম লোকের মুখে মুখে গৃহে গৃহে উচ্চারিত, তিনি—জন লাউডন ম্যাক্-অ্যাডাম—আজও অনেকটা অপরিচিত রহিয়া গিয়াছেন। রেলপথের বা বাষ্পীয় জাহাজের প্রবর্তক জীবনে বহু সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা সাধারণ রাস্তায় যানবাহন চলাচলের সুবিধা বিধান করত ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির মূলীভূত কারণ রূপে বর্তমান, তাঁহারা—ম্যাক্-অ্যাডাম ও টেলফোর্ড—আজ বিস্মৃতির অনন্ত অতলে নিমগ্ন রহিয়াছেন!

জন লাউডন ম্যাক-অ্যাডাম

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর আয়ার নামক স্থানে ম্যাক্-অ্যাডাম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ম্যাক্-গ্রেগর বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, এই বংশ নির্ভীক, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং তাহারা নিজের বিবেক ব্যতীত অন্য কাহারো আদেশ পালন করিত না।

তাঁহার পিতার নাম জেমস ম্যাক্-অ্যাডাম; তিনি ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে আয়ারে প্রথম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন; ফলে শীঘ্রই শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উক্ত কাউন্টির মধ্যে বিশেষ প্রভাবশালী লোকে রূপান্তরিত হন। ম্যাক্-অ্যাডামের বাল্যকালে আয়ারের নিকটবর্তী লেওয়াইনস্থ তাঁহার পিতৃগৃহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং তিনি দৈব-কৃপায় অতি কষ্টে অকালমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। অগ্নিদাহের পরে এই স্থানে তাঁহার পিতৃগৃহ নির্মিত হইল না। উক্ত কাউন্টিতেই ব্লেয়ারকুহান নামক স্থানে আরামদায়ক পল্লীগৃহ নির্মাণ করিয়া তাঁহারা তথায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

বাল্য জীবন

এই স্থানে ম্যাক্-অ্যাডাম তাঁহার বাল্য জীবন পল্লী গ্রামের বালকের অনুরূপভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি লোকের অনিষ্ট করিতেন, বৃক্ষে আরোহণ করিতেন, পাখীর বাসায় গুলি করিতেন; এবং পল্লী-বালকের যে সমস্ত গুণ বা দোষ সচরাচর দেখা যায়, তাঁহার মধ্যেও তাহা পূর্ণ পরিস্ফুট দেখা যাইত। ব্লেয়ারকুহানের নিকটবর্তী মেবোলের প্যারিস স্কুলে তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হইলেন। কিন্তু বালক অবস্থাতেও তিনি লেখা পড়া ও খরগোশ শিকারের মধ্যে রাস্তা ও রাস্তা তৈয়ারীর দিকে মনোনিবেশ করিতেন। ইহা শুনিতে বিসদৃশ হইলেও অতীব সত্য যে, যখন তিনি বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেন, তখনও মেবোল ও কার্ক-অসওয়াল্ড নামক নিকটবর্তী গ্রামের মধ্যস্থিত রাস্তার আদর্শ অংশের নির্মাণে তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। পিতার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও স্থানীয় পদমর্যাদা হেতু তিনি ইহাতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুতে ম্যাক্-অ্যাডাম

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা আয়ারের ব্যাঙ্কার

পরলোক গমন করেন; কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে পুত্রের তত্ত্বাবধানের ভার নিউ ইয়র্কের সমৃদ্ধিশালী বণিক্ স্বীয় ভ্রাতার হস্তে উইলের দ্বারা অর্পণ করেন। সুতরাং বালক ম্যাক্-অ্যাডামকে আমেরিকা পাঠাইয়া দেওয়া হইল; ইহাতে সমুদ্র-পীড়ায় এবং গৃহের জন্য মর্মপীড়ায় আকুল অবস্থাতে তিনি নিউ ইয়র্কে উপনীত হইলেন। কিন্তু পিতৃব্যের স্নেহ-আদরে ভ্রাতুষ্পুত্র অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইল এবং ভাবিল, অবশিষ্ট জীবন ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া নিউ ইয়র্কেই কাটাইবে। আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত ম্যাক্-অ্যাডাম আমেরিকায় কাটাইলেন। যখন উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হইতেছিল, তখন তিনি পুরস্কার বিক্রয়কারী এজেন্টের কার্য করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জন করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

ঔপনিবেশিকেরা যখন যুদ্ধে জয়লাভ করিল এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নূতন শক্তিরূপে দেখা দিল, তখন ম্যাক্-অ্যাডাম স্বীয় জন্মভূমি স্কটল্যাণ্ডে ফিরিবার সঙ্কল্প করেন। যুদ্ধের সময় তিনি যে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, নূতন গভর্ণমেণ্ট উহার বৃহৎ অংশ বাজেয়াপ্ত করেন; কিন্তু তিনি কৌশলে অনেক অর্থ লইয়া দেশে ফিরিলেন এবং উহা দ্বারা আয়ার ও মেবোলের মধ্যবর্তী সৌরী নামক একটি গ্রামে কিছু জমিদারী ক্রয় করিলেন।

পরবর্তী কার্য

পরবর্তী ১৩ বৎসর তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে দিনাতিপাত করেন। কিন্তু যিনি ব্যবসার বহুমুখী প্রতিভা লইয়া কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার পক্ষে সাধারণ গ্রাম্য ভদ্রলোকের জীবনযাপন খুব কষ্টসাধ্য। ফলে নিজের জমিদারী দেখাশুনা ছাড়াও তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে, আয়ারের ডেপুটি লেফ্টেন্যাণ্ট ও রাস্তার ট্রাষ্টের কার্য করিতেন। সুতরাং তিনি দ্বিতীয়বার রাস্তার বিষয় অধ্যয়নে নিরত হইলেন, যাহাতে তিনি বাল্যকালে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন কার্যের ব্যপদেশে দেশের বিভিন্ন দিকে পরিভ্রমণ কালে তিনি লক্ষ্য করেন যে, রাস্তাগুলি মেরামতের অভাবে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রহিয়াছে, বা নৈরাশ্যের অন্ধকূপে বিদ্যমান। অবশ্য রাস্তা-মেরামতকারী লোকেরা অবিরাম তত্ত্বাবধান করিয়াও রাস্তার বিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারিত না; কারণ অধিকাংশ রাস্তা কাঁকর দ্বারা তৈয়ারী হইত; কিন্তু এই সমস্ত আলগা কাঁকর ভারি গাড়ীর চাকাকে ব্যাহত করিতে পারিত না; ফলে রাস্তা নির্মিত হইতে না হইতেই গাড়ীর চাকার আঘাতে খাঁজ-কাটা হইয়া যাইত। ম্যাক-অ্যাডাম প্রথমে রাস্তার এই দুরবস্থা দেখিতেন এবং উহার উন্নতির উপায় কিছুই নির্ধারণ করিতেন না। কিন্তু এই কথা তাঁহার অন্তর-লোকে দিন দিন নব নব চিহ্ন অঙ্কিত করিতে লাগিল এবং অবশেষে তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ রাস্তা-তৈয়ারী-প্রণালী আবিষ্কার করিলেন, যাহাতে রাস্তার উপরিভাগ চাকার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারিবে না।

ইংল্যাণ্ডে অবস্থিতি

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাক-অ্যাডাম ইংল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলের বন্দরসমূহে জাহাজে খাদ্য-সরবরাহকারী এজেণ্টের কার্য লাভ করেন। ইহাতে তিনি আয়ারশায়ার হইতে ইংল্যাণ্ডে গমন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ফ্যালমাউথে বাসস্থান নির্ণয় করিয়া স্বীয় কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এই কার্যে নিউ ইয়র্কে অবস্থান কালে লব্ধ ব্যবসার অভিজ্ঞতা তাঁহার খুব কাজে লাগিয়াছিল।

এই কার্যে তাঁহাকে বন্দরে বন্দরে ঘোরাঘুরি করিতে হইত; ইহাতে তিনি দেখিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের রাস্তাও স্কটল্যাণ্ডের মত খারাপ—কারণ এখানে ভারী গাড়ীর চলাচল অনেক বেশী। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"রাস্তা অসমতল, বন্ধুর, ক্ষয়িষ্ণু, যাত্রীর পক্ষে বিরক্তিকর ও বিপজ্জনক এবং মেরামতের পক্ষে অত্যধিক ব্যয়শীল ছিল।"

স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করিবার পূর্বে স্বীয় জমিদারী সৌরীতেই তিনি নূতন রাস্তা নির্মাণ প্রণালীর পরীক্ষা করিতেছিলেন; এইবার ইংল্যণ্ডে ফ্যালমাউথে উহার পরীক্ষায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

নব প্রণালীতে রাস্তা-নির্মাণে বাধা

ফ্যালমাউথে ম্যাক-অ্যাডাম নিজ ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণে নব প্রণালী প্রবর্তন করিতেছিলেন; কিন্তু উহাতে বাধা দেখা দিল। তাঁহাকে বহু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশ্য কোন নব পদার্থের প্রবর্তনে প্রকৃতিগত বিরক্তি ব্যতীত রাস্তার উন্নতিবিধানে লোকের যে অন্য আপত্তি থাকিতে পারে, তাহা ধারণা করাও কঠিন। কিন্তু মানবের ইতিহাসে প্রত্যেক নব বিষয়ের প্রবর্তককে অনুরূপ বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া স্বীয় পথরেখা বিস্তৃত করিতে হইয়াছে। অবশ্য পরিশেষে যুগ-যুগ-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সম্মিলিত ফলে মানব নবীন আবিষ্কারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

উৎকৃষ্ট রাস্তার উপাদান

গভীর অনুসন্ধানের ফলে ম্যাক-অ্যাডাম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, রাস্তা কেবলমাত্র প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা নির্মিত হওয়া উচিত। অবশ্য এই অনুসন্ধানকালে তিনি যে কোন মজুরের মত শাবল ও গাঁতি লইয়া নিজ হস্তে কার্য করিতেন। তিনি যে আদর্শ রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা করিলেন, উহা সাধারণ সমতল ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত হইবে এবং উহাতে পয়ঃ-প্রণালীর দ্বারা জল নিঃসরণের সুব্যবস্থা থাকিবে। সমস্ত রাস্তা খণ্ডিত প্রস্তরের পাতলা স্তরে আবৃত হইবে; এই খণ্ডিত প্রস্তর সমূহ ঘন বস্তুর আকার-সমন্বিত হইবে এবং কোনটিরই ওজন ৬ আউন্সের বেশী হইবে না।

ম্যাক-অ্যাডাম প্রথমে রাস্তাকে রোলার দ্বারা সমতল করিবার পরিকল্পনা করেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সাধারণ গাড়ীর চলাচলে উহা আপনাআপনি সমতল [illegible] যে, বৃষ্টি বা বাতাস এই রাস্তার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; গাড়ী চলাচলে এই রাস্তার অনিষ্ট ঘটিবে না এবং ইহা প্রস্তরের মত বাধাদানের শক্তি ধারণ করিবে। ইহা সত্ত্বেও, তিনি যে প্রমাণ লোক-চক্ষুর গোচরীভূত করিলেন তাহাতে কেহই কর্ণপাত করিল না; কেহই ভাবিল না যে, এই খাদ্য-সরবরাহকারী এজেন্ট চিরস্থায়ী সন্তোষজনক রাস্তা নির্মাণ প্রণালী অধিগত করিয়াছে।

বৃষ্টলে ম্যাক-অ্যাডাম

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে, ওয়াটার্লু যুদ্ধের বৎসর ম্যাক-অ্যাডাম বৃষ্টলের রাস্তার সার্ভেয়ার জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। এই সময় নিজের উদ্ভাবিত রাস্তা-নির্মাণ প্রণালীতে তিনি খুব কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। ফলে তিনি এই পদের প্রার্থী ছিলেন মাত্র নিজের পরিকল্পনাকে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য। ইতিমধ্যে তিনি রাস্তা-নির্মাণের পরীক্ষায় স্বীয় ব্যক্তিগত সমস্ত অর্থ প্রায় নিঃশেষ করিয়াছিলেন; বিশেষত, রাস্তা গঠন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার; ইহার জন্য সমৃদ্ধি শীঘ্রই অন্তর্হিত হইতে পারে।

বৃষ্টল-রাস্তার পরিবর্তন

বৃষ্টলে কার্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অচিরে স্বীয় পরিকল্পনাকে কার্যক্ষেত্রে রূপদানে চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে বৃষ্টলের রাস্তাসমূহ জলপূর্ণ, কাদাময়, পিচ্ছিল অবস্থা হইতে গাড়ী চলাচলের উপযোগী, সমতল, কঠিন বহিরাবরণযুক্ত, পয়ঃপ্রণালী সংশ্লিষ্ট রাস্তায় রূপান্তরিত হইল। বৃষ্টলের অধিবাসী বিস্মিত হইয়া ভাবিল কি প্রকারে এই স্কটল্যাণ্ডের সার্ভেয়ার জেনারেল এই অলৌকিক কাণ্ড সংসাধিত করিল! লোকে তাঁহার কথা লইয়া যেখানে সেখানে আলোচনা করিতে লাগিল, পর্যটকেরা ও দর্শকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—"আমাদের দেশে কি আমরা বৃষ্টলের মত রাস্তা তৈয়ারী করিতে পারি না?"

পুস্তক-প্রকাশ

ম্যাক-অ্যাডাম যখন দেখিলেন যে, লোকের দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত, তখন তিনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে Practical Essay on the Scientific Repair and Preservation of Roads নামক পুস্তক প্রকাশ করিলেন। পরবর্তী বৎসর তাহার Present State of Road-making প্রকাশিত হইল।

অবশ্য এই দুইখানি পুস্তকের নামকরণ খুব সরল নহে; কিন্তু ম্যাক্-অ্যাডাম তাঁহার বিষয়বস্তু জীবন্তরূপে পাঠকের পুরোভাগে উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার পুস্তক বেশ বিক্রীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যণ্ডের রাস্তা যে সুগম নহে, তাহা লোকের ধারণা-পথে উপনীত হইল এবং সকলে ভাবিল অবিলম্বে ইহার জন্য কিছু করা দরকার।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তকের পঞ্চম সংস্করণ চলিতেছিল এবং ম্যাক-অ্যাডাম-রাস্তার সফলতা সর্বত্র স্বীকৃত হইল।

জনসাধারণের উপকারার্থ কার্য

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক-অ্যাডামের আবেদনে জন-সভার একটি কমিটি দেশের সর্বত্র নূতন প্রণালীতে রাস্তা নির্মাণ সুসঙ্গত কি না সেই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য গঠিত হইল। ম্যাক-অ্যাডাম এই কমিটির নিকট বিস্তৃত সাক্ষ্যদান করিলেন। তখনই লোক বুঝিল, তাঁহার পরিকল্পনাকে সাফল্য দান করিবার জন্য তিনি কি বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন! ১৭৯৮—১৮১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বৃটেনের ৩০,০০০ মাইল রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া উহা পরীক্ষা করিয়াছেন। এই ভ্রমণে তাহার ২০০০ দিন ও ৩০০০ পাউণ্ড অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। এই ভ্রমণের ব্যয় ব্যতীত তিনি ব্যক্তিগত পরীক্ষার জন্যও প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যয় তিনি কোন স্বার্থসিদ্ধির আশায় করেন নাই; তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জন-সাধারণের উপকারার্থ রাস্তার উন্নতি সাধিত হউক. যাঁহারা দুঃখী, ব্যথিত, পীড়াগ্রস্তের জন্য কাজ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের কাজের জন্য সম্মানিত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে দীর্ঘকালব্যাপী ধীর কষ্টকর ভ্রমণে যে পরিশ্রম ম্যাক-অ্যাডাম স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাও পরের উপকারের জন্য— উহা অন্যান্য জনহিতকর অনুষ্ঠান হইতে উচ্চে ভিন্ন নিম্নে অবস্থিত নহে।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কমিটির রিপোর্টের ফলে ম্যাক-অ্যাডাম ইংল্যণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের রাস্তার সাধারণ সার্ভেয়ার নিযুক্ত হন এবং পার্ল্যামেণ্ট বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে পূর্বকালে ব্যয়িত অর্থের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মোট ১০,০০০ পাউণ্ড প্রদান করেন।

পরিকল্পনার রূপদান

অতঃপর ম্যাক-অ্যাডাম দেশের সর্বত্র তাঁহার পরিকল্পনার রূপদানে উঠিয়া উড়িয়া লাগিলেন। ক্রমবর্ধমান বয়সকে উপেক্ষা করিয়া তিনি অক্লান্তভাবে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হন। হার্টফোর্ডএর নিকটবর্তী হড্‌স্‌ডনে বাস করিলেও তিনি দেশের সর্বত্র গাড়ী করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার গাড়ীর পশ্চাতে একটি নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দেশীয় কুকুরকে ছুটিতে দেখা যাইত।

গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নাইট উপাধি দ্বারা বিভূষিত করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তাঁহার প্রধান সন্তোষের বিষয় ছিল দেশের সর্বত্র পরিকল্পিত রাস্তা প্রস্তুত দেখা।

পারিবারিক জীবন

ম্যাক-অ্যাডাম দুইবার বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পত্নীই আমেরিকাবাসিনী ছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে চারিটি পুত্র ও তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার এক পুত্র পরবর্তী কালে পিতৃ-পরিত্যক্ত নাইট উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবপ্রবণ উদারহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন এবং মূর্খের কথা প্রতিবাদ না করিয়া সহ্য করিতেন না। যদি কেহ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে যুক্তিহীনের মত কথা বলিত, তবে তিনি অনেক সময় ক্রুদ্ধ হইতেন;

মেজাজ ঠিক রাখিতে পারিতেন না, কিন্তু বন্ধুবর্গ ও পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের নিকট তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক রূপে প্রতিভাত হইতেন।

শেষ জীবন ও মৃত্যু

জীবনের শেষভাগে তিনি বাল্য জীবনের পরিচিত স্থানসমূহ পরিদর্শনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে স্কটল্যাণ্ডে গমন করিতেন। কিন্তু রাস্তা নির্মাণের শ্রমসাধ্য কর্মে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল; ফলে স্কটল্যাণ্ড হইতে ফিরিবার পথে ডামফ্রিশায়ারের অন্তর্গত মোফাট নামক স্থানে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ম্যাক-অ্যাডাম হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। দেশের লোকের অতুলনীয় উপকারে উৎসর্গীকৃতজীবন ম্যাক-অ্যাডাম দরিদ্ররূপেই মৃত্যুকে বরণ করেন; তবে মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বেও তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি দরিদ্র বটে কিন্তু সাধু।"

টমাস টেলফোর্ড

টমাস টেলফোর্ড ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে ডামফ্রিশায়ারের অন্তর্গত ওয়েষ্টারকার্ক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জন টেলফোর্ড। ওয়েষ্টারকার্ক—চতুর্দিকে পার্বত্য তুঙ্গভূমি পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম; এই গ্রামে ৩৭০ জন কৃষকের বাস ছিল। জন টেলফোর্ডও এই স্থানে মেষপালক ছিলেন। তিনি চতুর্দিকে মাটির প্রাচীর বেষ্টিত পর্ণাচ্ছাদিত কুটিরে বাস করিতেন।

একবার কোন লোক এই স্থানের কোন পুরোহিতকে এই উপত্যকার অধিবাসীর প্রাকৃতিক বৃদ্ধির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় পুরোহিত উত্তর দিয়াছিলেন—"তাহারা দিন দিন বাড়িতেছে, কেহ ভারতবর্ষে, কেহ আমেরিকায় কেহ টেলফোর্ডের মত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া লণ্ডনে অবস্থিতি করিতেছে; তবে আমি একমাত্র সেই উপত্যকাবাসী যে, ওয়েষ্টমিনষ্টার গির্জায় উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছে।"

বাল্য জীবন

টমাসের বয়স যখন তিন মাস তখন জন টেলফোর্ড মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার ও শিশু পুত্রের ভরণপোষণের কোনরূপ ব্যবস্থা রহিল না। টমাস একটু বয়স্ক হইয়াই পিতার সমাধির উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিলেন। এই সমাধি-স্তম্ভে তিনি নিজেই অক্ষর খোদিত করিয়া লিখিলেন—"জন টেলফোর্ডের স্মৃতি রক্ষার্থ—যিনি ৩৩ বৎসর নির্দিষ্ট মেষপালকের কার্য করিয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে গ্লেন্‌ডিনিংএ মৃত্যুমুখে পতিত হন।"

টমাসের মাতা মহীয়সী মহিলা ছিলেন। তিনি নিজের অসহায় অবস্থাতে প্রভূত মানসিক শক্তি বলে পুত্রের লালনপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। অবশ্য দয়ালু প্রতিবেশীরাও এই অসহায় মাতা-পুত্রকে সাহায্য করিত। ফলে বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া টমাসের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। বালকটিও অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় এবং তুষ্ট ছিল। ফলে টমাস দশ বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্বেই উপত্যকাবাসী সকলের নিকট "Laughing Tam" নামে পরিচিত ছিল। আরও একটু বড় হইয়া টমাস গ্রীষ্মকালে মেষপাল রক্ষণে নিযুক্ত হইল। শীতকালে নিকটবর্তী কৃষকের গৃহে বাস করিত, তাহাদের সংবাদ বহন করিত, রান্নাঘর পরিষ্কার করিত এবং অন্যান্য কাজ করিত। পারিশ্রমিক স্বরূপ নিজের আহার, এক জোড়া মোজা ও বাৎসরিক পাঁচ শিলিং জুতা কিনিবার জন্য পাইত।

শিক্ষানবীশ টমাস

ওয়েষ্টারকার্কে একটি প্যারিস বিদ্যালয় ছিল। কালে টমাস এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি যে শিক্ষালাভ করেন, তাহা নগণ্য বলা চলে, কিন্তু এই স্থানের অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁহার নিকট

আশীর্বাদের মত প্রতীয়মান হইয়াছিল; কারণ তিনি এই স্থানে লিখিতে পড়িতে ও সামান্য গণিতিক সমস্যা সমাধান করিতে শিক্ষা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল শেষ হইল; এইবার কোন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করা অনিবার্য হইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন প্রস্তর-মিস্ত্রীরূপে জীবন অতিবাহিত করিবেন। সুতরাং তিনি নিজের গ্রামের নিকটবর্তী লকম্যাবেন নামক সহরের প্রস্তর-মিস্ত্রীর নিকট শিক্ষানবিশরূপে ভর্তি হইলেন। এই স্থানে মনিবের নিষ্ঠুরতায় তিনি কয়েক মাস পরেই তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এই মনিব অনেক সময় তাঁহাকে পেট ভরিয়া খাইতে দিত না। কিন্তু তাঁহার প্রত্যাগমনে তাঁহার মাতা শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। কারণ যে সমস্ত শিক্ষানবিশ নির্ধারিত সময় অতিবাহিত না করিয়া যায়, তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডদানের আইন বর্তমান; হয়ত টমাসকেও সেই আইনের কবলে পড়িয়া জেলে যাইতে হইতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেইরূপ কিছু সংঘটিত হইল না। অবিলম্বে টমাস ল্যাং হোমের এণ্ড্ টমসনের নিকট শিক্ষানবিশীতে ভর্তি হইলেন। এই স্থানে অবস্থিতি সময়ে অবসর কালে তিনি স্বীয় বিদ্যার উন্নতিবিধানে মনোযোগী হন। সাহিত্য অবিলম্বে তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। প্যাসলি নাম্নী একটি মহিলা তাঁহাকে স্বীয় লাইব্রেরী হইতে পুস্তক পাঠ করিতে দিতেন। এই মহিলা ল্যাংহোমের অধিবাসী ও টমাসকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

কর্মক্ষেত্রে টমাস

কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যয়নের মধ্যে টমাসের শিক্ষানবিসের বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। অচিরে তিনি দৈনিক ১৮ পেন্স বেতনে ভ্রমণকারী রাজমিস্ত্রীতে রূপান্তরিত হইলেন। এই কার্যে তিনি গৃহ, সেতু ও গির্জা নির্মাণে সবিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি স্বীয় অঞ্চলে সুদক্ষ রাজমিস্ত্রীরূপে পরিচিত হন। নিজ জন্মভূমির শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া টমাস ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে নব নির্মিত এডিনবরা সহরে কার্যান্বেষণে যাত্রা করিলেন। তাঁহার দক্ষতা তাঁহাকে বেশ ভাল বেতনে বহু কার্য যোগাড় করিয়া দিল, এইরূপে দুই বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি ইংল্যণ্ড যাত্রার সঙ্কল্প করেন।

ইংল্যণ্ডে টমাস

সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি স্বীয় জন্মভূমির নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিলেন; বন্ধুবান্ধবগণের নিকটও চির বিদায় গ্রহণ কর ত নিজের জিনিষপত্র বাঁধিয়া অশ্বারোহণে স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করেন। একজন দেশীয় আড়তদার লণ্ডনে একটি ঘোড়া পাঠাইতেছিল; এই সুযোগে সে উহা টমাসকে ভাড়া দিয়া সস্তায় লণ্ডন পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল।

লণ্ডনে পৌঁছিয়া তিনি কাজ খুঁজিয়া পাইলেন। প্রথমে তিনি সামারসেট হাউসে কার্য করেন, উহা তৎকালে নির্মিত হইতেছিল। মিস প্যাসলি তাঁহাকে অ্যাডাম ব্রাদার্সের নিকট পরিচয়-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যও তিনি কিছুকাল কাজ করেন। যত্ন ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি প্রথম শ্রেণীর রাজমিস্ত্রী বলিয়া নিজেকে প্রতিপন্ন করিলেন।

এক বৎসর পরে তিনি লণ্ডন হইতে পোর্টসমাউথে গমন করেন, এই স্থানে তিনি ফোরম্যান মিস্ত্রীর কার্যে নিযুক্ত হইলেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের শরৎকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি পোর্টসমাউথে অতিবাহিত করেন; এই স্থানে বহুবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং নিয়োগ কর্তার মূল্যবান্ প্রশংসাবাদ লাভ করিয়াছিলেন। পরিশেষে এই নৌবন্দরের কার্য শেষ হইল এবং তিনি নূতন কার্যের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

উন্নতির পথে টমাস

এই সময় শ্রুসবেরীর পার্ল্যামেণ্টের সদস্য মিঃ পুলটেনী একজন সুদক্ষ রাজমিস্ত্রীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। শ্রুসবেরীস্থ তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করার কাজের জন্য এই মিস্ত্রীর দরকার ছিল। টমাসকে তাঁহার কোন পরিচিত ব্যক্তি সুপারিশ-পত্র দিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া

দিলেন, এই তরুণ উৎসাহী স্কটল্যাণ্ডবাসী শ্রপশায়ারে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টরূপে গমন করিলেন—জীবনের উন্নতি-পথে এই তিনি দ্বিতীয় সোপানে পদার্পণ করিলেন—প্রথম সোপান পোর্টসমাউথে ফোরম্যান মিস্ত্রীর পদ লাভ।

মিঃ পুলটেনী টমাসকে অত্যন্ত বিশ্বাস ও পছন্দ করিতেন; ফলে তাঁহার নিজের কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি টমাসের জন্য কাউন্টির পূর্ত বিভাগের সার্ভেয়ারের পদ যোগাড় করিয়াছিলেন। এই পদলাভ টমাসের জীবনে এক যুগান্তর আনয়ন করিল—এখন আর তিনি মিস্ত্রী নহেন, পরন্তু নিজেই কর্তা।

সার্ভেয়াররূপে তাঁহার খ্যাতি দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল; তাঁহার সঙ্গীরাও তাঁহাকে তরুণ উন্নতিশীল কর্মীরূপে অভিনন্দিত করিতে লাগিল। তিনি শ্রুসবেরীতে মাত্র কয়েক বৎসর ছিলেন। অতঃপর তিনি এল্‌স্‌মিয়ার খালের এঞ্জিনিয়ারের পদ গ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন—এই পদ কাউন্টি সার্ভেয়ারের পদ অপেক্ষা অনেক ভাল, তাহা বলাই বাহুল্য। টমাস এই পদ গ্রহণ করেন এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক জরীপ কার্য শেষ হইল; খাল কাটা কার্যেও টমাস অন্যান্য কার্যের মত নিজের দক্ষতা প্রতিপন্ন করিলেন। তাঁহার কার্য পূর্ণ সফলতা লাভ করে। Pont-Cysylltau সেতু ও Chirk সেতু—এই দুই বৃহত্তম সেতু নির্মাণ দ্বারা তিনি সহসা বৃটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিবিল এঞ্জিনিয়ার বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন, এবং যশের তুঙ্গ শিখর এত সহসা অধিগত করিলেন যে, লোক নির্বাক্-বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। তিনি যে একজন এঞ্জিনিয়ারিং প্রতিভাশালী ব্যক্তি, সেই বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহের অবকাশ রহিল না।

সেতু-নির্মাণে টমাস

খালের কার্য সম্পূর্ণ হইবার পর সেতু-নির্মাণকারীরূপে টমাসের নাম বিখ্যাত হইয়া পড়ে এবং সেতু-নির্মাণের বহু প্রস্তাব তাঁহার নিকট আসিতে থাকে। যে কেহ বৃহৎ বা সুন্দর সেতু নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করিত, সেই টমাসের নিকট উপস্থিত হইত, এবং তাঁহাকে ঐ কার্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিত। ডি নদীর উপর টাংল্যাণ্ড সেতু ও বিউড্‌লি সেতু তিনি নির্মাণ করেন এবং তিনি লণ্ডনের নিকট টেমস নদীর উপর নির্মাণার্থ এক-খিলান-বিশিষ্ট লৌহ-সেতুর পরিকল্পনা করেন; কিন্তু ইহা কার্যে রূপান্তরিত হয় নাই। ব্যবসা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমি একজন ভ্রমণকারী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছি; আমি টেনিশ বলের মত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতেছি;...সত্য কথা বলিতে গেলে, ইহা আমার প্রকৃতির অনুরূপ।"

১৮০২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্কটল্যাণ্ডে জরীপ করিয়া দেশের রাস্তা ও সেতুর অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। ফলে টমাস স্বীয় জন্মভূমির সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয়ের রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টই পরিশেষে গভর্ণমেণ্টের স্কটল্যাণ্ডের রাস্তার আইনের ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল।

টমাসের দূরদৃষ্টি

টমাস স্বীয় দূরদৃষ্টি বলে দেশের লোকের অভাব-অভিযোগ বেশ ভাল করিয়া বুঝিতেন, এবং যে পথে গেলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে, তাহা নির্ধারণ করিয়া প্রভূত রাস্তা নির্মাণ করেন। স্কটল্যাণ্ডের সার্ভের পর টমাস ক্যালিডোনিয়ান খাল খননে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই খালের প্রাথমিক জরীপ কার্য জেমস্ ওয়াট নিষ্পন্ন করেন। টমাস Loch Eil ও Loch Lochy—এই ৮ মাইলের মধ্যে ৮টি বিশাল লক নির্মাণ করেন, ইহাতে ৮ মাইলে জল ৯০ ফিট নীচে নামিয়া পড়ে; এই লক এখনও "বরুণের সিঁড়ি" (Neptune's staircase) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এই খালের কার্য আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রথম জাহাজ খালের মধ্য দিয়া সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে গমন করে। এই খাল খনন করিতে ১,৩০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয়; কিন্তু টমাস প্রধান এঞ্জিনিয়াররূপে মাত্র বার্ষিক ২৩৭ পাউণ্ড পাইতেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পার্ল্যামেণ্টারী কমিটি বহু রাস্তার, বিশেষত গ্লাসগো ও কার্লাইলের মধ্যবর্তী রাস্তার অবস্থা ধ্বংসোন্মুখ ও বিপজ্জনক বলিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন। ফলে এই রাস্তাকে পুনর্গঠিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং টমাসকে এই কার্যের ভার দেওয়া হয়।

মেনাই প্রণালীর উপর ঝুল্যমান-সেতুনির্মাণ

টমাসের প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান স্রুসবেরি-হোলিহেড্ রাস্তা নির্মাণ। এই কার্য কেবলমাত্র কঠিন সমতল রাস্তা নির্মাণ নহে; পরন্তু পাহাড় অতিক্রম করা, বহু সেতু, খিলান প্রভৃতি গঠন এবং সর্বোপরি মেনাই প্রণালী অতিক্রম করা—এই রাস্তা নির্মাণের বিশেষত্ব। ক্রমশঃ নূতন রাস্তা নির্মিত হইতে লাগিল; ধীরে ধীরে এই পথ পাহাড়-উপত্যকা অতিক্রম করিয়া স্রুসবেরি হইতে ব্যাঙ্গোর পর্যন্ত উপনীত হইল; অন্য দিকে হোলিহেড হইতেও অ্যাঙ্গলসি পর্যন্ত রাস্তা বিস্তৃত হইল; কিন্তু এই উভয় সীমার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রহিল মেনাই প্রণালী। টমাস, তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ঝুল্যমান সেতুর দ্বারা এই প্রণালী অতিক্রম করিবার পরিকল্পনা করিলেন।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রস্তর খণ্ড সংস্থাপিত হইল এবং সেতুর নির্মাণ-কার্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরিয়া একদল পরিশ্রমী মজুর সেতুর নির্মাণ-কার্যে পরিশ্রম করিতে লাগিল এবং টমাস সেতু-নির্মাণ ও ক্যালিডোনিয়ান খাল খনন—এই উভয়বিধ অবস্থার সামঞ্জস্য বিধানে প্রায় উন্মত্তের মত হইয়া উঠিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান শৃঙ্খল ঝুলান হইল; ১৭১৫ ফিট দীর্ঘ ১৬ গাছি শৃঙ্খল প্রায় ৬০ ফিট পাহাড়ের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, এই শৃঙ্খলমালা ২,০১৬ টন ভার বহনে সমর্থ ছিল; এই শৃঙ্খল হইতে রাজপথ ঝুলান হইল; ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম উহা লোক ও মাল-চলাচলের জন্য খোলা হয়।

ভারতবর্ষে হরিদ্বারের সন্নিকটে লছমনঝোলায় গঙ্গার উপর এইরূপ ঝুল্যমান সেতু বর্তমান। উহা দেখিলে টমাসের পরিকল্পনার আভাস্ পাওয়া যায়।

পুল তৈয়ারী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা নির্মাণও শেষ হইল,—টমাসের কর্মব্যস্ত জীবনের চরম সিদ্ধিলাভ ঘটিল।

শেষ জীবন ও মৃত্যু

টমাস আরও কয়েক বৎসর স্বীয় ব্যবসা চালাইয়া ছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্রম-বর্ধমান বধিরতা হেতু কর্মক্ষেত্র হইতে একরূপ অবসর গ্রহণ করেন, তিনি ওয়েষ্টমিনষ্টারের সন্নিকটে অ্যাবিংডন ষ্ট্রীটে স্বীয় বাস ভবনে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ ওয়েষ্টমিনষ্টার গির্জায় সমাহিত করা হয়।

জন মেটকাফ

টমাস টেলফোর্ড এবং লাউডন ম্যাক-অ্যাডামএর অভ্যুদয়ের পূর্বে জন মেটকাফ বহু উৎকৃষ্ট রাস্তা নির্মাণ ও সেতু-রচনা কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি সাধারণত নেয়ারুজবরোর অন্ধ জ্যাক নামে পরিচিত ছিলেন।

জন মেটকাফ ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছয় বৎসর বয়সে বসন্ত রোগের আক্রমণে অন্ধ হইয়া যান। কিন্তু স্বীয় দৃষ্টিহীনতা সত্বেও শিকার করা বা অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতেন।

যন্ত্র-সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি হ্যারোগেটে বেহালা-বাদক নিযুক্ত হন। প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া তিনি উক্ত কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে হঠাৎ তাঁহার মাথায় নূতন খেয়াল চাপিল এবং তিনি অবিলম্বে রাস্তা ও সেতু-নির্মাণ-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই কার্য তিনি সুচারুরূপে নির্বাহ করেন; তিনি যে প্রণালীতে রাস্তা নির্মাণ করিতেন সেই প্রণালীর মধ্যে কতকগুলি পরবর্তীকালে ম্যাক-অ্যাডাম নিজের কর্মপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।

জন মেটকাফ ৯৬ বৎসর জীবিত থাকিয়া পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উপসংহার

অবশ্য ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে রাস্তা-নির্মাণ ও উহার উন্নতি-সাধন উপরি লিখিত তিনজন মনীষীর অবদান। কিন্তু ভারতবর্ষে এই সমস্ত মনীষীর উদ্ভবের বহু পূর্ব হইতে রাস্তা নির্মাণ-কার্য চলিতেছিল। সম্রাট্ সেরসাহ বঙ্গদেশ হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন। এতদ্ভিন্ন আরও বহু রাস্তা মোগল-রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল, তাহার নির্মাণ-প্রণালী তৎকালীন ইয়োরোপীয় নির্মাণ-প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, সন্দেহ নাই। কালের কুটিল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া উহা আজও সদর্পে বিরাজমান। এতদ্ভিন্ন ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাই হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রম পর্যন্ত ১৮০ মাইল দীর্ঘ যে রাস্তা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজও বিদেশী পর্যটকের বিস্ময় উৎপাদন করে এবং উহাতে টেলফোর্ডের বহু পূর্বে দুল্যমান পুল দেশীয় প্রথায় গঠিত হইয়াছিল।

পঞ্চপুষ্প

তারকার বাণী

সম্প্রতি নক্ষত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সার আর্থার এডিংটন বেতারবার্তার মারফৎ এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে উহার সারমর্ম উদ্ধৃত করা গেল।

"তারকা কিসের দ্বারা গঠিত উহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তারকার আলোক যখন স্পেক্‌ট্রস্কোপের মধ্য দিয়া গমন করে, তখন উহাতে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ রেখা দৃষ্টিগোচর হয়; এবং তাহার মধ্যে যে রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান, তাহা জানিতে পারা যায়, কারণ প্রত্যেক পদার্থের স্বতন্ত্র রেখা-সমষ্টি বিদ্যমান।

অণু ও বেতার-বিকিরণ-কেন্দ্রের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে; উহাদের প্রত্যেকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বিকিরণ করে। প্রকৃত পক্ষে অণু ক্ষুদ্র বেতার-বিকিরণ-কেন্দ্র; উহারা যে আল্‌ট্রা হ্রস্ব তরঙ্গ বিকিরণ করে, তাহাকে আমরা আলোক বলি এবং আমাদের চক্ষুই উহার গ্রহণ-যন্ত্র। আমরা দিল্লীকে কলিকাতা হইতে পৃথক বলিয়া জানিতে পারি, উহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দ্বারা; সেইরূপ হাইড্রোজেন অণু হইতে ক্যালশিয়াম অণুর পার্থক্য বিকাশ করে বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য।

এই প্রকারে রাসায়নিক পদার্থের পার্থক্য-নির্ণয়-প্রণালী পার্থিব পদার্থের বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং এই প্রণালী আলোক যে স্থান হইতে নির্গত হউক না কেন—ল্যাবরেটারীর পদার্থ হইতে কিম্বা শূন্যমার্গের মধ্য দিয়া নয় বৎসর ভ্রমণের অবসানে Sirius হইতে—সমস্ত আলোকের প্রতি প্রযোজ্য।

এই প্রকারে যদি আমরা Siriusএর আলোক বিশ্লেষণ করি, তবে আমরা হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্য পদার্থ খুব কম দেখিতে পাইব। সূর্যালোক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা কতকগুলি ধাতু দেখিতে পাই। উহার মধ্যে লৌহ প্রধান, কিন্তু আমাদের হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে যে, সূর্য লৌহ দ্বারা এবং Sirius হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত। অবশ্য পার্থিব পদার্থের বিশ্লেষণে রাসায়নিক চাপ ও তাপের সমতা রক্ষা সম্বন্ধে যত্নবান হইতে পারেন; কিন্তু তারকা সম্বন্ধে আমাদের সেরূপ কিছু করা সম্ভব নহে; উহাকে আমরা যেরূপভাবে দেখি, সেইরূপই গ্রহণ করি।

প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, Siriusএর উপরিভাগের চাপ ও তাপ হাইড্রোজেন অণুর উত্তেজনার অনুকূল;—অন্য কোন পদার্থের পক্ষে তেমন অনুকূল নহে; সেইরূপ সূর্যের

তাপ অপেক্ষাকৃত নিম্ন বলিয়া লৌহ-অণুর পক্ষে যেরূপ অনুকূল ; হাইড্রোজেনের পক্ষে তেমন অনুকূল নহে।

যতদূর নির্ণয় করা সম্ভব, তাহাতে দেখা যায় যে, তারকামণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থ বিদ্যমান, পৃথিবীতেও তাহাই আছে—নূতন কোন পদার্থ তারকায় কিম্বা নীহারিকায় দেখা যায় না। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পৃথিবীর একটি প্রয়োজনীয় গ্যাস প্রথমে সূর্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই গ্যাসকে হিলিয়াম বলে। উহার অর্থ সূর্যের উপাদান। এই গ্যাস ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সূর্যে ধরা পড়ে; উহার ২৭ বৎসর পরে, উহা পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়। সকলেই জানেন, সেই হইতে হিলিয়াম কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকভাবে নহে, পরন্তু ব্যবসা হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

যদি নক্ষত্র-বিজ্ঞান কেবলমাত্র আমাদের পরিচিত পদার্থ শূন্যমার্গে দূর দূরান্তরে অবস্থিত তারকায় আবিষ্কার করিত, তবে উহা নিশ্চয় নীরসরূপে প্রতিভাত হইত। কিন্তু আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, উহা তারকার আকার ও উহার রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধেও আমাদিগকে শিক্ষা দান করে।

যখন আমরা কোন পীতবর্ণের রেখা দেখি, তখন আমরা শুধু মনে করিনা যে, সোডিয়াম উহার মধ্যে বর্তমান, পরন্তু উহার তাপ ও ঘনত্ব সোডিয়াম উৎপাদনের অনুকূল। সুতরাং ইহা বলা চলে স্পেকট্রস্কোপের রেখা প্রাকৃতিক অবস্থার সাঙ্কেতিক চিহ্ন; এই সাঙ্কেতিক চিহ্নের অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া এক কথা কিন্তু উহার সম্যক্ অর্থ নির্ধারণ দুরূহ ব্যাপার।

ভারতীয় অগ্রদূত

এই সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ নির্ণয় ব্যাপারের বিকাশে একজন ভারতীয় অগ্রদূত—তিনি এলাহাবাদের অধ্যাপক সাহা। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ নির্ণয়ের সাধারণ সূত্র তিনি আবিষ্কার করেন এবং তদবধি উহা সফলতা সহকারে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মতবাদ অবিলম্বে সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। সেই হইতে সমস্ত ব্যাবহারিক পর্যবেক্ষক ও গবেষক তারকার বহির্মণ্ডল পঠনে এই প্রণালীর জটিল তত্ত্ব অনুসরণে ব্যস্ত রহিয়াছেন।

তারকার উপরিভাগের তাপের তারতম্য বর্তমান। রক্তবর্ণ তারকা সর্বাপেক্ষা শীতল। উহার উত্তাপ পৃথিবীতে প্রাপ্ত চুল্লীর তাপের অনুরূপ—২০০০-৩০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্। অতঃপর সূর্যের ৬০০০ ডিগ্রি ও Siriusএর তাপ ১১০০০ ডিগ্রিতে আমরা উপনীত হই। সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত তারকার তাপ—২০,০০০—৩০,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্। কিন্তু এই উত্তাপ বিশাল অগ্নিকুণ্ডস্বরূপ তারকামণ্ডলীর উপরিভাগের কিনারার তাপমাত্র।

নিম্নে—তারকার অভ্যন্তরে উত্তাপ অনেক অধিক। আমার মনে হয় আমরা উহার অভ্যন্তরের উত্তাপ ঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে পারি। তারকামণ্ডলী আভ্যন্তরীণ উত্তাপে প্রায় একরূপ—সূর্য, Sirius ও অধিকাংশ তারকার মধ্যস্থলে উত্তাপ ১৫০ লক্ষ ডিগ্রি।

যে সমস্ত তারকা আমরা খণ্ড দৃষ্টিতে দেখি, তাহারা বাষ্পময়—উহা গ্যাস বা বাষ্পপিণ্ড মাধ্যাকর্ষণ বলে একত্র সংশ্লিষ্ট থাকে। তাহাদের কতকগুলি আমাদের চতুর্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাও হাল্কা। কিন্তু দূরবীক্ষণ দ্বারা আমরা এক প্রকার তারা দেখিতে পাই যাহা বাষ্পময় নহে। এই সমগ্র তারকাকে যে কি নামে অভিহিত করিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না, কারণ তাহারা আমাদের পৃথিবীস্থ কঠিন, তরল বা বাষ্পময় প্রকৃতির কোনটিই নহে।

তাহাদের মধ্যে আমরা একরূপ পদার্থ দেখিতে পাই যাহার ঘনত্ব পূর্বে কল্পনা করা সম্ভব হয় নাই। এই সমস্ত তারকাকে সাধারণতঃ 'শ্বেত বামন' বলে। ইহার মধ্যে যেটি সবিশেষ পরিজ্ঞাত, সেটি Siriusএর সঙ্গী। সমস্ত তারাই সূর্যের মত একাকী নহে; অনেকগুলি যুগ্ম—দুইটি তারকা পরস্পরের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। Sirius কথকটা ঐরূপ, ইহার সন্নিকটে একটি ক্ষীণ তারা বিদ্যমান। Sirius হইতে ইহার দূরত্ব সূর্য হইতে নেপচুনের দূরত্বের অনুরূপ। ইহা Siriusএর চতুর্দিকে স্বীয় কক্ষে ৫০ বৎসরে একবার ঘুরে। কিন্তু ইহা গ্রহ নহে—প্রকৃত তারা। ইহা

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই তারার ঘনত্ব খুব বেশী। ইহার পদার্থনিচয় এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে, ইহার গঠন তারকার মত হইলেও আকারে গ্রহের মত, ইহার গঠন পদার্থ প্ল্যাটিনামের ২০০০ গুণ ঘন। ইহার এক ঘন ইঞ্চির ওজন এক টন।

শেষ কথা এই যে, কে এই লক্ষ কোটি বৎসর ধরিয়া তারকাকে তাপ ও আলোক বিকিরণ করে? কে তাহা সরবরাহ করে? ইন্ধন না দিলে পার্থিব চুল্লী নিভিয়া যায়; তারকা স্বর্গীয় চুল্লী; সুতরাং উহারও ইন্ধনের অপরিমাণ সরবরাহ থাকা দরকার, যাহাতে ইহা এই শক্তিলাভ করে। ইহা খুব সম্ভব যে, পদার্থের পরিবর্তনের দ্বারা উহা এই শক্তি পাইয়া থাকে। এই পরিবর্তনের বিষয় লর্ড রাদারফোর্ড প্রথম আবিষ্কার করেন।

তারকার অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন আমাদের পরিজ্ঞাত ৯১ রকমের জটিল অণুতে রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। পরিবর্তন কালে উত্তাপ এক কোটি ডিগ্রি ও লক্ষ লক্ষ বায়ুমণ্ডলের চাপ থাকে। তাহাতেই এই রাসায়নিক পরিবর্তন সংসাধিত হইয়া থাকে, এবং জীবনের উপযোগী বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু উৎপন্ন হয়। এই উপায়ে কিছু শক্তি মুক্তিলাভ করত তারকার তাপ ও আলোক রক্ষা করিতেছে।"

ষ্টেট্‌সম্যান

পুকুরে ইলিশ মাছের চাষ

বাংলা গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মৎস্য-বিশেষজ্ঞ কর্মচারী ডক্টর আর নাইডুকে বাংলা দেশে পাঠাইয়াছেন। ইনি মৎস্যের চাষ-সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া ইহার উন্নতিকল্পে বাংলা গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন।

কোনও সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে ডক্টর আর নাইডু বলিয়াছেন,—"আমি শুনিলাম, ইলিশ মাছ বাংলা দেশের অধিবাসীর খুব প্রিয় খাদ্য। বর্ষাকালে প্রধানতঃ এই মাছই বাংলার চাহিদা মিটায়। যখন ইচ্ছা যেমন খুসী এই মাছ ধরা হয়। ইলিশ মাছের পেটে যখন ডিম হয় তখন এই মাছ মারিতে কসুর করা হয় না। এইরূপ যথেষ্ট মাছ ধরিলে ভবিষ্যতে হয়ত ইলিশ মাছের সংখ্যা খুব কমিয়া যাইবে। হয়ত এই মাছ একেবারে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। মাদ্রাজে আমার এই-রূপ অভিজ্ঞতা আছে। মাদ্রাজের নদীতে ইলিশ মাছ হইত; অধুনা বাঁধ নির্মাণের ফলে জলস্রোত মৃদু হইয়াছে, তাই ইলিশ মাছ কমিয়া গিয়াছে। সময় থাকিতে সতর্ক হইলে এবং যথোচিত ব্যবস্থা করিলে ইলিশ মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।"

ডক্টর নাইডু আরও বলেন,—"কৃত্রিম উপায়ে ইলিশ মাছের ডিম ফুটাইয়া পোনা উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই পোনা নদীতে কিংবা পুকুরে জীয়াইয়া প্রচুর ইলিশ মাছ জন্মান যাইতে পারে।"

সমুদ্রের লোণা জলে এবং ভূমধ্যের নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুরের সুমিষ্ট জলে যে সব মাছ জন্মে,—সেই সব মাছের বিষয়েই ডক্টর নাইডু তদন্ত করিবেন। প্রথমতঃ তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে মনোযোগ দিবেন। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া বাংলার মৎস্য-সম্পদ্‌ বৃদ্ধির জন্য তিনি কতকগুলি উপায় নির্দেশ করিবেন।

মৎস্য বিক্রয়, মাছ তাজা রাখা, চালান দেওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধেও তিনি কয়েকটি প্রস্তাব করিবেন। যথেচ্ছভাবে মাছ ধরা বন্ধ করিবার জন্য আইনপ্রণয়নের প্রয়োজন। সম্ভবতঃ তিনি এরূপ পরামর্শও দিবেন।

শিক্ষা-সমাচার

পরলোকে ডক্টর হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়

১২৬৪ সালে নদীয়া জেলার হিজলাবট গ্রামে ডক্টর হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের জন্ম হয়। এই গ্রাম কুমারখালি ও ফরিদপুর জেলার সন্নিকট। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন মৈত্রেয়। তাঁহাদের বেশ স্বচ্ছল অবস্থা ছিল। গ্রাম হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ডক্টর মৈত্রের কলিকাতা আসেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া এম এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইংরাজি সাহিত্যে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উচ্চ শিক্ষা ও কৃতিত্বের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে

শিক্ষা-বিভাগের চাকুরী দিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। ডক্টর মৈত্রেয়, মিঃ আনন্দমোহন বসু, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি ভগবানের সেবা ও দেশের সেবা করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করায় তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। তাহার পর ব্রাহ্ম সিটি স্কুলকে কলেজে পরিণত করিলে তিনি সিটি কলেজে ইংরাজী অধ্যাপকের কার্য গ্রহণ করেন। তাঁহার অধ্যাপনার জন্য সিটি কলেজের এরূপ সুখ্যাতি হইয়াছিল যে, দলে দলে ছাত্রগণ সিটি কলেজে শিক্ষালাভ করিতে আসিত। সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি মধ্যে কয়েক বৎসর সিটি কলেজ ত্যাগ করিয়া ঢাকার জগন্নাথ কলেজে চাকুরী গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। কিন্তু মতভেদ বহু দিন তাঁহাকে সিটি কলেজ হইতে দূরে রাখিতে পারে নাই। তিনি পরে পুনরায় সিটি কলেজে ফিরিয়া আসেন। এই কয়েক বৎসর ব্যতীত তিনি সিটি কলেজে প্রায় ৫৪ বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

সিটি কলেজের প্রখ্যাতনামা প্রিন্সিপ্যাল বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের পরলোকগমনের পরে ডক্টর মৈত্রেয় সিটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ সালে ভগ্ন স্বাস্থ্য হওয়ায় তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাব্রতী ছিলেন ও তাঁহার বিদ্যা ও ধর্ম্মপরায়ণতার খ্যাতি পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি বহু কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। লর্ড কার্জনের বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন পরিবর্তনের প্রস্তাবে তিনি তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করেন।

তিনি এমার্সনের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া কলেজে অধ্যা-পনা করিবার সময়, বক্তৃতায় ও ধর্ম সভায় উপদেশ দিবার কালে এমার্সনের রচনা সম্বন্ধে গবেষণা পূর্ণ আলোচনা করিতেন। এমার্সনের রচনা তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। এমার্সনের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি গ্রিফিথস পুরস্কার পান। তাঁহাকে এমার্সন সম্পর্কে প্রামাণ্য বলিয়া সকলে স্বীকার করিত।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কার্লাইলের পদ্য ও রচনাদি সম্বন্ধেও তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন ও তাঁহাদের গুণগ্রাহী ছিলেন ও ১৯৩০ সালে তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর অব লিটারেচার উপাধি দেন। তজ্জন্য তাঁহাকে সিটি কলেজের ও স্কুলের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ অভিনন্দন প্রদান করেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি সুরেন্দ্রনাথের মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে প্রথম হইতে যোগদান করিয়াছিলেন ও উহার ভাইস প্রেসিডেণ্ট হইয়া-ছিলেন। তিনি সাধারণত উন্মুক্ত স্থানে বক্তৃতা দিতেন না; তবে কয়েকবার তিনি গোলদিঘী ও অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের কার্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই উন্মুখ ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের বহু বৎসর সম্পাদকতা করিয়াছেন। ঐ অবৈতনিক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরও বহু প্রবন্ধাদি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের জন্য লিখিতেন। তিনি বহুকাল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াও শেষ জীবনে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতেন।

তিনি ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন ও নানা স্থানে ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টানগণ তাঁহার বক্তৃতা ও প্রার্থনায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার আন্ত-রিকতায় বিদেশীগণ মুগ্ধ হইয়াচিলেন।

মাঘোৎসবের সময়ে ১১ই মাঘ বৈকালে ইংরাজীতে উপাসনা ও রাত্রে বাংলায় উপাসনায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গভীর ধর্মাভাব পূর্ণ উপদেশ শুনিয়া সুধী ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হইতেন।

তিনি বরিশালের পরলোকগত কালী কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র অল্প বয়সে ও জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহের পর পরলোকগমন করেন।

তাঁহার নির্মল চরিত্র, নিখুঁত সত্যবাদিতা, পবিত্রতার

প্রতি একান্ত নিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। তাঁহার সত্যবাদিতার জন্য নানা গল্প প্রচলিত আছে। বিগত মহাযুদ্ধের পরে যখন ইংরাজ মহিলাদের পরিচ্ছদ আরও সংক্ষিপ্ত হইল তখন তিনি ঘোরতর বিরক্তি ও ঘৃণা প্রকাশ করেন।

তিনি পরলোকগত কালীশঙ্কর সুকুল, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও পরলোকগত কৃষ্ণকুমার মিত্রের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় ব্যতীত অপর তিন জনেই ১৮৮৮ সালে হ্যারিসন রোডের পার্শ্বে পাশাপাশি বসত বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। বন্ধুদ্বয়ের বাড়ী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কেবল মৈত্রেয় মহাশয়ের বাড়ীটি আছে।

সঞ্জীবনীর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ১৯১১ সালে পর্যন্ত তিনি ইহার অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি সঞ্জীবনীতে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে "চাই বেল ফুল" নামক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। সঞ্জীবনী তাঁহার নিকট চিরঋণী।

স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় পরলোক গমন করিলে ডক্টর মৈত্রেয় তাঁহার অভাবে বহুদিন রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকেন। সার জগদীশচন্দ্র বসুর পরলোক গমনের পরে ডক্টর মৈত্রেয় তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও চিকিৎসকের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া বহুক্ষণ মৃতদেহের নিকট ক্রিমেটোরিয়মে রৌদ্রে বসিয়া থাকেন। তাঁহার এই বন্ধুর মৃত্যুর বেদনা হৃদয়ে অত্যন্ত বাজিয়াছিল। তিনি তাহার পর সেই যে শয্যা গ্রহণ করিলেন, তাহা হইতে আর উঠেন নাই।

গত ১৬ই জানুয়ারী বেলা ৩ টায় তাঁহার অবস্থা একটু খারাপ হয় কিন্তু তখনও বিশেষ চিন্তার কারণ হয় নাই। হঠাৎ সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার অবস্থা আরও খারাপ হয়, পরে শ্বাস বহিতে থাকে ও রাত্রি পৌনে আটটায় দিব্যধামে গমন করেন।

১৬ই জানুয়ারী রাত্রে বহুলোক তাঁহার গৃহে তাঁহার মৃতদেহ দর্শন করিতে আসেন। রাত্রি ১০টায় মৃতদেহ ঘিরিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও ধর্মবন্ধুগণ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। পরদিন বেলা ১০ টার সময়ে ভগবচ্চরণে প্রার্থনার পরে তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার হ্যারিসন রোডস্থ বাস ভবন হইতে ১১॥০ টার সময় শোভাযাত্রা করিয়া বাহির করা হয়। বহু প্রতিষ্ঠান ও বহু ব্যক্তি পুষ্পমাল্যে তাহাদের শেষ অর্ঘ্য প্রদান করে। শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কলেজ স্কোয়ারে "সঞ্জীবনী" অফিসের সম্মুখে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান হয়। তাহার পরে সিটি স্কুলের সম্মুখের প্রাঙ্গণে নামান হয়। তথা হইতে সেনেট হাউসের সম্মুখে লইয়া গেলে তথায় সহস্র লোককে তাঁহার শেষ দর্শন দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে দেখা গেল। ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি শবাধারে একটি পুষ্পমাল্য স্থাপন করেন। তাহার পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তথা হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়। তথায় বহু নারী তাঁহার মৃতদেহ দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তথায় পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করেন। অতঃপর সুকীয়া ষ্ট্রীট দিয়া মৃতদেহ সিটি কলেজে লইয়া গিয়া তথাকার প্রাঙ্গণে রক্ষা করা হয়। পুনরায় এই স্থান হইতে সুকিয়া ষ্ট্রীট দিয়া সার্কুলার রোডে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের ভিতর লইয়া যাওয়া হয়। তথায় বালিকাগণ বিদায় সঙ্গীত করেন "কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় আস।" তথা হইতে সার্কুলার রোড দিয়া বেলা তিনটার পরে ক্রিমেটোরিয়ামে মৃতদেহ আনা হয়। তথায় বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্তী ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিলে আধারের মধ্যে মৃতদেহ প্রবেশ করাইয়া দাহকার্য্য করা হয়।

সঞ্জীবনী

শিক্ষিত বেকার যুবকের কৃষিকার্য

যাহাতে শিক্ষিত বেকার যুবকেরা কৃষিকার্য অবলম্বন করে, এই উদ্দেশ্যে আসাম গভর্ণমেণ্ট ৮ জন বেকার যুবকের প্রত্যেককে বলদ ও লাঙ্গল কিনিবার জন্য শতকরা বার্ষিক তিন টাকা হার সুদে আড়াই শত টাকা করিয়া ঋণ দিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে হইবে, তবে প্রথম দুই বৎসরে আসলের অংশ আদায় করা হইবে না। প্রত্যেক যুবককে অনধিক

পঞ্চাশ বিঘা পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু প্রথম দুই বৎসর কোন খাজনা লাগিবে না। জমি বিলির সর্ত্ত এইরূপ যে, গভর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে উহা হস্তান্তর করা চলিবে না এবং দুই বৎসরের মধ্যে চাষ আরম্ভ করা না হইলে ঐ বন্দোবস্ত গভর্ণমেণ্ট নাকচ করিতে পারিবেন।

কৃষিকার্যরত যুবকদের জন্য উপনিবেশ স্থাপন এবং একটি কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—এই দুইটি বিষয় গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। জানা গিয়াছে যে নববর্ষের বাজেটে নিম্নলিখিত কার্যের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে ঃ—

(১) পাট বোনা শিক্ষা দেওয়া, (২) মোজা ও গেঞ্জি বোনা শিক্ষা দেওয়া (৩) সুরমা উপত্যকা টেকনিক্যাল ট্যানিং শিক্ষা এবং (৪) জোরহাট টেকনিক্যাল স্কুলে পিত্তল কাসার বাসন তৈয়ারী এবং ইলেকট্রো-প্লেটের কার্য শিক্ষা।

শিক্ষা-সমাচার

ভারতের ডাক বিভাগ

১৯৩৬ সালের ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায় যে ঐ বৎসর ১৪ লক্ষ টাকার বেশী লাভ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ৪৬৭৭৩ টাকা লাভ হইয়াছিল।

দ্রব্য	টাকার পরিমাণ
পার্শেল, বুকপোষ্ট ইত্যাদি	১১২১৩০৮০০০৲
রেজেষ্টি পার্শেল ইত্যাদি	৪৩৫০৮০০০৲
ইন্সিওর পার্শেল ইত্যাদি	৩১৫৭০০০টি
ঐ ঐ মোট মূল্য	৯৫৫৯৬৫০০০৲
ঐ ঐ মাশুল	৬৭৮৫৫০০০৲
মনি অর্ডার	৪৩৪৯৬০০০টি
ঐ ঐ মূল্য	৮১৪৯৭৫০০০৲
ভিঃ পিঃতে আদায়	১৮৭০৫৫০০০৲

অধিকাংশেই পূর্ব বৎসরের অপেক্ষা অধিক কার্য্য হইয়াছে।

	১৯৩৫-৩৬ সন	১৯৩৬-৩৭ সন
ডাক বিভাগে লাভ	২১৯০৮৪৩ টাঃ	২৭৩৪৪০৫ টাঃ
টেলিফোনে লাভ	১৪৯৭৯৭৮ ,,	১৯৭৯০৩২ ,,
টেলিগ্রাফে ক্ষতি	৩৩৩৬২২৫ ,,	২৯৯৩০৭০ ,,
রেডিওতে ক্ষতি	৩১৩৮২৩ ,,	২৬৫৮১০ ,,
মোট লাভ	৪৮৭৭৩ ,,	১৬৫৪৫৫২ ,,

নূতন পোষ্ট অফিস ৫৮৪

পোষ্টাল অর্ডার	৩৫৬০০০টি মূল্য	১৪৬৭৫০০ টাকা	
১৯৩৫-৩৬ সাল ঐ	৩৮২০০০ ,,	৯০৭০০০	,,
টেলিগ্রাফে আয়	২৬৯৮৭৫২১ ব্যয়	২৯৯৮১২৯৯	,,
১৯৩৫-৩৬ সাল ঐ	২৬৭৬৮৯১১ ,,	৩০১০৪২৩৬	,,
টেলিফোনে আয়	৮৬০৪০৫২ ,,	৬৬২৫০২০	,,
১৯৩৫-৩৬ সাল ঐ	৮০৫৫৬৬৭ ,,	৬৫৫৮৭০৯	,,
টেলিফোনে সকল কোম্পানীর আয়			
১৯৩৫-৩৬ সালে	৮৬৭৫০০ ,,	৪২৩০০০	,,
১৯৩৬-৩৭ সালে		৯৪৫৯৭০০	,,
গভর্ণমেণ্ট রয়্যালটি পাইয়াছেন		৪৫৮০০০	,,

ঐ বৎসরে মোট ২৪টি বেতার ষ্টেশন ছিল। ডাক ও তার বিভাগের লোক ১২১৩৬৭। পূর্ব্ব বৎসর ১১১৮৬৩ জন।

সঞ্জীবনী

প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি

প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করার জন্য তিব্বতে যে পণ্ডিতসঙ্ঘের যাওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, তাঁহারা এপ্রিল মাসের শেষভাগে পাটনা হইতে যাত্রা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পাণ্ডুলিপিগুলি নাকি গিয়ানসা, সিকার্ত্তা ও লাঙ্কার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে আছে। পাণ্ডুলিপিগুলি তিব্বতীয় ও চীনাভাষায় লেখা। ঐ গুলিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করা হইবে।

এই পণ্ডিত-সঙ্ঘ কালিম্পং ও ফাড়ির মধ্য দিয়া যাইবেন এবং যে সমস্ত স্থানে পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাইবে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিবেন। বিহার রিসার্চ্চ সোসাইটি ঐ সকল অনূদিত পাণ্ডুলিপি ক্রমশঃ বাহির করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বিহার গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপরিষদের গত অধিবেশনে এই পণ্ডিত-সঙ্ঘের তিব্বত অভিযানের সাহায্যার্থ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য তিব্বত গভর্ণমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষা করা হইতেছে। পাটনা কলেজের অধ্যাপক মিঃ এ বি শাস্ত্রী এই পণ্ডিতসঙ্ঘের নেতৃত্ব করিবেন।

এতদ্ভিন্ন মিঃ গঙ্গাশরণ সিংহ, সিংহলের ভিক্ষু নাগার্জুন, মিঃ এ এস পেরিয়া, একজন ফটোগ্রাফার ও একজন দোভাষী থাকিবেন।

ইতিপূর্ব্বে ইতালীর অধ্যাপক মিঃ তুচি ও ভিক্ষু রাহুল সংকৃত্যায়ন অনুরূপ উদ্দেশ্যে তিব্বতে অভিযান করিয়াছিলেন।

শিক্ষা-সমাচার

অদ্ভুত কৃষি পরীক্ষা

যুক্ত প্রদেশের মৈনপুরীতে ডক্টর এস নেহরু, আই সি এসের তত্ত্বাবধানে বিদ্যুৎ-প্রভাবে কৃষি-কার্য্যের উন্নতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য ও কৌতুহলপূর্ণ পরীক্ষা চলিতেছে। বিহারের শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ মৈনপুরী গিয়া ঐ সকল পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, একটি ছোটগাছের চতুর্দিকে যদি এক ফুট চওড়া ধাতু নির্মিত জাল জড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে গাছ দ্রুত বর্দ্ধিত হয়। জলের মধ্যে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ চালনা করিবার পরে সেই জলে যদি ছোলা ৮ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ভূমিতে রোপণ করা যায় তাহাতে ফসল অধিক হয়। বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ-প্রভাবিত জলে ইক্ষুর চারা ভিজাইয়া রাখার পরে তাহা একখণ্ড জমির অর্দ্ধেকে রোপণ করা হয় ও সচরাচর যে ভাবে ইক্ষু রোপিত হয় সেই ভাবে অপর অর্দ্ধখণ্ডে ইক্ষু রোপিত হয়, তাহাতে দেখা যায় বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ-জলে-ডুবান ইক্ষুর অর্দ্ধেক ভাগে অধিকতর উত্তম ইক্ষু হইয়াছে। শাকসব্জীর একটি চারার পাশে একটি পেঁয়াজের চারা, তাহার পর শাকশব্জীর চারা তাহার পর আবার পেঁয়াজের চারা—এই ভাবে চারা রোপণ করার ফলে শাক-শব্জীর অধিক ফলন হয় দেখা গিয়াছে। এই সকল উপায় অতি সহজ। যতটা ফলন হইবে বলা হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেকও যদি হয় তাহা হইলে কৃষির বহু উন্নতি হইবে। ইহাতে কোনও ব্যয়বাহুল্য দ্রব্য নাই। একটি ছুরি পুড়াইয়া লাল করিয়া কাষ্ঠের উপর নানাপ্রকার জ্যামিতির চিত্রের আকারে দাগ কাটিয়া দেখান হয়। ইহাতে না কি কাষ্ঠে উই ধরে না। এই পরীক্ষাকেন্দ্রে গমন করিলে কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে অনেক নূতন জ্ঞান লাভ হয়। এই কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নূতন নূতন উপায় শিক্ষা করিয়া গ্রামের ও কৃষির অনেক উন্নতি করা যায়।

সঞ্জীবনী

পরলোকে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিগত ২রা মাঘ রবিবার সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও বহু উপন্যাস প্রণেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পার্ক নার্সিংহোমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ ২৪ নং অশ্বিনী দত্ত রোডস্থিত শরৎবাবুর বালীগঞ্জের বাসভবনে লইয়া যাওয়া হয়। তৎপরে কলিকাতা ও সহরতলীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও তাঁহার ভক্তগণ সমারোহ-সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া কালীঘাট কেওড়াতলার শ্মশানে লইয়া শবদেহ দাহ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর ৪ মাস হইয়াছিল।

১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্থানীয় বাংলা বিদ্যালয় হইতে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি টি এন্ জুবিলী কলেজে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারেন নাই।

অতঃপর তিনি নানাস্থানে ঘুরিয়া কলিকাতায় আসেন ও তথা হইতে রেঙ্গুন যাত্রা করেন। রেঙ্গুনে প্রথমে সওদাগরী অফিসে ও পরে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসে কার্য করিয়াছিলেন। শেষোক্তস্থানে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত মনোমালিন্য হাতাহাতিতে পর্যবসিত হয়, এবং তিনি চাকুরী ছাড়িয়া সাহিত্যকেই উপজীবিকারূপে গ্রহণ করেন।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্কের বার্ষিক অধিবেশন

মধ্যস্থলে চেয়ারে উপবিষ্ট (বামদিক্ হইতে)—ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা (ডিরেক্টর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক), শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী (মেয়র কলিকাতা কর্পোরেশন), শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় (ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন)

("হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে"র সৌজন্যে)

তাঁহার রচনা পাঠকদলকে আকৃষ্ট করিল, ফলে ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপা তাঁহার উপর বর্ষিত হইল।

তিনি প্রথমে বাজে শিবপুরে ও পরে পানিত্রাসে এবং কলিকাতায় বাসস্থান নির্ণয় করত উপন্যাস রচনা করিতে থাকেন।

শ্রীকান্ত, বিরাজ বৌ, দেবদাস, পণ্ডিত মশায়, চন্দ্রনাথ, গৃহদাহ, চরিত্রহীন প্রভৃতি তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

তাঁহার প্রতিভাকে অস্বীকার করা চলে না অথচ তাঁহার সমগ্র মতবাদ নির্বিচারে গ্রহণ করাও কঠিন।

তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে, তিনি চলিয়া গিয়াছেন, ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বার্ষিক অধিবেশন

বিগত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বার্ষিক অধিবেশন ব্যাঙ্কের রেজিষ্টার্ড অফিস ৬নং তিলক রোডস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ও কলিকাতা কর্পোরেসনের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়ও এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। মেয়র তাঁহার অভিভাষণে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহ-সমস্যার সমাধানে ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টার বিষয় উল্লেখ করিয়া ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণের কার্য-প্রণালীর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

নাস্তিক

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(১২)

বেলা ১০টায় নাগপুর প্যাসেঞ্জার হাওড়া ষ্টেসন ত্যাগ করিল গার্ডের বংশী-নিনাদ ও সবুজ পতাকার আন্দোলনের সময়ে। সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল যাত্রিদলের কল-কোলাহল, বিবিধ দ্রব্য-বিক্রেতার হাঁক-ডাক, কুলীদলের বিরক্তিজনক চীৎকার।

সুশান্ত প্রথম শ্রেণীর একটি কক্ষে বসিয়া রহিয়াছে। সেই কক্ষে আর একটি ভদ্রলোকও ছেলেমেয়ে লইয়া উঠিয়াছেন; তিনি উলুবেড়িয়ার সাব ডিভিসনাল অফিসার; সস্ত্রীক কর্মক্ষেত্রে চলিয়াছেন। সুশান্ত জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। এই দিকের দৃশ্যের সঙ্গে সে তেমন পরিচিত নহে; তাই দেখিতেছিল হাওড়া জেলার পল্লী-অঞ্চলের দৃশ্যাবলী। ষ্টেসন ইয়ার্ড ছাড়াইয়া গাড়ী চলিতে লাগিল।

সুশান্ত বাংলার শ্যামাপল্লীর দৃশ্য বিশেষ মহাযোগ সহকারে দেখিতেছিল। কোথাও ক্ষুদ্র ডোবা; স্বল্প-পরিসর জলরাশির উপর কলমী শাক শ্যামশোভা বিস্তার করিয়াছে। তাহারই একটি ধার পরিষ্কার করিয়া পল্লী-বধূর জলাহরণ ও কাপড়-কাচা-বাসন-ধোয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। কোথাও গ্রাম্য জমিদারের সুবৃহৎ অট্টালিকা প্রাচীর-বেষ্টিত হইয়া দম্ভ-অহঙ্কারের বিস্তৃত পরিধি বিশাল হইতে বিশালতর করিবার জন্য নারিকেলবৃক্ষের ঊর্দ্ধ শীর্ষ নীলাকাশে প্রেরণ করিয়াছে। ছেলের দল গ্রাম্য বিদ্যালয়ে চলিয়াছে, হাতে বই-শ্লেট। আজকাল তালপাতায় লেখার রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে; তৎস্থলে জার্মাণীর বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শ্লেট মৌরসীপাট্টা লইয়া দিব্য আরামে ভোগ-দখল সুরু করিয়াছে।

হঠাৎ সুশান্তের চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, গাড়ীর

অপর ভদ্রলোকের একটি ছোট মেয়ের উচ্চ ক্রন্দন ধ্বনিতে। মেয়েটি কি একটা জিনিষের জন্য বায়না ধরিয়াছিল; উহা তাহাকে দেওয়া হয় নাই; সেই জন্য সে অভিমান ভরে দিক্-দিগন্তে স্বর-লহরী বিস্তৃত করিল; জানাইয়া দিল বিশ্বের প্রতিকেন্দ্রে তাহার মর্ম বেদনা, তাহার দাবী অপূর্ণ রাখার করুণ ইতিহাস। কে জানে কোন দিন এই করুণ কাহিনীর বিবরণ বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের দরবারে নব কলেবরে হাজির হইয়া স্বীয় নালিশ দায়ের করিবে কি না। আপাতত বালিকাটিকে ভিন্ন বস্তু দিয়া সন্তুষ্ট করা হইল। সে হয়ত খেলনার পরিবর্তে মিষ্টান্ন লইয়া ভুলিয়া গেল। কিন্তু জগতের প্রতিকেন্দ্রে সভ্য জাতির হৃদয়-কন্দরে যে ক্রন্দনধ্বনি দিনরাত নিজের মর্ম-পীড়ায় জাগিয়া উঠিতেছে, তাহার প্রতিরোধের উপায় কি? কে তাহাকে পরিতুষ্ট করিয়া শান্ত বাতাসে ঈশ্বরের অলৌকিক মহিমা জীবচরাচরে ছড়াইয়া দিবে?

উলুবেড়িয়া ষ্টেসনে ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন। এইবার সুশান্ত স্বীয় কক্ষে একা; অন্য কেহই নাই। প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী একেবারে দুর্লভ না হইলেও সুলভ নহে।

ভদ্রলোক সপরিবারে নামিয়া যাওয়ার পর হইতে সুশান্তের মনে একটা নবভাবের উদয় হইল। একটা নবীন জীবনের মোহময় ছবি তাহার মানস-মুকুরে বিম্বিত হইল,—সেও ত এই ভদ্রলোকের মত জীবনের পথে নবীন গৃহস্থালী সাজাইয়া জীবনের নূতন আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। আজ তাহার অর্থের অভাব নাই; যে অর্থকষ্ট সে নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছে, তাহার পুত্রকন্যগণকে ত আর তাহা ভোগ করিতে হইবে না—তবে—এই দ্বৈধভাব কেন?

সুশান্ত ঠিক বুঝিতে পারিল না তাহার এই অভিনব মনোবৃত্তির কারণ কি,—ভদ্রলোকের সাহচর্য না অন্য কিছু—হয়ত উভয়ই। সে নিজকে কথকটা সংযত করিয়া পুনরায় বহির্দেশের দৃশ্যাবলী দর্শনে মনোযোগী হইল।

বেলা সাড়ে বারটায় গাড়ী খড়্গপুর জংসনে পৌছিল। খড়্গপুরে আধ ঘণ্টা থামিয়া গাড়ী বম্বে লাইনে যাত্রা সুরু করিল। এইবার দৃশ্যাবলী কতকটা রূপান্তরিত হইতে লাগিল;—যে শ্যামল সমতল ভূমি দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর আম্র-তাল-কদলী-গুবাক্-নারিকেল-কুঞ্জের মধ্য দিয়া এতক্ষণ তৃপ্তিদান করিয়াছিল, এইবার তাহা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তাহার স্থলে দেখা দিল—"গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটীর পথ।" গভীর শালবন মাথা তুলিয়া উর্দ্ধলোকে তাকাইয়া রহিয়াছে কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সংযমী সাধনশীল ধ্যানমগ্ন যোগীর মত; স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ আবলুষ বৃক্ষও দেখা যাইতে লাগিল। বন-বিহঙ্গের মধুর কূজন সুশান্তকে শ্যামরাজ্যের জঙ্গলের কথা স্মরণ করাইয়া দিল।

অপরাহ্ণ ৪টার সময় গাড়ী টাটা নগরে দাঁড়াইল। পথিমধ্যে বাঙালীর বায়ু-পরিবর্তনের স্থান ঘাটশীলা, গালুধি, গিডনি প্রভৃতি স্থানে নব নব সৌধরাজি মাথা তুলিয়া রেলযাত্রীকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিল। বিশেষত গালুধির পটভূমিকায় পাহাড়ের সংস্থিতি উহাকে খুব মনোরম ভাবে প্রতিভাত করিয়াছিল।

ষ্টেসন হইতে টাটার বিশাল লৌহ-কারখানা দেখা গেল। এই স্থানে রাঁচীগামী যাত্রিদল নামিয়া গেল। প্রায় পনের মিনিট অবস্থিতির পর গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

এইবার আরম্ভ হইল উড়িষ্যার মধ্য দিয়া যাত্রা; এই পথে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিত্র-করদ রাজ্য অতিক্রম করিতে হয়। মাঝে মাঝে ভীষণ অরণ্যানীর বক্ষ ভেদ করিয়া গাড়ী চলিল, যেখানে সূর্যালোক হয়ত কোন দিন প্রবেশ করে নাই, সন্ধ্যাতারার মৃদু কিরণ শ্যামল বল্লরীর লুলিত কুন্তলে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। গাড়ী রাত্রি ৮টার সময় একটা দীর্ঘ সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিল। পরে চক্রধরপুর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া প্রায় রাত্রি ১২টার সময় বিলাসপুর জংশনে উপনীত হইল।

পূর্বেই গার্ড টেলিগ্রাম করিয়াছিল। সুতরাং রেলওয়ে রিফ্রেসমেণ্ট রুম হইতে সুশান্তকে নৈশ খাদ্য সরবরাহ করিল। আহারান্তে সুশান্ত নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

শেষ রাত্রে সুশান্ত স্বপ্ন দেখিল—একটি নারী—ষোড়শী বলা যাইতে পারে—একটি নদীর ধারে পাহাড়ের উপর বসিয়া রহিয়াছে, সঙ্গে আরও দুই তিনটি তরুণী, তাহারা যেন বনভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত। সুশান্তকে দেখিয়া সেই উপবিষ্টা তরুণী তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। পরে বলিল—"আমি আপনার সঙ্গে যাব।"

হঠাৎ সুশান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, জাগিয়া দেখিল, তখনও মোহময়ী রজনীর তিমিরাবগুণ্ঠন দিকে দিকে প্রসারিত ; দূর গগনপ্রান্তে উষার শিশু শুক্তারা নিম্নে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিরাজমান। গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে কত অজানা গ্রাম-জনপদ অতিক্রম করিয়া বিরাট্ দৈত্যের মত। কে জানে কোথায় উহার গতি শেষ হইবে!

রায়পুর বেশ একটি বড় ষ্টেশন। এইস্থানে সুশান্ত প্রাভাতিক চা-পান শেষ করিল। স্থানে স্থানে শ্যামল দিগন্তপ্রসৃত প্রান্তর সুশান্তকে নববার্তা জ্ঞাপন করিল।

একস্থানে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর শ্বেতবর্ণের ইষ্টকালয় তাহাকে বিশেষ আনন্দ দান করিল। সুশান্ত পরে জানিতে পারিল, উহা আমেরিকান মিশনের প্রচার-কেন্দ্র।

ডোঙ্গারগড়ে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া সুশান্ত বেলা আড়াইটার সময় গণ্ডিয়া জংসনে অবতরণ করিল। এই স্থান হইতে সে ভিন্ন লাইনে জব্বলপুর যাইবে। এই যাত্রায় জব্বলপুর তাহার প্রথম গন্তব্যস্থল।

রাত্রি ১০টায় গণ্ডিয়া জংশন হইতে গাড়ী জব্বলপুর লাইনে যাইবে। এই লাইন ক্ষুদ্র, গাড়ীও অনুরূপ। সুতরাং ওয়েটিং রুমে জিনিষপত্র রাখিয়া সুশান্ত সহর দেখিতে বাহির হইল। সহর বলিতে তেমন কিছু গণ্ডিয়ায় সুশান্তের দৃষ্টিপথে পড়িল না। একজন বিড়ি বিক্রেতার প্রাসাদোপম অট্টালিকা সুশান্তের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। সুশান্ত জানিতে পারিল, বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে বিড়ির পাতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ চালান যায় এই গণ্ডিয়া জংসন হইতে এবং উক্ত বিড়ি বিক্রেতাই এই মাল-চালানের প্রধান কর্মকর্তা।

রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউটে গিয়া সুশান্ত কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিল। অতঃপর বাজারের মধ্য দিয়া ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমে ফিরিয়া আসিল। রিফ্রেসমেণ্ট রুম হইতে নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা করা হইল ; অতঃপর রাত্রি দশটার গাড়ীতে সুশান্ত গণ্ডিয়া ত্যাগ করিল।

রাত্রে গাড়ীতে বসিয়া সুশান্ত ভাবিতে লাগিল—"যদি ঠিক ভবঘুরের মত ভ্রমণ করা যায়, তবে কেমন হয়? কোন লক্ষ্য ঠিক থাকিবে না ; আহারের নিয়ম থাকিবে না ; যখন যেখানে যে ভাবে যাহা জুটে তাহা উদরস্থ করিয়াই নিশীথের নীলনভোচন্দ্রাতপতলে রজনী যাপন করা যাইবে।"

গাড়ী চলিতেছে খুব ধীর গতিতে। বাহিরে কৃষ্ণা-সপ্তমীর চন্দ্রকরলেখা দূর বনান্তে ফুটিয়াছে। কোথাও কোন হতভাগ্য পল্লীবাসী শান্ত নিশীথের নিবিড় নীরবতায় প্রাণের দ্বার খুলিয়া বাঁশী বাজাইতেছে ; তাহার করুণ মূর্চ্ছনা নৈশ বায়ুতরঙ্গে সুশান্তের কাণে আসিয়া পৌছিতেছে। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ষ্টেসনে গাড়ী থামে, আবার উহা অতিক্রম করিয়া অনন্ত অন্ধকারের বুকে লুকাইয়া যায়!

ভাবিতে ভাবিতে সুশান্ত নিজের অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িল ; যখন সুশান্ত জাগিয়া উঠিল, তখন প্রভাত হইয়াছে। পূর্বাশায় দিক্‌চক্রবালে দিনমণির লোহিতবিম্ব ধীরে ধীরে বিশ্বজগতের তিমিরান্ধকার উন্মোচন করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। সুশান্ত চোখ মেলিয়া দেখিল—গাড়ী চলিতেছে বঙ্কিম সর্প-কুটিল লৌহ-পথে ;—কখনো ধীর গতিতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, আবার পরক্ষণে নিম্নে ধাবিত হইতেছে, অথচ একস্থান হইতে অন্যস্থানের রেলপথ বেশ পরিদৃশ্যমান। কেথাও চলিয়া গিয়াছে বনরেখা—সিমন্তিনীর সিঁথির সিঁদুর-রেখার মত উজ্জ্বল লাল কাঁকরে সজ্জিত বন পথ—অজানা অচেনা কত নূতন দেশে—কে তাহার সন্ধান রাখে।

বেলা ৮টায় গাড়ী নয়ানপুর জংশনে থামিল, ক্ষুদ্র একটি ষ্টেশন—জংশন নামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ; কিন্তু এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা সুশান্তকে খুব মুগ্ধ করিল।

সুশান্ত গাড়ী লইতে নামিয়া টি-ষ্টল হইতে চা পান করিল। উৎকৃষ্ট গাভীদুগ্ধের প্রস্তুত চা তাহার নিকট বড়ই উপাদেয় রূপে প্রতিভাত হইল। সুশান্ত ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট গিয়া ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিল—"এখানে দু'একদিন বিশ্রামের জন্য কোন বাড়ী পাওয়া যেতে পারে? অবশ্য ভাড়া দিতে প্রস্তুত আছি।"

ষ্টেসন মাষ্টার উত্তর দিলেন—"এ জঙ্গলের মধ্যে বাড়ী আর কোথায় পাবেন; তবে ঐ যে দূরে পাহাড়ের মাথায় বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ওটা ফরেষ্ট বাংলো; ওখানে থাকতে পারেন, দৈনিক ৫৲ টাকা করে নেবে।"

সুশান্ত উত্তর দিল—"পাঁচ টাকা নিক্ ক্ষতি নেই, জায়গা পেলেই হয়।"

ষ্টেশন মাষ্টার—"অবশ্য জায়গা পাওয়াও কতকটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, কারণ যদি ফরেষ্ট বিভাগের কোন উচ্চ কর্মচারী আসেন, তবে আর জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।"

সুশান্ত আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরমন্থর গতিতে ফরেষ্ট বাংলো লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

বেলা প্রায় সাড়ে ৯টায় সুশান্ত ফরেষ্ট বাংলোয় পৌঁছিয়া দেখিল, বাংলোয় দুইখানি ঘর বাসের জন্য বর্তমান, তবে একখানি ইতিমধ্যে অধিকৃত; অন্যখানি তখনও খালি ছিল, সুশান্ত উহা অধিকার করিল। জমাদার ঘরটি পরিষ্কার করাইয়া সুশান্তের বিছানা-পত্র কুলির নিকট হইতে লইয়া ক্যাম্পখাটের উপর সংস্থাপিত করিল এবং আহারাদির ব্যবস্থা কি হইবে জিজ্ঞাসা করিল।

সুশান্ত উত্তর দিল—"এখানে রান্না করার কোন লোক পাওয়া যায় না?"

জমাদার উত্তর করিল—"আমার সন্ধানে একজন ব্রাহ্মণ আছে, সে সব রান্নার কাজে সিদ্ধহস্ত; আপনার অনুমতি পেলে তাকে দিতে পারি, তবে সে দৈনিক খোরাক আর চারি আনা বেতনের কম কাজ কর্বে না।"

সুশান্ত উত্তর দিল—"তার জন্য কোন ভাবনা নেই; এই নাও সাতদিনের ভাড়া আর রাঁধুনীর বেতন।"

সুশান্ত ১০ টাকার ৫ খানি নোট জমাদারের হাতে দিল, এবং সত্বর চা তৈয়ারী করিতে বলিল। জমাদার অবিলম্বে উহা লইয়া সুশান্তের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে মনোনিবেশ করিল।

প্রায় পনের মিনিট পরে রাঁধুনী কেশবলাল চার পেয়ালা ও স্যাণ্ডউইচ্ লইয়া উপস্থিত হইল। সুশান্ত ক্যাম্পখাটের উপর বসিয়া চতুর্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চা পান করিতে লাগিল।

ঐ দূরে দেখা যাইতেছে একটি উপত্যকার চতুর্দিকে ক্ষুদ্র পাহারের শিখর; মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে একটি তরুবীথিমণ্ডিত পথ-রেখা—কে জানে কোথায়!

অন্যদিকে নয়নপুর ষ্টেসনের দূরবর্তী সিগ্ন্যাল দেখা যাইতেছে। দূরে দূরে পাহাড়ের কোলে পার্বত্য অধিবাসীর বাস, তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র; কিন্তু তাহারা সাধু, চরিত্রবান্, ঈশ্বরবিশ্বাসী। বর্তমান জগতের সভ্যতার ধারা এইস্থানে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এখনও এই অধিবাসীরা টাকা ধার লইয়া আইনের দোহাই দিয়া "তামাদি" জারি করিতে নারাজ; তাহারা বলে—"মানুষের আইনকে ফাঁকি দিতে পারি, কিন্তু যিনি চালাইতেছেন অগণিত সৌরমণ্ডল, শশি-তারা-নীহারিকা, অনন্ত জ্যোতিঃপথ, তাঁহাকে কেমন করিয়া ফাঁকি দিব? তাঁহার আইনে ত তামাদির কোন ধারা দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই জন্মের ঋণধারা যে পরবর্তী জন্মে দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইয়া দেখা দিবে, দেহ, মন, প্রাণ জর্জরিত করিবে—তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় কি?" এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা তাহারা আধুনিক সভ্যতার নিকট পায় নাই। ফলে প্রাচীন রীতি-নীতি-বিশ্বাসকে আঁকড়িয়া ধরিয়া কুসংস্কারের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরন্তু নিরাপদ্ শান্তিময় বক্ষে বিরাজ করিতেছে। জব্বলপুরের খৃষ্টান মিশনারীগণ এই সমস্ত অধিবাসীকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কোন সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। কারণ ইহারা নিজেদের প্রাচীন পথ পরিহার করিয়া নূতন প্রথা অবলম্বনে অসম্মত। তথাপি কিন্তু মিশনারীগণ প্রচারে নিশ্চেষ্ট নহে।

বহুবিধ চিন্তার ধারা সুশান্তের মনকে আলোড়িত করিতেছিল, হঠাৎ বাহিরে বামাকণ্ঠের মধুর ধ্বনি তাহার কর্ণকুহরকে আকর্ষণ করিয়া ধ্বনিত হইল—"এস বাবা, আমরা এসে পড়েছি।"

সুশান্ত বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল একটি তরুণী ও প্রৌঢ় ভদ্রলোক ফরেষ্ট বাংলোর অন্য কক্ষের দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান। সুশান্ত তরুণীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, এ যে তাহার গাড়ীতে সেই স্বপ্নদৃষ্টা সুন্দরী!

সুশান্ত বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারাই কি পাশের ঘরটিতে থাকেন?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—"হাঁ! কয়েক দিন হ'ল আমি এখানে এসেছি এই ফরেষ্ট পর্যবেক্ষণ উপলক্ষ্যে। আমি এই রেঞ্জের ডেপুটি কন্সারভেটর। আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

সুশান্ত উত্তর করিল—"আমি কলকাতা থেকে বেরিয়েছি নিরুদ্দেশ যাত্রায়। যখন যেখানে ভাল লাগ্‌বে, সেখানেই কিছুদিন কাটিয়ে আবার বেরিয়ে পড়্‌ব, জব্বলপুর যাবার পথে এ জায়গাটা খুব ভাল লাগল, তাই নেমে পড়েছি।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের নাম পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, ইঁহার পূর্ব-নিবাস হুগলী জেলার মহানদের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম। বি এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ভাগ্যান্বেষণে মধ্য প্রদেশে উপনীত হন এবং ফরেষ্ট বিভাগে সামান্য বেতনে কার্য আরম্ভ করেন। পরে নিজের কর্মদক্ষতাগুণে ডেপুটি কন্সারভেটর হইয়াছেন, বেতন মাসিক হাজার টাকা।

পূর্ণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি করা হয়?"

সুশান্ত—"আমি মালয় উপদ্বীপে রবার প্ল্যানটার; তাছাড়া শ্যাম রাজ্যে টিনের খনি ও একটি কাঠের ব্যবসা আছে।"

পূর্ণ—"ও বুঝেছি, আপনারই কথা বুঝি একটা বাংলা কাগজে খুব লিখেছিল?"

সুশান্ত—"ও সব মিথ্যে কথা বিশ্বাস করবেন না, আমি ক্যাম্বেল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করে একটা রবার বাগানে ডাক্তার হয়ে গিয়াছিলাম, পরে অবশ্য অদৃষ্টের বশে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছি মাত্র।"

পূর্ণবাবু তরুণীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"সুষি তোর কাছে সে কাগজটা আছে না?" সুশান্তের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"এটি আমার একমাত্র মেয়ে। একে তিন মাসের রেখে এর মা মারা যায়, আমি সেই থেকে একে সঙ্গে সঙ্গে রেখে মানুষ করেছি, নাম সুষমা।"

সুষমা—"আছে বাবা, এই যে।" বলিয়া সুষমা একটা সংবাদপত্রের টুকরা বাহির করিয়া দিল।

পূর্ণবাবু বলিলেন—"আপনার নাম সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়? আমার নাম পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী। আমরা রাঢ়ী শ্রেণীর।"

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি বুঝি কাজে বেরিয়েছিলেন?"

পূর্ণবাবু উত্তর দিলেন—"হাঁ, এই কিছুক্ষণ ইন্‌স্পেক্‌শন করে ফিরছি।"

সুশান্ত বলিল—"তবে আর আপনাদের বিরক্ত কর্ব না, এখন বিশ্রাম করুন, পরে আলাপ করা যাবে।"

এই বলিয়া সুশান্ত স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ

জাতীয় সংবাদ

গ্রামোন্নয়নে ডক্টর সত্যচরণ লাহার দান

কলিকাতা মহানগরীর ভূতপূর্ব সেরিফ ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় গ্রামোন্নতিকল্পে "ডক্টর সত্যচরণ লাহা ডেভেলপ্‌মেণ্ট ফণ্ড" নামে একটি ধনভাণ্ডার গঠনার্থ বঙ্গদেশের চেরিটেবল্ এণ্ডাউমেণ্টসের ধনাধ্যক্ষের নামে ৫০ হাজার টাকার ভারত গভর্ণমেণ্টের ষ্টক সার্টিফিকেট হস্তান্তরিত করিয়াছেন।

এই ফণ্ডের সাধারণ উদ্দেশ্য এই যে, ভারত গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পিত গ্রাম পুনর্গঠন পরিকল্পনার প্রসারকল্পে মাত্র বঙ্গদেশে এই অর্থ ব্যয়িত হইবে। আর বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, ফণ্ডের আয় হইতে নিম্নলিখিত কার্যগুলির জন্য বার্ষিক অর্থ সংরক্ষিত হইবে :—(ক) রোগের প্রতিকার ও প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন ; (খ) দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও জলাভাব হেতু দুঃখ-দারিদ্র্যের দূরীকরণ ; (গ) খাদ্য-গবেষণা ও সংস্কার এবং (ঘ) গ্রাম্য পশুর উন্নতিসাধন।

এই ফণ্ডের কার্য-পরিচালনার্থ একটি পরিচালক সমিতি গঠিত হইবে। উহার পাঁচজন সদস্য থাকিবে তন্মধ্যে দাতা নিজে একজন। বঙ্গদেশের গভর্ণর বাহাদুর উহার সভাপতি থাকিবেন।

বেঙ্গল শেয়ার এণ্ড ষ্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের স্বজাতির কুলগৌরব ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বেঙ্গল শেয়ার এণ্ড ষ্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার নবীন পদ লাভে আমরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দেশের, দশের ও আমাদের স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করেন।

দান

শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ লাহা ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির ভারতীয় বিভাগে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কুমার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র লাহা ভারত সম্রাটের আদেশানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ক্ষয়রোগ চিকিৎসা ভাণ্ডারে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ডক্টর বি সি লাহা এবং শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন হাওড়া জেলা ক্ষয়রোগ চিকিৎসা ভাণ্ডারে যথাক্রমে ২৫০৲ টাকা ও ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীবলাইচাঁদ আঢ্য

পাত্রপাত্রী সংবাদ

(১)

কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বংশীয়, অবস্থাপন্ন, বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃতদার পুত্রের জন্য বিনাপণে পাত্রী আবশ্যক। পাত্র ত্রয়োত্রিংশৎ বর্ষীয়, বি এস্-সি, স্বাস্থ্যবান্ সুপুরুষ। সদ্বংশ-জাতা, গৌরবর্ণা, অধিকবয়স্কা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বিস্তৃত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রাদি লিখুন বা সাক্ষাৎ করুন।

শ্রীনির্মলচন্দ্র ব্যানার্জি
২৩৭ মাণিকতলা মেন রোড
কলিকাতা

(২)

প্রকৃত সুন্দরী, শিক্ষিতা (আই এ পরীক্ষার্থিনী) গৃহকর্মে সুনিপুণা সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুবর্ণবণিক্ পাত্রীর জন্য উপার্জনক্ষম উচ্চ শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী পাত্র চাই। সমাচারের ম্যানেজারের নিকট বিস্তৃত বিবরণের জন্য ডাক টিকেট সহ

সমালোচনা

বন্দিপুরের হীরালাল—শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ দেববর্মা শাস্ত্রী, এফ এল এস, বি এ প্রণীত। ১নং ব্রাকোয়ার স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, এম এ, বি এল কর্তৃক প্রকাশিত। ক্রাউন ৮ পেজি, ৫৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তি স্থান—আর্বান স্পোর্টস হাউস, ১৩৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচ্য পুস্তকে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বন্দিপুরের উদারহৃদয়, দানশীল জমিদার স্বর্গীয় হীরালাল ঘোষ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা বিবৃত হইয়াছে।

কর্মবীর হীরালাল স্বাবলম্বী স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ। তিনি "এত দিনের এত আকর্ষণময় রেঙ্গুন, বিশেষ লাভজনক কর্ম লোষ্ট্রখণ্ডের মত পরিত্যাগ করিয়া * * * স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।" ইহাতে তাঁহার চরিত্রের একটি দিক্ সমুজ্জ্বল হইয়া পাঠকের পুরোভাগে ফুটিয়া উঠে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তাঁহার এত প্রবল!

নিজে বিদ্যার উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি গ্রামবাসিগণেরও নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থ. বন্দীপুর বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ব্যারাকপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণে সহায়তা ও হীরালাল ফ্রি ষ্টুডেণ্ট-শিপ প্রতিষ্ঠা তাঁহার মহৎ ও উচ্চ অন্তঃকরণের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তিনি নিজে জলকষ্ট অনুভব না করিলেও পরদুঃখে তাহার প্রাণ বিগলিত হইত। ফলে গ্রামবাসীর জলাভাব মোচনে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ও পঙ্কোদ্ধার তাঁহার অক্ষয়তম কীর্তিরূপে বিরাজমান।

তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ ভক্তিরত্ন মহাশয়, স্বর্গীয় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মাতৃজাতি সেবক সমিতি প্রতিষ্ঠা, নলকূপ নির্মাণ প্রভৃতি কার্যের দ্বারা,—"পিতা যে পুত্রের মধ্যেই জীবিত থাকেন"—তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি, যাহাতে এই কৃতী পুরুষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে অনুসৃত হয়।

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক সমাচার

২২শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪৪ সাল | ৫ম সংখ্যা

রাইখ্স বাঙ্ক ও বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের পুনর্গঠন

ডক্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার

নোট-ব্যাঙ্কিং

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে "ফেডারাল রিজার্ভ" প্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধনবিজ্ঞানসেবী ও ব্যবসায়ী মহলে "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" কথাটার বেশ-কিছু চল বাড়িয়াছে। "কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক" কথাটা ততদূর ব্যাপক নয়, আর ইহার প্রয়োগও আরম্ভ হইয়াছে অল্প দিন হইতে। মহাযুদ্ধের পরবর্তী অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় এই কথাটা জন্মলাভ ও রূপগ্রহণ করিয়াছে। বাজারের উঠানামা, আর্থিক সঙ্কট, মুদ্রার স্থিতীকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্তমানে যে ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রানুগতা বা ঐক্য সাধন এবং কর্জ-নিয়ন্ত্রণ সেই ব্যবস্থারই অন্তর্গত। একালের "সরকারী ব্যাঙ্ক" নামে পরিচিত কতকগুলা প্রতিষ্ঠানকেও রিজার্ভ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নামে অভিহিত করা অনেকটা সার্বজনিক দস্তুর দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এইখানে বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, বিলাত (১৬৯৪), ফ্রান্স (১৮৮০), জার্মাণি (১৮৭৫), জাপান (১৮৮২) এবং ইতালির (১৮৯৩) এই ধরণের সেকেলে ব্যাঙ্কগুলার কোনটাকেই "রিজার্ভ", "কেন্দ্রীয়" বা "সরকারী" বলা হয় না। আপন আপন দেশের নামানুসারেই এইগুলার নামকরণ হইয়াছে। "সরকারী" প্রতিষ্ঠান হিসাবে এগুলার দৌড় কতটুকু তাহা সমঝিতে হইলে উহাদের ভিতর-বাহির রীতিমত খতাইয়া দেখিতে হইবে। সহজেই প্রশ্ন উঠিবে,—অতীতে এগুলা আপন আপন দেশের রিজার্ভ কেন্দ্রের কাজ করিয়াছিল কি না এবং বর্তমানেই বা এগুলার হালচাল কেমন। এই-সব প্রশ্নের উত্তর পাইতে

হইলে মুদ্রার বাজারে এগুলার কার্যকলাপের ইতিহাস এবং ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের হিসাব আবশ্যক হইবে। কিন্তু একটি বিষয় সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই যে, এগুলা পুরাপুরি ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাঙ্ক। ব্যবসাবাণিজ্যের কর্জ-প্রতিষ্ঠান-রূপে নোট ছাপান এবং নোট চালানও এগুলার কারবার এবং একটা বিশেষত্বও বটে। কাগজী মুদ্রা এবং নোট বাহির করার কাজে এগুলা প্রধানভাবে মোতায়েন।

ইতালিতে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলা এমিস্‌সিয়োনে ব্যাঙ্ক, ফ্রান্সে সির্কুলাসিঅঁ ব্যাঙ্ক এবং জার্মাণিতে নোট-ব্যাঙ্ক রূপে পরিচিত। ইংরেজীতে ইহার প্রতিশব্দ "ইস্থ-ব্যাঙ্ক" হওয়া কর্তব্য।

এই সমস্ত ব্যাঙ্কের উপর দুই ধরণের কাজ ন্যস্ত থাকে। প্রথমতঃ ডিপজিট ও কর্জদাদনের কারবার করিয়া এগুলা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাজও করে। দ্বিতীয়তঃ কাগজের নোট বাহির করাও এগুলার বিশেষ ধান্ধা। ১৮৪৪ সনের ব্যাঙ্ক চার্টার আইনে ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যণ্ডকে (১) মামুলি ব্যাঙ্কিং কারবার ও (২) নোট বাহির করা—এই দুই কাজের জন্য দুই স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

এই সমস্ত কর্জ-প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয়, রিজার্ভ, সরকারী বা আধা-সরকারী রূপটা অগ্রাহ্য করা বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাঙ্করূপে যে এগুলা সাধারণ ব্যাঙ্কের কারবারও চালায় তাহা ঘাঁটিয়া দেখাই প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষি, শিল্প বা অন্যান্য শ্রেণীর ব্যাঙ্কিংয়ের মত নোট-ব্যাঙ্কিংয়ের নিজস্ব ঝুঁকি এবং ঐ সমস্ত ঝুঁকি সামলাইবার পন্থা আছে। এখন নূতন রাইখ্‌স্‌ বাঙ্ক এবং বাঁক্‌ দ্য ফ্রাঁসকে ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইংল্যণ্ডের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যাউক। ইহাতে নোট-ব্যাঙ্কিং এবং বাণিজ্যবিষয়ক ব্যাঙ্কিং এই দুমুখো সমস্যা ইস্থ-ব্যাঙ্কগুলার দ্বারা কি ভাবে সমাধান হইতে পারে তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে।

জার্মাণির পাঁচটা নোট-ব্যাঙ্ক

১৮৫১ সনে জার্মাণিতে ১০টা নোট-ব্যাঙ্ক ছিল। ১৮৬০ সনে এই সংখ্যা ৩০ এবং ১৮৭৫ সনে ৩৩-এ পরিণত হয়। এক প্রুশিয়াতেই ব্যাঙ্ক অফ্‌ প্রুশিয়া নামক সরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া আরও ৮টা নোট-ব্যাঙ্ক ছিল।

১৮৭৫ সনের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে আইন জারি হয়। ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ও উহার পরিচালনে সর্বত্র একই ধরণের নিয়ম-কানুন প্রচলন করার ব্যবস্থা করা হয়। জার্মাণ সাম্রাজ্যের সিক্কার ঐক্য-সাধনও ঐ আইনের অন্যতম ধান্ধা ছিল।

১৮৭৫ সনের আইনের বলে ৩৩টি ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিবার অধিকার লাভ করে। কিন্তু এইগুলার নোট ছাপাইবার মুরোদ ৩৮৫০ লক্ষ মার্ক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়। এই ৩৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাইখ্‌স্‌ বাঙ্ককেও ধরা হয়, এবং ইহার নোট বাহির করার দৌড় স্থির করা হয় ২৫ কোটি মার্ক পর্যন্ত। উক্ত আইনে এই ব্যবস্থাও কায়েম করা হয় যে, যদি এই সমস্ত ব্যাঙ্কের কোনোটি ফেল মারে বা নোট বাহির করার অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে তাহা হইলে রাইখ্‌স্‌ বাঙ্ক ঐ ফেল-মারা ব্যাঙ্কের সমস্ত অধিকার ভোগ করিবে এবং ঐ ব্যাঙ্ক যে পরিমাণে নোট বাহির করার অধিকারী ছিল রাইখ্‌স্‌ বাঙ্ক সেই পরিমাণে অতিরিক্ত নোট বাহির করিতে পারিবে।

১৯০০ সনে রাইখ্‌স্‌বাঙ্ক বাদে নোট-ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৭টি। এইগুলার মোট পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ কোটি মার্ক। নোট-ব্যাঙ্কগুলা যেই কারবার গুটাইয়াছে বা অধিকার ত্যাগ করিয়াছে রাইখ্‌স্‌ বাঙ্ক সেই তাহাদের স্থান দখল করিয়া পুঁজির ঘাট্‌তি ও নোট ছাপাইবার ঘাট্‌তি দুইই পূরণ করার ব্যবস্থা করিয়াছে।

১৯১৩ সন হইতে জার্মাণিতে নোট-ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল মাত্র পাঁচটি, যথা—(১) ব্যাভেরিয়ার বায়ারিশে নোটেনবাঙ্ক, (২) স্যাক্সনির সেক্‌জিশে বাঙ্ক (৩) ভুর্টেম্বার্গের ভুর্টেম্ব্যার্গিশে নোটেনবাঙ্ক, (৪) বাডেনের বাডিশে নোটেনবাঙ্ক এবং (৫) রাইখ্‌স্‌ বাঙ্ক (ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক)। শেষোক্ত ব্যাঙ্কটির প্রধান কার্যালয় বার্লিনে অবস্থিত এবং দেশের মধ্যে তখন ইহার শাখা-কার্যালয় ৪৮০।

১৯১৩ সনে প্রথম চারটি নোট-ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা (মার্কে) নিম্নরূপ ছিল :—

	পুঁজি	নোট	নগদ
বায়ারিশে	৭,৫০০,০০০	৬৬,০৫৫,০০০	৩৯,১৯৭,০০০
সেক্‌জিশে	৩০,০০০,০০০	৫৪,৬৯৭,০০০	৩৪,২৪৩,০০০
ভুর্টেম্ব্যাগিশে	৯,০০০,১০০	২১,২২৭,০০০	১১,০০০,০০০
বাডিশে	৯,০০০,০০০	১০,৮০৩,০০০	৭,৯১২,০০০

এই চারটি ব্যাঙ্কের মোট নোট ছাপানোর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৬০,০০০,০০০ মার্ক।

১৯১৩ সনে রাইখ্‌স বাঙ্কের সর্বোচ্চ নোট প্রচার ২,৫৯১,৪৪৫,০০০ মার্ক এবং সর্বনিম্ন প্রচার ১,৭১১,৭০০,০০০ মার্ক দাঁড়ায়; সুতরাং এই বৎসরের গড় প্রচার ছিল ১,৯৫৮,০০০ মার্কের কাছাকাছি। প্রথম চারটি নোট ব্যাঙ্কের সমবেত নোট-জারি অপেক্ষা রাইখ্‌স বাঙ্কের মোট নোট-প্রচার প্রায় ১৩ গুণ বেশী। প্রাগ্‌-যুদ্ধ-যুগে এই অনুপাতই ছিল দস্তর।

যুদ্ধের পরবর্তী যুগের প্রথম বৎসরে (১৯১৯) পূর্বোক্ত চারটি নোট-ব্যাঙ্কের নোট-জারি নিম্নরূপ দাঁড়ায় :—

বায়ারিশে	১০৩,৮০০,০০০ মার্ক
সেক্‌জিশে	৮৪,৭০০,০০০ মার্ক
ভুর্টেম্ব্যাগিশে	৩১,৭০০,০০০ মার্ক
বাডিশে	৩৭,৭০০,০০০ মার্ক

সুতরাং মোট প্রচারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৬০,০০০,০০০ মার্ক হইতে প্রায় ২৫৮,০০০,০০০ মার্ক পর্যন্ত। এইগুলির ৬২% বাড়তি মহাযুদ্ধের সময়কার রাইখ্‌স্ বাঙ্কের অতি-বাড়ের তুলনায় কিছুই নয়। ১৯১৯ সনের মাত্র একটা রাইখ্‌স্ বাঙ্কের নোট প্রচার দাঁড়ায় ৩৫,৬৯৮,৩৬৯,০০৯ মার্ক। এই বৎসরের সর্বনিম্ন সীমা ২২,৪৩৬,৮৪৪,০০০ মার্ক, এবং বৎসরের গড় ২৭,৯৮৭,৮০৮,০০০ মার্ক। মহাযুদ্ধের পরে কাগজী মুদ্রার যে অতি-প্রচলন দস্তরে পরিণত হয় ইহা তাহার পূর্বাভাসরূপে ধরা যাইতে পারে। ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯১৯ সনের গড় ১৪২৯% বেশী। সুতরাং রাইখ্‌স্ বাঙ্কের সহিত অপর চারটি ব্যাঙ্কের অনুপাত ১০৮ : ১। মহাযুদ্ধের পূর্বে এই অনুপাত ছিল ১৩ : ১।

জার্মাণ সাম্রাজ্যের সিক্কার বাজারে এই চারটি ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বুঝা যাইতেছে। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্তী কালে কাগজী মুদ্রার অতি-প্রচলন দেখা দেয়। কাজেই ১৯২৪ সনে ব্যাঙ্কসমূহ পুনর্গঠনের সময় এই ব্যাঙ্কগুলির নোট প্রচারের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয় নাই। ১৯২৪ সনের আইনে উক্ত ব্যাঙ্ক চতুষ্টয়কে সর্বোচ্চ সীমায় নিম্নলিখিতরূপ নোট ছাপানোর অধিকার দেওয়া হয় :—

বায়াবিশে	৭০,০০০,০০০	রাইখ্‌স	মার্ক
সেক্‌জিশে	৭০,০০০,০০০	,,	,,
ভুর্টেম্ব্যাগিশে	২৭,০০০,০০০	,,	,,
বাডিশে	২৭,০০০,০০০	,,	,,

সুতরাং এইগুলার মোট নোট প্রচার ১৯৪,০০০,০০০ রাইখস্ মার্কের বেশী হইতে দেওয়া হয় নাই।

ব্যাঙ্কগুলাকে ১৯৩৫ সনের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত এই অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হয়। তারপর এই অধিকার নাকচ বা হ্রাস করিবার কথা। প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর এক বৎসরের নোটিশ দিয়া অধিকার নাকচ বা কমাইবার রেওয়াজ কায়েম করা হইয়াছে। কোনো ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জার্মাণ মুল্লুকের রাইখ্‌স বাঙ্কে কেন্দ্রীভূত একচেটিয়া নোট-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে।

রাইখ্‌স বাঙ্ক ১৮৭৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সময় ব্যাঙ্ক অব্ প্রুসিয়া, ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনী প্রভৃতি প্রদেশের প্রতিষ্ঠানের মত সরকারী নোট-ব্যাঙ্ক ছিল। কিন্তু এইটির উচ্ছেদ সাধন করিয়া রাইখ্‌স বাঙ্কের গোড়াপত্তন করা হয়। প্রদেশের নাম ইহার সহিত জড়িত না করিয়া নয়া জার্মাণ সাম্রাজ্যের নামে ইহা প্রচলিত করা হয়। নিম্নে প্রথম প্রতিষ্ঠা হইতে ১৯২৩ সন পর্যন্ত (মহাযুদ্ধের পর কাগজী মুদ্রার অতি প্রচলন সহ) এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জীবন-কথা লিখিত হইল :—

সন	গড় নোট প্রচলন	১৮৭৬ সনের শতাংশ	সর্বোচ্চ প্রচলন	সর্বনিম্ন প্রচলন
১৮৭৬	৬৮৪,৮৬৬,০০০	১০০	৭৭৭,৬৭৭,৭০০	৬২১,০৮৯,০০০
১৮৯৬	১,০৮৩,৪৯৭,০০০	১৫৮,২	১,২৫৭,৯২৫,০০০	৯৭৩,৪৮৪,০০০
১৯১৩	১,৯৫৮,১৭৩,০০০	২৮৫,৯	২,৫৯৩,৪৪৫,০০০	১,৭১১,৭০০,০০০
১৯২১	৭৮,৬১৯,৪৭১,০০০	১১৩,৪৭৯,৫	১১,৬৩৯,৪৬৪,০০০	৬৫,৫১৯,৮৭৭,০০০
১৯২২	...		১,২৮০,১ মিলিয়ার্ড	১১১,৯ মিলিয়ার্ড
১৯২৩	...		৪৯৬,৫ ট্রিলিয়ণ	১,৩৩৬,৫ ,,

পুনর্গঠিত রাইখ্‌স বাঙ্কের প্রথম বৎসরের (১৯২৪) হালচাল নিম্নরূপ :—

(রাইখ্‌স মার্কে হিসাব)

গড় নোট প্রচলন	১৮৭৬ সনের শতাংশ	সর্বোচ্চ প্রচলন	সর্বনিম্ন প্রচলন
১,০৬৮,৪৬৫,০০০	১৫৬	১,৭৪১,৪৪০,০০০	১,৪৮৪,২৪৯,০০০

এই প্রসঙ্গে ১৮৯৬ সনের মাপজোক খতাইয়া দেখা দরকার।

কাগজী মুদ্রা বনাম ব্যাঙ্ক-নোট

ব্যাঙ্ক-নোট বস্তুটা কাগজী মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলা বড় বড় পাওনা পরিশোধের সময় এই চিজ প্রয়োগ করে। ব্যাঙ্কগুলার অধিকারে যে সোনা থাকে এবং ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে যাহা জমা থাকে তার পরিবর্তে উহারা প্রতিশ্রুতির নোট প্রচার করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যাঙ্ক যে দেনার ঝুঁকি ঘাড়ে লয় ব্যাঙ্ক-নোটগুলা তার দলিল-সাক্ষী ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য ব্যাঙ্কগুলা ঠিক যে মূল্যের কাগজী মুদ্রা ছাড়ে ঠিক সেই মূল্যের মূল্যবান্ ধাতু জমা রাখিতে অভ্যস্ত।

রাষ্ট্র কিন্তু ব্যাঙ্কগুলার লেনদেনের কারবার বাড়াইবার জন্য উহাদিগকে সঞ্চিত মূল্যবান্ ধাতু অপেক্ষা অধিকতর মূল্যের নোট বাহির করিবার অধিকার দিয়াছে। ১৯২৪ সন পর্যন্ত জার্মাণিতে নিয়ম ছিল, প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে প্রচারিত নোটের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যবান্ ধাতু জমা রাখিতে হইবে। প্রচারিত নোটসমূহের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যের সোনা সকল সময়ে জমা রাখা নোট-ব্যাঙ্কগুলা নিরাপদ্ ভাবিত, কারণ দরকার হইলে তাহার দ্বারা নগদ টাকায় শোধ দেওয়াও সম্ভবপর হইতে পারে।

সুতরাং পুরাতন দস্তুর নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত করা যাইতে পারে। নোট-ব্যাঙ্কগুলা নোটের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যের সোনা জমা রাখিত। বাকী দুই-তৃতীয়াংশের জন্য নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা থাকিত। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্কগুলা ভাল ভাল সিকিউরিটি বা কোম্পানীর কাগজ জমা রাখিতে চেষ্টা করিত, কারণ প্রয়োজন হইলে ঐগুলা অনায়াসে বিক্রয় করিয়া দায় উদ্ধার করা চলিত। দ্বিতীয়তঃ ব্যাঙ্কগুলা তিন মাসের মধ্যে পরিশোধিতব্য এক্‌সচেঞ্জ বিল বা বিনিময়ের দলিল এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কাগজ রাখিত।

সুতরাং প্রকৃত পক্ষে এই ধরণের ব্যাঙ্ক-নোটগুলিকে কাগজী মুদ্রা বলা চলে না। মূলতঃ এইগুলা ধাতব মুদ্রারই স্থলাভিষিক্ত। কোন ব্যাঙ্কই খাঁটি কাগজী মুদ্রা বাহির করে নাই। একমাত্র গবর্ণমেণ্টই বিপদ-আপদের সময় কাগজী মুদ্রা বাহির করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ মহা-যুদ্ধের রেওয়াজ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাগজী মুদ্রার দস্তুর এই যে, উহা ধাতব মুদ্রায় পরিণত হইতে পারে না।

কাগজী মুদ্রার উদাহরণ স্বরূপ রাইখ্‌স কাসসেনশাইন

অর্থাৎ ইম্পিরিয়্যাল ট্রেজারি বিল উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৪ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখের আইন দ্বারা জার্মাণির ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট এইগুলা প্রথম জারি করে। রাইখ্‌স বাঙ্কে এইগুলা জন্মলাভ করে নাই। এর জন্য কোন সোনাও মজুদ রাখা হয় নাই বা এগুলা সোনায় রূপান্তরিতব্যও ছিল না। সুতরাং এইগুলা যেমন এক পক্ষে পূরাপূরি কাগজী মুদ্রার লক্ষণযুক্ত অন্য পক্ষে তেমনি এগুলা ব্যাঙ্ক-নোট হইতে পৃথক বস্তু। দেশবাসী যখন বা যদি গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব এবং আর্থিক লেনদেনে বিশ্বাসবান্‌ হয় একমাত্র তখন ও তবেই গবর্ণমেণ্ট কাগজী মুদ্রা জারি করিতে সাহসী হইয়া থাকে।

যে আইন অনুসারে রাইখ্‌স কাস্‌সেন্‌শাইনের প্রথম প্রচলন হয় তদনুসারে নিয়ম করা হয় যে, ১২ কোটি মার্কের বেশী এই চিজ বাহির করা চলিবে না। সুতরাং সাধারণ সময়ে সাম্রাজ্যের মুদ্রা-ব্যবস্থায় এইগুলা ধর্তব্যের মধ্যেই দাঁড়াইত না।

১৮৭৬ সনে এই খাতে কাগজী মুদ্রা বাহির করা হয় ৪৪,৮০৮,০০০ মার্ক, এবং ১৯১৩ সনে মাত্র ৪৬,২০২,০০০ মার্ক। এই সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সীমা উপস্থিত হয় ১৯০৭ সনে এবং মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫,৪৩৯,০০০ মার্ক; কারণ এই বৎসর আমেরিকার আর্থিক সঙ্কটের ঢেউ ইয়োরোপেও লাগিয়াছিল।

মহাযুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের পরবর্তী কাগজী মুদ্রার অতি-প্রচলনের যুগেও রাইখ্‌স কাস্‌সেন্‌শাইন সিক্কার জগতে বড়রূপে প্রতিভাত হয় নাই। ১৯২০ সনের সর্বোচ্চ সীমার বৎসরে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ১০০,২৫৯,০০০ মার্ক।

এই শ্রেণীর কাগজী মুদ্রা চাপা পড়িয়া যায় ডার্লে হেন্‌স্‌ কাস্‌সেনশাইন (লোন ট্রেজারী বিল) নামক আর এক ধরণের কাগজী মুদ্রা দ্বারা। মহাযুদ্ধের প্রথম বৎসরে (১৯১৪) ইহার পরিমাণ ৮৭১,১৩৮,০০০ মার্ক হইলেও ১৯২২ সনে ২৩৮,৪৭২,৫৮১,০০০ মার্ক দাঁড়ায়। ১৯২৩ সনে ৯৩ বিলিয়নের সীমাও ছাড়াইয়া যায়। ১৯২৪ সনে এই ধরনের লোন ট্রেজারি বিল বিলুপ্ত করা হয়।

১৮৭৫ সনের রাইখ্‌স-বাঙ্ক আইন

মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী বৎসরগুলায় সুবিধা-প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক চতুষ্টয়ের মোট নোট প্রচলন দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ১৫-২০ কোটি মার্ক। জার্মাণির লেন-দেনের ক্ষেত্রে ঐ ব্যাঙ্ক-গুলার কিম্মৎ ছিল অত্যন্ত কম। তাছাড়া ১৮৭৫ সনের আইন অনুসারে ঐ ব্যাঙ্কগুলার নোট কেবলমাত্র রাইখ্‌স বাঙ্কের নিকট কর্জ শোধ দেওয়ার সময় মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত। ১৯২৪ সনের আইন অনুসারে এই সমস্ত নোটের আইনসম্মত মুদ্রারূপে (লিগ্যাল্‌ টেণ্ডার) ব্যবহৃত হওয়ার উপায় নাই। কোনো প্রাদেশিক আইন-কানুনের (ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনী প্রভৃতি) মুরোদ নাই যে, এগুলিকে এই মর্যাদা দিতে পারে। সুতরাং, স্বভাবতঃই এইগুলার কারবার জার্মাণ সাম্রাজ্যের মুদ্রা-ব্যবস্থার আলোচনা-ক্ষেত্রে ধর্তব্যের মধ্যে আসে না বলিলে চলে।

বাস্তবক্ষেত্রে রাইখ্‌স বাঙ্কই ছিল সাম্রাজ্যিক জার্মাণির একমাত্র নোট-ব্যাঙ্ক। সাধারণতন্ত্রী জার্মাণ যুক্তরাষ্ট্রের আমলেও রাইখ্‌স বাঙ্কের উক্ত অধিকার অটুট আছে। ১৯২৪ সনের আইনে রাইখ্‌স বাঙ্কের এই অধিকার আরও বেশী বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাইখ্‌স বাঙ্ক একটা আক্‌টসিয়েনগেজেল্‌ শাফ্‌ট অর্থাৎ বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের অধিকারী একটি "সাধারণ" জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী। সুতরাং প্রতিষ্ঠানটা আইনের চোখে আর পাঁচটা শিল্প বা বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের মত একই মর্যাদাবিশিষ্ট। লোকে সাধারণতঃ ইহাকে সরকারী ব্যাঙ্ক মনে করিলেও ইহা আসলে তাহা নয়। ১৯২৪ সনের আইন স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছে যে, ইহা জার্মাণ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংস্রব-শূন্য। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলিয়া রাখা ভাল যে, ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড এবং বাঁক্‌ ত্য ফ্রাঁসও সরকারী প্রতিষ্ঠান নহে।

১৯২৪ সনের পূর্বে কিন্তু ইহার পরিচালন সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। প্রেসিডেণ্ট থাকিত একজন উচ্চতম সাম্রাজ্যিক কর্মচারী।

পরিচালনে অংশীদারদের দাবীদাওয়ার কথা বড় একটা আমল পাইত না। সাম্রাজ্যবাসী সর্বসাধারণের সুখ-সুবিধা রক্ষা করাই ছিল ইহার সব চেয়ে বড় ধান্ধা।

১৮৯৯ সনে চার্টার পরিবর্তন করিয়া মূলধন ১৮ কোটি মার্ক (প্রায় ১৩½ কোটি টাকা) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ১৯১১ সনে সর্বোচ্চ লভ্যাংশ নির্দিষ্ট হয় ৩½%। লভ্যাংশ বিতরণের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা নিম্নলিখিতভাবে বাঁটিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ঃ—¾ অংশ যাইবে রাষ্ট্রের তহবিলে এবং বাদবাকী অংশীদারগণ ভোগ করিবে। প্রত্যেক হিস্যাদারকে প্রাপ্ত লাভের ১০% চাঁদা দিয়া মজুদ তহবিলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৮৭৫ সনে রাইখ্স্ বাঙ্ককে কেবলমাত্র বেশী দামের নোট জারি করার অধিকার দেওয়া হয়, —যথা ১০০০ ও ১০০ মার্কের নোট। ১৯০৩ সনের আইনে ৫০ এবং ২০ মার্কের নোট বাহির করার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯২০ সনের পূর্বে ১০ মার্কের নোট সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল।

১৯০৯ সনে প্রথম আইন করিয়া রাইখ্স্ বাঙ্কের নোটগুলাকে "লিগ্যাল টেণ্ডার" অর্থাৎ কানুন-মাফিক মুদ্রা রূপে ঘোষণা করা হয়। কার্যতঃ কিন্তু আইনের সাহায্যে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার সৃজন না করা হইলেও ১৮৭৪ সনের পর হইতে ঐগুলা ঐভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল।

১৮৭৫ সনের আইন কাগজেকলমে রাইখ্স্ বাঙ্কের নোট বাহির করার গণ্ডী বাঁধিয়া দেয় নাই বা কোনরূপ প্রতিবন্ধকেরও ব্যবস্থা করে নাই। কিন্তু কার্যতঃ একটা সীমার ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছিল। কারণ ৫৫০,০০০,০০০ মার্কের অতিরিক্ত নোটসমূহের জন্য ইহাকে ৫% হারে ট্যাক্স দিতে হইত।

নোট-প্রচারের ক্ষমতা অসীম হইলেও রাইখ্স্ বাঙ্ক কোন্ কোন্ ধরণের কারবার চালাইতে পারিবে সে সম্বন্ধে আইন করিয়া রীতিমত বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে এই নোট-ব্যাঙ্কের অন্য কোনো ব্যাঙ্কের সহিত প্রতিযোগিতা করার উপায় ছিল না। সুতরাং এই ঋণ-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আপন খেয়াল-খুসী মত নোট বাহির করার বাস্তবিকই কোন উপায় ছিল না। কাজেই রাইখ্স্ বাঙ্ক আপন কারবারের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে যথেচ্ছ নোট প্রচারের অধিকারী ছিল মাত্র। আর এই সমস্ত কারবারের হালচালও এমন যে, রাইখ্স্ বাঙ্ক কোনো বিপজ্জনক ঝুঁকি মাথায় লইতে সাহসী হইত না, কারণ তাহা হইলে নোট ভাঙাইয়া নগদ টাকা প্রদানের জন্য ইহার যে সুনাম আছে তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিত।

জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ

আইনে খোলসা করিয়া নোটের জামিন রাখার কথা ছিল। রাইখ্স্ বাঙ্ককে অন্ততঃ পক্ষে প্রচারিত নোটের একতৃতীয়াংশের জন্য প্রচলিত দুই দফার এক দফা গ্যারাণ্টি রাখিতে হইত। গ্যারাণ্টি বা জিম্মার চিজ্ ইম্পিরিয়্যাল ট্রেজারি বিল সমেত জার্মাণ মুদ্রা হইতে পারিত। অথবা ব্যাঙ্কের সিন্দুকে সোনার তালও রাখা চলিত। বিদেশী মুদ্রার আকারেও সোনা রাখায় কোনো আপত্তি ছিল না। এক পাউণ্ড সোনার দাম ধরা হইত ১৩৯২ মার্ক। সুতরাং সিকিউরিটি রাখা সম্বন্ধে রাইখ্স্ বাঙ্কের কোনো স্বাধীনতা ছিল না; কাগজী মুদ্রার মজুদ তহবিল রীতিমত সরকারী আইন দ্বারা নির্ধারিত হইত।

ধাতুঘটিত সিকিউরিটি বা জামিন যতখানি ততখানি পর্যন্ত নোটগুলা যে আসল স্বর্ণমুদ্রা সেই সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। সোনার তাল এবং বিদেশী মুদ্রা দুই-ই ন্যায্য সিকিউরিটিরূপে গ্রাহ্য হইত। টাঁকশালে সকলেরই অবাধ অধিকার ছিল, এবং যে কেহ এখানে সোনা জমা দিয়া মুদ্রা তৈরী করিয়া লইতে পারিত; সুতরাং এই জন্য রাইখ্স্ বাঙ্কের মজুদ সোনাও জার্মাণ স্বর্ণমুদ্রার সামিল ছিল।

কিন্তু ঢাকনা বা জামিনের অন্যান্য দফা বিষয়ক আইনে,—যথা ইম্পিরিয়্যাল ট্রেজারি বিল সহ সাধারণ জার্মাণ মুদ্রার গ্যারাণ্টিতে,—রাইখ্স্ বাঙ্কের পক্ষে কাগজী মুদ্রার বিজয়-অভিযানের দিকে ফাঁক ছিল যথেষ্ট। কারণ

এই দফায় স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ বাঁধিয়া রাখার কোনো বাধ্য-বাধকতা ছিল না। আর ইম্পিরিয়্যাল ট্রেজারি বিলও ছিল কাগজমাত্র। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত জার্মাণ মুদ্রাই স্বর্ণ-নির্মিত ছিল না। কারণ নিকেল, তামা এবং রূপার মুদ্রারও চলন ছিল।

সুতরাং যাহারা নোটের জামিন বা আবরণ স্বরূপ এক-তৃতীয়াংশ সোনার পক্ষপাতী তাহাদের পক্ষে ১৮৭৫ সনের আইন নিশ্চয়ই গলদ্‌পূর্ণ। রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক যদি আইনের দৌর্বল্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিত তাহা হইলে আর্থিক জগতে মহা দুর্যোগ উপস্থিত হইতে পারিত। কিন্তু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক আপনাকে নিরাপদ্ রাখিবার জন্য আইনসম্মত সোনার পরিমাণ ও সিকিউরিটি বা কোম্পানীর কাগজ অপেক্ষা অধিকতর সোনা ও বাণিজ্যিক কাগজপত্র মজুদ রাখিয়া চলিয়াছে।

জার্মাণির অন্যান্য নোট-ব্যাঙ্কের মত রাইখ্‌স ব্যাঙ্ককেও ⅔ ভাগ ছাপান নোটের জন্য ভাল ভাল সিকিউরিটি বা কোম্পানীর কাগজ (যদিও পূর্বোক্ত নগদ টাকা নয়) মজুদ রাখিতে হইত। আইন অনুসারে কাগজগুলি তিন মাসের মধ্যেই শোধ দিতে হইত অর্থাৎ লম্বা মেয়াদী হুণ্ডি জিম্মারূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত না। অধিকন্তু এইগুলিতে যুগ্ম স্বাক্ষর থাকিত অর্থাৎ দুইটা বিশ্বাসযোগ্য কোম্পানীর দায়িত্ব কাগজগুলার গায়ে লেখা থাকিত।

ধরিয়া লওয়া যাউক, রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক ১০০,০০০,০০০ মার্ক মূল্যের নোট ছাপাইয়াছিল। তাহা হইলে ১৮৭৫ সনের আইন অনুসারে সমমেত নোটের জামিন, ঢাক্‌না বা আবরণ নিম্নরূপ দাঁড়াইত :—

১। "নগদ"—
(ক) জার্মাণ মুদ্রা
(১) স্বর্ণমুদ্রা
(২) রৌপ্য মুদ্রা
(৩) নিকেল বা তাম্র মুদ্রা
(৪) ইম্পিরিয়্যাল ট্রেজারি বিল
অথবা
(খ) সোনা
(১) স্পেনার তাল
(২) বিদেশী মুদ্রা
} ৩৩,৩৩৩,৩৩৩⅓ মার্ক

২। "সিকিউরিটি"
বা কোম্পানীর কাগজ
(ক) গিল্ট এজ্‌ড
সোনার কিনারাযুক্ত
(খ) তিন মাসের মধ্যে
শোধনীয় হুণ্ডি
} ৬৬,৬৬৬,৬৬৭⅓ মার্ক

সুতরাং রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের সমস্ত নোটের জন্য জামিনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আইন অনুসারে কিছু জামিন-বিহীন বা আবরণ-শূন্য নোট বাহির করার অধিকার ছিল এবং ইহার সর্বোচ্চ সীমা বাঁধা ছিল ৫৫০,০-০,০০০ মার্ক।

এই সুবিধাভোগের সীমা যদি বাড়াইবার দরকার পড়িত তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সম পরিমাণের নগদ অর্থেরও ব্যবস্থা করিতে হইত। অন্যথায় যতদিন পর্যন্ত এই অতিরিক্ত নোট অর্থাৎ ঢাক্‌না-বিহীন নোট বাজারে চলিত ততদিন ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ৫% ট্যাক্স যোগাইতে বাধ্য থাকিত।

কিন্তু মোটের উপর জার্মাণ সিক্কা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় প্রত্যেকখানি নোট নগদ অর্থরূপে ধার্য হইত বা নগদ অর্থের স্থলাভিষিক্তরূপে বিবেচিত হইত। পূর্বোক্ত সামান্য সুবিধা ছাড়া "ঢাকনা অভাবে নোট অসিদ্ধ" অর্থাৎ "ঢাক্‌নাহীন নোট অগ্রাহ্য"—রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের ইহাই ছিল দস্তুর।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক দুর্যোগের ধাক্কা ইয়োরোপেও লাগিয়াছিল এবং এজন্য জার্মাণিকেও অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়। রাইখ্‌স ব্যাঙ্ককে বাধ্য হইয়া (১) বেশী নোট ছাপাইতে হয় (২) নগদ অর্থ, ও সিকিউরিটি প্রভৃতির পরিমাণও কমাইতে হয়। ১৯০৬ ও ১৯০৭ সনে নোটের জন্য গড় ঢাকনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৪·১০% হইতে ৬৮%; ১৯০২ সনে এই পরিমাণ ছিল ৮২·৮%। ১৯০৭ সনে এক সময় নোটের সর্বোচ্চ পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২৭৫,০০০,০০০ মার্ক এবং নগদ অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৭৭৬,০০০,০০০ মার্ক।

১৮৭৫ সনের আইনে একমাত্র সোনাকেই নগদ অর্থ-

রূপে গ্রহণ করা হয় নাই। সুতরাং নোটের নগদ অর্থের ঢাকনা ও সোনার ঢাকনার মধ্যে পার্থক্য ছিল। নগদ অর্থের ঢাকনার তুলনায় সোনার ঢাকনা কমই থাকিত। কারণ নগদ অর্থের মধ্যে সোনা ছাড়া অন্যান্য ধাতু এবং ইম্পিরিয়্যাল ট্রেজারী নোটও থাকিত। নিম্নে ঢাকনার (গড়) শতকরা হিস্যার ইতিহাস দেওয়া গেল :—

সন	গড় সোনার ঢাকনা	গড় নগদ অর্থের ঢাকনা
১৮৭৬	৪১'৯%	৮২'৫%
১৮৯১	৬০'৭%	৮৭'২%
১৯০৭	৪২'৯%	৬৪'১%
১৯১৩	৫৪'৫%	৭২'০%
১৯১৮	১৭'৫%	...
১৯১৯	৫'২%	...
১৯২০	২'০৮%	...
১৯২১	১'২৪%	...
১৯২২	০'৩৪%	...

১৯১৩ সন পর্যন্ত ক্যাশ অর্থাৎ নগদ অর্থের জামিন বা ঢাকনা সম্পর্কে "ড্রিট্টেল্স্ ডেক্কুং" অর্থাৎ "একতৃতীয়াংশ" নীতি দস্তরমত অনুসৃত হইয়াছিল। ১৯০৭ সনের সর্বনিম্ন পরিমাণ ৬৪'১% ছিল আইনসম্মত ক্যাশের প্রায় দ্বিগুণ। ক্যাশ বা "নগদ" জামিনের সোনার হিস্যা সম্বন্ধে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকিলেও এ বিষয়ে রাইখস্ বাঙ্ক খুব হুঁসিয়ার হইয়া চলিত। ১৯০৭ সনে সমস্ত প্রচলিত নোটের সোনার জামিন ছিল ৪২'৯%; আইন অনুসারে যে পরিমাণে ক্যাশ জামিনের প্রয়োজন ১৯০৭ সনের এই সর্বনিম্ন সোনার জামিনও তদপেক্ষা বেশী ছিল। সুতরাং এক সোনার জামিন দ্বারাই আইনতঃ বাধ্য-বাধকতার স্বচ্ছন্দে পূরণ হইত। ১৯০৪ সনের আইনে সোনার জামিন বাঁধিয়া দেওয়া হয় ৪০%; ১৮৭৬ সন হইতে ১৯১৩ সন পর্যন্ত সোনার জামিনের হিসাব সব সময়েই এর চেয়েও বেশী ছিল।

উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার জন্য রাইখস্ বাঙ্ক যত খুসী সোনা গ্রহণ করিতে পারিত; দ্বিতীয়তঃ লোকেরা টাকা-কড়ির পরিবর্তে সেই মূল্যের সোনা লইতে পারিত। স্বর্ণমানের দেশ বা স্বর্ণমানের যুগের ইহাই হইতেছে রীতি।

রাইখস্ বাঙ্কের পুনর্গঠন (১৯২৪-২৯)

উপরে যে বিবরণী দেওয়া হইল তাহা এখন ইতিহাসের সামগ্রী। ১৯২৪ সনের আইন দ্বারা রাইখস্ বাঙ্কের কাঠামোটাই বদলাইয়া ফেলা হইয়াছে,—এক কথায় প্রতিষ্ঠানটাকে সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া সাজানো হইয়াছে। পুনর্গঠিত রাইখস্ বাঙ্কের পরিচালন ও শাসনভার পাঁচটা বিভিন্ন বিভাগের হাতে অর্পিত হইয়াছে :—

(১) রাইখস্ বাঙ্ক ডিরেক্টোরিয়ুম অর্থাৎ রাইখস্ বাঙ্কের ডিরেক্টার সভা, (২) গেনেরালরাট অর্থাৎ বড় সভা, (৩) নোট বাহির করিবার কর্মকর্তা, (৪) অংশীদারদের মহাসভা এবং (৫) অংশীদারদের কেন্দ্রীয় কমিটি।

ব্যাঙ্কের গঠন-প্রণালীর দিক্ হইতে ডিরেক্টার-সভাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিভাগ, কারণ এই সভা সিক্কা, ডিস্কাউণ্ট ও কর্জদাদন-নীতি নিয়ন্ত্রণকারী। ডিরেক্টার সভায় প্রয়োজনমত যে কোন সংখ্যক সদস্যের স্থান হইতে পারে। একজন সদস্য প্রেসিডেণ্টরূপে পরিচিত। সদস্যদের প্রত্যেকেরই জার্মাণ নাগরিক হওয়া চাই। সংখ্যা-গরিষ্ঠদের অনুমোদিত নিতান্ত সাদাসিধে আইনই ব্যাঙ্কের বিধিবদ্ধ আইন। দুই পক্ষে ভোট সমান হইলে প্রেসিডেণ্ট নাকচ করিবার ভোট প্রয়োগ করিতে পারে।

প্রেসিডেণ্ট বড় সভা কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তি; নয় জনের মেজরিটি কর্তৃক তিনি সমর্থিত এবং এই ৯ জনের মধ্যে ৬ জন জার্মাণ। সুতরাং কোনো অ-জার্মানের পক্ষেই প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়ার উপায় নাই। ১৯২৪ সনের পূর্বে অবস্থা ছিল একেবারে বিপরীত। তখন প্রেসিডেণ্ট গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাহাল হইত এবং একজন পুরাদস্তুর সরকারী চাকুরেই

যার উপর গবর্ণমেন্টের কোন প্রভুত্বই নাই। আবার এই বড় সভার অধিকাংশ সদস্যই যে অ-জার্মাণ তাহা আমরা পরে দেখাইব। বড় সভা কর্তৃক প্রেসিডেন্ট পদচ্যুত হইতেও পারে। কিন্তু একটা বিষয় জানিয়া রাখা দরকার যে, যে নিয়োগপত্রের বলে প্রেসিডেন্ট কার্যভার গ্রহণ করে সেই নিয়োগপত্রে কেবল-মাত্র নির্বাচনে যোগদানকারী বড় সভার সদস্যদের নাম স্বাক্ষরই থাকে না, নিয়োগপত্রখানি রাইখ্‌স প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ জার্মাণ গবর্ণমেন্টের প্রেসিডেন্ট কর্তৃকও স্বাক্ষরিত হওয়া দরকার। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক এই যে, রাইখ্‌স প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করিলে নিয়োগপত্র স্বাক্ষরে গররাজী হইয়া বড় সভা দ্বিতীয়বার নির্বাচন আহ্বান করিতেও বাধ্য করিতে পারেন। রাইখ্‌স প্রেসিডেন্ট যদি দ্বিতীয় নির্বাচিত ব্যক্তির নিয়োগ-পত্রে নাম সহী করিতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে তৃতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এইবারও রাইখ্‌স প্রেসিডেন্ট যদি সহী করিতে রাজী না হন তাহা হইলে নিয়োগপত্রে রাইখ্‌স প্রেসিডেন্টের নাম স্বাক্ষর না থাকা সত্ত্বেও রাইখ্‌স বাঙ্কের প্রেসিডেন্ট কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্টের কার্য্যকালের মেয়াদ ৪ বৎসর। তিনি পুনর্নির্বাচিতও হইতে পারেন।

পুরাতন রাইখ্‌স বাঙ্কের কাউন্সিল মেম্বরগণ গবর্ণ-মেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইত। কিন্তু নূতন রাইখ্‌স বাঙ্কের ডিরেক্টোরিয়ুম প্রেসিডেন্টের মত সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। প্রেসিডেন্টের মত সদস্যগণও বড় সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয় অর্থাৎ ৬ জন জার্মাণ সহ ৯ জনের মেজরিটি কর্তৃক নির্বাচিত হয়। নিয়োগপত্রে কিন্তু রাইখ্‌স প্রেসিডেন্টের পরিবর্তে ব্যাঙ্কের প্রেসি-ডেন্টের নাম স্বাক্ষর থাকে। প্রথম ডিরেক্টোরিয়ুম যে সমস্ত সদস্য লইয়া গঠিত হয় সেই সমস্ত সদস্য তিনটি বয়সের শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং তাহাদের কার্যকালের মেয়াদ ছিল ৪ হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত। ইহাদের সকলেরই পুনরায় নির্বাচিত হইবার অধিকার আছে, এবং পুনর্নির্বাচনের পর প্রত্যেকের ১২ বৎসর পর্যন্ত সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু প্রত্যেক সদস্যই ৬৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য।

গুরুতর আপত্তির কারণ উপস্থিত হইলে প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করিতে পারে; কিন্তু এজন্য পূর্বোক্তরূপ মেজরিটি কর্তৃক এই পদচ্যুতি সমর্থিত হওয়া দরকার। এই একই ধরণে ডিরেক্টোরিয়ুমের অন্যান্য সদস্যদিগকেও জবাব দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু প্রেসিডেন্টের সমর্থন থাকা চাই।

জার্মাণ রাইখ্‌স বাঙ্কে মজার ব্যাপার এই যে, গবর্ণমেন্ট ডিরেক্টোরিয়ুমের উপর কোন প্রকার খবরদারি করিবারই অধিকারী নয়। আইনের ভাষায় ডিরেক্টোরিয়ুম প্রায় পূর্ণ স্বরাজের অধিকারী। বড় সভারও ডিরেক্টোরিয়ুমের উপর কোনো হাত নাই, যদিও ডিরেক্টোরিয়ুমের জন্মদাতা।

গেনেরালরাট অর্থাৎ বড় সভাকে রাইখ্‌স বাঙ্কের "কিং-মেকার" রাজা-নির্বাচক বলা যাইতে পারে। এই অদ্ভুত প্রতিষ্ঠানটির জুড়িদার অন্য কোনো নোট-ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চৌহদ্দির মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই প্রতিষ্ঠানের ১৪ জন সদস্যের মধ্যে অর্দ্ধেক মাত্র জার্মাণ। বাকী সাতজন অ-জার্মাণ সদস্য, বিলাত, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড এবং স্বইট্‌সারল্যাণ্ডের লোক। সাতজন জার্মাণ সদস্যের মধ্যে একজন প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি বড় সভারও চেয়ারম্যান। সাতজন বিদেশী সদস্যের মধ্যে একজন নোট বাহির করিবার কমিসারের কাজ করেন। জার্মাণ সদস্যদের সংখ্যা বাড়ান যাইতে পারে বটে, কিন্তু বিদেশী সদস্যদের সংখ্যা একজনও বাড়াইবার উপায় নাই।

দুইটি মহত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কঘটিত কাজে বড় সভার অনুমোদন আবশ্যক। ব্যাঙ্কের সিকিউরিটি বাবদ লম্বা মেয়াদের সরকারী লোন গ্রহণ করিতে হইলে বড় সভার হুকুম লইতে হয়। তাছাড়া নোটের জন্য ৪০% জামিনের যে আইন আছে তাহা ভঙ্গ করিতে হইলেও বড় সভার অনুমোদন চাই।

কেবলমাত্র রাইখ্‌স বাঙ্কের জার্মাণ অংশীদারদের বড়

সভার জার্মাণ সদস্য নির্বাচনের অধিকার আছে। ইহাদের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের অধিকার নাই। প্রথমবার বিদেশী সদস্যগণ সংগঠন কমিটি কর্তৃক মনোনীত হইয়াছিল। পরবর্তী সদস্যদের বেলায় এই নিয়ম করা হইয়াছে যে, শূন্য সদস্য পদ জাতি হিসাবে পূরণ করিতে হইবে, তবে সাতজন বিদেশী সদস্যকেই ভোট দিতে হইবে। একজন বাদ সকল সদস্যের অভিমত থাকিলে তবে নির্বাচন সিদ্ধ হয়।

বড় সভা কর্তৃক বিদেশী সদস্যদের মধ্যে একজন নোট-জারি করিবার কমিশার বা কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়। এজন্য ৯ জনের মেজরিটি গঠন করা চাই এবং এর মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ৬ জন হইবে বিদেশী সদস্য। বড় সভার সদস্য শ্রেণীভুক্ত নয় এরূপ কোনো ব্যক্তি যদি নির্বাচিত হয় তাহা হইলে বড় সভার উক্ত নির্বাচিত ব্যক্তির স্বদেশী সদস্যকে পদত্যাগ করিতে হয়। নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিশার ৪ বৎসরের জন্য বড় সভার সদস্য পদবাচ্য হয়।

কমিশারকে প্রত্যেক দিন ডিরেক্টোরিয়ুমের নিকট হইতে নোট ও জামিন সম্বন্ধে মাপজোক ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হয়। নোট তৈরী করা, বাহির করা, উঠাইয়া লওয়া এবং ধ্বংস করা সম্বন্ধে তিনিই একমাত্র কর্তা, এবং আইন অনুসারে তিনিই নোট নিয়ন্ত্রণ করেন। ডিরেক্টোরিয়ুমের সভা-সমিতিতে তাঁহার যোগদানেরও অধিকার আছে।

প্রত্যেক জন রেজেষ্টারি করা অংশীদারকে লইয়া তাহাদের মহাসভা গঠিত হয়। যাহারা সভায় যোগদান করে কেবলমাত্র তাহারাই ভোট দানের অধিকারী। প্রত্যেকের অধিকারে যতগুলি শেয়ার বা অংশ থাকে তাহার কাগজে বর্ণিত মূল্যের ভ্যালুর উপর ভোটের সংখ্যা নির্ভর করে।

অংশ প্রতি ভোট। কিন্তু একজন উর্দ্ধ পক্ষে ৩০০টি ভোটের অধিকারী হইতে পারে। সাধারণতঃ মেজরিটি গঠিত হইলেই ল্যাঠা চুকিয়া যায়। তবে দুই পক্ষে সমান ভোট হইলে শেয়ারের মূল্য অনুসারে সিদ্ধান্ত করা হয়।

প্রত্যেক বৎসর মহাসভার নিকট শাসন-বিবরণী দাখিল করিতে হয়। উদ্বৃত্ত অর্থ, লাভক্ষতির হিসাব, লাভ বিবরণ, সমস্তই আইন অনুসারে নিষ্পন্ন করিতে হয়। বলা বাহুল্য বড় সভার অনুমোদন অনুসারে ডিরেক্টোরিয়ুম যে সমস্ত আইনের নির্দেশ প্রদান করে সেই সমস্ত আইন অনুসারে যে সকল পরিবর্তনের প্রয়োজন মহাসভাকে সে সম্বন্ধেও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। তবে মহাসভা এ সম্বন্ধে নিজে কিছু বাৎলাইতে পারে না। আর একটা অধিকার আছে। এই প্রতিষ্ঠান জার্মাণ সদস্যদের দ্বারা বড় সভার জার্মাণ প্রতিনিধিবর্গও নির্বাচিত করিতে পারে।

২সেণ্ট্রাল আউসশুস্ বা কেন্দ্র-কমিটি একটি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত বিশেষ কমিটি। মহাসভার জার্মাণ ও বিদেশী উভয় শ্রেণীর সদস্যগণ কর্তৃক এই কমিটি নির্বাচিত হয়। কিন্তু কার্যতঃ একমাত্র জার্মাণ অংশীদারগণই এই কমিটিতে নির্বাচিত হইয়া থাকে। এই কমিটি একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। প্রয়োজন হইলে ডিরেক্টোরিয়ুম ইচ্ছামত ইহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে। এই বিশেষজ্ঞগণ ব্যাঙ্ক, কল-কারখানা, বাণিজ্য, কৃষি, কুটির-শিল্প, কারিগরশ্রেণী প্রভৃতির পক্ষ হইতে ডিরেক্টোরিয়ুমের নির্দেশ অনুসারে নির্বাচিত হয়। ডিরেক্টোরিয়ুম এই কমিটির প্রতিনিধি-দিগকে উহার অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে পারে।

নয়া রাইখ্‌স্ বাঙ্কের শাসন-বিভাগে বিদেশীদের স্থান উঁচু বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ইহা চির-আচরিত দস্তুর নয়। এই প্রতিষ্ঠানের আজগুবী পারিপার্শ্বিক অবস্থাই ইহার জন্য দায়ী। মহাযুদ্ধ, ভার্সাই সন্ধি, ডয়েস্ প্ল্যান এবং যুদ্ধ-ক্ষতি-পূরণের কমিশন—এইগুলির জন্যই রাইখ্‌স্ বাঙ্কের উপর বিদেশী কর্তৃত্ব দেখা যাইতেছে।

"এক-তৃতীয়াংশ ঢাকনা" হইতে "সোনার ঢাকনা" (১৯২৪)

ক্নাপ্ কর্তৃক "ডী ষ্টাট্‌লিখে টেয়োরী ডেস্ গেল্ডেস্" (১৯০৫) প্রকাশিত হওয়ার পর জার্মাণিতে মুদ্রার

নমিনালিষ্টিক (নামনিষ্ঠ) থিয়োরির অতি-প্রচলন হয়। যুদ্ধের মধ্যেও উহার পর বড় বড় সিক্কা-বিশেষজ্ঞগণ থিয়োরীটি বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিতে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ডালবার্গ প্রণীত "নয়া জার্মাণ কারেন্সী", ১৯২৪; "স্বর্ণের সিংহাসনচ্যুতি" এবং "মুদ্রার অতি প্রচলন", ১৯১৯, উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবুও মুদ্রার "মেটালিষ্টিক" (ধাতুনিষ্ঠ) থিয়োরী চলিতে থাকে; তবে ইহা সত্য যে, এই মতবাদ অনেকটা ক্ষুণ্ণ ও পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। কিন্তু ১৯২৪ সনের ব্যাঙ্ক-আইনের দৌলতে এই থিয়োরী আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। সেই জন্য কারেন্সীকে সোনা হইতে মুক্ত করিয়া কেবলমাত্র নোটের উপর উহার ভিত্তিমূল স্থাপন করার খেয়াল জার্মাণি হইতে বিদায় লইয়াছে। নয়া রাইখ্‌স্ বাঙ্ক স্বর্ণমানের আদর্শকে ঠিক যেন কড়ায় ক্রান্তিতে স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিতে পারি।

প্রথমতঃ ড্রিট্টেল্‌সডেক্কুং অর্থাৎ নোটের পরিবর্তে এক তৃতীয়াংশ ঢাকনা রাখার জার্মাণ রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ গোণ্ড ডেক্কুং (স্বর্ণ-ঢাকনা) পুরাতন রাইখ্‌স্ বাঙ্কে ছিল ইচ্ছাধীন বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। তাহা ১৯২৪ সনের আইন অনুসারে রীতিমত বাধ্যতা-মূলক। আর অনুপাত যতদূর সম্ভব উচ্চ করা হইয়াছে।

নূতন আইন অনুসারে সমস্ত নোটের পরিবর্তে নিম্ন-লিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে:—

১। গোল্ড-ডেক্কুং (স্বর্ণ জামিন) ৪০%

(ক) প্রকৃত সোনা (৩০%):—

(১) সোনার তাল, (২) জার্মাণ স্বর্ণমুদ্রা, (৩) বিদেশী স্বর্ণমুদ্রা।

এই সমস্ত সোনা হয় রাইখ্‌স্ বাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে, না হয় কোন বিদেশী সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের চলতি হিসাবে জমা রাখিতে হইবে। খাঁটি সোনার এইরূপ সংজ্ঞা স্থির করা হইয়াছে যে, ১ পাউণ্ড ওজনের খাঁটি সোনায় ১৩৯২টি রাইখ্‌স্ মার্ক তৈরী হইতে পারে।

(খ) ডেভিজেন (১০%):—

(১) ব্যাঙ্ক নোট, (২) ঊর্দ্ধ পক্ষে ১৪ দিনের মধ্যে শোধনীয় কাগজ (৩) চেক, (৪) কোনো ভাল ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিদেশী মুদ্রাকেন্দ্রে বিদেশী মুদ্রায় শোধিতব্য দৈনিক বিলসমূহ। এই সমস্ত কাগজী মুদ্রার মূল্য নির্ধারণের সময় সোনার দরে কষিয়া লইতে হয়।

২। ব্যবসার সিকিউরিটি অর্থাৎ বাণিজ্যিক কাগজ ৬০%।

(১) ঊর্দ্ধ পক্ষে তিন মাসের মধ্যে শোধনীয় বিল। এই সমস্ত বিলে তিনটি সাহুকার কারবারীর স্বাক্ষর থাকা চাই। ভাল কারবারের প্রমাণ থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে এইগুলি ডিস্কাউণ্ট করিয়া ঢাকনারূপে জমা রাখা যাইতে পারে।

(২) যে সমস্ত চেকে তিনটি সঙ্গতিসম্পন্ন কারবারীর স্বাক্ষর আছে সেগুলিও ডিস্কাউণ্ট করিয়া ঢাকনারূপে রাখা যাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই বিল বা চেকের যদি বিশেষত্বপূর্ণ জামিন ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে তৃতীয় পক্ষের স্বাক্ষরের কোনো প্রয়োজন নাই।

গোল্ড ডেক্কুং নয়া আইনের প্রধান বিশেষত্ব। কিন্তু সোনার ঢাকনা জিনিষটা পুরামাত্রায় স্বদেশী বস্তু নয়। গোল্ড-রিজার্ভের 'ধাতব' ও ডেভিজেন উভয় দফাতেই বিদেশী চিজ রীতিমত স্থান দখল করিয়াছে; তবে এই স্থান দেওয়া ইচ্ছাধীন বটে। আইনে আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, রিজার্ভ বিদেশে রক্ষিত হইবে।

অধিকন্তু নোটের কর্মকর্তারূপে বিদেশীকে নিয়োগ করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে। আর বড় সভায় বিদেশী সদস্যদের অবস্থিতি—এই ক্ষেত্রেও বিদেশীদের আধিপত্য চোখে পড়ে।

পুরাতন রাইখ্‌স্ বাঙ্ক ঊর্দ্ধ পক্ষে ৫৫০,০০০,০০০ মার্ক জামিনহীন নোট প্রচলনের অধিকারী ছিল; তবে জরিমানা দিয়া এইরূপ নোটের পরিমাণ বাড়ানো চলিত।

কিন্তু ১৯২৪ সনের আইন রাইখ্‌স্ বাঙ্ককে এই অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে। "জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ"—এই নীতির এখন জয়জয়কার চলিতেছে।

জামিন বিশেষতঃ সোনার জামিন সম্বন্ধে রাইখ্‌স্ বাঙ্ককে কিছু সুবিধা দান করা হইয়াছে। কিন্তু এই

সুবিধা ভোগ করার পূর্বে ব্যাঙ্ককে বড় সভার অনুমোদন লাভ করিতে হয়। যদি কোনো জরুরি অবস্থার উদ্ভব হয়, এবং ডিরেক্টোরিয়ুমের নিকট হইতে নির্দেশ আসে তবেই, মাত্র একজন বাদ সমস্ত সদস্যের অনুমোদন ক্রমে এই সুবিধা ভোগ করা চলিতে পারে।

৪০% সোনার জামিন বিষয়ক নিয়ম তখন দুইটি সর্তে শিথিল করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আইনসম্মত মাপকাঠি অনুসারে রাইখ্স বাঙ্ককে গবর্ণমেণ্টের নিকট ট্যাক্স দিতে হইবে। যদি এক সপ্তাহের বেশী জামিন হ্রাস করিতে হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিতরূপ ট্যাক্সের হার বলবৎ হইবে:—

	প্রতি সন
সোনার জামিন শতকরা ৩৭ হইতে ৪০	৩%
,, ,, ,, ৩৫ ,, ৩৭	৫%
,, ,, ,, ৩৩⅓ ,, ৩৫	৮%

সোনার ঢাকনা ৩৩⅓%এর কম হইলে প্রত্যেক সন ৯% হিসাবে ট্যাক্স এবং ৩৩⅓%-এর নীচে শতকরা প্রত্যেকটি কমতির জন্য ১% হিসাবে অতিরিক্ত কর যোগাইতে হইবে।

সোনার ঢাকনা হ্রাস করিবার দ্বিতীয় সর্ত নিম্নলিখিত উপায়ে সিদ্ধ হইতে পারে। প্রথমতঃ হ্রাস করিবার সময়ের মধ্যে ডিস্কাউণ্টের হার ৫%-এর কম হইলে চলিবেনা; দ্বিতীয়তঃ যখনই ট্যাক্স যোগাইতে হইবে তখনই ট্যাক্সের এক-তৃতীয়াংশ অনুপাতে ডিস্কাউণ্টের হারও বাড়াইতে হইবে।

৩। সোণ্ডার-ডেক্কুং বা বিশেষ স্বতন্ত্র ঢাকনা (৪০% দৈনিক দেনার বা দায়িত্বের)।

নোটের পূর্বোক্ত ঢাকনা ছাড়া ১৯২৪ সনের আইনে রাইখ্স বাঙ্ককে উহার দৈনিক দেনাপত্রের জন্য অন্ততঃ পক্ষে ৪০% ঢাকনা রাখিবার ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে। এই ঢাকনা নিম্নলিখিতরূপ হইবে:—

১। জার্মাণিতে রাইখ্স বাঙ্কের দৈনন্দিন ডিপজিট বা আমানত।

২। বিদেশে

৩। রাইখ্স বাঙ্কের পক্ষে অন্যান্য ব্যাঙ্কের উপর চেক (জার্মাণ ও বিদেশী)।

৪। ঊর্দ্ধপক্ষে ৬০ দিনের মেয়াদ বিশিষ্ট বিনিময় হুণ্ডি বিল।

৫। রাইখস্ বাঙ্কের যে-যে কর্জ প্রতিদিন আদায় হইতে পারে।

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাইখ্স বাঙ্ক দেশ-বিদেশে অপরের নিকট অল্পদিনের মেয়াদে যে সমস্ত কর্জ দাদন করিয়াছে এই সমস্ত ঢাকনা তাহারই অন্তর্ভুক্ত।

আইনে আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, দৈনিক কারবারের জন্য এই ৪০% ঢাকনা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য টাকাকড়ি হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। ক্ষতিপূরণ বাবদ রাইখ্স বাঙ্ককে সকল সময়ে দুই শত কোটি মার্ক জমা রাখিতে হয়।

রাইখ্স বাঙ্কের দৈনিক আমানত এবং অন্যান্য দেনা-পত্র দৈনিক ও অল্পমেয়াদের দাবীর আকারের স্থায়ী ৪০% রিজার্ভ হইতে মিটান হইয়া থাকে। এই রিজার্ভ যে কেবল মাত্র রাইখ্স বাঙ্কের সাধারণ ব্যাঙ্কিং কারবারের কাজ করে তাহা নহে; ইহা পরোক্ষে নোটের ঢাকনিরও শক্তি বৃদ্ধি করে। এই আইন দ্বারা "নোট-বিভাগের" ঢাকনা, সিকিউরিটি বা সংরক্ষণ হইতে "ব্যাঙ্ক-বিভাগের" ঢাকনা, সিকিউরিটি বা সংরক্ষণকে পৃথক করা হইয়াছে। সুতরাং রাইখ্স বাঙ্কের উত্তমর্ণ হিসাবে নোটের অধি-কারীদের সহিত আমানতকারী ও অন্যান্য উত্তমর্ণদের প্রতিযোগিতার পথও বন্ধ করা হইয়াছে।

সাধারণ ব্যাঙ্কিং কারবারের দেনাপত্রের জন্য এইরূপ বিশেষ ব্যবস্থা যদি না থাকিত তাহা হইলে আমানতকারী ও অন্যান্য কর্জদাতাদের অধমর্ণ হিসাবে রাইখ্স বাঙ্ককে বহু সময় নোটের রিজার্ভে বা ঢাকনায় হাত দিতে হইত। আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত এই সোণ্ডার ডেক্কুং বা স্বতন্ত্র "ব্যাঙ্কিং, রিজার্ভ"-ঢাকনা নোট "কাগজী মুদ্রার রিজার্ভের" নূতন এবং নিখুঁত জামিনের ব্যবস্থা করিয়াছে। ১৯২৪ সনের আইন অনুসারে গঠিত নোট

চিন্তাক্ষেত্রে একেবারে নতুন চিজ নয়। ১৮৯৯ সনে হেল্‌ফেরিখ্ তাঁহার "জার্মাণ ব্যাঙ্ক আইনের নূতনত্ব সাধন" নামক গ্রন্থে এই মত বহু পূর্বে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বিলাতের নোট আইন (১৮৪৪-১৯২৮)

আরও একটি বিষয় জানিয়া রাখিতে হইবে যে, নয়াজার্মাণ নোট-ব্যবস্থায় বিলাতী নোট-ব্যবস্থার মূলসূত্র-গুলা গ্রহণ করিয়া হইয়াছে। ১৮৪৪-৪৫ সনের ব্রিটিশ (পীল) আইন দ্বারা ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডের নোট-প্রচার নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। এই আইনের ফলে ব্যাঙ্কের নোট-বিভাগ ব্যাঙ্কিং বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সুতরাং ব্যাঙ্কের অন্যান্য বিভাগের ঢাকনা হইতে নোট-বিভাগের ঢাকনা পৃথক।

নোটের জামিন বা ঢাকনা সম্বন্ধে উক্ত আইনে নিম্নলিখিত সর্তগুলা দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

১। সিকিউরিটি (১) সরকারী (২) অন্যান্য	১৪,০০০,০০০ পাঃ (বিশ্বাসনিষ্ঠ নোট-প্রচার)
২। সোনা (১) সোনার তাল (২) মুদ্রা	ঢাকনার বাকী অংশ; পরিমাণ যতই হউক না কেন

১৮৮৩ সন পর্যন্ত সোনার ২৫% রূপায় রাখা চলিত। কিন্তু তাহারপর রূপা রাখিবার প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং বুলিয়ান বা তাল কেবলমাত্র খাঁটি সোনা লইয়াই গঠিত হইয়াছে।

১৮৮৯ সনে সিকিউরিটির পরিমাণ ১৪,০০০,০০০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৬,৪৫০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত বর্ধিত হইয়াছে।

১৯১৪ সনের কারেন্সী ও ব্যাঙ্ক আইন দ্বারা নোট-ব্যাঙ্ককে আইনসম্মত সীমা ছাড়াইয়া যথেচ্ছ ব্যাঙ্ক-নোট প্রচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়। আইনটা সামরিক ব্যবস্থা-রূপে গৃহীত হয়। ১৯১৯ সনে একটা সর্বোচ্চ সীমার নির্দেশ ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। এই সঙ্গে স্থির করা হয় যে, কোন সনের বাস্তব সর্বোচ্চ "বিশ্বাস-নিষ্ঠ" (অর্থাৎ স্বর্ণবিহীন) ঢাকনায় প্রচারিত কারেন্সি পরবর্তী সনের ধার্য ও নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমারূপে গৃহীত হইবে। ১৯২১ সনে এই সর্বোচ্চ সীমা দাঁড়ায় ৩২০,৬০০,৫০০ পাউণ্ড।

১৯২৮ সনের জুলাই মাসে "বিশ্বাস-নিষ্ঠ" নোটের সর্বোচ্চ স্থায়ী সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয় ২৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই নয়া নিয়মে ঢাকনার অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নরূপঃ—

১। "বিশ্বাস-নিষ্ঠ"-নোট (১) গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি (২) অন্যান্য সিকিউরিটি (৩) ৫,৫০০,০০০ পাঃ মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা	২৬০,০০০,০০০ পাঃ
২। স্বর্ণ ঢাকনাযুক্ত নোট (১) মুদ্রা (২) বুলিয়ন বা তাল	প্রচারিত নোটের বাকী অংশ

এই নয়া ব্যবস্থায় ১৮৪৪ সনের নীতিই অটুট রাখা হইয়াছে।

অর্থাৎ সিকিউরিটির বিনিময়ে যতটা সর্বোচ্চ পরিমাণের নোট জারি করা যাইতে পারে তাহাছাড়া বাকী সমস্ত নোটের জন্য স্বর্ণ জামিনের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং বিলাতী নোট-ব্যবস্থাতেও জার্মাণ নীতির অর্থাৎ "জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ" নীতির জয়-জয়কার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেকখানি নোট মুদ্রার সার্টিফিকেট মাত্র এবং অক্লেশে উহাকে স্বর্ণমুদ্রার সামিল ধরা যাইতে পারে।

কিন্তু পূর্বে জামিনের হালচাল সম্বন্ধে জার্মাণ ও বিলাতী কায়দার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক ছিল। এ তথ্যটা তলাইয়া দেখা দরকার। বিশেষতঃ ১৮৪৪ সনের বিলাতী আইনের অনুসরণ করিয়াও ১৮৭৫ সনের জার্মাণ আইন মুদ্রা-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করিবার জন্য কি পরিমাণ চেষ্টা করিয়াছে তাহাও জানিয়া রাখা ভাল।

ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডকে সোনার বাহিরে নোট প্রচার করিতে দেওয়া হয় না। এই প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ

সোনা আছে ঠিক সেই পরিমাণে নোট প্রচলন করিতে দেওয়া হয়। সিকিউরিটিগুলা যতই ভাল হউক না কেন একটি সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বিলাতী নোট-ব্যবস্থা কেবল মাত্র "জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ" নয়; "স্বর্ণ জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ" এই নীতির উপরই উহার ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত। সোজা কথায় বিলাতী নোটের রিজার্ভ প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র স্বর্ণ-দ্বারাই গঠিত।

পুরাতন রাইখ্স বাঙ্ক (১৮৭৫ সনের আইন) কিন্তু বহুল পরিমাণে স্বর্ণের সংস্রব হইতে মুক্ত ছিল। এখানে সিকিউরিটিরই ছিল জয়-জয়কার। রাইখ্স বাঙ্কের নোটের বহর যত বেশী হউক না কেন, দুই তৃতীয়াংশ নোটের পরিবর্তে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করিলেই চলিত। বিলাতী ব্যবস্থাতে কিন্তু সিকিউরিটি গৌণ স্থানই দখল করিয়া আসিতেছে। ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যণ্ডের নোটের বহর যতই বেশী হইবে, ব্যাঙ্কের সিন্দুকে ততই বেশী সোনা মজুদ রাখিতে হইবে, এবং নোট বা সোণার তুলনায় সিকিউরিটির (ঊর্দ্ধপক্ষে ২৬০,০০০,০০০ পাঃ) অনুপাত ততই কম হইতে থাকিবে।

রাইখ্স বাঙ্কের ব্যবস্থায় সোনার ঢাকনার স্থান ঢুঁড়িতে হইবে "নগদ সিক্কায়"; ড্রিট্টেলসডেক্কুং নীতি অনুসারে এই "নগদ সিক্কা" বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। কিন্তু এখানেও বিকল্পের ব্যবস্থা আছে। তথাকথিত "নগদ সিক্কা" সোনা বা "জার্মাণ মুদ্রা" দুই-ই হইতে পারে। যদি সমস্তই সোনা ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে দেখা যায়, কারেন্সীর এক-তৃতীয়াংশ নোটের জন্য সোনা মজুদ রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু "নগদ সিক্কার" জামিনের খাতে যদি কেবলমাত্র "জার্মাণ মুদ্রা" রাখার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে কি পরিমাণ সোনা থাকিবে তাহার কোনো ধরাবাঁধা নিয়মের উদ্দেশ পাওয়া যাইবে না। আইনটা এমন শিথিল যে, ইম্পিরিয়াল ট্রেজারী বিলকে পর্যন্ত জার্মাণ মুদ্রার সামিল করা হইয়াছে। অথচ এই ইম্পিরিয়াল ট্রেজারি বিল

"নগদ সিক্কার" তালিকায় এই চিজটা অতি অল্প পরিমাণে রাখা হয়। ১৮৭৫ সনের আইনে "নগদ সিক্কার" যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও আমরা এই গলদ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

রাইখ্স বাঙ্ক ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যণ্ড হইতে নীতি গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রয়োগের বেলায় অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে। জার্মাণ কারেন্সী-ব্যবস্থায় কেবলমাত্র সোনাকেই নোটের প্রধান রিজার্ভ বা জামিনরূপে গ্রাহ্য করা হয় নাই।

১৮৭৫ সনের জার্মাণ আইন আরও এক বিষয়ে বিলাতী দস্তুরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ ইহার জামিন বা রিজার্ভ ছাড়াও কিছু নোট প্রচলনের (৫০০,০০০,০০০ মার্ক) ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অধিকার ব্যাপকতর করারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯২৮ সনের জুলাই মাসের কারেন্সী ও ব্যাঙ্ক নোট আইন ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যণ্ডকে "আনুপাতিক" স্বর্ণ-জামিন রাখিবার জন্য বাধ্য করে নাই। এই আইনে "স্বর্ণ হীন নোট অসিদ্ধ" নীতিটা বিশেষ কঠোরতার সহিত মানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে বলিয়াও মনে হয় না।

১৯২৮ সনের ২৮শে নভেম্বর তারিখে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যণ্ডের নোট-বিভাগ নোট ও ঢাকনার নিম্নলিখিতরূপ সাপ্তাহিক বিবরণী প্রকাশ করে:—

নোট (দেনা):—

১। বাজারে	৩৬৭,০০১,১৪৮ পাঃ
২। ব্যাঙ্কে	৫২,০৮৭,১৯৭ পাঃ
মোট	৪১৯,০৮৮,৩৪৫ পাঃ

জামিন বা ঢাকনা (সম্পত্তি)

১। বিশ্বাস-নিষ্ঠ বা বিশ্বস্ত (সোনা নয়)	২৬০,০০০,০০০ পাঃ
(১) সরকারী ঋণ	১১,০১৫,১০০ পাঃ
(২) অন্যান্য সরকারী সিকিউরিটি	২৩৩,৫৬৮,৫৫০ পাঃ
(৩) অন্যান্য সিকিউরিটি	১০,১৭৬,১৯৩ পাঃ

২। সোনা

(১) মুদ্রা
(২) বুলিয়ন বা তাল } ১৫৯,০৮৮,৯৪৫ পাঃ

অর্থাৎ প্রচারিত ৪১৯,০৮৮,৯৪৫ পাঃ মূল্যের নোটের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে মাত্র ১৫৯,০৮৮,৯৪৫ পাউণ্ড মূল্যের "সোনার ঢাকনা" ছিল। সুতরাং মোট নোটের স্বর্ণ-জামিনের পরিমাণ প্রায় ৩৮%, এখন বিশ্বাস-নিষ্ঠ, বিশ্বস্ত বা শ্রদ্ধাসূচক নোটের পরিচালন যদি বাড়াইতে হয়, আর আইনেও যখন এরূপ বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে—তখন সোনার ঢাকনার অনুপাত নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাগজে কলমে যেরূপ নীতিরই ব্যবস্থা থাকুক না কেন, এবং বিলাতী আইন যতই সংরক্ষণমূলক এবং প্রাচীনতার পক্ষপাতী হউক না কেন, অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর চাপে এবং বিভিন্ন মতবাদের খাতিরে রাইখ্‌স বাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড একই ধরণের কার্যক্রম মানিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছে।

১৯২৪ সনের আইন অনুসারে জার্মাণিতে গোল্ড ডেকুং (সোনার ঢাকনা) প্রবর্তিত হইয়াছে এবং উহা বাধ্যতা-মূলক সোনার রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থাও কায়েম করিয়াছে। সোনার জামিন যুক্ত নোটের পরিমাণও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। তবুও নূতন ও পূর্বতন উভয় রাইখ্‌স বাঙ্কের সহিতই বিলাতী নোট ব্যাঙ্কের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ব্যাঙ্কের কাঠামো বা গঠন হিসাবে জার্মাণ প্রতিষ্ঠানে সোনার মজুৎ তহবিল মাত্র গৌণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিলাতের ১৯২৮ সনের আইন ১৮৪৪ সনের আইনের সমান সাবধানী বা সতর্কতাযুক্ত। অন্য পক্ষে ১৮৭৫ সনের জার্মাণ আইনে যে শৈথিল্য প্রকাশ করা হইয়াছে, নয়া রাইখ্‌স বাঙ্ক পত্তনের আইনেও তাহারই প্রাবল্য দেখা যায়।

নোট-ব্যাঙ্কিংয়ের ফরাসী দস্তুর (১৮০০-১৮৪৮)

জার্মাণির ১৯২৪ এবং ১৮৭৫ সনের নোট বিষয়ক

উদারনীতিক মালুম হয়; তাহা হইলে শত বৎসরের পুরাতন ফরাসী আইন জার্মাণ আইনকেও নেহাইৎ রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী ঠাওরাইবে। কারণ বাঁক দ্য ফ্রাঁস নোট জারি সম্বন্ধে কোন ঢাকনা বা জামিন বিষয়ক আইনের ধার ধারে নাই। "স্বর্ণ অভাবে নোট অসিদ্ধ" নীতি চুলোয় যাউক, এমন কি আটপৌরি "জামিন বা ঢাকনা অভাবে নোট অসিদ্ধ" নীতিও ১৮০০ হইতে ১৯২৭ সন পর্যন্ত ফরাসী কারেন্সী-আইনে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল।

নিম্নে লক্ষ হিসাবে যে কয়েকটি অঙ্ক দেওয়া গেল তাহা হইতেই বাঁক দ্য ফ্রাঁসের প্রাথমিক জীবনের কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে :—

	নগদ	বিল	নোট
১৮১২ (প্রারম্ভ)	১,১৪০	১৫০	১,১৭০
১৮১৪ (১৮ই জুন)	১৪০	৩১০	৩৮০

১৮৪৬-৪৮ সন পর্যন্ত সঙ্কটকালে প্রকৃত অবস্থা নিম্নরূপ ছিল :—

	নগদ	বিল	নোট
১৮৪৬ (ডিসেম্বরের শেষ)	৭১০	১,৮৮০	২,৫৮০
১৮৪৭ (,,)	১,০৭০	১,৫৭০	২,৩৩০

আইনের ব্যবস্থা না থাকিলেও, এই ব্যাঙ্কের নোট ও নগদের অনুপাত আধুনিক মাপকাঠি অনুসারেও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

পূর্বোক্ত সময়ের মধ্যে ফরাসী এলাকার বিভিন্ন স্থানে আটটি পৃথক নোট-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং বাঁক দ্য ফ্রাঁসের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। নিম্নে ব্যাঙ্ক কয়টির অবস্থান এবং স্থাপিত হওয়ার সময় উল্লেখ করা হইল :—

১। ১৮১৭ রুআঁ
২। ১৮১৮ নাঁৎ
৩। ১৮১৮ বোর্দো
৪। ১৮৩৫ লিওঁ
৫। ১৮৩৫ মার্সেই
৬। ১৮৩৬ লিল্
৭। ১৮৩৭ হাভর
৮। ১৮২৮ তুলুজ্

প্রতিষ্ঠানগুলি আপন আপন জনপদে স্বাধীনভাবে

নিম্নের তালিকায় এই ৮টি ব্যাঙ্কের কারবারের পরিচয় দেওয়া হইল (লক্ষ) ঃ—

সন	নগদ	বিল	নোট
১৮৪১	৩০০	৫১০	৬৩৮
১৮৪৬	৪৪০	৭৭০	৮৬০
১৮৪৭	৪২০	৮৫০	৯০০

এই সমস্ত বিভাগীয় বা জিলা নোট-ব্যাঙ্ক বাঁক দ্য ফ্রাঁসের প্রতিযোগিতার মুখেও আপন আপন নোট-প্রচারের অনুপাত রক্ষা করিয়া চলিত।

১৮৪৮ সন ফরাসী নোট-ব্যাঙ্কের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই সনের ১৫ই মার্চ তারিখে ফরাসী-মুল্লুকে সর্বপ্রথম নোট প্রচারের সর্বোচ্চ সীমা (৩৫ কোটি) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। হপ্তায় হপ্তায় উদ্বর্ত পত্র প্রকাশ করারও রেওয়াজ স্থাপিত হয়। উপরন্তু ২৭শে এপ্রিল ও ২রা মে তারিখের ঘোষণা অনুসারে ৭টি বিভাগীয় ব্যাঙ্কই বাঁক দ্য ফ্রাঁসের সামিল অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই দুই ঘোষণা-বাণী অনুসারে পুঁজি ৯৩,২৫০,০০০ ফ্রাঁতে বর্ধিত করিয়া নোট জারির সর্বোচ্চ সীমা ৪৫২০ লক্ষ ফ্রাঁ নির্দিষ্ট করা হয়।

ফ্রান্সে নোট প্রচারের সর্বোচ্চ সীমা (১৮৪৮-১৯২৮)

বাঁক দ্য ফ্রাঁস কর্তৃক নোট প্রচলনের সীমা নির্দেশ নোট-ব্যাঙ্কিংয়ের এক নূতন রেওয়াজরূপে সমঝিতে হইবে।

১৮০৬ সনের ২২শে এপ্রিল তারিখের আইন এবং ১৮০৮ সনের ১৭ই জানুয়ারি তারিখের ঘোষণাবাণী দ্বারা বাঁক দ্য ফ্রাঁস স্থাপিত বা পুনর্গঠিত হয় বলা যাইতে পারে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া এই ব্যাঙ্ক কোনো সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশের ধার ধারে নাই। পূর্বেও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ১৮৪৮ সনের ১৫ই মার্চ তারিখের ঘোষণা-বাণী দ্বারা সর্বোচ্চ সীমা ২৫০,০০০,০০০ ফ্রাঁ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের সময় সর্বোচ্চ সীমা বাড়াইয়া ২৮০ কোটি করা হয় (১৮৭১ সনের ডিসেম্বর)। নির্ধারণ করা হয়। ১৮৯৭ সনে উহা বাড়াইয়া ৫০০ কোটি, ১৯১১ সনে ৬৮০ কোটি এবং ১৯২৫ সনে ৫,৮৫০ কোটি করা হয়।

নোট প্রচলন এবং স্বর্ণজামিনের সম্বন্ধ রক্ষা সম্পর্কে কোনরূপ আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকিলেও বাঁক দ্য ফ্রাঁসের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এই কর্ম-প্রতিষ্ঠানের গবর্ণরগণ জাতির বাজার-সম্ভ্রম এবং মজুদ ভাণ্ডার রক্ষা করিবার বাস্তব উপায় সম্বন্ধে জার্মাণি এবং বিলাত উভয়কেই হার মানাইয়াছে।

সপ্ত দশকের সঙ্কট সময়ে নগদ ও নোটের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ অনুপাতের ব্যবস্থা ছিল ঃ—

২৭শে জানুয়ারী	নগদ	নোট
১৮৭০	১,২০২,০০০,০০০	১,৪৭১,০০০,০০০
১৮৭১	৩৯৮,০০০,০০০	২,৩৫৯,০০০,০০০
১৮৭২	৬৩০,০০০,০০০	২,৬৭৮,০০০,০০০
১৮৭৩	৭০৫,০০০,০০০	৩,০৭১,০০০,০০০
১৮৭৪	১৩৩০,০০০,০০০	*
১৮৭৫	*	২,৬০০,০০০,০০০

পরবর্তী সনগুলিতে অনুপাত (লক্ষের হিসাব) নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছিল (দৈনিক গড়) ঃ—

	নগদ	নোট
১৮৮০	১৯,৭৪০	২৩,০৫০
১৮৯০	২৫,১৩০	৩০,৬০০
১৮৯৭	৩১,৮৪০	৩৬,৮৭০
১৯০০	৩২,৮৭০	৪০,৩৪০
১৯০৫	৩৯,৫৬০	৪৪,০৮০
১৯০৯	৪৫,২৪০	৫০,৮০০
১৯১৩	৩৯,২৭০	৫৬,৬৫০

উপরের অঙ্কগুলা হইতে দেখা যাইতেছে ১৮৭১-৭৩ সন দুইটা ছাড়া প্রায় সব সময়েই নগদ ও নোট প্রায় সমান সমান রহিয়াছে। খাঁটী সত্য কথা বলিতে গেলে, অধিকাংশ সময়েই প্রচলিত নোটের জন্য প্রায় ৯০%

এইজন্য ১৮৪৪-৪৫ সনের বিলাতী আইন বা ১৮৭৫ সনের জার্মাণ আইনের মত কোনো আইনের বিধিনিষেধ ছিল না।

এই সমস্ত বৎসরের মধ্যে নোটের ঢাকনা বা জামিনের জন্য কেবলমাত্র যে নগদ সিক্কারই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহা নহে। মোট নোটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হিস্যার জন্য বাণিজ্যিক কাগজ ঢাকনারূপে কাজ করিয়াছে। নোট ও কাগজের দৈনিক গড় নিম্নলিখিতরূপ (লক্ষের হিসাব) :—

	কাগজ	নোট
১৮৯৯	১০,৮৮০	৩৬,৮৭০
১৯০০	১৬,৬৭০	৪০,৩৪০
১৯০৫	১১,২৪০	৪৪,০৮০
১৯১১	১৮,৪২০	৫২,৪৩০
১৯১৩	২৩,৭৪০	৫৬,৬৫০

এখন যদি আমরা নগদ (৯০%) এবং অন্যান্য সিকিউরিটি (প্রায় ৩৩%) এক সঙ্গে যোগ করি, তাহা হইলে আমরা প্রচলিত নোটের জন্য প্রায় ১২৩% অর্থাৎ মোট নোটের চেয়ে অনেক বেশী ঢাকনা জামিনের ব্যবস্থা দেখিতে পাই।

নোট-প্রচার সম্পর্কে বাঁক দ্য ফ্রাঁসকে নেহাইৎ নরমপন্থী বলিতে হয়। নিতান্ত গরজের সময় ছাড়া (১৮৭১-৭৩) এই ফরাসী প্রতিষ্ঠান সির্কুলাসিঅঁ-ব্যাঙ্ক অর্থাৎ নোট-ব্যাঙ্কের কাজ করিয়াছে কি না তাহা রীতিমত সন্দেহজনক। মোটামুটিভাবে যেন ব্যাঙ্কটি সাধারণ ডিপজিট ব্যাঙ্কেরই কাজ চালাইয়াছে। মহাযুদ্ধ (সন ১৯১৪-১৮) এবং যুদ্ধোত্তর যুগের ঘটনাবলীকে অবশ্য অসাধারণ সমজিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি বিষয় জানিয়া রাখা ভাল। ফরাসী কর্তৃপক্ষ মুদ্রা এবং রাজস্বের বেলায় নোট-ব্যাঙ্কের "জ্ঞানকাণ্ড" একরূপ এড়াইয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা কারেন্সী-প্রিন্সিপ্‌ল্ বা সিক্কা-নীতি (এই নীতির উপরই পীল ১৮৪৪-৪৬ সনে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যণ্ডের নোট-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন) বনাম ব্যাঙ্কিং প্রিন্‌সিপ্‌ল্ বা ব্যাঙ্ক-নীতি (অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত) নামক সমস্যাটা পুঁথিগত সমস্যারূপেই সমঝিতে অভ্যস্ত।

ফরাসী কর্তারা পীলের মত ব্যাঙ্ক-নোটকে মুদ্রারূপে গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। অ্যাডাম স্মিথ এবং রিকার্ডোর মত ফরাসী অর্থনীতিজ্ঞগণ নোটকে "মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত"-রূপেই বিবেচনা করেন। তাঁহাদের মতে নোটব্যাঙ্কগুলা এমন হওয়া আবশ্যক, যাহাতে উহাদের প্রচারিত নোটগুলা নোটওয়ালাদের দাবী উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রায় রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হয়। আর এই ব্যবস্থা করার জন্য সাধারণ ব্যাঙ্ক-কারবারের যে দস্তুর আছে সেইরূপ মজুদ-ভাণ্ডার (রিজার্ভ), নগদ টাকা, সিকিউরিটি ইত্যাদি জমা রাখিয়া নোট-ব্যাঙ্কগুলা সাবধানভাবে চলিলেই হইল। চেক ভাঙ্গান, এক্সচেঞ্জ বিল এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কাগজপত্রের পরিবর্তে নগদ টাকা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কগুলা যেরূপ নীতি অবলম্বন করে নোটের বেলাতেও সেইরূপ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ ফরাসী অর্থশাস্ত্রীরা নোট সম্বন্ধে "ব্যাঙ্কিং-নীতির"ই পক্ষপাতী।

মতবাদ ও আইন-কানুন দুই বিষয়েই বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস "ব্যাঙ্কিং-নীতি" মানিয়া চলিয়াছে ; পক্ষান্তরে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যণ্ড এবং রাইখ্‌স বাঙ্ক সিক্কা-নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, "জ্ঞানকাণ্ড" সম্বন্ধে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও ব্যাঙ্ক তিনটা কার্য-ক্ষেত্রে ঢাকনা ও নোটের সম্বন্ধ নির্ণয়ে মূলতঃ একই নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ঢাকনা, সোনা, সিকিউরিটি ইত্যাদির গড়ন যাহাই হউক না কেন, ইহারা সকলেই ক্রমে ক্রমে "ঢাকনা বা জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ" এই সার নীতিটা মানিয়া চলিয়াছে। ঝুঁকি বা দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করিবার জন্য মামুলি ব্যাঙ্ক পরিচালনের যে দস্তুর আছে মূলতঃ তাহা হইতেই এই ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং বাস্তবতার রাজ্যে ব্যাঙ্কিং ও সিক্কা-নীতি দুইটা একই রঙ্গমঞ্চে কোলাকুলি করিতেছে।

১৯১৪ সনের পর যে অসাধারণ ঘটনাবলী উপস্থিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আবশ্যক।

যুদ্ধের সময় দৈনিক গড়গুলি কিরূপ ছিল তাহা নীচের তিন দফা অঙ্ক হইতে বেশ বুঝা যাইবে (লক্ষ ফ্রাঁ) :—

সন	নগদ	বিল	নোট
১৯১৪	৪৪,০৫০	২৩,১৪০	৭৩,২৫০
১৯১৫	৪৭,০৯০	৯২৮০+২৩,৯৯০	১২২,৮০০
		(ঋণ-মকুপের আমলে)	
১৯১৮	৫৬,৯০০	২০,৯৮০+১০,৮২০	২৭৫,৩৬০
		(ঋণ-মকুপের আমলে)	

যুদ্ধোত্তর যুগে, ১৯২৮ সনের জুন মাসের আইন অনুসারে পুনর্গঠন না হওয়া পর্যন্ত বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের নোট ও রিজার্ভের হালচাল নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

বিভিন্ন দফা	১৯২০ (৩১শে ডিসেম্বর)	১৯২৭ (৩১শে ডিসেম্বর)
১। নগদ	৫,৭৬৬,২৭০,১৩০	৫,৮৮৭,৭৭২,৮৩৪
(১) ফ্রান্সের সোনা	৩,৫৫১,৭৮৭,৬৯৪	৩,৬৮০,৫০০,৮২১
(২) বিদেশস্থ সোনা	১,৯৪৮,৩৬৭,০৫৬	১,৮৬৪,৩২০,৯০৭
(৩) রূপা	২৬৬,১১৫,৩৭৯	৩৪২,৯৫১,১০৫
২। ডিস্কাউণ্ট-করা কাগজ বৎসরের মধ্যে	৩২,০২৩,৬১০,৬০০	৪৫,২৯১,২৬২,৬০০
৩। প্রচলিত নোট বৎসরের মধ্যে	৭,৮৪৪৭,১২৫,০০০	১৫,১৫৫,০০০,০০০
৪। মোট চলতি নোট	৩৭,৬৫২,২৪০,২৯৯	৫৬,৩০০,৬১০,২৫০

১৯২৫ সনের ৪ঠা ডিসেম্বরের আইন দ্বারা নোট প্রচলনের সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয় ৫৮,৫০০,০০০,০০০ ফ্রাঁ; পূর্বেও একথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর যুগে মোট প্রচলিত নোট ও নগদ ঢাকনা বা জামিনের অনুপাত অবশ্য লড়াইয়ের পূর্বেকার অনুপাত অপেক্ষা কম হইয়াছে। কিন্তু "ভাল" বাণিজ্যিক কাগজের ঢাকনার রেওয়াজ উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়াছে। ১৯২০ সনে বিলসমূহের গড় মেয়াদ ছিল প্রায় ২৫ দিন, কিন্তু ১৯২৭ সনে উহা মাত্র ১৮ দিনে পরিণত হইয়াছে।

"নয়া" বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস

(১৯২৮ সনের জুন মাস হইতে)

যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে মুদ্রাঘটিত পুনর্গঠন অর্থাৎ "স্থিতিকরণ" ১৯২৬ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখের আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর আরম্ভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই আইনের বলে বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস বিনিময়ের বাজারে সোনার তাল এবং সোনার জামিনযুক্ত সিকিউরিটি, বিল, বিদেশী কাগজী মুদ্রা ক্রয় করিবার অধিকারী হয়। বিনিময়ের বাজারে ফরাসী ব্যাঙ্কের এই প্রভাবের ফলে ১৯২৭ সনে নূতন অবস্থার উদ্ভব হয়। পূর্বে বিদেশে যেমন ফরাসী পুঁজি রপ্তানি করা হইয়াছিল এইবার তাহার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। বাণিজ্যিক কাগজ এবং সোনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক ঠিক সেই পরিমাণে নোট-প্রচার বাড়াইবারও অধিকারী হয়। নোটের বহর ১৯২৫ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের আইন মাফিক ৫,৮৫০ কোটির সর্বোচ্চ সীমায় আসিয়া ঠেকে। ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডে যে ফরাসী সোনা গচ্ছিত ছিল তাহাও ফিরিয়া পাওয়া সম্ভবপর হয়। ১৯২৭ সনে ফ্রান্সের আর্থিক এবং রাজস্ব-ঘটিত অবস্থা বাস্তবিকই ফিরিয়া যায়।

বাঁক দ্য ফ্রাঁসের কঁং র‍াঁদ্যু (প্যারি ১৯২৯) বলে ১৯২৮ সনে "এক নূতন ফ্রাঁ সৃষ্ট হয়।" "১৪ বৎসর যাবৎ বাধাপ্রাপ্ত মুদ্রা থাকার পর ফ্রাঁ পুনরায় খাঁটী মুদ্রায় পরিণত হয় এবং পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মুদ্রার সহিত ঢাকনা বা জামিন সম্বন্ধে ইহা সমান প্রতিযোগিতা করিবার অধিকারী হয়।"

১৯২৮ সনের ২৫শে জুন তারিখের আইনে সোনাকেই বিধিবদ্ধ মুদ্রা-ধাতুরূপে স্বীকার করা হয় আর পূর্ববর্তী আঠারো মাসের প্রচলিত হারে ফ্রাঁর দর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ১৯১৪ সনের ৫ই আগষ্ট তারিখের আইন অনুসারে আইন-সঙ্গতরূপে ঘোষিত নোটগুলা উক্ত আইনের বলে বিলুপ্ত করা হয়। ব্যাঙ্ককে উহার প্রচারিত নোটগুলির জন্য সোনা বা মুদ্রা জিম্মা রাখিতে বাধ্য করা হয়।

জনসাধারণকে কতকগুলি নোটের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট

হইতে নোটের পরিবর্তে সোনার মুদ্রা বা সোনা আদায় করিবার অধিকারী করা হয়, এবং এইরূপ নোটের সর্বনিম্ন সীমা ২১৫,০০০ ফ্রা বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

এই সমস্ত আইনকানুন দ্বারা কারেন্সীর স্থিতিকরণ এবং উহার একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড নিরূপণ করা হয়। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঠিক এই উপায়েই কারেন্সির সংস্কার বা পুনর্গঠন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ফ্রান্সে কর্তৃপক্ষ ফ্রাঁকে উহার পূর্বতন মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়াছে। ফ্রাঁর মূল্য-হ্রাস ফরাসী মুদ্রাসংস্কারের এক বড় কথা। মুদ্রার মূল্য-হ্রাস-নীতি ফ্রান্সের আর্থিক ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

নোট-নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯২৮ সনের ২৫শে জুন তারিখের আইনও সমান বিপ্লবাত্মক। এই আইন দ্বারা ১৮৭৬ সনের পর সর্ব প্রথম বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসকে নোট-প্রচারের জন্য সর্বনিম্ন জামিন রাখিবার নীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য করা হয়। উত্তমর্ণদের চলতি হিসাব সহ মোট প্রচারিত নোটের জন্য কম পক্ষে ৩৫% সোনার মুদ্রা (বাণিজ্যিক কাগজ ছাড়া) রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং আইনসঙ্গত সর্বোচ্চ নোটপ্রচারের নীতির (১৮৪৮ সনে ৩৫ কোটি এবং ১৯২৫ সনে ৫,৮৫০ কোটি) মূলেও কুঠারাঘাত করা হয়। ৩৫% সোনার ঢাকনা ১৯২৪ সনের রাইখ্‌স বাঙ্ক আইন-সম্মত সোনার ঢাকনা অপেক্ষাও বেশী, কারণ উক্ত আইনে উর্ধ্ব পক্ষে মাত্র ৩০% সোনার ঢাকনা রাখার বাধ্য-বাধকতা কায়েম করা হইয়াছে।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, ফ্রান্স শতাব্দীর পুরাতন "ব্যাঙ্কিং নীতি" বর্জন করিয়া ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যণ্ড ও রাইখ্‌স বাঙ্কের "কারেন্সী নীতি" বা সিক্কা-নীতিই গ্রহণ করিয়াছে। তবে বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস বিশ্বস্ত নোট প্রচারের "বিশ্বাস-নিষ্ঠ" বা আইন মাফিক সর্বোচ্চ সীমা সম্বলিত কঠোর বিলাতী ব্যবস্থার পরিবর্তে রাইখ্‌স বাঙ্কের আনুপাতিক জামিন বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত শিথিল ব্যবস্থারই পক্ষপাতী হইয়াছে।

১৯২৮ সনের জুন মাসের আইনে উদ্বর্তপত্র তৈরী করা এবং উহার হিসাব-পত্র গ্রহণেরও কিছু পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। ঐ তারিখে বিনিময়ের নয়া হার অনুসারে ব্যাঙ্কের অধিকারভুক্ত সমস্ত স্বর্ণমুদ্রার দর কষা হয়। রৌপ্যমুদ্রাগুলারও এইভাবে দর কষিয়া ঐগুলিকে মুদ্রার আসন হইতে নামাইয়া সাধারণ চাঁদি হিসাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্পণ করা হয়। কঁৎ রাঁছ (প্যারি, ১৯২৯) ১৯২৮ সনের দ্বিতীয় ছয় মাস ব্যাঙ্কের নিম্নলিখিতরূপ (লক্ষ ফ্রাঁর হিসাব) হিসাব প্রকাশিত করে :—

তারিখ	স্বর্ণমুদ্রা	নোট	নোট ও চলতি আমানতের অনুপাতে সোনার জামিনের শতকরা হিস্যা
২৫শে জুন	২,৮৯,৩৫০	৫,৮৭,৭৫০	৪০.৪৫
৭ই সেপ্টেম্বর	৩,০৪,২৬০	৬,১৫,৫২০	৩৯.১৭
২১শে ডিসেম্বর	৩,১৮,৩৫০	৬,১৯,১৪০	৩৯.৩২

এই সময়ের মধ্যে সোনার ঢাকনা বা জামিন দৈনিক বা অল্প মেয়াদের দেনাসমূহের ৩৯.১৭% ও ৪০.৪৫% এর মধ্যে উঠা-নামা করিয়াছে। এই ঢাকনা আইনসঙ্গত ৩৫%এর অনেক উপরে। ব্যাঙ্কের তহবিলে মজুদ নগদ সোনার সহিত বিদেশে দৈনিক বা অল্প মেয়াদের যে সমস্ত সম্পত্তি আছে তাহা যোগ করিলে অনুপাত আরও বাড়িয়া যাইবে।

"আনুপাতিক ঢাকনা" সম্পর্কেও নয়া রাইখ্‌স বাঙ্ক ও নূতন বাঁক দ্য ফ্রাঁসের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। দুইটি নোট-আইনের সর্তাবলীর মধ্যে যে সমস্ত পার্থক্য আছে তাহা মোটেই উপেক্ষা করা যায় না। ফ্রান্সের ৩৫% সোনার ঢাকনা (১) নোট এবং (২) চলতি ডিপজিট বা আমানত প্রভৃতি সাধারণ বাণিজ্যিক ঋণ উভয়ের জন্যই নির্দিষ্ট। কিন্তু জার্মাণিতে কেবলমাত্র নোটের জন্যই ৩০% সোনার ঢাকনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জার্মাণ নোট-ব্যাঙ্কের চলতি ডিপজিট প্রভৃতি সাধারণ ব্যাঙ্কিং কারবারের

বিশেষ ঢাকনার ব্যবস্থা আছে। এই ঢাকনার বরাদ্দ মোট সুদের ৪০% পর্যন্ত, এবং ইহা সোনা না হইলেও চলিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাইখ্‌স বাঙ্ক নোট ও সাধারণ ব্যাঙ্ক-বিভাগের মধ্যে রীতিমত ভেদ-রেখা টানিয়া দুইটাকে পৃথক পৃথক ঋণরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রত্যেক দফার জন্য বিভিন্ন ধরণের জামিন কায়েম করিয়াছে। অন্য পক্ষে বাঁক দ্য ফ্রাঁস নোট-প্রচার এবং ডিপজিট প্রভৃতি সাধারণ ব্যাঙ্কের কারবার দুইটিকে কেবলমাত্র মামুলি ঋণরূপেই সমঝিয়া লইয়াছে। সেই জন্য দফার জন্য পৃথক পৃথক জামিনের ব্যবস্থা করা হয় নাই; ৩৫% সোনার ঢাকনা দুই ধরণের কর্জেরই ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম, এইরূপ ধারণা করা হইয়াছে।

বাকী ৭০% নোটের জন্য যে বাধ্যতামূলক ঢাকনার প্রয়োজন জার্মাণ আইনে তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু ফরাসী আইন এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। ফ্রান্স আনুপাতিক ঢাকনার বাধ্যতামূলক নীতি স্বীকার করিয়াছে বটে কিন্তু কার্যতঃ চির-আচরিত স্বাধীনতাই উপভোগ করিতেছে।

বিলাতী প্রতিষ্ঠানের রক্ষণশীলতা ও হুসিয়ারীর তুলনা করিলে দেখা যায় ফরাসী প্রতিষ্ঠান রাইখ্‌স বাঙ্কেরই মত শিথিল ত বটেই, অধিকন্তু কাগজী-মুদ্রা বা সাধারণ ব্যাঙ্ক-কারবার ক্ষেত্রে আইনের বালাই সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া জার্মাণ প্রতিষ্ঠানকেও অতিক্রম করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এখানে আমরা সেই পুরাণা "ব্যাঙ্কিং প্রিন্‌সিপ্‌ল" বা "ব্যাঙ্কিং নীতিকে" এক নয়া আকারেই দেখিতে পাইতেছি।

নোট-ব্যাঙ্কসমূহের বাণিজ্যিক, রিজার্ভ ও সরকারী ব্যাঙ্কিং

অন্যান্য জার্মাণ ব্যাঙ্কের মতই রাইখ্‌স বাঙ্কও সাধারণ ভাবে আপন ব্যবসা-বাণিজ্যের কারবার চালাইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যণ্ডের মত রাইখ্‌স বাঙ্কেরও সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের কারবার জার্মাণির বাঘা-বাঘা ব্যাঙ্কগুলার তুলনায় অত্যন্ত কম।

১৯১৩ সনে রাইখ্‌স বাঙ্কের সর্বনিম্ন বাণিজ্যিক কারবারের পরিমাণ ৮,৭৪০ লক্ষ মার্ক এবং উহার সর্বোচ্চ কারবার ১৭,৩২০ লক্ষ মার্ক। তুলনায় অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলার, যথা ডয়চে বাঙ্ক, ডিস্কোণ্টো গেজেল্‌শাফ্‌ট, ড্রেসড্‌নার বাঙ্ক প্রভৃতির কারবার অনেক বেশী। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটির পুঁজিপাট্টা ২০ কোটি মার্ক। ডয়চে বাঙ্কের এক আমানতের হিসাবেই ১৫৮ কোটি মার্কের কারবার হইয়াছে। ড্রেসড্‌নারের আমানত ব্যাঙ্কিংয়ের পরিমাণ ৯৫,৮০ লক্ষ এবং ডিস্কোণ্টোর ৬৭,৪০ লক্ষ।

ডয়চে বাঙ্কে ডিস্কাউণ্ট ও সকল প্রকার কর্জের খাতে কারবারের পরিমাণ ১৫৫ কোটি মার্ক, ড্রেসড্‌নারের ৯৪,২০ লক্ষ এবং ডিস্কোণ্টোর ৭৭,৮০ লক্ষ। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের একত্রে ডিস্কাউণ্ট ও কর্জের খাতে মোট কারবারের পরিমাণ ৩২৭ কোটি মার্ক এবং ইহা রাইখ্‌স বাঙ্কের সকল প্রকার বাণিজ্যিক কারবারের প্রায় দ্বিগুণ। এই তিনটি ব্যাঙ্ক ছাড়া আরও অনেকগুলি ব্যাঙ্ক এই সময়ে কারবার চালাইয়াছে।

নিম্নে রাইখ্‌স বাঙ্কের "সক্রিয়" (সম্পত্তি) বাণিজ্যিক কারবারের (বিল, ডিস্কাউণ্ট ও সিকিউরিটির পরিবর্তে কর্জ দাদন) পরিচয় দেওয়া গেল :—

তারিখ	বিল	কর্জ
	মার্ক	মার্ক
১৯০৩, ৩১শে ডিসে	১,০৮৯,১৯০,৮৫৫	১৪৬,২২৬,৭০০
১৯১৩, ৩১শে ডিসে	১,৪৯৭,৮৬০,২৮২	৯৪,৪৭২,৮০০
১৯২৪, ৩১শে ডিসে	২,০৫১,৪৬৮,৩২৯	১৬,৯৬০,২০০

বিলের কারবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্জের কারবার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯১৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মোট কারবারের পরিমাণ ১,৫৯২,৩৩৩,০৮২ মার্ক; ইহার সহিত জার্মাণির অন্যান্য ডিপজিট বা আমানত-ব্যাঙ্কের বাণিজ্যিক কারবারের তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে। নিম্নে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ১৯১৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত কারবারের হিসাব দেওয়া গেল :—

ডিস্কাউন্ট করা বিল	...	৪,২৮৬,২০০,০০০ মার্ক
অধমর্ণদের নিকট দাদন	...	১৪,২৪২,৬০০,০০০ ,,
সিকিউরিটি খরিদ	...	৫,৫৮৮,৫০০,০০০ ,,
বন্ধক	...	১৪,১৫৭,৫০০,০০০ ,,
পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর্জ দাদন	...	৩,৭০৭,৫০০,০০০ ,,
মোট	...	৪১,৯৮২,৩০০,০০০ ,,

অর্থাৎ জার্মাণির ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাঙ্কের তুলনায় রাইখ্স বাঙ্ক মাত্র ৩·৮% কারবার করিয়াছে।

১৯২৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই সমস্ত ব্যাঙ্কের "সক্রিয়" কারবার নিম্নরূপ ছিল :—

বিল	...	২,৩০৪,৬০০,০০০ মার্ক
অধমর্ণ	...	৫,৪৬৪,০০০,০০০ ,,
সিকিউরিটি	...	৩১৪,৩০০,০০০ ,,
বন্ধক	...	১০৪,০০০,০০০ ,,
পাবলিক প্রতিষ্ঠানকে ধার	...	১৫১,২০০,০০০ ,,
মোট	...	৮,৩৩৮,১০০,০০০ ,,

ঐ তারিখে রাইখ্স বাঙ্কের মোট কারবারের পরিমাণ ২,০৬৮,৪২৮,৫২৯ মার্ক, অর্থাৎ অন্যান্য ব্যাঙ্কের কারবারের ২৪·৮%।

নিম্নে রাইখ্স বাঙ্কের ডিপজিট ("নিষ্ক্রিয়" অর্থাৎ দেনা) কারবারের পরিচয় দেওয়া গেল :—

১৯০০, ১লা জানুয়ারি	...	৬৮৫,৩৫৭,২৭৮ মার্ক
১৯১২, ,,	...	৫৫৮,৪৯৫,৯৫৫ ,,
১৯২৪, ,,	...	৪০৩,৭৬৩,০৮২ ,,

১৯১৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ডিপজিট কারবারের পরিমাণ ৩৪,৫৭১,৮০০,০০০ মার্ক। ১৯১৩ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে রাইখ্স বাঙ্কের ডিপজিট কারবারের তুলনায় ইহা প্রায় ৬২ গুণ। ১৯২৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে "অন্যান্য ব্যাঙ্কের" ডিপজিট কারবার ৭,৯৫০,৪০০,০০০ মার্ক; সুতরাং এহিসাবে ঐগুলার কিম্মৎ রাইখ্স বাঙ্ক অপেক্ষা ১৯·৭ গুণ বেশী।

এ সম্বন্ধে ফ্রান্সের কাহিনী জার্মাণিরই জুড়িদার।

ফ্রান্সের "বাঘা-বাঘা তিনটার" অর্থাৎ ক্রেদি লিঅঁনে, সোসাইতে জেনের‍্যাল ও কঁতোয়ার ন্যাশনালের "সক্রিয়" (সম্পত্তি) কারবার নিম্নরূপ :—

১৮৯৯, ৩১শে ডিসেম্বর		...	১,৬৬৫,০০০,০০০ ফ্রাঁ
১৯০৫	,,	...	২,৭৬০,০০০,০০০ ,,
১৯১৩	,,	...	৪,২০০,০০০,০০০ ,,

দেখা যাইতেছে ব্যাঙ্কগুলার কারবার ক্রমে ফাঁপিয়া উঠিতেছে; ১২ বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ১৪৭%।

অন্য পক্ষে বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের বিল ডিস্কাউন্ট করিবার কারবার ১৮৮০ সন হইতে ১৯০৫ সন পর্যন্ত ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া ক্রমাগত কমিয়া চলিয়াছে। নিম্নে দৈনিক গড়ের হিসাব দেওয়া গেল :—

১৮৮০	...	৭৫৮,৫০০,০০০ ফ্রাঁ
১৮৯০	...	৬৬৯,৬০০,০০০ ,,
১৮৯৫	...	৫৪৩,৬০০,০০০ ,,
১৯০১	...	৫৯২,৪০০,০০০ ,,
১৯০৫	...	৬৪০,৫০০,০০০ ,,

বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলা বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসকে ক্রমেই এই কারবার হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ১৯১২ সনে ইহার দৈনিক গড় ১,৩৩৩,০০০,০০০ ফ্রাঁ হয় বটে, কিন্তু তবুও এইখাতে বাঘা তিনটার মিলিত কারবার দাঁড়ায় ইহার তিনগুণেরও বেশী। এমন কি, ক্রেদি লিঅঁনে নামক ব্যাঙ্কের বিল-ডিস্কাউন্টের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৪৪১,০০০,০০০ ফ্রাঁ।

বিগত কয়েক বছরের জন্য বাঁক্ ও বাঘা তিনটা ব্যাঙ্কের ডিস্কাউন্ট কারবারের তুলনামূলক হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

(লক্ষ ফ্রাঁর হিসাব)

সন	ক্রেদি লিঅঁনে	সোসিয়েতে	কঁতোয়ার	বাঁক্
১৯২০	৩২,৩৯৩	৩০,৯০০	২৬,৫১৩	৩২,৭৬০
১৯২৫	৪৭,৯৭০	৪৭,০৬০	৩৭,৭৭০	৩৫,৭৩০
১৯২৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে বাঁক "বাঘা তিনটা"র সহিত কোনো রকমে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। কিন্তু দেশের মোট ডিস্কাউন্ট কারবারের ক্ষেত্রে ইহার আসন মাঝামাঝি মাত্র।

রাইখ্ স বাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড এবং বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের মত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কারদের ব্যাঙ্ক। এই প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সমস্ত ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা জমা রাখে এবং জার্মান সাম্রাজ্যের অর্থসম্পদ্ কেন্দ্রীভূত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। সুতরাং গোটা দেশের "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" রূপে ইহার দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। এই জন্য ইহাকে আপন "ঢাক্‌না" অর্থাৎ "নগদ" সোনা ও সিকিউরিটিগুলার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

রাইখ্ স বাঙ্কের "ঢাকনা"ই প্রকৃত পক্ষে সমগ্র সাম্রাজ্যের—গবর্ণমেণ্টের তথা অন্যান্য ব্যাঙ্কের "মজুদ তহবিল"। রিজার্ভ ব্যাঙ্করূপে রাইখ্ স বাঙ্কের অধিকার ঠিক ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক-বিভাগের মত। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিলাতী প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্কিং বিভাগে সবরকম ব্যাঙ্কিং কারবারই চলিয়াছে।

রিজার্ভ অর্থাৎ মজুদ অর্থ-ভাণ্ডার রক্ষা করিবার ব্যবস্থা জার্মাণি ও বিলাতে একই ধরণের। দুই দফা আর্থিক পরিস্থিতির জন্য এই আইনসঙ্গত রিজার্ভ কমিয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, শিল্পপ্রসার বা সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অতি-বাড়তির জন্য বিভিন্ন ধরণের বিল অতি-মাত্রায় উদ্ভূত হইতে পারে। এই সমস্ত বাণিজ্যিক কাগজ ডিস্কাউন্ট করিবার জন্য রাইখ্ স বাঙ্ক বাধ্য হইয়া অতিরিক্ত নোট বাহির করিতে পারে, ফলে উহার আইনসঙ্গত ঢাক্‌নাও কমিয়া যাইতে বাধ্য। এই অবস্থার সূত্রপাত হওয়া মাত্র রাইখ্ স বাঙ্ক ডিস্কাউন্টের হার চড়াইয়া দেয়, অর্থাৎ চড়া হারে কর্জ দিতে আরম্ভ করে। ফলে কোম্পানিওয়ালা ও অন্যান্য হঠাৎ ব্যবসায়ীদের উৎসাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং বাণিজ্যিক কাগজপত্র হাতে লইয়া ইহাদের পক্ষে ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইতে আর উৎসাহ থাকে না। ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুঃসময়, কারণ মুদ্রার বাজার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। রাইখ্ স বাঙ্ক কিন্তু এই সময় আপন সম্পদ্ বাড়াইয়া লইয়া দেশের মজুদ ভাণ্ডারের নিরাপত্তা রক্ষা করে।

দ্বিতীয়তঃ বিদেশী এক্সচেঞ্জের উঠানামার জন্যও আইনসঙ্গত ঢাকনা বিপর্যস্ত হইতে পারে। মার্কের তুলনায় পাউণ্ড, ষ্টার্লিং, ডলার বা অন্যান্য বিদেশী কারেন্সীর হার বাড়িতে পারে। এইরূপ অবস্থায় তথাকথিত "স্বর্ণবিন্দু" উপস্থিত হইবার জন্য এক্সচেঞ্জ বিলের পরিবর্তে সোনার তালে বা মুদ্রায় মার্ক রপ্তানি লাভজনক হইয়া থাকে। জার্মাণ ব্যবসায়ীরা তখন নিশ্চয়ই রাইখ্ স বাঙ্কের নিকট নোট লইয়া আসিয়া সোনার তাল বা মুদ্রার জন্য তাগাদা আরম্ভ করিবে। কাজে কাজেই রাইখ্ স্ বাঙ্কের মজুদ সোনা হ্রাস পাইবার উপক্রম হয়। এই অবস্থাতেও নোটের ঝামেলা কমাইবার জন্য রাইখ্ স বাঙ্ক ডিস্কাউন্টের হার বাড়াইয়া থাকে।

এই কার্যক্রম আপনা-আপনি উদ্ভূত হয় এবং ইহা ফরাসী বা বিলাতী ও জার্মাণ দস্তুরও বটে। তবে এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডে বা রাইখস্ বাঙ্কের তুলনায় বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস সকল সময়েই প্রায় একই ধরণের ডিস্কাউন্টের হার রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। অধিকন্তু, ইংল্যাণ্ড বা জার্মাণি অপেক্ষা ফ্রান্সে ডিস্কাউন্টের হার সাধারণতঃ কমই আছে।

১৮৯৮ এবং ১৯১৩ সনের মধ্যে বাঙ্কের ডিস্কাউন্টের হার অধিকাংশ সময় ৩% ছিল।

নিম্নে ব্যতিক্রমের উদাহরণ দেওয়া গেল :—

হার	সময়
৩·৫%	১৮৯৯ ডিসেম্বর, ১৯০৭ মার্চ্চ, ১৯০৮ জানুয়ারি, ১৯১১ সেপ্টেম্বর, ১৯১২ জানুয়ারি, ১৯১২ অক্টোবর
৪%	১৯০০ জানুয়ারি, ১৯০৭ নবেম্বর, ১৯০৮ জানুয়ারী, ১৯১২ অক্টোবর, ১৯১৩ জানুয়ারী
৪·৫%	১৮৯৮ ডিসেম্বর

এই সময়ের মধ্যে রাইখ্ স বাঙ্কের ডিস্কাউন্টের হার অনবরত উঠানামা ত করিয়াছেই, তাছাড়া উহা বাঁক্

অপেক্ষা সব সময়েই বেশী ছিল। ফরাসীর ধরাবাঁধা ৩%-স্থলে জার্মাণির "সাধারণ" হার অনেক সময়েই ৫%, এবং অধিকাংশ সময় ৪%। রাইখ্‌স বাঙ্কে ১৮৯৮ সনে মাত্র ৫১ দিন, ১৯০২ সনে ২৩৬ দিন, এবং ১৯০৫ সনে ১৯৬ দিনের জন্য ৩% হার উদ্ভূত হইয়াছিল। নিম্নের তালিকায় এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণী দেওয়া হইল :—

যে সমস্ত দিন ধার্য ছিল

সন	৩%	৩½%	৪%	৪½%	৫%	৫½%	৬%	৬½	৭%	৭½%
১৮৯৮	৫১	...	২০৮	...	৪৮	১০	৪২	...	...	...
১৮৯৯	...	...	৪০	১২৬	৯০	...	৯২	...	১২	...
১৯০০	...	...	...	...	১৬৮	১৬৬	১৫	...	১১	...
১৯০১	...	৯৫	১৫৪	৫৬	৫৫	...	...	...	...	...
১৯০৭	...	...	...	...	...	১৮৬	৯১	৯	২১	৫৩
১৯১০	...	...	২২৬	১৯	১১৫	...	...	...	...	...
১৯১১	...	...	২১১	১২	১৩৭	...	...	...	....	...
১৯১৩	...	...	...	...	১৯	৪৫	২৯৬	...	...	...

১৯১৫-১৯২১ সনের মধ্যে বৎসরের মধ্যে ৩৬০ দিন রাইখ্‌স বাঙ্কের ডিস্কাউণ্ট-হার ৫% ছিল। ফ্রান্সেও ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ সন পর্যন্ত হার ৫% নির্দিষ্ট ছিল। ইহার পর হার,—যথা মাত্র ১৯২৬ সনের জুলাই মাসে একবার,—৭%এর বেশী কখনও হয় নাই। ফ্রান্সের হার শতকরা ৫ হইতে ৬-এর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে।

জার্মাণ ডিস্কাউণ্ট হারের ইতিহাস কিন্তু নিম্নলিখিতরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল :—

সে সমস্ত দিনে ধার্য হইয়াছিল

সন	৯%	১০%	১২%	১৯%	৩০%	৯০%
১৯২৩	...	১৭	৯৫	৯৯	৪৫	১০৬
১৯২৪	...	৩৬০	...	...	...	...
১৯২৫	৩০৫	৫৫	...	...	...	...

রাইখ্‌স বাঙ্ক সরকারী প্রতিষ্ঠান নয় বটে, কিন্তু ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইংল্যাণ্ড এবং বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের মত এই প্রতিষ্ঠানও কতকগুলি সরকারী কাজ করিবার জন্য বিশেষ অধিকার ভোগ করে। ইহা জার্মাণ সাম্রাজ্যের লেন-দেন এবং ঋণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

ভিতর দিয়াই সম্পন্ন হয়। ১৯২৪ সনের আইন দ্বারা এ-সম্বন্ধে কোনোও প্রকার নূতনত্বই সাধিত হয় নাই।

ইতি পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাইখ্‌স বাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট পূর্বে একজন ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী ছিল। বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের গবর্ণরও এইরূপ ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হয়। কিন্তু ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইংল্যাণ্ডের গবর্ণর মোটেই কোনো সরকারী কর্মচারী নহে। ডিরেক্টার বোর্ড কর্তৃক ইনি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। অংশীদারগণ আবার ডিরেক্টারদের নির্বাচিত করে। ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা ফরাসী প্রতিষ্ঠান অধিকতর গবর্ণমেণ্ট-ঘেঁসা।

১৯২৮ সনের পুনর্গঠনের পরও ইহাকে প্রায় সরকারী প্রতিষ্ঠান বলা চলে। নয়া রাইখ্‌স বাঙ্ক কিন্তু পূরাদস্তর বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

সাধারণ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্কারদের ব্যাঙ্ক (অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক)রূপে রাইখ্‌স বাঙ্ক উহার মক্কেলদের নিকট হইতে সাধারণভাবেই ফি গ্রহণ করিয়া থাকে।

কিন্তু ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্করূপে পুরাতন ব্যাঙ্কের মত নয়া রাইখ্‌স বাঙ্কও বিনা পারিশ্রমিকে

নিম্নলিখিতরূপ পারিশ্রমিক তাহার ভোগে আসে। প্রথমতঃ একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানই গোটা সাম্রাজ্যের জন্য আইন-সঙ্গত ব্যাঙ্ক-নোট ছাপাইবার অধিকারী। এই ব্যবসা রীতিমত লাভজনক। দ্বিতীয়তঃ ইহা সরকারী তহবিলের একমাত্র তোষাখানা, এবং এই হিসাবে অজস্র তরল-পুঁজির অধিকারী। তৃতীয়তঃ নির্দিষ্ট ৩১/২% লভ্যাংশ বাদে ইহা বহুকাল যাবং সিকিবরাদ্দ লাভের হিস্যা হজম করিয়াছে।

জার্মাণ গবর্ণমেণ্টও কম সুবিধা ভোগ করে নাই। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের লেনদেনের এজেণ্টরূপে রাইখ্‌স বাঙ্ক বিনা মজুরীতে সরকারী কাজকর্ম নির্বাহ করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট এইভাবে নিখরচায় রাজস্ব, দেনা-পাওনা ইত্যাদি আর্থিক কারবার চালাইয়া লইবার সুবিধা ভোগ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্ট "নিট" লাভের অর্থাৎ লভ্যাংশ পরিশোধের পর যাহা বাঁচে তাহার বারো আনা পরিমাণ ভোগ করিয়া আসিয়াছে।

১৯২৪ সনের আইনে সর্বনিম্ন লভ্যাংশের হার ৮% বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও রাইখ্‌স বাঙ্কের মধ্যে লাভের তঙ্কা বণ্টন করিবারও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম জারি করা হইয়াছে। রাইখ্‌স বাঙ্কের আরও একটি সুবিধা, জার্মাণ ভূমিতে ইহাকে কর্পোরেশন আয় বা ব্যবসায় প্রভৃতির কর হইতে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে রাইখ্‌স বাঙ্ক ও বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস

ফরাসী ঋণদান-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের যে স্থান, রাইখ্‌স বাঙ্ক জার্মানির বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাঙ্কগুলার কাছে ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সঙ্কট-সময়ে এই প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহের আপন আপন কাগজপত্র পুনরায় ডিস্কাউণ্ট করার পক্ষে পরম আশ্রয়স্থল। কিন্তু বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস যেমন ফরাসী ব্যাঙ্ক-জগতের কেন্দ্রস্থল, রাইখ্‌স বাঙ্ককে ঠিক সেইভাবে জার্মাণ ব্যাঙ্কজগতের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করা যায় না।

এই দুই দেশের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহার মধ্যেই ইহার কারণ ঢুঁড়িয়া দেখিতে হইবে। সাধারণ ব্যাঙ্ক-কারবারের বেলায় জার্মাণ ব্যাঙ্ক আর ফরাসী সোসাইতে দ্য ক্রেদির মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই, অর্থাৎ চলতি হিসাব, ডিস্কাউণ্ট, টাকা পাঠানো, বিনিময়, আদায় প্রভৃতির বেলায় দুই দেশের ব্যাঙ্কগুলার মধ্যে একই ধরণের রেওয়াজ বর্তমান। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাঙ্কগুলা সাধারণতঃ এই সব কারবারই চালাইয়া থাকে। কিন্তু এমন কতকগুলা কাজ আছে যেগুলা ব্যাঙ্কিং কারবারের বাইরে, অথচ ব্যাঙ্কগুলাই এই সব কাজ হাসিল করিয়া থাকে। মুখ্যতঃ বা গৌণভাবে শিল্প-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ এই সমস্ত কাজের সামিল। শিল্পের মোসাবিদা কাজে পরিণত করা এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে পুঁজি যোগান, এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক-ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত।

ফরাসী ব্যাঙ্কগুলা এই সমস্ত কাজকর্মের বেলায় অত্যন্ত হুঁসিয়ার অর্থাৎ এইগুলি পরিচালনা করিতে অত্যন্ত ভয় পায়। চলতি কাজকামে লাগিয়া থাকাই এগুলার দস্তর। অন্য পক্ষে জার্মাণ ব্যাঙ্কসমূহ শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলায় বুকের পাটা দেখাইয়া পুঁজিপাট্টা ঢালিয়া থাকে। ফরাসী মুল্লুকে, যে সমস্ত ব্যাঙ্ক এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ গঠিত এবং প্রয়োজনমাফিক পুঁজিপাট্টার অধিকারী, মাত্র সেগুলার পক্ষে এই সব কাজে হাত দেওয়া সমীচীন বিবেচিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর মক্কেলদের আমানতী টাকায়, বা গচ্ছিত অর্থে পুষ্ট ব্যাঙ্কগুলার পক্ষে এই ধরণের অতি-কিছু দুঃসাহসিক পরিকল্পনাসমূহের ঝুঁকি বা দায়িত্ব গ্রহণ বিবেচিত হয়। কারণ ঐ সমস্ত কারবারে অনেক দিন ধরিয়া পুঁজি রীতিমত বাঁধিয়া রাখিতে হয় এবং সাধারণ ব্যাঙ্কের পক্ষে তাহা অসম্ভবই বটে।

প্রায় অধিকাংশ জার্মাণ ব্যাঙ্কই শিল্প-বাণিজ্যে পুঁজি ঢালিতে অভ্যস্ত, এবং এইভাবে উহারা আপনাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্তই করিয়া থাকে। সুতরাং রাইখ্‌স বাঙ্কের পক্ষে উহাদের ঝুঁকি বা দায়িত্বের অংশ গ্রহণ, বা নিয়ন্ত্রণ একরূপ ঘটিয়া উঠে না বলিলেই চলে। কিন্তু ফ্রান্সে

কতকগুলি বিশেষ ব্যাঙ্ক এইরূপ দায়িত্ব বা ঝুঁকি গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে; সেই জন্য বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের পক্ষে বিপদ্-আপদ্ কোথায় ঘটিবে না ঘটিবে তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করার পর, ফরাসী ব্যাঙ্ক-জগতে বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের মত রাইখ্‌স বাঙ্ককে জার্মাণ ব্যাঙ্ক-জগতের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করা চলে না।

অন্য পক্ষে কিন্তু রাইখ্‌স বাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার জার্মাণির অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলা মানিয়া লইতে বাধ্য। সুতরাং জার্মাণ মুল্লুকের গোটা ব্যাঙ্কিং কারবার হাতের মুঠার মধ্যে রাখিয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ হিসাবে রাইখ্‌স বাঙ্ক ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা অধিকতর "কেন্দ্রী-কৃত।" অন্ততঃ পক্ষে এই দফার বেলায় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসকেও রাইখ্‌স বাঙ্কের নিকট হার মানিতে হইবে।

নোটব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্ট

বিলাত, জার্মাণি ও ফ্রান্সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শাসন-পরিচালনে যথেষ্ট গরমিল আছে।

১৮০০-১৮০৮ সনের আইনের পর হইতে বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস ২০০ জন সদস্য লইয়া গঠিত "সাধারণ পরিষদ্" কর্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছে। এই সদস্যগণ ব্যাঙ্কের সব চেয়ে বড় অংশীদার। পরিষদের কাজ "কাউন্সিল" ও "কমিটি" নামক দুইটি ছোট ছোট সভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। "কাউন্সিলে" থাকে ১৫ জন "রিজেণ্ট" আর কমিটিতে ৩ জন "সেন্সার"। রিজেণ্টরাই খাঁটি ডিরেক্টার বা শাসনকর্তা। সেন্সারদের কাজ হিসাবপত্র অডিট করা।

সাধারণ পরিষদ্ কর্তৃক রিজেণ্টগণ নির্বাচিত হয়। ইহাদের মধ্যে ৫ জন আসে অংশীদারদের মধ্য হইতে। তবে কারখানার মালিক বা বণিক্‌রূপে ইহাদের ব্যবসা-জ্ঞান থাকা চাই। পরিষদ্‌কে গবর্ণমেণ্টের প্রাদেশিক ট্রেজারী অফিসারদের মধ্যে তিন জন রিজেণ্ট বাছাই করিয়া লইতে হয়। বাকী সাতজন সম্পর্কে পরিষদ্ যাহা খুসী তাহাই করিতে পারে।

সমগ্র শাসন-কার্যের খবরদারি করে একজন গবর্ণর ও দুইজন ডেপুটি গবর্ণর। এই তিনজন কর্মচারীই গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হয়। সাধারণতঃ বড় বড় সরকারী কর্মচারীকে এই সমস্ত পদে নিযুক্ত করা হয়। গবর্ণর নিযুক্ত হয় আজীবন কর্মচারিরূপে। ১৮৯৭ সনের ১৭ই নভেম্বরের আইন অনুসারে গবর্ণর বা ডেপুটি গবর্ণরদের চেম্বার অফ্ ডেপুটিজ্ এবং সেনেটের সদস্য হওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের কার্য-নির্বাহ সম্পর্কে তিনজন রিজেণ্ট ও তিনজন গবর্ণর গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং এ হিসাবে ইহাকে সরকারী ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে; বিশেষতঃ শাখা-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে সমস্ত আইন-কানুন করা হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে সরকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে হয়।

বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের শাখাসমূহ ডিরেক্টার বোর্ড কর্তৃক শাসিত হয়। এই সমস্ত বোর্ডে যাহারা অধিষ্ঠিত হয় তাহারা স্থানীয় অংশীদারগণ বা খোদ প্রধান কার্যালয়ের অংশীদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। তবে চরমভাবে নিয়োগ করিবার ভার থাকে গবর্ণরের হাতে। সুতরাং শাখাগুলাও সরকারী রক্ষণাবেক্ষণে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া এই সমস্ত শাখার গবর্ণরগণও সমগ্র ব্যাঙ্কের গবর্ণরের মত এক একজন সরকারী কর্মচারী।

কাঠামো অর্থাৎ গঠন-প্রণালীর দিক্ হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, গবর্ণমেণ্টের সহিত পুরাতন রাইখ্‌স বাঙ্কের যোগাযোগ বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর ছিল। রাইখ্‌স বাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট আর "কাউন্সিল" দুইই গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইত। তবে একটি কমিটির ব্যবস্থা ছিল এবং অংশীদারগণ ইহার ভিতর দিয়া ব্যাঙ্ক-শাসনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত।

অধিকন্তু, লভ্যাংশ প্রদানের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত গবর্ণমেণ্ট তাহার ¾ অংশ গ্রহণ করিত; সুতরাং এই ব্যবস্থা দ্বারা রাইখ্‌স বাঙ্কের কারবার সোজাসুজি সরকারী ব্যবসাতেই পরিণত ছিল।

রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্কের নিট লাভের সরকারী হিস্যার নির্দিষ্ট শতকরা বরাদ্দ বহুবার স্থির করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ মহালড়াইয়ের পূর্বে ১৮৭৫, ১৮৮৯, ১৮৯৯ এবং ১৯০০ সনের সরকারী ঘোষণার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯২৪ সনের ৩০শে আগষ্ট তারিখের আইনেও অবস্থা সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিয়া নয়া হারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত আইনের প্রত্যেকটির দ্বারা নিট লাভের নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়া বিলি বন্দোবস্ত করা হইয়াছে:—(১) মজুদ তহবিল, (২) অংশীদারদের লভ্যাংশ, (ক) পরিশোধিত ও (খ) পরবর্তী সনের হিসাবে জমা দেয় এবং (৩) সরকারী হিস্যা।

১৮৭৬ সন হইতে ১৯১৩ সন পর্যন্ত রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্কের কারবারে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ মোটা দাঁও মারিয়াছে তাহা নিম্নের অঙ্কগুলার উপর চোখ বুলাইলেই টের পাওয়া যাইবে:—

১৮৭৬-১৯১৩ সন

নিট লাভের শ্রেণী বিভাগ

মোট আয়	...	১,৩৬৮,০৯৩,৬১১ মার্ক
মোট ব্যয়	...	৫৮৯,০৬৩,৬১১ ,,
নিট লাভ	...	৭৭৯,০২৯,৮৬০ ,,
নিট লাভের সরকারী হিস্যা		৩৭৬,২৮০,০৮৩ ,,
নিট লাভে অংশীদারদের হিস্যা		
(ক) পরিশোধিত	...	৩৬৪,০৬৪,০০০ ,,
(খ) জমা	...	১,০১৪ ,,
মজুদ তহবিল	...	৩৮,৬৮৪,৭৬৩ ,,

সুতরাং গবর্ণমেণ্ট নিট লাভের "সিংহের ভাগই" গ্রহণ করিয়াছে, কারণ সরকারী হিস্যার বরাদ্দ ৪৮·৩%; পক্ষান্তরে অংশীদারদের নিকট পরিশোধিত হিস্যার বরাদ্দ ৪৬·৭% মাত্র।

তবে এ হিসাবে সরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে পুরাতন রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্কের বাঁক্ ছ ফ্রাঁস অপেক্ষা বেশী বাহাদুরি লওয়ার উপায় নাই। কারণ ১৮৯৭ সনের ১৭ই নভেম্বরের আইন অনুসারে বাঁক্ ছ ফ্রাঁসকে নূতন কতকগুলি আর্থিক সুবিধা ভোগের যে ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে তাহা আদৌ ফেলিতব্য চিজ নয়। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থা দ্বারা ফরাসী রাষ্ট্র ১৮৫৭ ও ১৮৭৮ সনে ব্যাঙ্কের নিকট গৃহীত ১৪ কোটি ফ্রাঁর সুদ হইতে রেহাই পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বাঁক্ যতদিন সুবিধা ভোগ করিবে গবর্ণমেণ্ট ততদিনের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৪ কোটি ফ্রাঁর আর এক দফা কর্জ আদায় করিয়া লইয়াছে। তৃতীয়তঃ বাঁক্ যে পরিমাণ ডিস্কাউণ্ট ভোগ করে তাহার এক অষ্টমাংশ পরিমিত অর্থ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে বাধ্য আছে। এই অর্থের পরিমাণ অন্ততঃ পক্ষে ২০ লক্ষ ফ্রাঁ হওয়া চাই-ই। চতুর্থতঃ, ডিস্কাউণ্টের হার যদি ৫% এর বেশী হয় তাহা হইলে অংশীদারদের হিস্যা হইতে অতিরিক্ত কাটিয়া লইতে হইবে। যাহা বাকী থাকিবে তাহার সিকি ব্যাঙ্কের পুঁজিতে যোগ দিয়া তিন-চতুর্থাংশ রাষ্ট্রের তহবিলে জমা পড়িবে।

১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসের আইনে তৃতীয় ধারা সম্বন্ধে কিছু রদ-বদল করা হইয়াছে। ডিস্কাউণ্টের হার ৪%এর বেশী হইলে রাষ্ট্রের হিস্যা ⅛ হইতে ⅙ এ পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকন্তু উক্ত আইন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বিনা সুদে ২ কোটি ফ্রাঁ ধার লইবারও ব্যবস্থা করে।

নিম্নের তালিকায় বাঁক্ কর্তৃক রাষ্ট্রের নিকট প্রদত্ত টাকার হিসাব দেওয়া গেল:—

	ফ্রাঁ		ফ্রাঁ
১৮৯৭	২,৭৪২,০০০	১৯০৬	৫,৩৩৩,০০০
১৮৯৮	৩,৩৪৩,০০০	১৯০৭	৭,৩৫৭,০০০
১৮৯৯	৪,৮৫৭,০০০	১৯০৮	৫,৫৩৩,০০০
১৯০০	৫,৬০৫,০০০	১৯০৯	৪,৭৯০,০০০
১৯০১	৪,১০৭,০০০	১৯১০	৫,৭৩৩,০০০
১৯০২	৩,৭৭৭,০০০	১৯১১	৭,২২৬,০০০
১৯০৩	৪,৩১৪,০০০	১৯১২	৮,৭২৩,০০০
১৯০৪	৪,৫২১,০০০	১৯১৩	১৩,৬২৫,০০০
১৯০৫	৪,২২৫,০০০		

১৯২৮ সনের ২৩ শে জুনের চুক্তি অনুসারে নয়া বাঁক্ গবর্ণমেণ্টকে ৩০০ কোটি ফ্রাঁ বিনা সুদে ধার দিয়াছে, এই দেনা ১৯৪৫ সনে শোধ দেওয়া হইবে। সুতরাং বাঁকের নিকট ফরাসী রাষ্ট্রের বিনা সুদে ঋণের পরিমাণ ৩২০ কোটি ফ্রাঁ (নয়া ফ্রাঁ)।

ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা পুরাপুরি বে-সরকারী। এর উপর রাষ্ট্রের কোনো ক্ষমতাই নাই। অংশীদারগণই সর্বে-সর্বা। তাহারাই নিজেদের মধ্য হইতে ডিরেক্টার-সভা গঠন করে। এই ডিরেক্টার-সভায় যে সদস্য আছে তাহাদের মধ্যে কাহারই কর্মচারী বা মালিক-রূপে অন্য কোনো ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ নাই। একজন গবর্ণর এবং তাঁহার সহকারী ডেপুটী গবর্ণর আছেন ; এবং ইঁহারা উভয়েই দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহারা উভয়েই খোদ ডিরেক্টার-সভার লোক।

বাঁকের নিকট হইতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যে মোটা মোটা আর্থিক সাহায্য ও বিনা সুদে ঋণ ভোগ করিয়া থাকে ১৯২৪ সনের রাইখ্‌স বাঙ্ক আইনের নিকট তাহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বস্তু। জার্মান গবর্ণমেণ্ট বড় জোর ১০ কোটী মার্ক ধার লইতে পারে কিন্তু তাহা সরকারী বৎসরের মধ্যেই শোধ দিতে হয়। সুদও রীতিমত ভাবে দিতে হয়। তবে সরকারী ডাক ও রেল বিভাগকে ঊর্ধ্বপক্ষে ২০ কোটি মার্ক ধার দেওয়ার জন্য রাইখ্‌স বাঙ্ককে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু নিট লাভের ১২% মজুদ তহবিল এবং ৮% অংশীদারদের বাঁটিয়া দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা রাইখ্‌স বাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েই ভোগ করে।

তবে রাইখ্‌স বাঙ্কের কারবারে লাভের ভাগ লইতে গিয়া জার্মান গবর্মেণ্ট যে খুব বেশী লাভবান্ হইয়াছে তাহা মনে হয় না। মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্থিতিসাধনের পর প্রথম বৎসরের হিসাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহা বেশ বুঝা যাইবে। নিম্নে ১৯২৪ সনের যে অঙ্কগুলা দেওয়া হইল তাহা বেশ প্রণিধানযোগ্য :—

মোট আয়	৩০৭,০৭৩,৩৫০	রাইখ্‌স মার্ক
মোট ব্যয়	১৮৪,৫৫৯,১৫৯	,,
নিট লাভ	১২২,৫১৪,১৯১	,,
মজুদ তহবিল	২৪,৫০২,৮৩৮	,,

অংশীদারদের লভ্যাংশ

(ক) পরিশোধিত	৯,০০০,০০০	,,
(খ) জমা	৩৩,৪৮৩,৬০০	,,
গবর্ণমেণ্টের হিস্যা	৫৫,৬০৮,৫১৪	,,

নয়া রাইখ্‌স বাঙ্ক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে বটে, তবুও নিট লাভের "সিংহের ভাগ" অর্থাৎ ৪৫·৪% সরকারই ভোগ করিবার অধিকারী।

কিন্তু ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডের বেলায় আমরা যেন আর একটা নয়া জগতে উপনীত হই। সরকারী নিয়ন্ত্রণ, এমন কি উহার সংস্পর্শ হইতেও পূর্ণ অব্যাহতি এই ব্যাঙ্কের গঠনতন্ত্র বা কাঠামোর প্রধানতম সর্তরূপে সমঝিতে হইবে। পূর্বেও এসম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। নয়া রাইখ্‌স বাঙ্কের চেয়েও ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড এসম্বন্ধে বেশী সুবিধা ভোগ করে। কারণ রাইখ্‌স বাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের বেলায় জার্মান প্রেসিডেণ্টের অনেকখানি হাত আছে। তাহা ছাড়া বাঁক্ দ্য ফ্রাঁসের বিনা সুদে রাষ্ট্রকে কর্জদান, আর ফরাসী ও জার্মাণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লাভের মোটা অংশ রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। তবে নোট বিভাগে প্রতি বৎসর যে লাভ দাঁড়ায় তাহা অবশ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উপভোগ করে ; কিন্তু এই টাকার পরিমাণ এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়। অন্য পক্ষে গবর্ণমেণ্ট ঋণের জন্য ব্যাঙ্ককে ক্রমবর্ধিত হারে সুদ দিয়া থাকে। সরকারী কাজ-কর্মের জন্য এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের মতই গবর্ণমেণ্টের নিকট পারিশ্রমিক আদায় করিয়া থাকে। সুতরাং দুই পক্ষই কেহ কাহারও অধীন না হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করিতেছে।

ত্রিবেণী

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী সাহিত্যভারতী

ধবল-অমলা শুভ্র-বরণা
বিমলসলিলা গঙ্গে ;
পুণ্য-পূতা জাহ্নবী তুমি
নৃত্য করিছ রঙ্গে ।
তোমার বিমল সলিল মাঝারে,
কি শোভা রয়েছে মিশি ;
সুরতরঙ্গিণী জাহ্নবী তুমি
অতুল সুষমারাশি !
নৃত্যচপল ভঙ্গীতে তব
সঙ্গীত কলতানে,
কুলুকুলুস্বরে বহিছ সুস্বরে
জুড়ায়ে মানব-প্রাণে ।

অতীত যুগের পুণ্য-কাহিনী
লেখা আছে তব ভালে ;
তোমার পুণ্য-প্রবাহ-মাঝারে
যুগে যুগে কালে কালে ।
মুক্তবেণীতে যুক্ত হইয়ে
ত্রিধারা রূপেতে বহিছ তুমি ;
জয় জয় গঙ্গে পতিতপাবনী
যেন নিশিদিন ও পদ চুমি ।
যুগ যুগ ধরি তোমারি মহিমা
গাইছে জগতে গো নরনারী ;
বন্দি তোমায় ত্রিপথগা তুমি
নমি গো চরণে সুরেশ্বরী ॥

অন্নচিন্তা

শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ

(১)

কোন্ শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিল কেষ্ট তাহা জানিত না। বিধবা জননী তাহাকে অতি কষ্টে অতি যত্নে মানুষ করিয়াছিলেন। এখন সে রাজসাহী কলেজে বি এ ক্লাসের ছাত্র। মাতাপুত্রকে লইয়াই ক্ষুদ্র সংসার দীর্ঘকাল ধরিয়া টিং-টিং করিয়া চলিয়া আসিতেছে। মা আদর করিয়া পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন 'কেষ্টধন'। কিন্তু ডাকিত সবাই 'কেষ্ট' বলিয়া, এমন কি মা নিজেও। মা ছিলেন হরিভক্ত। কেষ্ট ছিল মাতৃভক্ত। পড়াশুনায় অনুরাগ ছিল তাহার অন্তহীন। সংসারের অভিজ্ঞতা ছিল অত্যল্প—না থাকার সামিল। সংসার চলে অফুরন্ত দুঃখের মধ্য দিয়া। কিন্তু মায়ের দুঃখের অংশীদার 'কেষ্ট' নয়। মায়ের বক্ষ-প্রাচীর ভেদ করিয়া দুঃখ-কৃপাণের যে সামান্য আঘাত পুত্রের গায়ে লাগে, গাত্রাবরণ বিদ্ধ করিয়া সে আঘাত তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। ঠিক সাধারণ ছেলে 'কেষ্ট' নয়। তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সকলের চক্ষেই ধরা পড়ে। দুঃখের মধ্যেও কেষ্টর কথা ভাবিয়া মায়ের আহ্লাদের সীমা নাই। সে মানুষ হইলে দুঃখ ঘুচিবে—ভরসা এই প্রকার।

ইংরাজিতে অনার্স সহ বি এ পাশ করিয়া কেষ্ট বাড়ী ফিরিল। মায়ের আনন্দ আর ধরে না। এত দিনে তাঁহার দুঃখ ঘুচিল। পুত্র বি এ পাশ করিয়া বাড়ী

ফিরিয়াছে। ঘোষাল গিন্নী, নিধুর মা, ফটিকের পিসী, সোনা বৌ, গোপালের ঠাকুর মা, ক্ষান্ত গোয়ালিনী প্রভৃতি, পাড়ার প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশিনীদের প্রায় সকলকেই ডাকিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমার কেষ্ট অনার পাশ হয়ে বাড়ী এসেছে। তোমাদের সকলের আশীর্বাদের জোরে ও পাশ হয়েছে। তোমরা সবাই ওকে দেখে গেলে না?"

কেষ্ট ত লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া যাইতে চায়। কিন্তু মায়ের স্বাভাবিক আনন্দ-উৎসাহে সে বাধা দিবে কেমন করিয়া? কেষ্টর মায়ের উৎসাহ আর থামেনা। তিনি গাঁয়ের ধনী মহাজন উমেশ মুখুয্যেকে (মুখুয্যে মশাই) গিয়া নিজেই বলিয়া আসিলেন—"এবার তুমি নিশ্চিন্ত হও মুখুয্যে মশাই। আমার কেষ্ট অনার-পাশ হয়ে বাড়ী এসেছে। আর রাখবো না মুখুয্যে মশাই! এবার পাঁচ মাসে তোমার ঋণ শুধ্‌বো, তা তুমি দেখে নিও। তোমরাই ত বল অনার-পাশ সোজা জিনিষ নয়—কেষ্ট যে আমার তাই হয়ে এসেছে।"

কেষ্টর মা বাড়ী ফিরিয়া কেষ্টকে নিভৃতে ডাকিয়া উঠানের একান্তে একটি হৃষ্টপুষ্ট তুলসী গাছের কাছে লইয়া কহিলেন—"কেষ্ট এই তুলসী তলায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর। এ তুলসীগাছ আজকের নয়। আমি এ বাড়ীতে প্রথম পা দিতেই এর উপর নজর পড়েছিল সকলের আগে। একেই আমি ভালবেসে ছিলাম সকলের চেয়ে বেশী। এখানে কে থাকে জানিস্? আমার 'কৃষ্ণধন'। না, না, তুই না। দ্বাপরের সেই ননীচোরা। একেই যত্ন করতে করতে একদিন তোকে পেয়েছিলাম। তখন আমার বুকের আধখানা শূন্যস্থান পূর্ণ হয়েছিল। বুক জুড়ে রইলি তোরা দুটিতে। তারপর সংসারের কত দুঃখের ভিতর দিয়ে দিন কাটিয়ে কাটিয়ে আমি আজ বুড়ো হয়েছি। তোদের কাউকে একটু কষ্ট দিই নি। তুই যখন থাকতিসনে বাড়ী, তখন আমার কৃষ্ণধন যদি আমার কাছে না থাকতো, তা হলে আমি মরে যেতুম। আজ আমার কৃষ্ণ আর কেষ্টকে আমি আবার এক সঙ্গে তাকাইয়া কি যেন দেখিয়া লইলেন—হয়ত বা দেখিলেন কেষ্ট তাঁহার কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতেছে কি না। কেষ্ট কিন্তু নির্বাক্।

ক্ষণপরে কি ভাবিয়া কেষ্টকে একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তিনি কহিলেন—"কেষ্ট, জানিস বাবা, কৃষ্ণধন আমাকে কতখানি সান্ত্বনা দিয়েছে। দুঃখকে আমি দুঃখ বলে গ্রাহ্যই করতাম না। তারপর যেদিন আমার চরম দুর্দিন এল, যেদিন চলে গেলেন তিনি, সেদিন আমি ভেঙ্গে যেতাম, যদি কেষ্ট আমার কাছে না থাকতো। তিনিও গেলেন চলে, আর আমিও শক্ত করে ধরলাম ওকেই আমার বুকের মধ্যে চেপে। তুই তখন তিন মাসেরটি।" বলিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আর বলিতে পারিলেন না। ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কেষ্ট নির্বাক্ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন মায়ের সমস্ত বাক্যের অর্থ তাহার বুদ্ধির অগোচর। শুধু একটা অস্পষ্ট না-ভাল-লাগার কাঁটা তাহার মনের কোন্ এক অজ্ঞাত কোনে খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

দুপুরবেলায় কেষ্ট যখন খাইতে বসিল, মা তাহার কাছে বসিয়া পাখার হাওয়া করিতে করিতে বলিলেন—"কেষ্ট, জানিস্ তো বাবা, সংসার অচল। অনেক কষ্টে আমি তোকে পড়িয়েছি। এবার একটা চাকরীর চেষ্টা কর বাবা।" কেষ্ট এবার বুঝিল মায়ের পূর্বেকার কথার মধ্যে যেন ইহারই ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। নির্বাক্ বিস্ময়ে সে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, জবাব দিতে পারিল না। কিন্তু পুত্রের নিভৃত অন্তরের কথা জননী শুনিলেন। তিনি তাহার আরও কাছে সরিয়া স্নেহের সুরে কহিলেন—"আমি জানি বাবা। জানি পড়াশুনা তোর সব চেয়ে প্রিয় জিনিষ। আমার যেমন প্রিয় তুই, তোর তেমনি পড়াশুনা। কিন্তু কি করি বাবা? টাকা অভাবে কিছুই হয় না। তুই সব খবর জানিসনে। ভদ্রাসনটুকু বাকি ছিল তাও এবার বাঁধা দিয়ে তোর পরীক্ষার ফিস্ দিয়েছি। দেনায় গলা পর্যন্ত ডুবেছি। মুখুয্যেরা টাকার জন্য গায়ের ছাল ছিঁড়ে খাচ্ছে। না খেয়ে থাকা সহ্য হয় কিন্তু পাওনা-

"কিন্তু বন্ধুরা সবাই এম্ এ পড়বে" এইটুকু বলিয়া কেষ্ট ভাতের থালার উপর আঙুল দিয়া আঁক কাটিতে লাগিল।

"বন্ধুরা বড়লোক, তারা পড়তে পারে। গরিবের বেশী পড়তে নেই। তুই তো অনার পাশ করেছিস। যথেষ্ট করেছিস লেখাপড়া আর কেন বাবা, এবার একটা চাকরী দেখ্। টাকার জন্যই লেখাপড়া।" এই কথা বলিয়া মা কেষ্টর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কেষ্টর শিরে যেন বজ্রপাত হইল। এতদিন সে এসব কথা ভাবিয়াই দেখে নাই। তাহার ধারণা ছিল জগৎটা রাজসাহী কলেজ, খেলার মাঠ, হোষ্টেল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুঃসীমানার দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কল্পনার চক্ষে সে দেখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড বাড়ী এবং তাহারই একটি প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে গবেষণার ছাত্ররূপে সে কত নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছে। চারিদিকে কত প্রশংসার বাণী। তাহাকে লইয়া কত কাড়াকাড়ি, কত হৈ-চৈ। ইহা ছাড়া মোহনবাগান দলের খেলোয়াড় হইয়া একটি প্রশস্ত ময়দানে বুট্‌পরা গোরার সহিত খেলিবার সুযোগ সে কতরাত্রিতে স্বপ্নে অর্জন করিয়াছে। কিন্তু আজ সে এ কি শুনিল! তাহার ভবিষ্যৎ আশা-প্রদীপ মায়ের কথার দম্‌কা হাওয়ায় তাহারি চক্ষের সম্মুখে দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল!

মায়ের চক্ষেও অশ্রু দেখা দিল। তিনি আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন—"দেখ কেষ্ট, বহু কষ্টে নিজেকে নানা রকমে বঞ্চিত করে আমি তোর পড়ার খরচ যুগিয়েছি। আজ তোর মুখের ঐ বেদনার ছায়া আমার বুকে পাষাণ চাপিয়ে দিচ্ছে, তবু তোকে বলছি চাকরী করতে কেন জানিস? নিঃস্ব—নিতান্ত নিঃসম্বল তোর মা আজ" বলিতে বলিতে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু তাঁহার গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

মায়ের বেদনার অশ্রু এবার বোধকরি কেষ্টর গভীর চিত্ততলের কিয়দংশ অভিষিক্ত করিল। ধরাগলায় সে বলিল—"তুমি স্থির হও, মা। তোমার আদেশ আমি অমান্য করবো না। সে শক্তি তোমার কেষ্টর নেই। তবু জানকি মা? জ্ঞান হবার প্রথম দিন থেকে আমি ভেবেছি, আমি মানুষ হব। আমি আজও বুঝি, আমি যে মানুষ হয়ে জন্মেছি সেই আমার গর্বের বস্তু নয়, মনুষ্যত্বই আমার গর্বের। তোমার দুঃখ আজ আমার মর্মে বেজেছে।" আর সে বলিতে পারিলনা। মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া নীরব হইয়া রহিল।

ক্ষণকালের জন্য মাতাপুত্র উভয়ে নীরব—দুটি ব্যথিত হৃদয় যেন পরস্পরের বেদনার স্পন্দন নীরবে অনুভব করিতে লাগিল। মাতৃবক্ষ আলোড়িত করিয়া অব্যক্ত বেদনার যে দুর্দম প্রবাহ বাহিরে পথ খুঁজিতেছিল, তাহা যেন কোন্ অন্তর্নিহিত প্রবেশ-দ্বার দিয়া গোপনে পুত্র-হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মায়ের উচ্ছ্বসিত বেদনার কয়েক বিন্দু অশ্রু অন্তরের নিগূঢ় সত্যের পরিচয় লইয়া নয়নকোনে ফুটিয়াই পুত্রের শিরে নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল।

এই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিল মায়ের কথায়। তিনি বলিতে লাগিলেন—"তোর স্বভাব আমি জানি বাবা, তুই আমার অবাধ্য হতে পারিসনে। তোর মত লেখাপড়া-জানা লোক গ্রামে তো বেশী নেই। তুই তো অনার পাশ, আর ও পাড়ার হারান ঘোষালের ছেলে একটা পাশের পড়া করেই চাকরীতে ঢুকেছিল। আজ সে পুলিশের বড় দারোগা। তুই ও বাবা, এবার রোজগারপাতি করতে আরম্ভ কর, আমার বৌমাকে ঘরে এনে একটু শান্তিতে দিন কাটাই। বুড়ো হয়েছি, আর খাটতে পারিনে, যার সংসার সেই চালাক্ এসে।"

"হুঁা তাহলে তোমার কেষ্টধনের ভার লাঘব করে কৃষ্ণধনকে নিয়ে একবার লাগতে পার"। কেষ্ট চট করিয়া এই কথা বলিয়া ফেলিয়াই মায়ের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

মা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"না বাবা ঠিক তা নয়, তবে তোর বিয়ের কথা আমি এখন ভাবি।"

কেষ্ট এবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—"তার জন্য ভাবনা কি মা? তার জন্যে তো চাকরীর দরকার হয় না। বি এ পাশ করলেই বিয়েটা হয়। কন্যাদায়-গ্রস্তরা তো আর ভেবে দেখেনা তাদের মেয়ে খাবে কি, তারা দেখে

ছেলে কি পাশ আর তোমার 'অনার পাশ' ছেলেকে তো তারা লুফে নেবে। কন্যাদায়গ্রস্তরা বিশেষ কন্যা যখন দায়—এক ঘাড়ের দায় অন্যঘাড়ে নামাতে পারলেই বাঁচে। খেয়ে বেঁচে থাকার প্রশ্ন সেখানে ওঠেনা, ঘাড়ের মজবুতত্ব দেখার প্রয়োজন হয় না।"

কেষ্টর এই সমস্ত কথার তাৎপর্য মা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন কেষ্ট খুসী হইয়া একটু রসিকতা করিতেছে। তিনি পুনরায় বাক্য যোজনা করিয়া কেষ্টর এই খুসিত্বের অবসর এবং আরামটুকু কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন না। কেষ্ট পুনরায় আরম্ভ করিল—"বড়লোক বাংলাদেশে ক'জন? প্রায় সবাই গরিব। তবে আমরা যে গরিবের চেয়েও গরিব এ কথা তোমার এতবড় ছেলেকে কোনদিন জানতে দাওনি মা। তোমার দুঃখের সঠিক খবর তোমার প্রবাসী পুত্রের কানে কোন দিনই পৌছায়নি। আজ তোমার বুকের মধ্যে বসে তোমার মর্মবেদনা অনুভব করেছি। তবু তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি মা, আর দুটি বছর সবুর কর। আমি তোমার কাছে আর টাকা চাইব না, আমার খরচ আমি চালাব। এম্ এ পরীক্ষা দিয়েই আমি চাকরীতে ঢুকবো। তুমি বিমুখ হলে আমার সব পণ্ড হবে। তুমি খুসী মনে আদেশ কর। তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি নির্ভয়ে বিদেশ যাত্রা করি, বিপদ্ আমার ধারে ঘেঁসবে না। তুমি তোমার কৃষ্ণধনকে নিয়ে আর দুটো বছর কাটাও।" অগত্যা মা বলিলেন—"তবে তাই হোক্। তোর প্রাণের ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না। আমি আশীর্বাদ করি, তুই এম্ এ পাশ করে হাকিম হবি।"

(২)

সেই হাকিম হবার আশীর্বাদ মাথায় লইয়া কেষ্ট কলিকাতা রওনা হইয়া গেল।

কেষ্টর অন্তরঙ্গ বন্ধু রমেন ধনীর সন্তান। সে কলিকাতার বাসিন্দা। তাহারই খুল্লতাত গিরিশ বাবু রাজসাহী কলেজের গণিতের অধ্যাপক। রমেন খুড়া মহাশয়ের কাছে থাকিয়াই উক্ত কলেজে বি এ পড়িত। কলেজে অধ্যয়ন কালেই কেষ্টর সহিত রমেনের বন্ধুত্ব। কেষ্ট ভাল ছেলে ছিল বলিয়া গিরিশবাবু তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিবেন। সেই সূত্রে গিরিশবাবুর বাড়ীতে কেষ্টর যাতায়াত ছিল। এবং আপন ঔদার্যে এবং সৌহৃদ্যে অল্প দিনের মধ্যেই কেষ্ট সকলের প্রিয় হইয়া উঠিল। বি এ পরীক্ষা দিয়া রমেন বাড়ীতে আসিয়াছিল। কেষ্ট এই বন্ধুর গৃহেই অতিথি হইল।

রমেনের পিতা প্রকাণ্ড ছাপাখানার মালিক। তিনি সজ্জন; তাঁহার আশ্রয়েই কেষ্ট এম্ এ পড়িতে লাগিল। তাঁহার অর্থ এবং সৌজন্যের বিনিময়ে কেষ্ট উপযাচক হইয়া তাঁহার ছাপাখানার কিছু কিছু প্রুফ দেখিয়া দিত। দুইটি বছর কায়ক্লেশে কোন প্রকারে কাটিয়া গেল। কেষ্ট সেকেণ্ড ক্লাসে ফার্ষ্ট হইয়া গণিতে এম্ এ পাশ করিল। এইবার সে মাকে চিঠি লিখিয়া জানাইল যে, সে একেবারে চাকরী ঠিক করিয়া তবে বাড়ী ফিরিবে। তারপর সেই সেকেণ্ড ক্লাসে ফার্ষ্ট এম এর ডিগ্রী লইয়া চাকরীর প্রত্যাশায় কলিকাতার সমস্ত বড় বড় অফিসের দ্বারদেশে ধন্না দিল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশাধিকার পাইল না। লৌহদ্বার অর্গলবদ্ধ। যদি কখনও কোন প্রকারে সামান্য ফাঁক হয়, তো সে সঙ্কীর্ণ ফাটল দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে অন্য ব্যক্তি। সেকেণ্ড ক্লাসে ফার্ষ্ট এম্ এ ডিগ্রী হোল্ডার এবং মায়ের সেই বহুগর্বের অনার গ্রাজুয়েট কাহারও চক্ষু ঝলসাইতে পারিল না। বরঞ্চ অল্পবিদ্যার পালিশহীন বলিষ্ঠ অঙ্গের ঠোক্কর খাইয়া ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। অতি অল্প দিনেই চাকরীর বাজারে কেষ্টর বহু আয়াসলব্ধ বিদ্যার মূল্য নিরূপিত হইয়া গেল। আত্মাভিমান এখনও অন্তরের মাঝে ঘাড় বাঁকাইয়া গর্জিয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু সে গর্জনে আর গাম্ভীর্য নাই, দৃঢ়তা নাই—দুর্দম ব্যাধিগ্রস্ত মহাপ্রস্থানের যাত্রীর ক্ষীণ কণ্ঠের ভগ্ন আওয়াজের মত আপনার মধ্যে আপনিই বিলীন হইয়া যায়।

"চাকরী একটা জুটবেই" সেই যে গর্ববাণী মায়ের সম্মুখে অত্যন্ত অকস্মাৎ তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল সে কথা স্মরণ করিয়া তাহার যৌবনদীপ্ত বলিষ্ঠ হৃদয়ও শঙ্কায় সঙ্কোচে বিন্দুবৎ হইয়া যাইতে লাগিল। মায়ের

সেই হাকিম হইবার আশীর্বচন অবশ্য বাড়াবাড়ি, কিন্তু তাই বলিয়া যে উহা এমন করিয়া মিথ্যা হইয়া যাইবে, এমন কি সওদাগরী অফিসেও একটা ৪০্ টাকার চাকরীও জুটিবে না—একথা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। এদিকে মায়ের পত্র আসিল টাকা না পাঠাইলে সকলই নষ্ট হইল। দেনার দায়ে বসৎবাটী নীলামে উঠিয়াছে। মুখুয্যে মশায় একেবারে মারমুখী। খাদ্যাভাবে উপবাস চলিতেছে ইত্যাদি আরও বহু মর্মান্তিক সংবাদ সেই পত্রে।

"সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া; দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষীছাড়া।" মনে মনে ইহাই উচ্চারণ করিয়া কেষ্ট ভাবিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ছাত্র সে, সেই সম্মান অর্জন করিতে অনাথা জননী আজ সর্বস্বান্ত। রমেনের পিতার অনুগ্রহপ্রসূত দুই চারিখণ্ড রৌপ্যমুদ্রা হাত পাতিয়া লইয়া সে আপনার এবং মায়ের উপবাস ভঙ্গের সুযোগ অর্জন করিতেছে কিন্তু আত্মাভিমান ও আত্মগ্লানির চাপে আপন হৃদয়ের দুকূলে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে তাহা প্রতিরোধের কোন পন্থাই সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

জনশ্রুতি ছিল জাপানী ব্যাঙ্কের বড় বাবু হরিহর মিত্র মহাশয় খুব সদাশয় ব্যক্তি। তাঁহার দয়ার শরীর; বহু লোককে তিনি চাকরী দিয়াছেন। তাঁহার শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলেই চাকরী অনিবার্য। এই বাঙালী সাহেব প্রত্যহ মোটর যোগে সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের কাছে মোটর গাড়ীখানি রাখিয়া খানিক পায়চারি করিয়া ক্ষুধা সংগ্রহ করিয়া ফেরেন। একদিন সাহেবের আসিবার বহু পূর্বে সেখানে উপস্থিত হইয়া কেষ্টধন নির্দিষ্টস্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মিত্তির সাহেব নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া মোটর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যথারীতি পায়চারি আরম্ভ করিলেন।

লজ্জা, ঘৃণা, ভয় কেষ্ট এক প্রকার বিসর্জন দিয়াছিল। সে নিঃশব্দে সাহেবের কাছে যাইয়া অকস্মাৎ নীচু হইয়া একরাশি ধুলাবালি সাহেবের বুট হইতে সংগ্রহ করিয়া, মাথায় ও মুখে মাখিয়া ফেলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বড় সাহেবের বড় চাহনীতে ভীত হইল দেখিয়া সাহেব গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কেহে ছোকরা? আদপ কায়দা আদৌ জাননা দেখ্ছি। কি চাও তুমি?"

কেষ্ট ধীর ভাবে বলিল—"আমি বড় গরিব। মা অনাহারে—" আর বলিতে পারিলনা, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। মিত্তির সাহেব তাহার দিকে সেকেণ্ড তিনেক চক্ষুর বিস্তৃতি সম্পূর্ণ শেষ সীমায় পৌছাইয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমার মায়ের আহার সংগ্রহের দায়িত্ব আমার কতটুকু?"

কেষ্ট থতমত খাওয়া ভাবটা একটু সামলাইয়া লইয়া জবাব দিল—"আপনার অফিসে একটি চাকরী—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া "একটি চাকরী" বলিয়া ধমক দিয়া জাপানী ব্যাঙ্কের বড় বাবু এমন এক মুখভঙ্গী করিয়া ক্রুদ্ধ ভীষণ দৃষ্টি ফেলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন যে, যে-কেহ সেই অবস্থা দেখিলে মনে করিতে পারিত—ভয়ার্ত ছাগশিশু যেমন করিয়া ভীষণদর্শন অজগরের ভয়ঙ্কর লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে সজ্ঞাহীন আড়ষ্টপ্রায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেই মহা-আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে এক প্রকার অজ্ঞাতসারেই সেই বিস্তৃত মুখ-গহ্বরে গিয়া প্রবেশ করে কেষ্টও বোধকরি সেইরূপ—নিতান্ত মুখ-গহ্বরে না হউক—জ্ঞান হারাইয়া বড় কর্তার পায়ের নীচেও পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাপার অতদুর গড়াইবার পূর্বেই সাহেব আর একদফা ধমকানী দিলেন—"চাকরী? চাকরী কি গাছে ঝোলে?"

নির্মম নৈরাশ্য আর মর্মান্তিক বেদনার মাঝেও দুর্বল আশার ক্ষীণ জ্যোতি নিষ্পেষিত আত্মাভিমানের ফাঁকে উঁকি মারিয়া গেল। সে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল—"অসহায় গরিব আমি, বহু কষ্টে এম্ এ পাশ করেছি।"

মেজাজ একটু খাটো করিয়া কিন্তু আরও গভীর স্বরে বড় কর্তা জবাব দিলেন—"সে আস্ফালন আমার কাছে নয়। এম্ এ আমি ঢের দেখেছি। রোজ আমার কাছে আসে দশ বিশটা। চাকরীর বাজারে তোমাদের বিদ্যের দাম তোমার নাজানা থাকতে পারে, আমার আছে। সুপারিশ আছে?"

"আমি সুপারিশ কোথায় পাব? আপনার দয়া থাকলে সবই হতে পারে।" বলিয়া কেষ্ট মুখ নত করিয়া হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল।

দয়ার শরীর বড় কর্তা বলিলেন—"না, আমার দয়া নেই।" বলিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেলেন। একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না এই প্রত্যাখ্যানে কেষ্টর মুখের অবস্থা কিরূপ হইল।

কেষ্ট সেইখানে বসিয়া মনে মনে বলিল—"ভগবান্! তোমার কতবড় অভিসম্পাতের ফলে এ দেশের নরনারীর আজ এই ভীষণ পরিণাম? যে দেশের যুবক-যুবতীর বিদ্যার্জন জ্ঞানার্জন শুধু চাকরীর উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত, যে দেশের লক্ষ লক্ষ সন্তান গোলামীকেই মানবজীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া মনে করিতে লজ্জা বোধ করেনা, তাহাদের জন্য তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডারে দুঃখ, দারিদ্র্য, ক্লেশ, হীনতা, হেনস্থা প্রভৃতি আর যাহা কিছু থাকুক, তোমার অনন্ত করুণার এক কণাও অবশিষ্ট নাই—এ কথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।"

হতাশা এবং অপমানের তীব্র বিষে তাহার সমস্ত দেহ-মন রি-রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কোন প্রকারে দেহটাকে খাড়া করিয়া উদ্দেশ্যবিহীন অবস্থায় হাটিতে লাগিল। তখন প্রকৃতি আঁধারের যবনিকা ফেলিয়া চতুর্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। চারিদিকে কালো—বাইরেও কালো, ভিতরেও কালো। দুই কালো একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। একটু পার্থক্য ছিল। বাহিরের কালোর রাজত্বে কতকগুলি বেরসিক বৈদ্যুতিক আলো বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অদূরে গঙ্গার এপারে ওপারে সহস্র দীপশিখা শরতের নির্মল নভোমণ্ডলে উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জের ন্যায় ঝিকমিক করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এদিকে হর্ম্মরাজিপরিশোভিত বিরাট্‌কায় সহরের শিরোদেশে দীপ্যমান লক্ষ লক্ষ বৈদ্যুতিক আলো অসংখ্য দৈত্যচক্ষুর মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার দিকে ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া রহিল। চারিদিকে সকলেই যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

এইবার সে ভাবিল—"আর মা নয়, বন্ধু নয়, ভবিষ্যতের আশা নয়। পার্থিব সকল আকর্ষণ হেলায় পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। সেইখানে সে যাইবে যেখানে চাকরীর জন্য অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিবার উৎসাহ দিতে কেহ থাকে না; অফিস-বড়কর্তাদের করুণার দ্বারে ভিখারী সাজিয়া মনুষ্যত্বের গলা টিপিবার দুঃসাহস সঞ্চয়ের পথ যেখানে সহজপ্রাপ্য নহে। সে নির্ভয়ে পা বাড়াইয়া দিবে অন্ধকার ভবিষ্যতের অনন্ত অনিশ্চিতের গর্ভে। সেইখানে সে যাইবে, যেখানে চোখ খুলিলেই প্রকৃতিরাণীর অনবদ্য মহান্ সৌন্দর্যে অন্তর ভরিয়া ওঠে, আর সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিনিপুণতার অসংখ্য প্রমাণ অন্তরলোককে আনন্দে পরিপ্লুত করে।

(৩)

প্রায় মাস তিনেক হইল কেষ্টর মা ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাশায়ী। তাঁহারই পাড়ার সোনাবৌ আসিয়া দিনান্তে একবাটি বার্লির জল মুখে দিয়া যায়। আর আসেন মুখুয্যে মশায় স্বয়ং টাকার তাগাদায়। তিনি বেশ একটু ব্যঙ্গ এবং শ্লেষের সঙ্গে বলেন—"কি হে কেষ্টর মা কেষ্টার চাকরী হ'ল। আমি টাকা আর ফেলে রাখতে পারিনে। এবার নালিশ না করলে খতের মিয়াদ থাকেনা। আমার দোষ কি?"

কেষ্টর মা স্বাভাবিক সরলতায় সহাস্য মুখে বলেন—"আর একটু সবুর কর মেজো কর্তা! তোমার টাকা যাবেনা। এবার একটা চাকরী কেষ্টর হবেই। এই চাকরী হতে যা দেরী।"

তারপর তাঁহার সেই ক্ষীণ দেহটাকে কোন প্রকারে ঈষৎ টানিয়া তুলিয়া বেড়ার ফাঁকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলেন—"ঐদেখ মেজো কর্তা! ঐ যে তুলসী গাছ, ঐ গাছে আমি আজও জল দিই।" বলিয়া বালিশের উপর মাথা রাখিয়া কেষ্টর মা খানিক হাঁপাইয়া স্থির হন। মেজোকর্তা মুখ বিকৃত করিয়া মনে মনে বলেন—"তোমার মরণ-দশা ধরেছে।"

বিছানায় শুইয়া কেষ্টর মা রোজই ভাবে আজ কেষ্টর চিঠি আসিবে চাকরীর সংবাদ লইয়া। পিয়নকে রাস্তা

সোনাবৌ, পিয়নকে জিজ্ঞেস করে আমার চিঠি আছে কি না।" এই প্রকারে দিনের পর দিন কাটিয়া যায় কেষ্টর চিঠি আসে না। কেষ্টর মা ক্ষণেকের জন্য নিরাশ হইয়া মনে মনে বলেন—"কৃষ্ণধন, তোমায় তো কখনও অযত্ন করিনি, তবে আমাকে এমন করে নিরাশ কর কেন?" সোনাবৌ একদিন একখানি খামের চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া বলিল—"তোমার কেষ্ট চিঠি লিখেছে।" উদ্দীপ্ত উল্লাসে দুর্বল দেহটাকে একটা ঝাঁকানী দিয়া খাড়া করিয়া ধরিয়া কেষ্টর মা বলিলেন—"ঐ তো, আমি তো বলেছি। একেবারে চাকরী জোগাড় করে কেষ্ট চিঠি লিখবে। যাও, যাও সোনাবৌ তুমি মেজো কর্তাকে ডেকে নিয়ে এস, বল, তার টা—আচ্ছা, গা থাক, আগে চিঠিটাই পড় শুনি। তোমরা জাননা সোনাবৌ কৃষ্ণধনকে যে ভাল বেসেছে, তার বাক্য কখনও মিথ্যা হয়না। কোন কালেও হয়নি মিথ্যা। সোনাবৌ চিঠি পড়।"

"শ্রীশ্রীচরণেষু,

মা,

দুর্ভাগ্য তোমার। দুর্ভাগ্য আমার। তোমার যথা-সর্বস্বের বিনিময়ে তোমার ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলে। কিন্তু তাকে তুমি মানুষ করতে পারনি, করেছ অকর্মণ্য, অপদার্থ। শিক্ষার মোহ আমাকে পাগল করেছিল, তোমার পায়ের নীচে প্রবঞ্চনার অতলস্পর্শী গহ্বর খুঁড়ে রেখেছিল আমার শিক্ষা আমার অজ্ঞাতে, আমি ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে, হৃদপিণ্ডের স্পন্দন দিয়ে উপলব্ধি করেছি, শুধু আমার নয়, এদেশের প্রত্যেক সন্তান এমনি নৈরাশ্য এবং ব্যর্থতার মাঝেই জীবনের ন্যায্য দাবীর জন্য মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। তবু যদি গ্রামে বাস করে তোমার স্নেহচ্ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমার পৈতৃক ভূখণ্ডগুলিকে নিয়ে পরিশ্রম করতাম, আমার সে শ্রম ব্যর্থ হ'ত না। আজ আমি ব্যর্থতার কোন্ স্তরে এসে পৌছেছি সে কথা কেউ বুঝবে না। এ ভুল এখন আর শোধরাবার উপায় নেই। আমার শিক্ষার 'সেণ্ট্র্যাল অ্যাভেনিউ' গ্রাস করেছে আমার পৈতৃক জমি—মায় বাড়ীখানি শুদ্ধ। বড় কোদালীর বাঁট ধরার শক্তিও আর আমার হাতে নেই। আজ আমি শ্রান্ত। এই ব্যর্থ জীবনের ক্লান্ত দিনে তোমাকে সান্ত্বনা দেবার আমার কিছুই নেই। তোমার মত অনাথারা আজ তোমাকে দেখে শিখুক, যাদের অর্থের প্রয়োজন, শহরে পাঠিয়ে ছেলেকে লেখাপড়া যেন তারা আর না শেখায়। গ্রামের বিদ্যালয়ই তাদের জন্য যথেষ্ট। তার বেশী বিদ্যা তাদের বাহুর শক্তি অপহরণ করে, তাদেরকে অকর্মন্য করে দেবে।

আমার অপরাধ নিওনা মা; তোমার সেই 'হাকিম হবি' আশীর্বাদ আজও ভুলিনি। যদি অর্থ যোগাড় করে জীবনের পরমার্থ অর্জন করতে পারি, আবার তোমার পায়ে এসে প্রণাম করবো। নইলে এই শেষ পত্র। কেষ্টকে ভুলে যেও। কৃষ্ণধন তোমার রইল—তাকে বুকে করে দিন কাটিও। ইতি কেষ্ট"

সোনাবৌ ভাবিয়াছিল একটা অনর্থ ঘটিবে। হয়ত বা মূর্ছাও ঘটিতে পারে। কিন্তু ঘটিল না কিছুই। কেষ্টর মা পাথরের মূর্তির মত বসিয়া পত্রখানি আগাগোড়া শুনিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করিলেন—"তা হয় না সোনাবৌ, আমি এই মরা দেহটাকে টেনে নিয়ে ওই তুলসী গাছে আজও জল দিই।" বলিয়া দুইহাত এক করিয়া কপালে ঠেকাইয়া চক্ষু মুদিয়া যেন কাহার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

(৪)

কেষ্ট রমেনের নিকট হইতে পাঁচশ টাকা ধার করিয়া সেই দিনই রওনা হইয়া গিয়াছিল। তাহার অসংবদ্ধ গতি বাধা প্রাপ্ত হইল কাশ্মীরে আসিয়া। কাশ্মীরের সৌন্দর্যরাশি যেন তাহাকে হাত বাড়াইয়া টানিয়া ধরিল। সে ঠিক করিল এই খানে দু'চার দিন থাকিয়া সে আবার অজানা পথে রওনা হইবে। প্রাতঃকালে রোজই সে ভ্রমণে বাহির হইত। একদিন অকস্মাৎ তাহার নজরে পড়িল এক অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী তরুণী—বঙ্কিমবেণী দোলাইয়া রাস্তায় ফুল তুলিয়া চলিয়াছে। সেই নবীনার অসামান্য রূপের জ্যোতি কেষ্টধনের চিত্তাকাশ ঝলসাইয়া দিল। প্রথম রমণী-দরশ-মুগ্ধ সেদুটি নয়ন আনন্দের উজ্জ্

হাস্তে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কেষ্টকে দেখিতে পাইয়া সেই তরুণী দ্রুত সেস্থান ত্যাগ করিল। আর ত্যাগ করিল কেষ্টর অন্তর বাহির পরিব্যাপ্ত করিয়া তাহারই দুর্জয় রূপের সম্মোহিনী শক্তির অমর প্রভাব।

এখন হইতে প্রত্যহ এই ফুলবাগানের ধার দিয়া কারণে অকারণে হাটিয়া বেড়ান কেষ্টর দৈনন্দিন কার্যের তালিকাভুক্ত হইল। কেষ্ট পূর্বে দেখিত মুগ্ধনয়নে প্রকৃতির শোভা, এখন চাহিয়া থাকিত উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় আকণ্ঠ পান করিতে সেই তরুণীর রূপসুধা। ইহা ছাড়া কাশ্মীরের আরও অনেক রাস্তা সে নিরর্থক হাটিয়া শেষ করিল, কিন্তু সে তরুণীর সন্ধান মিলিল না। পরিশেষে হাটিতে হাটিতে সে একদিন একটি বাঙ্‌লোর কাছে আসিয়া শুনিতে পাইল নারীকণ্ঠের বাংলাগান। বাহিরে বারান্দায় একটি বৃদ্ধ বাঙালী নির্বিকার চিত্তে তামাকু সেবনে রত। কেষ্টকে দেখিতে পাইয়া তিনি ইঙ্গিতে কাছে ডাকিলেন। তারপর আলবোলার সুদীর্ঘ নলটি মুখ হইতে নামাইয়া এক গাল ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন—"বাঙালী দেখলে ডেকে আলাপ করতে হচ্ছে করে। তুমি থাক কোথায়? কি নাম?"

"নাম কেষ্টধন সান্যাল, থাকি কাছেই।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াই সে নীরব হইল। কিন্তু বৃদ্ধের উৎসাহ তাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইল না। তিনি ধীরে স্নেহের স্বরে বলিয়া চলিলেন—"তা বেশ বাবা, বেশ। তোমাকে দেখে আজ খুশী হয়েছি। আরে বল কি কথা! একটা বাঙালীর মুখ দেখার জো নেই—তোমার সঙ্গে আলাপ করে আজ মনের ক্ষোভ মেটাই। একে বৃদ্ধ তায় আবার বাতে পঙ্গু। বাড়ীর বার হতে পারি না, এক যায়গায় পড়ে থাকি, তাই বকুনীটা একটু বেড়েছে।" এইটুকু বলিয়াই তিনি একটু জোর করিয়া হাঁকিতে লাগিলেন—"ওরে ও তোতা, শীগগির আয়। আয় মা, দেখ একটা নতুন লোক পেয়েছি।" দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া একটি তরুণী জবাব দিল—"দেখ বাবা, তুমি যদি যার তার সামনে আমার ঐ নাম ধরে চীৎকার কর, আমি জবাব দেব না।" বৃদ্ধ একগাল হাসিয়া সংশোধন করিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, তোতা নয়, তোতা নয়, লাবু।"

"লাবুও নয় বল লাবণ্য" অন্তরাল হইতে জবাব আসিল। বৃদ্ধ বলিলেন—"তুমি কাছে এস ত মা! তোমার নাম আমি ঠিক করে দিচ্ছি।" লাবণ্য কাছে আসিতেই কেষ্টর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"দেখ কেষ্টধন! এই আমার মেয়ে তোতা নয়, লাবু নয়, শ্রীমতী লাবণ্য প্রভা দেবী। খুব আলাপী, সকল আলাপিতার সঙ্গেই আলাপ করেন। তর্কের সুযোগ পেলে তর্ক করেন, কিন্তু প্রত্যেক তর্কে ওঁর জেতা চাই। ওঁর সঙ্গে আলাপে বাধা নেই—কিন্তু ভয় আছে। যাত্রাদলের বীর পুরুষের মত গায়ে জোর থাকা সত্ত্বেও তর্কের তলোয়ার ঠোকাঠুকি করে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতেই হবে, যেন তর্ক-শতাশ্বমেদের ঘোড়া ছেড়েছেন, দিগ্বিজয়ী ওঁর হওয়াই চাই।"

বৃদ্ধের এই অনাবশ্যক রসিকতায় যেমন ব্যতিব্যস্ত হইল লাবণ্য, তেমনি সন্ত্রস্ত হইল কেষ্ট। এতক্ষণ ধরিয়া সে লজ্জায় লাল হইতেছিল। হঠাৎ তরুণীর দিকে চোখ পড়িতেই তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। এই সেই তরুণী! ইহারই সন্ধানে সে কাশ্মীরের অন্ধ্র-রন্ধ্র খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়াছে। একবার সে ভাবিল এই স্থান হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া সে আত্মরক্ষা করিবে। কিন্তু তাহাও পারিয়া উঠিল না। একটা অজ্ঞাতপূর্ব লজ্জা এবং সঙ্কোচের আবিলতা দেহ-মন তাহার এমনি অবশ করিয়া ধরিল যে, সে না পারিল কথা বলিতে না পারিল সেখান হইতে এক পাও নড়িতে। মুগ্ধনেত্রে স্থির হইয়া রহিল। কিন্তু একটা অসহনীয় অবস্থার চাপে তাহার মুখের রঙ বদলাইতে লাগিল। মিনিট তিনেক বাদে সে কি বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। আরক্ত ঠোঁট বার দুই কাঁপিয়া শান্ত হইল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক কেষ্টকে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নিজেই উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া একটি চেয়ারে বসাইয়া দিয়া কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—"শোনাও তো মা, লাবু আমাদের এই নবীন

বন্ধুকে তোমার সেই গানটি। ওই যে তোমার সেই—শরতে আজ কোন অতিথি……।”

কন্যা পিতার কথায় কোনরূপ বিচলিত হইল না, দ্বিধা-বাধার এতটুকু ভাব প্রকাশ করিল না। গম্ভীর হইয়া জবাব দিল—“বসন্তের অতিথির আছে শরতের গান চল্‌বে বাবা ?”

পিতাও কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া কহিলেন —“আরে হোক্‌না বসন্ত। মনই তো সবচেয়ে বড় বস্তু। মনের জোরে তোমার অন্তর-জগতে শরতের আগমন ঘোষণা কর, আর তারই বহিঃ-প্রকাশ হোক্ তোমার গানের ভিতর দিয়ে।”

কন্যা গান ধরিল—“শরতে আজ কোন্ অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে……।”

বৃদ্ধের অনাড়ম্বর অমায়িকতায় কেষ্টধন পূর্ব হইতেই বিস্মিত হইয়াছিল, ততোধিক বিস্মিত হইল এই বালিকার নির্ভীক সরলতায়। গান যখন শেষ হইল তখন মুগ্ধ-বিস্ময়ে সে সেই বালিকার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। নারীকণ্ঠের এমন স্থললিত স্বর আর সে পূর্বে কখনও শোনে নাই। আজ এইখান হইতে যেন কেষ্টধনের জীবনের এক নূতন পর্ব আরম্ভ হইল। জীবনের এতটা কাল কাটিয়াছে তাহার একভাবে ; কিন্তু ইহার যে আরও একটা দিক্ থাকিতে পারে এবং সেও যে বিশেষ প্রবল দিক্, তাহা কেষ্ট কোন দিনই ভাবিয়া দেখে নাই। সুপ্ত অন্তরের যে অতৃপ্ত বাসনা এতকাল ধরিয়া তাহার নিভৃত অন্তস্তলের গভীর তলদেশে আত্মগোপন করিয়াছিল, কোন্ এক অজ্ঞাত ঐন্দ্রজালিকের যাদুদণ্ডস্পর্শে সে যেন সজাগ সতেজ হইয়া উঠিল এবং পুলকের উচ্ছ্বসিত আবেগে, আত্মপ্রকাশের উল্লসিত আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের দুকূল ছাপাইয়া খরবেগে ছুটিয়া চলিল। সেই প্রবল প্রণয়-বানের সম্মুখে তাহার নীতি-বুদ্ধির যত কিছু বাঁধ বালির বাঁধের মত ভাঙিয়া পড়িল। দুরন্ত দুরাশার তীব্র তাড়নে অহর্নিশি এই মায়াস্বর্ণ-মৃগের পশ্চাতে ছুটিয়া নিরুদ্বেগে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। কোথায় রহিলেন মাতা, কোথায় স্বদেশ আর কোথায় চাকরী! প্রবাসের এই প্রণয়-পিপাসা যেন তাহার বহু জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত বেদনার স্থানটি আলোড়িত করিয়া তাহার সুখমন্থরগামী শোণিত-প্রবাহকে অবিশ্রাম শোষণ করিতে লাগিল।

লাবণ্য তাহাকে ডাকে ‘কেষ্ট বাবু” আর লাবণ্যকে সে ডাকে “বন্যা”—এ ডাকটি বোধ করি তাহার রবিঠাকুরের অমিতর মুখ হইতে শিক্ষা করা। পরস্পরের সৌজন্যে এবং সৌহার্দ্যে পরস্পরে তাহারা মুগ্ধ। যেন কত জন্মের পরিচিত। লাবণ্যর এক বিধবা পিসি ছিলেন ; তাঁহাকে কেষ্ট ডাকিত “নতুন পিসি” বলিয়া। এই নতুন পিসিটি কেষ্ট এবং লাবণ্যর অবাদ মেলামেশা একটু বক্রদৃষ্টিতে দেখিতেন। কিন্তু কেষ্টধনের উদার ব্যবহারে এবং বৃদ্ধের সহজ সরল উচ্চহাসির স্রোতে তাঁহার অন্তরের সেই কুটিলতা কোথায় ভাসিয়া যাইত। উপরন্তু ইহাদের ছোটখাট তর্ক এবং মান-অভিমানের মীমাংসা তাঁহাকেই করিয়া দিতে হইত। ইহাদের সহিত যতই মেলামেশা করিতেছিল, কেষ্ট ততই মুগ্ধ হইতেছিল। এঁরা হিন্দু, ব্রাহ্ম কি খ্রীষ্টান—তাহা জানিবার প্রয়োজন ছিল না। এটুকু কেষ্ট নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এঁরা যে ধর্মের এবং যে শ্রেণীরই হউন কোন অহেতুক লজ্জা বা সঙ্কোচের বাধা ইঁহাদের বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে।

কেষ্ট এবং লাবণ্য দুজনেই রবিঠাকুরকে পছন্দ করে। রবিঠাকুরের লেখা “বিদায় অভিশাপ” “চিত্রাঙ্গদা” প্রভৃতি কাব্য-নাটিকা ইহারা আবৃত্তি করে ; কখনও কখনও নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণপূর্বক অভিনয়ের কায়দায় বলিয়া যায়। এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করিতে ‘নতুনপিসি’ ঠিকমত পারিয়া উঠেন না। কাজেই লাবণ্যর বৃদ্ধ পিতাকেই বিচারক সাজিতে হয়। এমনি একটি অভিনয় দিনে তাহারা ঠিক করিল “বিদায় অভিশাপে” কেষ্ট কচের ভূমিকা এবং লাবণ্য দেবযানীর ভূমিকা গ্রহণপূর্বক বিষয়টি তাহারা নিজেদের মধ্যে রীতিমত ‘ভাবাবেগ’ সহ মহলা দিয়া যুৎসই করিয়া তবে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। তাহাই হইল কিন্তু একটু অসুবিধা ঘটাইয়া ফেলিল লাবণ্য নিজে। অভিনয় পরিসমাপ্তির মুখে কেষ্ট বলিল—“আমি

বর দিনু দেবী, তুমি ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে,” এইটুকু বলিয়া শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই লাবণ্য ভাবের আতিশয্যে একেবারে চোখ দিয়া জল টানিয়া বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল—“সে হবেনা কেষ্ট বাবু! তুমি যে আমাকে মিথ্যা বর দিয়ে ফাঁকির মধ্যে ডুবিয়ে চলে যাবে সে হবেনা। এইখানে বসে তুমি আমাকে শতকোটি অভিশাপ দাও সে আমি সইব কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না, তা আমি তোমাকে আজ স্পষ্ট কথায় বলে দিচ্ছি—হ্যাঁ—।”

কেষ্ট হাসিয়া উঠিয়া বলিল—“আরে এতো অভিনয়। আমি কি আর সত্যিই যাচ্ছি নাকি?”

“ওঃ তা হলে সত্যিই আর তুমি যাবেনা কি বল কেষ্ট বাবু? আমার যেন কিরকম ছাই মাথাটা একটু গুলিয়ে গেল আর মনে হোল তুমি আমাকে ফেলে চলেই যাচ্ছ।”

লাবণ্য একটু নিরস্ত হইলে এবার কেষ্ট বলিল—“আমি তোমাকে ফেলে পালাব না এ তুমি নিশ্চয় জেনো, কিন্তু বন্যা, তুমি যে একদিন আমাকে ফেলে পালাবেনা এ কথা তুমি বলতে পার? অমিতর বন্যার মত তুমিই যদি একদিন লিখে রেখে যাও?—তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান; গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়। হে বন্ধু, বিদায়!”

লাবণ্য এবার গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল—“যাও, যাও কেষ্ট বাবু, আমাকে তুমি ও রকম ঠাট্টা করোনা। আমার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। আমাকে তুমি বিশ্বাসঘাতক পেয়েছ? নিষ্ঠুর পেয়েছ?”

এমনি করিয়া ‘কচ-দেবযানীর’ মিথ্যা অভিনয় করিতে তাহাদের অনেকখানি সত্যিকার অভিনয়ও হইয়া গেল। পরিসমাপ্তি হইল অবশ্য কমেডিতে। কিন্তু এই অভিনয়-প্রহসনের সাক্ষী কেহ ছিল কি না, জানিনা। তবে যিনি সব কিছু দেখিতে পারেন, তিনি হয়ত অলক্ষ্যে বসিয়া ইহার খানিক দেখিয়া থাকিবেন।

মাঝে মাঝে কেষ্টধনের মায়ের কথা মনে পড়ে; কিন্তু সে চিন্তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়না। তাহার মনের সকল শূন্য পূর্ণ করিয়াছে আজ লাবণ্য। তাহার ইহজীবনের

কেষ্টর মন বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিতান্ত অকারণেই মনের মধ্যে সে এক তীব্র অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। দুই দিন চুপচাপ বসিয়া রহিল; ঘর হইতে বাহির হইল না। তৃতীয় দিবসে প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়াই দেখিল লাবণ্যদের চাকর শশিনাথ দ্বার-দেশে দাঁড়াইয়া আছে। লাবণ্যর পিসির লেখা একখানি ক্ষুদ্র পত্র শশিনাথ কেষ্টর হাতে দিল। পত্রের মর্ম দুই দিন অনুপস্থিতির জন্য অনুযোগ এবং অবিলম্বে দর্শনদানের জন্য অনুরোধ।

কেষ্ট শশিনাথের সঙ্গেই রওনা হইয়া গেল। যাইয়া প্রথমেই দেখিল লাবণ্যকে। লাবণ্যকে দেখিয়াই সে দ্বিধা-লেশহীন ভাবে যেন কিছুই হয় নাই এমনিধারা ভঙ্গীতে কহিল—“আজ তিন দিন তোমার গান শুনিনি। গাও বন্যা একটা রবিঠাকুরের গান গাও।”

লাবণ্য কিন্তু এই কথাগুলি অত সহজে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মন কিছু ভারি হইয়াই ছিল। সেও দ্বিধা-লেশহীন ভাবে জবাব দিল কিন্তু কথাগুলি ব্যবহার করিল বেশ ঝাঁঝালো। সে বলিল—“আমার কাছে দুঃখ পেয়েই হয়ত তুমি দুই দিন আসনি কেষ্ট বাবু! কিন্তু একটা কথা তোমাকে মনে রাখতে অনুরোধ করি। দুঃখানুভূতিটা শুধু তোমাদের একচেটে নয়। সময় সময় আমাদেরও দুঃখিত হবার কারণ ঘটতে পারে; এটা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি।”

কেষ্ট বুঝিল এ তাহার অভিমান-পীড়িত অন্তরের কথা। ইহা লইয়া বাদানুবাদ চলে না। তাই সে আরও সহজভাবে জবাব দিল—“বন্যা তোমার গান আমার খুব ভাল লাগে। আর তোমাকে যে আমার কি ভাল লাগে তা বলতে পারিনে। তোমাকে দেখে সত্যিই আমার মনে হয়, তুমি যেন স্বর্গের দেবী।”

লাবণ্য বলিল—“থাক্, থাক আর আমি সহ্য করতে পারব না। আমাদের মন ভোলানর জন্য তোমরা ‘দেবী টেবী’ অনেক কিছু শব্দ ব্যবহার করে থাক ও জানাই আছে। ভুলিয়েভালিয়ে আমাদের একবার হাত করে

তোমরা, তার ইতিহাসটা তো তোমারও জানা আছে আমারও আছে। এমনিতর ছুটো মিষ্টি যে……" ·

কেষ্ট আবেগকম্পিত কণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"তুমি কি বলছো বন্যা? তুমি জাননা বন্যা, কি এক অনন্ত প্রেরণা নিরন্তর ব্যাকুল বলে আমাকে তোমার দিকে আকর্ষণ করছে! তুমি জাননা ভালবাসার কি সে উদ্‌ভ্রান্ত আগ্রহ! সে যেন বন্যার মত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় বন্যা! তার প্রচণ্ড গতিবেগ আমি সহ্য করতে পারিনে। আমি পাগল হয়ে যাই।"

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কেষ্টধনের এইরূপ উক্তির পরেও লাবণ্য অবিচলিত সহজ কণ্ঠে জবাব দিল। সে কহিল—"মনকে কেন চোখ ঠাঁরো কেষ্ট বাবু? তোমার নিজের মনের খাঁটি খবর তুমি আজও জানতে পারনি। যেদিন জানবে সেদিন এই জটিল প্রশ্নের একটা সহজ মীমাংসাও হবে। মোহ আর ভালবাসায় গুলিয়ে এক জিনিষ ভেবে আত্মপ্রবঞ্চনা কোর না।"

কেষ্ট এইবার ধৈর্য হারাইল। সে খপ্ করিয়া লাবণ্যর হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"তুমি অবিশ্বাস করছো কেন বন্যা? আমি হয়ত পাগল……।"

কেষ্ট আর বলিতে পারিল না। লাবণ্য এবারও কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। হাত ছাড়াইবার আগ্রহ দেখাইল না। ধীরে ধীরে বলিল—"আমার চেহারা ভাল লাগে, আমার গান ভাল লাগে, আমাকে তোমার ভাল লাগে কি?"

কেষ্ট অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল। লাবণ্য বাধা দিয়া বলিল—"আরে শোনই না সব কথা! আমার আবাল্য ইতিহাস শুনলে আমাকে ভালবাসার প্রবৃত্তি তোমার আর একটুও অবশিষ্ট থাকবে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

কেষ্ট পূর্ববৎ ব্যস্ত হইয়াই বলিল—"তোমার ইতিহাসটাই আমি শুনবো। তারপর প্রমাণ করবো তোমার ধারণা ভুল।"

"সমগ্র ইতিহাসের প্রয়োজন হবে না। জীবনের একটা বিশিষ্ট ঘটনা বললেই যথেষ্ট হবে।" এই টুকু বলিয়াই একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া লাবণ্য বলিতে আরম্ভ করিল—"তোমরা সভ্য সমাজের অভিজাত বংশের শিক্ষিত সন্তান। সমাজের ভক্ত তোমরা নারীর সম্বন্ধে তোমাদের প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ়প্রতাপ পণ্ডরাজকেও অতিক্রম করে চলে। রক্ষা করার শক্তি তোমাদের নেই। বিচারের ক্ষমতা তোমাদের আছে। ভালবাসা তোমাদের মূলধন নয়। তোমাদের মূলধন সামাজিক সম্মান। কোন কিছুর সঙ্গে তোমরা তার বিনিময় করতে পার না। তোমাদের মুখে ভালবাসার বুলি একটু বেখাপ লাগে।"

কেষ্ট এই সকল কথার কোন অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিয়া শুধু তাহার মুখের দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রইল। লাবণ্য বলিয়া চলিল—"বাবা মুন্‌সেফি চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করার পর আমরা আমাদের বাড়ী যাই। সেখানে বছর দেড়েক কাটানোর পর একদিন সন্ধায় স্নানান্তে পুকুরঘাট থেকে ফিরে আসছি আরও কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে, হঠাৎ কয়েকটি দুর্বৃত্ত বলপ্রয়োগে আমাকে ধরে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। গ্রাম থেকে খানিকটা দূরে মাঠ পর্যন্ত যেতে না যেতে বাবার লোকজন এসে আমার সংজ্ঞাহীন দেহের উদ্ধার সাধন করে। জ্ঞান হলে দেখলাম বহুলোক আমাকে ঘিরে মন্তব্য প্রকাশ করছে। নানাতর্কের পর অপরাধের বিচার শেষ হোল। সবাই একবাক্যে রায় দিলেন আমিই অপরাধী, যবনস্পৃষ্টা কুলটা। পিতার আশ্রয়ে আমার আর থাকা চলবেনা। তবে বিচারকদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত দয়ালু তাঁরা বাবাকে আড়ালে ডেকে গোপনে বললেন—'আপনি যদি হাজার দুই টাকা জরিমানা বাবদ ধরে দিতে পারেন, তা হলে এর একটা বিহিত হতে পারে।' তার উত্তরে বাবা বললেন—'যারা গুণ্ডামী করলো তাদের অপরাধের জরিমানা যদি আমাকেই দিতে হয় তো আমি নারাজ। কাজ কি আমার এ সবে? আমিই ইচ্ছে করে স্বগ্রামে বাস করতে এসেছিলাম, স্বজাতি, সমাজ যদি আমাকে না চায় আমিই আবার আমার কন্যার হাত ধরে যেখানে খুসী চলে যাব।'

এই বলে সেই যে তিনি দেশ ছেড়েছেন আর স্বদেশের নামও করেন নি।”

লাবণ্যর কথাগুলি এতক্ষণ ধরিয়া কেষ্ট যেন গিলিতেছিল। তাহার বুকের মধ্যে ব্যথায়, বেদনায়, সহানুভূতিতে টন্ টন্ করিতে লাগিল। সমাজের বিরুদ্ধে তাহার মন মুহূর্তে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কোনও প্রকার ক্রোধ প্রকাশ করিল না; কারণ তাহার পরমারাধ্যা জননী এই সমাজের মধ্যে বাস করিয়াই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। সহানুভূতির স্বরে সে শুধু বলিল—“কিন্তু এই দুর্ঘটনার জন্য তুমি আদৌ দায়ী নও। তোমার এতে লজ্জা নেই। তোমাকে ভালবাসতে পেলে আমি ধন্য হব।”

লাবণ্য তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—“তার মানে? ভালবাসা আবার সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকে নাকি? সুযোগ পেলেই একপস্‌লা ভালবেসে নেওয়া যায়, আর সুযোগের অভাবে আকাশ পানে হাঁ করে চেয়ে থাকতে হয়? আশ্চর্য্য!”

কেষ্ট একটু অপ্রতিভ হইল, কিন্তু জবাব দিল ব্যস্ত হইয়া—“না, না তা বলছিনে। তবে একটা অধিকার থাকা চাইতো? থাকিবার না—”

“আবার, অধিকার! অধিকার কেউ কাউকে কি হাতে ধরে দিয়ে দিতে পারে? অধিকার নিজের জোরে অর্জন করতে হয়। আর অধিকার মানে তো আধিপত্য বিস্তার? সেই আধিপত্য বিস্তার না করতে পারলেই ভালবাসা যায় না?”

“না, ঠিক তা নয় বন্যা! অধিকার একটা না পেলে যেন স্বস্তি পাইনা। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয় কি যেন আমার বাকি রয়ে গেছে, কি যেন আমি পাইনি। যেটুকু দীপশিখা আমি জেলেছি, কোথাকার কোন্ এক প্রতিকুল দম্‌কা হাওয়া সব আমার মুহূর্তে নিবিয়ে দিয়ে যাবে এই আমার ভয়।”

“হায়, হায়, এত লেখাপড়া শিখেও তুমি আজ এই কথা বল? অস্বস্তি যদি বল, আর বাইরের বস্তু দিয়েই যদি সেই অস্বস্তির খাদটা ভরাতে চাও, তা হলে জেনে রাখ চির অস্বস্তিই মানবমনের চিরন্তন সত্য। আমাকে পেলেই কি তোমার এই অস্বস্তি মিটবে? মিটবে না। যে দিন তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে পাবে সেদিনই আর এক নতুনতর বন্যার জন্য হাতদুখানি তোমার অনন্ত আগ্রহে সম্মুখের দিকে প্রসারিত হয়েই থাকবে। মনে হবে ঠিক যেন এ তুমি চাওনি, যা চেয়েছ তা পাওনি। ঐ অনন্তপ্রসারিত উন্মুক্ত আকাশ পানে চেয়ে বুকের মধ্যে তোমার খাঁ খাঁ করবে।”

এই সমস্ত কথায় কেষ্ট হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারিল না। নীরবে তীব্র দৃষ্টিতে লাবণ্যর দিকে তাকাইয়া রহিল। লাবণ্য আবার বলিয়া চলিল—“আমাকে পাওয়া যেদিন তোমার শেষ হয়ে যাবে, যৌবন-প্রভাতে যে লজ্জাকর ঘৃণ্যকাহিনীর দুরপনেয় কলঙ্ক আমার জীবনের সঙ্গে চির চিহ্নিত হয়ে গেছে, সেই কালো দাগ জল-জল করে তোমার সম্মুখে ভাসতে থাকবে। আর তা ছাড়া সব দৃষ্টির অন্তরালে আমার অন্তরে তোমার অবহেলার মাঝে কাটা হয়ে সে ফুটবেই। যাকে ভালবাসি তাকে এত বড় ফাঁকি দেব কোন্ সাহসে? এ জগতে আমি তোমার সব চেয়ে আপনার জন—সব চেয়ে বড় বন্ধু। স্ত্রী নাই বা হলাম। স্ত্রীত্বের চেয়ে এর দাম কম কি?”

কেষ্ট বিমর্ষভাবে বলিল—“কেউ সে কথা স্বীকার করবে না। লোকে তা মানবে না। আমাদের অন্তরের ভালবাসার কথা চিন্তা করে কেউ আমাদের ক্ষমা করবে না। বরঞ্চ এইখানেই তাদের কটাক্ষ সবচেয়ে তীব্র হয়ে উঠ্‌বে। আর সকলের তীব্র কটাক্ষে আমাদের সম্বন্ধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।”

লাবণ্য অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দিল—“লোকে না মানুক তুমি তো মানবে। আমি তো মানবো। যিনি সর্ব-নিয়ন্তা তিনি তো মানবেন। এ সম্বন্ধ যেখানে থাকবে মানুষের কটাক্ষ সেখানে পৌছোবেনা। তুমি একটু স্থির ভাবে চিন্তা করে দেখ কেষ্ট বাবু, মানবমনের এই ভালবাসার সম্বন্ধই সব চেয়ে সত্য সম্বন্ধ। এর চেয়ে বড় সম্বন্ধ আজও সৃষ্টি হয়নি। এই মহাসত্য বিশ্বাস কর।”

কেষ্ট বলিল—"সবচেয়ে সত্য হতে পারে কিন্তু সবচেয়ে কঠোর সম্বন্ধ।" এই বলিয়া কেষ্ট থামিল। আরও খানিকটা বক্তৃতা প্রসব করিয়া লাবণ্যর কণ্ঠও নীরব হইল। কিন্তু কেষ্টর মনের সংশয় আর ঘুচিতে চাহেনা। তাহার মন বারংবার প্রশ্ন করিয়া ফিরিতে লাগিল—এই কি সত্য, এই কি চিরস্থায়ী, এই কি সকলের বড় সম্বন্ধ। না, না, না, তা হইতেই পারে না। কোন বাহ্য বস্তুকে আশ্রয় না করিয়া ভালবাসা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কবি বলিয়াছেন—"নিরাশ্রয় স্মৃতিলতা বেঁচে নাহি রবে বাতাসেরে ঘিরে।"

বাসায় ফিরিয়া কেষ্ট দেখিল টেবিলের উপর খামের চিঠি পড়িয়া আছে। হস্তাক্ষর রমেণের। খুলিয়া দেখিল—কলিকাতায় একটি নূতন বৈদেশিক ব্যাঙ্কে তাহার চাকরী রমেণ ঠিক করিয়াছে। বেতন আপাতত ১৫০৲। পরে বেশী হইতে পারে। সাত দিনের মধ্যে কাজে যোগদান করিতে হইবে। পত্র পড়িয়া একদিকে সে যেমন আনন্দ অনুভব করিল, অন্যদিকে তেমনি একটা দুঃসহ বেদনার গ্লানি কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল এই জন্যই জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া সে নিষ্ঠুর অদৃষ্টের সঙ্গে অক্লান্ত যুদ্ধ করিয়াছে। বাঙালী জীবনের চির অভীপ্সিত সেই চাকরী আজ অযাচিত ভাবে তাহার সম্মুখে। তাহাকে উপেক্ষা করিবে আজ সে কোন্ মহামূল্য বস্তুর বিনিময়ে? সে দরিদ্র! জীবনের আনন্দ উপভোগের শক্তি তাহার কোথায়? সে যাহাদের আছে, তাহারা দুইটি উদরান্নের জন্য দাসত্ব-বৃত্তির দুরাকাঙ্ক্ষায় জীবনের সমস্ত সুখসম্ভোগ, সম্মান, আত্মাভিমান বিসর্জন দিয়া প্রভুর অনুগ্রহপ্রসূত দয়াদৃষ্টির পানে চাহিয়া থাকেনা। না, আর লাবণ্য নয়। শত লাবণ্য একদিকে আর চাকরী একদিকে। তৎক্ষণাৎ সে লাবণ্যদের বাড়ীতে গেল। চাকরীর সংবাদ দিয়া প্রথমে লাবণ্যর পিতা এবং পিসির নিকট হইতে বিদায় নিল। বৃদ্ধ চাকরীর সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বিদায় দিতে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তবে কেষ্টর নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে নিয়মিত পত্র লিখিবে কলিকাতায় যাইয়া।

লাবণ্যর ঘরে গিয়া দেখিল লাবণ্য বিছানার উপর মুখ গুজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। পত্রখানা লাবণ্যর দিকে ছুড়িয়া দিয়া সে কহিল—"বন্যা এই রমেণের পত্র। আমি চাকরী পেয়েছি। আমাকে আজই রওনা হতে হবে। কি করি বল?"

লাবণ্য গাম্ভীর্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া জবাব দিল—"কি করবে? তুমি যাবে। চাকরী উপেক্ষা করা চলে না।"

এই উদাসীন উত্তরে কেষ্ট দারুণ আঘাত পাইল। তাহার বিস্ময়ও সীমা অতিক্রম করিল। অসহ্য বেদনায় তাহার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ী পিটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ সে প্রত্যুত্তর দিতে পারিল না। তারপর ধীরে ধীরে বলিল—"ভাবছি আজই রওনা হব।"

উত্তর পাইল—"আবশ্যক হলে তাই করতে হবে। চাকরীর বাজার দুরূহ। লাবণ্যদের সংখ্যা অনেক। কাজেই সুলভের জন্য দুর্লভকে উপেক্ষা করা অন্যায়।"

কেষ্টধনের সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে আগুন্ত একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাস বলিয়াই মনে হইল। সেখানে দাঁড়াইয়া বাদানুবাদের প্রবৃত্তি তাহার আর রহিল না। দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছিল অস্পষ্ট স্বরে তাহার কানে আসিয়া বাজিল—"কেষ্ট বাবু!" দুর্বল অন্তর আবার তাহাকে সেইখানে ফিরাইয়া আনিল। দেখিল লাবণ্য উপুড় হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতেছে। কান্নার অবরুদ্ধ আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। কেষ্ট অবিলম্বে তাহাকে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেই সে বলিয়া উঠিল—"তুমি যাও কেষ্ট বাবু! তোমাকে বলার কিছু নেই। বিয়েটাই তোমরা ভালবাসার সম্বন্ধের নিকষ-পাথর ভেবে রেখেছ। তোমার সঙ্গে বিয়ে আমার হতেই পারে না তার অনেক কারণ। কিন্তু তোমাকে দেখেই আমি ভালবাসতে শিখেছিলাম, তাই মনে আমার অবিচলিত আশা ছিল। যেখানেই থাকি, যাই কেন না করি, যারই স্ত্রী হই, তোমাকে আমি ভুলবো না। তুমি আমার সর্বাগ্রে। কিন্তু তোমার

মুখে এই প্রথম শুনলাম বিয়ে ছাড়া ভালবাসার অধিকার থাকে না। তুমি আমার সর্বনাশ করেছ।" তাহার স্বর রুক্ষ কর্কশ—কেষ্টর গায়ে যেন তীরের মত আসিয়া বিঁধিল।

কেষ্টও এবার একটু রূঢ় ভাষাতেই জবাব দিল—"আর তুমি আমার শেষ সর্বনাশ করেছ বন্যা। আমি হয়ত আর বিয়েই করবো না, হয়ত আমি তোমারই জন্য শেষ দিন পর্যন্ত কেঁদে মরবো। কিন্তু সংস্কারের মহিমায় আবদ্ধ তোমরা। তোমরা কি পার একটা নিঃসম্পর্কীয় ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে? একটা মাসও তুমি তোমার মনের মধ্যে একে ধরে রাখতে পারবে না। তোমার মনের এই ভালবাসার বিরাট্ পরিমণ্ডল তোমার সংস্কারের যমদূতগুলো নিশ্চিহ্ন করে, বেদখল করবে তারপর তোমার বিয়ের মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ঘাড় ধরে নির্বাসিত করে দেবে।"

*	*	*	*

চাকরীতে যোগদান করিয়া কেষ্ট প্রথমে পত্র লিখিল মাকে। তারপর লিখিল লাবণ্যকে। লাবণ্য সে পত্রের উত্তরে লিখিল—

শ্রীতিভাজনেষু—

কেষ্ট বাবু!

তোমার যাবার দিনটি মনে পড়ে। ভাবি, অমন সুন্দর ছিল যার আরম্ভ তার এমন পরিসমাপ্তি কি করে হোল! তুমি হয়ত ভেবে গেলে বিদায়ের মুহূর্তেও যার মুখ দিয়ে কটু কথা ছাড়া বেরোলো না, তাকে বলার আছেই বা কি? আমার অন্তরের বেদনাকে ছাড়িয়ে আমার সৌজন্য সেদিন উঠতে পারেনি, তাই কি ভেবে গেলে আমি নিষ্ঠুর? তাই কি আগাগোড়া সমস্ত জিনিষটাই একটা অভিনয় ভেবে গেলে? দেখ আমি আর যাই হই, ভালবাসার ফাঁকি আমার মধ্যে নেই। অন্তরের সরল সত্য ব্যক্ত করতে গিয়ে যদি তোমার কাছে অপরাধ করে থাকি, তার জন্য ক্ষমা চাই।

কিন্তু তুমি? তুমি অমন কঠিন সেদিন হলে কোন্ জোরে? মানুষের পরিচয়ের দাম কি এই? জীবনের পথে কত সহস্র লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, সে পরিচয় আবার যায় ভেঙ্গে, তাতে কারুরই কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয়—অন্তরের সঙ্গে অন্তরের পরিচয়—ঘটে শুধু একজনের সঙ্গে। সে পরিচয় ভেঙ্গে যাবার দিন যেদিন আসে সেদিন? সেদিন যে বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে টান পড়ে হৃদয়ের অন্ধ্রে-রন্ধ্রে। হৃদয়ের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু সেদিন হাহাকার করে জানাতে থাকে সেই শোকের সংবাদ। তাই বলি, ভুল বুঝো না। তুমি যদি ভুল বোঝ সে ব্যথা রাখবার ঠাঁই নেই। তুমি আমার এ জগতের শ্রেষ্ঠ বন্ধু—একান্ত আপনার জন। তোমারি চেহারা মনের গহনে নিতান্ত সংগোপনে আজও আমি প্রহরীর মত পাহারা দিয়ে নিয়ে বেড়াই। তার গায়ে একটুকু আঁচড় লাগেনি। ইতি—বন্যা।

এদিকে মায়ের চিঠির জবাব না পাইয়া কেষ্ট উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তিন দিন ছুটি লইয়া সে বাড়ীর দিকে রওনা হইয়া গেল। উঠানে পা দিয়াই দেখিল বাড়ীতে একটু সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। সোনাবৌ, ফটিকের মা, গোপালের ঠাকুরদা প্রভৃতি গ্রামস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এবং জন চারেক যুবক মিলিয়া একটি মুমূর্ষু রোগীকে লইয়া শুধু হৈ চৈ করিতেছে। কেষ্টকে দেখিয়া এক বাক্যে সবাই বলিয়া উঠিল—"ঐ কেষ্ট এসেছে, ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছেন।" মায়ের রোগজীর্ণ চেহারা দেখিয়া কেষ্টর বাক্-শক্তি রহিত হইয়া গেল। একটু সামলাইয়া সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—"মা"—। ভগবানের কি আশ্চর্য করুণা! পুত্রের সেই আন্তরিক 'মা' ডাক মুমূর্ষু জননীর নিঃসাড় কর্ণে প্রবেশ করিল। মুহূর্তের জন্য তিনি সজাগ হইয়া উঠিলেন। ক্ষীণ ভগ্ন কণ্ঠে জোর করিয়া বলিতে চেষ্টা করিলেন—"ওই! ওই এসেছে আমার কেষ্টধন। মুখুয্যে মশাই! আমি তো বলেছিলাম আমি আজও তু—ল—সী—ই—ই।" আর বলিতে পারিলেন না—বাক্‌শক্তি তাঁহার চিররুদ্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে কেষ্টর হৃদয়-বিদারক মর্মন্তুদ হাহাকারের ভিতর দিয়া মুখুয্যে মশায়ের সকল দেনা পরিশোধের দায়িত্ব তাহারই মাথায় চাপাইয়া মা অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

পৃথিবীর সমস্ত আলোকরশ্মি কেষ্টর চোখের সম্মুখে কে যেন লেপিয়া মুছিয়া দিয়া গেল, রহিল শুধু দিগন্ত-বিস্তৃত সীমাহীন অন্ধকার। আর সেই অনন্ত অন্ধকার-সমুদ্রে সে একাকী হাবুডুবু খাইয়া কিনারা খুঁজিয়া মরিতে লাগিল। আশ্রয়ের জন্য যেদিকে হাত বাড়ায় দুরন্ত অন্ধকার-সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ তাহাকে সেই দিকে গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসে।

মুখুয্যে মশাই, গোপেনের ঠাকুরদা, ফটিকের পিসি এমন কি ওপাড়ার নিতাই সাধুর্খা প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত থাকিয়া কেষ্টকে নানা প্রকারে আশ্বাস দিবার পর জানাইলেন, যে সে মায়ের একমাত্র সক্ষম পুত্র; তাহার স্নেহময়ী জননীর একবারের অধিক মৃত্যু হইবে না। কাজেই তাঁহার শ্রদ্ধাদি কার্যে কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। কেষ্ট যদি শোকে মুহ্যমান হইয়া থাকে তো এ সকল কে করিবে? মুখুয্যে মশাই এ পর্যন্ত আশ্বাস দিলেন যে টাকার জন্য আট্‌কাইবেনা। মোটাসুদে হ্যাণ্ডনোট্ কাটিলে যত টাকা লাগে তিনিই দিবেন। চাকরী যখন হইয়াছে তখন আর টাকার ভয় কি? ব্রাহ্মণ-ভোজন এবং ব্রাহ্মণে দানধ্যান ইত্যাদি কার্য স্বচ্ছলতার সঙ্গে করাই ভাল।

কেষ্টর বেদনার শেষ না হইতেই ছুটির শেষ হইল। সে অবিলম্বে যাইয়া কাজে যোগ দিল। রমেণের পিতা তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন, শ্রাদ্ধাদি কার্যের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনিই বহন করিলেন। সমস্তই যথানিয়মে চলিতে লাগিল। দিনও কাটিতে লাগিল। লাবণ্যর পত্রের সে জবাব দিয়াছিল। তাহার মধ্যে তাহার মায়ের মৃত্যুসংবাদ পর্যন্ত ছিল। অথচ এই এত কালান্তরেও লাবণ্যর নিকট হইতে প্রত্যুত্তর পাইল না। বাহিরে সে খুব ছট্‌ফট্ করেনা বটে। কিন্তু গোপন অন্তর তাহার নিরন্তর ব্যাকুল আগ্রহে লাবণ্যর পত্রের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। লাবণ্যকে সে কিছুতেই ভুলিতে পারেনা। একটা একটানা চাপা ব্যথার ফল্গুধারা অহর্নিশি তাহার অন্তরে বহিয়া চলিয়াছে। বাহিরে তাহাকে সামান্য বিমর্ষ মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে। কিন্তু কেহ ঠিক করিয়া জানিতে পারিল না যে, লাবণ্যবিচ্ছেদব্যথায় তাহার সমস্ত অন্তর আজ পরিপূর্ণ!

সেবারে বড় দিনের ছুটিতে রমেণরা সকলেই গেলেন কাশীতে। কেষ্টও গেল তাঁহাদের সঙ্গে। কেষ্টর নির্লিপ্ত ব্যথিত ভাব দেখিয়া তাঁহারা মনে করেন, কেষ্ট মাতৃশোক আজও ভুলিতে পারে নাই। প্রায়ই সে একাকী গঙ্গার ঘাটে বসিয়া কাটায়। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে বসিয়া আছে বহুজন-কোলাহলমুখর কাশীর "দশাশ্বমেধ ঘাটে"। দিবসের ক্লান্ত সূর্য্য তখনও পশ্চিম আকাশে ডুবি-ডুবি করিতেছে। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর শুভ্র জলধারা তীরস্থ ছোট বড় ঘাটগুলির পাদদেশ বিধৌত করিয়া বিগলিত রজতধারার মত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। তারই অনতিপ্রশস্ত নিটোল বক্ষের উপর কত শত ব্যস্ত তরী সাদাপাল তুলিয়া খর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। দুগ্ধ-ফেনিল ভাগীরথীর এই শুভ্র বারিরাশির উপর অস্তগমনোন্মুখ স্তিমিত সূর্যের ক্ষীণালোকপাতে এক অপূর্ব শোভার সৃষ্টি হইয়াছে। কেষ্ট নিমগ্ন চিত্তে এই শোভাই দেখিতেছিল। অতীতের কত কথাই না আজ তাহার মনে পরিল। মনে পড়িল তাহার বাল্যজীবন, স্কুল-গৃহ, কলেজ-উদ্যান, খেলার মাঠ, ইউনিভার্সিটির বৃহৎ অট্টালিকা, আর মনে পড়িল মায়ের আজীবন দুঃখ-ভোগ—চাকরীর জন্য অসংখ্য কাতর অনুরোধ এবং সর্বোপরি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল লাবণ্যর সেই অশ্রুভারাক্রান্ত করুণ আঁখি। ইহারই মধ্যে অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টি গিয়া পড়িল নীচের ঐ প্রকাণ্ড ভিড়ের দিকে। সবিস্ময়ে দেখিল একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা তরুণীর নিষ্প্রভ করুণ আঁখি দুইটি তাহারই দিকে নিবদ্ধ হইয়া আছে। একটা প্রমত্ত আবেগের ঝড় তাহার সারা দেহটার উপর দিয়া বিক্রম প্রকাশ করিয়া গেল। বিবেক-বুদ্ধিহারা হইয়া 'বন্যা' বলিয়া চীৎকার করিয়া সে সেইদিকে অগ্রসর হইল। চকিতা হরিণীর মত তড়াক্ করিয়া পিছাইয়া গিয়া লাবণ্য বলিল—"আপনি কি করছেন কেষ্টবাবু! আমি যে বিবাহিতা। ঐ যে আমার স্বামী।" এই বলিয়া সে ঘাটের দিকে তাহার তর্জনী সবেগে আন্দোলিত করিয়া দিল।

কেষ্ট একবার অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিল—"বিবাহিতা?" তারপর কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে পড়িয়া গেল। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিল বহুলোকে তাহাকে ধরিয়া তাহারি কাপড়ের একাংশ ছিঁড়িয়া তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছে। কেষ্টর সদ্যচেতনালব্ধ সচকিত দৃষ্টি সেই ভিড়টাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু বন্যার চিহ্ন পর্য্যন্ত সেখানে দেখিতে পাইল না; বরঞ্চ মনে হইল গঙ্গার বিক্ষোভিত বারিরাশি উদ্বেলিত গতিভঙ্গীতে বন্যার বেগে তাহাকে গ্রাস করিতে ধাইয়া আসিতেছে!

তুলসী-সপ্তশতিকা

শ্রীরামচরণ দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৪৯)

চন্দ্ররমণী ভজ গুণ সহিত সমুঝি অন্ত অনুরাগ।
তুলসী যো অহ বণি চারৈ তৌ তব পুরণ ভাগ॥

চন্দ্রের রমণী　　　অনুরাধা তার
তৃতীয় বরণ কর গ্রহণ;
প্রেম অন্ত্য বর্ণ　　　সংযোগে ভজহ
তুলসি! হইবে ভাগ্য পূরণ।

(৫০)

যিনকে হরিবাহন নহি দধিসুতসুত যেহিঁ নাহি।
তুলসী তে নর তুচ্ছ হৈ বিনা সমীর উড়াহি॥

মনেতে যাহার　　　গুরুত্ব না থাকে
বুদ্ধি নাহি থাকে যার মানসে;
কহিছে তুলসী　　　সেই তুচ্ছ নর
উড়ে' যায় সদা বিনা বাতাসে।

(৫১)

রবি চঞ্চল অরু ব্রহ্ম দ্রব বীচ সবাস বিচারি।
তুলসীদাস আসন করে জনকসুতা উরধারী॥

লোলার্কের ঘাট,　　　আর বিষ্ণুপদী
তার মাঝে নিজস্থান বিচারি,
এ তুলসীদাস,　　　করেছে আসন,
জনকসুতারে হৃদয়ে ধরি।

(৫২)

বন বনিতা দৃগকোপমা যুক্ত করু সহিত বিবেক।
অন্ত আদি তুলসী ভজহুঁ পরহরি মনকর টেক॥

নারা তার অন্ত　　　মৎস্য তার আদি
যুক্ত করহ সহিত বিবেক;
ভজহ তুলসী　　　সতত সে নাম
পরিত্যাগ করি মনের টেক।

(৫৩)

উর্ব্বী অন্ত হুঁ আদি যুত কুলশোভা কমলাদি।
কৈ বিপর্য্য ঐ সেহি ভজহুঁ তুলসী শমন বিষাদ॥

ধরার, মহীর　　　অন্ত আদি যুত
শীল তামরস আদি মিলন;
বিপর্যয় কিংবা　　　ঐ রূপে ভজ,
হবে সর্ববিধ ক্লেশ-শমন।

(৫৪)

তৌ হোহি কহুঁ সব কো সুখদ কবহি কহা তব পাঁচ।
হরব তৃতীয় বারিজবরণ তজব তিনি সুনু সাঁচ॥

তামরস তার　　　তৃতীয় ছাড়িয়া
অবশিষ্ট যাহা ত্যজ যতনে;
নিশ্চয় জানিবে　　　তাহারে ছাড়িলে,
কি করিবে তব ইন্দ্রিয়গণে।

(৫৫)

তজহুঁ সদা শুভ আশ অরি ভজু সুমনস অরিকাল।
সজুমত ঈশ অবন্তিকা তুলসী বিমল বিশাল॥

শুভ আশ অরি সতত ত্যজহ
ভজ সুমনস অরির কাল;
এই অবন্তিকা- ঈশ মতে চল
তুলসী! ইহা বিমল বিশাল।

(৫৬)

এত বংশ বর বরণ যুগ সেত জগত সরী জান।
চেত সহিত সুমিরণ করত হরত সকল অঘখান॥

সূর্য্যবংশ বর বরণ যুগল
ভব-সরিতার সেতু জানিবে;
চেতনার সহ স্মরণ করিলে
সকল পাপের বিনাশ হবে।

(৫৭)

মৈত্রী বরণ য কার কো সহ স্বর আদি বিচার।
পঞ্চ বর্গহি যুত সহিত তুলসী তাহি সঁভার॥

য কারের মৈত্রী র বর্ণের সহ
আদি স্বর দিয়া কর বিচার;
প বর্গ পঞ্চম যুত করি তাহে
তুলসী, ভরসা রাখ তাহার।

(৫৮)

হল, ঞ ম মধ্য সমান যুত যাতে অধিক ন আন।
তুলসী তাহি বিসারি শঠ ভরমত ফিরত ভুলান॥

হল, ঞম, মধ্যে, দুই বর্ণ লয়ে
তার মধ্যে যুক্ত কর অকার,
রে শঠ তুলসী, তাহারে ভুলিয়া
কেবল ভ্রমেতে ভ্রম সংসার।

(৫৯)

কৌন জাতি সীতা সতী? কৌ দুঃখদা কটুবাম?
কো কহিয়ে শশিকর দুঃখদ? সুখদায়ক কো? রাম॥

কেবা সতী? সীতা, কেবা দুঃখপ্রদা
এসংসারে? কটুবাদিনী বাম;
চক্রবাক—বল কাহার হৃদয়
দহে শশী? কেবাসুখদ? রাম।

(৬০)

কো শঙ্কর গুরু? বাগবর; শিবহর কো? অভিমান
করতা কো? অজ, জগত কো ভরতা বেগ? হরিজান

কি কল্যাণকর? গুরুর বচন,
কিবা কল্যাণহর? অভিমান;
জগতের কর্ত্তা কে বা হয়? অজ;
জগতের ভর্ত্তা কে? হরি জান।

(৬১)

স্বর শ্রেয়স রাজীব গুণ করুতেহিঁ দিঠ পহিচান।
পঞ্চ পবর্গহি যুত সহিত তুলসী তাহি সমান॥

তামরস তার তৃতীয় বরণ
তাহে যোগকর অকার স্বর;
পবর্গ পঞ্চম, মিলন করিয়া
তুলসী! সপ্রীতি ভজন কর।

(৬২)

হোত হরষ কাপায়? ধন; বিপতি তজে কা? ধাম।
দুঃখদা কুমতি কুনারীতর অতিসুখদায়ক রাম॥

কি পেলে হরষ? ধন; কি বিপদ্?
ছাড়িয়া যাইতে হইলে ধাম;
অত্যন্ত দুঃখদ কে? কুরমণী
অতি সুখদাতা কে? শ্রীরাম

(৬৩)

বীর কৌন? সহমদনশর ধীর করস্ত রতরাম।
কজন ক্রুর? হরিপদ বিমুখ; কো কামী? বশবাম॥

কেবা বীর? কাম- শরসহ যেই;
কেবা ধীর? যেই শ্রীরামে রত;
ক্রূর কেবা? হরি- চরণ বিমুখ;
কেবা কামী? নারী চরণগত।

(৬৪)

কারণ কো কং জীব কো খং গুণ কহ সবকোয়।
জাবত বেগ তুলসী কহত সো পুনি অবরণ হোয়॥

জীবের কারণ কামনা কেবল
কামে সীমাহীন সসীম হয়;
তাঁরে কেবা জানে কহিছে তুলসী
যে জানে সে ছাড়া অপর নয়।

ক্রমশঃ

হৃদয়-চাঁদ

শ্রীবলাইচাঁদ আঢ্য

(আর) ভয় কেন মন করিস্ অকারণ
ও তাঁর চরণচাঁদ উঠেছে আকাশে।
অবহিত হয়ে কান পেতে শোন,
এসেছে ওই আশার বাণী বাতাসে॥
চেয়ে দেখ ওই মেঘ নাহি আর,
মিছে যত ব্যথা, শোক হাহাকার,—
নীলাকাশ হতে সহস্র ধার
হৃদয় চাঁদের করুণা-কিরণ নেমে আসে॥
(যদি) ভয়েতে বিহ্বল হইয়ে থাক মন,
দূরে ফেলে দিয়ে মোহ-আবরণ,
জ্ঞান-নয়নে কর দরশন
কি মধুর জ্যোতিঃ পরকাশে—
(সেই জ্যোতিঃ হেরি,
ভবভয়-হারী শ্রীহরি-চরণ-জ্যোতিঃ হেরি,
ত্রিতাপ শান্তিকারণ, শমন-নিবারণ,
কোটী ইন্দু-লাঞ্ছন চরণ-জ্যোতিঃ হেরি,
হরি হে তোমারি)
শেষের সে দিনে শমন পলাবে তরাসে।

স্বর্গীয় কানাইলাল চন্দ্র

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

গ্রন্থকার কানাইলাল বাবুর মতে—"ভক্ত তাঁহার (অর্থাৎ ভগবানের) কিঞ্চিৎ বিশেষ কৃপাপাত্র ও ভক্তিমিশ্রিত না হইলে যোগসাধন হইতে পারে না।" (পৃঃ ১৫) এই উক্তির সমর্থন-কল্পে তিনি বলিতেছেন—"যোগীরা নিয়মাবলী অনুসারে তাঁহাকে ভাবনা ও প্রাণায়ামের দ্বারা মূলাধার হইতে সহস্রাধারে লইবার চেষ্টা করিতে থাকেন; কিন্তু এই প্রকরণে অনেকের এমত ভ্রম উপস্থিত হয় যে, তাহারা আত্মার সহিত ভগবান্‌কে সমজ্ঞান করে সুতরাং বিস্মৃত হইয়া যায় যে, সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এক বৃহৎ অগ্নিরাশি ও আমাদিগের আত্মা এক কণা মাত্র। যদিও 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান, বেদ, ও শাস্ত্রসম্মত ভেদাভেদ আছে, তাহা সতত ধারণা রাখিতে হইবেক।" (পৃঃ ১৫) গ্রন্থকার ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের মধ্যে যে পার্থক্য দেখাইতেছেন, তাহা যে কতদূর যুক্তিসিদ্ধ ও সঙ্গত তাহা বলা কঠিন। ভক্তি-সাধনার শেষে যে আনন্দলাভ হয়, জ্ঞান-সাধনার সম্প্রাপ্তি-শেষে যে সে আনন্দ পাওয়া যায় না, তাহাই বা কিরূপে বলা যায়? সাধনার পথ দুইটি বিভিন্ন হইলেও, শেষে উভয় পথের পথিকই একই স্থানে সমুপস্থিত হন। তবে জ্ঞান-সাধনার পথ কঠিন এবং ভক্তি-সাধনার পথ সরল। পার্থক্য এইখানে।

ভক্ত কিরূপ অহঙ্কারশূন্য, দীন, সহগুণশালী ও অক্রোধী হয়, তাঁহাদের ক্ষমাশীল ও মাৎসর্যবিহীন ভাব

দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের দুই প্রধান ভক্ত এবং মহা পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহারা এত মাৎসর্যবিহীন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন যে, যখন দ্রাবিড়ের একজন পণ্ডিত আসিয়া তাঁহাদের সহিত বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদিও জ্ঞাত ছিলেন যে সেই পণ্ডিত কোন মতে তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন, তত্রাচ পরাভবপত্রে তাঁহারা স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু যখন ঐ ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ঐ পত্র দেখাইলেন, তখন জীব তাঁহার সহিত বিচার করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাপার শ্রীরূপের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি কহিলেন যে, ভক্তের এ ধর্ম নহে ও জীব এখনও শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবার যোগ্য পাত্র হন নাই।" পৃঃ ১৯

গ্রন্থশেষে কানাইলাল বাবু ভক্ত ও যোগী উভয়ের তুলনা করিয়া লিখিতেছেন—"ভক্তের ও যোগীর মন যে সমভাব নহে, তাহার ভূরি ভূরি স্থানে প্রমাণ আছে। ফলতঃ ভক্তের মন অতি দীন; যেমন সাধারণ জমি হইতে নিম্ন জমি খাদ বলিয়া বোধ হয়, তেমনি ভক্তের মন, সাধারণ মন অপেক্ষা নিম্ন;—এবং ঐ নিম্ন জমিতে কখন যদি জলপ্রবাহ আসে তবে ঐ খাদ জমি হইতে বন্যার জল যেমন সম্পূর্ণরূপে নির্গত হয় না, সেইরূপ ভগবৎকৃপা-বন্যা, সময়ে সময়ে উপস্থিত হইলে কেবল ভক্ত দীনদিগের মনে ঐ কৃপার অবশিষ্ট ভাগ অবস্থিত থাকে। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, যদিও কর্মফলে জীব সুখ ও দুঃখ ভোগ করে বটে, তথাপি ভগবদ্ ভক্ত তাঁহার বিশেষ কৃপা পাত্র।" পৃঃ ২১-২২

"ভক্তিযোগে ভগবান্ এতাদৃশ বশ যে, বিধিপূর্বক কর্ম না হইলেও কর্ম সফল। যে সকল কর্মকাণ্ড কেবল ভক্তির উদ্দেশে করা হয়, তাহার কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।......

কোন সময়ে এক মূঢ় ব্যক্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমস্তই অশুদ্ধ পাঠ করিতেছিল, কিন্তু পাঠ করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যদেব দৈবাৎ সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, এবং এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি পাঠ করিতে করিতে অশ্রুপাত করিতেছ কেন? সে ব্যক্তি কহিল যে, যদিও আমি উত্তমরূপে শিক্ষা পাই নাই, কিন্তু পাঠ করিবার সময় আমার বোধ হয় যেন অর্জুন মহাশয়ের রথ ও সারথী আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি অহরহঃ দর্শন করিতেছি। এই ব্যাপারে আমার মনকে ভক্তির শক্তিতে বিহ্বল করিয়া অস্থির করে ও আমার জ্ঞান প্রায় শূন্য হইয়া যায়। আমার যে তখন কি অবস্থা হয়, তাহা আমি কহিতে পারি না। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে সাধুবাদ করিলেন, এবং কহিলেন যে তোমারই পাঠ সার্থক, তুমিই ধন্য ধন্য ধন্য।" পৃঃ ২২-২৩

বর্তমানে শ্রীচৈতন্যদেবপ্রবর্তিত নাম-সংকীর্তন দ্বারা ভগবানের উপাসনা করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য—ইহা গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে নানা প্রমাণ ও বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পিতৃস্মৃতি

"পিতৃস্মৃতি অর্থাৎ পরমভাগবত পিতা ৺কানাইলাল চন্দ্র মহাশয়ের প্রণীত ভক্তিগ্রন্থ।" তাঁহার পুত্র শ্রীপূর্ণচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীনদেরচাঁদ চন্দ্র ও শ্রীগোলোকচাঁদ চন্দ্র কর্তৃক ১৯১২ খৃষ্টাব্দে (বাং ১৩১৮ সাল, কার্তিক মাস) প্রকাশিত হয়।

এ পুস্তকখানিতেও মূল্যের কোন উল্লেখ নাই। ইহাও সম্ভবতঃ বিতরণের জন্য প্রকাশিত হয়। ডিমাই ১৬ পেজী আকারে ২৬০ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত। সুন্দর কাপড়ের বাঁধাই। ৫৮ ও ১২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা মেসার্স এস্ সি আঢ্য এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থমধ্যে পুত্রত্রয় লিখিত একটি 'পূর্বাভাষ' ও কানাইলাল বাবুর লিখিত একটি ভূমিকা আছে। আমরা এখানে "পূর্বাভাষটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"আমাদের পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺কানাইলাল চন্দ্র

তারিখে স্বধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার পবিত্র স্মৃতিই এক্ষণে আমাদের একমাত্র আশ্বাসের সামগ্রী। আমরা তাঁহার অনুপযুক্ত পুত্র, তাঁহার আচরিত একটি ভক্তির অনুষ্ঠানও তাঁহার মত সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার সেই ভক্তিপূত মূর্তি ও অকপট ভক্তি-সাধনের কথা যখনই স্মরণ করি, তখনই অতি মাত্র আনন্দে অভিভূত হই।

যাঁহারা ভগবানের একান্ত ভক্ত, তাঁহারা কখনও কামীর মত একা একা কোন সামগ্রী উপভোগ করিতে পারেন না। তাই আমাদের মহনীয় চরিত্র পিতৃদেব সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রব্যাখ্যাতা শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিতগণের মুখে যে সকল অমূল্য উপদেশ লাভ করিতেন, তাহাই সর্বসাধারণকে জানাইবার জন্য বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে যত্নবান্ হইতেন। তিনি ইহ সংসারে থাকিতে থাকিতেই এই যত্নের ফল দুইখানি গ্রন্থ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থ দুইখানির একখানি 'নিত্যলীলাস্থাপন' এবং অপরখানি 'জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ'। গ্রন্থ দুইখানিই ভক্তজনের চিত্তবিনোদনে এবং অবিশ্বাসীর অন্তরে বিশ্বাস-বীজ বপনে সম্পূর্ণ সমর্থ। তাঁহার অবশিষ্ট রচনা যাহা তিনি স্বয়ং প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই এবং শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন আশানুরূপ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেইগুলিই 'পিতৃস্মৃতি' নাম দিয়া আমরা প্রকাশ করিলাম। আশা আছে, তাঁহার পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থ দুইখানির মত এই গ্রন্থখানিও সাধারণের আনন্দবর্ধনে এবং হিতসাধনে সমর্থ হইবে।

এই পবিত্র গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধব যাঁহারা আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি, আর পাঠকবর্গের সমীপে সবিনয় প্রার্থনা, তাঁহারা যদি এই গ্রন্থপাঠে কিঞ্চিন্মাত্রও উপকৃত হন, তবে তাহার বিনিময়ে এ অধম-দিগকে এই আশীর্বাদ করিবেন, যেন সেই প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃদেবের -পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে

নিম্নলিখিত সাতটি অধ্যায়ে গ্রন্থখানি বিভক্ত :—

১। মঙ্গলাচরণ (শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ)	...	১—৬ পৃষ্ঠা
২। ব্রহ্মমোহন (এইখান হইতে 'পিতৃস্মৃতি' আরম্ভ)	...	১—৮ "
৩। ব্রহ্মার স্তব	...	৯—৭৩ "
৪। দশম স্কন্ধ ১ম অধ্যায় (শ্রীমদ্ভাগবত)	..	৭৪—১৭১ "
৫। দশম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়	...	১৭২—২০৩ "
৬। একাদশ স্কন্ধ (উদ্ধব সংবাদ)	...	২০৪—২৩৭ "
৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সংক্ষিপ্ত মর্ম (১ম—১৮শ অধ্যায়)	...	২৩৮—২৬০ "

এই পুস্তকের প্রত্যেক অধ্যায়টি সুলিখিত, এবং সরল ভাষায় গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের যে সমস্ত মহামূল্য বিষয় মাত্র মূল শ্লোক, টীকা ও অনুবাদ মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, সেগুলি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ পূর্বক গ্রন্থকার ভিতরকার প্রকৃত রস পরিবেশনে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এই বিশ্লেষণী-শক্তির পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অনুবাদেই প্রকটিত হইয়াছে। এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, উহা পাঠে গ্রন্থ-কারের সে শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

"শ্রীশ্রীব্যাসদেব গ্রন্থারম্ভে ৺ভগবান্ পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতেছেন,—'ধীমহি' অর্থাৎ ধ্যান করিতেছি। এখানে 'ধীমহি' শব্দ বহুবচন; কিরূপে ব্যাসদেবের একলার উক্তি হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, ব্যাসদেব সাক্ষাৎ নারায়ণ; তিনি আপনি স্বয়ং আপনার ধ্যান করিতে পারেন না কিন্তু সকল জীবের নিমিত্ত তিনি ধ্যান করিতেছেন।

তিনি কাহাকে ধ্যান করিতেছেন? —'পরং' অর্থাৎ পরমেশ্বরকে। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের পর, যিনি ব্রহ্মাণ্ডে লিপ্ত নহেন; কারণ ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল পদার্থ দেখা যায়, তাহা সমস্তই নশ্বর অর্থাৎ তাহা লয় হইবেক। এখানে ইহা বোধ হইতে পারে যে, ব্রহ্মাণ্ড এক পদার্থ ও পরমেশ্বর অতীত;

ইহা কখন সম্ভবে না। তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আছেন, কিন্তু মায়ার অতীত হইয়াই আছেন। অতএব যগুপি জীব মায়া ছাড়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেক। এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ব্যাসদেব অদ্বৈত-বাদী নহেন; তাহা হইলে তিনি 'পরং ধীমহি' কহিতেন না। তিনি বলিতেন—'ব্রহ্ম ধীমহি'।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, পরমেশ্বরের লক্ষণ কি? উত্তর—তাঁহাকে দুই লক্ষণেতে জানা যায়।

১। এক, তাঁহার 'স্বরূপ লক্ষণ'

২। দ্বিতীয়, 'তটস্থ লক্ষণ'

'স্বরূপ লক্ষণ' কাহাকে বলে? উত্তর—কোন এক পদার্থের সেই পদার্থটি ব্যতীত অন্য বস্তুকে স্বরূপ লক্ষণ বলিতে পারা যায় না। যেমন গরুর স্বরূপ লক্ষণ গাভী, কেবল নাম বদল। এখানে পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ 'সত্য'। ব্যাসদেব মহাভারতে উদ্যোগপর্বে কহিয়াছেন যে, সত্যের উপর ভগবান্ স্থাপিত ও ভগবানের উপর সত্য স্থাপিত। অতএব সত্য আর ভগবান্ ভিন্ন পদার্থ নহে।

'সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ॥'

এই সত্য এক পদার্থ ভূমণ্ডলে থাকাতে, মিথ্যা পদার্থ সকলকে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, অর্থাৎ তিনিই কেবল সত্য, আর অন্য সকল পদার্থ মিথ্যা; কিন্তু মিথ্যা বস্তুও ভ্রমবশতঃ সত্য বোধ হয়। তেজ, জল ও মৃত্তিকার পরস্পর ভ্রম বোধ হইয়া এক বস্তুতে আর এক বস্তু বোধ হয়। যেমন বালিতে ও তেজেতে—মরীচিকাতে জল বোধ হয়। শুক্তিতে রজত বোধ হয়। রজ্জুতে সর্প বোধ হয়। ইহাতে প্রমাণ হইল যে, জল এক পদার্থ আছে বলিয়াই বালিতে ও তেজেতে জল বোধ হয়, ও রজত এক পদার্থ আছে বলিয়া শুক্তিতে রজত বোধ হয়, এবং সর্প এক পদার্থ আছে বলিয়া রজ্জুতে সর্প বোধ হয়। অতএব পরমেশ্বর এক সত্য আছেন বলিয়া, এই ব্রহ্মাণ্ড যদিও মিথ্যা, তথাপি সত্য বলিয়া বোধ হয়। এখানে এক কথা হইতেছে যে, জল আমরা দেখিয়াছি; রূপা আমরা দেখিয়াছি ও সর্প আমরা দেখিয়াছি বলিয়া উল্লিখিত পদার্থে ভ্রম বোধ হয়; কিন্তু পরমেশ্বরকে ত কখন আমরা দেখি নাই, কিরূপে ইহা হইতে পারে যে, ব্রহ্মাণ্ডকে আমরা সত্য বোধ করিতেছি, তাহা আমাদিগের ভ্রম?

উত্তর—৺ভগবান্ অজ অর্থাৎ তাঁহার আদি নাই এবং জীবও অনন্তকাল অবধি এই ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছেন; কিন্তু অনন্তকাল অবধি জীব ভ্রমেতে পতিত। অতএব তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ডকে যে, ভ্রমেতে সত্য বোধ হয়, তাহা হইতে পারে; কিছুই আশ্চর্য নহে।

এখানে আর এক সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্যাসদেব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে মিথ্যা বলিতেছেন ও এক 'পরং' পরমেশ্বর-কেই কেবল সত্য ভাবিতেছেন। তবে কি তিনি অদ্বৈত-বাদী? কেননা ভগবান্ হইতে ব্রহ্মার (রজোগুণে) উৎপত্তি তাঁহাকে মিথ্যা কিরূপে বলি? সত্য হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, সে কখন মিথ্যা নহে। আবার ব্রহ্মা হইতে মনু প্রভৃতির উৎপত্তি ও সেই মনু হইতে সকল প্রজার সৃষ্টি।" পৃঃ ১—৩

আলোচনার শেষে তিনি বলিতেছেন—"(ভাগবতের) এই শ্লোকের সহিত বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় সূত্রের এবং গায়ত্রীর প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত একতা আছে। গায়ত্রীর প্রথমে প্রণব; যাহার অর্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। এখানে 'জন্মাদ্যস্য' ঐ ভাব প্রকাশ করে। আর 'জন্মাদ্যস্যযতঃ' হইতেছে বেদান্ত-সূত্রের ২য় সূত্র; ইহারও মধ্যেতে যাহা আছে, গায়ত্রীও সেইভাব। আর গায়ত্রীর শেষেও 'ধীমহি', ইহারও শেষে 'ধীমহি'। পৃঃ ৬

ক্রমশঃ

নাস্তিক

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(১৩)

অপরাহ্ণে দিবানিদ্রার অবসানে সুশান্ত স্বীয় কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিল—দূরে শ্যামল পর্বতের তুঙ্গশিরে, বৃক্ষরাজির ঘন পল্লবে, লোহিত সূর্যের কিরণমালা লুকোচুরি খেলা সুরু করিয়াছে। ভৃত্য হাত-মুখ ধুইবার জল দিয়া গেল এবং কেশবলাল চা, স্যাণ্ডুইস, কেক প্রভৃতি লইয়া হাজির হইল। চা-পান শেষ করিয়া সুশান্ত বেড়াইতে বাহির হইল, অজানা অচেনা পথে।

সঙ্কীর্ণ পথ; কোথাও কণ্টকগুল্ম মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার মাথায় কত রং-বেরঙের ফুল। কি সে অপূর্ব বর্ণ-সুষমার সমারোহ। কি সে ধাতার অপূর্ব সৃষ্টি-কৌশল! পথরেখা নামিয়া চলিয়াছে দূর উপত্যকাভিমুখে, পাহাড় ক্রমশ উর্ধ্বমুখে নীলকাশে অভিযান করিয়াছে, আর নিম্নস্থ উপত্যকা ধীরে ধীরে বিশাল হইতে বিশালতর হইতেছে। দেখা দিতেছে কোথাও সবুজ শস্য ক্ষেত্র; চারিদিকে কঞ্চির বেড়া; লম্বা বাঁশের মাথায় কৃষ্ণবর্ণ হাড়ি ঝুলাইয়া ডাইনী মূর্তি রচিত হইয়াছে, যাহাতে বন্য পশুপক্ষী ক্ষেত্রের শস্যের কোনরূপ অনিষ্টসাধন না করে। সূর্যকিরণ ধীরে ধীরে আকাশের কোলে মিলাইয়া যাইতেছে; অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে নিম্নভূমিতে।

সুশান্তের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; সে আপন মনে চলিয়াছে বনপথে অজানা-অচেনা ফুলের মদির গন্ধে লুব্ধ ভ্রমরের মত। দিবাচর পক্ষী শূন্যপথে কুলায় ছুটিয়াছে; অদূরে একটা পার্বত্য ঝরণা শিলা হইতে শিলান্তরে অট্টহাস্য করিয়া লাফাইয়া পড়িতেছে। দূরে বৃক্ষরাজির শীর্ষদেশ হইতে সূর্য্যকিরণ লুপ্ত হইয়া গেল—বনভূমি ঘন অন্ধকারের রাজ্যে রূপান্তরিত হইল।

এইবার সুশান্তের চমক ভাঙ্গিল, দেখিল চারিদিকে অন্ধকার। উর্ধ্বে তাকাইয়া দেখিল—দেখা যাইতেছে সপ্তর্ষির মৃদু কিরণ, কাল পুরুষের কটিবন্ধ; ধ্রুবতারার স্নিগ্ধরশ্মি তাহার চোখে অমৃতের স্পর্শ বুলাইয়া দিল।

আপনাভোলা অবস্থায় সুশান্ত যে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে এই বনভূমির নিবিড় আলিঙ্গনের ব্যপদেশে—এইবার সুশান্ত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিল। সে সঙ্গে কোনরূপ আলোক আনে নাই; অথচ এই ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথরেখা ধরিয়া ফরেষ্ট বাংলোয় ফিরিয়া যাওয়া খুব কষ্টসাধ্য।

সহসা পুরোভাগে তাকাইয়া সুশান্ত দেখিল—কিঞ্চিৎ দূরে একটি কুটির হইতে আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছে। অগত্যা সুশান্ত সাহায্য প্রাপ্তির আশায় সেই দিকে ছুটিয়া গেল। দেহ কণ্টক-তরু-গুল্মের আঘাতে জর্জরিত হইল, কিন্তু সুশান্তের নিকট উহা ছেলাখেলা মাত্র।

রুদ্ধদ্বার পর্ণকুটিরের পুরোভাগে উপনীত হইয়া সুশান্ত করাঘাত করিল। প্রথমবার কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়বারে একটি বৃদ্ধা স্থূলকায়া পাহাড়ী স্ত্রীলোক দরজা খুলিয়া ভাঙ্গা হিন্দীতে সুশান্তকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাই?"

সুশান্ত উত্তর করিল—"একটা আলো ও একজন লোক চাই; যে আমাকে ফরেষ্ট বাংলোয় পৌছে দিতে পার্বে।"

স্ত্রীলোক—"এখানে তেমন কোন লোক নেই।"

সুশান্ত—"ফরেষ্ট বাংলো এখান থেকে কতদূর?"

স্ত্রীলোক—"৭।৮ মাইল হবে।"

সুশান্ত—"আজ রাত্রের মত এখানে থাকার জায়গা হবে?"

স্ত্রীলোক—"হবে। তবে আপনাদের মত বড়লোকের উপযুক্ত হবে না।"

সুশান্ত—"সে জন্য আপনাকে কোনরূপ ভাবনা করতে হবে না।"

স্ত্রীলোক—"তবে আসুন।"

স্ত্রীলোকটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুশান্ত কুটিরে প্রবেশ করিল। গৃহের মধ্যে আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। কয়েকটি মাটির ও কাঠের পাত্র; এক ধারে মাটিতে বিস্তৃত জীর্ণ শয্যা। গৃহের অধিবাসী মাত্র দুইজন; বৃদ্ধা ও তাহার কন্যা।

সুশান্তকে বসিবার জন্য একটি খেজুর পাতার চাটাই পাতিয়া দিয়া বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা ?"

সুশান্ত—"ব্রাহ্মণ।"

স্ত্রীলোক—"রাত্রে খাওয়া কি হবে ?"

সুশান্ত—"সেজন্য কোন চিন্তা করতে হবে না। এক বেলা না খেলে আমার কোন কষ্ট হবে না।"

স্ত্রীলোক—"তা কি হয়। আপনি অতিথি আমাদের বাড়ী এসে রাত্রি বেলা উপোষ থাকবেন, আমরা মায়ে ঝিয়ে পেট ভরে গিল্‌ব—তাকি হয়। আচ্ছা, আমাদের রান্না খেতে আপনার কোন আপত্তি আছে ?"

সুশান্ত—"কোন আপত্তি নেই। তবে এই রাত্তিরে আপনাদের কষ্ট দেওয়া কি ঠিক হবে ?"

স্ত্রীলোক—"কষ্ট আবার কি ? আমরা ত নিজেদের জন্য রাঁধবই; তবে আপনার জন্য এক মুঠো আটা নিলে কি আমাদের গতর ক্ষয়ে যাবে ? ও মিছরি, শিগ্‌গির উনুনজ্বেলে ফুলকো তৈরী কর। আর কাঁচা ছোলার ডাল কর আর আলুর শাক তৈরী করে দে। দুধটাও গরম করিস্।"

ইহা শুনিয়া অর্ধবয়সী অপর স্ত্রীলোকটি উনুন জ্বালিয়া মাটির হাড়িতে ডাল চাপাইয়া দিল এবং রুটির আটা মাখিতে বসিল।

বৃদ্ধা সুশান্তের পাশে বসিয়া সুখ-দুঃখের গল্প আরম্ভ করিল। আগে তাহারা দূরবর্তী পল্লীতে বাস করিত। তখন তাহাদের পুরুষেরা সব বাঁচিয়াছিল। পরে দুরন্ত মৃত্যুর কঠোর ইঙ্গিতে বৃদ্ধা নিজে ও তাহার কন্যাটি করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু মেয়েটি তাহাতে রাজী হয় নাই। তারপর সর্দারের ছেলের চক্রান্তে মেয়ের নামে কুৎসা রটনা করা হইল। পরিশেষে মিথ্যা লোকগঞ্জনার হাত এড়াইবার জন্য বৃদ্ধা মেয়েকে লইয়া এই ঘন জঙ্গলের মাঝে বাসস্থান রচনা করিয়াছে। শাক-শব্জী, ফলমূল, কাঠ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে তাহাদের দিন চলে। তবে এখানে তাহারা বেশ শান্তিতে আছে।

বৃদ্ধার করুণ দুঃখ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে সুশান্তেরও চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

যথাসময়ে আহার প্রস্তুত হইলে সুশান্ত আহারে বসিল। মোটা আটার রুটি, কাঁচা ছোলার ডাল, আলু কুমড়োর তরকারী ও দুগ্ধ সহযোগে অসভ্য পাহাড়ী বৃদ্ধার বাটিতে সুশান্তের অতিথি-সৎকারের পর্ব শেষ হইল, কিন্তু বিপদ্ দেখা দিল শয়নের স্থান লইয়া। শয়নের ঘর মাত্র একখানা, তাহাতে কন্যা ও জননী থাকে; এখন অতিথিকে শয়ন করিতে দেওয়া যায় কোথায় ? বিছানাও ত কিছুই নাই। অগত্যা বৃদ্ধা সুশান্তের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমাদের শোবার ঘর মাত্র একখানা। আপনাকে ঐ ধারের চালাটার পাশে কাঠ রাখবার ঘরটিতে থাকতে হবে।"

সুশান্ত ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল; না জানাইয়া উপায় কি ? দূরে তাকাইয়া দেখিল বিশাল বিশ্বসংসার নৈশান্ধকারে বিলুপ্ত। মৃত্যুর মত গভীর রহস্যময় অন্ধকার দিকে দিকে প্রসৃত। মাঝে মাঝে দূর বনপথে ব্যাঘ্রের গর্জনধ্বনি শোনা যাইতেছে।

সুশান্তকে শয়নের জন্য আহ্বান করা হইল। সুশান্ত গিয়া দেখিল—বেশ পুরু খড়ের উপর একখানা কাপড় পাতিয়া শয্যা রচিত হইয়াছে। সুশান্তের নিকট উহা বেশ কোমল বলিয়া প্রতীয়মান হইল। বৃদ্ধা সুশান্তের শয্যা-প্রান্তে একটা মাটির প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সুশান্ত সেই খোলা দ্বারের বাহিরে বিশ্বের অনন্ত পথের দিকে চাহিয়া রহিল। অদূরে একটা গাছে জোনাকী পোকার মন্দমধুর পুলক-নৃত্য সুশান্তের নিকট বেশ

আবার নৈশান্ধকারে মিশিয়া যাইতেছে। এই এক অপূর্ব লুকোচুরি খেলা খদ্যোতিকার আবরণের মধ্য দিয়া সুশান্তের প্রাণের একটা অজ্ঞাত তারে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

ভাবিল সুশান্ত—"কি এ অপূর্ব রহস্য-ঘন ব্যাপার! জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া কে খেলিতেছে এই অপ্রত্যাশিত-পূর্ব অননুভূতপূর্ব খেলা দিবস-রাত্রির ছন্দে তালে, মাস-ঋতু-বৎসরের সমবায়ে। সত্যই কি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন সৃষ্টিকর্তা, কোন ঈশ্বর বা তৎসদৃশ কেহ বর্তমান, যাহার অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিতে চলিতেছে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, মানব-জীবনের সুপ্তি জাগরণ, নৈশাকাশে অগণিত গ্রহ-তারকার গতি-বেগ? না উহা শুধু মানবের দুর্বল মুহূর্তের কল্পনার ফল, যখন মানুষ শক্তিহীন হইয়া এমন একটা বিরাট্ কিছুর কল্পনা করে, যাহার পাদমূলে বসিয়া সে নিজ জীবনের বৈষম্য-বিফলতা ভুলিয়া যাইতে চাহে; যে জ্বালার তীব্র দাহ তাহাকে দিনে দিনে পলে পলে তিলে তিলে দগ্ধ করিতেছে; তাহার হাত হইতে মুক্তির ক্ষীণ আশাই তাহাকে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে? অসম্ভব নহে! সবই চলিতেছে একটা অপ্রত্যাশিতপূর্ব সমন্বয়ের প্রভাবে। নতুবা যদি ঈশ্বর বলিয়া কিছু থাকে, তবে কেন সেই ঈশ্বর স্বীয় অমিত শক্তির প্রভাবে বিশ্বের দুঃখদৈন্য দূরীভূত করিয়া দেয় না? কেন সে ঈশ্বর মানুষের অপেক্ষাও নিষ্ঠুর? যে দৃশ্য মানুষ চোখে দেখিতে পারে না, যে দৃশ্যে পশুপক্ষীও কাঁদিয়া আকুল হয়, সে দৃশ্যে বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বর নির্বিকার থাকে কেমন করিয়া? ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানব-বিন্দু আমি যে অন্ধভিক্ষুকের দুঃখে বিগলিতচিত্তে তাহাকে ভিক্ষাদান করিয়া দৃষ্টিহীনতার দুঃখ মোচনে যত্নপর,—যিনি অগণিত শশিসূর্যতারকার গতি-পথ রচনা করেন, অনন্ত সমুদ্রোপ-কূলে সংখ্যাহীন বালুকারাশি যাঁহার ব্যর্থ সৃষ্টির জ্বলন্ত উদাহরণ—তিনি কি তাহা দূরীকরণে অসমর্থ? যদি তাহাই হয়, তবে ত ঈশ্বর শক্তিহীন—শক্তিহারা দুর্বল ক্ষীণজীবী ঈশ্বরের উপাসনায় কি লাভ? অথচ দিনের পর দিন—এই নিষ্ঠুর ক্ষীণজীবী ঈশ্বরের জন্যই দেশে দেশে কালে কালে বহু লোক জীবন বিসর্জন দিয়াছে! এই একটা অনিশ্চিত রহস্য মানবের দুর্বল মুহূর্তে দেখা দেয়; সবল মুহূর্তে উহার অস্তিত্ব প্রায় দেখা যায় না।

এই ত দেখিতেছি শ্যাম ও মালয়ের ঘন জঙ্গলে কত দেবমন্দির অতীত যুগের ভাস্কর্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপে আজ দেশদেশান্তরের পর্যটককে আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু একদিন ত ঐ মন্দিরতলে কত অসহায় দীন দরিদ্রের ব্যাকুল অশ্রুধারা পাষাণ-দেবতার কৃপাকণা লাভের জন্য নীরবে ঝরিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তাহাতে দেবতার পাষাণ-প্রাণ গলিয়াছে কি? দুঃখীর দুঃখ মোচনে উহার কোন সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে কি? কে বলিবে।

কিন্তু যে দেবতাকে মানুষ সর্বশক্তিমান বোধে পূজা করে,—সে দেবতা আত্মরক্ষায় অক্ষম কেন? যে সোম-নাথের বিশাল মূর্তি সুলতান মামুদের যষ্টির আঘাতে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিজয়ীর চরণ-তলে রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছিল, সেই সোমনাথকেই ত কত হিন্দু প্রাণাপেক্ষা অধিক মনে করিত। মনে করিত—সোমনাথই বিশ্ব-নিয়ন্তা; যাহার কটাক্ষে কোটি কোটি ধূমকেতু নীহারিকার বক্ষোভেদ করিয়া শ্যামল ধরিত্রীর দিকে ছুটিয়া আসে, লক্ষ লক্ষ পিঙ্গলফণায় সমুদ্র গর্জন করিয়া উঠে। তবে—তবে—সে সামান্য পার্থিব বিজয়ীর যষ্টির আঘাত প্রতিরোধে অক্ষম কেন?—মিথ্যা—মিথ্যা—শুষ্ক রুক্ষ মলিন জীবনকে তৈলচিক্কন করিবার জন্য ঈশ্বর একটা ভুয়ো কল্পনা। দুর্বল মুহূর্তের একটা আশ্রয়—নশ্বর জীবনের কণ্টকসঙ্কুল দীর্ঘপথের পাথেয় মাত্র; উহার প্রয়োজনীয়তা যতক্ষণ মানুষ দুর্বল ততক্ষণ—সবলের পক্ষে উহার মূল্য কাণাকড়িও নহে।

কৈ?—যিনি ভূমণ্ডলে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আজও পূজিত হইতেছেন, তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন কেন? যিনি নিজের পাঞ্চভৌতিক দেহটাকেই রক্ষা করিতে অক্ষম, তিনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নর-নারীর ত্রাণকর্তা—একথা বিশ্বাস করা সহজ মস্তিষ্কের কাজ নহে।

হাঁ। একটি লোক বটে ঠিক সত্য কথা বলিয়াছে

বিশ্বের বুকে—সে বুদ্ধ। ঈশ্বর সম্বন্ধে বুদ্ধ কোন কথা বলেন নাই। কেন? যদি সত্য সত্য ঐরূপ একটা কিছুর অস্তিত্ব তিনি উপলব্ধি করিতেন ধ্যানযোগে, তবে তাঁহার মত স্পষ্টবাদী কখনো তাহা লুকাইয়া রাখিতেন না।

সুতরাং কর্মই মানবের একমাত্র কাম্যবস্তু; একমাত্র সত্য।"

উত্তপ্ত মস্তিষ্কের চিন্তাধারা বিভিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া চলিল। সেই চিন্তার মধ্যে আত্মহারা সুশান্ত কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহা নিজেই জানে না।

যখন জাগিয়া উঠিল—দেখিল—পূর্ব দিকে রক্তিমাভা দেখা দিয়াছে। উঠিয়া বাহিরে আসিতেই বৃদ্ধা হাতমুখ ধুইবার জল আনিয়া দিল। তৎপরে এক বাটি গরম দুধ সুশান্তকে খাইতে দিল। সুশান্ত দুগ্ধ পান করিয়া বৃদ্ধার হাতে পাঁচটি টাকা দিল। বৃদ্ধা উহা ফিরাইয়া দিয়া বলিল—"বাবুজি অতিথির কাছ থেকে কিছু নিতে নেই, নিলে পাপ হয়।"

সুশান্ত আর কোন কথা বলিতে পারিল না, কিন্তু বিস্মিত হইয়া ভাবিল—ইহারা দরিদ্র; অতি কষ্টে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে, অথচ কি নির্লোভ! ভাবিয়া পাইল না সুশান্ত এই জীর্ণ চীরধারিণী মহিলা কি শক্তির প্রভাবে পঞ্চ রজতখণ্ডকে ধূলিমুষ্টির মত পরিহার করিল; অথচ তাহাতে যে বৃদ্ধার কিছুমাত্র দুঃখ হইয়াছে এমন কোন চিহ্ন সুশান্তের নয়ন কোণে প্রতিভাত হইল না।

পরে সুশান্ত বৃদ্ধার নিকট বিদায় লইয়া ফরেষ্ট বাংলোর দিকে অগ্রসর হইল।

ক্রমশঃ

পঞ্চপুষ্প

পার্ল্যামেণ্টে বক্তৃতার সময়-নির্দেশক আলো

দক্ষিণ রোডেশিয়ান পার্ল্যামেণ্টে সদস্যগণের বক্তৃতার সীমা নির্দেশ করিবার জন্য "ট্র্যাফিক লাইটে"র অনুরূপ আলো ব্যবহৃত হইতেছে। যখন কোন সদস্য বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন কেরাণীর ডেস্কের উপর একটি সবুজ আলো জ্বলিয়া উঠে। বক্তৃতার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পূর্বে ম্লান পীতাভ আলো জ্বলে। নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে লাল আলো জ্বলিয়া বক্তাকে স্বীয় আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য করে।

অবশ্য ম্লান পীতাভ আলো রিপোর্টারগণের বিরক্তি উৎপাদন করে; যেহেতু উহা জ্বলিলেই বক্তা বক্তৃতার গতি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

ষ্টেট্‌সম্যান

পল্লীগ্রামে চক্ষু-চিকিৎসা হাসপাতাল

ধনিয়াখালি গ্রামে যে চক্ষু চিকিৎসা হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে, গত ২২শে মার্চ পর্যন্ত তথায় মোট ১৯টি চক্ষু রোগীর অস্ত্রোপচার হইয়াছে। কলিকাতা ন্যাসনাল মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ সুবোধচন্দ্র গাঙ্গুলী, এম বি ও ডাঃ অনাদিচরণ ভট্টাচার্য এম বি অস্ত্রোপচার করিয়াছেন। স্থানীয় ডাঃ ভবতোষ দাশ এম বি, ডাঃ গণেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী ও ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় হাসপাতালের কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কংগ্রেস কর্মিগণ রোগীদের শুশ্রূষার ভার লইয়াছে। রোগিগণ ভালই আছে।

চুঁচুড়া-বার্তাবহ

গ্রাম্য বেতার-বিকিরণ

গ্রাম্য বেতার-বিকিরণ-পরিকল্পনার পরিপূরণের জন্য দিল্লী প্রদেশের ১২০টি গ্রামে বেতার-গ্রহণ-যন্ত্র সংস্থাপিত হইতেছে।

ইহা অনেকের মনে থাকিতে পারে যে, মিঃ লাইয়োনেল ফিল্ডিং বিকীরণ-নিয়ন্ত্রকরূপে দিল্লী প্রদেশের

গ্রাম্য বিকিরণের জন্ম একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিয়ন্তার স্বকীয় কর্তৃত্বাধীনে গ্রাম্য-বিকিরণ প্রণালী গঠিত হইবে, যাহাতে ঐ প্রদেশ অগ্রগামীর স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় গ্রাম্য বিকিরণে প্রধান অসুবিধা এই দেখা গিয়াছিল যে, ব্যাটারি-পরিচালিত রেডিয়ো সেটকে কি প্রকারে চলাচল ও বন্ধ করা যাইবে। তৎকালে এই খোলা ও বন্ধ করা গ্রাম্য চৌকিদারের কাজ ছিল; তাহাতে হয় খুব সকালে, কিম্বা অত্যন্ত দেরীতে উহা খোলা হইত এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখা হইত, তাহাতে ব্যাটারির বিদ্যুৎ বহু পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়া যাইত, বর্তমানে এই অবস্থা দূরীভূত হইয়াছে। স্বতঃ-কার্যকরী রেডিয়ো-গ্রহণ-যন্ত্র নির্ধারিত সময়ে আপনি বাজিয়া উঠে ও ঠিক সময়ে বন্ধ হইয়া যায়; সুতরাং চৌকীদারের প্রয়োজন হয় না। এই যন্ত্র ধাতব বাক্সে আবদ্ধ ও উহাতে স্বতঃ-কার্যকরী সময়-জ্ঞাপক চাবি বর্তমান। এই যন্ত্রের ২০টি বম্বে গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন ও ২০টি যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট লইয়াছেন। এই যন্ত্রের ৩০টি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, ২০টি পাঞ্জাবেও ৩০টি বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হইতেছে। মাদ্রাজ ষ্টেসন কার্যকরী হইলেই সেখানে এই যন্ত্রের ২০০।৩০০ সেট গ্রামে ব্যবহারের জন্ম গৃহীত হইবে।

পরবর্তী অসুবিধা এই যে, ব্যাটারিকে পুনরায় পূর্ণ করার জন্ম কি ব্যবস্থা করা হইবে। দক্ষিণ ভারতের মত দিল্লী প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে সুন্দর রাস্তা নাই; কিন্তু দিল্লীর ছয়টি কেন্দ্রে পেট্রোল চালিত ব্যাটারি পূর্ণ করার যন্ত্রপাতি স্থাপিত হইবে। এই সমস্ত কেন্দ্রে সুদক্ষ কারিকর মোতায়েন থাকিয়া ব্যাটারিসমূহ মেরামত করিবে। প্রত্যেক কেন্দ্রের অধীনে ২০টি রেডিয়ো যন্ত্র থাকিবে।

লাহোরে মাধ্যমিক তরঙ্গ ও দিল্লীতে হ্রস্ব তরঙ্গের ষ্টেসন নির্মিত হইবে। লক্ষ্ণৌতে মাধ্যমিক তরঙ্গের ও হ্রস্ব তরঙ্গের ষ্টেসন দেখা দিবে। মাদ্রাজে মাধ্যমিক ও হ্রস্ব তরঙ্গের ষ্টেসন রাখা হইবে; পক্ষান্তরে ত্রিচিনপল্লী ও ঢাকাতে মাধ্যমিক তরঙ্গ-ষ্টেসন ১৯৩৮ সালের শেষভাগে খোলা হইবে। আগামী জুন মাসে কলিকাতাতেও হ্রস্ব তরঙ্গের ষ্টেসন কার্য করিবে।

অমৃতবাজার পত্রিকা

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন-পত্র

অক্সফোর্ডকে সাধারণত লুপ্ত কারণের জন্মদাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে; এবং এই বর্ণনার পোষকতায় বলা হয় যে, যে যুগে মানুষ অর্থবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অনুরক্ত, সেই যুগে উহা গ্রীক ভাষা শিক্ষা দিতে উৎসুক, যদিও খুব কম লোকে উহা অধ্যয়ন করে। কিছুকাল পূর্বে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স চ্যান্সেলাররূপে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ১০ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্যের জন্ম এক আবেদন-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন; ইহার উদ্দেশ্য ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে যাহা নষ্ট হইয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিকরূপে দাঁড় করান। এই উদ্দেশ্যে লর্ড নাফিল্ড তাঁহার দানের দ্বারা বেশ কিছু করিয়াছেন। অক্সফোর্ড চিকিৎসা-বিজ্ঞানাগার নবভাবে নির্মিত হইবে; এতদ্ভিন্ন একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহা নূতন ও পুরাতনের মধ্যে একতা স্থাপন করিয়া শিল্প সম্পর্কে মানবের ব্যবহার সম্বন্ধীয় গবেষণা করিবে। অক্সফোর্ডের গৌরব, প্রাচীন ভাষা, মহামানবতার প্রতি অনুরাগ, ইতিহাস ও দর্শন শিক্ষা-দান। ক্যাম্ব্রিজ বিজ্ঞানে বহু অগ্রবর্তী। আরও অনেক নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ও এই বিষয়ে অক্সফোর্ডের অগ্রগামী। কিন্তু বর্তমানে অক্সফোর্ড পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং প্রাচীন শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াও জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে কৃতিত্ব দেখাইতে ইচ্ছুক।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির একটা তালিকা নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে আবেদনের অনুকূলে বিশ্ব-বিদ্যালয় কি করিয়াছে ও কতটুকু ভবিষ্যতে করিবার আশা করে, তাহা বিবৃত হইয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের আবেদনের ফলে ৪২৬,০০০ পাউণ্ড

পাওয়া গিয়াছিল; উহার সহিত লর্ড নাফিল্ডের প্রদত্ত অর্থ সংযুক্ত হইয়া অনেক কিছু করা হইয়াছে। সাধারণের অভিমত এই যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ঐশ্বর্যশালী; উহার অনেক ছাত্র ঐশ্বর্যশালী বটে, এবং খুব কম কলেজ ঐশ্বর্যশালী। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গবেষণায় বার্ষিক ২৬০০০০ পাউণ্ড ব্যয় করে। ইহার আয় মূলধন হইতে ১৯,০০০ পাউণ্ড। যুদ্ধের সময় হইতে গভর্ণমেণ্ট সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছে; এই সাহায্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আয়; উহার পরিমাণ বার্ষিক ১০৬,০০০ পাউণ্ড। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদা ৭৮,০০০ পাউণ্ড; কলেজসমূহের ট্যাক্স ৬৮,০০০ পাউণ্ড। উনবিংশ শতাব্দীতে এই আয় পর্যাপ্ত বিবেচিত হইত; কিন্তু বর্তমানে গবেষণায় বহু অর্থের প্রয়োজন অথচ গবেষণাকে উপেক্ষা করা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষে অসাধ্য। ফলে নবীন ভাব নূতন অভাবের জন্মদান করে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত ৪২৬,০০০ পাউণ্ডের মধ্যে বডলিয়ান লাইব্রেরীর বিস্তৃতির জন্য ২২০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে, ১০,০০০ পাউণ্ড রাজনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের শিক্ষার জন্য রোড্‌স্ ট্রাষ্টীর দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং সাধারণ আবেদনের ফণ্ডে ৬৩,০০০ পাউণ্ড অবশিষ্ট আছে। বর্তমানে সাধারণ গবেষণা ভাণ্ডার স্থাপন বিশেষ দরকার। উহা মানবিকতা ও বিজ্ঞানের জন্য ব্যয়িত হইবে; ইহাতে আনুমানিক ব্যয় ১০০,০০০ পাউণ্ড। সুকুমার শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগেও গবেষণার দরকার।

আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য বৃত্তির এবং গবেষণাগারের প্রয়োজন। উহার জন্য লর্ড নাফিল্ড ১০০,০০০ পাউণ্ড দান করিয়া অগ্রদূতরূপে বিবেচিত হইতেছেন। ইহা দ্বারা নূতন অট্টালিকা ও যন্ত্রপাতিসমন্বিত নব গঠিত পদার্থ-রসায়ণ-গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা হইবে। সেল তৈল কোম্পানী ভূতত্ত্ববিদ্যার ব্যবস্থা করিয়াছে ও অন্য একজন নবীন পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারের জন্য টাকা দিয়াছে।

বর্তমান আবেদনে ২½ লক্ষ পাউণ্ডের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতবর্ষও এই আবেদনে সাড়া দিয়াছে। দান যত সামান্য হউক, দাতার সুদীর্ঘ তালিকা অন্য লোককে দানে প্ররোচিত করে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন অফিস, পুরাতন ক্ল্যারেণ্ডন বিল্ডিংস, অক্সফোর্ড —এই ঠিকানায় চাঁদা পাঠাইতে হইবে।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

ঢাকেশ্বরী মিলের প্রশংসার্হ কার্য

ঢাকেশ্বরী কটন মিল একটি অবৈতনিক স্কুল পরিচালনা করিয়া শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া অশেষ উপকার করিতেছেন। কয়েক দিন পূর্বে ঢাকা জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য এম এ, পি আর এস মহাশয়ের সভাপতিত্বে ঢাকেশ্বরী মিল ফ্রি স্কুলের পুরস্কার বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার বাবু সূর্যকুমার বসু সভায় শ্রমিক-দিগকে দলে দলে ঐ বিদ্যালয়ে যোগ দিতে আহ্বান করেন। শ্রমিকদিগের ব্যায়ামাগারের অভাব দেখিয়া তাহা দূর করিবেন বলেন। এই উৎসব উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীগণ আবৃত্তি প্রভৃতি করিয়া তাহাদের শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা প্রকাশ করেন। বঙ্গের শিল্প-প্রতিষ্ঠান সকল ঢাকেশ্বরী মিলের কর্তৃপক্ষের প্রদর্শিত পথে কার্য করিলে দেশের অনেক উপকার করিতে পারেন।

শিক্ষা-সমাচার

আসামের রেশম-শিল্প

আসামের বয়ন-শিল্পের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অল ইণ্ডিয়া টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েসনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, এল্ সুন্দরম্ সম্প্রতি গৌহাটির অধিবেশনে বলিয়াছেন— আসাম রেশম-শিল্পের জন্মভূমি; আসামের এণ্ডি ও মুগা জগতের ঈর্ষা উদ্রিক্ত করে এবং উহা তুলনাহীন। আসামের আহোম রাজারা এই তাঁতের শিল্পকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক আসামী—কি ধনী কি দরিদ্র—নিজের তৈয়ারী রেশমী বস্ত্র পরিধান করে। এই রেশম রপ্তানি হইত এবং সোনার ওজনে বিক্রয় হইত।

সমগ্র ভারতে আসামেই হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। ভারতের ২০ লক্ষ হস্তচালিত তাঁতের মধ্যে আসামে ৪,২১,০০০ তাঁত বর্তমান; উহা ⅕ অংশেরও বেশী। ইহা অবসর-সময়ে চালিত কুটির-শিল্প। ইহা সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে আবদ্ধ, যদিও এখানে সেখানে বালক বা যুবককেও তাঁত বুনিতে দেখা যায়। আসাম ও মণিপুরী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বয়নশিল্পদক্ষতা একটি বিশিষ্ট গুণ, যেমন দক্ষিণ ভারতে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে রন্ধন ও সঙ্গীত এবং ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে নৃত্য বৈশিষ্ট্য দান করে।

কিন্তু এই সংখ্যাবাহুল্য সত্ত্বেও আসামে তাঁতের উৎপন্ন দ্রব্য ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম। কারণ লোকেরা মোটেই ব্যবসার জন্য তাঁত চালনা করেনা।

নিম্নে বিভিন্ন প্রদেশের তাঁতের সংখ্যা ও ব্যবহৃত সূতার পরিমাণের তালিকা দেওয়া গেল—

প্রদেশ	তাঁতের সংখ্যা	ব্যবহৃত সূতার পরিমাণ পাউণ্ড
আসাম	৪২১,০০০	৪,০৩৭,০০০
মাদ্রাজ	২৮৫,৫০২	৭৮,৭৮৯,০০০
ব্রহ্মদেশ	২৭১,৫৫৬	১৭,৬১৮,০০০
পাঞ্জাব (দিল্লী ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত সহিত)	২২৮,৪০৭	২৪,১০৫,০০০
বম্বে	১১০,১৮৩	৪৩,০২৬,০০০
বিহার-উড়িষ্যা	১৮০,০০০	৩১,৪৬২,০০০
বঙ্গদেশ	সংখ্যা অজ্ঞাত	৪৮,২১৯,০০০
যুক্তপ্রদেশ	ঐ	৪৩,৪৪৬,০০০

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড

কলিকাতায় অলৌকিক শক্তিশালী যোগী

পারস্যের মুসলমান যোগী সেখ ফজল ইলাহি সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে দুইবার তাঁহার বিবরণ সমাচারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ১৯৩৬

উপর পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর ১৯৩৬ সালের ২৩শে জুলাই করাচী সহরেও সর্বসাধারণের সমক্ষে অগ্নির উপর ভ্রমণ করিয়া সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি ১৯৩৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে অগ্নির উপর পরিভ্রমণ করিয়া পাশ্চাত্য নরনারীকে মুগ্ধ করেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি দিল্লীতে চক্ষু আবদ্ধ অবস্থায় ষ্টেটস্‌ম্যানের কিয়দংশ পাঠ করেন ও অন্যান্য লোকের লেখা ইত্যাদি পাঠ করিয়াছিলেন।

আমি সম্প্রতি ২২বি রাণী রাসমণি রোডে যোগিবরের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিন খণ্ড কাগজে তিনটি প্রশ্ন লিখিতে বলিলেন। তিনি যাহাতে উহা দেখিতে না পান, সেইভাবে উহা আমি লিখিলাম। পরে কাগজখণ্ডগুলি ভাঁজ করিয়া হাতের মুঠোর মধ্যে রাখিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে একখণ্ড বৃহৎ কাগজ ও পেন্সিল দিয়া উহাতে প্রথম প্রশ্ন লিখিতে বলিলেন ও ভাঁজ করা কাগজখণ্ডগুলি টেবিলের উপর রক্ষিত হইলে তাহার একটিতেও প্রথম চিহ্ন অঙ্কিত করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে তিনি ঐ কাগজের লিখিত প্রথম প্রশ্ন অবিকল বলিয়া যান ও উহা আমাকে বৃহৎ কাগজখণ্ডে লিখিতে বলেন। ভাঁজ করা কাগজ পরে তাঁহার আদেশে আমারই পকেটে রক্ষিত হইল। এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্ন তিনি অবিকল বলিয়া যান এবং কাগজখণ্ডগুলি পকেটে রাখা হয়। তিনি একটি পেন্সিল আমার পকেটের মধ্যে রাখিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আমার দক্ষিণ হস্ত করমর্দনের অনুরূপভাবে কয়েক মিনিট ধরিয়া রাখেন। এই সময় সুগন্ধ ধূপের মৃদু সুরভি কক্ষকে আমোদিত করিতেছিল। কয়েক মিনিট পরে তিনি আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া পকেট হইতে কাগজখণ্ডগুলি বাহির করিয়া দেখিতে বলেন। বিস্ময়ের বিষয় যে প্রত্যেক কাগজখণ্ডে প্রশ্নের নীচে পেন্সিল দ্বারা অদৃশ্য হস্তের লিখিত উত্তর বর্তমান। কিরূপে ইহা সম্ভব হইল, তাহা আজও আমার নিকট বিরাট্ রহস্যের মত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-শিক্ষালয়

গত কয়েক মাস যাবত বিশেষ বিবেচনার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ কৃষিবিজ্ঞানে ও কোনও রূপ কুটিরশিল্প সম্বন্ধে পুঁথিগত ও হাতে কলমে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা স্থির করিয়াছেন। তথায় এরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহাতে শিক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ গ্রাম্য অঞ্চলে বাস করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারে।

রয়াল টার্ফ ক্লাব ব্যারাকপুর ঘোড়দৌড়ের মাঠের পার্শ্বে এতদুদ্দেশ্যে ১০ বৎসরের জন্য ১১০ বিঘা জমি ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, উহার মিয়াদও বাড়াইয়া দেওয়া হইতে পারে। তথায়ই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইবে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে স্কুলটি খোলা হইবে এবং অনতিবিলম্বে গৃহ নির্মাণ আরম্ভ হইবে। প্রাথমিক ব্যয় ৫০০০০ টাকা ও বাৎসরিক ব্যয় ২০০০০০ টাকা পড়িবে বলিয়া ধার্য হইয়াছে।

ছাত্রগণকে ঐ বিদ্যালয়ে দুই বৎসর শিক্ষা পাইতে হইবে। প্রারম্ভিক বর্ষে মাত্র ২৫ জন ছাত্র লওয়া হইবে, পরে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র লওয়া হইবে। পাঠ্য বিষয় অযথা পুঁথিগত করা হইবে না। হাতে কলমে শিক্ষণীয় ও জ্ঞানসংক্রান্ত শিক্ষণীয় বিষয়কে দুই ভাগ করা হইবে—যাহাতে কোন জিলার সদর বা মহকুমার সদরের নিকটবর্তী স্থানে ৩ হইতে ৫ বিঘা জমিতে চাষের কার্য করা যাইতে পারে এবং অন্যটিতে যাহাতে গ্রাম্য অঞ্চলে ১ হইতে ২০ বিঘা জমিতে চাষের কার্য করা যাইতে পারে। কৃষিকার্যের মূলতত্ত্ব ও মৌলিক বিষয় ছাত্রগণকে পড়ান হইবে। এতদ্ব্যতীত জমির উন্নতি সাধনার্থ মৌলিক ফরমূলা ও নূতন প্রণালীতে অত্যধিক শস্য উৎপন্ন হয় এরূপ কৃষিকার্য পরিচালনা করিয়া যাহাতে অধিক লাভ হইতে পারে এরূপ শিক্ষাও দেওয়া হইবে। কৃষি-কার্যের সহিত সূত্রধরের প্রাথমিক কাজ, কর্মকারের কাজ, দুগ্ধাদি ব্যবসায় ও পক্ষী পালনের কার্য অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হইবে। এতদ্ব্যতীত ছাত্রদিগকে রুটি বিস্কুট তৈয়ারী শিক্ষা বা খেলানা নির্মাণ বা সাইকেল, ষ্টোভ ইত্যাদি সাধারণ কলকব্জা মেরামতের কার্য মধ্যে যে কোন একটি বিষয়ে শিক্ষা করিতে হইবে।

কৃষিবিদ্যার জন্য ছাত্রদিগকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পড়িতে হইবে—জমির অবস্থার জ্ঞান, ক্ষেত্রকার্য, সার, জমির সিক্ততা, এক শস্য চাষের পরে অপর রকম চাষ, বীজ, কৃষি সম্বন্ধীয় উদ্ভিদ্ বিদ্যা, চারার ব্যাধি-বিজ্ঞান, চারার জন্মবিষয়ক জ্ঞান, পশুপালন, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির বিষয়, কৃষি এঞ্জিনিয়ারিং, পল্লী স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, কৃষি বিষয়ক অর্থনীতি এবং যৌথ ব্যবসায়।

শিক্ষাকেন্দ্রে ১৫ বিঘা জমি পরীক্ষামূলক কার্যে ব্যবহার করা হইবে। তন্মধ্যের ১০ বিঘায় পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র হইবে, ৩ বিঘায় চারার গাছ উৎপন্ন হইবে, ২ বিঘা জমিতে নানা বৃক্ষ রোপণ ও বর্ধন করা হইবে। দর্শনের জন্য ২০ বিঘা জমিতে ঋতু অনুসারে শস্য উৎপন্ন করা হইবে। ইহা ব্যতীত ৫ বিঘা করিয়া ৩ ভাগে তিনটি শাক সব্জীর বাগান করা হইবে।

সঞ্জীবনী

মুদ্রাযন্ত্রের জন্মদাতা জোহান গুটেনবার্গ

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

সূচনা

পৃথিবীর বক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারকল্পে মুদ্রাযন্ত্র যে শীর্ষস্থানীয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যে জ্ঞানরাশি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ অবস্থায় ছিল, তাহাই মুদ্রযন্ত্রের কল্যাণে বিশাল সভ্য জগতে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং যিনি এই মুদ্রাযন্ত্রের জন্মদাতা তিনি যে প্রত্যেক সভ্য মানবের প্রাতঃস্মরণীয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ দেখা যায় না।

অনেক পণ্ডিতের মত চীনদেশেই প্রথম মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা চলে না যে, পুস্তকের মুদ্রণ-কার্যে চীনদেশ অগ্রদূত হইলেও, ভারতবর্ষও বহুবিধ মুদ্রণ ব্যাপারে পৃথিবীর অগ্রণী ছিল। চীনদেশে মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবনের বহু পূর্ব হইতে ভারতবর্ষ নামাবলী ছাপাইত। অথচ কেন যে প্রাচীন ভারতীয় মনীষিগণ পুস্তক রচনায় উহার ব্যবহার করেন নাই, তাহাই চিন্তার বিষয়।

ইয়োরোপে তিনজন মনীষী মুদ্রাযন্ত্রের জন্মদাতা হিসাবে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ম্যাজারিণ বাইবেলের মুদ্রাকর জোহান গুটেনবার্গ মুদ্রাযন্ত্রের জন্মদাতা। আবার কেহ কেহ বলেন, জে এইচ্ হেসেল্স্ মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অন্যান্য কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে হার্লেমনিবাসী লুরেন্স্ জান্‌হুন কষ্টার মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া লোকসমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রসারের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

জন্ম ও পিতৃপরিচয়

১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে বা সাময়িককালে জোহান গুটেনবার্গ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা মাইন্টজ সহরের সমৃদ্ধিশালী অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ছিলেন; তাঁহার নাম Friolo zum Gänsfleisch ও তাঁহার মাতার নাম জু গুটেনবার্গ; মাতার নামানুসারেই তাঁহার নামকরণ করা হইয়াছিল। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে মাইন্টজ সহরের অধিবাসীরা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগকে বিতাড়িত করে; ফলে গুটেনবার্গ ষ্ট্রাসবুর্গ সহরে আনীত হইলেন।

কয়েক বৎসর পরে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণকে পুনরায় মাইন্টজ এ ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু গুটেনবার্গের পিতা সে সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। তিনি সপরিবারে ষ্ট্রাসবুর্গে বাস করিতে থাকেন।

জোহান গুটেনবার্গ কোন্ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বা কিভাবে বাল্যজীবন অতিবাহিত করেন, সে সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায় না।

অধমর্ণ ও গুটেনবার্গ

১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে গুটেনবার্গ ষ্ট্রাসবুর্গের কর্পোরেশনের কেরাণীকে তাঁহার প্রাপ্য কর্পোরেশনের ঋণ প্রদান না করায় বলপূর্বক ধৃত করেন ও তাহাকে বন্দী করিলেন। তৎকালে সুবৃহৎ সহরের স্বাধীনতা রক্ষার ভার নগরবাসীদের হাতেই অর্পিত ছিল; সুতরাং গুটেনবার্গের এই অসমসাহসিক কার্য তাঁহার নির্ভীক চরিত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বিকাশ বলা যায়। কর্পোরেশন ও মেয়র মনে করিলেন যে, তাঁহাদের সহযোগী অধিবাসী অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা উক্ত কেরাণীকে মুক্তিদানের জন্য গুটেনবার্গকে অনুরোধ করেন। গুটেনবার্গ অনুরোধ রক্ষা করিলেন বটে, তবে কেরাণীকে টাকা

প্রদান না করিলে আরও ভয়াবহ বিপদে পড়িতে হইবে বলিয়া শাসন করিয়াছিলেন।

বিচারালয়ে গুটেনবার্গ

১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে আমরা গুটেনবার্গকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে দেখি। এইবার তিনি নিজে আসামী ছিলেন। অভিযোগের বিবরণ এই যে, Emmeline zu Iserne-Thüre নাম্নী একটি মহিলাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি উহা ভঙ্গ করিয়াছেন। এই মোকদ্দমা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই; কারণ তিনি অবিলম্বে উক্ত মহিলাকে বিবাহ করিয়া এই জটিল সমস্যার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন!

বিভিন্ন বিষয়ে গুটেনবার্গ

মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবনের সম্ভাবনায় মনোনিবেশ করার পূর্বে গুটেনবার্গ আরও বহুবিধ দুঃসাহসিক অর্থকরী ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। ২৮ বৎসর বয়সে তিনি Andrew Dritzen নামক এক ব্যক্তির সহিত অংশীদারী কারবারে অবতীর্ণ হন। এই কারবারের উদ্দেশ্য ছিল গুটেনবার্গের নবোদ্ভাবিত প্রস্তর মসৃণ করার উপায়কে প্রচার করা। কিছুকাল পরে তিনি দর্পণ প্রস্তুতের প্রণালীর উন্নতি বিধানে সমর্থ হন। অবিলম্বে তিনি দুইটি বন্ধুর সহায়তায় যথোচিত মূলধন সংগ্রহ করিয়া বহুসংখ্যক দর্পণ প্রস্তুত করিলেন। তিনি এই দর্পণগুলি Aix-la-Chapelleএর তীর্থযাত্রীদের নিকট বিক্রয় করিয়া ধনবান্ হইবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তীর্থযাত্রা কিছুকাল বন্ধ ছিল; ফলে বাজারে গুটেনবার্গের দর্পণরাজি অবিক্রীত রহিয়া গেল!

মুদ্রাযন্ত্র নির্মাণে গুটেনবার্গ

১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে চালনক্ষম অক্ষরমালার সমবায়ে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের জন্য গুটেনবার্গ Audrew Dritzehn, Andrew Heilmann ও Anton Heilmannএর সহিত অংশীদারী কারবারে অবতীর্ণ করেন। অংশীদার-গণের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য পাইয়া গুটেনবার্গ কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং অনতিবিলম্বে স্বীয় গবেষণায় আত্মহারা হইয়া যান। কিন্তু সিদ্ধির মন্দিরতলে উপনীত হইবার পূর্বেই Andrew Dritzehn মারা যান; তাঁহার ভ্রাতারা মনে করিলেন যে, গুটেনবার্গ এমন কোন গুপ্ত বিষয় অবগত আছেন, যাহা দ্বারা প্রভূত অর্থের মালিক হওয়া যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তের বশে তাঁহারা Dritzehnএর উইলের অছি হিসাবে উক্ত গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করার জন্য গুটেনবার্গের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুটেনবার্গ মোকদ্দমার প্রতিবাদ করেন। বহুকাল বিলম্বের পর ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে Dritzehnএর ভ্রাতা-গণের বিরুদ্ধে বিচারক রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময় এইরূপে ব্যাহত হইয়া গুটেনবার্গ প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে আদৌ অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

এই মোকদ্দমায় গুটেনবার্গের এই শিক্ষালাভ হইল যে, তিনি আর কখনো অংশীদারী কারবার করিবেন না। কিন্তু তাঁহার টাকার দরকার, অথচ গবেষণায় নিরত থাকায় তিনি টাকা উপার্জনেও অক্ষম। সুতরাং তিনি ঋণ করিয়া প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৪৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ৮০ লিভার ধার করেন। এই অর্থ ও নিজের সঞ্চিত অর্থে এক বৎসর চলিল। পরে ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি Martin Brehter নামক মহাজনের নিকট হইতে পুনরায় অর্থ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। এই ঋণের দলিলপত্র বর্তমান; কিন্তু তৎপরবর্তী চারি বৎসরের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে ইহা দেখা যায় যে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার নামে যথানিয়মে ট্যাক্স দিতেন।

মাইন্‌টজএ আগমন

উপরি লিখিত চারি বৎসরের মধ্যে তিনি ষ্ট্রাসবুর্গ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পিতৃপুরুষের বাসভূমি মাইন্‌টস্‌এ ফিরিয়া যান। এই স্থানে তিনি পিতৃপুরুষের প্রাচীন বাসগৃহে বসতি নির্ণয় করেন; এই বাসগৃহের নাম Zum Jungen; বহু পুরুষ ধরিয়া ইহাতে তাঁহার পিতৃপুরুষগণ

বাস করিতেন। এই স্থান-পরিবর্তনে তাঁহার বেশ কিছু অর্থব্যয় হইয়াছিল; ফলে দেখা গেল মাইন্‌টজএ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহার অসহোদর ভ্রাতা Arnold Gelthusএর নিকট হইতে ১৫০ গিল্ডার ধার করিতে বাধ্য হন।

এই সময়ের মধ্যে গুটেনবার্গ সুদীর্ঘ পরীক্ষার পর নিশ্চয় তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রকে পূর্ণতার উপকূলে উপনীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আশা করা যায়, যদিও আমরা তাঁহার অধ্যবসায়ের কোন সঠিক সংবাদ জানি না। কারণ দেখা গেল যে, অনতিবিলম্বে মাইন্‌টজ অধিবাসী সুচতুর স্বর্ণকার জোহান ফাষ্ট তাঁহাকে ৮০০ গিল্ডার দাদন প্রদান করিল; অবশ্য পরে আরও অর্থ প্রদত্ত হইয়াছিল; এই অর্থের জামিনস্বরূপ গুটেনবার্গ যে সমস্ত মুদ্রা-যন্ত্র সম্বন্ধীয় দ্রব্য বা যন্ত্রাদি ক্রয় করিবেন, তাহা বন্ধকস্বরূপ থাকিবে।

ম্যাজারিণ বাইবেল মুদ্রণ

পরিণামে এই অবিরাম ঋণ-গ্রহণ গুটেনবার্গকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া গেলেও প্রথমে ফাষ্টের সহিত এই অংশীদারী কারবার বেশ সফলতা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার মুদ্রণ-প্রণালী কার্যকরী প্রতিপন্ন হইল এবং তিনি ল্যাটিন ভাষায় ম্যাজারিণ বাইবেল মুদ্রণে নিরত হইলেন। এই ফোলিয়ো-বাইবেল প্রকাশিত হইবার পূর্বে গুটেন-বার্গের মুদ্রাযন্ত্রে কয়েকটি সামান্য বিষয় ও কয়েক ফর্মা গির্জার পাপ-মুক্তিপত্র মুদ্রিত করিয়াছিল। কিন্তু বাইবেলই তাঁহার প্রথম বৃহৎ কাজ; ইহা এত সুচারুরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল যে, অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির সমালোচকও সন্তুষ্টি প্রকাশ না করিয়া পারিত না। ইয়োরোপে মুদ্রিত এই প্রথম পুস্তক অদ্যাবধি পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট মুদ্রিত পুস্তকের অন্যতমরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

পুস্তকের অক্ষর আধুনিক যন্ত্রমালার সমবায়ে নির্মিত অক্ষরের মত সমতা প্রাপ্ত হয় নাই সত্য; মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধীয় বহু ভুল বর্তমান সন্দেহ নাই; তথাপি এই পুস্তক ছয়খানি উৎকৃষ্ট মুদ্রিত পুস্তকের অন্যতম বলিয়া গর্ব করিতে পারে। ইহার কৃষ্ণবর্ণ, পঞ্চদশ শতাব্দীর উৎকৃষ্ট লেখকের লেখা হইতে অনুকৃত দৃষ্টি আকর্ষণকারী অক্ষর, প্রশস্ত প্রান্তভাগ, সূক্ষ্ম আনুপাতিক ব্যবস্থা—সব সমস্বরে গুটেনবার্গের যন্ত্র ও কৌশলের জয় ঘোষণা করিতেছে। বর্তমানে এই বাইবেলের মাত্র ৩৮টি খণ্ড (তন্মধ্যে দুইখানি অসম্পূর্ণ) বর্তমান। ফলে এই বাইবেল পুস্তক-সংগ্রাহক ব্যক্তিবর্গের নিকট বিশেষ লোভনীয় বস্তু। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই বাইবেলের একখণ্ড ৩,৯০০ পাউণ্ডে বিক্রীত হইয়াছিল—কাগজে মুদ্রিত পুস্তকের মূল্য ইহাপেক্ষা বেশী দেখা যায় নাই।

ফাষ্ট ও গুটেনবার্গ

গুটেনবার্গের নবীন মুদ্রণপ্রণালী প্রথমে আর্থিক সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে ফাষ্ট গুটেনবার্গের অবিরাম ঋণ গ্রহণের জ্বালায় অস্থির হইয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। ফলে তিনি যে অর্থ ঋণদান করিয়াছেন, তাহা সমস্ত অবিলম্বে পরিশোধ করার জন্য গুটেনবার্গকে তাগাদা করিতে লাগিলেন, যদিও তিনি জানিতেন যে, গুটেনবার্গ উক্ত টাকা প্রদানে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

ইহাতে ফাষ্ট আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গুটেন-বার্গকে সমস্ত মুদ্রাযন্ত্র ফাষ্টকে প্রদান করিতে বাধ্য করেন এবং ইহা ফাষ্ট নিজের গৃহে লইয়া যান। ফাষ্ট স্বীয় গৃহে ভ্রাতুষ্পুত্রের সহায়তায় নিজে মুদ্রণ কার্য আরম্ভ করেন। এই সময়ে মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ল্যাটিন Psaltesএর edito princeps—এই পুস্তক ম্যাজারিণ বাইবেল অপেক্ষাও দুষ্প্রাপ্য।

গুটেনবার্গের শেষ জীবন

ফাষ্টের দ্বারা এইরূপে সর্বস্বান্ত হইয়া গুটেনবার্গ গভীর অধ্যবসায় ও বিপুল সাহস সহকারে নিজেই স্বতন্ত্রভাবে পুনরায় মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি মাইন্‌টজএর ডক্টর হোমারীর সহায়তা প্রাপ্ত হন; তিনি গুটেনবার্গকে নূতন মূলধন প্রদান করিলেন।

খুব ধীরগতিতে এই মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার কার্য চলিল।

ইহা মাইন্‌টজএর নিকটবর্তী Eltvilleএ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৎসরের পর বৎসর তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফলে তিনি মাইন্‌টজের আর্কবিশপ অ্যাডল-ফাসের সভাসদের পদ গ্রহণ করেন।

সভাসদ্‌রূপে তিনি বেশ মোটা বেতন পাইতেন এবং জীবনের শেষ তিন বৎসর এই পদে তিনি অতিবাহিত করেন। উহাতে তিনি কর্মব্যাপ্ত জীবনের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের জন্মদাতা গুটেনবার্গ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি নিঃসন্তান এমন কি বন্ধুহীন ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

প্রতিমূর্তি নির্মাণ

মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার ব্যতীত গুটেনবার্গের ব্যক্তিগত জীবনের বা কার্যাবলীর বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু মানব-সভ্যতার বিকাশে তাঁহার দান তুলনাহীন। মাইন্‌টজে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার একটি প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপে তাঁহার জন্মভূমি যে মনীষীকে জীবিতকালে সমাদর করে নাই, মৃত্যুর পর তাহার কথঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ করিল।

স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(১৩৪৪ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(২)

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর ডাক্তার চন্দ্র* জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতে তিনি M. R. C. S. (Member of Royal College of Surgeons) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ডাক্তারী ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি রাজকীয় সৈনিক বিভাগের কাজ লইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন।

বিলাতে পূর্বোক্ত রৌপ্যপদক (Zoologyএর জন্য প্রাপ্ত) ব্যতীত তিনি একখানি স্বর্ণপদক পান। এই স্বর্ণপদকের

সম্মুখভাগ

Robertus Fellowes L. L. D.
Merenti Proposuit.

পশ্চাদ্‌ভাগ

Morbis Inspectis
Descriptisque
Meruit.
Univ : coll : Lond :
Alumnus.

পদকের ধারে (edge) লেখা আছে Summer terms, 1856-57, Rajendra Chandra Chandra.

বিলাত যাত্রার পূর্বে তিনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে (কুড়ি বৎসর বয়সে) ধাত্রী বিদ্যায় পরীক্ষা দিয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় -"গুডিভ মেডাল"

লাভ করেন। এই পদকের—

সম্মুখদিকে

Medical College of Bengal
Founded
1836

* পূর্বে উল্লিখিত ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ তাঁহার জন্ম সাল নহে।

পশ্চাদ্‌ভাগে

Goodeve Medal
Awarded to
Rajendra Chandra Chandra
1853

লেখা আছে। পদকখানি Bronze এর কিন্তু ইহার ধার ও রিং সোনার।

ডাঃ চন্দ্র ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যখন বিলাত যান, সে সময়ে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ও সহকর্মিগণ তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। তাহাতে ২৬। ২৭ জনের স্বাক্ষর আছে। সেই স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে একজনের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। ইনি ডাঃ কেদারনাথ দত্ত। ইনি ডাঃ চন্দ্রের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে ইহার বয়স আশির উপর। ডাঃ চন্দ্র সম্বন্ধে ইনি বলেন—"ডাঃ চন্দ্র মেডিক্যাল কলেজে মেটিরিয়া মেডিকা ও ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক ছিলেন।* তৎকালে হৃদ্‌রোগ ও ফুস্‌ফুসের চিকিৎসায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। কেবল চিকিৎসা নহে, অধ্যাপনা ব্যাপারেও তাঁহার অসামান্য কৃতিত্ব ছিল। ছাত্রদিগকে তিনি খুবই স্নেহ করিতেন। পড়াইবার পদ্ধতিও তাঁহার সুন্দর ছিল। ছাত্রদের মধ্যে কাহারও কোন অসুখ করিলে, তিনি বিনা ভিজিটে তাঁহাদের দেখিতেন ও নানারূপ সাহায্য করিতেন। তাঁহার ১৬৲ টাকা ফি ছিল। কিন্তু অসমর্থ রোগীর কাছে অনেক সময় তিনি একটি মাত্র ফি গ্রহণ করিয়া, আমাদের ডাকিয়া বলিতেন,—'তোমরা সামান্য কিছু নিয়ে রোগীকে প্রত্যহ দেখিয়া আসিয়া আমাকে রিপোর্ট দিবে।' এইভাবে ছাত্রদিগকেও তিনি অনেক সময় অর্থ পাওয়াইয়া দিয়াছেন। মেডিক্যাল কলেজে তিনি প্রায় কুড়ি বৎসরকাল অধ্যাপনা করেন।"

ডাঃ চন্দ্রের আর একজন কৃতি ছাত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফকির চন্দ্র সাধু-খাঁ (ইহার বর্তমান বয়স প্রায় ৭০ বৎসর) বলেন—"ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদ্‌রোগের চিকিৎসায় তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। ছাত্রদিগের প্রতি তাঁহার অপরিসীম প্রীতি ও স্নেহ ছিল। তাঁহার একটি অমূল্য উপদেশ আমি আজীবন পালন করিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিতেন—'দেয় ব্যবস্থাপত্র (Prescription) লিখিয়া কখনও তোমরা কাটাকুটি করিবে না। ইহাতে বিপদ্‌ আছে। অনেক সময় কম্পাউণ্ডারেরা ঠিক পড়িতে না পারিয়া, একটার বদলে আর একটা ঔষধ দিয়া বিভ্রাট বাধাইয়া তোলে। ইহার ফলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। আমার জীবনে, এ অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিয়াছি'।" আজকালকার এবং অধুনা পরলোকগত চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারী ডাঃ চন্দ্র Brigade Surgeon এর পদলাভ করেন এবং এই বৎসরের ১৯এ আগষ্ট তিনি অস্থায়ী Inspector General of Civil Hospitals (Bengal) হন।

কলিকাতায় তিনি ৯৩ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে বাস করিতেন। এখানে তাঁহার সহিত তাঁহার পত্নী মেরী চন্দ্রও থাকিতেন। মেরী চন্দ্র ডাক্তার চন্দ্রের আত্মীয়স্বজনকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী চূণীমণি দাসীকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন এবং অনেক সময় তিনি তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মেরী চন্দ্র পরলোকগমন করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর বিলাতে ডাঃ চন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ ও বিলাতে ডাঃ চন্দ্রের বহু সম্পত্তি ছিল। এই সমস্ত সম্পত্তির মূল্য প্রায় আট লক্ষ টাকা। এই সমস্ত সম্পত্তি, ডাক্তার চন্দ্রের মৃত্যুর পর, দানাদি কার্যে

* "Dr. R. C. Chunder F. R. C. S. 1874-1893. Professor of Materia Medica & Clinical Medicine." Page 115. The Centenary Report of the Medical College, Bengal.

প্রদানান্তর, প্রায় তুল্যাংশে তাঁহার সহোদরা চুণীমণি দাসী ও সহোদর মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র পান।

বিলাতে—

১। Brompton Hospital for consumptivesএ £ 2000

২। London Hospitalএ £ 1000

৩। তাঁহার পত্নীর মৃত্যু-শয্যায় যে ধাত্রী সেবা করেন তাঁহাকে যাবজ্জীবন মাসিক £ 10 হিসাবে দেওয়া হয়।

এখানে কলিকাতায়—

১। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে দশ হাজার টাকা —Dr. R. C. Chunder Scholarship for original research of Indian indigenous drugs. (কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর "রঙ্গন ফুল" সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া একবার এই পুরস্কার বাবদ ৭৫০৲ টাকা পুরস্কার পান।)

২। ডাক্তার চন্দ্রের পত্নীর নামে——১৫,০০০৲ পনের হাজার টাকা—Mary Chandra Scholarship (ইহার সুদে একটি মেয়ে "স্বর্ণময়ী হোষ্টেলে" থাকিয়া ডাক্তারি শিক্ষা করিতে পারে।)

৩। Propagation of Christianityর জন্য Duff College এর কর্তৃপক্ষের হাতে ৭,০০০৲ সাত হাজার টাকা।

এ সমস্ত ব্যতীত জীবিতকালে ডাক্তার চন্দ্র বহু সৎকার্যে অনেক অর্থ দান করিয়া যান।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে তাঁহার একখানি তৈল-চিত্র আছে। ইহা কলেজ হাসপাতালের দ্বিতলে প্রধান সোপানশ্রেণীর পশ্চিম কোণে রক্ষিত।

পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় মাত্র নিজের প্রতিভা ও অনন্য-সাধারণ অধ্যবসায় বলে ডাঃ চন্দ্র যে সম্মান ও কৃতিত্ব অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকের ভাগ্যে সুদুর্লভ।*

সমাপ্ত

জাতীয় সংবাদ

ইউনিয়ান বোর্ডের সুবর্ণবণিক্‌ প্রেসিডেণ্ট

কিছুদিন হইল ঢাকা জিলার কেয়াইন ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। কাদিশাল কেয়াইন ইউনিয়ান বোর্ডের অন্তর্গত; উক্ত নির্বাচনে কাদিশাল "শঙ্কর-কুটীর" নিবাসী, বিক্রমপুর সুবর্ণবণিক্‌ সমাজের বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র পাল মহাশয় প্রেসিডেণ্ট এবং উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভুবনমোহন পাল মহাশয় ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র পাল মহাশয় ১৩২৯ সালে কেয়াইন ইউনিয়ান বোর্ডের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন এবং এযাবৎকাল ৫টি termএ সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার বোর্ড, বেঞ্চ ও কোর্টের কার্য-দক্ষতার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বহু প্রথম শ্রেণীর সার্টি-ফিকেট, স্বর্ণাঙ্গুরী, রিষ্টওয়াচ ও পদক প্রভৃতি পুরস্কার পাইয়াছেন। মহিম বাবুর পূর্বে উক্ত গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার দেবেন্দ্রচন্দ্র পাল মহাশয় ১৩১৫ সাল হইতে ১৩২৮ সাল পর্যন্ত সুনামের সহিত প্রেসিডেণ্টএর কার্য করিয়াছেন; মহিম বাবু তখন ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর মহিম বাবু উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্রমান্বয়ে ৩০ বৎসর যাবত কাদিশালের সুবর্ণবণিক্‌গণ ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যশের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। কেয়াইন ইউনিয়ান বোর্ডে সুবর্ণবণিকের সংখ্যা উক্ত ইউনিয়ানের ২৫ মাত্র।

---

* প্রবন্ধের এই অংশের উপকরণসমূহের জন্য আমি ডাঃ চন্দ্রের ভাগিনেয়পুত্র বহুবাজার নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দে মহাশয়ের

কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজ

(১)

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন

গত ৬ই ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকার সময় সমাজের কার্যালয়ে একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। সমাজ-মন্দির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ট্রাষ্টী নির্বাচন এই সভার একমাত্র নির্ধারিত বিষয় ছিল। সমাজের সভাপতি ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় সর্ব-সমেত ১৪১ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

সভারম্ভ হইলে সম্পাদক সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া ট্রাষ্টীগণের নির্বাচনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন এবং বিগত ২৬শে বৈশাখ তারিখের বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত ট্রাষ্টডিডের আবশ্যক অংশ পাঠ করেন। সমবেত সভ্যগণকে ট্রাষ্ট-ডিডে লিখিত নিয়মানুযায়ী সাত জন ট্রাষ্টী নির্বাচন করিতে অনুরোধ করেন।

উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ ট্রাষ্ট-ডিডের অংশ বিশেষে আপত্তি উত্থাপন করেন এবং অবৈধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। অপর কয়েক জন বৃষ্টি, ভাদ্র মাস প্রভৃতি কারণ প্রদর্শনপূর্বক নির্বাচন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করেন। এই সমস্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন যে, যখন পূর্ব অধিবেশনে ট্রাষ্ট-ডিড যথারীতি গৃহীত হইয়াছে তখন বর্তমান সভায় তাহার বিরুদ্ধে কোনও প্রস্তাব চলিতে পারে না; বিশেষতঃ ট্রাষ্টীগণের নির্বাচনের অভাবে সমাজমন্দিরের কার্য অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; সুতরাং অকারণে বা কল্পিত আপত্তিতে নির্বাচন বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

অতঃপর সমাজের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী যাঁহারা বর্তমান বর্ষের পূরা চাঁদা দিয়াছেন তাঁহাদিগকে নির্বাচনের মুদ্রিত তালিকা দেওয়া হয়।

"ক" পর্যায় ভুক্ত (A Class) ট্রাষ্টীগণের মধ্য হইতে অর্থাৎ যাঁহারা সমাজভবন নির্মাণকল্পে দুই হাজার টাকা মধ্য হইতে পাঁচজন এবং "খ" পর্যায় (B Class) ভুক্ত সভ্যগণ যাঁহারা একশত টাকা বা তাহার অধিক চাঁদা বা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্য হইতে দুইজন মোট, সাতজন ট্রাষ্টী নির্বাচিত হইবেন।

অতঃপর সম্পাদক নিম্নলিখিত পদপ্রার্থী সভ্যগণের নাম এবং চাঁদার পরিমাণ বিবৃত করেন।

"ক" পর্যায় (A Class)

১।	ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা	৫০০০৲
২।	কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায়	৫০০০৲
৩।	কুমার গোকুলচন্দ্র লাহা	৫০০০৲
৪।	কুমার কার্তিকচরণ মল্লিক	২৫০০৲
৫।	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র শীল	২০০০৲
৬।	" অরুণপ্রকাশ বড়াল	২০০০৲

"খ" পর্যায় (B Class)

১।	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন	২৫০৲
২।	" নটবরচন্দ্র দত্ত	১০০৲
৩।	" বল্লভচাঁদ বড়াল	১০০৲

উক্ত প্রতিশ্রুতির মধ্যে কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রথম কিস্তি নগদ ২০০০৲ টাকা ইতিপূর্বে দিয়াছেন এবং কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায় সভায় ৫০০০৲ টাকার চেক প্রদান করেন।

সভ্যগণের নিকট হইতে অপরাপর প্রতিশ্রুতি ও নগদ দান যাহা পাওয়া গিয়াছিল সম্পাদক সেইগুলি সভায় প্রকাশ করেন।

তদনন্তর নির্বাচনের নিয়মানুযায়ী ব্যালট ভোট দ্বারা নিম্নলিখিত সভ্যগণ নির্বাচিত হয়েন।

A Class	১।	ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা
	২।	কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায়
	৩।	" কার্তিকচরণ মল্লিক
	৪।	" গোকুলচন্দ্র লাহা
	৫।	শ্রীযুক্ত অরুণপ্রকাশ বড়াল
B Class	৬।	" উপেন্দ্রনাথ সেন

পরিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১। স্থিরীকৃত হইল যে ট্রাষ্টীগণকে তাঁহাদের প্রতিশ্রুত চাঁদা বর্তমান বর্ষের কার্ত্তিক মাসের মধ্যে সমাজের তহবিলে জমা দিতে হইবে এবং পূজার বন্ধের পর হাইকোর্ট খুলিলে পাকা ট্রাষ্ট-ডিড্ স্বাক্ষরিত এবং রেজেষ্টীকৃত হইবে। উক্ত সময় মধ্যে প্রতিশ্রুত চাঁদা বা অন্ততঃ ট্রাষ্ট-ডিডে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা (দুই হাজার বা একশত) যিনি জমা না দিবেন তাঁহার নাম ট্রাষ্টী-তালিকা হইতে অপসারিত হইবে এবং ট্রাষ্টডিডে লিখিত নিয়মানুযায়ী বিশেষ সাধারণ সভায় তাঁহার স্থলে নূতন ট্রাষ্টী নির্বাচিত হইবে।

পরিশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য শেষ হয়।

(২)

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন

(ক)

গত ৬ই ভাদ্র রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় সমাজের কার্যালয়ে সমাজের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় মোট ১৩১ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন এবং ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সমাজের অষ্টাবিংশ এবং ঊনত্রিংশ (২৮ ও ২৯) বর্ষের কার্য-বিবরণী পঠিত হইলে সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তৎপর উক্ত দুই বর্ষের আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের পরীক্ষিত হিসাব গৃহীত হয়।

বার্ষিক ন্যূন এক টাকা চাঁদায় মহিলা সভ্য নিয়োগ করিবার পক্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদিত প্রস্তাব সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত হয় এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ আঢ্য উহা সমর্থন করেন।

স্থিরীকৃত হইল যে, সমাজের প্রচলিত নিয়মের আবশ্যক পরিবর্তন করিয়া উক্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হউক এবং উহা সর্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

গণের নির্বাচনার্থ ৬০টি নাম সম্বলিত মুদ্রিত নির্বাচন-পত্র সভ্যগণকে দেওয়া হয়। সমাজের বর্তমান নিয়মানুযায়ী ঐ তালিকা হইতে ২২টি নাম কাটিয়া সভ্যগণ উক্ত তালিকা সভাপতিকে অর্পণ করেন। তৎপর সভা কর্তৃক ভোটগণনাকারিগণ নির্বাচিত হইয়া ভোট পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ইত্যবসরে কুমার কার্তিকচরণ মল্লিকের উপর সভার পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা সভা ত্যাগ করেন।

আনুমানিক দুই ঘণ্টা সময়ের পর ভোটপরীক্ষকগণের কার্য শেষ হয় এবং ভোটের সংখ্যা অনুযায়ী ৩৮ জন সভ্য নির্বাচিত হয়েন। সভাপতি উক্ত ৩৮ জনের নাম এবং ভোটের সংখ্যা এবং অনির্বাচিত সভ্যগণের নাম এবং ভোটের সংখ্যা সভায় প্রকাশ করেন এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় সভার কার্য্য স্থগিত করেন।

স্থিরীকৃত হইল যে, তিন সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় স্থগিত অধিবেশনের অবশিষ্ট কার্য, অর্থাৎ কর্মাধ্যক্ষগণের নির্বাচন, অপর একটি সভা আহ্বান করিয়া সম্পন্ন করা হইবে।

পরিশেষে উভয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

(খ)

গত ২৭শে ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় ৬ই ভাদ্র তারিখের স্থগিত বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্য পুনরারম্ভ হয়। সভায় এই দিবস মোট ৬৬ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন এবং ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার নির্ধারিত কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে সম্পাদক নিতান্ত দুঃখিতান্তকরণে সভায় বিজ্ঞাপিত করেন যে, কলিকাতার বিখ্যাত মল্লিকবংশোদ্ভব অশেষগুণসম্পন্ন মহানুভব পান্নালাল মল্লিক মহাশয় গত ২৪শে ভাদ্র তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে সমাজের অন্যতম সহকারী সম্পাদক এবং কর্মী শ্রীযুক্ত নটবরচন্দ্র দত্তের একটি ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক পুত্রের মৃত্যু

দুর্ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার পুত্রের সদ্গতি কামনায় দণ্ডায়মান হইয়া তাহার আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং সমাজের পক্ষ হইতে একখানি শোক-সূচক পত্র পাঠাইবার জন্য প্রস্তাব করেন।

৺পান্নালাল মল্লিকের মৃত্যুতে সভাপতির অনুরোধে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। জাতির আন্তরিক হিতকামী মনস্বী বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী বহুতীর্থ পর্য্যটক ধর্মনিষ্ঠ প্রবীণ বৈষ্ণব, সমাজের ভূত-পূর্ব সহকারী সভাপতি মল্লিকবংশোদ্ভব মল্লিক লজ নিবাসী পান্নালাল মল্লিক মহোদয়ের পরলোক গমনে এই সভা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং ভগবৎ-সমীপে তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছে।

স্থিরীকৃত হইল যে, এই প্রস্তাবের অনুলিপি পান্নালাল বাবুর জ্যেষ্ঠ-পুত্র শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মল্লিকের নিকট প্রেরিত হইবে।

তৎপরে সম্পাদক পূর্ব অধিবেশনে অর্থাৎ ৬ই ভাদ্র তারিখের সভায় নির্বাচিত ৩৮ জন সভ্যের নাম পাঠ করেন। তৎপর তিনি ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহার নাম সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত সুবোধ কুমার দত্ত উহা সমর্থন করিলে সভা কর্তৃক সর্ববাদিসম্মতি-ক্রমে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত (এডভোকেট) ছয় জন সহকারী সভাপতির নাম প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক উহা সমর্থন করিলে সর্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার দত্ত প্রস্তাব করেন যে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদক নির্বাচিত হউন। শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ দে উহা সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত রাধারমণ দত্ত সম্পাদকের পদের জন্য শ্রীযুক্ত নটবরচন্দ্র দত্তের নাম প্রস্তাব করেন এবং ঐ প্রস্তাব যথা-রীতি সমর্থিত হইলে সভাপতি দুইটি নাম ভোটে দেন এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন অধিকাংশমতে সম্পাদক নির্বাচিত হয়েন।

সেন প্রস্তাব করেন শ্রীযুক্ত নটবরচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত সুবোধ কুমার দত্ত মহাশয়ের নাম। এই প্রস্তাব যথা-রীতি সমর্থিত এবং উভয়েই সর্ববাদিসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হয়েন।

সম্পাদকের প্রস্তাবে এবং সর্ববাদিসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অনুকূলচরণ রায় ধনরক্ষক নির্ব্বাচিত হয়েন।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ আঢ্য আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্বাচিত হউন। এই প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত হয়।

শ্রীযুক্ত রাধারমণ দত্ত কর্তৃক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দের নাম উক্ত পদের জন্য প্রস্তাবিত এবং যথারীতি সমর্থিত হয়।

উভয় নাম ভোটে দেওয়া হইলে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে অধিকাংশ মতে আয়-ব্যয় পরীক্ষক নির্বাচিত হইলেন।

নিম্নলিখিত সভ্যগণ বর্তমান বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

সভাপতি

ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা

সহকারী সভাপতি

কুমার কার্তিকচরণ মল্লিক

,, বিষ্ণুপ্রসাদ রায়

,, গোকুলচন্দ্র লাহা

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য বি এ

রায় বাহাদুর গোপীনাথ সেন বি এ

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র শীল বি এ

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন

সহঃ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নটবরচন্দ্র দত্ত

,, সুবোধকুমার দত্ত এম এস-সি

ধনরক্ষক

শ্রীযুক্ত অনুকূলচরণ রায়

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

অপর সভ্যগণ

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী
,, অরুণপ্রকাশ বড়াল
,, আনন্দলাল মল্লিক (১)
,, আনন্দলাল মল্লিক (২)
,, উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক
,, কার্তিকচন্দ্র মল্লিক বি এল্
,, কালঙ্কর মল্লিক
,, কিরণচন্দ্র দত্ত
,, কিষণচাঁদ বড়াল
,, কুলচন্দ্র দত্ত
,, শ্রীকৃষ্ণদাস দে
,, গদাধর মল্লিক
,, গুরুদাস দত্ত এটর্ণি
,, গোপীনাথ নন্দী এম এ, বি এল
,, দীননাথ মল্লিক এর্টণি
,, পশুপতি ধর
,, বৈদ্যনাথ সেন
,, ভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক এর্টণি
,, ভোলানাথ দত্ত বি এল, এডভোকেট
,, মহেন্দ্রনাথ আঢ্য
,, রাখালচন্দ্র দত্ত
,, রাজকুমার দে এর্টণি
কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মল্লিক
,, হরিদাস নন্দী

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

(৩)

কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন

গত ২রা আশ্বিন শনিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় ২৭নং মদন বড়াল লেনে সমাজের নূতন কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আপ্রতিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী এবং উৎসাহী সভ্য কলিকাতা প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট নিবাসী নবকুমার দে মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সমাজের প্রতি নবকুমার বাবুর আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির উল্লেখ করিয়া সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করেন। উপস্থিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া নবকুমার বাবুর আত্মার উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করেন। স্থিরীকৃত হইল যে, সমাজের পক্ষ হইতে সম্পাদক শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া একখানি পত্র নবকুমার বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজকুমার দে মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন।

শিক্ষা-সাব-কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকুমার দে বর্তমান বর্ষে যে সমস্ত ছাত্রগণকে বৃত্তি দেওয়ার সুপারিশ করিয়া তাহাদের নামের তালিকা পাঠাইয়াছিলেন সম্পাদক তাহা অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপিত করেন।

শ্রীযুক্ত দীননাথ মল্লিক উক্ত বৃত্তি অনুমোদনে আপত্তি করেন এবং বলেন যে শিক্ষা-সাব-কমিটির সভায় মাত্র দুইজন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং প্রাপ্ত দরখাস্তগুলি পুনরায় পরীক্ষা করা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস দত্ত এই আপত্তি অনুমোদন করেন।

সাব-কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক এই আপত্তির উত্তরে বলেন যে, অধিবেশনের রাত্রে অত্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় সম্ভবতঃ অপর সভ্যগণ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আর একজন উপস্থিত থাকিলেই সভার যথারীতি কোরাম হইতে পারিত; কিন্তু তাহা না হইলেও তিনি এবং রাজকুমার বাবু সমস্ত দরখাস্তগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা এবং পরীক্ষা করিয়া ২৪ জন আবেদনকারীর মধ্য হইতে ১২ জনকে বৃত্তি দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

সম্পাদক বলেন যে, রাজকুমার বাবু আবেদনকারী-গণের সম্পূর্ণ তালিকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং বৃত্তিদানে বিলম্ব করিলে নিরপরাধ ছাত্রগণের বিশেষ অসুবিধা হইবে। সুতরাং প্রস্তাবিত বৃত্তিগুলি সাব-কমিটির সুপারিশ বলিয়া বিবেচনা না করিয়া কার্যনির্বাহক সমিতি নিজ

অতএব তিনি সভাকে বৃত্তিগুলি মঞ্জুর করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

দীননাথ বাবু তাঁহার আপত্তি প্রত্যাহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হইলে অধিকাংশ মতে রাজকুমার বাবুর প্রস্তাবিত বৃত্তিগুলি মঞ্জুর করা হইল। তদনুযায়ী নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বর্তমান বর্ষের মে মাস হইতে এক বৎসরের জন্য বৃত্তিভোগী বলিয়া নির্ধারিত হইল।

	নাম	নিবাস	স্কুল	শ্রেণী	পাঠ	মাসিক সাহায্য
১।	শ্রীমান অভয়পদ দত্ত	কলিকাতা	মেডিকেল	২য় বার্ষিক		৬৲
২।	,, ননীগোপাল দাস	ঐ	বঙ্গবাসী	ঐ-ঐ আই এ		৩৲
৩।	,, সুরেন্দ্রনাথ সেন	ঐ	স্কটিসচার্চ	৩য় ঐ বি এ		৫৲
৪।	,, গোবিন্দপদ মল্লিক	ঐ	ঐ	৪র্থ ঐ ঐ		৪৲
৫।	,, লক্ষীকান্ত দত্ত	ঐ	বিদ্যাসাগর	৩য় ঐ	বি কম	৫৲
৬।	,, রজনীকুমার দত্ত	ঐ	ঐ	১ম ঐ	আই কম	৫৲
৭।	,, রাসবিহারী দাস	ঐ	যাদবপুর	জুনিয়ার	টেক্‌নিক্যাল	৫৲
৮।	,, বিশ্বেশ্বর পাল	ঢাকা	আশানুল্লা	১ম বার্ষিক	ওভারসিয়ার	৫৲
৯।	,, কানাইলাল দে	নদীয়া	রিপন	ঐ	আই এস-সি	৫৲
১০।	,, ভোলানাথ বড়াল	দিনাজপুর	ঐ	ঐ	ঐ	৫৲
১১।	,, জিতেন্দ্রনাথ ধর	কলিকাতা	সিটি	ঐ	ঐ	৫৲
১২।	,, সুরেন্দ্রনাথ পাইন	ঐ	বঙ্গবাসী	ঐ	আই এ	৫৲
১৩। ১৪।	আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের ২ জন ছাত্র					২৲

নিম্নলিখিত সাব-কমিটিগুলি গঠিত হইল।

শিক্ষা সাব-কমিটি

১। কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায় (সভাপতি), ২। শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক, ৩। শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার দত্ত, ৪। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দে, ৫। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ আঢ্য, ৬। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ নন্দী, ৭। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর, ৮। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, ৯। শ্রীযুক্ত রাজকুমার দে (সম্পাদক)।

বিল্ডিং সাব-কমিটি

১। ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা (সভাপতি), ২। কুমার কার্তিকচরণ মল্লিক, ৩। কুমার গোকুলচন্দ্র লাহা, ৪। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দে, ৫। শ্রীযুক্ত অরুণপ্রকাশ বড়াল, ৬। শ্রীযুক্ত নটবরচন্দ্র দত্ত, ৭। শ্রীযুক্ত অনুকূলচরণ রায়, ৮। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত, ৯। শ্রীযুক্ত পতিতপাবন দে, ১০। শ্রীযুক্ত বল্লভচাঁদ বড়াল, ১১। কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায়, ১২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদক)।

প্রচারক সাব-কমিটি

উপেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩। শ্রীযুক্ত পশুপতি ধর, ৪। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পাইন, ৫। শ্রীযুক্ত রাধারমণ দত্ত, ৬। শ্রীযুক্ত দুলালচাঁদ লাহা, ৭। শ্রীযুক্ত বল্লভচাঁদ বড়াল, ৮। শ্রীযুক্ত কালগুর মল্লিক (সম্পাদক)।

নিয়ম পরিবর্তন সাব-কমিটি

১। ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা (সভাপতি), ২। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর, ৩। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৪। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত, ৫। শ্রীযুক্ত গুরুদাস দত্ত, ৬। শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক, ৭। শ্রীযুক্ত দীননাথ মল্লিক, ৮। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, ৯। শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার দত্ত, (সম্পাদক)।

চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ আঢ্য মহাশয়ের একখানি পত্র পঠিত হইল। তাহাতে তিনি "বীরভূম বার্তা" পত্রিকায় সুবর্ণবণিকের বিরুদ্ধে অসম্মানসূচক একখানি পত্র প্রকাশিত হওয়ায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

বীরভূম জেলার সেটলমেন্ট রিপোর্টে সুবর্ণবণিক্

হওয়ায় বলাই বাবু তাহারও প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারও অনুলিপি তিনি পত্র মারফৎ সমাজের সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

উক্ত পত্রদ্বয় পাঠান্তে সভ্যগণ বলাই বাবুকে ধন্যবাদ জানাইবার জন্য সম্পাদককে অনুরোধ করেন।

সভার নির্ধারিত কার্যাবসানে সম্পাদক তাঁহার ভবনে শুভাগমন করিয়া সভার কার্য সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি এবং সভ্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। পরিশেষে চা ও জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

(৪)

কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন

গত ১০ই আশ্বিন শনিবার রাত্রি ৭৷৷০ ঘটিকার সময় সমাজ-মন্দিরে কার্যনির্বাহক সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল। রায় বাহাদুর গোপীনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিগত ২রা আশ্বিন তারিখের কার্যনির্বাহক সমিতির বিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

সমাজের বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাসের আয়ব্যয় প্রদত্ত হইল।

স্থিরীকৃত হইল যে আগামী ২১শে কার্তিক রবিবার স্বর্গীয় নবীনচাঁদ বড়াল মহাশয়ের ভবনে সমাজের বার্ষিক বিজয়া সম্মিলনী হইবে। এই অনুষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহার্থ একশত টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইল।

বিজয়া-সম্মিলনের কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণ লইয়া একটি সাব-কমিটি গঠিত হইল।

১। শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল
২। ,, গোপীনাথ নন্দী
৩। ,, আনন্দলাল মল্লিক
৪। ,, ননীগোপাল দে
৫। ,, সুবোধকুমার দত্ত
৬। ,, কিরণচন্দ্র দত্ত
৭। ,, উপেন্দ্রনাথ সেন

স্থিরীকৃত হইল যে আগামী ২৮শে কার্তিক রবিবার সিকদারপাড়া ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত গদাধর মল্লিক মহাশয়ের ভবনে সমাজের সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হইবে। স্থিরীকৃত হইল যে, এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য দলপতিগণের অন্যতম প্রবীণ শ্রীযুক্ত নন্দলাল মল্লিক মহাশয়কে অনুরোধ করা হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের নূতন সভ্য নির্বাচিত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত গৌরচাঁদ আঢ্য
২। ,, নৃপেন্দ্রলাল দত্ত
৩। ,, তারকনাথ বড়াল
৪। ,, বনমালী শীল

সমাজের সভাপতি ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা বেঙ্গল ন্যাসনাল চেম্বার হইতে সেণ্ট্রাল জুট কমিটির সদস্য মনোনীত হওয়ায় এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে "বৈষ্ণব সভা" হইতে "ভক্তিসাগর" উপাধি পাওয়ায় সভ্যগণ আনন্দ প্রকাশ করেন।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

সমালোচনা

নলিনী-সুষমা—সুবর্ণবণিক্ জাতির পুরোহিত-বংশোদ্ভব বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ অক্লান্ত কর্মী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম জন্ম তিথি উপলক্ষে যে সমস্ত অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার কয়েকখানি লইয়া এই সুষমা গ্রথিত। ইহাতে সার্বজনীন সম্বর্ধনা-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ মনীষিগণ, বঙ্গদেশের যাবতীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী, মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদ্, রংপুর সাহিত্য-পরিষদ্, রাজসাহীর অধিবাসিবৃন্দ, শালিখা গোবর্ধন-সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ, চট্টগ্রাম সাহিত্য-পরিষদ্, নৈহাটি নারায়ণ বাণী-মন্দির, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবি নজরুল ইসলাম প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং সাহিত্যিকগণের অভিনন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া ডবল ক্রাউন ২২ পেজী আকারে পুস্তিকায় প্রকাশিত করা হইয়াছে। পুস্তকখানিতে পণ্ডিত মহাশয়ের দুইখানি হাফটোন ব্লক দেওয়ায় উহার শোভা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় আমাদের স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ, তাঁহার গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত। পুস্তকখানিতে মূল্যের কোন উল্লেখ নাই। প্রাপ্তি স্থান ৩৩নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

সুবর্ণবণিক সমাচার

২২শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪৫ সাল | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কৃত্রিম রেশম

শ্রীঅসিতকুমার নন্দী এম্ এস্-সি

গত বছর ৺ পূজোর বাজারে লক্ষ্য করে দেখেছিলাম ছেলেমেয়েদের জামা শতকরা ৭০টাই কৃত্রিম রেশমের তৈরী। কৃত্রিম রেশমের চাহিদা আজকাল অত্যন্ত বেড়ে গেছে। অধুনা অতিমাত্রায় প্রচলিত জর্জেট্ শাড়ীর অধিকাংশই কৃত্রিম রেশম হতে তৈরী। তারপর রবার সিল্ক, রেয়ন সিল্ক ইত্যাদি বিভিন্ন নামে এই কৃত্রিম রেশম বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

আসল রেশম বা সিল্ক গুটিপোকা থেকে পাওয়া যায়। গুটিপোকা mulberry বা তুঁত গাছের পাতা খেয়ে তাদের শরীর থেকে চকচকে সূতার মত এক প্রকার লালা বের করে। এই লালার সূতো দিয়ে গুটিপোকা তাদের নিজের শরীর আবৃত করে রাখে। গুটিপোকাগুলোকে গরম জলে ফেলে মেরে ফেলা হয় এবং তাদের শরীর থেকে এই সূতো খুলে নেওয়া হয়। এই সূতোই আসল রেশমী সূতো বা সিল্ক। আসল বা স্বাভাবিক সিল্কের দাম কৃত্রিম সিল্কের চেয়ে অনেক বেশী। আসল ও কৃত্রিম রেশমের তফাৎ এই, কৃত্রিম রেশম একটু কম টেঁকসই এবং কৃত্রিম রেশমের চেয়ে আসল রেশম অনেক বেশী মসৃণ, নইলে কৃত্রিম রেশমের চেয়ে আসল রেশমের প্রভেদ বড় বেশী নয়।

কৃত্রিম রেশম আসল রেশমের চেয়ে ঢের বেশী চক্‌চকে আর অতি সহজেই একে রং করা যায়। কৃত্রিম রেশমের প্রধান দোষ এর সূতো শক্ত নয়।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম রেশমের আজকাল অনেক উন্নতি হয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে কৃত্রিম রেশম [illegible]

সকল বিষয়েই আসল রেশমের সমকক্ষ হতে পারবে। হয়ত আসল রেশম তখন বাজার থেকে একেবারেই নির্বাসিত হবে। কৃত্রিম রেশমের ব্যবহার কেবল বস্ত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। নকল চুল, পরচুলা, পেট্রোম্যাক্স বা ডে-লাইট ইত্যাদি অত্যুজ্জ্বল বাতি জ্বালবার ম্যাণ্টেল তৈরী করতে কৃত্রিম রেশমের দরকার হয়।

এখন দেখা যাক কৃত্রিম রেশম কিভাবে তৈরী হয়। কৃত্রিম রেশম তৈরীর প্রধান উপাদান হচ্ছে সেলুলোজ; —কাঠ, ঘাস, খড়, তুলো, পাট, শণ, বাঁশ ইত্যাদিতে এই সেলুলোজ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ পূর্বোক্ত জিনিষগুলি এই সেলুলোজ দিয়েই তৈরী। কয়েক প্রকার বিভিন্ন নিয়মে সেলুলোজ হতে কৃত্রিম রেশম তৈরী করা যেতে পারে। তার মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলিই প্রধান।

(১) শার্দনের প্রথা (২) পলির প্রথা
(৩) ভিসকোস্ সিল্ক (৪) সেলুলোজ এসিটেট্ প্রথা

যে সমস্ত উপাদান হতে সেলুলোজ পাওয়া যায় তার মধ্যে কাঠই সস্তা। কাঠ হতে যে নিয়মে কৃত্রিম রেশম তৈরী হয় তাকে ভিসকোস্ প্রথা বলা হয়।

১৮৯২ সালে ক্রস ও বিভান নামক দুই বৈজ্ঞানিক এই প্রথা আবিষ্কার করেন। কাঠ হতে প্রাপ্ত সেলুলোজ প্রথমে concentrated বা তীব্র কষ্টিক সোডা দ্বারা দ্রব করে তাতে carbon di-sulphide মেশালে চটচটে আঠার মত এক প্রকার জিনিষ প্রস্তুত হয়। একে ভিসকোস বলে। এই ভিসকোস জলে দ্রব করে তাকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়ে অত্যন্ত চাপ সহকারে প্রবেশ করান হয়। এই প্রক্রিয়ায় সেই ভিসকোস সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রপথের মুখ দিয়ে অতি সূক্ষ্ম চক্‌চকে সুতোর মত হয়ে বেরিয়ে আসে। এই ভিসকোস বায়ুর সংস্পর্শে এলে নষ্ট হয়ে যায়। কাযেই সমস্ত যন্ত্রটি এমনি ভাবে তৈরী যে, এই সুতোগুলো বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারে না। সাধারণত কাচের অথবা প্ল্যাটিনাম নামক একপ্রকার বহুমূল্য ধাতুনির্মিত ছিদ্রের ভিতর দিয়ে এই ভিসকোস্‌কে আসে, সে গুলো ammonium chloride বা নিশাদলের সংস্পর্শে এনে পাকান হয়। Ammoninm chloride-এর সংস্পর্শে এলে এই সুতো দীর্ঘস্থায়ী ও শক্ত হয়। তারপর কয়েকটি সূক্ষ্ম সুতো একসঙ্গে পাকিয়ে একটি দৃঢ়তর সুতোয় পরিণত করা হয়। এই সুতো দিয়েই কৃত্রিম রেশম তৈরী হয়; তাকে রয়্যাল সিল্ক বলে। এই প্রথায় নির্মিত সিল্ক অন্যান্য প্রথায় নির্মিত সিল্ক অপেক্ষা কম শক্ত। অধুনা এই ভিস্‌কোস রেশমই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

আজকাল সাবানের বাক্স, বইয়ের জ্যাকেট্‌ ইত্যাদিতে একপ্রকার চক্‌চকে ও স্বচ্ছ কাগজ ব্যবহার করা হয়। এই কাগজকে সেলোফন কাগজ বলে। এই কাগজও ভিসকোস্ হতে তৈরী। কৃত্রিম রেশম যে নিয়মে তৈরী হয় ইহাও সেই নিয়মে তৈরী হয়। কেবল ভিসকোসকে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে প্রবেশ না করিয়ে পাতলা পাতের আকারে টেনে বের করা হয়। তারপর একে ammonium chloride দ্রবকে ভিজান হয়। এমনি করে সেলোফনের পাতলা চাদর তৈরী হয়। বায়োস্কোপের ফিল্মও এই শ্রেণীর পাতলা স্বচ্ছ চাদর।

স্বাভাবিক ও কৃত্রিম রেশমের মধ্যে তফাৎ এই যে স্বাভাবিক বা আসল রেশমে নাইট্রোজেন থাকে কিন্তু কৃত্রিম রেশমে একেবারেই নাইট্রোজেন নাই। কৃত্রিম রেশম স্বাভাবিক রেশমের চেয়ে কিছু বেশী ভারী ও তেমন শক্ত নয়। কিন্তু কৃত্রিম রেশমের দাম এত কম যে, সকলে ইহা ব্যবহার করতে পারে। সেই জন্যই বাজারে এর আজকাল এত চাহিদা।

নিম্নলিখিতভাবে পরীক্ষা করলে কৃত্রিম ও স্বাভাবিক রেশমের প্রভেদ বোঝা যায়—২০০° ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে কৃত্রিম রেশম পুড়ে যাবে। তার ছাই স্পর্শ করা মাত্রই গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু স্বাভাবিক রেশম পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও ধরা মাত্রই ছাই হয়ে যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে কৃত্রিম রেশমের সুতোকে ফাঁপা নলের মত দেখাবে আর স্বাভাবিক রেশমের

বৈশাখী ঝড়

শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ

চপল ঝড়ের রাতে
কেঁপে ওঠে যবে মহীরুহ সব ভীষণ রুদ্র বাতে।
মেঘে অগণন বজ্র স্বনন ভূতলে আলেয়া নৃত্য
চঞ্চল করে দূরের পথিকে ভয়াকুল সব চিত্ত।
পিশাচীর দল হাসে খল খল ভীষণ দশন মেলি,
ঝোড়ো হাওয়া তায় মাতালের প্রায় গগনে করিছে
কেলি।

প্রলয়-আঁধার ঢাকে চারিধার করাল কঠিন রূপ
চারিদিকে হায় শুধু জ্বলে যায় মরণ-যাগের ধূপ।
শাখায় শাখায় করে কোলাকুলি বৃক্ষ বৃক্ষ পরে,
ক্রোধে আজ তারা যেন দিশেহারা কণ্ঠে কণ্ঠ ধরে।
শিবাগণ তায় সভয়ে লুকায় থামিল কাকলি রব
শ্বাপদ বনের গৃহে একাকার ভয়ে ভীত আজ সব।
বিপদের দিনে হিংসা ভুলিয়া সকলে খুঁজিছে ঠাঁই—
মৃত্যু যে দ্বারে কেবা রাখে কারে উপায় দ্বিতীয় নাই!
গৃহীরা এবার সভয়ে দুয়ার করিল সকলে বন্ধ;
বোশেখের বায় অভিসারে যায় লুটিয়া ফুলের গন্ধ।
ঘনঘটা রণ জোঝে প্রাণপণ অসুর ও সুরের সাথে
বুঝি বসুধায় ভেঙ্গে দিতে চায় প্রলয়ে কালের হাতে।

সে ভীষণ নৈশ রণে
বন্ধ দুয়ার কুটির আমার কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
আমি একা ঘরে ভীত অন্তরে আকুল ভাবনাচয়,
অন্তর-দরী তিল তিল করি নিয়ত করিছে ক্ষয়!
আজ বুঝি হায় শেষ হয়ে যায় জীবনের খেলাগুলি—
নানা ছল করি এতকাল ধরি মরণে রয়েছি ভুলি।
বিরহের ভার সব কত আর কেমনে জীবন কাটে
যত স্মৃতি-রেখা মনে ছিল আঁকা জাগিল মানস পটে!
অতি অকস্মাৎ মৃদু করাঘাত দুয়ারে লাগিল ওই
এঘোর ঝঞ্ঝায় আঁধার নিশায় কেমনে বাহির হই।

চাহি চারিভিতে অতি আচম্বিতে দুয়ার ধরিনু চাপি
ঘন গুরু গুরু হিয়া দুরু দুরু শিহরি উঠিল কাঁপি।
নারীকণ্ঠস্বর অতি মনোহর পশিল শিথিল কানে;
মুছি আঁখি লোর ত্বরা খুলি দোর চাহিনু বাহির পানে।
সহসা কুটিরে প্রবেশিল ধীরে সিক্তবসনা নারী
ঘর করি আলো এল সেই বালা বসনে ঝরিছে বারি।
ছিঁড়ে গেছে তার অঞ্চলধার অশ্রুকাতর আঁখি
কোন্ সে অভয় নিঠুরহৃদয় আঘাতিল হায় একি!
দুটি আঁখি তার ছবি করুণার চপল মলিন দৃষ্টি
অতি অপরূপ কিবা তার রূপ বিধাতা করেছে সৃষ্টি।
কত কাঁটাবন করি নিপীড়ন বালিকা এসেছে আজ
পীঠে বেণী তার গলে ফুলহার নয়নে ঝরিছে লাজ।
বহু আশা নিয়ে তার দিকে চেয়ে আদরে শুধানু তারে—
কোথা তুমি যাও বল কিবা চাও বিজনে খুঁজিছ
কারে?

আঁধার টুটিয়া এসেছ ছুটিয়া বিজন কুটীরে মোর
যেওনাকো ফিরে রাখি আঁখিনীরে রজনী হয়নি ভোর।
রূপের পূজারী আমি চিরকাল দগ্ধ মলিন হিয়া
পূজিব তোমারে ভগ্নকুটিরে যা আছে আমার দিয়া।
কোন কথা তার নাহি বলিবার নয়নে অশ্রু ঝরে,
নিশীথ রাতের শুকতারা সম বিশাল আকাশ 'পরে।
সিক্ত কুন্তল শিহরিল তার বারেক কাঁপিল দেহ
দ্রুতপদে অতি চলি গেল সতী আঁধার করিয়া গেহ!
ভুল ভেঙ্গে যায় একি হোল হায় দুয়ার খুলিয়া দেখি—
ভরা নদীজল ছোটে কলকল দেবতা দিয়েছে ফাঁকি!
আমি মূঢ়মতি কি হবে যে গতি দেবতা চিনিতে নারি
আজ দয়া করি নারীরূপ ধরি আপনি এল যে হরি।
কভু কিরে আর দেখা পাব তার নিঝুম যমুনা-পার;
একবার যেই ফিরে যায় সে কি আসেনা কখনও আর।

স্বর্গীয় প্রেমলাল মল্লিক

শ্রীগোপীনাথ নন্দী এম্‌ এ, বি এল

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কলিকাতা সহরে সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের যে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল আজ আর তা নেই। নেই এর কারণ হয়ত অনেক কিছু, কিন্তু বর্তমান কালে সুবর্ণবণিক্‌সম্প্রদায়ের মধ্যে যে লজ্জাকর শ্রম-বিমুখতা দেখা দিয়েছে সেইটাই হচ্ছে এর প্রধান কারণ। এই শ্রমকাতরতা, এই অল্পশ্রমে অধিক সুখ-ভোগের প্রবৃত্তি, একটি ক্রমবিবর্ধমান ব্যাধির মত আমাদের সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি লোপ করতে বসেছে। আজ তাই আমাদের মধ্যে যাঁরা এখনও শ্রমের মর্যাদার উচ্চ আদর্শ তুলে ধ'রে রেখেছেন তাঁরা শুধু আমাদের আদর্শ-স্থানীয় নন্, প্রাতঃস্মরণীয়ও বটে।

স্বর্গীয় প্রেমলাল মল্লিক এই কারণে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে, আশৈশব ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তিনি যেভাবে আপনাকে আলস্যের মোহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন তা আজকের দিনে একেবারে বিরল না হলেও, কতকটা যে দুর্লভ সেটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। জীবনের শেষ ছুটির দিন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে, সে আনন্দের আস্বাদ তিনি পেয়েছিলেন। তাই তাঁর সকল কাজের মূল্য বাজার-দরের মাপকাঠিতে নির্ধারণ করা না গেলেও, সংসারক্ষেত্রে সকল চক্ষুর অন্তরালে তার যে প্রভাব সে প্রভাব অস্বীকার করবার যো নেই।

তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী হয়ত তিনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী বলে পরিচয় লাভ করবার সুযোগ পান নি, কিন্তু তবুও ফলাফলের হিসাব-নিকাশের বাহিরে নীরবে তিনি যে পরিশ্রম করে গেছেন, তার মর্যাদা নগণ্য নয়। দেশের সর্বসাধারণের কাছে হয়ত তাঁর সম্যক্ পরিচয় হয়নি; কিন্তু অন্তরঙ্গদের অন্তরে তিনি আপনার যে বিশেষত্বটুকু রেখে গেছেন তার স্মৃতি কোনদিনই ম্লান হবার নয়।

যোড়াসাঁকোর ঘড়ীওয়ালা বাড়ী কলিকাতাবাসী প্রায় সকলের নিকট পরিচিত। এই বাড়ীটি বাংলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, কারণ এই বাড়ীতেই সর্বপ্রথম টিকিট বিক্রয় করে আধুনিক প্রথায় বাংলা নাটকের অভিনয় সাধারণের নিকট প্রদর্শন করান হয়। বাড়ীর তদানীন্তন মালিকের কাছ থেকে স্বর্গীয় গোবিন্‌লাল মল্লিক ও তদীয় ভ্রাতাগণ এই বাড়ীখানি ১৮৮৫ সালের শেষভাগে ক্রয় করেন। বাড়ী কেনবার অল্পদিনের মধ্যেই গোবিন্‌লাল মল্লিকের দ্বিতীয় পুত্র শিশু প্রেমলাল এই নব গৃহে সন ১২৮৮ সাল ২০শে বৈশাখ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ভূমিষ্ঠ হন। গৃহ-প্রবেশের উৎসবের সুর মিলিয়ে যেতে না যেতে নবজাত অতিথির আগমন-উৎসবে সমস্ত গৃহখানি আনন্দ-মুখরিত হয়ে উঠেছিল। তারপর দীর্ঘ সাতান্ন বৎসরের সুখ-দুঃখ-ঘাত-প্রতিঘাতের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে যে শান্ত, সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন তিনি কাটিয়ে গেলেন তা শুধু সুবর্ণবণিক্‌সমাজে নয়, বাংলার সকল সমাজেই অনুকরণীয়।

জন্মের কয়েক বৎসর পর তাঁর যথারীতি বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। প্রথমে কয়েক বৎসর গৃহ-শিক্ষকের কাছে পড়বার পর আট বৎসর বয়সে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন, এইখানেই প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ ক'রে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।

ব্যবসায়ের প্রতি বরাবর তাঁর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল; এবং বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেই তিনি তাঁর বহুবিধ উদ্ভাবনী শক্তি এই ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। ১৩০৭ সালে পিতার সহিত নানাপ্রকার পেটেন্ট

স্বর্গীয় প্রেমলাল মল্লিক।

জন্ম—২০শে বৈশাখ সন ১২৮৮ সাল।

মৃত্যু—১৭ই ফাল্গুন ১৩৪৪ সাল।

মেডিসিনের ব্যবসা নিয়েই তাঁর ব্যবসায়ী জীবনের সূত্রপাত হয়। তারপর নানাসূত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। ১৩১৫ সালে তিনি গোবিনলাল মল্লিক এণ্ড সন্স নামক ঔষধালয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। তাঁর সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায় অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই এই ফার্মটি কলিকাতা সহরের একটি প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ঔষধালয় রূপে খ্যাতি লাভ করে। কালক্রমে তিনি অন্নপূর্ণা মেডিকেল ষ্টোর্স নামে আর একটি স্বতন্ত্র ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। কেবল ঔষধের ব্যবসার মধ্যেই তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে পারেন নি। ১৩১৮ সালে টালার "মেসার্স পি এল মল্লিক এণ্ড কোং" নামে একটি ফার্ম স্থাপন করে পাট ও অন্যান্য ভূষিমালের আড়ৎদারি ব্যবসা আরম্ভ করেন। পাটের কন্‌ট্রাক্টের কাজে এই ফার্মটির সহিত "এন্‌ড্রু ইউল এণ্ড কোং" "রেলী ব্রাদার্স" "জার্ডিন স্কিনার" "বার্কমায়ার ব্রাদার্স" "কেট্রেলওয়েল বুলেন" প্রভৃতি তদানীন্তন কয়েকটি প্রসিদ্ধ কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ১৩২৬ সালে তিনি কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে একত্রে "জে জে হেডওয়ার্ডস্ এণ্ড কোং" নামে আর একটি ফার্ম গঠন করেন। এছাড়া "বেঙ্গল মোটর কার কোং"-এর তিনি একজন অংশীদার ছিলেন। গত দুই বৎসর হইল তিনি "মল্লিক পারফিউমারী" নামে একটি পারফিমারীর ব্যবসাও করেন।

তাঁর শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় উক্ত জে জে হেড্‌ওয়ার্ডস্ এণ্ড কোম্পানীর কাজ নিয়েই কেটেছে। প্রথমে মুখ্যতঃ অর্ডার সাপ্লায়ের কাজ নিয়ে এই ফার্মটির সূত্রপাত হলেও এখন এর কার্যাবলী ব্যাপকতর ক্ষেত্র অবলম্বন করেছে। কলিকাতার ক্রীড়ামোদীর কারও কাছে এই কোম্পানীটির নাম আজ অবিদিত নেই। তিনি মৃত্যু-কালে এই ফার্মটির সর্বপ্রধান অংশীদার ছিলেন। ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার কয়েক মাস তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন, দর্শকদের সুখ-সুবিধা-বিধানের জন্য দিনের পর দিন তিনি যে কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, তা শুধু বাংলার ব্যবসাক্ষেত্রে নয়, কর্মক্ষেত্রেও আদর্শস্থানীয়।

তাঁর পারিবারিক জীবন শান্তিময় ছিল। ১৩০৬ সালে, তিনি ১৯ বৎসর বয়সে বড়বাজার আমড়তলা নিবাসী তদানীন্তন স্বনামধন্য এটর্ণি ৺আশুতোষ ধর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র সাতকড়ি ধর মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী পূর্ণশশী দাসীর পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীমতী পূর্ণশশী যথার্থই অন্নপূর্ণাস্বরূপিণী। তাঁর স্নেহার্দ্র মধুর স্বভাব ও মিষ্ট বাক্যের গুণে ৺প্রেমলাল মল্লিকের সংসারে সর্বদা একটি অপার্থিব শান্তি বিরাজমান ছিল। সাতকড়ি বাবুর জীবদ্দশায় তাঁর একমাত্র পুত্র ও কনিষ্ঠ কন্যার মৃত্যু হওয়ায় তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ রূপলালকে ১৩২৬ সালে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

প্রেমলাল মল্লিক মহাশয় কালক্রমে পাঁচ পুত্র সহরলাল, মাখনলাল, রূপলাল, রাধানাথ, বৈদ্যনাথ ও ছয় কন্যা যুথকুমারী, মেনকা, গৌরী, সরস্বতী, দুর্গা ও উর্মিলার জনক হন। তাঁর এই ভরা সংসার বড়ই সুখের ছিল। কিন্তু শেষ বয়সে পুত্র মোহনলাল ও কন্যা উর্মিলার মৃত্যুতে তাঁর বুকখানা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, এবং ইহাই পরে তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি পুত্রদের সুশিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করেন। তাঁর তৃতীয় পুত্র ৺মোহনলাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ বি পাশ করে ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু পাশ করবার দেড় বছরের মধ্যেই তাঁর সকল ব্যবসা শেষ হয়ে যায়!

মানুষের জীবনটা হাসিকান্নার সূত্র দিয়ে গাঁথা। চিরজীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখ কেউ পায় না। মাঝে মাঝে জীবনের উপর অন্ধকার ছায়া নেমে আসে। সেই সুখ-দুঃখের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়ে যান তাঁরা যাঁরা সুখের দিনে নির্বিকার ও দুঃখের দিনে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে নিজেদের সংযত করে রাখতে পারেন। ৺প্রেমলাল মল্লিক এই মনুষ্যত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পুত্রের মৃত্যুর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি,—সেই রাত্রে একে একে আত্মীয় বন্ধুগণ আসছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আর অন্য দিকে প্রিয়তম পুত্রের শেষ নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসছে—সেই সন্ধিক্ষণে তিনি যেরূপ সংযতভাবে অভ্যাগতদের সঙ্গে সহজ ভাষায় আলাপ করে যাচ্ছিলেন,

তা যথার্থই লোকাতীত। যে বিক্ষুব্ধ ঝটিকা ভিতরে ভিতরে সমস্ত অন্তরকে তোলপাড় করে দিয়ে যাচ্ছিল, বাহিরে লোকচক্ষুর সামনে তার লেশমাত্র দেখা যায় নি। তার দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে নিজে শেষশয্যায় শুয়ে তিনি যখন তাঁর পৌত্রীকে বললেন—"এতদিন পরে আবার তোর বাবার সঙ্গে দেখা হবে।" তখন তাঁর এই পাঁচ বৎসরের পুঞ্জীভূত বিয়োগ-বেদনা বিরহ-কাতর অন্তর থেকে বেরিয়ে এল। রোগ-শয্যায় শুয়ে এবারে তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, এই তাঁর শেষশয্যা; এবং মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই ছিল তাঁর সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা যে, তিনি আবার তাঁর হারাণ পুত্রকন্যাকে দেখতে পাবেন।

৺প্রেমলাল মল্লিক মহাশয়ের চরিত্রের সর্বাপেক্ষা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর নিরহঙ্কার অমায়িক ব্যবহার। এই ব্যবহারের গুণে তিনি ঘরে বাহিরে সকলের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন। তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, সরল স্বভাব সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত।

সেকালে সুবর্ণবণিক্‌সম্প্রদায় দানের জন্য সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। ক্রমে সে প্রসিদ্ধি তাঁদের নষ্ট হয়ে আসছে। ৺প্রেমলাল মল্লিক মহাশয়ের মধ্যে এই গুণটি পূর্ণমাত্রায় দেখা যেত। দানে ছিলেন তিনি মুক্তহস্ত। দেশে দুর্ভিক্ষ ও প্লাবনের সময় বা গৃহে অনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে তিনি আর্ত ও দরিদ্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন।

তিনি ক্রীড়া-কৌতুক বড় ভাল বাসতেন। নিজের বহুবিধ কাজের মধ্যেও "এরিয়ান্স ক্লাব", "কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাব", "বরাহনগর ফুটবল ক্লাব", "মিলনী ক্লাব", "চৈতন্য লাইব্রেরী" প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সভ্যরূপে সাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ তিনি কখন হারাতেন না। মাঝে মাঝে লাটপ্রাসাদের ভোজ-সভায়ও তিনি যোগদান করতেন।

ছুটির দিনে ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করতে তিনি বড় ভাল বাসতেন। ভারতের বহুস্থান তিনি সপরিবারে ভ্রমণ করেছেন। গত পূজার ছুটিতেও তিনি দ্বারকাধাম পর্যন্ত বেড়িয়ে এসেছিলেন।

তাঁর সাধারণ স্বাস্থ্য' বরাবর ভালই ছিল। কিন্তু শেষ বয়সে উপর্যুপরি দুইটি শোকে তাঁর শরীর ও মন দুইই ভেঙ্গে পড়ে। সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি বিরাম-বিহীনভাবে পরিশ্রম করে গেছেন শেষশয্যা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত।

গত ফাল্গুন মাসের ৯।১০ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার কারণ ক্রমে নিউমোনিয়া বলে ধরা পড়ে। এবারে বিছানায় শুয়ে পর্যন্ত তিনি বেশ বুঝেছিলেন, এই তাঁর শেষ শোওয়া। তাঁর পুত্রগণ যথাসম্ভব সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন, কিন্তু তিনি আদৌ সে সব পছন্দ করতেন না। যাবার জন্য তিনি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। একমাত্র বৃদ্ধা জননীর চিন্তায় তাঁকে মাঝে মাঝে কাতর হতে দেখা যেত; তাছাড়া আর যেন কোন বন্ধনই তাঁর ছিল না। মৃত্যুর ঠিক আগের দিন তাঁর সমস্ত রোগ-যন্ত্রণা কোথায় মিলিয়ে গেল। সেইদিন সকাল বেলায় নিজেই সকলকে বলে নিজের প্রায়শ্চিত্তের বন্দোবস্ত করালেন। এযুগে জন্মেও, সর্বপ্রকার আধুনিক-ভাবে জীবন কাটালেও আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের প্রতি যে তাঁর কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল, এই একটি বিষয় থেকেই তা বেশ বোঝা যায়।

সেই দিন বহু চেষ্টা ও অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁকে এক ফোঁটা ঔষধ বা পথ্য কেউ খাওয়াতে পারে নি। শুধু মাঝে মাঝে একটু একটু জল ছাড়া আর কিছুই তিনি সেদিন গলাধঃকরণ করেন নি। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল—"আপনার কি খেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে?" তিনি হাসতে হাসতে বললেন—"মাগুর মাছের ঝোল;··· দেবে?" সঙ্গে সঙ্গে মাগুর মাছের ঝোল রেঁধে আনা হ'ল। সেই দেখে তিনি হাসতে লাগলেন, বললেন—"আমি কি সত্যিই খেতে চেয়েছি, ঠাট্টা করে বললুম।" মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এই সহজ রহস্যালাপ দেখে স্বতঃই মনে পড়ে—

"So live, that sinking to thy life's
last sleep
Calm thou may'st smile, whilst
all around thee weep".
(Sir William Jones)

সেদিন সারাদিন তাঁর জ্ঞান খুব পরিষ্কার ছিল। মৃত্যু অতি আসন্ন হলেও, মৃত্যুর কালছায়া তাঁর মুখে এসে পড়েনি; বরং সেখানে সংসারের মোহমুক্ত একটা নির্বিকল্প স্বচ্ছতা বিরাজ করছিল। তাঁর এক বন্ধু সেইদিন প্রথম তাঁর অসুখের সংবাদ পেয়ে তাঁকে দেখতে আসেন।

বন্ধুকে দেখে তিনি হাসতে হাসতে বললেন—"খুব সময়ে এসে পড়েছ, আর একটু পরে এলে দেখা হ'ত না।" মুক্তির আস্বাদ কতখানি পেলে এত সহজে যে মৃত্যুকে বরণ করা যায়, কে জানে!

সন্ধ্যার পর থেকে আস্তে আস্তে জ্ঞান অস্পষ্ট হয়ে এল। পরের দিন ১৭ই ফাল্গুন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-ভক্ত পুত্র, স্নেহপ্রবণ পিতা, সহৃদয় বন্ধু ও একজন একনিষ্ঠ কর্মী চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে বাংলার বুক থেকে চলে গেলেন; রেখে গেলেন বিশ্বের বুকে, আগত-অনাগতদের জন্য তাঁর জীবনব্যাপী কর্মপ্রতিষ্ঠার বিপুল স্মৃতি!

অনাদৃতার হাসি

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য

যতদূর চোখ যায় পড়ে আছে সুবিশাল মাঠ,
আদি নাই অন্ত নাই, যেন এক পুরাণ গালিচা,—
মাঝে মাঝে উঠে গেছে রোঁয়া,
দেখা গেছে অন্তরের রূপ পায়ে-হাঁটা পথের ভিতরে।
মানবের ঔদাসীন্য সুন্দরের তরে জানায়ে দিতেছে তারা।
মাঠে আছে শুধু শ্যামঘাস, আর আছে মাটিময় পথ
নাহি সেথা কোন তরুলতা ক্ষুদ্র কি বিশাল।
তারি মাঝে কেমনে জানিনা
বাড়িয়া উঠেছে এক বনফুলচারা আপনার পরিপূর্ণ রূপে।
সকলের চেয়ে তার উন্নত মস্তক,
সকলের চেয়ে সে বৃহৎ;
তবু তার মনে সুখ নাই;
কাঁদে, সে যে অবিরল কাঁদে।
পথ দিয়ে যায় পথচারী;
ভুলে ফিরে দেখেনা তাহারে,—
নামহীন বাসহীন সে যে বনফুল!
দূর হ'তে ফুল দেখি ছুটে আসে মৃদুল মলয়;
তারপর চিনি বনফুল,
অবজ্ঞায় ঠেলে ফেলে দূরে চলে যায়!
বনফুল ফুলে' ফুলে' কাঁদে;
সে ক্রন্দনে কাঁপে সারাদেহ।
সেইদিন বেলা যায় যায়,
আসন্নবিদায়ে কাঁদে রাঙ্গা ভানু, ধরা।—
তারি সাথে কাঁদে বনফুল
এতটুকু সোহাগের তরে।
ওদিকে—
মাঠের পরে পায়ে-হাঁটা পথে
নৃত্যের চপল ভঙ্গী জড়ায়ে চরণে
আসে দুই তরুণ, তরুণী।
তরুণের হাতে আছে বাঁশী;
সে বাঁশী চুম্বিছে তার রক্তাভ অধর।
চুম্বন সোহাগে গলে সুমধুর স্বনে
গাহিয়া উঠিছে বাঁশী।
তরুণীর দুটি আঁখি চেয়ে আছে তরুণের বয়ানের পানে।
হাসি মাখা উছলিছে আলো
সে আঁখির মধু দিঠি হতে।

তরুণের চোখ বাঁশী 'পরে,
মন বুঝি তরুণীর মনে।
তরুণীর চোখ-মন দুই তরুণেতে।
প্রাণহীন পথ তা বোঝে না ;
ধীরে ধীরে সরে যায় পদতল হ'তে।
তরুণী হোঁচট খায়,
পদতলে সেই ফুলচারা।
তরুণের থেমে যায় বাঁশী,
সাবধানে তোলে তরুণীরে।—
লাগেনি তেমন তার।

বনফুল পড়েছে ভূতলে,
খসে গেছে পাঁপড়ি তাহার,
তবু নাই ক্রন্দনের রেশ ;
হাসি যেন উঠিছে ফুটিয়া সারা দেহে তার।
তরুণ দেখিল বনফুলে,
তুলে দিল তরুণীর হাতে।
তরুণী প্রিয়ের দান গাঁথিল খোঁপায়।
বনফুল লাগিল হাসিতে।—
অনাদৃতা হাসিল প্রথম।

পীরের ছলনা

শ্রীসত্যনারায়ণ পাল

(১)

বনডাঙ্গা হইতে লাল কাঁকর ও বালি বিছানো যে চওড়া রাস্তাটি দাসপুকুরের গা ঘেঁসিয়া দূরে সাহেব বাগানে আসিয়া মিশিয়াছে তাহার ঠিক দক্ষিণ পূর্ব কোনে রামেশ্বরপুরের সিদ্ধ ফকির পীর সাহেবের দরগা। কতদিন পূর্বে এবং কাহার দ্বারা ইহা নির্মিত হইয়াছিল এখন কেহ বলিতে পারে না, তবে উক্ত অঞ্চলের অতি বৃদ্ধ যাহারা, তাহাদের মুখে শোনা গিয়াছে অনুমান প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে বাবুরামপুরের কয়েকজন দরিদ্র মুসলমান এ দরগাটি ফকির পীর সাহেবের কবরের উপর তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ভিক্ষালব্ধ অর্থে নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিল। কত উৎসব, কত সমারোহ ব্যাপার, মহরম রমজান প্রভৃতি পর্ব উপলক্ষে এই স্থানে হইয়া গিয়াছে, কত মেলা বসিয়াছে, গানবাজনার অফুরন্ত স্রোত বহিয়া গিয়াছে এই স্থানে ; এখন আর তাহার কিছুই নাই, কালের কঠোর চক্রে সমস্ত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার সময় একটা মাটির প্রদীপ পর্যন্ত জ্বলে না এই দরগায়! শুধু দাঁড়াইয়া আছে এই জীর্ণ দরগা অতীতের স্মৃতি বুকে লইয়া ভগ্নহৃদয়ে বিষাদ প্রতিমার মত। দীর্ঘদিন সংস্কার অভাবে দরগাটির অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, দেখিলে বোধ হয় কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইবে।

দরগার কয়েক রশি পথের দক্ষিণে সে কয়েকঘর মুসলমান বাস করিত, তাহারা সকলেই গরীব, পেট চালাইত দিন মজুরের কাজ করিয়া। অদৃষ্ট দোষে মজুরের কাজটাও প্রায় প্রতিদিন জুটিত না, দুই একদিন ছাড়া যাহাও বা জুটিত, তাহাতে খাইতে কুলাইত না। বৎসরের অন্যান্য ঋতুতে এক বেলা হউক, এক সন্ধ্যা হউক, কোনরূপে আহার জুটিত কিন্তু বর্ষাকালে বেচারীদের কষ্টের অবধি থাকিত না,—না পাইত পেট ভরিয়া খাইতে, না পাইত হাত-পা ছড়াইয়া শুইতে। অর্থের অভাবের জন্য তাহারা ফি বৎসরে

চালে খড় যোগাইতে পারিত না ফলে বর্ষার জল চালের বাতা ভেদ করিয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িত। হতভাগ্য মজুরের দল সমস্ত রাত্রি এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিজিত আর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিত।

ইহাদের মধ্যে রসুল মিঞারই বড় দুঃখের সংসার। দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া তাহার ভরা যৌবনে বার্ধক্যের ছাপ লাগিয়াছে। এখন হঠাৎ দেখিলে তাহাকে বুড়া বলিয়া ভ্রম হইত, তদুপরি ঘরে অন্নাভাব, দুবেলা দূরের কথা এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পাইত না, কোনদিন বা অনাহারেই কাটিয়া যাইত। সংসারে স্ত্রী মুন্না ও সাত বৎসরের একটি ছেলে হানিফ; দারিদ্র্যের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ইহারাও অস্থিচর্মসার হইয়া পড়িয়াছে।

মাসের মধ্যে রসুল মিঞা যে কয়দিন ভাল থাকিত রোজ খাটিতে যাইয়া অন্যান্য প্রতিবেশীদের সহিত, ভাগে যৎসামান্য যাহা পাইত তাহাতে একবেলা এক সন্ধ্যা আহার করিত, যে দিন অসুস্থ থাকিত সে দিন আর যাইতে পারিত না সংসার উপবাস যাইত। ধার করিয়া মুন্না সংসার চালাইবে কতদিন? আর নিত্য ধারই বা দেয় কে? ঘুঁটে বিক্রয় করিয়া অপরের বাড়ীতে ধান ভানিয়া যে কয়টি পয়সা পাইত সে, তাহা পেটে খাইবে না ধার শোধ দিবে? পরণের কাপড়খানা এমন শতছিন্ন হইয়া গিয়াছে যে, রাস্তায় বাহির হইতে পারিত না, একদিক সেলাই করিতে অন্যদিক্ ছিঁড়িয়া যাইত। এক রতি ছেলে, কেবল খাই খাই করিয়া কাঁদিত; তাহাকে কি খাইতে দিবে এই ভাবনায় মুন্না কেবল চোখের জল ফেলিত আর আল্লাকে ডাকিত।

সমস্ত রাত্রি জ্বর ভোগ করিয়া রসুল মিঞা ভোরের মুখে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিল চতুর্দিকে রৌদ্র উঠিয়া গিয়াছে, শরীর খুব দুর্বল ছিল বলিয়া উঠিয়া বসিতে পারিল না শুইয়া রহিল। ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছিল যথেষ্ট কেন না কাল সমস্তদিন পেটে একটা দানা পড়ে নাই, মুন্নাকেও দেখিতে পাইল না ঘর হইতে, অগত্যা চুপ করিয়া রহিল রাস্তার দিকে তাকাইয়া মুন্না কতক্ষণে ফিরিবে এই আশায়।

হঠাৎ তাহার কানে গেল হানিফের কণ্ঠস্বর, বোধ হইল খাবার বায়না ধরিয়াছে ভীষণ, রাগের ঝাঁজ আছে অথচ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—"রোজ রোজ চোঁয়া মুড়ি, মিয়োন মুড়ি খেতে পার্বো না, ওই খেয়ে কে আছে বল্ না, না আছে একমুঠো মুড়কী না আছে একটা কদমা শুধু জেনে রেখেছিস চোঁয়া মুড়ি, কেন? ভাত রাঁধতে কি হয় তোর শুনি?"

মুন্না চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"তোর যে জ্বর হয়েছিল বাবা, ডাক্তার ভাত খেতে বারণ ক'রে দিয়েছে; শুকনো মুড়ি খেতে বলেছে শুধু আর কিছু নয়, মুড়কীও নয় কদমাও নয় না হলে ভাত রাঁধিনি? তোর জন্যে আমরাই ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। তুই ত দেখতে পাচ্ছিস বাবা।"

হানিফ রাগিয়া উঠিয়া বলিল—"কবে একটু সর্দি ক'রে জ্বর হয়েছিল, সেই থেকে চোঁয়া মিয়োনো মুড়ি খাইয়ে রেখেছিস, এমন ক্ষিদে পেয়েছে পেটটা কোঁ কোঁ কচ্ছে দুটো পান্তা ভাত হাঁড়িতে নেই দে না খাই, পেটটা একটু ঠাণ্ডা হোক।"

মুন্নার বুকের ভিতরটা ধসিয়া যাইতে লাগিল ছেলের কথা শুনিয়া, তাহার শুষ্ক মুখে অজস্র চুমায় ভরাইয়া দিয়া মুন্না গাঢ়স্বরে বলিল—"ওরে বাপরে, পান্তাভাত খাবি? গরমভাতই খেতে মানা করে দিয়েছে ডাক্তার, তুই চাচ্ছিস পান্তা খেতে, ডাক্তার শুনলে আমাকে আস্ত রাখবে?"

রাগিয়া টং হইয়া হানিফ কহিল—"না খাইয়ে খাইয়ে আমাকে মেরে ফেলবি বুঝি? দেখ না মুখপুড়ি ক্ষিদেতে পেটটা কি হয়ে গেছে একেবারে খোলার মত, পান্তা ভাত না দিস্ পেট ভরে কিছু খেতে দে।"

মুন্নার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঘরে এককণা ক্ষুদ নাই, হাঁড়িতে এক মুঠা চোঁয়া মুড়ি নাই ছেলেটা ক্ষুধায় অস্থির হইয়া কাঁদিতেছে তাহাকে কি খাইতে দেয়। উত্তর না দিয়া শুধু ম্লানমুখে সে হানিফের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হানিফ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দিবি নিত খেতে দেঃ ক্ষিদেতে পেটটা জ্বলে যাচ্ছে যে।"

হঠাৎ মুন্নার মনে পড়িয়া গেল, রুগ্ন অভুক্ত স্বামীর জন্য সে এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া আনিয়াছিল, সেটা খরচ হয় নাই চালের বাতার মধ্যে ঠোঙ্গা শুদ্ধ মুড়ি গোঁজা আছে। গভীর অন্ধকারের ভিতর একটা ক্ষীণ আলোকশিখা তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল, ক্ষণিক আনন্দে তাহার মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মুড়ির ঠোঙ্গাটি হাতে লইয়া মুন্না বলিল—"এখন এই মুড়িগুলো খেয়ে নে তারপর—"

মুন্নার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল; রাগে অধীর হইয়া হানিফ মুড়ির ঠোঙ্গাটি উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া রাগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দশ দিনের গিয়োনো মুড়ি খেতে দিচ্ছিস, কিছুতেই খাবো না, মারা গেলেও না, মুখপুড়ি নিজের বেলায় ভাত গিলবে, আমার বেলায় ওই মুড়ি—চাই না ছাই-পাঁশ খেতে।"

হাউ হাউ করিয়া খানিকটা কাঁদিয়া হানিফ রাগে হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

শুইয়া শুইয়া রসুল মিঞা সমস্তই শুনিল। একটা ছেলে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল বাপ হইয়া সে মুখ বুজিয়া সবই দেখিল। ঘরে এমন একটা আধলা নাই ছেলেটার হাতে দিয়া ঠাণ্ডা করে বা ভুলাইয়া রাখে, হায় রে পোড়া অদৃষ্ট তাহার, কত কামনার ধন ছেলে, সেই ছেলের এই অবস্থা! অশ্রুতে রসুল মিঞার চোখ দুইটি ভরিয়া গেল, কেবল ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"আল্লা আমাকে যত পার কষ্ট দাও তোমার দণ্ড যত কঠোরই হোক আমি বুক পেতে রইলুম নিক্ষেপ কর মুখ বুজে সহ্য কোরবো, কিন্তু দোহাই তোমার দুধের বাছা এক ফোঁটা ছেলেকে আর কষ্ট দিও না।"

(২)

অতীতের কত কথাই রসুল মিঞার মনের মধ্যে বায়স্কোপের ছবির মত একটির পর একটি করিয়া ভাসিয়া উঠিল। চিরদিন তাহার এই অবস্থা ছিল না, বাপ ছিল গ্রামের মধ্যে একজন মাতব্বর ব্যক্তি বিশেষ, ভাড়া খাটিত সব ছিল তাহার বাপের ইজারা করা, এছাড়া মুনিষের কাজ ছিল একচেটে। বাড়ীতে প্রত্যেক দিন বাইরের লোক খাইয়া যাইত দশ পনের জন, কিন্তু হায়রে একটা সাত বৎসরের ছেলে সেই বংশের, আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত, দুর্ভাগা সে নিজে নয়, তাহার স্ত্রী ও ছেলে উভয়ই!

আজ সত্যসত্যই তাহার বুকখানা হাহা করিয়া উঠিল স্ত্রী পুত্রের দুরবস্থা দেখিয়া, বেশী ধিক্কার লাগিল তাহার জীবন্মৃতের মত বাঁচিয়া থাকাটা, যে যদি অসুস্থ না হইত, তাহা হইলে সংসারের এতটা অধঃপতন ঘটিত না। শুইয়া ছিল, অতিকষ্টে উঠিয়া বসিল, ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিল—"বউ ও বউ।"

বাহিরের উঠানের এক কোণে দাঁড়াইয়া মুন্না নীরবে কাঁদিতেছিল, স্বামীর আহ্বানে তাড়াতাড়ি তাহার সামনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ডাকছো?"

"হ্যাঁ, একবার হাতটা ধরে উঠিয়ে দাও না।"

"কেন বলতো?"

"দেখি যদি কিছু পয়সার সংস্থান ক'রে আনতে পারি, বাপ হ'য়ে আর যে এক ফোঁটা ছেলের কষ্ট দেখতে পারি না বউ, হায় হায় পেটের জ্বালায় কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে চলে গেল সে, আর আমি চেয়ে চেয়ে তাই দেখলুম—ওঃ আল্লা পূর্ব জন্মে অনেক পাপ ক'রেছিলুম, বোধ হয় মুখের অন্ন কেড়ে নিইছিলুম কারও, সেই পাপে এত কষ্টভোগ কচ্ছি আমি।" বলিতে বলিতে টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা গরম জল তাহার গাল বাহিয়া বুকের উপর গড়াইয়া পড়িল।

মুন্না গলা ছাড়িয়া বলিল—"কি পাগলের মত ব'কছ তুমি? একে রোগা মানুষ, খাওয়া নাই তিন দিন, তার ওপর হাড়ভাঙ্গা জ্বরে ভুগেছ সমস্ত রাত, কাজ ক'রব ব'লে মুখে ব'লছ কিন্তু পারবে ক'রতে? হাত ধ'রে উঠিয়ে দিতে হচ্ছে যাকে সে কি ক'রে মুনিষের কাজ কর্বে শুনি?"

"পারবো না এ আমি জানি, কিন্তু কি করবো, না

কোনও ওজর শুনবে না কোনও কৈফিয়ৎ মানবে না, আর আমার একটা পেটের জন্যে ততটা ভাবি নি বউ, ভাবছি তোমার আর সকলের চেয়ে ভাবছি ছেলেটার কথা। আহা বাছারে আমার, একটা দিনও তোকে পেট ভ'রে খেতে দিতে পারি নি, এ আপশোষ মলেও যাবে না আমার।" বলিতে বলিতে রস্থল মিঞা অতি কষ্টে হাঁটুতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মুন্না হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—"একি তুমি যাচ্ছো না কি? কি মুস্কিল! এই শরীর নিয়ে কেউ মজুর খাটতে পারে? যদি ঘাড়-মুখ গুঁজে রাস্তায় উল্টে পড় কি হবে ভেবে দেখেছ?"

"দেখিছি, বড় জোর যদি কিছু হয় মৃত্যু এর বেশী আর ত কিছু হবে না কিন্তু বউ দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে কি এ ভাল নয়, অনশনের তীব্র দংশনের জ্বালা মুখ বুজে নীরবে তুমি বা আমি কিছুক্ষণ সহ্য করতে পারি কিন্তু দুধের বাছা হানিফ, পারবে কেন বউ? জীবনে আমি তোমায় সুখী করতে পারিনি, ছেলেটাকে দুবেলা দুমুঠো খাইয়ে কোনরূপে যদি বাঁচিয়ে রেখে যেতে পারি, তাহলে ওর দৌলতে তুমি শেষ জীবনে তবু একটু সুখের মুখ দেখতে পাবে।"

"ওগো তোমায় এত ভাবতে হবে না, আমি ওর খাবার ব্যবস্থা করে এসেছি, হালদার গিন্নীকে জান ত? সে আমার হানিফকে বাগাল রাখতে রাজী হয়েছে। দুবেলা পেট ভ'রে খেতে দেবে আর মাসে এক টাকা মাইনে দেবে। কাজ এমন কি বেশী, খালি মাঠে গরু-গুলোকে নিয়ে যাবে, আর সন্ধ্যের সময় তাড়িয়ে নিয়ে আসবে।"

মুন্নার কথা শুনিয়া রস্থল চমকাইয়া উঠিল—"ও বাগালি করবে? পাগলের মত কি বলছো তুমি? সাত বছর বয়স ওর যাকে কাপড় পরিয়ে না দিলে প'রতে পারে না, সে ক'রবে বাগালি? ওরই বাগালি করবার একজন লোকের দরকার, আগে আমায় মরতে দাও, তারপর তাকে যা ইচ্ছে করতে দিও।" মাথায় হাত রাখিয়া রস্থল মিঞা জোরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

মুন্না ম্লানমুখে বলিল—"ওগো তুমি এত ভেবনা, হানিফ আমার গোবর গণেশ নয়, দেখতে ওইটুকু বটে কিন্তু ওর বুদ্ধি কত, আর গরিবের ছেলে যখন এখন থেকে কাজ না শিখলে শিখবে কবে? কাজ শিখতে দোষ কি?"

"শিখবে গো শিখবে, সময় হ'লেই শিখবে কাউকে শেখাতে হবে না, এত তাড়াতাড়ি কেন বউ, একটু বড় হোক আমি ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো, এখন দিন কতক ওকে খেলিয়ে বেড়াতে দাও তারপর জীবন ভোর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটতে খাটতে হিম্‌শিম্ খেয়ে যাবে। উঃ কি তেষ্টা কিছু খাইনি কাল থেকে, ঘরে কিছু—" এইটুকু বলিয়া রস্থল থামিয়া গেল, সে জানে আর কিছু নাই ছেলেটা খাইতে না পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। ভাতের হাঁড়িটা উনানে বসে নাই পনের দিন—শিকায় ঝুলিতেছে; রস্থল আর ভাবিতে পারিল না ঘরের কোণে লাঠিটা পড়িয়া ছিল, লইয়া বেদনা-বিকৃত মুখে দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া পড়িল।

মুন্না হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—"ওগো তুমি যেয়ো না, দুর্বল শরীর এক্ষুণি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে, একটু সুস্থ হও আগে তারপর কাজে বেরিও।"

"সুস্থ একেবারে হব মুন্না।" বলিতে বলিতে রস্থল মিঞা টলিতে টলিতে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। সন্ধ্যার সময় তাহার প্রতিবেশীরা যখন তাহাকে ঘরে আনিয়া ফেলিল তখন তাহার জ্ঞান ছিল না, এত জ্বর গায়ে হাত দেওয়া যায় না, বোধ হয় ধান দিলে খই হইয়া যায়, গা এত গরম। তিন দিন জ্বরে অচৈতন্য থাকিয়া চার দিনের দিন হতভাগ্য রস্থল মিঞা স্ত্রী ও পুত্রের মায়া কাটাইয়া এক অজানা অচেনা জায়গায় চলিয়া গেল।

দরিদ্র প্রতিবেশীরা রস্থল মিঞার মৃত দেহটিকে পীর সাহেবের দরগার কাছেই কবরস্থ করিল।

(৩)

তিনমাস পরের কথা। হানিফ এখন হালদারদের গরুর বাগালি করে। দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় ফ্যানে ভাতে, আর মাসিক বেতন ধার্য হইয়াছে

এক টাকা। মুখ বুজিয়া গাধার মত খাটিয়া যায় উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত; ভোর বেলা এক কোঁচড় মুড়ি লইয়া সে গরুগুলিকে তাড়াইয়া লইয়া যায় বনডাঙ্গার দিকে, দশটার মধ্যে তাহাদের লইয়া ফিরিয়া আসে, আবার যায় দুপুর বেলা, ফিরিয়া আসে সন্ধ্যার পরে। তারপর গরুর গোয়াল পরিষ্কার করে, বিচালি, খোল প্রভৃতি বাজার হইতে কিনিয়া আনে; খড় কাটে গরুকে জাব দেয়, গরুর ডাবা ভর্তি করিতে হয় কলসী কলসী জল আনিয়া এছাড়া গৃহিণীর ফায়ফরমাস আছে হরেক রকমের, বেচারী এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিবার সময় পায় না। কিন্তু এত করিয়াও সে গৃহিণীর মন পায় না। দিনরাত "ছুঁই, ছুঁই, দূর বেরো" ইত্যাদি বুলি তাঁহার মুখে লাগিয়া আছে।

ইহার একমাত্র কারণ হানিফের স্বাস্থ্য; এক ফোঁটা সাত বছরের ছেলে হানিফ দুবেলা খাইয়া থাকে শুধু ফ্যান আর ভাত; না পায় একটু দুধ না পায় এক ফোঁটা ঘি তবু তার স্বাস্থ্য কি? দেখিলে কেহই বলিবে না হানিফ সাত বছরের ছেলে—সকলেই বলিবে উহার বয়স তেরো কি চৌদ্দ। গায়ের রং শ্যামবর্ণ যদিও কেমন একটা উজ্জ্বল কান্তি কালোর ভিতর হইতে উঁকি মারিতেছে। ঐটুকু ছেলের গায়ে শক্তিও নিতান্ত কম নয়, গরুর দড়ি ধরিয়া কেমন অবহেলে টানিয়া লইয়া যায়। একটি দিনের জন্য অসুখ নাই, বিধি যেন তাহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছে।

হালদার গৃহিণীর তিনটি মেয়ে ও দুইটি ছেলে। সকলেই জীর্ণশীর্ণ; গৃহিণী পেট পুরিয়া তাহাদের খাইতে দেন, তবু পোড়া ছেলে মেয়ে মোটা হয় না, রোগ লাগিয়াই আছে বারমাস, একটির পর একটির; কাহারও কাশি, কাহারও সর্দি, কাহারও জ্বর কাহারও পেটের অসুখ নিত্য লাগিয়া আছে। ফী মাসে ইহাদের জন্য ঔষধে ব্যয় হয় দশ টাকা পনের টাকা করিয়া।

গৃহিণী একবার করিয়া হানিফের নিটোল স্বাস্থ্যের দিকে তাকাইয়া দেখেন, সেই সঙ্গে নিজের রোগশীর্ণ ছেলে-মেয়েদের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন, আর ভগবানের উপর দোষারোপ করেন। পোড়া ছেলেমেয়েরা এক ছটাক দুধ হজম করিতে পারে না আর হানিফ এক কাঁড়ি ফ্যান শুদ্ধ ভাত বিনা ব্যঞ্জনে শুধু লবণের সাহায্যে খাইয়া কি করিয়া হজম করে গৃহিণী কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। যতদিন যায় হানিফের স্বাস্থ্য ততই গড়িয়া উঠে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, আর ছেলেমেয়েগুলির রোগে রোগে ক্রমে উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়ে; হিংসায় ফাটিয়া মরেন গৃহিণী, আর দিনরাত হানিফের রোগ কামনা করেন ভগবানের নিকট। বিনা দোষে হানিফকে তিরস্কার করেন অযথাভাবে, কটকট করিয়া আঙ্গুল মটকাইয়া গালাগালি দেন, খাইতেও দেন না কোনও কোনও দিন। এত নির্যাতন এত গালাগালি সহ্য করিয়া হানিফ মুখ বুজিয়া কাজ করিয়া যায় কোনও দিন প্রতিবাদ করে না, সে যে পেট ভরিয়া ফ্যানে-ভাতে খাইতে পায় ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রতিদিন দুপুর বেলা মাঠে গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া হানিফ বটগাছের তলায় বসিয়া গান গায়, কোনও দিন গামছাটি পাট করিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া থাকে, কোনও দিন বা ঘুমাইয়াও পড়ে। গোলপুকুরের পশ্চিম কোণে খরিষবেড়ে, সামনেটা কাঁকরে মাটির মাঠ মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করে দুপুর বেলাটা কিন্তু ভেতর দিক্‌টায় গাছপালা জন্মিয়া ঘন জঙ্গলের মত হইয়া থাকে বার মাস, শীত গ্রীষ্মের ঋতুভেদে ইহার কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। আশপাশের গ্রামের রাখালেরা খরিষবেড়ের ভিতরে গরু ছাড়িয়া দিয়া যায় এবং সন্ধ্যার সময় তাহাদিগকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনে। তাহাদের দেখাদেখি হানিফও গরু-গুলিকে এই দিকে লইয়া আসে।

সেই দিন দুপুরের রৌদ্রটা ছিল খুব তীব্র, কাঁকর বিছান রাস্তাটা এমন তাতিয়া উঠিয়াছিল যে, মানুষ ত দূরের কথা, একটা কুকুর-শিয়াল পর্যন্ত কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই—এমন কি সামান্য কাক পক্ষীও বাহির হয় নাই। দাসপুকুরের শ্মশানঘাটের অনতিদূরে জীবন তাঁতির প্রতিষ্ঠা করা বটগাছটার ছাওয়ায় হানিফ শুইয়া-ছিল গরুগুলিকে ইচ্ছামত চরিয়া খাইতে ছাড়িয়া দিয়া।

তন্দ্রাও আসিয়াছিল একটু। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল একটা কর্কশ আহ্বানে। চাহিয়া দেখিল ষণ্ডামার্কের মত চেহারা তামাটে রংয়ের আধা বয়সী একটা লোক, ভাটার মত চোখের তারা ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল রাগে মুখ বিকৃত করিয়া —"এই তুই কে রে? এখানে ঘুমুচ্ছিস্ কেন? তোর ঘর কোথা?"

এক সঙ্গে অতগুলি প্রশ্নের জবাব হানিফ এক কথায় দিতে পারিল না, শুধু চাহিয়া রহিল ভয়ে ও বিস্ময়ে প্রশ্ন-কর্তার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া।

রোষগম্ভীর কণ্ঠে লোকটি জিজ্ঞাসা করিল আবার —"তুই কালা না কি? গরুগুলো ছেড়ে দিয়েছে কে? তোর গরু?"

মুখখানা যথাসম্ভব ম্লান করিয়া হানিফ বলিল—"না, হালদারের গরু ওগুলো, আমি তাদের বাগাল।"

হানিফের কথা শেষ হইতে না হইতেই লোকটা গর্জন করিয়া উঠিল—"ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে বোঝাবি অপরকে বেটা নবাবপুত্তুর কোথাকার গরু ছেড়ে দিয়ে ঘুম হচ্ছে নাক ডাকিয়ে, এদিকে আমার কি সর্বনাশ ক'রছে তোর গরু, খেয়াল আছে কি?"

লোকটার কথার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভয়ে হানিফ আঁতকাইয়া উঠিল, জিহ্বায় জড়তা আসিয়া স্বরনলী বিকল করিয়া দিল—"গ-গ-গরু? স-স-স…"

"হ্যাঁরে, ডেপো ছেলে কোথাকার, দেখতে চাস্? বল্‌লে বিশ্বাস হয় না বুঝি? এই দেখে যা।" বলিয়া লোকটা সজোরে হানিফের কান ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে খরিখবেড়ের দিকে ছুটিয়া চলিল আর হানিফ পরিত্রাহি শব্দে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো আমার বড্ড লাগছে, ওগো আমার কান ছিঁড়ে গেল, ছুটি পায়ে পড়ি তোমার ছেড়ে দাও গো—"

লোকটা হানিফের কথায় কর্ণপাত করিল না, একেবারে একটা কলাবাগানের মধ্যে আনিয়া ফেলিল, তারপর সজোরে তাহার কানটা বার কতক জোরে নাড়া দিতে দিতে কর্কশ স্বরে বলিল—"দেখতে পাচ্ছিস, গাছগুলোর মরতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার, সব মুড়িয়ে খেয়েছে সর্বনেশে গরু, করক'রে ত্রিশ টাকার মাল গো! মহাজন কি বলবে আমায়!" রাগে হানিফের গালে ঠাশ ঠাশ করিয়া গোটা কতক চড় মারিয়া লোকটা বলিল—"গরু ছেড়ে দিয়ে আর ঘুমুবি কি না বল? হারামজাদা; পাজি, ছুঁচো, নিতান্ত ছেলে মানুষ তুই, তাই ছেড়ে দিলুম না হ'লে দাম আদায় ক'রে তবে ছাড়তুম, মনে থাকবে?"

কাঁদিতে কাঁদিতে হানিফ বলিল—"হাঁ, থাকবে।"

"নাকখত দে আগে বল শীগ্‌গির গরু আর এদিকে আনব না, গরু ছেড়ে দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাবো না।"

লোকটির কথামত হানিফ নাকখত দিল এবং নাক-কান মলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল সে কলাবাগানের দিকে ভবিষ্যতে আর গরু চরাইতে আসিবে না এমন কি সে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে এ মুখো আর হইবে না কিছুতেই।

শুনিয়া লোকটি একটু নরম হইল বটে তবে সে যখন দেখিল হতচ্ছাড়া গরুর দল আবার কলাবাগানে ঢুকিয়া মস্ মস্ শব্দে অবশিষ্ট কচি কলাপাতাগুলির নির্বিবাদে সদ্ব্যবহার করিতেছে চক্ষু বুজিয়া, তখন তাহার ক্রোধাগ্নিতে কে যেন ইন্ধন জোগাইয়া দিল। একটা বংশখণ্ড হাতে করিয়া সে খুব সন্তর্পণে কলাবাগানে প্রবেশ করিল তারপর আরম্ভ করিয়া দিল কি বেদম্ প্রহার, লেজ উঁচু করিয়া দৌড় দিল তিনটা গরু হম্বা হম্বা রবে চতুর্দিক্ কাঁপাইয়া, কিন্তু কে তাহা গ্রাহ্য করে, আথালি-পিথালি প্রহার করিতে করিতে সেই সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় গরুর ও তাহার মনিবের সাতগোষ্ঠির মহিমা কীর্তন করিয়া সমগ্র বনডাঙ্গাটা যেন ফাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া হানিফ একটা পিপুল গাছের আড়ালে লুকাইয়া থর থর করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল তবু হানিফের সাহসে কুলাইল না অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া পলায়মান গরুগুলির সন্ধান লইতে, পাছে আবার লোকটার সহিত দেখা হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহারও নির্যাতন হইবার

গৃহস্বামিনীর তপ্ত শলাকার মত বাক্যবাণ, ষণ্ডামার্ক লোকটার কানমলা ও প্রহারের যন্ত্রণা অপেক্ষা লক্ষ গুণ বেশী।

সাত পাঁচ ভাবিয়া হানিফ অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িল। পথে লোকটার সহিত তাহার দেখা না হইলেও গরুগুলির জন্য তাহার ভাবনা হইল বড্ড বেশী, কেন না দিগন্তপ্রসারী বনডাঙ্গার উপর যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সে গরুগুলিকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে অন্ধকার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, গরুগুলির নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে হানিফ সমস্ত বনডাঙ্গাটা তোলপাড় করিয়া ফেলিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই গরুর সন্ধান করিতে পারিল না, অগত্যা একটা আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া বেচারী বুকফাটা কান্না জুড়িয়া দিল।

দৈবক্রমে জন কতক রাখাল বালক সেই সময়ে গরু লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল হানিফের কান্না শুনিয়া তাহারা তাহার নিকটে আসিয়া বলিল পশ্চিমপাড়ায় গোন্দল পুকুরের পাড়ে তাহারা তিনটি গরুকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া আসিয়াছে খুব সম্ভব গরুগুলি হালদারদেরই হইবে। হানিফের কাকুতি মিনতিতে প্রলুব্ধ হইয়া রাখাল-বালকের দল তাহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল এবং প্রায় এক ঘণ্টার উপর অন্ধকারে অন্ধকারে ডাঙ্গার রাস্তা ধরিয়া পশ্চিমপাড়ায় আসিয়া গরুগুলিকে উদ্ধার করিল বটে—তবে বাছুরটার সন্ধান মিলিল না। রাখাল বালকেরা হানিফকে বুঝাইয়া দিল বাছুরটা বোধ হয় বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে। শুনিয়া হানিফ একটু আশ্বস্ত হইল. তবে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। ভয়ে ভয়ে তিনটি গরুকে লইয়া সে যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

(৪)

সন্ধ্যা হইতে হালদার গৃহিণী ঘরবাহির করিতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় গরু লইয়া ফিরিবার কথা, রাত্রি নয়টা বাজিতে যায় এখনও বাগালের দেখা নাই। গয়লা আসিয়া তিনবার ফিরিয়া গেল, ছেলেমেয়েগুলি দুধ দুধ করিয়া কাঁদিতেছে, হায় হায় রোগার দল রোগের জ্বালায় —ডাক্তার অপর জিনিষ খাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন—শুধু দুধসাগু বেচারীদের আহার, সময়ে তাহাও যদি খাইতে না পায় তাহা হইলে তাহাদের বাঁচিয়া থাকাটাই যে বিড়ম্বনা। ছেলেমেয়েগুলি বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দুধ খাইতে পাইল না দেখিয়া রাগে হালদার গিন্নী মুখে যা আসিল তাই বলিয়া হানিফের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের পিণ্ড চটকাইতে লাগিলেন।

রাত্রি দশটার পরে গরু লইয়া হানিফকে ফিরিতে দেখিয়া গিন্নী চীৎকার-শব্দে সমস্ত বাড়ীখানা ফাটাইয়া ফেলিলেন। সেই সঙ্গে যাচ্ছে তাই করিয়া হানিফকে গালি দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন শুনিলেন বাছুরটিকে পাওয়া যায় নাই এবং তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্যই ফিরিতে এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে তাহার, তখন গিন্নী আর যায় কোথায় একেবারে রণচণ্ডীর মত তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিলেন, নথচক্র ঘুরাইয়া, মাথার খোঁপা দুলাইয়া এমন তর্জন-গর্জন আরম্ভ করিলেন যে, বেচারী হানিফ ভয়ে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গিন্নীর তখন মুখের তোড়ে দাঁড়ায় কার সাধ্য—"হাড়-হাবাতে কোথাকার, মরতে এসেছে আমার বাড়ীতে, কোনও চুলোয় জায়গা জোটে নি, গেলবার বেলায় খুব, কাঁড়ি না হ'লে বাখর ভরে না, কিন্তু কাজের বেলায় ঢু-ঢু, নিয়ে আয় শিগ্‌গীর বাছুর খুঁজে নইলে মারের চোটে তোর হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় করবো তা জানিস?"

সাত বৎসরের ছেলে হানিফ, ভয়ে কাঁটা হইয়া গেল। গিন্নীর তাড়া খাইয়া হাপুশ নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"একটু পরে যাচ্ছি মাঠাকরুণ বড্ড মাথাটা ঘুরছে, হাত-পাগুলো কামড়াচ্ছে সারা বনভাঙ্গা, পশ্চিমপাড়া, খরিষবেড়ে খুঁজে এসেছি সন্ধ্যা থেকে রাত্তির নটা পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে পায়ের তলা এমন টাটিয়ে উঠেছে পা ফেলতে পাচ্ছি নে—একটু ব'সে—"

"ওরে আমার গুরুপুত্তুর রে, একটু ব'সে জিরিয়ে বিশ্রাম ক'রে, বাখর ভরিয়ে তবে উঠবেন, এদিকে ছেলে মেয়েগুলো দুধ দুধ করে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে প'ড়ল। জল

খেংরা না খেলে কি উঠবি? লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না, তোর এ রোগের ওষুধ হ'চ্ছে খালি ঝাঁটাপেটা আর খেঁটু বন্ধ করে দেওয়া—হাঁ ক'রে চেয়ে দেখছিস্ কি? যা শিগ্‌গীর, ওঠ শিগ্‌গীর, বাছুর খুঁজে নিয়ে আয় আগে।"

হানিফের অবস্থা তখন কি, এক সর্বান্তর্যামী ভগবান্ ছাড়া কেহই বুঝিতে পারিবে না। গৃহিণীর হুমকি খাইয়া অতিকষ্টে সে দাঁড়াইল বটে, তবে পা ফেলিতে পারিল না; পা এমন টাটাইয়াছে, পা ফেলিবামাত্র হুমড়ি খাইয়া পড়িল গেল। অতি বড় শত্রু যে, যাহার মন পাষাণ দিয়া তৈয়ারী, হানিফের অবস্থা এবং তাহার অশ্রুভরা ম্লান মুখখানি দেখিলে তাহাদেরও হৃদয় গলিয়া যাইত! কিন্তু কি কঠোরহৃদয়া হালদার গৃহিণী। কি নিষ্ঠুরা, কঠিনপ্রাণা, স্নেহমায়াবিবর্জিতা নারী। বিন্দুমাত্র বিচলিতা না হইয়া নিতান্ত হৃদয়হীনার মতন গর্জন করিয়া উঠিলেন—"মনে ক'রেছিলুম এত রাত্রে তোকে ছুঁয়ে আর নাইবো না, কিন্তু এখন দেখছি তাই ক'রতে হবে আমাকে, হতচ্ছাড়া, ডেকরা ছোঁড়া কোথাকার, কথা বললে শোনা হয় না, দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি তোকে।"

কোমরে কাপড় জড়াইয়া গৃহিণী ছুটিয়া গেলেন রান্না ঘরের মধ্যে রাগে চক্ষু লাল করিয়া এবং তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিলেন একটা লম্বা লোহার বেড়ি হাতে করিয়া। ব্রাহ্মণীর রণচণ্ডী মূর্তি দেখিয়া হানিফ প্রাণের ভয়ে দিল চোঁ-চোঁ দৌড়। হানিফকে পলাইতে দেখিয়া গৃহিণী রাগ সামলাইতে পারিলেন না, হানিফকে লক্ষ্য করিয়া লোহার বেড়িটা সজোরে ছুঁড়িয়া মারিলেন। হানিফ তখন পগার পার, বেড়িটা তাহার গায়ে লাগিল না বটে, লাগিল এক কেঁড়ে সরিষার তেলের উপর যেটা কলুবউ সুদের দরুণ দালানের এক পাশে রাখিয়াছিল। লোহার আঘাতে মাটির কেঁড়েটি ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া গেল, আর আড়াইসের আন্দাজ খাঁটি সরিষার তৈল একেবারে "ন দেবায় ন ধর্মায়" দেখিয়া ব্রাহ্মণী হায় হায় করিয়া উঠিলেন।

করিলেন গালিগালাজ হানিফকে উদ্দেশ করিয়া। হানিফের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের মুণ্ডপাত করিয়াও গায়ের জ্বালা মিটিল না হালদার গৃহিণীর। রাগের মাথায় টাল ঠিক রাখিতে না পারিয়া উঠানে নামিবার সময় পড়িয়া গেলেন চিৎপটাং হইয়া. হানিফ সদরে লুকাইয়াছিল; গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আগুন ইন্ধন পাইয়া জ্বলিয়া উঠিল দাউ দাউ করিয়া—ভাঙ্গা বেড়িটা হাতে করিয়া গৃহিণী হানিফকে প্রহার করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হানিফকে সমুচিত শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে বেড়িটা আবার সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। হানিফের গায়ে লাগিল না, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। দুই দুইবার বিফলমনোরথ হওয়াতে ব্রাহ্মণীর মাথা বিগড়াইয়া গেল, ভাঙ্গা বেড়িটা হাতে লইয়া হানিফকে তাড়া করিলেন অজস্র গালি দিতে দিতে, ঊর্ধ্বমুখে হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া। হানিফ দেখিল ব্যাপার গুরুতর; যদি কোনও রূপে ধরা পড়ে তাহা হইলে তাহার শাস্তির অবধি থাকিবে না। পিরি পুকুরের পাশ দিয়া যে রাস্তাটি মান্নাদের পান বরুজের দিকে চলিয়া গিয়াছে সেই রাস্তা ধরিয়া হানিফ পন পন শব্দে ছুটিতে লাগিল।

ছুটিতে ছুটিতে পিছন ফিরিয়া দেখিল হালদার গৃহিণী আলুথালু বেশে ছুটিয়া আসিতেছেন, একবার করিয়া থামিয়া দম লইতেছেন, আবার ছুটিতেছেন অশ্রাব্য ভাষায় সুধাবৃষ্টি করিতে করিতে, দেখিয়া হানিফের প্রাণ উড়িয়া গেল; যে গতির বেগ দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল।

ভুলিয়া গেল হানিফ ক্ষুধা তৃষ্ণা, ভুলিয়া গেল দীর্ঘ দিনব্যাপী পরিশ্রমজনিত অসহ্য দৈহিক যাতনা, শুধু ভাসিয়া উঠিল তাহার দৃষ্টির পুরোভাগে ব্রাহ্মণীর রোষকষায়িত মুখের বীভৎস ছবি, রক্তলোলুপ হিংস্র শ্বাপদের চক্ষুর মত তাঁহার জলন্ত দৃষ্টি, কি তাহার দাহিকা শক্তি। ঠিক যেন ধ্যানভঙ্গ ধূর্জটির আরক্ত লোচন উদ্ভূত তীব্র অগ্নি-ধারা, বোধ হয় বিরাট্ বিশ্বখানা ধ্বংস করিয়া দিবে পলকের মধ্যে।

ঠিক এই সময় নৈশ গগন আলোড়িত করিয়া ব্রাহ্মণীর

তাহার শ্রবণ-বিবরে বজ্রের ন্যায় বাজিয়া উঠিল—"মনে ক'রেছিস পালিয়ে গেলেই রেহাই পেয়ে যাবি? কিন্তু পালিয়ে যাবি কোথায়, জাল ছিঁড়ে নয় পালালি, কিন্তু পুকুর থেকে পারবি নি পালাতে।"

ভয়ে হানিফ আরও ছুটিতে লাগিল গলদঘর্ম হইয়া, কিন্তু যতই সে ছুটে ব্রাহ্মণীর হুঙ্কারের রেশ ততই সমান তালে তাহার কানে ঝঙ্কৃত হয় কিছুতেই সে তাহা এড়াইয়া যাইতে পারে না।

ছুটিতে ছুটিতে হানিফ আবার শুনিতে পাইল ব্রাহ্মণীর কর্কশ কণ্ঠ—"দূর হ'য়ে গেছিস, দূর হ'য়েই থাকবি খবরদার আর বাড়ী ঢুকিস্ নি বাছুর আনতে পারিস ত চাকরি থাকবে, না হলে আজ থেকে তোর চাকরি খতম হ'য়ে গেল।"

রাত্রি তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। নীরব নিস্তব্ধ মেদিনী, জনমানবহীন পথ যতদূর দৃষ্টি যায় পূর্ণিমার আলোকে উদ্ভাসিত দিগন্তপ্রসারী ডাঙ্গা ধূ ধূ করিতেছে মরুভূমির মত। সম্মুখে দাসপুকুরের মহাশ্মশান; অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃতদেহ যে কত পড়িয়া আছে ইয়ত্তা নাই তাহাই লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল অসংখ্য শিবাকুল হুক্কাহুয়া রবে শ্মশানভূমি কাঁপাইয়া। নিশাচর পক্ষীর কর্কশ কণ্ঠ উদাস নৈশ বায়ুর সহিত ভাসিয়া আসিতেছিল, মর্মের অন্তরতল পর্যন্ত কি এক ভীতি-হিল্লোলে ভরাইয়া দিয়া।

হানিফ কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করিল না, লক্ষ্যহীনের মতন লক্ষ্যহীন পথে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, খেয়াল নাই তাহার সে যাইতেছে কোথায়, কোথায় তাহার গন্তব্য পথ। এতক্ষণ কোনও বাধা পায় নাই এখন বাধা পাইল গদা হাজির পুকুরের সামনে, যাহার পাড়টা তিন তলা সমান উঁচু, পাহাড়ের মত দাঁড়াইয়া আছে বহু দূর বিস্তার করিয়া, হঠাৎ দেখিলে মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। এইরূপ জনশ্রুতি পূর্বে নাকি এইখানে ডাকাতের আড্ডা ছিল, কত পথিক ধন-প্রাণ হারাইয়া এই স্থানে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার সম্বন্ধে হানিফ কিছু কিছু শুনিয়াছিল তবে সে স্বচক্ষে দেখে নাই এই স্থান ইহার পূর্বে, আজ সেই সর্বনেশে পুকুরের দৃশ্য দেখিয়া সত্যসত্যই তাহার বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল, আকস্মিক ভয়ে ও বিস্ময়ে। পা আর উঠিল না, ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে শুধু চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

কিন্তু হানিফ যাহা দেখিল, চক্ষু আর ফিরাইতে পারিল না, এমন মনোহারিণী মনোমোহিনী দৃশ্য! মধ্যাহ্নের মরুভূমি বনডাঙ্গা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারায় স্নান করিয়া এক অপূর্ব মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার অঙ্গারতপ্ত বালুকা যেন যাদুদণ্ডস্পর্শে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে রজতদীপ্ত প্রবালের আকারে। অগণ্য বৃক্ষশ্রেণী ধ্যানমগ্ন যোগীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দূরে পার্শ্বে ও সম্মুখে, দেখিলে মনে এক মহান্ ভাবের উদয় হয়, আর সেই সঙ্গে একটা মধুর স্বর, বাঁশীর স্বর বলিয়া ভ্রম হয়—গহন, কানন মূর্চ্ছনায় ভরাইয়া দিয়া—একটা অফুরন্ত আনন্দের শিহরণ জাগাইয়া তুলিল।

দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, দূরে পীর সাহেবের দরগা, জ্যোৎস্নার আলোকে ইহার উচ্চ প্রাচীর ও তৎসংলগ্ন স্তম্ভগুলি দপ দপ করিতেছে। দরগার চতুষ্পার্শ্বে কেমন ফুলের বাগান, ফুলগুলি ফুটিয়া মৃদু হিল্লোলে দোল খাইতেছে, ক্ষুদ্র লতাগুল্মগুলি এমন শ্রেণীবদ্ধভাবে মাথা উঁচু করিয়া আছে দেখিলে মনে হয় কে যেন তাহাদের সযত্নে রোপণ করিয়াছে, ঊর্দ্ধে ষোলকলায় পূর্ণ শশধর, নিম্নে শ্যামল দূর্বাদল; চতুর্দিকে বিমল শান্তির পরিপূর্ণ ভাব দেখিয়া হানিফের চক্ষু জুড়াইয়া গেল।

ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া হানিফ দরগার দিকে আগাইতে লাগিল। কিন্তু যতই সে আগাইয়া চলে, ততই এক অনির্বচনীয় আনন্দের আধিক্যে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। বুঝিতে পারিল না সে, তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে সপ্ত-স্বরমালায় ঝঙ্কৃত এমন মধুর রাগিণী বাজিয়া উঠিল কেন, এতক্ষণ বাজে নাই—এখন কেন বাজিয়া উঠিল? আনন্দ-লহরী আনন্দধামেই বহিয়া যায়, পীর সাহেবের দরগা তবে কি আনন্দ-নিকেতন, যেখানে আসিলে মানুষ শোক-তাপ-দুঃখ সমস্ত ভুলিয়া যায়?

তাহার মাতার মুখে শুনিয়াছিল হানিফ, পীর সাহেব

সাক্ষাৎ পূর্ণানন্দের প্রতিমূর্তি, ঐশী শক্তিতে বলীয়ান্ মহাপুরুষ, তুনিয়ায় তাঁহার অসাধ্য কর্ম কিছুই নাই। জাতি-ধর্ম মানেন না তিনি, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই তাঁহার দয়া লাভ করিয়াছে, যাহারাই তাঁহার নিকট জানু পাতিয়া করুণা ভিক্ষা চাহিয়াছে।

পীর সাহেবের কথা ভাবিতে ভাবিতে হানিফের অশান্ত মন ক্ষণেকের জন্য বিভোর হইয়া উঠিল কিন্তু পরক্ষণেই হালদার গৃহিণীর করাল মূর্তি এবং তাঁহার ভীতিদায়িনী তিরস্কার-বাণী মনের কোণে উঁকি মারিয়া পীর সাহেবের চিন্তাসূত্র ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল। দরগার চাতালের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া হানিফ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল—"পীর সাহেব, পীর সাহেব, ছুটে ছুটে প্রাণ বেরিয়ে গেল আমায় আর হায়রাণ কোরো না, আর কষ্ট দিও না, বাছুরটা দয়া করে খুঁজে দাও, বাছুর না পেলে—" আর বলিতে পারিল না, দরগার চাতালের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া হানিফ বুকফাটা কান্না জুড়িয়া দিল।

(৫)

"কে, ওরকম ক'রে কাঁদছে রে?"

স্বর গুরুগম্ভীর, অথচ স্নেহভরা। তাড়াতাড়ি উঠিয়া হানিফ চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি, জনমানবহীন স্থান—হানিফের বুকের ভিতরটা ছম ছম করিতে লাগিল।

"কাদের ছেলে রে তুই? একলা এত রাত্রে এখানে এসে কাঁদছিস?" ভয়ে হানিফের গলা কাঠ হইয়া গেল, দেখিতে পাইল না প্রশ্নকর্তাকে, তবে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে? কোনও অশরীরী আত্মা নয় ত? বিশ্বাস কি, চতুর্দিকে যে সব কবর আর গোরস্থান, অশরীরী আত্মার অভাব আছে কি এই স্থানে—বোধ হয় তাহার কান্না শুনিয়া কেহ কবর হইতে উঠিয়া আসিল!

খড়মের খট্ খট্ আওয়াজ করিতে করিতে কে যেন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, হানিফের প্রাণবিহঙ্গ তখন দেহখাঁচা হইতে পলাইবার উপক্রম করিল। তুই "ওগো তুমি যেই হও, আমাকে ভয় দেখিও না, বড্ড ভয় ক'রছে আমার।"

মূর্তি ধীরকণ্ঠে বলিল—"এখানে কোনও ভয় নেই, পীর সাহেবের দরগার ত্রিসীমানায় ভয় ভয়ে ঘেঁস দেয় না বুঝেছিস? তুই কাঁদছিস, কেন বল ত?"

"বাছুরটা খুঁজে পাচ্ছি না সন্ধ্যে থেকে, বাছুর না পেলে হালদার গিন্নী আস্ত রাখবে না ব'লেছে আমাকে; আমি তাদের গরুর বাগালি করি, আমার নাম হানিফ।"

"ঐ ত বাছুর আমার চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, কি রকম ময়লা ক'রেছে দেখতে পাচ্ছিস ত, দুর্গন্ধে সমস্ত রাত ঘুমুতে পারি নি; বাড়ী যাবার সময় এইগুলো পরিষ্কার ক'রে দিস।"

তারপর হাসিতে হাসিতে বলিল—"গরু ছেড়ে দিয়ে ঘুমুস নি বাবা তাহ'লে ফের এখানে এসে ও আমার চাতাল নষ্ট করে দেবে। তুই ত জানিস পীরের আস্তানা এটা, পীর সাহেব এইখানে থাকে।"

এতক্ষণ পরে হানিফের একটু সাহস হইল। মুখ হইতে হাত সরাইয়া চাহিয়া দেখিল মূর্তিটি অনেকখানি ফকিরের মত দেখিতে; মাথায় লম্বা লম্বা চুল, পাকা দাড়ি বুকে আসিয়া পড়িয়াছে, অয়স-পাথরের মালা এক ছড়া তাহার গলায় ঝুলিতেছে। গায়ে কম্বল জড়ানো; ডান হাতে লোহার বালা একটা, আর বাঁ হাতে ছোট একটি লাঠি।

সাহসে ভর করিয়া হানিফ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি, তুমি বুঝি পীর সাহেব?"

প্রফুল্লমুখে উত্তর দিলেন পীর সাহেব ঘাড় নাড়িয়া—"হ্যাঁ, তুই বুঝি জানিস নি, এই দরগায় আমি থাকি।"

পীর সাহেবের কথায় হানিফ বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে শুনিয়াছিল তাহার মাতার মুখে, পীর সাহেব অনেক দিন আগে দেহ রাখিয়াছেন এবং তাঁহার কবরের উপর এই দরগা তৈয়ারী হইয়াছে। হানিফ কৌতূহল দমন করিতে পারিল না হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"দূর, এ মিথ্যে কথা, তুমি সেই পীর সাহেব নও, সেই পীর সাহেব

যে দরগা, যা এখন ভেঙ্গে-চুরে একাকার হয়ে গেছে, এটা তৈরি হয়েছিল তাঁরই কবরের ওপরে, সে কি এক আধ দিন না কি ?"

পীর সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"ওরে সত্যিই আমি সেই পীর সাহেব, এই দরগায় থাকি, পীর সাহেব কি মিথ্যা কথা বলে ?"

চোখ দুইটি বড় করিয়া হানিফ বলিল—"এই ত বলছ ? মরা লোকে বুঝি কথা কয় ? বাবা মারা গেছে গেল বছরে, কই সে ত কথা বলে না ?"

"মরা লোকে কথা কয় না ? কে বললে তোকে কয় না ? কথা কহালেই কয় রে, কত কেঁদে কেঁদে পীর সাহেব ব'লে ডাকছিলি তুই চুপ করে থাকতে পারলুম কি ? কথা না কইয়ে তুই ছাড়লি কি ?"

হানিফ উত্তর দিল না শুধু ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

পূর্ব্ববৎ হাসিমুখে পীর সাহেব বলিলেন—"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? আচ্ছা তোকে বিশ্বাস করিয়ে দিচ্ছি। ওই সামনে চেয়ে দেখ্।"

হানিফ সবিস্ময়ে দেখিল দরগার মধ্যস্থলে উঁচু বাঁধান বেদিটা হঠাৎ সশব্দে ফাটিয়া গেল। তাহার মধ্যে দেখা গেল এক গাদা মাটি উঁচু হইয়া আছে, মাটির স্তূপটিও দেখিতে দেখিতে ফাঁক হইয়া গেল; পলকহীন নেত্রে হানিফ দেখিতে লাগিল তাহার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড গহ্বর যেন হাঁ করিয়া গিলিতে আসিতেছে আর সেই গহ্বরের মধ্যে একটি মৃতদেহ বস্ত্রাবৃত হইয়া নীরবে শুইয়া আছে। চক্ষুর নিমেষে মৃতদেহের আচ্ছাদিত বস্ত্রখণ্ডটি সরিয়া গেল, দেখা গেল মৃতদেহের প্রতিমূর্তি পীর সাহেবের জীবন্ত মূর্তির সহিত অবিকল মিলিয়া যাইতেছে, একটুও তারতম্য নাই। মৃতদেহী এতক্ষণ চক্ষু মুদিয়া শুইয়া ছিল, হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া স্মিতমুখে বলিয়া উঠিল—"এইবার বিশ্বাস হয়েছে হানিফ ?"

দেখিয়া আতঙ্কে হানিফের মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল ! কি ভীষণ দৃশ্য ! কি অঘটন সংঘটিত ব্যাপার ! মরা মানুষেও কথা বলে, কি আশ্চর্য কথা ! মাথার ভিতরটা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া গেল হানিফের, চতুর্দিকে এমন চাঁদের আলো, হানিফ দেখিতে লাগিল কেবল অন্ধকার আর ধোঁয়া, স্থির থাকিতে পারিল না, অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া চাতালের উপর পড়িয়া গেল।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে হানিফ দেখিল পীর সাহেবের কোলে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া আছে। সম্মুখে মৃত দেহটি নাই, কবরও নাই আর সেই বিরাট্ গহ্বরটিও অন্তর্হিত হইয়াছে। দরগার উপরিস্থিত বেদিটি ভরাট হইয়া গিয়াছে, ফাটালের চিহ্নমাত্র নাই। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সে পীর সাহেবের মুখের দিকে তাকাইবা মাত্র—তিনি কোমলকণ্ঠে বলিলেন—"বড্ড ভীতু তুই, তা জানলে কিছুতেই তোকে এ সব দেখাতুম না, মনে করেছিলুম তুই সাহসী, এখন দেখছি এক নম্বরের ভয়কাতুরে।"

ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া হানিফ দৃঢ়স্বরে বলিল—"তোমার মূর্তি দেখে ভয় পাইনি পীরসাহেব, মাথাটা ঘুরে গেল কেন জানো দুর্বলতায়, সমস্ত দিন কিছুই খাইনি বলে।"

শুনিয়া শশব্যস্তে পীরসাহেব বলিলেন—"ও তাই না কি ? সমস্ত দিন খাস্‌নি কিছু ? এতক্ষণ বলিসনি কেন ? আমার কত খাবার গড়াগড়ি যাচ্ছে।"

চক্ষুর নিমেষে কোথা হইতে এক ধামা গরম মুড়ি, বাতাসা, কদমা ও মুড়কী আসিয়া হাজির হইল। হানিফ কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারিল না। মুখ দিয়া কথা সরিল না অত্যধিক বিস্ময়ে শুধু লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল আহার্যের দিকে।

প্রসন্ন মুখে পীর সাহেব বলিলেন—"কি খেতে ভালবাসিস বল ? লুচি, কচুরি, মিষ্টি ? বল স্পষ্ট ক'রে ?"

হানিফ বলিবে কি, বলিবার কি আছে তাহার ? খালি দেখিতে লাগিল চক্ষু ভরিয়া, আর ভাবিতে লাগিল মনে মনে—এই আহার্যের জন্য সে তাহার অভাগিনী মাতার উপর কতই দুর্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে,—হায়রে মায়ের প্রাণ!—প্রতিদানে দিয়াছে শুধু ভালবাসা আর আশ্বাস। টপটপ করিয়া জল গড়াইয়া আসিল হানিফের চক্ষে মায়ের কথা ভাবিয়া, খাদ্য মুখে তুলিতে পারিল না।

পীর সাহেব বলিলেন—"চুপ করে কি ভাবছিস? ক্ষিদে পেয়েছে বলছিলি যে, খাচ্ছিস না কেন হানিফ?"

সজলচক্ষে হানিফ বলিল—"মা সমস্ত দিন শুকিয়ে আছে যে পীর সাহেব, আমি কি করে খাই, এ ত আমার মুখে উঠবে না।"

"আচ্ছা তোর মায়ের জন্তও খাবার নিয়ে যা, খাবারের আমার অভাব আছে কি?"

কে যেন বায়বীয় মূর্তি ধরিয়া এক ঠোঙ্গা মিষ্টান্ন মুড়ির ধামার উপর রাখিয়া গেল। আহার-সামগ্রী-পূর্ণ পাত্রটি হাতে করিয়া হানিফ উঠিয়া দাঁড়াইল। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল পূর্ব গগনে মরিচীমালী সবিতৃদেব একখানি লাল থালার মত হইয়া ধীরে ধীরে উদিত হইতেছেন, রক্তিম ছটায় চতুর্দিক্ ক্রমে ক্রমে আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। অসংখ্য পক্ষীর কল-কূজনে নীরব মেদিনী যেন সজাগ হইয়া উঠিল। বিহ্বলের মত হানিফ কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দূর শূন্যের দিকে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ পিছন ফিরিয়া দেখিল, সামনে পীর সাহেব নাই, শুধু বাছুরটা দরগার সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

(৬)

সমস্ত রাত্রি মুন্নার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় কাটিয়া গেল। কিছুতেই ঘুম আসিল না তাহার চক্ষে; জাগিয়া বসিয়া রহিল হানিফের অপেক্ষায় এই আসে এই আসে মনে করিয়া। হায়রে মায়ের মন, খালি মন্দই গায়, সুস্থির হয় না কিছুতেই। মুন্না ভাবিতে লাগিল মনিব বাড়ীতে যত কাজই থাক, রাত্রি দশটার মধ্যে হানিফ ফিরিয়া আইসে, রাত্রি যাপন করে না কিছুতেই; কিন্তু এখনও সে ফিরিল না কেন? কোনও বিপদ্-আপদ্ ঘটিল না কি? হানিফের কথা যতই ভাবে ততই চোখের জলে তাহার মুখ ও বুক ভাসিয়া যায়।

ভোরের সময় এক ধামা মুড়ি ও অন্যান্য সামগ্রী লইয়া হানিফকে ফিরিতে দেখিয়া মুন্না সব ভুলিয়া গেল। প্রথমে ছেলেকে কিছুক্ষণ তিরস্কার করিয়া পরে আদর করিয়া তাহার মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সস্নেহে বলিতে লাগিল—"যেখানেই যাস্ আমাকে ত ব'লে যাবি, সমস্ত রাত কিভাবে কেটেছে আমার যদি জানতিস?"

"আমার কিভাবে রাত কেটেছে তা ত জিজ্ঞাসা করলি নি? মানুষ নিজের কষ্টটা খুব বেশী করেই দেখে মা।" বলিতে বলিতে হানিফ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নিতান্ত অপরাধিনীর মত মুন্না কিছুক্ষণ থ হইয়া রহিল, পরে কাপড়ের খুঁটে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে হানিফ কাঁদছিস্ কেন বাবা?"

"কান্না কি আজ নতুন দেখছিস মা, রোজ রোজ কাঁদি গোপনে, কিন্তু আজ তোর সামনে কাঁদছি বড্ড দুঃখে।"

"হালদার গিন্নি বুঝি বকেছে তোকে?"

"বকুনি খেলে মানুষ তত কাঁদে না, যত কাঁদে মনে দুঃখ হ'লে। জীবনপাত করে মনিবের মন যুগিয়ে চলি কিন্তু একটি দিনের জন্যে তার মুখে মিষ্টি কথা শুনতে পাইনি—এইতে বড্ড দুঃখ হয় মা, কাল রাতে এমন তাড়া করেছিল মারবার জন্যে আমার পিছনে পিছনে লোহার একটা বেড়ি নিয়ে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ছুটে ছিলুম, অপরাধ বাছুরটা হারিয়ে গেছলো সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যেতে পারিনি ব'লে, যদি ধরতে পারতো, খুন না ক'রে ছাড়ত না।"

এই পর্যন্ত বলিয়া হানিফ জোরে নিশ্বাস লইল পরে আবার বলিতে লাগিল—"কোন সকালে এক মুঠো শুকনো চোঁয়া মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছিলুম গরু নিয়ে সমস্ত দিনটা পেটে আর কিছু পড়েনি, তার ওপর কি ছোটাছুটি ওঃ পায়ের তলা দুটো এমন টাটিয়ে উঠেছে পা ফেলতে পাচ্ছি না আর কি হায়রাণি! হ্যাঁ মা আমাদের এ দুঃখ কি যাবে না? চিরকালই কি হা অন্ন হা অন্ন ক'রে পরের দোরে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে কাটাতে হবে?"

চোখের জল মুছিয়া মুন্না উত্তর দিল—"সবই আমাদের অদৃষ্টের দোষ বাবা, না হ'লে দুধের ছেলে তুই, এই বয়সে বাগালি ক'রে পেট চালাতে হয় তোকে! ওঃ

আল্লা পূর্ব জন্মে অনেক পাপ ক'রেছিলুম, তার ফল এখন ভোগ ক'রছি।"

হানিফ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"আল্লা কে মা? কোথায় থাকে আমায় বলতে পারিস?"

"আল্লার থাকবার কোনও নিদিষ্ট স্থান নাই বাবা, ভক্তরা যেখানেই তাঁকে কাতর প্রাণে ডাকে সেইখানেই তিনি অধিষ্ঠান হন।"

সোৎসাহে হানিফ বলিল—"আচ্ছা মা তুই যে বলেছিলি পীর সাহেব সাক্ষাৎ ভগবান! সত্যি?"

"সত্যি বই কি বাবা, পীর সাহেব ভগবানেরই অবতার, যাকে বলে সাক্ষাৎ পয়গম্বর, যে যা চেয়েছে তাঁর কাছে তাই পেয়েছে রে।" বলিয়া মাথায় হাত ঠেকাইয়া মুন্না উদ্দেশে পীর সাহেবকে সেলাম করিল।

"আচ্ছা মা, তুই পীর সাহেবকে দেখেছিস?"

"হাবা ছেলে, আমি কি করে দেখবো, আমার তখন জন্মই হয় নি যে।"

"তবে আমি তাঁকে দেখলুম কি ক'রে? চমকে উঠলি বড়? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? সত্যি বলছি মা, কাল রাত্রে আমি স্বচক্ষে পীর সাহেবকে দেখিছি আর তাঁর সঙ্গে কথাও ক'য়েছি।"

হানিফকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া মুন্না গাঢ় স্বরে বলিল—"চুপ কর, ঠাকুর দেবতার কথা ও রকম করে ব'লতে নেই হানিফ।"

হা হা করিয়া হাসিতে হাসিতে হানিফ বলিল—"ব'লতে নেই মানে? তুই বুঝি মনে ক'রেছিস, আমি সব মিথ্যে বলছি? এই যে এক গাদা খাবার কে দিয়েছে জানিস? স্বয়ং পীর সাহেব।"

মুন্না শিহরিয়া উঠিল হানিফের কথা শুনিয়া, বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি? পীর সাহেব তোকে খেতে দিয়েছেন? তোর ভয় ক'রলো না পীর সাহেবের সঙ্গে কথা ক'ইতে?"

"ভয় ক'রবে কেন শুনি? পীর সাহেব বাঘ-ভালুক না কি? দেখতে কেমন জানিস মা ঠিক ফকিরের মত! এক মুখ পাকা দাড়ি, মাথায় লম্বা চুল, গলায় মালা আর এমন মিষ্টি কথা, খানিকক্ষণ শুনতে ইচ্ছে করে, চোখের কি ভাব। দেখলে মনে হয় সত্যিই পীর সাহেব ভগবান্।"

বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া মুন্না আবার জিজ্ঞাসা করিল—"এত খাবার পীর সাহেব তোকে খেতে দিলেন? তুই বুঝি খেতে চেয়েছিলি?"

"চাইব না? ক্ষিদেতে মাথা ঘুরে প'ড়ে গেছলুম যে।"

মুন্না চীৎকার করিয়া বলিল—"শুধু খেতে চাইলি? আর কিছু চাইলি নি? হতভাগা ছেলে, নিজেদের কষ্টের কথাটা, দুঃখের কথাটা মুখ ফুটে তাঁকে জানাতে পারলি নি? হায় হায় কি সাংঘাতিক ভুলই করলি হানিফ? হাতে রত্ন পেয়ে হারিয়ে ফেললি?"

"বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে মা, কথায় কথায় এমন বেভুল হয়ে গেলুম নিজেদের অবস্থাটার কথা জানাবার অবসর পেলুম না।"

এই পর্যন্ত বলিয়া হানিফ কিছুক্ষণ মুন্নার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল তারপর ম্লানমুখে বলিল—"সত্যিই আমি হতভাগা মা, শুধু হতভাগা কেন—এক নম্বরের বোকা, আর গাধা, চাইলুম কি না হালদার গিন্নীর হারাণো বাছুরটা পীর সাহেবের কাছে! এমন আপশোষ হচ্ছে মা মাথা খুঁড়ে মরি।"

চোখ দুইটি বড় করিয়া মুন্না বলিল—"হারাণ বাছুরটা পাওয়া গেল?"

"হাঁ, পীর সাহেব বল্লেন, বাছুরটা তাঁর চাতালে দাঁড়িয়ে আছে, নিয়ে যেতে, ময়লা ক'রেছিল ব'লে কত দুঃখ ক'রে বল্লেন, দুর্গন্ধে সমস্ত রাত তিনি ঘুমুতে পারেন নি—হায় হায় কি ভুলই করলুম!"

রগ দুইটি সজোরে টিপিয়া ধরিয়া মুন্না অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল। শূলের ব্যথায় অম্বুলে রোগিণী যেরূপ যন্ত্রণায় মেঝের উপর গড়াগড়ি দেয় ও কাতরাইতে থাকে মুন্না ঠিক তদ্রূপ করিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে লাগিল—"ওঃ ওঃ—"

কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মুন্না বিহ্বলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"যা বললি আমাকে সব সত্যি ত হানিফ? মিথ্যে বলিস নি?"

"না মা সব সত্যি, এক বিন্দু মিথ্যে বলিনি।"

পাগলিনীর মত চীৎকার করিয়া বলিল মুন্না—"আচ্ছা, আমাকে দেখাতে পারবি, পীর সাহেবকে?"

"খুব পারবো, আজ রাত্রে আমার সঙ্গে দরগায় যাস্, পীর সাহেবকে দেখিয়ে দেব।"

কাঁদিতে কাঁদিতে মুন্না বলিল—"যাব, যাব, নিশ্চয়ই যাব, দেখা যদি হয় তা হ'লে তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ে ব'লব, পীর সাহেব, আমি রাজ-অট্টালিকা, অতুল ঐশ্বর্য তোমার কাছে চাই না, শুধু এই বর দাও দুবেলা দুমুঠো যেন পেট ভরে খেতে পাই—এর বেশী আকাঙ্ক্ষা আমাদের নেই।"

* * * * *

সমস্ত দিন মুন্না কাজে মন বসাইতে পারিল না, যখনই পীর সাহেবের কথা মনে উদয় হয় অমনি বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ক্ষণিক আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিভোর হইয়া পড়ে, আর চক্ষু মুদিয়া সেইটুকু উপভোগ করে অনেকক্ষণ ধরিয়া; একপ্রকার মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে সে, তাহাদের দুরবস্থার কথা পীর সাহেবকে জানাইবেই, প্রাণপণ করিয়া চেষ্টা করিবে তাহাদের দুঃখের জীবনের ধারা বদলাইবার জন্য এবং ইহার একটা না একটা কিনারা না করিয়া সে ছাড়িবে না ইহা নিশ্চিত এবং নিঃসন্দেহ।

মনের মধ্যে শুধু এইগুলি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল কত অনাথ, আতুর, দুঃখী, রোগী পীর সাহেবের দয়ালাভ করিতে পারিয়াছে যখন, সেও সেই দয়ার একটুকু কণার প্রত্যাশিনী, তাহা হইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। খুব সম্ভব সে বঞ্চিতা হইবে না, কেন না সে শুনিয়াছে ও জানে যদি কেহ জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিতে পারে, পীর সাহেব তাহাকে কখনই পায়ে ঠেলিবেন না। যাহা হউক একটা না একটা ব্যবস্থা করিয়াই লইবে সে, কাঁদিয়াই হউক আর মাথা ফাটাইয়াই হউক বা বুক চাপড়াইয়া লুটাইয়া পড়িয়াই হউক। হায় হায় হানিফ করিল কি? হাতে মাণিক পাইয়া হারাইয়া ফেলিল? মিষ্টান্ন দেখিয়া সব ভুলিয়া গেল? একটু আভাস পর্যন্ত দিল না তাহাদের দুরবস্থার? তাহা হইলে কি এতক্ষণ তাহাদের পেটের চিন্তা করিতে হইত না দারিদ্র্যের কশাঘাত মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইত?

চিন্তার তরঙ্গে তলাইয়া গেল মুন্নার মন। কেবল অপেক্ষা করিতে লাগিল কতক্ষণে সন্ধ্যা হয়, কতক্ষণে গভীর রাত্রি হয়। দিন যে আর ফুরাইতে চায় না গো, সূর্যের গতি কি রুদ্ধ হইয়া গেল আজ? কখন প্রভাত হইয়াছে এখনও কি সন্ধ্যা হইবার সময় হয় নাই, আজকের দিন কি ফুরাইবে না?

হানিফের কাজে জবাব হইয়া গিয়াছে শুনিয়া মুন্না একটুও দুঃখিত হইল না, পীর সাহেব যদি দয়া করেন, হানিফের কাজের অভাব কি, কত কাজ স্বেচ্ছায় জুটিয়া যাইবে, কাজের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না আর। মন শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে মুন্না, আর কিছুতেই সে টলিবে না, সে এইবার মর্মে মর্মে বুঝিয়া লইয়াছে,—"ভগবান্ দিলে ফুরায় না মানুষ দিলে কুলায় না।"

সন্ধ্যা হইল। পীর সাহেবের দেওয়া মিষ্টান্ন সেবন করিয়া মায়েপোয়ে প্রস্তুত হইতে লাগিল রাত্রির অপেক্ষায়। আর একটু রাত্রি হইলেই বাহির হইবে উভয়ে। মনে মনে ভাঁজিতে লাগিল মুন্না পীর সাহেবের নিকট প্রথমে কোন্ কথা উত্থাপন করিবে। যদি হানিফের মত মিষ্টান্ন কি অলঙ্কার দিয়া পীর সাহেব তাহার মন ঘুরাইয়া দেন তাহা হইলে সেও ছেলের মত প্রতারিত হইবে না ত?

না না মুন্না সে মেয়ে নয়, মুন্না কাজ বাগাইতে জানে। পীর সাহেবের সহস্র প্রলোভনে ভুলিবার পাত্রী নয় সে, হানিফ ছেলে মানুষ ভুলিতে পারে বটে।

রাত্রি দশটার পূর্বে মুন্না হানিফের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

বাবুরামপুর হইতে পীর সাহেবের দরগা বেশী দূর না হইলেও পথ নিতান্ত কম ছিল না। তিথিটা ছিল প্রতিপদ কিন্তু আকাশে তখনও চাঁদ উঠে নাই, অমাবস্যার মত অন্ধকার ততটা গাঢ় না হইলেও একটু যেন গুমোট বাঁধিয়া ছিল, পথঘাট স্পষ্ট ঠাওর হইতেছিল না। গোর-স্থান ও অসংখ্য কবরের ধার দিয়া যাইতে যাইতে মুন্নার মন সত্যসত্যই ভয়ে ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

হঠাৎ সামনের বটগাছ হইতে একটা নাম না জানা পাখী ওঁয়া ওঁয়া শব্দে আতুরের ছেলের কান্নার মত ডাকিয়া উঠিল, শুনিয়া মুন্নার বুকখানা ধড়্ ফড়্ করিয়া উঠিল। হানিফের হাতখানা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া ছুটিয়া যাইবে এমন সময়ে সড়াৎ করিয়া একটা প্রকাণ্ড সাপ রাস্তার একদিক্ হইতে অন্যদিকে চলিয়া গেল, ভয়ে মুন্না পা বাড়াইতে পারিল না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ওদিকে ডোবার ধারে শৃগালের দল মহানন্দে কীর্তন জুড়িয়া দিয়াছে "হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া" স্বরে; তাহার সহিত গেঁয়ো কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ গানের সঙ্গতের মত তালে তাল মিশাইয়া চতুর্দিক্ কাঁপাইয়া দিতেছে। আকাশের কোলে ছিন্ন-ভিন্ন মেঘগুলি ক্রমশঃ একত্রিত হইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে বিরাট্ দৈত্যের আকারে সমগ্র আকাশখানাকে ছাইয়া ফেলিল।

উভয়ে যখন দরগায় আসিয়া পৌছিল তখন আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। উত্তর দিকে মন্দ মন্দ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল ঠিক এই সময়ে, আর সেই সঙ্গে মেঘের গুরুগম্ভীর নিনাদ বেশ স্পষ্ট জানাইয়া দিল—দুর্যোগের আর অধিক বিলম্ব নাই, কেন না দুই এক ফোঁটা বৃষ্টির কণা উড়িয়া গায়ে আসিয়া পড়িল।

গত রাত্রে পূর্ণিমার আলোকে উদ্ভাসিত দরগার উচ্চ স্তম্ভগুলি কেমন মধুর শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার কি ভীষণ দৃশ্য! অন্ধকারে দেখাইতেছে তাহার স্তম্ভগুলিকে যেন কতিপয় ষণ্ডামার্ক অসুর বিরাট্ বাহু বিস্তার করিয়া অগ্নিমূর্তিতে দাঁড়াইয়া বিভীষিকা দেখাইতেছে, চোখ মেলিয়া চাওয়া যায় না তাহার দিকে—দেখিলে মনে হয় দরগাটি যেন বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত!

ঠিক এই সময়ে বিরাট্ ব্যোম কাঁপাইয়া দূরে বজ্রপাত হইল, রাশি রাশি অগ্নির ঝলকে দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত করিয়া দিয়া; ছুটিয়া আসিল মত্ত মাতঙ্গের বেগে প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝা—কি তাহার বীভৎস মূর্তি, কি তাহার হুঙ্কার, আর কি তাহার দুর্দমনীয় তেজ! অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ পাদপশ্রেণী সে ভীম আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল। আশ্রয়হারা পক্ষিকুল প্রাণের ভয়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিল করুণ আর্তনাদে চতুর্দিক্ বিকম্পিত করিয়া—সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হইয়া যায়!

ভয়ে চক্ষু মুদিয়া হানিফ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, ঝড়ের তাড়নায় সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, ছিটকাইয়া পড়িল দরগা হইতে দশহাত দূরে, সর্বাঙ্গে আঘাত পাইল সাংঘাতিক; রুদ্ধ হইয়া গেল বাক্-শক্তি শুধু ক্ষীণকণ্ঠে একটিবার মাত্র "পীর সাহেব, পীর সাহেব" বলিয়া ডাকিয়া সেইখানে মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

আর মুন্নার অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। সেও ঝড়ে আছাড় খাইয়া ঠিকরাইয়া পড়িল। যন্ত্রণায় কান্নার ঢেউ খেলিয়া গেল হতভাগিনীর বক্ষে, বুকজোড়া নৈরাশ্যের শ্বাস ঠেলিয়া উঠিল কণ্ঠভেদ করিয়া। উচ্ছ্বসিত অশ্রু বেদনাপ্লুত আর্তনাদে সংযুক্ত সমুত্থিত করুণস্বর পীর সাহেবের কানে প্রবেশ করিল না—প্রলয়ের ভীম গর্জনে ডুবিয়া গেল!

অবশিষ্ট যেটুকু ছিল পূর্ণ করিয়া দিল বৃষ্টির প্রবল ধারা; তীক্ষ্ণ শলাকার মত তাহার এক একটি ফোঁটা ধরণীর বক্ষ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। খসিয়া পড়িল কক্ষচ্যুত হইয়া গ্রহ, নক্ষত্র ও উল্কা, হাসিয়া উঠিল ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আকাশপটে নির্মলা সৌদামিনী; ভরিয়া গেল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিরাট্ অন্ধকারে। মুছিয়া গেল ধরণীর শোভা, শুধু চলিতে লাগিল প্রবল ঝঞ্ঝার সংহারিণী নর্তনলীলা, আর মেঘ-ডম্বুরের গুরুগম্ভীর বিকট অট্টহাসি!

সমস্ত রাত্রি অজ্ঞানের মত মাতা ও পুত্র দরগার চাতালের উপর পড়িয়া রহিল। যখন জ্ঞান হইল তখন প্রভাতের অধিক বিলম্ব ছিল না, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কমিয়া গিয়াছে এবং পূর্বাকাশ ধীরে ধীরে রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। ঊষার অস্পষ্ট আলোকে তাহারা দেখিতে পাইল এক পাদচারী পথিক দূরে বহু দূরে মরু প্রান্তরের উপর দিয়া একাকী চলিয়াছে ধীর মন্থর গতিতে, আর শুনিতে পাইল তাহার উদাস কণ্ঠের মধুর সঙ্গীতধ্বনি,—কি বেদনাভরা, কি নৈরাশ্যব্যঞ্জক, কি মর্মস্পর্শী!—

"সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল
অভাগী-কপাল-দোষে।"

বহুরূপ-তারার মর্মবাণী

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম্ বি এ এ, ও এ আর এফ

একদা শরৎকালে, নিশীথ সময়ে,
নির্মল গগনতলে, ছাদের উপরে,
বসিয়া নির্জনে, দূরবীণ-চক্ষুযোগে,
খুঁজিতেছি অদৃশ্য তারকাকুল ; যারা
মাঝে মাঝে দেখা দিয়া লুকাইয়া যায়
নিবিড় নীলিমা-মাঝে, অতি দূর দেশে।
উজ্জ্বল প্রভায় কিম্বা থাকি দীর্ঘকাল,
হঠাৎ নিবিয়া যায়, না জানি কেন বা !
দেখিতে দেখিতে যেন মনে হ'ল মোর,
দূর নীলাকাশ হ'তে আসিছে গুঞ্জন ;
কহে কথা পরস্পর বহুরূপ-তারা,
নিশার আঁধারে করি জ্যোতিঃ বিকিরণ।
'এস্ এস্ অরিগী' কহে 'U জেমিনোরে',—
"হের বোন্ ! বসে ওই সুদূর ধরায়,
দূরবীণ ল'য়ে হের খুঁজিছে মোদের !
উহারা মানব ; শিখেছে অধিকতর
খুঁজিতে কৌশল, গগনের গ্রহ-তারা,
পারে নাই যাহা উহাদের পিতৃগণ।"
একথা শুনিয়া কহে 'এস্ ইউ টোরী'—
"পারিবে কি নর, উন্মুক্ত করিতে গুপ্ত
রহস্য মোদের ?" হেন কালে আসি তথা
'আর্ কর্ বোর্', কহে অতি ভীত মনে,—
"জীবনে কি কাজ, সখি ! যদি পারে ওরা,
মোদের রহস্য ব্যক্ত করিতে ধরায়।"
অকস্মাৎ আসি তথা পূর্ণতম জ্যোতিঃ,
শুক্লবর্ণা, 'এস্ এস্ সিগ্নী', চড়িয়া
বিমানে, ছায়াপথে, সম্বোধিয়া ক্ষীণাঙ্গী
ভগিনীগণে কহিলা—"যতই লুকাই
মোরা গহন গগনে, যত ত্রস্ত হই
মোরা আগমে-নিগমে, পাইবনা পরি-
ত্রাণ, সদা হুঁসিয়ার ঐ আমেরিকার
বহুরূপ-তারা দেখা-সমিতি হইতে।"
কহিতে কহিতে কথা দেহ-কান্তি তার,
ম্লান হ'তে ম্লানতর হইতে লাগিল।
এ কথা শুনিয়া যত বহুরূপ-তারা
কলরব করি কহে 'সিগ্নীর' প্রতি,—
"নাহি কি উপায় কিছু ?" উত্তরে 'সিগ্নী,'—
"নাই ! নাই ! ওই দেখা যায় সুভীষণ
স্পেক্ট্রোস্কোপ, মর্ত্যবাসিগণ যাহে অতি
সুনিপুণ।" 'সিগ্নীর' কথা শুনি ভয়ে,
অতি দ্রুত তারাগণ পলাইয়া যায়।
হেন কালে আসি তথা মায়াবিনী 'মীরা'
রক্তবর্ণা, সুশোভনা, কহে উচ্চৈঃস্বরে,—
"ফটোগ্রাফী হ'তে কিন্তু নাহিক নিস্তার।"
কবি কহে ভয় নাই, ওগো সুলোচনে !
ব্যর্থ হবে সর্ব চেষ্টা বিধাতৃ-বিধানে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা

শ্রীহরিদাস নন্দী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই সময় হতে তাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে তাঁদের দলপতি বলে মনে করলেন এবং দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীর্তন করে কাল কাটাতে লাগলেন।

একদিন গদাধর পণ্ডিত মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত সাক্ষাৎ করতে এলেন। সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়কে দেখবামাত্র তিনি ব্যগ্রসহকারে বলে উঠলেন—"হরি কোথায় আছেন।" পণ্ডিত মহাশয় বললেন—"হরি তোমার হৃদয়-মধ্যে আছেন।" এই কথা শ্রবণমাত্রে শ্রীগৌরাঙ্গদেব উন্মত্তের ন্যায় নখাঘাতে স্বীয় হৃদয় বিদীর্ণ করবার প্রয়াস পেতে লাগলেন। পণ্ডিত মহাশয় দ্রুতভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের হস্ত ধারণ করে বহুকষ্টে তাঁকে নিরস্ত করে বললেন,—"অধীর হয়ো না; ধীর এবং শান্তভাবে শ্রীভগবান্‌কে ডাকলেই তিনি আপনা হতেই এসে তোমাকে দর্শন দেবেন।" পণ্ডিত মহাশয়ের বাক্য শুনে গৌরসুন্দর আশ্বস্ত হলেন। শচীমাতা দেখলেন—গদাধরের বাক্যে তাঁর নিমাই শান্তভাব ধারণ করেছে, এজন্য তিনি গদাধরকে নিমাইয়ের সহিত সর্বক্ষণ থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন। গদাধর পণ্ডিত মহাশয় শচীদেবীর আজ্ঞা মহানন্দে পালন করতে লাগলেন।

মুকুন্দ দত্ত নামক জনৈক ভক্ত শ্রীচৈতন্যদেবের পারিষদ্‌-বর্গের মধ্যে উত্তম গীতবাদ্য করতে পারতেন। এঁর নিকট শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকাবলী সুমিষ্ট স্বরে শ্রবণ করতে অত্যন্ত ভালবাসতেন ও শ্রবণ করে প্রেমে গদগদ ভাব হয়ে উঠতেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত ভক্তগণ কীর্তনানন্দে কালযাপন করছিলেন, কিন্তু জগতে সু ও কু প্রকৃতির দুই প্রকারেরই লোক সর্ব সময়েই বিদ্যমান আছে। তাই ভক্তগণের এ বিমল আনন্দ দুষ্টপ্রকৃতি লোকের ভাল লাগল না। তারা ভক্তগণের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করতে লাগলে। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয়কে তারা দলের সর্দার বুঝে তাঁর প্রতি নির্যাতনের সঙ্কল্প করলে। কেহ কেহ শ্রীবাস পণ্ডিতের নামে রাজদ্বারে অভিযোগ করবার জন্য উদ্যত হল। এইরূপ নানা-ভাবে নির্যাতন করতে থাকলে—নিরীহ ভক্তগণ পাষণ্ডি-গণের কার্যকলাপে বড়ই ভীত হলেন। এমন কি কেহ কেহ সংকীর্তন হতে প্রতিনিবৃত্ত হবার মানসও করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ভক্তগণের প্রাণের বেদনা বুঝতে পেরে তার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা করলেন। একদিন দিবাভাগে প্রকাশ্য রাজপথে তিনি এক বিরাট্ সংকীর্তনের দল নিয়ে নির্ভয়ে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

একদিন তিনি ভাগীরথী-তীরে ভ্রমণ করতে করতে গঙ্গাদেবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অধীর হলেন এবং সেই সময়ে তিনি—"আমিই সেই শ্রীহরি, আমিই সেই শ্রীহরি" এই বলে উচ্চধ্বনি করে দ্রুতপদে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে গমন করলেন। পণ্ডিত মহাশয় সেই সময়ে তাঁর দেবমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করে শ্রীভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। গৌরসুন্দরের অদ্ভুত বাণী শ্রবণে তিনি চমকিত হয়ে দ্বারোদ্ঘাটন করলেন, গৌরহরি গৃহে প্রবেশ করে পণ্ডিত মহাশয়কে বললেন—"পণ্ডিত! আপনি কি আমাকে জানেন না? আমিই সেই শ্রীহরি। সাধুগণের উদ্ধার এবং পাপীর দণ্ড প্রদান করবার জন্যই বৈকুণ্ঠধাম হতে অবতীর্ণ হয়েছি।" শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের তৎকালীন অপরূপ ভাব দর্শনে, তিনি যে প্রকৃতই বিষ্ণুর অবতার, তাহা হৃদয়ঙ্গম করলেন, এবং সমুদয় পরিজনবর্গের সহিত যথাবিধি তাঁর পূজা করতে

লাগলেন। অতঃপর ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই গৌরহরি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন এবং প্রায়ই তিনি শ্রীভগবদ্‌ভাবে আবিষ্ট হতেন।

এই সময় নবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শুভাগমন হল। ইনি বীরভূম জেলার একচক্রা বীরচন্দ্রপুর গ্রামে অবতীর্ণ হন। ইঁহার পিতার নাম হাড়াই ওঝা, এবং মাতার নাম শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী। ইঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, শ্রীল হাড়াই পণ্ডিত মহাশয় মুকুন্দ পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যকালে জনৈক সন্ন্যাসী ওঝা মহাশয়ের গৃহে গমন করেন, এবং এই সন্ন্যাসিপ্রবর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে উভয়ে নানা তীর্থে ভ্রমণ করতে থাকেন। পরিশেষে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ধামে অবস্থান করতে করতে নবদ্বীপ ধামে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কার্যকলাপের বিষয় অবগত হয়ে তাঁর সহিত মিলিত হবার জন্য নবদ্বীপে গমন করেন। নবদ্বীপে তিনি শ্রীল নন্দন আচার্যের গৃহে বাস করতে থাকেন। কথিত আছে শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর আগমনের বিষয় পূর্বেই অবগত ছিলেন, এবং ভক্তমণ্ডলীর নিকট তিনি এ সংবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। এক্ষণে তিনি শিষ্যমণ্ডলী সহ তাঁকে দর্শন করিবার জন্য নন্দন আচার্য মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ বড়ই প্রীতিজনক হল, যেন যুগযুগান্তরের পরিচয়; যেন গঙ্গা-যমুনার মিলন। সেই হতে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় দেখতে লাগলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নবদ্বীপ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে নিত্যানন্দ বললেন,—তিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় নানাস্থান পরিভ্রমণ করেছেন, কিন্তু কোথাও তাঁর দর্শন প্রাপ্ত হন নি। অবশেষে তিনি জানতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বঙ্গদেশে এই নবদ্বীপ ধামেই অবতীর্ণ হয়েছেন। এজন্যই তাঁর শ্রীধামে আগমন। অতঃপর উভয়ে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক একটি শ্লোক আবৃত্তি শুনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ তদ্দৃষ্টে পরম প্রীত হলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহ বা অঙ্গন শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-বিকাশের প্রধানস্থল বলে পরিগণিত হল। এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করিতে লাগলেন। পণ্ডিতের সহধর্মিণী শ্রীমতী মালিনী দেবীকে নিত্যানন্দ 'মা' বলে সম্বোধন করতেন।

শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রীতিভাব দর্শনে ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁদের হরিহর-মিলন, কেহ কেহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ এবং কেহ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সহিত তাঁদের তুলনা করতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীনিত্যানন্দ বলরামের অবতার বলে কীর্তিত হয়েছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দণ্ড-কমণ্ডলু-ধারী সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সহিত মিলনের পরেই তিনি দণ্ডকমণ্ডলু ভগ্ন করে ফেললেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোনও উত্তর না দিয়ে কেবল হাস্য করতে লাগলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তগণ সহ ঐ ভগ্ন দণ্ডকমণ্ডলু জাহ্নবী-সলিলে নিক্ষেপ করে আসেন।

অতঃপর পূর্ণ উৎসাহে শ্রীবাস অঙ্গনে সংকীর্তন যজ্ঞ আরম্ভ হল। নানা দেশ-বিদেশ হতে ভক্তগণ নবদ্বীপ-ধামে আগমন করে কীর্তনে যোগদান করতে লাগলেন। নবদ্বীপে গোলোকের আনন্দ প্রকাশ পেতে লাগলো।

এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেব শান্তিপুরের শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে আহ্বান করে আনবার জন্য রামাই পণ্ডিত নামক জনৈক ভক্তকে শান্তিপুরে প্রেরণ করলেন। আচার্যদেব রামাই পণ্ডিতের মুখে নবদ্বীপের সমুদয় সংবাদ অবগত হয়ে মনে মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। প্রকাশ্যে তিনি রামাই পণ্ডিতকে বললেন, আমি শ্রীগৌরাঙ্গকে পরীক্ষা করব। নবদ্বীপে গমন করে আমি গোপনভাবে অবস্থান করব, যদি শ্রীগৌরাঙ্গ আমাকে সন্ধান করে বার করতে পারেন, তবেই বুঝব যে তিনি সত্য-সত্যই গোলোক হতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এই বলে তিনি পণ্ডিতকে সমুদয় বিষয় গোপন রাখতে উপদেশ দিলেন। রামাই পণ্ডিত নবদ্বীপে গমন করে

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত সাক্ষাৎ মাত্রেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব অদ্বৈত প্রভুর গোপন মনোভাবের কথা সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করে দিলেন।

আচার্যদেব পরে এই সব কথা অবগত হয়ে আশ্চর্যান্বিত হলেন। নন্দন আচার্যের গৃহে তিনি সস্ত্রীক অতীব গোপনে অবস্থান করছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আহ্বানে তাঁর সহিত মিলিত হলেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস মহাশয়ের গ্রন্থে আছে :—

"শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবনতমস্তকে গভীর চিন্তায় মগ্ন, তাঁর অঙ্গ হতে দিব্যজ্যোতি বিকাশ পাচ্ছে, চতুর্দিকে দেবদূতগণ তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। এই অবস্থায় অদ্বৈত আচার্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করলেন। এই অলৌকিক দৃশ্যে আচার্য মহাশয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেব অদ্বৈত প্রভুকে বললেন, —আচার্য মহাশয়! আপনার আন্তরিক প্রার্থনা আমাকে 'অবতারের রূপ' পরিগ্রহ করতে বাধ্য করেছে।"

আচার্য শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র পাঠ করতে করতে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের পদতলে বিলুণ্ঠিত হতে লাগলেন। সেই হতে অদ্বৈত প্রভু নবদ্বীপে সস্ত্রীক বসবাস করতে লাগলেন। নবদ্বীপে ক্রমে ক্রমে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হতে লাগল। ভুলোক গোলোকধামে পরিণত হল।

এই সময়ে নবদ্বীপে চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নামক জনৈক মহা প্রেমিক ভক্তের আগমন হল। ভক্ত-বর মুকুন্দ দত্তের সহিত বিদ্যানিধির বন্ধুত্ব ছিল। এক দিবস মুকুন্দের মুখে সুমিষ্টস্বরে ভাগবত পাঠ শুনে বিদ্যানিধি মহাশয় প্রেমে আত্মহারা হলেন। পরে তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এলে মুকুন্দ এই পুণ্ডরীককে শ্রীচৈতন্যের নিকট নিয়ে গেলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রফুল্ল অন্তরে তাঁদের আদর-অভ্যর্থনা করলেন। পুণ্ডরীকের বিদ্যানিধি উপাধি চৈতন্যদেবের মনঃপূত হল না। তিনি তৎপরিবর্তে তাঁকে 'প্রেমনিধি' এই উপাধি দ্বারা ভূষিত করলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হৃদয় সদাই আনন্দময়। তিনি হাস্য-পরিহাস এবং বালকদের সহিত ক্রীড়ায় রত থাকতেন। গঙ্গাবক্ষে সাঁতার কাটতে ভালবাসতেন, এবং সকলের গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়াতে বিশেষ আনন্দানুভব করতেন। তিনি শচীদেবীকে আন্তরিক ভক্তি করতেন এবং মা সম্বোধন করতেন। শচী দেবীও নিতাইকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখতেন।

হরিনাম প্রচারে শ্রীগৌরাঙ্গ

অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেব এক্ষণে সংকীর্তন সম্বন্ধে নূতন পরিবর্তন অবলম্বন করতে মনন করলেন। এই পর্যন্ত তাঁরা দিবাভাগে সংকীর্তন করতেন। এক্ষণে চৈতন্যদেব তাঁর শিষ্যবর্গকে বললেন যে "ভগবৎ-প্রীতিরূপ অতল-স্পর্শ-গঙ্গা-সলিলে অবগাহন করতে হলে তাঁদের দিবারাত্রি সর্ব সময়েই ভগবৎ-নাম কীর্তন করতে হবে।" বৈষ্ণবগণ এই প্রস্তাবে আনন্দিত হলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অভিমত অনুসারে ইহা ব্যতীত সংকীর্তন পদ্ধতিরও পরিবর্তন করা হল। সকলে একত্র হয়ে সংকীর্তন না করে ভিন্ন ভিন্ন সংকীর্তনের দল সৃষ্টি করা হল। নৃত্যের সময়ও পরিবর্ধিত করা হল। সংকীর্তন সময়ে যে সমস্ত স্তোত্র কীর্তন করা হত তা অতিশয় সুদীর্ঘ ছিল। কোন কোন স্তোত্রে প্রায় চল্লিশটি চরণ ছিল। অদ্বৈত আচার্য মহাশয় অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক হাবভাব সহকারে নৃত্য করতেন। তাঁর নৃত্য দেখে কেহ হাস্যরোধ করতে পারতেন না। অন্য দিকে শ্রীচৈতন্যদেবের নৃত্য-পদ্ধতি অত্যন্ত অসাধারণ রকমের ছিল। বৃন্দাবন দাস মহাশয় চৈতন্যদেবের নৃত্য নিম্নলিখিতরূপভাবে বর্ণনা করেছেন—"কখনও কখনও তিনি অল্প অল্প উল্লম্ফন দ্বারা স্থানে স্থানে ঘুরে নৃত্য করছেন, কখন বা কোনও বৈষ্ণবের স্কন্ধে লম্ফ দিয়ে আরোহণ করছেন। চৈতন্যদেব কোনও সময় অতিশয় হাস্যোদ্দীপক হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গী করতেন; নৃত্য করতে করতে কোন সময়ে তিনি তাঁর কোনও শিষ্যের পদতলে পতিত হতেন। তাঁর দেহ কখনও বিশেষ লঘু, কখন বা অতিশয় গুরু বলে অনুমিত হত।"

একদিন একজন শৈব-সন্ন্যাসী ভিক্ষা গ্রহণ করতে শ্রীচৈতন্যের গৃহে আগমন করলেন। সন্ন্যাসী তাঁর শিঙারব করতে এবং ভগবান্ একলিঙ্গের প্রশংসা করে স্তোত্র গান

করতে লাগলেন। ইহা শ্রবণ করতঃ শ্রীচৈতন্যদেব 'আমি শিব' এই বলে চীৎকার করে উঠলেন, এবং লম্ফ দিয়ে সন্ন্যাসীর স্কন্ধে আরোহণ করে বসলেন। সন্ন্যাসীর হৃদয়ও ভাবে ভরপুর হয়ে উঠেছিল এবং তিনিও নৃত্য করতে লাগলেন। অবশেষে শ্রীচৈতন্যের সংজ্ঞা ফিরে এলে তিনি সন্ন্যাসীর স্কন্ধ হতে অবতরণ করলেন এবং সম্মান সহকারে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা প্রদান করে বিদায় দিলেন।

এই সময় বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয়ের অন্দরমহলের প্রাঙ্গণে প্রত্যহ রাত্রিকালে সংকীর্তন করতে আরম্ভ করলেন। সংকীর্তন শুনতে বাড়ীর বহির্দেশে সকল রকমের লোকই এসে জমা হত। কেহ কেহ সংকীর্তন শুনে অতিশয় আনন্দ অনুভব করতেন। অধিকাংশ লোকই বৈষ্ণবদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত।

একদিন রাত্রিকালে কতকগুলি দুষ্ট লোক একত্রিত হয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয়ের বহির্বাটিতে একজন নষ্ট চরিত্রের স্ত্রীলোককে মদের বোতল হস্তে দিয়ে গুপ্তভাবে রেখে দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলের নিকট প্রকাশ করলেন যে, বৈষ্ণবগণ কীর্তন করবার ছল করে সমস্ত রাত্রি কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ করে থাকে ইত্যাদি। পরিশেষে সত্যের জয় হল, দুষ্টগণের দুরভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়ল। কথিত আছে অসৎ কার্যের ফলভোগ স্বরূপ তাদের দলপতি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়েছিল।

এ পর্যন্ত 'সংকীর্তন' বৈষ্ণবদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। চৈতন্যদেব সর্বসাধারণের মধ্যে হরিনাম প্রচার করা কর্তব্য বলে মনে করলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীহরিদাসকে এই কার্যভার গ্রহণ করতে বললেন। তিনি তাঁদের এইরূপ উপদেশ দান করলেন—"তোমরা দ্বারে দ্বারে ঘুরে 'হরিনাম' প্রচার কর। সকলকেই এই পুণ্যনাম গ্রহণ করতে অনুরোধ করবে। স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল নির্বিশেষে সকলকেই এই পবিত্র নাম প্রদান করবে। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা গৃহে ফিরে তোমরা কার্যে কতদূর কৃতকার্য হয়েছ—তা আমাকে জ্ঞাপন করবে।" হরিদাস এবং নিত্যানন্দ অতি হৃষ্টচিত্তে এই কার্যভার গ্রহণ করলেন।

নিত্যানন্দ এবং হরিদাস হরিনাম প্রচার আরম্ভ করলেন। তাঁরা সকলকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করতে লাগলেন—"ভাই সব! আন্তরিক ভক্তিসহকারে হরিনাম স্মরণ কর। শ্রীহরিই তোমাদের জীবনের জীবনীশক্তি! তোমরা যাহা কিছু আপনার বলে গর্ব অনুভব কর সে সমস্তই শ্রীহরির দান। আমরা তোমাদের পদধারণ পূর্বক অনুরোধ করছি যে, তোমাদের সেই শক্তিমান্ শ্রীহরির নাম গ্রহণ কর। তোমাদের কঠিন হৃদয় হরিনাম-সুধা-ধারে গলে যাবে, তোমাদের জীবন ধন্য এবং সুখে অতি-বাহিত হবে।" অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁদের এই কথায় মনঃসংযোগ করত। অধিকাংশ মনুষ্যই তাঁদের নিন্দা ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করত।

একদিন জগাই মাধাই নামক দুইজন পাষণ্ডের সহিত নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সাক্ষাৎ হল। এই দুই ব্যক্তি পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও তাদের চরিত্র অতি হীন ছিল। তারা সর্বদাই পাপাচরণ এবং ভগবানের নিন্দা করে বেড়াত। পথিকদের অসহায় অবস্থায় নির্যাতন করাই তারা তাদের কর্তব্যকার্য বলে গ্রহণ করেছিল। ইহাদের উভয়ের অবস্থা চিন্তা করে নিত্যানন্দ হৃদয়ে বিষম বেদনা পেতেন। নিত্যানন্দ একজন ভদ্রলোককে ইহাদের চরিত্রে কোনও একটি গুণ আছে কি না এই বিষয় জিজ্ঞাসা করলে সেই ভদ্রলোক বললেন যে, ইহাদের কোনও লোকের নিন্দা করতে শুনি নি। নিত্যানন্দ উভয়কে উদ্ধার করবার বাসনা করলেন। হরিদাসকে তিনি তাঁর অভিমত জানালেন এবং দুইজনে তাদের কর্ণে হরিনাম প্রদান করতে মনন করলেন। নিত্যানন্দ এবং হরিদাস জগাই মাধাইএর সম্মুখে অগ্রসর হতে চললেন। সেই দিকে অগ্রসর হতে দেখে পথিকগণ তাঁদের জগাই এবং মাধাইএর অত্যাচার স্মরণ করিয়ে অগ্রসর হতে নিষেধ করলে। নিত্যানন্দ এবং হরিদাস পথিকদের কথায় কর্ণপাত করলেন না, তাঁদের গন্তব্যপথে অগ্রসর হতে লাগলেন। নিত্যানন্দ এবং হরিদাস জগাই এবং মাধাইএর সম্মুখীন হয়ে তাদের হরিনাম করতে অনুরোধ করলেন। দস্যুদ্বয় তাঁদের বধ করবার ভয় প্রদর্শন করলে। তাদের

ভয়ঙ্কর দস্যুমূর্তি অবলোকন করে নিতাই ও হরিদাস প্রাণ ভয়ে ছুটে পলায়ন করলেন। চৈতন্তের গৃহ অতি নিকটবর্তী ছিল। তাঁরা তাঁর গৃহে আশ্রয় নিলেন। নিত্যানন্দ এবং হরিদাস, চৈতন্তদেব এবং অন্যান্য বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট জগাই এবং মাধাইএর বিষয় বিবৃত করলেন। শ্রীচৈতন্তদেব জগাই এবং মাধাই সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার বাসনা প্রকাশ করলেন। গঙ্গাদাস এবং শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয় জগাই এবং মাধাই সম্বন্ধে সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে শ্রীচৈতন্তদেবকে বললেন। তাঁদের বর্ণনা অনুসারে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হল যে, জগাই ও মাধাই পাপের চরম সীমায় পদার্পণ করেছে। ইহা শুনে চৈতন্তদেব ক্রোধে অন্ধ হয়ে বলে উঠলেন যে, তারা এখানে এলে তিনি তাদের খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলবেন। চৈতন্তের উক্তি শুনে নিতাই বললেন—"তুমি তাদের খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলতে পার,—কিন্তু আমি তাদের উদ্ধার না করে ছাড়ব না। হরিনাম গ্রহণ করলে যদি জগাই এবং মাধাইএর মত পাপী মুক্তি না পায় তবে হরিনাম গ্রহণের ফল কি?" নিতাইএর মহৎ উক্তি শুনে চৈতন্তদেব বললেন—"আপনি যদি একাগ্রচিত্তে তাদের শুভ কামনা করেন তবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাদের উদ্ধার করবেন।" চৈতন্তের কথা শুনে নিতাই অত্যন্ত প্রীত হলেন।

এখন হতে জগাই, মাধাইএর কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা নিতাই তাঁর কর্তব্যকার্য বলে মনে করলেন।

ক্রমশঃ

তুলসী-সপ্তশতিকা

শ্রীরামচরণ দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৬৫)

তুলসী বরণ বিকল্পকো ঔচপ তৃতীয় সমেত।
অন সমুঝে জড় সরিসনর সমুঝে সচেত ॥

বিকল্পবর্ণ "বা" চপ তৃতীয় "ত"
উভয় মিলনে "বাত" উদয়;
যে না বুঝে সেই নর হয়ে জড়,—
যে বুঝে সে সাধু সচেত হয়।

(৬৬)

যাস্থ আস্থ সরদেব কো অরু আসন হরি বাম।
সকল দুঃখদ তুলসী তজহুঁ মধ্য তাস্থ সুখধাম ॥

মানস-সরসে যাহার আবাস
হরি-বামা যাহে করে আসন;
উভয়ের মধ্য লইয়া ভজিবে

(৬৭)

চঞ্চল তিয়ভজু প্রথম হরি যো চাহসি পুরধাম।
তুলসী কহহিঁ সুজন শুনহুঁ যহি সয়ানপ কাম ॥

চঞ্চল, নারীর প্রথম ছাড়িয়া
শেষ মিলাইয়া কর ভজন;
কহিছে তুলসী যদি চাহ মুক্তি
জগতে হইতে চতুর জন।

(৬৮)

কুলিশ, ধর্ম যুগ অন্তযুত ভজু তুলসি তজি কাম।
অশুভহরণ সংশয়শমন সকল কলাগুণধাম ॥

কুলিশ, ধর্মের যুগঅন্ত যুত
ভজরে তুলসি! ত্যজিয়া কাম;
অশুভহরণ সংশয়শমন

(৬৯)

শ্রীকরমেকো ? রঘুনাথ, হর অনয়স কহ সব কোয়।
সুখদা কো ? জানত সুমতি তুলসী সমতা দোয় ॥
শ্রীকর বিপদ- হর কে ? শ্রীরাম—
জগতে একথা সকলে জানে ;
সুখদা সংসারে কিবা হয় ? বল
সুমতি সমতা তুলসী ভনে।

(৭০)

বৈর মূল হিত হর বচন প্রেমমূল উপকার।
দোহা সরল সনেহময় তুলসী কর বিচার ॥
বৈরমূল হয় হিতহর কথা
উপকার হয় প্রেম-কারণ ;
দুই পরিহরি সরল সনেহ
হৃদয়ে রাখহ তুলসী ক'ন।

(৭১)

প্রাগ কবন ? গুরু ; লঘু জগত তুলসী অবর ন আন।
শ্রেষ্ঠা কো হরিভক্তি সম কো লঘু লোভ সমান ॥
কে সবার বড় ? গুরু ; সর্ব লঘু
কে হয় ? সংসার বলিয়া জান ;
শ্রেষ্ঠা কে জগতে হরিভক্তি সম
কেবা লঘু আর লোভ সমান।

(৭২)

বরণ নিরয় নাশক নিয়র তুলসী অন্তরসাল।
ভজহুঁ সকল শ্রীকর সদন জনপালক খল সাল ॥
নিরয়-নাশক নারায়ণ ; তার
দ্বিতীয় বরণ কর গ্রহণ ;
আম এর অন্ত সংযোগ করিয়া
ভজ সকল ঐশ্বর্যসদন।

(৭৩)

কপ শ্রেয়স স্বর সহিত গুণি ক্রমযুত দুমদ ন আন।
তুলসী হল যুত তে কুশল অন্তকার সহ জান ॥
কপের "ক" কার লইয়া যতনে
তাহাতে অকার যোগ করিয়া
ক্রমের মকার যোগে হয় যাহা
তারে নাশ সদা হরি ভজিয়া।

ক্রমশঃ

প্রমীলা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্

কুশীলব

(পুরুষ)

রাম—অযোধ্যার রাজপুত্র
লক্ষ্মণ—ঐ ভ্রাতা
রাবণ—লঙ্কাধিপতি
বিভীষণ—ঐ ভ্রাতা
মেঘনাদ—রাবণের পুত্র
বীরবাহু—রাবণের পুত্র
কালনেমি—রাবণের মাতুল
বিশ্বশ্রবা—জনৈক মুনি (রাবণের পিতা)
সারণ—রাক্ষস-সচিব
শুক—চর
মারুতি—হনুমান
অঙ্গদ—বানররাজ বালীর পুত্র

কঞ্চুকী, প্রতিকামী, দূত, দেবগণ, রাক্ষসগণ, যক্ষগণ,
কিন্নরগণ ইত্যাদি

(স্ত্রী)

সীতা—রামের স্ত্রী
মন্দোদরী—রাবণের স্ত্রী
চিত্রাঙ্গদা—রাবণের অন্যতমা মহিষী
প্রমীলা—রাবণের পুত্রবধু, মেঘনাদের পত্নী
রঙ্গিলা—প্রমীলার প্রধানা সহচরী
সখীগণ, পুরস্ত্রীগণ ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—লঙ্কা ; কাল—উষা
রাণী চিত্রাঙ্গদার শয়ন-কক্ষ
চিত্রাঙ্গদা ও বীরবাহু

চিত্রা। যাবি রণে!
বীর। মাতা!
কি হেতু বিস্ময়!
চুমা দাও গালে,—
দাও পদরেণু,—
তুলে দেই ভালে!
রাজীব চরণ-গুণে,—
পা'ব বরাভয়!
হবে মোর সর্বত্র বিজয়।
[চিত্রাঙ্গদা কোন কথা বলিলেন না]
বীর। নিরুত্তর কেন রহ মাতা!
আশা মোর—
সোসর রাঘব সহ করিব সমর!
বীর অবতার—
নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র—
কীর্তি-গাথা যাঁর,
প্রচারিত ভুবনে ভুবনে।
রাজর্ষি জনক-গৃহে,
হরধনু ভাঙ্গি,—
লভেছে মৈথিলী ;
বীরগর্বী ভার্গবের—
রুদ্ধ স্বর্গপথ বাণের তাড়নে।
পাষাণী মানবী!
কাষ্ঠতরী স্বর্ণ হ'ল চরণ-পরশে।
মাতা!
সেই রামচন্দ্র সনে রণ—
মিলিবে না এ সুযোগ জীবনে আবার।
কর আশীর্বাদ।
চিত্রা। না—না—না—
ফিরে যা'—ফিরে যা' কুমার।
রামচন্দ্র সনে রণ—
শোভে কি কখন!
কুসুম-কোমল নবদূর্বাদলশ্যামদেহে,—
অবিরাম ক্ষরিছে বিদ্যুৎ!
বাণমুখে জ্বলে কালানল,—
যে অনলে ভস্ম কুম্ভকর্ণ—
মহাবীর—বিরূপাক্ষ সম!
দগ্ধ অতিকায়
শূরগর্বী কৃতান্ত সমান!
পুত্র—পুত্র!
ক্ষুদ্র ঐ নরদেহে,—
বাস করে দর্পহারী নারায়ণ—
যুদ্ধ শোভে সমানে সমান—
নাহি শোভে, জীবে নারায়ণে!
বীর। নারায়ণ—নারায়ণ!
শুনেছিনু খুল্লতাত বিভীষণ-মুখে,—
ত্যজিয়া কনক লঙ্কা,
ত্যজি প্রিয় জন্মভূমি
ত্যজি সহোদর
বাষ্পাকুল আঁখি—
আকুল পরাণ লয়ে,—
নির্বাসনে গিয়েছিল যবে!
বলেছে সরমা মাতা,

রুদ্ধকণ্ঠে নয়নের জলে !
বলেছে তরণী,
বাণে বাণে বিদ্ধ হয়ে—
যবে চুম্বি পড়িল অবনী !
তুমিও কহিছ মাতা !
বিদায়ের সন্ধিক্ষণে মোর !
তীব্রতর লালসা জাগিছে প্রাণে।
নশ্বর নয়ন—
সর্বত্র হেরিছে রামরূপ !
নবদূর্বাদলশ্যামশোভা,—
ভুবন করিয়া আলো,
নয়নে বিঁধিছে মোর !
মাতা-মাতা।
শত্রুরূপে নারায়ণ
করিছেন রণ আকিঞ্চন
রক্ষঃ শিশু—পিতা মোর দুর্মদ রাবণ !
বল মাতা—
কোন্ প্রাণে পরিহরি রণ
দীনবেশে লইব শরণ !
ভেব না জননি !
সম্মুখ আহবে,—
যবে ভেটিব শ্রীরামে,
বাণে বাণে—
আবীরে রাঙাব শ্রীচরণ,
পুষ্পিত মন্দার সম,
শোভিত হইবে নারায়ণ !

চিত্রা। না—না—না—
চলে যা—চলে যা—
দূরে—বহু দূরে পালারে বালক—
পাপ লঙ্কা ত্যজি।
হেথা পিতা করে পুত্ররক্ত পান !
মাতা তৃপ্তা তনয়ের মেদে !
আকাশে বাতাসে—
বৈরিতার বীজ ছড়াছড়ি।

বীর। মাতা !
নারায়ণ উদয় লঙ্কায়।
পূজা তাঁর চাই !
কিন্তু মাতা !
এ পূজায় অভিষেক হবে না তাঁহার;
তীর্থ-বারি দিয়া।
সুগন্ধী কুসুমে হবে না অর্চনা।
অফুরন্ত কামনার ভারে,
শির নাহি লুটাবে মেদিনী।
পরিবর্তে তার,—
রণক্ষেত্রে বাণের তাড়নে
লাবণি ছুটায়ে শ্যামদেহে
অভিষেক করিব তাঁহারে।
ক্ষুরপার্শ্ব অর্ধচন্দ্র বাণে—
মর্মস্থলে আঘাত করিয়া,—
জানাইব হৃদয়ের ব্যথা ;
তাহে যদি তৃপ্ত নাহি হ'ন নারায়ণ !
অর্ঘ্য দেব ছিন্ন শির !
উত্তপ্ত শোণিতে,
ধোয়াইব রাতুল চরণ !

চিত্রা। পুত্র—পুত্র !

বীর। না—না—না—
মাতা,—
আঁখিজলে পথ মোর করনা পিছিল,—
স্নেহ-মমতার আবরণে,—
ঢাকিও না হৃদি !
আকুল আগ্রহ, অতৃপ্ত বাসনা লয়ে,—
ছুটিয়াছি আমি,—
তাঁর দরশন লাগি
যেই জন উন্মাদ করেছে মোরে।
মাতা !
সাগরের নীলবক্ষ ভেদি—
দেখ ঐ রাঙা রবি দিক্‌চক্রবালে,—
শরতের পবিত্র প্রভাতে—

লোহিত পতাকা লয়ে,—
ডাকিতেছে স্নিগ্ধ কলগানে।

[এমন সময় নিম্নের রাজপথ দিয়া অগণিত যুদ্ধোন্মত্ত সৈনিকগণ গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল]

সাজ, সাজ সাজরে,
রণ-সাজে সাজরে!
চল্‌রে—চল্‌রে—
সমরে চল্‌রে!
অরিকুল মারিয়া নৃপতিকে রাখ্‌রে!
চলরে—চলরে!
রয়েছে বানর-নর ঘেরিয়া লঙ্কা;
শত্রু গর্বভরে বাজাইছে ডঙ্কা;
ঘরে কেন বসে রে!
চল্‌রে—চল্‌রে!

বীর। মাতা!
ঐ ঐ বিজয়-দুন্দুভি বাজে!
হুঙ্কারিছে রাক্ষস-কটক!
ঐ ঐ মৃত্যুর আহ্বান!
মাতা—মাতা—
লহ নমস্কার।
ঝাঁপ দেব সমর-অর্ণবে।
যদি কুল পাই,—
তোমারে দেখাব নারায়ণ। [প্রস্থান]

চিত্রা। নারায়ণ—নারায়ণ— [প্রস্থান]

ক্রমশঃ

স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল সরকার

শ্রীআশুতোষ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন—"

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হোমিওপ্যাথ-বৈজ্ঞানিক, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠাতা, কলিকাতা জার্ণ্যাল অফ মেডিসিন পত্রিকার প্রবর্তক, বৈদ্যনাথ দেওঘরে রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, এসিয়াটিক্ সোসাইটির কাউন্সিলের সভ্য এবং ইয়োরোপ ও আমেরিকায় নানা বিজ্ঞান সভার সভ্য, স্বদেশপ্রেমিক স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের ৩৪তম মৃত্যুবাসর উপলক্ষে স্মৃতি-পূজা কলিকাতা এবং বাংলার অনেক স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

একশত পাঁচ বৎসর পূর্বে (২রা নভেম্বর ১৮৩৩ সালে) রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধানের কয়েক মাস পরে বাংলা দেশে এই প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। মহেন্দ্রলালের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতির ন্যায় ব্যাপৃত না হইলে পাশ্চাত্য জগতের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া জীবন-সংগ্রামে টিঁকিতে পারিবে না। তাই তিনি তাঁহার সময়, অর্থ ও সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করিয়া ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সভা (The Indian Association for the Cultivation of Science) স্থাপনে তিনি যেরূপ অদম্য অধ্যবসায়, একাগ্রতা, ত্যাগ ও কুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। স্বদেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য তিনি এই দুরূহ কাজে নামিয়াছিলেন। এদেশের লোক যাহাতে স্বল্প ব্যয়ে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি শিক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া শিল্প ও কৃষির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে তাহাই তাঁহার বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল।

ডাক্তার সরকার ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথির প্রচারে
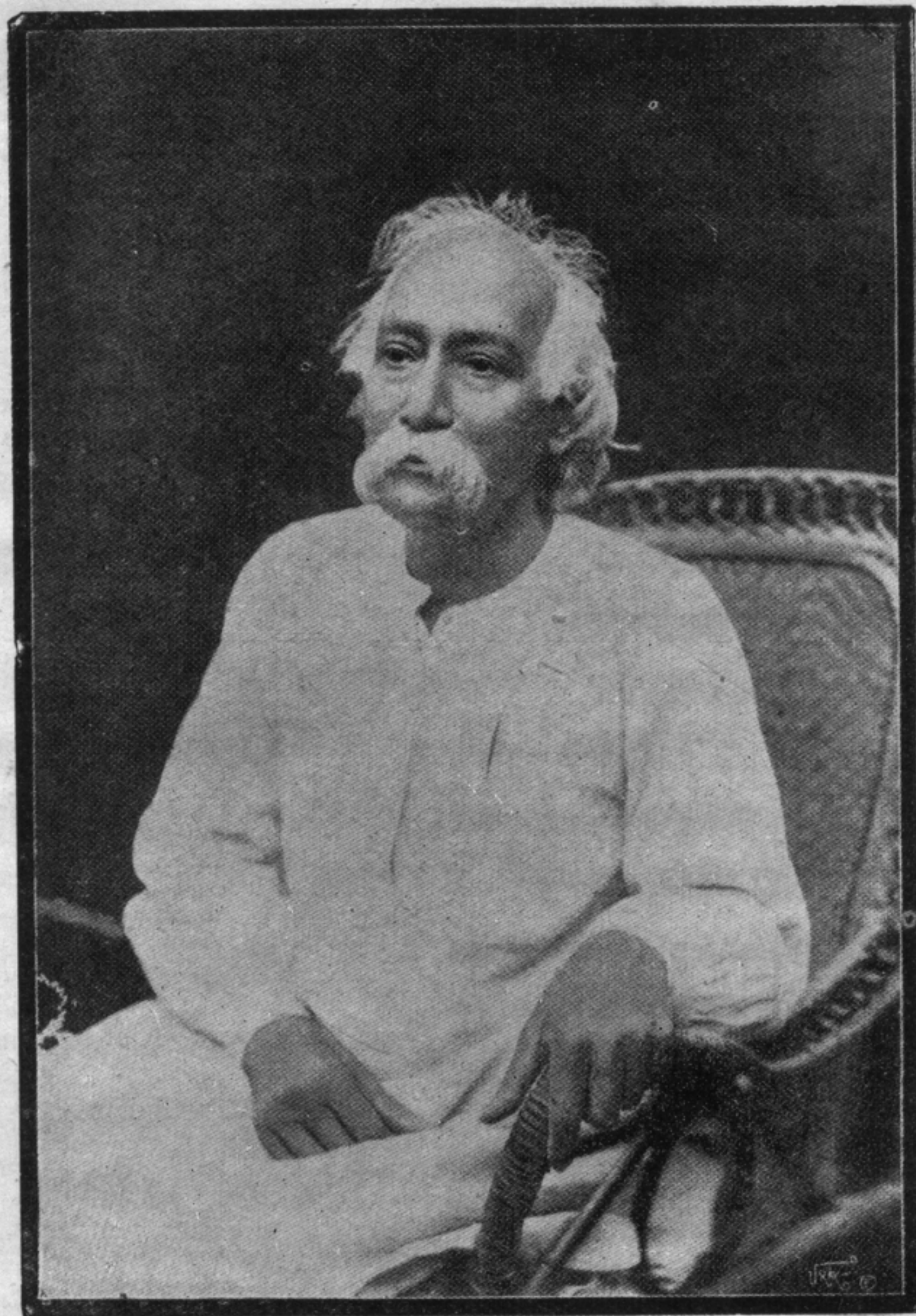
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সি আই ই

জন্ম—২রা নভেম্বর, ১৮৩১ মৃত্যু—২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪

অগ্রণী ছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে যে আর্থিক ক্ষতি ও নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এইরূপ অবস্থা-বিপর্যয়েও মহেন্দ্রলাল যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা হইতে স্খলিত হন নাই। তাঁহার মনস্বিতা ও সত্যানুরাগের ইহা বড় কম পরিচয় নয়। হোমিওপ্যাথি প্রচারের জন্য তিনি ১৮৬৮ সালে "Calcutta Journal of Medicine" নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন; ইহা আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করে।

জীবনে তিনি অসংখ্য কার্য করিয়া গিয়াছেন, যাহার একটি মাত্র কার্যের অনুষ্ঠান করিলে বহুলোকের জীবন ধন্য হইয়া যায়। নূতন আলোক, নূতন আকাঙ্ক্ষা দিয়া ভারতে যাঁহারা নবজাগরণ আনয়ন করিয়াছেন, মহেন্দ্রলাল তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বৈজ্ঞানিক হইলেও পরম পিতা পরমেশ্বরে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার ঐকান্তিক ধারণা ছিল যে, ঐশীশক্তি প্রভাবে জীবের জীবন সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

তিনি ছাত্রদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি আজীবন ছাত্রদের কল্যাণ কামনায় পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "A" course and "B" courseএর সৃষ্টি হয়। দরিদ্রাবস্থাপন্ন ছাত্রগণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি আপন পাঠাবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন।

তাঁহার সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন :—

"আসিয়া ভারত মাঝে দীনবেশে হে সত্য সহায়,
উঠেছিল উন্নতির অতি উচ্চ চরম সীমায়।
জ্ঞান-শৈলে চন্দ্র সম নীরবেতে উত্থান তোমার,
তবুও জলধিপারে বিকীর্ণ ও কিরণ অপার।"

আমরা যখন জেনারেল অ্যাসেমব্লিস্ ইন্‌স্টিটিউসনে পড়ি তখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত Indian Association for the Cultivation of Science মন্দিরে, তাঁহার ও Rev. Father Lafontএর বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম; সে বহু কালের কথা, বোধ হয় ১৮৮৭ কি ১৮৮৮ সালের কথা, তখন স্কটিশচার্চ কলেজের সৃষ্টি হয় নাই।

তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ছিল। মানুষের দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। কুষ্ঠ রোগীদের দুর্দশা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত ব্যথিত হইয়াছিল, তাই তিনি বৈদ্যনাথ—দেওঘরে পঞ্চ সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়ে তাঁহার পতিপ্রাণা স্ত্রীর নামে "রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম" স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাঁখারিটোলার গৃহে বহু রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইত। তিনি বিনা দর্শনীতে বহু লোককে দেখিতে যাইতেন। আমাদের বাড়ীতে তিনি কখনও দর্শনী গ্রহণ করেন নাই।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক পুস্তকে ডাক্তার সরকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"আর একজন বঙ্গ সমাজের রত্ন স্বরূপ ব্যক্তির সদাশয়তা এখানে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে (১৮৭৯ সালে যখন লাহিড়ী মহাশয় শোকে ভগ্ন ও রোগে জীর্ণ পরিবার-পরিজনকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় বাস করিতে উপস্থিত হইলেন) বঙ্গবাসীর সুপরিচিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় সময় নাই, অসময় নাই, এই পরিবারের বিশেষতঃ লাহিড়ী মহাশয়ের কোনও অসুখের কথা শুনিবামাত্র নিজ শরীরের সুস্থতা অসুস্থতা গণনা না করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত এই অকৃত্রিম প্রীতি ও সদ্ভাবের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।"

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এম্ ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পূর্বে কেবলমাত্র ডাঃ চন্দ্রকুমার দে মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই গৌরবময় উপাধি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এম্ ডি পরীক্ষায় মহেন্দ্রলাল প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺জগবন্ধু বসু মহাশয় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

প্রথমে ডাঃ সরকার এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সুফল দেখিয়া এবং ইহার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি মত গ্রহণ করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক নির্যাতন ও

আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী কর্মবীর মহেন্দ্রলাল এ সমস্ত সহ্য করিয়া নিজের নির্বাচিত পথে অচল, অটলভাবে চলিতে লাগিলেন। হোমিওপ্যাথির উন্নতিকল্পে তিনি কি কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা সর্বজনবিদিত; সত্যের জন্য এমন ত্যাগ ও নিষ্ঠা খুব কমই দেখা যায়।

স্বাবলম্বন এই মহাপুরুষের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি ছিলেন চিরদিন ছাত্র। তিনি শুধু বিজ্ঞানের কিম্বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। তাঁহার শাঁখারিটোলার বাস ভবনে নানাবিষয়ক বিবিধ গ্রন্থে পূর্ণ বিস্তৃত পুস্তকাগার ছিল।

তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল। প্রখর বুদ্ধি, উন্নত চরিত্র ও গভীর জ্ঞানের সমাবেশে তাঁহার জীবন অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার আর্তের প্রতি সেবাপরায়ণ চিত্ত, তাঁহার ছাত্রদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, তাঁহার সত্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তাঁহার নির্ভীক সরলতা ও তেজস্বিতা, তাঁহার অদম্য জ্ঞান-স্পৃহা আমাদিগকে বিমুগ্ধ করে।

"Hindoo Patriot" পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে একস্থানে লিখিত হইয়াছে—

"His public services were varied and immense and there was hardly a path of public usefulness in which his marked personality did not loom large. Whether as a professional man, or as scientist, whether as a Municipal Commissoiner, or as a Sheriff, whether as a journalist or as an accomplished public speaker, whether as a Magistrate or as a Senator, his services to the country were immense, varied and long. Distinction in any single one of these varied walks would make one famous and he had the unique distinction of being distinguished in all."

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি এল্ উপাধি দ্বারা বিভূষিত করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি আই ই উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

ডাক্তার সরকারের ধর্মমত সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলেন। তিনি নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী বা অন্য কিছু ছিলেন না, পরন্তু পরম পিতা পরমেশ্বরে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং তিনি একজন ভগবদ্ভক্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক ধারণা ছিল যে, ঐশী শক্তি প্রভাবে জীবের জীবন সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং সেই জন্য জীবনের সর্বকার্যেই তিনি শ্রীভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেন। শেষ জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় গুণ গুণ রবে বিভু-গুণ গান করিতেন। বিজ্ঞানের বিচিত্র রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি তাঁহার অনুরাগ মন্দীভূত না হইয়া বরং দিন দিন প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল। আজকালকার ভগবদ্ভক্তি-বিহীন শিক্ষার দিনে ইহা ভাবিবার বিষয়। তাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে :—

"He could never subscribe to the idea that the study of science generated pride, led to materialism and destroyed religious feelings."

তিনি বিশ্বাস করিতেন :—

"False science or half knowledge alone puffs up ; true science tends rather to humble human pride by teaching man how little and imperfectly he knows and understands the works of the Creator."

ধর্মে তাঁহার প্রবল আন্তরিকতা ছিল—বাহ্য আড়ম্বর দেখাইতে তিনি জানিতেন না। শেষ জীবনে তিনি যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার ধর্ম-প্রাণতা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তাঁহার রচিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—ইহার নাম দিয়াছিলেন, Resignation, the true worship of God—

"যা মনে করি আমার, তা সকলি তোমার ;
কি দিয়ে তবে পূজিব তোমায়।
আত্মসমর্পণ করি, লওহে (নাথ) দয়া করি ;
তোমার ধন তুমি লও, কাজ নাই আমার তায়।
এই মাত্র ভিক্ষা করি, যেন দিবা-শর্বরী ;
রাখিতে পারি মনে সদাই তোমায়।
স্মৃতি পথে থাকলে তুমি, ভাব্‌না কি আর করি আমি ;
সকল ভাবনা ঘুচে যাবে,
মুক্তি পাব তব কৃপায় ॥

পঞ্চপুষ্প

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের রাস্তা নির্মাণ ফণ্ডে উদ্বৃত্ত টাকা

বিগত ১লা এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের রাস্তা নির্মাণ ফণ্ডে ৪৩.৩৩৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৯৩৭-৩৮ বৎসরেও ১.১৩ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টকে দিয়াছে। এই বৎসর মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১১.৫৫ লক্ষ টাকা। ফলে ৩২.৯৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত অবস্থায় বৎসর শেষ হইয়া গেল। বর্তমান বৎসরের খরচের তালিকায় ২৫.৮২ লক্ষ টাকার হিসাব দেখা যায় ; যদি এই সমস্ত টাকা রাস্তা নির্মাণে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে ৭.১০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে।

বর্তমান সংস্কারমালার প্রবর্তনের পূর্বে রাস্তা নির্মাণ ফণ্ড স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পূর্তবিভাগ—এই দ্বৈধপ্রভাবের অন্তর্বর্তী ছিল। ফলে পরিকল্পনায় বহুবিলম্ব হইত ; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণেও রাস্তার উন্নতিবিধানে বহু দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই।

বাংলার মত বদ্বীপপ্রধান প্রদেশে প্রথমত স্বাস্থ্য ও কৃষির জন্য জল-প্রণালী সরবরাহের সমস্যা সমাধান বিশেষ দরকার ; তৎপরে রাস্তার উন্নতি বিধান ও বৃহত্তর নদ-নদীর বক্ষে সেতু রচনার কথা কল্পনা করা যাইতে পারে। জমি অধিকার আইনের জটিলতায় জমি অধিকারে বিলম্ব হেতু রাস্তার উন্নতি বিধানে বিশেষ বিলম্ব ঘটে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক পরিকল্পনা সংযোগ-সাধন বোর্ডের অনুমোদনের পর ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতেও অনেক সময় অনর্থক নষ্ট হয়।

গভর্ণমেণ্ট একজন বিশিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক সমস্ত প্রদেশের রাস্তা নির্মাণ তালিকার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। বর্তমানে উহা গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে এবং মুদ্রিত হইতেছে।

অদূর ভবিষ্যতে জন সাধারণের জন্য যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে তাহার বৃহৎ আকার ও মানচিত্রসমূহ দেখিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, এই বিশিষ্ট কর্মচারী কি বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সমগ্র প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং ২৬টি জেলায় জেলাবোর্ড ও জেলার শাসনকর্তার সহিত পরামর্শ করিয়া প্রত্যেক রাস্তার পরিকল্পনা রিপোর্টের অঙ্গীভূত করিয়াছেন।

এ কথা সত্য নহে যে কার্যোপযোগী পরিকল্পনার অভাবে উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয় হয় নাই—পরন্তু গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনার অভাব নাই।

সমস্ত কার্যপ্রণালী স্থিরীকৃত হইলে শৃঙ্খলানুসারে সমস্ত পরিকল্পনার কার্যানুসরণের জন্যই অপেক্ষা করা হইয়াছে।

ইহাও সত্য যে, বিগত আর্থিক বৎসরে রাস্তা নির্মাণ গভর্ণমেণ্টের আশানুরূপ হয় নাই।

এই উদ্দেশ্যে এবং রাস্তা নির্মাণের দ্রুত উন্নতির জন্য সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ারের সমপদস্থ একজন বিশিষ্ট কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার কর্তব্য—রাস্তা নির্মাণ পরিকল্পনার আয়োজন ও দ্রুত সম্পাদন। পরিকল্পনাগুলিকে নিজেই বিশ্লেষণ করা এবং বিভাগীয় প্রণালীর জন্য অপেক্ষা না করা; যাহাতে শীঘ্র জমি অধিকৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করা, স্থানীয় কর্মচারীর কার্যে উপস্থিত বাধার অপসারণ এবং সেচ, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিভাগের সহিত পত্র ব্যবহার করা, যাহাদের সহিত ভবিষ্যতে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হওয়া সম্ভব—তাঁহার কার্য।

আশা করা যায় এইরূপ বিশেষ ব্যবস্থার ফলে রাস্তা নির্মাণে অধিকতর উন্নতি সাধিত হইবে।

বম্বে প্রদেশেও অনুরূপ অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল এবং বম্বে গভর্ণমেণ্টও অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্

হৃদযন্ত্রের স্পন্দন-রহিত মানব

ইংলণ্ডে এক ভদ্রলোক বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন—তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র বহুকাল যাবৎ স্পন্দন-রহিত হইয়াছে। ভদ্রলোক শাসন বিভাগের উচ্চ পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। আমাদের যে হৃৎস্পন্দন হয়, তাহার অর্থ কি? হৃদ্‌যন্ত্রের কবাট মুক্ত ও বন্ধ হইতেছে, হার্টের মধ্যে রক্তসঞ্চালন করিবার উদ্দেশ্যে। এই পাম্পিংএর ফলেই রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে। এ দিকে একটু বাধা ঘটিলে জীবন-সংশয়—এ ভদ্র লোকটির হৃদ্‌যন্ত্রের কবাট এত বড় হইয়া গিয়াছে যে, সে আর রক্ত পাম্প করিতে পারে না; এ ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের বাঁচিয়া থাকিবার কথা নয়—অথচ তিনি বাঁচিয়া আছেন এবং সর্ববিধ কার্য করিতেছেন।

হিন্দুরঞ্জিকা

জীবনীশক্তির দমকল

কর্ণেল লিণ্ডবার্গের আবিষ্কৃত "লিণ্ডবার্গস্ লাইফ্-পাম্প" বা জীবনী শক্তির দমকলকে সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক ডাঃ ক্যারেল মানবের জীবনীশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ডাঃ ক্যারেল ফিলাডেলফিয়ার দার্শনিক সমিতির বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কর্ণেল লিণ্ডবার্গের আবিষ্কার মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুনঃ স্থাপনের প্রথম সোপান।

তিনি বলেন এই উপায়ে যদি কোন লোকের মূত্রাধার বিকল হয়, তবে তাহার দেহে সবল মূত্রধার সংযোগ করা সম্ভব হইবে, অবশ্য মূত্রাধারকে যন্ত্রের মধ্যে সজীব রাখিতে হইবে।

হৃদয় যেমন রক্ত সরবরাহ করে; এই প্রণালীও অনুরূপভাবে অঙ্গের মধ্য দিয়া শোধিত দ্রবপদার্থ পরিচালনা করে।

ডাঃ ক্যারেল বলেন,—এই প্রণালীতে এক লক্ষ ঘণ্টা ধরিয়া ৯০০টি পরীক্ষা কার্য চালান হইয়াছে। যে সময়ের মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন সম্ভব, উহা সকলের পক্ষে সমান নহে—তবে দুই দিন ও তিন দিনের মধ্যে।

যন্ত্র যে কোন ধমনীর বেগ ও চাপ অনুসারে ইচ্ছামত কার্য করে। এই প্রণালীতে হৃদয়, ফুসফুস, থাইরয়েড ও মূত্রাধার সজীব রাখা সম্ভব হইয়াছে।

ওভার-সিস ডেলি মেল

ভারতে বারিহীন কৃষি

আমেরিকায় বারিহীন কৃষি হইয়া থাকে। ভারতের মধ্য প্রদেশে জলহীন কৃষির দ্বারা আলু উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছিল। যে সকল স্থানে জলসেচের বন্দোবস্ত নাই তথায় কৃষিকার্য করা অত্যন্ত কঠিন। সে সকল স্থানে জমি আর্দ্র রাখার কোন কৌশল অবলম্বন করিলে চাষ চলিতে পারে। আমেরিকার উটা প্রদেশের প্রথায় ভারতের কেন্দ্রীয় কৃষি-গবেষণা-পরিষদ্ ভারতের বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বারিহীন কৃষির গবেষণা চালাইতেছেন। ঐ সকল অঞ্চলে এই প্রণালীতে দ্বিগুণ ফসল হয়। 'কিন্তু তাহা শ্রমসাপেক্ষ! বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদে পরীক্ষা চলিতেছে। ১৯৩৬ সাল

হইতে পাঞ্জাবে এই পরীক্ষা হইতেছে। পাঁচ বৎসরে পরীক্ষা শেষ হইবে। বাংলা দেশেও বীরভূম প্রভৃতি জেলার কোন কোন স্থানে এইরূপ কৃষির পরীক্ষা প্রয়োজন। সকল বিষয়েই বাংলা পিছনে পড়িয়া যাইতেছে।

সঞ্জীবনী

৬০ জন ছাত্রের চাকুরী প্রাপ্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "চাকুরী ও সংবাদ বোর্ড" প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিগত এক বৎসরের মধ্যে বোর্ড ৬০ জন ছাত্রের চাকুরী করিয়া দিয়াছে। নিম্নলিখিত বিষয়ে ছাত্রগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে—পাট হইতে সুতা কাটা ও বোনা; পাটের গাঁইট করা; ক্রয় ও শ্রেণীবিভাগ করা; ইস্পাত ব্যবসা; কয়লার ব্যবসা; বীমা, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য; চামড়া পরিষ্কার করা; বিক্রেতার কার্য; রাসায়নিক গবেষণা; বায়ুবশ বিদ্যা; টেলিফোন নির্মাণ ও পরিচালনা; বৈদ্যুতিক ও তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিল্প-কৌশল।

৬২টি ইয়োরোপীয় এবং ২১টি ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে ব্যবসা, শিল্প ও বাণিজ্যের বিভিন্ন বিভাগে ব্যাবহারিক শিক্ষাদানে সম্মতি দিয়াছে, যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণের ব্যবসা সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হয়।

এই বোর্ড ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সংস্রবে আসিয়া প্রার্থিগণকে ব্যাবহারিক শিক্ষা অথবা চাকুরী দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে।

বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ ডি কে সান্যাল তাঁহার প্রথম বার্ষিক কার্য বিবরণীতে বলিয়াছেন যে, ১৯৩৭ সালের মে মাসে বোর্ডের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের শেষ উত্তর না পাওয়ায় বোর্ডের কার্য আরম্ভে বিলম্ব ঘটিয়াছে।

বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স, বেঙ্গল ন্যাসনাল চেম্বার অফ কমার্স, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ও মসলিম চেম্বার অফ কমার্সকেও সহযোগিতা করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে এবং তাঁহারাও পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ব্যবসা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে।

প্রাথমিক কার্যের অবসানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ও উপাধিবিহীন ছাত্রবৃন্দের নিকট হইতে আবেদন-পত্র আহ্বান করা হয়। ১২২৪ জন ছাত্র আবেদন করে; তন্মধ্যে ১৪৩ খানি দরখাস্ত মফস্বলবাসী ছাত্রের; ২০২ খানা আবেদনপত্র যে সমস্ত ছাত্রের বয়স ২৫এর উপর তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

৭৫৫ জন ছাত্র সেক্রেটারীর সহিত দেখা করে; তন্মধ্যে ৫১৮ জন ছাত্রের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। মফস্বলস্থ ছাত্রগণের সহিত দেখা-শোনা হয় নাই। তবে প্রত্যেক কলেজে পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হইয়াছে; এই কমিটি নাম তালিকাভুক্ত করণেচ্ছু ছাত্রগণের সহিত দেখা-শোনা করিয়া তাঁহাদের মন্তব্য সহ নাম তালিকাভুক্ত করিবার জন্য পাঠাইবেন। ২৫ বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক ২০২ খানা দরখাস্ত বিবেচিত হয় নাই; যেহেতু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান তরুণ যুবক পছন্দ করে। উহারা ১৮-২৩ বৎসরের বয়স্ক যুবককে লইতে চাহে—২৫ বৎসর শেষ সীমা।

যখন কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ করার দরকার হয়, তখন বোর্ড তালিকাভুক্ত কয়েকজন ছাত্রকে প্রাথমিক পরীক্ষা করিয়া তাহাদের নাম ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করে, এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানই শেষ নির্বাচন করিয়া থাকে।

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রগণ কিরূপ উন্নতি করিতেছে তাহারও সংবাদ লওয়া হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে; ইহাতে অনুমিত হয়, সুযোগ-সুবিধা পাইলে বাঙালী যুবকেরাও ব্যবসা বিভাগে কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারে। বাঙ্গালী যে ব্যবসা করিতে অক্ষম—এই উক্তি বর্তমানে অসত্য প্রমাণিত হইতেছে।

সেনেট যে সমস্ত ছাত্র বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কার্যকরী শিক্ষা লাভ করে তাহাদিগকে মাসিক ৩০ টাকা

বৃত্তি দেওয়ার-ব্যবস্থা করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরে মাত্র ৪ জন ছাত্রকে এই বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে।

বৃহৎ ইয়োরোপীয় পাট কলের পরিদর্শকের পদের জন্য ৪ জন প্রার্থী মনোনীত করিবার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। তবে ইহার একটি সর্ত ছিল যে, কার্যে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে ডাণ্ডি টেকনিক্যাল কলেজে প্রার্থীকে নিজ ব্যয়ে পাটের সুতা কাটা ও বোনা শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে ৯০ খানি দরখাস্তের মধ্যে তিন জন নির্বাচিত হইয়াছিল।

বৈদ্যুতিক ও ব্যাবহারিক এঞ্জিনিয়ারের চাহিদা সর্বাপেক্ষা বেশী। সুতরাং বোর্ড এই দিক্ হইতে আরও অধিক আবেদন-পত্র সাদরে অভিনন্দিত করিবে।

কলিকাতার কোন বিশিষ্ট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ৩০টি প্রবেশিকা উত্তীর্ণ ছাত্রকে অফিসাররূপে শিক্ষিত করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের বয়স ১৫—১৭এর মধ্যে হইবে। দুই বৎসর পরে তাহাদিগকে জুনিয়ার কেরাণীর কার্যে নিযুক্ত করা হইবে, তবে ইতিমধ্যে তাহাদিগকে ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া আই এ পাশ করিতে হইবে। কলেজের বেতন উক্ত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বহন করিবে। জুনিয়ার কেরাণী-রূপে কার্যকালে যদি কেহ বি কম্ পাশ করিতে পারে; তবে তাহার আরও উন্নতি হইবে। এইরূপে এই ৩০ জন যুবককে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্য এই যে, পরে তাহারা নিজেরাই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিবে। এই প্রস্তাব এখনও বিবেচনাধীন।

এতদ্ভিন্ন খালি চাকুরীর পূরণের জন্য একাউণ্টটেণ্ট জেনারেল, বেঙ্গল; ডিরেক্টার রেলওয়ে অডিট; সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া; মেয়ো কলেজ, আজমীর; কণ্ট্রোলার, ইষ্টার্ণ গ্রুপ অফ স্লীপার কন্ট্রোল; নোয়াখালি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড; ডিরেক্টার অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রার্থীর নাম সুপারিশ করিবার জন্য বলিয়াছেন।

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড

বাংলার লবণ-শিল্প

বাংলাদেশ তাহার একটি বিনষ্ট শিল্পের কথা বিস্মৃত থাকার পর বর্তমানে পুনরায় এই শিল্পের উদ্ধারের জন্য অগ্রণী হইয়াছে। বিগত ১৯৩১ সালে করাচী, এডেন প্রভৃতি স্থানের লবণের কারখানাগুলিকে বিদেশী লবণের প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণের জন্য বিদেশী লবণের উপর আমদানি শুল্কের উপরে প্রতি মণে আরও সাড়ে চারি আনা করিয়া অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক ধার্য হইবার সমসময়ে এবং উহার পরে বাংলাদেশে কয়েকটি লবণ-কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব কোম্পানীর মধ্যে পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকৃচারিং কোম্পানী, প্রিমিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকৃচারিং কোম্পানী, ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যানু-ফ্যাকৃচারার্স লিমিটেড, বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী, লোকমান্য সল্ট ওয়ার্কস, ন্যাসনাল সল্ট কোম্পানী প্রভৃতি অন্যতম। উহার মধ্যে পাইওনিয়ার, প্রিমিয়ার, বেঙ্গল ও ইণ্ডিয়ান সল্ট কোম্পানী ইতিমধ্যেই লবণ প্রস্তুতের উপযোগী স্থান ইজারা লইয়া তাহাতে কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, অন্যান্য কোম্পানীর মধ্যে কেহ কেহ জমি ইজারা লইয়াছেন—কিন্তু কারখানা-স্থাপন কার্যে অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। * *

বাংলায় বর্তমানে বাহির হইতে প্রতি বৎসর ১ কোটি ৭০ লক্ষ মণ লবণ আমদানি হয়। উপরোক্ত কোম্পানী-গুলির মারফতে এই লবণ যদি বাংলাদেশে প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর দেশের বহু কোটি টাকা দেশের মধ্যে রক্ষিত হইতে পারে এবং উক্ত শিল্পের মারফতে ২০।৩০ হাজার শিক্ষিত বেকার ব্যক্তির অন্ন সংস্থানের উপায় হইতে পারে। অধিকন্তু বলা হয় যদি লবণ শিল্প ভালরূপ গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের অধিবাসীদের মধ্যে লবণ চালান দিয়া বাংলাদেশের প্রতি বৎসরে আরও এক কোটি টাকা অর্থাগম হইতে পারে।

বর্তমানে এই প্রদেশে লবণ-শিল্পের প্রসারের জন্য গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে ধরণের সাহায্যের আশু প্রয়োজন, তাহার মধ্যে (১) বিনা খাজনায় খাসমহালের জমি ইজারা দান; (২) প্রাথমিক ব্যয় ও কারখানা স্থাপন ইত্যাদির জন্য অর্থ সাহায্য বা নামমাত্র সুদে ঋণ

দান (৩) সেচ বিভাগের বিধি-নিষেধ অপসারণ; (৪) সরকারী জঙ্গল হইতে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে কাঠ কাটিবার অধিকার দান, (৫) উৎপন্ন লবণ গুদামজাত করা ও হাটে বাজারে প্রেরণের ব্যবস্থা করা, (৬) প্রতি মণ লবণের উপর ৪।৫ আনা করিয়া অর্থ সাহায্য প্রদান।

আর্থিক জগৎ

বালকবালিকার রেলগাড়ী চালন শিক্ষা

রুশিয়ার বালকবালিকাদের জন্য ৩০টি রেল লাইন নির্মিত হইয়েছে, উহার প্রত্যেকটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। প্রত্যেক লাইনের একটি এঞ্জিন ও ৬টি গাড়ী আছে ও প্রত্যহ ৩৮ বার গাড়ী যাতায়াত করে। ৬০৮ জন বালকবালিকা এই রেল লাইনে এঞ্জিন চালক, কণ্ডাক্টর, ষ্টেশন মাষ্টার ইত্যাদির কার্য করে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এই সকলে উৎসাহ দিয়া থাকে। ইহাতে অল্প বয়স হইতে খেলার ছলে বালকগণ রেল লাইন পরিচালনা করিতে শিখে।

সঞ্জীবনী

ধান্য এবং চাউলের মূল্য-হ্রাস ও তাহার পরিণাম

সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাসনাল চেম্বার অফ কমার্স বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর নিকট ধান্য এবং চাউলের মূল্য-হ্রাস ও তাহার পরিণাম সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন; নিম্নে উহার সারমর্ম প্রদত্ত হইল।

ধান্য বঙ্গদেশের প্রধান ফসল, বাংলার মোট আবাদী জমির ২৩০ লক্ষ একরের মধ্যে ২১০½ লক্ষ একরে ধান জন্মে, উহা পাটের চাষের ১১ গুণ বেশী। বাংলার সর্বত্র ধান্য উৎপন্ন হয়; এমন অনেক জেলা বর্তমান, যেখানে ধান্য ব্যতীত অন্য কিছু উৎপন্ন হয় না। অধিকাংশ কৃষক ধান্য উৎপন্ন করিয়া থাকে; অনেক জেলায় প্রয়োজনের অধিক ধান্য উৎপাদিত হয়; সেইহেতু ধান্য কেবলমাত্র খাদ্য-শস্য নহে; পরন্তু উহা বাংলার বেশ একটা মোটা অংশের অর্থোপার্জনের উপায়। প্রায় এক লক্ষ টন উৎকৃষ্ট চাউল এই প্রদেশ হইতে রপ্তানি হয়। অধিকন্তু চাউলের ব্যবসা বিভিন্ন জেলা ও প্রদেশকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। কৃষকেরা ধান্য বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে, জমিদারের খাজনা দেয় ও মহাজনের ঋণ শোধ করে। এই উপায়ে ধান্য বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করে। প্রত্যক্ষভাবে ধান্য কৃষককুলের সুখ-সমৃদ্ধির উপায় হইলেও, পক্ষান্তরে উহা সমাজের অন্যান্য স্তরের লোকেরও সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে।

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ধান্য ও চাউলের বাজার মন্দা পড়িয়াছে। নিম্নে প্রদত্ত 'শীতা' চাউলের মূল্য হইতে উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে,—এই চাউল ১৯৩৬ সালে ৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইত; ১৯৩৭ সালে উহা ৪৲ টাকায় নামে ও বিগত মাঘ মাসে উহার মণ ৩।৵০ ছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালের শেষ তিন মাস উৎকৃষ্ট ধান্য ১॥৵০—১৸৵০ মণ দরে বিক্রয় হইয়াছে; পক্ষান্তরে ১৯৩২-৩৩ সালে উহার মূল্য ২৲—২।০ ছিল। ইহাতে দেখা যায় কৃষক মাত্র ১।০-১॥০ মাত্র ধান্যের মণে দর পাইয়াছে। উহাতে ধান্যের উৎপাদন-ব্যয়ও সঙ্কুলান হয় না—কৃষকের শ্রমের মূল্য না হয় নাই ধরিলাম। ধান্য-ফসলের আনুমানিক উৎপাদনের ভবিষ্য ফল হইতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। প্রতি একরে ১৩৭৪ পাউণ্ড বা প্রতি বিঘায় ৫¾ মণ ধান্য জন্মিতে পারে, সুতরাং ইহা সহজেই অনুমিত হইতে হইতে পারে যে, কৃষকেরা প্রতিবিঘায় ৭॥০ টাকার ধান ও ১॥০ খড়ে পাইবে, এই অবস্থা দ্বারা অতি সহজে দেখা যাইবে যে, এই ৯৲ টাকা দ্বারা কৃষকের বিঘা প্রতি যে ১০৲ টাকা খরচ পড়িয়াছে, তাহাই উঠিবে না! সুতরাং এই অবস্থার প্রতিকারের দরকার, নতুবা কৃষককুল ধ্বংসের পথে উপনীত হইবে।

কৃষিকার্যে উন্নত প্রণালীর প্রবর্তন দ্বারা কৃষকগণের একই খরচে বেশী ফসল পাওয়ার ব্যবস্থা করার কথা অনেকে বলেন, কিন্তু যতক্ষণ গভর্ণমেণ্ট শস্যের করবৃদ্ধির ব্যবস্থা না করেন, ততক্ষণ উহা ফলপ্রসূ হইতে পারে না।

বাংলায় বার্ষিক ১০০ লক্ষ টন ধানের দরকার; ইহা উৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষা বেশী; কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ সালে উৎপন্ন দ্রব্য প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী ছিল। ইহাও মনে করিতে

হইবে যে, গার্হস্থ্য কার্যে ব্যয়িত ধান্য বাংলা দেশে উৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষা অনেক বেশী; উৎপন্ন দ্রব্যে বার্ষিক আমদানির পরিমাণ, প্রায় ৬ লক্ষ টন যোগ করিলেই ব্যয়ের পরিমাণ পাওয়া যায়। এই সমগ্র সংখ্যা হইতে যে এক লক্ষ টন চাউল বিদেশে চালান যায়, তাহা বাদ দিতে হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে ২½ লক্ষ টন চাউল চালান যায়, তাহাও বাদ দিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—

আনুমানিক গড়পড়তা উৎপাদন	৮৮ লক্ষ টন
,, আমদানি	৬ ,, ,,
	৯৪ ,, ,,
বিদেশে চালান	১ ,, ,,
	৯৩ লক্ষ টন
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চালান	২½ ,, ,,
মোট সরবরাহ	৯০½ লক্ষ টন

সুতরাং দেখা যাইতেছে উৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষা খরচ অনেক বেশী; অথচ উহার যে মূল্য বৃদ্ধি কেন হয় না তাহা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হইল না। ইহা অনুমিত হয় যে, ধান্য বা চাউলের আমদানি ব্যবসায় কিছু গলদ রহিয়াছে; যাহাতে চাহিদা বেশী হওয়া সত্ত্বেও মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে না। নিম্নে উহার কারণ বিবৃত হইল :—

(১) কৃষকের অক্ষমতা

কৃষক চাহিদা ও আমদানির পার্থক্য নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রেতার দয়ার পাত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

(২) মজুত রাখায় অক্ষমতা

কৃষক অভাবগ্রস্ত বলিয়া সুবিধা দরেব জন্য অপেক্ষা করিয়া চাউল ঘরে মজুত করিতে পারে না; ফলে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

(৩) পাটের অত্যধিক মূল্য-হ্রাস

কোন কোন জেলায় পাটের অত্যধিক মূল্য-হ্রাস কৃষকদিগের মাল মজুত রাখিবার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে; ফলে তাহারা ধান্য বিক্রয়ে বাধ্য হয়।

উপরিলিখিত কারণগুলি মফস্বল সহরে বণিক্‌গণের বা আড়তদারদের নিকট যখন মাল পৌঁছে তখনও বর্তমান থাকে; কারণ উহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে জানে না, পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া মরে।

(৪) রপ্তানি বাজারের সঙ্কোচন

বঙ্গীয় চাউলের পক্ষে রপ্তানিবাজারের ব্যাপক সুবিধা রহিত হওয়ায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধির যে উত্তেজক কারণ, তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৫) ব্রহ্মদেশীয় চাউলের আমদানি

ব্রহ্মদেশীয় চাউলের আমদানি বাংলায় চাউলের মূল্য হ্রাসের অন্যতম কারণ; যখন কলিকাতা বাজারে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে, তখন হঠাৎ সস্তা দামের ব্রহ্মদেশীর চাউলের আমদানিতে ব্যবসায়ীরা দেশীয় চাউলের মূল্য হ্রাসে বাধ্য হয়। বিগত বর্ষে ৯৮ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও কলিকাতার বাজারে সারা-বৎসরব্যাপী পাটনাই ধান ২৲—২।০ মণ দরে বিক্রীত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বনে উপরিলিখিত দোষসমূহ দূরীভূত করা সম্ভবপর।

(ক) জেলায় জেলায় চাউলের উৎপাদন ও ক্রয়ের তালিকা প্রস্তুত করণ

(খ) বিভিন্ন জেলায় ধান্য-কেন্দ্রে মঞ্জুরীপ্রাপ্ত গুদাম স্থাপন

(গ) পাটের মূল্য বৃদ্ধি

(ঘ) ধানের কেন্দ্র হইতে রপ্তানি বন্দর পর্যন্ত রেল পথের ভাড়া হ্রাস

(ঙ) অটোয়া চুক্তি অনুসারে চাউল রপ্তানির জন্য সুবিধাজনক সর্তলাভ

(চ) চাউলের উপর ধার্য রপ্তানি-শুল্ক হ্রাস

(ছ) নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত ব্রহ্মদেশীয় চাউল আমদানি রহিত করা

কিন্তু ইণ্ডো-বর্মা ট্রেড রেগুলেশন অর্ডার অনুযায়ী উহা করা অসম্ভব হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা করা যাইতে পারে। যদি ব্রহ্মদেশকে ভারতে চাউল

রপ্তানির পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিবার জন্য প্ররোচিত করা সম্ভব হয়, তবে ইহা অনায়াসে সংসাধিত হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় ভারতের চাউলের বাজারে অবিলম্বে পরিবর্তন দেখা দিবে, অথচ ব্রহ্মদেশের কোন ক্ষতি হইবে না।

বর্তমান ব্যবসার ভারকেন্দ্র ব্রহ্মদেশের দিকে ঝুঁকিয়াছে; যেহেতু, ব্রহ্মদেশ ভারতের নিকট হইতে বহু সুবিধা লাভ করিতেছে, পক্ষান্তরে ভারত তেমন কিছু পাইতেছে না। কারণ ব্রহ্মদেশের ভারতে রপ্তানি, ভারতের ব্রহ্মদেশে রপ্তানির তিনগুণ। ব্রহ্মদেশ ভারতে চাউল, সেগুন কাষ্ঠ ও তৈল চালান দেয়; পক্ষান্তরে ভারত মাত্র চটের থলে ও কয়লা ব্রহ্মদেশে রপ্তানি করে।

গভর্ণমেণ্ট যদি ধান্যের দর নির্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলেও এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

নিম্নে বাংলার বার্ষিক চাউলের চাহিদার পরিমাণ দেওয়া গেল :—

১৯৩১ সালের আদমসুমারির অনুসারে বাংলার লোকসংখ্যা ৫১,০৮৭,৩৩৯

১৫ বৎসর বয়স্ক পর্যন্ত লোক বাদে মোট লোকসংখ্যা ১,৯৮৫,৫৯৭

৫ বৎসর বয়স্ক বালক ৭,৯৪২,৫৫৬ = ১,৯৯৫,৬৩৯

(ইহাতে ২½ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকারা ভাত খায় না এইরূপ ধরা হইয়াছে, তদূর্ধ্ব সকলকে অর্ধেক আহার-কারী ধরা হইয়াছে)

৫—১৫ বৎসর বয়স্ক বালক ১২,৮৭৮,১৮৫ = ৯,৬৫৮,৬৩৯

(ইহাতে ৫—১৫ বৎসর বয়স্ক বালকেরা ¾ অংশ ভাত খায় ধরা হইয়াছে)

১৫ বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক বিধবা ৪,২৫৩,০৪৫ = ২,১২৬,৫২২

(ইহাতে বিধবারা একবেলা ভাত খায় ধরা হইয়াছে)

যে সকল লোক এক বেলা ভাত খায় ৩,১২৩,৮৬৩ = ১,৫৬১,৪৩১

(ইহাতে প্রতি দুইজনে একজন ধরা হইয়াছে)

যাহারা ভাত খায় তাহাদের মোট সংখ্যা ৩৮,২২২,৯২২

প্রতিজনের বার্ষিক ৭ মণ হিসাবে মোট চাউলের খরচ ২,৬৯৬ লক্ষ মণ

(এই হিসাব জেলের নিয়মানুসারে লিখিত)

প্রতি একরে ২৫ পাউণ্ড হিসাবে ২১½ লক্ষ একরের জন্য বীজ ধান ২,৪০ লক্ষ টন

মোট চাহিদা ১০০,৭০ লক্ষ টন

১৯৩১-৩৮ সালে ৩% লোক বৃদ্ধি ধরায় আরও বেশী চাহিদা ২,৯৫ লক্ষ টন

সর্বমোট চাহিদা ১০৪ লক্ষ টন

বাংলা-মায়ের রূপ

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জয়ন্তীর পথে

এইবার আমার গন্তব্যস্থল হিমালয়ের পাদমূলস্থ জয়ন্তী ও দলসিংপাড়া। যে গাড়ী কাটিহার হইতে ছাড়িল উহার নাম দলসিংপাড়া প্যাসেঞ্জার। গাড়ীতে বেশ জায়গা পাইলাম। সুতরাং শয়নের তেমন বিঘ্ন হইল না; বিশেষ গাড়ীর প্রথম যাত্রাস্থল হইতে আমার যাত্রা আরম্ভ হওয়ায় বেশ ভাল জায়গা পাইয়াছিলাম!

১০টা ২৫ মিনিটে গাড়ী কাটিহার ত্যাগ করিয়া অন্ধকারের অন্তহারা বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যে পথ

দিবাভাগে অতিক্রম করিয়াছিলাম প্রভাতসূর্যের লোহিত রাগের সমবায়ে; আবার সেই পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলাম নিশীথ রাত্রির গভীর তিমিরের অভ্যন্তরে। জগতের বুকে এই খেলা চলিতেছে অবিরাম অবিশ্রাম—মনে পড়িল—

"অসীম সেই নীরবতায়
উঠিয়া গীতি নিভিয়া যায়,
বিশ্ব জুড়ি' এই কি খেলা
চলেছে নিরবধি।"

সুখ-দুঃখের চক্রনেমির আবর্তনে ঘূর্ণ্যমান মানব-জীবনে—কখনো আলো, কখনো আঁধার, কখনো হাসি, কখনো কান্না!

দূরে দূরে গৃহস্থের কুটির হইতে ক্ষীণ আলোকরেখা নয়ন-পথবর্তী হইয়া আবার অন্ধকারে মিলাইয়া যায়। রেল ষ্টেশনের আলোকমালাও জীবনের দুঃখবহুল যবনিকায় সুখের রেখাপাতের মত ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে অন্তহারা নৈশতিমিরের অতল-তলে! মনে পড়িল দীর্ঘ-কাল পূর্বে কোন কবির উক্তি পড়িয়াছিলাম—

"আলোক বিশ্বের ঋণ; ঋণমুক্তি অন্ধকার।"

তখন এই উক্তির সার্থকতা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আজ নবীন আলোকপাতে এই কথা কয়টির অর্থ মানস-মুকুরে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিল। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের পূর্বে ছিল না আলো; কি ছিল—ছিল অন্ধকার! আবার মহাপ্রলয়ের অবসানে আলোক নিভিয়া যাইবে; লুপ্ত হইবে চন্দ্রতারা; লুপ্ত হইবে সৌদামিনীর ক্ষণপ্রভা; লুপ্ত হইবে অগ্নির লেলিহান শিখা; আবার সেই অন্তহারা অন্ধকারের বন্যা বিশ্বের উপর দিয়া ঢেউ খেলিয়া যাইবে—তখন—তখন যদি আবার আলোকের আবির্ভাব হয়; তবে উহা অস্বাভাবিক; বিশ্বের খাতায় ঋণের অঙ্ক; চিরন্তন অন্ধকারের রাজ্যে আলোকের বিকাশ যে কয়-বৎসর, যুগ বা মন্বন্তরের জন্য প্রয়োজন, তাহাকে ঋণ নামে অভিহিত করা কবির পক্ষে খুবই সমীচীন হইয়াছে; আবার যেদিন ভাঙ্গিয়া যাইবে ভবের খেলা দিবসের অবসানে, মুক্তিপত্র দেখা দিবে অন্ধকারের শাশ্বতী বাণীর আকারে; তখন মুছিয়া যাইবে ঋণযোগ; বাঁধনহারা বিশ্বে আবার অন্ধকারের রূপ চিরসত্যের আকারে উঁকি মারিবে।

চিন্তাপ্রবাহের অভ্যন্তরে নিমগ্ন মন কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল জানি না, সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি দার্শনিকের শরীর ও মনের সমান্তরালতত্ত্ব সত্য প্রতিপন্ন করিয়া শরীরও নিদ্রার কোলে এলাইয়া পড়িল!

রাত্রি ২টা ৫৬ মিনিটে গাড়ী পার্বতীপুর পৌছিল। জাগিয়া দেখি আমার অদূরবর্তী বেঞ্চে একটি বাঙালী ভদ্রলোক বসিয়াছেন, সঙ্গে একটি বৃদ্ধা ও একটি বালক। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায় যাইবেন। উত্তরে তিনি বলিলেন যে, তিনি কুচবিহার রাজষ্টেটে চাকুরী করেন, বাড়ী খুলনা জেলায় কোন গ্রামে। মা ও ভাইকে লইয়া কর্মস্থলে চলিয়াছেন; দিনহাটা ষ্টেশনে নামিবেন।

পার্বতীপুরে চা পান করিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম, কখন গাড়ী ছাড়িল জানি না। সকাল ৬-২৭ মিনিটে গাড়ী লালমণির হাট জংশনে থামিল। গাড়ী হইতে নামিয়া হাত-মুখ ধুইয়া চা ও জলযোগের পালা শেষ করিলাম। বেশ গরম গরম নিমকী ও সিঙ্গারা মিলিল—তৃপ্তিপূর্বক আহার শেষ করিলাম।

লালমণির হাট জংশন হইতে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে আরম্ভ হইয়াছে। এই রেলপথে বহু চা বাগান আছে। সেখানে বহু মাড়োয়ারী দোকান পাতিয়া বসিয়া আছে; উহারা জিনিষপত্র বিক্রয় করে, টাকাও ধার দেয়। বহু ফেরিওয়ালা বিবিধ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জন করে। বাঙালী এই দিকেও একবার চেষ্টা করিলে অনেক বেকারের অন্নচিন্তা দূর হইবে, আশা করা যায়।

৭-৬ মিনিটে গাড়ী লালমণির হাট জংশন ত্যাগ করিল। জীবনে বহুবার এই লালমণির হাট জংশনে আসিয়াছি, বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন মানসিক অবস্থার সমবায়ে। প্রথমবার তেজপুর যাইবার পথে এই লালমণির হাট জংশনে পাদুকা-চোর আমার পাদুকা চুরি করিয়াছিল

কি ভুলক্রমে লইয়া গিয়াছিল, তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। ভবিষ্যতেও তাহা কোন দিন প্রকাশিত হইবে কি না জানি না।

মনে পড়িল—দীর্ঘকাল পূর্বে এই লালমণির হাট জংশন ষ্টেশনে রাত্রে আসাম মেল হইতে নামিয়া ওয়েটিং রুমে ঘুমাইয়া পড়িছিলাম। আজ যেমন একাকী, সেদিন ঠিক তেমন ছিলাম না। সঙ্গে ছিল একজন, যাহার মধুর স্মৃতি আজও দুঃখদৈন্যভরা আশা-নৈরাশ্যের প্রবল সংঘাতে বিধ্বস্ত জীবনের প্রান্তে ধ্রুবতারার মত সমুজ্জ্বল; পরলোকের অজ্ঞাত রাজ্য হইতেও যাহা শান্তির বার্তা বহন করিয়া আনে ধরিত্রীর উষর মরুবুকে; তাপদগ্ধ বক্ষের ভীষণ জ্বালা চন্দন-প্রলেপে শীতল করিয়া দেয় স্নেহ-মমতার অশরীরী ধারায়। প্রভাতের শান্তস্নিগ্ধ আলোকে তাহার স্মৃতি নবীন হইয়া দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—

সে যে আছে—আছে—আছে—
তৃণাঙ্কুরে শ্যামল পত্রে ছায়া তাহার নাচে।
সুদূর হ'তে তাহার বাণী কাণে আমার লাগে;
দিন-দুনিয়ার সাগরপারে নিত্য সে যে জাগে!
আছে প্রাণে আশা,
জীবন-শেষে শুনব আবার তাহার মধুর ভাষা;
দেখ্‌ব তাকে নবীন রূপে মন্দাকিনীর তটে,—
থাকবে না'ক কালের সীমা বিশাল বিশ্বপটে।
ঘুচে যাবে দিবস-রাত্রি—সকল ব্যবধান—
ভগ্ন বীণা বাজবে আবার হয়ে একটি প্রাণ!

যাক, সে অতীতের কথা অতীতের বক্ষে। এস আজ বর্তমান নবীনতার মোহ লইয়া। কিন্তু পারিবে কি তুমি ভুলাইতে সেই অমূল্য অতীতের দুঃখ-সুখের স্মৃতি—যাহার তীরে তীরে কত কল্পকল্পান্তর ধরিয়া চলিয়াছে আমার আনাগোনা;—দিগন্তবিসারী প্রান্তরের বুকে রবি-কর লেখায় যাহার বাণী, সমীরণের বনবনান্তে ছুটাছুটির মধ্যে যাহার গতি, অন্তহারা নীল বারিধির বিশাল বক্ষে শুভ্রফেনপুঞ্জে যাহার উৎসব!

গাড়ী কুচবিহার লাইনে যাইবে। তবে মোগলহাট ও গিতালদহ জংশন আসাম লাইনে যাইতে পথে পড়ে। গিতালদহ জংশন হইতে প্রকৃত কুচবিহার লাইন আরম্ভ হইয়াছে। তবে সুবিধার জন্য অনেক সময় যাত্রীগাড়ী লালমণির হাট জংশন হইতে ছাড়ে।

ইতিপূর্বে আমি কুচবিহার লাইনে কখনো যাই নাই। ইহাই আমার প্রথম যাত্রা। এই পথের বিশেষত্ব প্রথমে কিছুই দেখিলাম না, যেমন গ্রাম, প্রান্তর, জলাভূমি অন্যত্র দেখি—এই লাইনেও প্রথমে সেই সব চোখে পড়িল। সঙ্গের ভদ্রলোক দীনহাটা ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন। আরও কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ৮—৪৯ মিনিটে কুচবিহার ষ্টেশনে পৌছিলাম। চা ও পুরি কচুরি-দ্বারা আবার জলযোগ করিলাম।

কুচবিহার সহর কুচবিহার নামক মিত্র রাজ্যের রাজধানী। বাংলার এই মিত্র রাজ্যের রাজধানী দেখিবার সুযোগ ইতিপূর্বে আমার হয় নাই। এইবারও গাড়ী হইতে নামিয়া সহর দেখিতে পারি নাই। তবে গাড়ীতে বসিয়াই রাজপ্রসাদের গম্বুজ নয়নগোচর হইয়াছিল। বহুলোক এইস্থানে নামিয়া গেল।

বেলা ৯-৬ মিনিটে গাড়ী কুচবিহার ষ্টেশন ত্যাগ করিল। এই দিকে পল্লীর তেমন ঐশ্বর্যসমৃদ্ধি চোখে পড়িল না—মনে হইল সকলেই যেন দরিদ্র। এইদিকের ভাষাও একটু কলিকাতায় কথিত বাংলা ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। পরে পাহাড়পুরের পথে এই পার্থক্য বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম।

জলপাইগুড়ির সাবডিভিসন আলিপুরদুয়ার অতিক্রম করিয়া বেলা ১০-২১ মিনিটে 'রাজাভাতখাওয়া' নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে এই গাড়ী ছাড়িয়া আমি জয়ন্তীগামী গাড়ীতে উঠিলাম। ষ্টেশনের অদূরে অবস্থিত কলে স্নান কার্য শেষ করা গেল। ষ্টেশনেই দুই একটি দোকান আছে, তাহাতে রুটি, বিস্কুট, চা, পুরি, তরকারী ও সামান্য মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। এখানেও কিঞ্চিৎ চা ও পুরী তরকারী ভোজন করিয়া লইলাম, কি জানি পরে জয়ন্তীর পাহাড়ী অঞ্চলে যদি কোন খাদ্য না পাই।

"রাজাভাতখাওয়া" নামটির একটি ইতিহাস আছে। একবার নাকি কুচবিহারের একজন রাজা শিকারের সন্ধানে আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন, সঙ্গের লোকজন দূরে ছড়াইয়া পড়ে। মহারাজ একাকী এইস্থানে উপনীত হইয়া এক দরিদ্র কৃষকের কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ফলে রাজাকে কৃষকের প্রদত্ত ভাত খাইতে হয়। পরে যখন রাজার সঙ্গিদল আসিয়া পড়িল, তখন তিনি এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্থানটির নামকরণ করিয়াছেন—"রাজাভাতখাওয়া।"

অবশ্য এই ইতিহাসের মূল্য আমার মত পর্যটকের নিকট কিছুই নয়। তথাপি একজন রাজা যে দরিদ্র কৃষকের আতিথ্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন—এই ভাবধারাই আমাকে পুলকিত করিল।

"রাজাভাতখাওয়া"র অবস্থিতি-স্থান বড়ই মনোরম। রেলপথের দূরবর্তী পতাকা-চিহ্ন হইতে শ্যামল তরুরাজি ঘন জঙ্গলের আকারে দূর দিক্‌চক্রবালে মিশিয়া গিয়াছে। তাহার পটভূমিকায় হিমগিরির অভ্রভেদী শৃঙ্গরাজি লোকালোক পর্বতের অনুকরণে মেঘমালার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলিতেছে। তদূর্ধ্বে নীল আকাশ প্রভাতসূর্য-করে শোভমান।

১০-২১ মিনিটে গাড়ী 'রাজাভাতখাওয়া' ছাড়িয়া বনপথে যাত্রা সুরু করিল। এই জনমানবশূন্য নিবিড় বনের শ্যামশোভা মনকে মুগ্ধ করিল। কোথাও দীর্ঘকায় বনস্পতি ছায়াবহুল শাখা-বাহু বিস্তারে সূর্যকিরণ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান। কোথাও বন্য বল্লরীর ললিত কুণ্ডলে অপরূপ কুসুম-শোভা নিসর্গের বিজন গৃহে অজানা পথিকের আগমন-প্রতীক্ষায় উৎসুকচিত্তে অপেক্ষমাণ। বিশাল-পত্র রুটিফলের গাছ এই পথের সৌন্দর্য যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কত নাম-না-জানা পাখীর বিচিত্র কলকূজনে নীরব বনস্থলী মুখরিত।

গাড়ীর গতি খুব ধীর মন্থর। গাড়ী সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া উর্ধ্বে উঠিতেছে। ১১-১৯ মিনিটে বক্সারোড ষ্টেসন মিলিল। ক্ষুদ্র পার্বত্য পল্লীর বুকে একটি ক্ষুদ্র ষ্টেসন জীবলোকের বার্তা ঘোষণা করিতেছে ক্ষণিক কল-কোলাহলে। ধূমকেতুর আবির্ভাবে মানুষ আমরা যেমন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠি, রেলগাড়ীর আবির্ভাবে এই ক্ষুদ্র পার্বত্য ষ্টেসনের তরুলতাগুল্ম-পশুপক্ষীও যেন ভীতচকিত হইয়া উঠিল! দুই একটি যাত্রী উঠা-নামা করিল। তারপর গাড়ী আরও উর্ধ্বে চলিল।

অবশেষে বেলা ১১-৪৩ মিনিটে গাড়ী জয়ন্তী ষ্টেসনে থামিল। গাড়ী হইতে দেখিলাম নীল হিমালয়ের আকাশ-স্পর্শী চূড়া সূর্য্য কিরণে হাসিতেছে।

ক্রমশঃ

অল ইণ্ডিয়া অডিট এণ্ড একাউণ্ট অফিসেস কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট উপেন্দ্রনাথ সেন

বিগত গুড ফ্রাইডের ছুটিতে শিলং সহরে অল ইণ্ডিয়া অডিট এণ্ড একাউণ্ট অফিসেস কন্‌ফারেন্সের সপ্তদশ অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ মহাশয় এই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন সুপ্রসিদ্ধ সুবর্ণবণিক্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদি নিবাস হুগলী জেলার বালি গ্রামে। বহুকাল হইতে ইঁহারা কলিকাতার অধিবাসী। উপেন বাবুর প্রপিতামহ ৺চৈতন্যচরণ সেন। তাঁহার নামানুসারে বৌবাজারের চৈতন্যচরণ সেন লেনের নামকরণ হইয়াছে।

তাঁহার পিতামহ ৺গৌরমোহন সেন এবং পিতার নাম

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ

স্বর্গীয় কানাইলাল সেন। কানাই বাবু বাল্যাবধি সংসার বিরাগী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি কয়েকবার সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বনে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পরে ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া দারপরিগ্রহ করিলেও ধর্মাচরণেই ব্যস্ত থাকিতেন। অবশেষে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নীলমণি দে মহাশয়কে পোষ্যপুত্র দান করিয়া এবং উপেন বাবুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। স্বর্গীয় পিতার ধর্মপ্রবণতা উপেন বাবুর মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত।

রিপণ কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপেনবাবু ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল, বেঙ্গলের অফিসে চাকুরী প্রাপ্ত হন। তৎকালে উক্ত অফিসে বি এ উপাধিধারী কর্মচারীর সংখ্যা খুব কম ছিল; ফলে তাঁহাকে সাবর্ডিনেট একাউণ্ট সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে প্রমোশনের সুবিধা দান করা হয়। কিন্তু তিনি সামাজিক ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, সে পরীক্ষা কখনো প্রদান করেন নাই।

অফিসেও তিনি কর্মচারিবর্গের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি ও তাহাদের অভাব অভিযোগের দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারই আপ্রাণ চেষ্টার ফলে একাউণ্ট অফিস অ্যাসোসিয়েসন গঠিত হয়; পরে এই সমিতি ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। তিনি এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন এবং বর্তমানে সভাপতি পদে বিরাজমান। তিনিই একাউণ্ট অফিস স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা; এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান ট্রেজারি বিল্ডিং ইনষ্টিটিউট নামে বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে; ইহার তাঁবে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ও ড্রামাটিক ক্লাব বর্তমান। একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি এবং টিফিন ক্লাব গঠনেও তাঁহার কৃতিত্ব সুপরিস্ফুট।

তাঁহার বিশাল প্রতিভার অসামান্য কৃতিত্ব অল ইণ্ডিয়া অডিট এণ্ড একাউণ্ট অফিসেস কন্‌ফারেন্সের সংগঠন। ইহাও তাঁহার ব্যক্তিগত পরিকল্পনার ফল—অন্য কেহই এই বিষয়ে তাঁহাকে কোনরূপ প্রেরণা দান করে নাই। ১৯২২ সালে কলিকাতায় এই সমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৩ সালে দিল্লী অধিবেশনে তিনিই সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন প্রতি বৎসরই নিয়মিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। ৭ম অধিবেশনে ১৯৩১ সালে রেঙ্গুনে তিনি দ্বিতীয়বার সভাপতি পদে বৃত হন। ১৯৩৩ সালে কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত ১১দশ অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস এম্ এ, বি এল্, সি আই ই মহাশয় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে উপেন বাবুর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন—"বাহিরের কোন লোকের সাহায্যের দরকার আপনাদের নাই। আপনাদেরই মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা চরিত্র, কর্মদক্ষতা, আভিজাত্য ও আভ্যন্তরিক জ্ঞানের দ্বারা আপনাদিগকে সাফল্যময় পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ। কোন লোকের নাম উল্লেখ করা আমার পক্ষে অশোভন হইবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আপনারা আপনাদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেনের মত বিশ্বস্ত ও প্রকৃত বন্ধুকে পাইয়া গর্ব অনুভব করিবেন —ইহা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়। দুইবার বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাকে সভাপতি পদে বৃত করিয়া আপনারা আপনাদের বিশ্বস্ততা দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এবং তিনিও আপনাদের বিশ্বস্ততার উপযুক্ত বলিয়া নিজেকে সপ্রমাণ করিয়াছেন।"

বর্তমান অধিবেশনের সভাপতি পদে বৃত হইয়া উপেনবাবু তিনবার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। এই দুর্লভ সৌভাগ্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের অফিসের অন্য কোন কর্মচারীর ভাগ্যে ঘটে নাই। এমন কি অন্য কোন কর্মচারী দুইবারই সভাপতি নির্বাচিত হন নাই। উপেন বাবুর কর্মদক্ষতা ও সদ্‌গুণ-রাজির নিদর্শন ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে?

লাহোরে চতুর্থ অধিবেশনের অবসানে সিমলায় মাননীয় অর্থ সচিবের সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য-এক ডেপুটেশন প্রেরিত হইয়াছিল। এই ডেপুটেশনে

তিনজন সদস্য ছিলেন; তন্মধ্যে উপেন বাবুই ডেপুটেশনের দলপতি ছিলেন। সিমলায় ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির নিকট সাক্ষ্যদানের জন্য দুইজন প্রতিনিধি একাউণ্ট বিভাগ হইতে আহূত হইয়াছিল; এইবারও দিল্লীর অন্যতম প্রতিনিধির সহিত উপেন বাবুই ডেপুটেশন পরিচালনা করিয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি Accounts Comrade নামক পত্রিকার সম্পাদক। এই পত্রিকাও তাঁহারই উপদেশ এবং পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ করে।

অফিসে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। এমন কি অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপনের জন্য উর্ধ্বতন কর্মচারিগণের নিকটও তাঁহার গতি চির-অব্যাহত।

তিনি ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

স্বজাতির উন্নতির জন্য উপেন বাবুর আপ্রাণ চেষ্টা সর্বজনবিদিত। তিনি বর্তমান কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের সম্পাদক। পাঠ্যাবস্থা হইতেই তিনি সুবর্ণবণিক্ সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট; নিখিল বঙ্গ সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠায় তিনি একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের যে নিজস্ব বাটী নির্মিত হইতেছে, ইহাতেও উপেন বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণপাত চেষ্টা বিদ্যমান। বস্তুত তাঁহার মত উৎসাহী, কর্মদক্ষ, মিষ্টভাষী, পরোপকারী, সুবক্তা—একাধারে বহুগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

শিলংএর থানারোডস্থ অপেরা হলে এই অধিবেশনের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিবর্গ শুভাগমন করিয়াছিলেন। ১৬ই এপ্রিল শনিবার তিন ঘটিকার সময় কার্যকরী সমিতির অধিবেশন চাঁচল রাজবাটীর অতিথি-ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল ৩ ঘটিকায় প্রথম দিবসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ঐক্যতান বাদনের অবসানে বালিকাগণ বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতে সভার উদ্বোধন করে। অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। পরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে সভাপতি

মাল্যদানের সঙ্গে সভাপতির সম্মানার্থ নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হয়—

শুভ যজ্ঞের ঋত্বিক হে
মোরা কি গাহিব তোমার গান।
সহকর্মিগণ প্রাণমন্দিরে
কীর্তি তব স্পন্দমান্।
সপ্তদশ দীর্ঘ বরষ ব্যাপিয়া
যে দীপশিখা রেখেছ জ্বালিয়া
সে মহা আলোক-সম্পাত তব
দিব্য বিভায় দীপ্তিমান্।
সুদূর শৈল-শিখর ছাপিয়া
তোমারি শঙ্খ উঠুক বাজিয়া
পুষ্প-মালিকা এনেছি গাঁথিয়া
তোমারে করিতে দান॥

সঙ্গীতাবসানে সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় তাঁহার লিখিত সুচিন্তিত সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন।

অভিভাষণ পাঠের পর অধিবেশনে যোগদানে অসমর্থ ব্যক্তিগণের প্রেরিত পত্র ও টেলিগ্রাম পঠিত হইল।

সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে অনেকে বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে শিলং অফিসের ডেপুটি কণ্ট্রোলার ও অন্যান্য কর্মচারিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

মৃত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে শোক প্রকাশের অবসানে নিম্নলিখিত বিদায় সঙ্গীত গীত হইয়া প্রথম দিবসের অধিবেশন সমাপ্ত হয়:—

মঙ্গল-আশীষ পীযূষধারা
বহিয়া এনেছি আজি।
এনেছি দুয়ারে শত শত ভারে
মঙ্গলকুসুমরাজি।
মঙ্গল-জলধারা মঙ্গল-কলসে
পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে আজি হরষে
সমিতির—অতিথির—নায়কের সবাকার

অন্ধ-কারায় আজো যারা বন্ধ
ভুলে গেছে বিশ্বের রূপরসগন্ধ
তোমারি মধুর মোহন পরশে
জাগিয়া উঠুক আজি ॥

রাত্রি ৮ ঘটিকায় অতিথি-ভবনে বিষয় নির্বাচন সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল।

১৮ই এপ্রিল দেড় ঘটিকার সময় সভার কার্যারম্ভ হয়। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর চিঠি ও টেলিগ্রাম পঠিত হইল। অতঃপর বিবিধ প্রস্তাব গৃহীত হইল। সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে শিলংএর কণ্ট্রোলার শ্রীযুক্ত এস্ সি গুপ্ত স্বীয় বক্তৃতার অবসানে সমাগত অভ্যাগতবর্গকে ১৯শে এপ্রিল সান্ধ্য ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। অতঃপর নিম্নলিখিত বিদায় সঙ্গীতে কন্‌ফারেন্সের অবসান ঘোষিত হইল ঃ—

মঙ্গলময় ভগবান্,
মঙ্গল কর সার্থক কর
দীনজনগণ অনুষ্ঠান।
আশীষে তোমার হে দেব মহান্,
যাক্ দূরে যাক্ লাজভয়মান,
জ্বলুক্ অন্তরে শিখা অনির্বাণ
কর অমৃত-আলোক দান।
স্কন্ধে মোদের ভিখারীর ঝুলি
নাহিক মোদের কাঞ্চন-থালি
এনেছি শুধু এ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি
তোমারি বন্দনা-গান ॥

রাত্রে অভ্যর্থনা সমিতি চা ভোজে সমাগত প্রতিনিধি-বর্গকে আপ্যায়িত করেন। তৎসঙ্গে ঐক্যতান বাদন, সঙ্গীত, হাস্যরসপূর্ণ আবৃত্তি প্রভৃতি ও জলযোগ সকলকে তৃপ্তিদান করিয়াছিল।

১৯শে এপ্রিল প্রভাতে প্রতিনিধিবর্গের ফটো তোলা হইল। মধ্যাহ্নে সকলকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বারিপাতের স্থান চেরাপুঞ্জি লইয়া যাওয়া হইল।

সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত এস সি গুপ্তের বাংলোয় সমাগত প্রতিনিধিবর্গ ও অফিসের সমস্ত কর্মচারীকে সঙ্গীত, বিবিধ আমোদপ্রমোদ ও ভূরিভোজে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রত্যেক প্রতিনিধিকে শ্রীযুক্ত এস্ সি গুপ্তের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলে তিনিও সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

অতিথি-ভবনে পুনরায় প্রতিনিধিবর্গকে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত সঙ্গীত ও কীর্তন দ্বারা আনন্দ দান করা হয়।

পরদিন সকলে প্রকৃতির লীলা-নিকেতন স্বাস্থ্যান্বেষীর স্বর্গধাম শিলং ত্যাগ করিয়া কর্মক্ষেত্রের দিকে প্রস্থান করেন।

অভ্যর্থনা সমিতি প্রতিনিধিবর্গের সুখসুবিধাবিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। তজ্জন্য অভ্যর্থনা সমিতির উৎসাহী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদার্হ। তিনি স্বীয় গৃহে স্ত্রীর অসুস্থতা সত্ত্বেও সর্বদা অতিথি-ভবনে উপস্থিত থাকিয়া প্রতিনিধিবর্গের সুখ-সুবিধাবিধানে যত্নবান্ ছিলেন।

শ্রীসুধাকান্ত দে

বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তকমণ্ডলী

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

মধ্যযুগের মুদ্রাকরগণ

জোহান গুটেনবার্গ মুদ্রাযন্ত্রের জন্মদাতা হইলেও, তিনি অবজ্ঞাত ও অখ্যাত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং কালে লোক তাঁহার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যায়। কিন্তু তিনি দীর্ঘ জীবনব্যাপী যে সাধনা সহকারে মুদ্রাযন্ত্রের জন্ম দান করেন, তাহা বৃথা ব্যয়িত হয় নাই। অবিলম্বে মুদ্রাযন্ত্র মাইন্টজ্ হইতে নিকটবর্তী সহরসমূহে বিস্তৃতি লাভ করে। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রাসবুর্গে ৫ জন স্বতন্ত্র মুদ্রাকর মুদ্রণকার্যে ব্যপ্ত ছিল। ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে বামবার্গে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। গুটেনবার্গের মৃত্যুর পূর্ববৎসর অর্থাৎ ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে দুই জন জার্মাণ শিল্পী রোম নগরে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত করেন। প্রকৃত পক্ষে মুদ্রণশিল্প রাইন উপত্যকার সর্বত্র এবং ইতালির সমস্ত বৃহৎ সহরে ছড়াইয়া পড়ে।

এই প্রদেশে মুদ্রণ-শিল্প প্রথমে প্রবর্তিত হইবার কারণ এই যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ অংশে রাইন জনপদ প্রকৃতপক্ষে ইয়োরোপের মধ্যে জ্ঞানে শীর্ষস্থানীয় ছিল; রেনেসাঁসের যে প্রবল বন্যা মধ্যযুগকে নির্বাসিত করিয়া বর্তমান যুগের ভিত্তি পত্তন করিল, তাহা প্রথম ইতালিতেই উদ্ভূত হয়, এবং তৎপরে রাইনের উত্তর তীরে ছড়াইয়া পড়ে। যেখানে পুস্তকের চাহিদা খুব বেশী ছিল, মুদ্রণ-শিল্প প্রথমে সেই স্থানেই সম্প্রসারিত হয়। ঐ সমস্ত প্রদেশ তৎকালে প্রাচীন শিক্ষার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিল।

নিকোলাস জেনসন

জেনসন জাতিতে ফরাসী। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে তিনি স্যাম্পেন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক বাল্যজীবন স্বীয় জন্মভূমিতে অতিবাহিত করিয়া প্যারিসে আগমন করেন এবং প্যারিস ট্যাঁকশালে লালিতপালিত ও শিক্ষিত হন। এইখানে কিছুকাল বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করার পর তিনি ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজ সপ্তম চার্লস কর্তৃক নবোদ্ভাবিত মুদ্রণশিল্পের শিক্ষালাভার্থ মাইন্টজ্ প্রেরিত হইলেন। তথায় তিনি তিন বৎসর অতিবাহিত করেন এবং এই সময়ের মধ্যে ফাষ্ট ও গুটেনবার্গের সতর্কপ্রহরী সমন্বিত মুদ্রণ-গৃহে যথাসাধ্য শিক্ষালাভের চেষ্টা করেন।

১৪৬১ খৃষ্টাব্দে জেনসন প্যারিসে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু তখন সপ্তম চার্লস পরলোক গমন করায় একাদশ লুই সিংহাসনে আসীন ছিলেন। একাদশ লুই মুদ্রণশিল্পে সপ্তম চার্লসের মত তত উৎসাহী ছিলেন না কিম্বা, জেনসন যে রাজকীয় সাহায্যের আশা করিয়াছিলেন, তাহা মিলিল না; ফলে জেনসন স্বীয় মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অক্ষম হইয়া ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে ভেনিস সহরে গমন করেন। জ্ঞান-পিপাসু ভেনিসবাসীর সহায়তায় তিনি ঈপ্সিত মূলধন লাভ করেন এবং ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষর নির্মিত এবং মুদ্রাকর শিক্ষিত হইল এবং তিনি মুদ্রণ ও পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা পত্তন করিলেন। এইরূপে জেনসন মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন করেন; কালে এই মুদ্রাযন্ত্র ইতালিত মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম মুদ্রণকার্য স্থরু করিয়াছিল।

এইবার পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবসায় অবতীর্ণ হইয়া জেনসন দ্রুতগতিতে পুস্তকের পর পুস্তক প্রকাশ করিয়া চলিলেন। শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার কাজ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়; যেহেতু তিনিই প্রথমে বিশুদ্ধ প্রাচীন সাহিত্য মুদ্রিত করিতে থাকেন। এইরূপ মুদ্রণের দ্বারা তিনি প্রাচীন সাহিত্যকে বিশুদ্ধ ও স্থিরীকৃত করিয়া দেন; যেহেতু

তৎপূর্বে পুস্তক হাতে নকল করিয়া লইতে হইত বলিয়া কোন পুস্তককে একেবারে বিশুদ্ধ বলা চলিত না।

নবীন পুস্তক-প্রচারকার্যের অগ্রদূতরূপে জেনসন ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে "কাউণ্ট প্যালেষ্টাইন" নামক সম্মানের উপাধি লাভ করিলেন। এই প্রথম মুদ্রাকর সম্মানিত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হইল!

১৪৭১ খৃষ্টাব্দে জেনসন "Decor Puellarum" নামক পুস্তক মুদ্রিত করেন, এই পুস্তকে তরুণীদের জীবন যাত্রানির্বাহার্থ সমুচিত উপদেশ ছিল।

১৪৮০ খৃষ্টাব্দে জেনসন পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র Asolaর Andrea Torresano নামক ব্যক্তি ক্রয় করিয়া লইলেন।

এলডাস্ ম্যানিউসিয়াস্

এলডাস্ ম্যানিউসিয়াস্ "রোমগনা" নামক স্থানে ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বালক ও যুবকরূপে তিনি রোম, ফেরারা এবং অবশেষে ভেরোনায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিতরূপে খ্যাতি অর্জন করেন; এমন কি বিংশতিবর্ষ বয়সেই তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। ধীরে ধীরে অমূল্য গ্রীক গ্রন্থরাজি মুদ্রিত করিয়া উহাদিগকে বিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প তাঁহার মনে উদিত হইল। দীর্ঘকাল তিনি কার্পির রাজকন্যার গৃহে শিক্ষকের কার্যে অতিবাহিত করেন; অবশেষে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি মনে মনে বলিলেন— "এইবার আমি জ্ঞানের জন্য জীবন উৎসর্গ করিব।"

কার্পির রাজকন্যা এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণ এই গ্রীক ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার অর্থ সরবরাহ করিলেন। ফলে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে ভেনিস সহরে তিনি স্বীয় মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে তিনি ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে একখানি গ্রীক ও একখানি ল্যাটিন ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। পরবর্তী বৎসরে আরিষ্টটলের পুস্তকাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতে মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত এলডাস কখনো গ্রীক ও ল্যাটিন ভাণ্ডারের রত্নরাজি প্রকাশে বিরত হন নাই। তাঁহার অভিলাষ ছিল—গ্রীক প্রাচীন গ্রন্থমালার একটা সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করিবেন। সেই সঙ্গে টীকা, অভিধান ও ব্যাকরণ-মালারও একটা সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। তিনি তাঁহার এই উচ্চাভিলাষ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু অদ্যাবধি পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলী তিনি যে সৎকার্য সংসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে এলডাস Andrea Torresanoর কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্বশুরের ব্যবসা আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে জেনসনের মুদ্রাযন্ত্রের অবশিষ্টাংশ ও ভাবধারা, মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনে জেনসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারীর হস্তে চলিয়া আসে—পার্থিব ও ভাবপ্রবণতা—এই উভয় দিক্ হইতেই এই এই ঘটনা সুখাবহ সন্দেহ নাই।

বৈদেশিক আক্রমণ এবং পৌরযুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এলডাস ক্রমাগত পুস্তক মুদ্রিত এবং প্রকাশ করিয়া চলিলেন। তিনি মোট ২৫০ খণ্ডে কয়েক শত পুস্তক প্রকাশিত করেন;—তৎকালীন বাধা-বিঘ্নের কথা স্মরণ করিলে ইহা যে সুবৃহৎ কার্য তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

এলডাসই নূতন ধরণের "ইটালিক" অক্ষরের জন্মদাতা। তিনি তৎকালীন প্রচলিত অক্ষর অপেক্ষা আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অক্ষর বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ফলে তিনি চওড়া অক্ষর অপেক্ষা সূক্ষ্মকোণ অক্ষর নির্মাণে অধিকতর ঝুঁকিয়া পড়েন। এলডাসের উদ্ভাবিত "ইটালিক" অক্ষরও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অথচ তাহাতে বেশী স্থানের দরকার হয় না।

১৫১৫ খৃষ্টাব্দে এই মহামনীষী পরলোক গমন করেন। তাঁহার ছাপাখানার নাম ছিল "এলডাইন প্রেস"।

এলডাসের বংশধরগণ

এলডাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নাবালক থাকায় তাঁহার শ্যালকগণ মুদ্রাযন্ত্র পরিচালন করিতে থাকেন।

ফলে তাঁহারা রীতিমত তত্ত্বাবধান না করায় ব্যবসা সাময়িকভাবে ধ্বংসের পথে চলিল।

এলডাসের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র পল ম্যানিউসিয়াস তিন বৎসর বয়স্ক ছিলেন। তাঁহার মাতুলগণ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালক ছিলেন। উক্ত বৎসরে পল ব্যবসায় নিজে নিযুক্ত হন এবং অবিলম্বে প্রমাণ করিলেন যে, তিনিও পিতৃ-প্রতিভার অধিকারী। তাঁহার পরিচালনায় এলডাইন প্রেস আবার উন্নতির পথে ধাবিত হইল এবং ইহা ইতালির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মুদ্রাযন্ত্রে পরিণত হয়।

পল ম্যানিউসিয়াস তাঁহার পুত্রকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র ব্যবসা পরিচালনা করিতে থাকেন, অবশেষে তিনিও ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

এলডাস ও তাঁহার বংশধরগণের কৃতিত্ব

উপরি লিখিত বিবরণ হইতে উহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে, পিতা, পুত্র ও পৌত্র—এই তিনজন শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া পাণ্ডিত্য এবং উৎকৃষ্ট মুদ্রণের সমন্বয় সাধন করেন। প্রতিযোগী ও বিরুদ্ধ পক্ষের লোকের নিকট তাঁহাদের উদাহরণ পৃথিবীর যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারে; কারণ মুদ্রণশিল্পের বাল্যকালে তাঁহারা যেরূপ উচ্চ শ্রেণীর মুদ্রণ-কৌশল, সর্বাঙ্গীন পারিপাট্য এবং নিম্ন মূল্যের একত্র সমাবেশ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহা অন্যত্র দুর্লভ ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মুদ্রাকরগণের কায়িক পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিলে ইহা অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে যে, এলডাসই তাঁহার মুদ্রিত গ্রীক ও ল্যাটিন পুস্তকমালার প্রতি খণ্ড আধুনিক মুদ্রার ৯।১০ শিলিংএ বিক্রয় করিয়াছেন।

ইংরেজ মুদ্রাকার উইলিয়াম ক্যাক্সটন

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইতালি, জার্মাণি ও ফ্রান্সের বৃহৎ সহরে মুদ্রণ-শিল্প

বিষয়ে খুব পশ্চাৎপদ ছিল না,—উইলিয়্যাম ক্যাক্সটন ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টমিনষ্টারে সর্বপ্রথম পুস্তক মুদ্রিত করেন।

ক্যাক্সটন ১৪২২ খৃষ্টাব্দে কেণ্টের উইল্ড নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে ক্যাক্সটন বা কোষ্টন পরিবার উক্ত জেলায় কৃষকের কার্যে লিপ্ত ছিল বা সামান্য ভদ্র গৃহস্থভাবে বসবাস করিত। উইলিয়্যাম ক্যাক্সটন নিজেই লিখিয়াছেন যে, তিনি সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে বরার্ট লার্জ নামক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বস্ত্র-ব্যবসায়ীর নিকট শিক্ষানবিশ ছিলেন। ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে ক্যাক্সটনের প্রভু লণ্ডনের লর্ড মেয়রের পদে অবস্থিতি-কাল পূর্ণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি তাঁহার উইলে ক্যাক্সটনকে ২০ মার্ক প্রদান করিয়া যান। ইহাতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, ক্যাক্সটন শিক্ষানবিশের আদর্শ মূর্তি ছিলেন।

এই অর্থ লাভ করিয়া ক্যাক্সটন ব্রাজেসে গমন করেন। তৎকালে বহু ইংরেজ বণিক্ এই স্থানকে তাঁহাদের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিলেন। ক্যাক্সটন ত্রিশ বৎসর বেলজিয়ামে অতিবাহিত করেন। এই ত্রিশ বৎসরে ক্যাক্সটন সামান্য শিক্ষানবিশ হইতে বৃহৎ ব্যবসায়ীতে রূপান্তরিত হইলেন। ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নীদারল্যাণ্ডে বাণিজ্যকারী ইংরেজ বণিক্‌দের গভর্ণর মনোনীত হন; এই পদ চতুর্থ এডোয়ার্ড গিল্ড অফ্ মার্চেণ্ট অ্যাড-ভ্যান্সারার্সকে সনন্দ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এই পদে কার্য করিয়া ও নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাইয়া ক্যাক্সটন লেখাপড়ার বা আমোদ-প্রমোদের সময় পাইতেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী রাজদূত—যিনি দেশে বাণিজ্যবিষয়ক সমস্ত চিঠিপত্র লিখিতেন, ইংল্যণ্ড ও নীদারল্যাণ্ডের মধ্যে সমস্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিতেন। ফলে তাঁহার পদের গুরুত্ব বেশ উপলব্ধ হয়। তিনি অবসর সময়ে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তিনি মধ্যযুগের রোমাঞ্চকর উপন্যাসাবলী ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। এতদ্ভিন্ন কতকটি কাজের খাতিরে ও কতকটা আমোদ উপভোগের জন্য তিনি হল্যাণ্ড ও রাইন

মুদ্রাযন্ত্রের জ্ঞান লাভ

১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে কলার্ড ম্যানসন নামক একজন কুশলী মুদ্রাকর ব্রাজেস সহরে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্যাক্সটন শীঘ্রই তাঁহার সহিত পরিচিত হন এবং অবসর সময় তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ও কর্মব্যস্ত লোক অবসর সময় যেরূপ চাতুর্য-পূর্ণ প্রশ্ন করে, সেইরূপ প্রশ্ন করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের বিবরণ অবগত হইতে লাগিলেন। তবে তাঁহার অবসর সময় কয়েক ঘণ্টার বেশী ছিল না। ক্যাক্সটন অবশেষে দেখিতে পাইলেন যে, তিনি ধীরে ধীরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্যকলাপ দুই এক বৎসর পূর্বে পরিহার করিয়া ক্যাক্সটন দেখিলেন যে, তাঁহার নিজের পক্ষে মুদ্রাকররূপে পরিণত হওয়ার কোন বাধা নাই।

ম্যানসনের ছাপাখানাস্থ লব্ধ জ্ঞান ব্যতীত, স্বীয় জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে ক্যাক্সটন ১৪৭১-৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোলোনে মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেন।

পুস্তক প্রচার

তিনি ব্রাজেসে ফিরিয়া আসিয়া জনপ্রিয় উপন্যাস Le Recueil des Histoires de Troye নামক পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হন। এই পুস্তক ইংরেজী ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। কিন্তু এই পুস্তক কোথায়, কখন, কিভাবে কিম্বা কাহার দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন মুদ্রিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে ও অন্যান্য পুস্তকের সহিত তুলনায় বিশেষজ্ঞগণ স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা ম্যানসনের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

ক্যাক্সটনের লিখিত বিবরণে প্রকাশ যে, তিনি ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে The Game and Playe of Chesse নামক পুস্তকের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। তিনি I. de Cessolisএর পুস্তকের একখানি ফরাসী সংস্করণকে তাঁহার অনুবাদের মূলরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহাতে তারিখ বা উৎপত্তির কোন নিদর্শন নাই; কিন্তু উপরি লিখিত কারণমালার সমবায়ে বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন যে, এই পুস্তক ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে ব্রাজেস সহরে ম্যানসনের প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাক্সটন ব্রাজেস পরিত্যাগ করত নিজের মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লণ্ডনে আগমন করেন। তিনি ওয়েষ্টমিনষ্টারে বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং এই স্থান হইতে ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে The Dicts and Sayings of the Philosophers নামক পুস্তক প্রকাশিত করিলেন। ইহাই ইংল্যাণ্ডে মুদ্রিত পুস্তকের প্রথম স্থানীয় এবং ক্যাক্সটন যে গ্রন্থমালার প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন, তাহার অগ্রদূত।

১৪৭৭-৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছাপাখানা খুব কর্মব্যস্ত ছিল। ক্যাক্সটনও ছাপাখানা সম্বন্ধে খুব উচ্চাভিলাষী হইলেন। তিনি ইহার প্রতিষ্ঠার বৎসরই সসারের 'ক্যাণ্টারবেরী টেল্‌স্'এর বৃহৎ ফোলিয়ো-সংস্করণ প্রকাশে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। Maloryর Le Morte d'Arthur, ইনিদের ব্যাখ্যা, সিসিরোর De Senectuteএর অনুবাদ, Golden Legendএর অনুবাদ যথাক্রমে তাঁহার ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়। সর্ব মোট তিনি ১৮,০০০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত বিষয় প্রকাশিত করিয়াছিলেন; ইহার অধিকাংশের আকার ফোলিয়ো; ইহার বহু পুস্তকের একাধিক সংস্করণ হইয়াছিল।

মুদ্রাকর ব্যতীত, ক্যাক্সটন নিজে ছাপাখানার জন্য অনুবাদেও বহু সময় ব্যয় করিতেন। অনুবাদকরূপে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতাভোগ করিতেন। তিনি লেখককে অনেক সময় ঠিক অনুকরণ করিতেন না; অধিকন্তু ব্যাখ্যা সংযোগ, প্রক্ষিপ্তাংশ গ্রথিতকরণ, অথবা ক্ষুদ্র বিষয় নিজের ইচ্ছামত পরিবর্তন করিতেন। তথাপি তিনি বিশিষ্ট বাক্‌পটুতা দ্বারা স্বীয় বিষয় অলঙ্কৃত করিতেন, এবং বলিয়া না দিলে, অনেকে তাঁহার রচনাকে মৌলিক বলিয়া ভ্রমে পতিত হইত। স্বীয়কৃত অনুবাদের প্রকাশের জন্য ষোড়শ শতাব্দীর গদ্য সাহিত্যের উপর ক্যাক্সটনের বেশ প্রবল

প্রভাব বিদ্যমান; প্রকৃত পক্ষে বলা হয় যে, তাঁহার গদ্য রচনার রীতি সার ফিলিপ সিডনী বা রাজ্ঞী এলিজাবেথের সমকালীন গদ্য লেখককে প্রেরণা দান করিয়াছিল।

ক্যাক্সটন ওয়েষ্টমিনষ্টারে বসবাস করিতেন পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তথায় তিনি একজন প্রভাবশালী নাগরিক ছিলেন। চতুর্থ এডওয়ার্ড ও তৃতীয় রিচার্ড উভয়েই তাঁহাকে সম্মানিত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে তিনি অনেক সময় রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন।

ক্যাক্সটনের মৃত্যু

ধীরে ধীরে ক্যাক্সটনের কর্মব্যস্ত জীবনের দিনগুলি মুদ্রণশিল্পে ও অনুবাদে অতিবাহিত হইতে লাগিল। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দীর্ঘ কর্মবহুল জীবনের রঙ্গমঞ্চে শেষ যবনিকা নিক্ষিপ্ত হইল। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, জীবনের শেষ কয়েক মুহূর্তও তিনি Vitæ Patrumএর অনুবাদ করিতেছিলেন। এই পুস্তক তাঁহার মৃত্যুর পর উইনকিন দে ওয়ার্ডি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

ক্যাক্সটন ঠিক কোন দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে ওয়েষ্টমিনষ্টারের সেণ্ট মার্গারেট গির্জার প্যারিশ-হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়—"উইলিয়াম ক্যাক্সটনকে সমাহিত করিতে ঘণ্টাবাদ্যে ৬ পেনি ও মশালে ৬ শিলিং ৮ পেন্স ব্যয়িত হইয়াছিল।"

উইন্‌কিন দে ওয়ার্ডি

ক্যাক্সটনের মৃত্যুর পর উইনকিন ওয়েষ্টমিনষ্টার ছাপাখানার অধিকারী হন। উইনকিন ইতিপূর্বে ক্যাক্সটনের ছাপাখানায় ফোরম্যান ছিলেন।

উইন্‌কিন আলসাস প্রদেশে ওয়ার্থ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার জন্মতারিখ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। তিনি তরুণ যুবকবেশে ইংল্যণ্ডে আগমন পরে নিজের কর্মদক্ষতায় ক্যাক্সটনের জীবিতকালে ফোরম্যানের পদ লাভ করিয়াছিলেন।

উইনকিনের পরিচালনায় এই ব্যবসা বেশ ভালভাবে চলিতে লাগিল। তবে উইনকিন মুদ্রণ-কার্যে আলঙ্কারিকতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতে থাকেন। তাঁহার প্রকাশিত অধিকাংশ পুস্তকে কাষ্ঠখোদিত চিত্র সন্নিবিষ্ট হইত; গুণে এই পুস্তকাবলী পূর্বপ্রকাশিত পুস্তকাবলী হইতে উৎকৃষ্ট ছিল।

উইনকিনের মুদ্রিত পুস্তক সমসাময়িক অন্যান্য মুদ্রাকর অপেক্ষা খুব বেশী ছিল সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে Golden Legend, Vitæ Patrum ও De Proprietatibus Rerum উল্লেখযোগ্য;—শেষোক্ত পুস্তক তৎকালীন চিত্র ও মুদ্রণ-শিল্পের আদর্শস্থানীয়।

ক্যাক্সটনের মৃত্যুর নয় বৎসর পরে উইনকিন ছাপাখানা ওয়েষ্টমিনষ্টার হইতে ফ্লিট ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত করেন; ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই স্থান হইতে তিনি প্রতিযোগী রিচার্ড পিনসনের সহিত সমকক্ষভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইবেন।

উইনকিনের মুদ্রিত পুস্তকাবলীর ঠিক সংখ্যা নির্ণয় দুরূহ; তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে উহা এক হাজারের বেশী।

তাঁহার মৃত্যু-তারিখও সঠিক জানা যায় না, তবে খুব সম্ভবত উহা ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বা ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমে সংঘটিত হইয়াছিল।

রিচার্ড পিনসন

রিচার্ড পিনসন নর্মাণ্ডির অধিবাসী, উইনকিনের মত তাঁহারও জন্মতারিখ অজ্ঞাত। তিনি নর্মাণ্ডিতে Guillaume le Talleurএর শিক্ষাধীনে মুদ্রণ-শিল্পে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

William de Machlinia ইংল্যণ্ডে আইন-পুস্তক মুদ্রণের ব্যবসায় বেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন। তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করায় তাঁহার স্থানে রিচার্ড
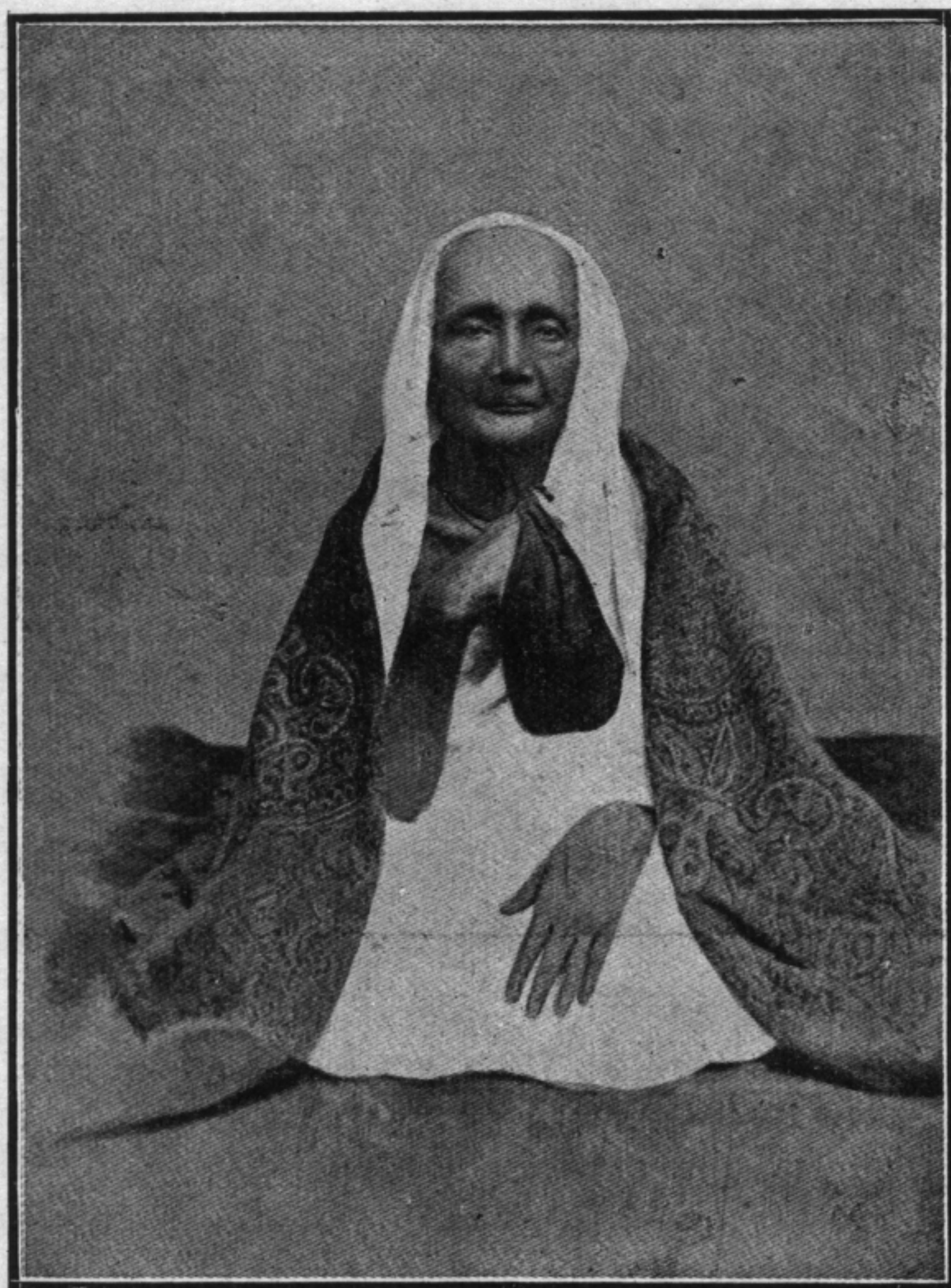
স্বর্গীয়া চুণীমণি দাসী

আগমন করেন। এই কার্যে পিনসন নিজকে যোগ্যতম উত্তরাধিকারিরূপে প্রমাণিত করেন।

প্রথমে তিনি টেম্পল বারের সন্নিকটে কাজকর্ম চালাইতেন। দশ বৎসর তথায় অতিবাহিত করিবার পর তিনি ফ্লিট ষ্ট্রীটে রাস্তার উত্তর ধারের একটি বাড়ীতে ছাপাখানা স্থানান্তরিত করেন। তিনি সর্বশুদ্ধ চারি শতের বেশী পুস্তক প্রকাশিত করেন নাই; তবে তাহার পুস্তকাবলী উইনকিন অপেক্ষা অধিকতর যত্নসহকারে মুদ্রিত হইত। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে Ship of Fool ও Sermo fratris Hieronymi de Ferraria উল্লেখযোগ্য।

অষ্টম হেনরি কর্তৃক তিনি রাজকীয় মুদ্রাকর পদে নিযুক্ত হন।

এক বিষয়ে পিনসন প্রকাশকদের অগ্রদূত; তিনি সর্ব প্রথম ইংরাজী দিন-পঞ্জিকা বাহির করেন। উহার নাম ছিল The Kalendar of the Shepardes—ইহা তিনি ফরাসী হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই দিন-পঞ্জিকা ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুতারিখও সঠিক জানিবার উপায় নাই, তবে খুব সম্ভবত তিনি ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

জন ডে

জন ডে সর্বপ্রথম সঙ্গীত পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম ইংল্যণ্ডের গির্জার সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশিত করেন। তৎপূর্বে ইংরেজী ভাষায় কোন মুদ্রিত সঙ্গীত পুস্তক ছিল না।

স্বর্গীয়া চূণীমণি দাসী

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

স্বর্গীয়া চূণীমণি দাসী ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। এই মহীয়সী মহিলার পিতার নাম বদনচন্দ্র চন্দ্র। পরমভাগবত বৈদ্যনাথ দে মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বৈদ্যনাথবাবু কাল্‌নার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধ ভগবান-দাস বাবাজীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ইঁহাদের চারি পুত্র ও তিন কন্যা। প্রথম পুত্র নরসিংহচন্দ্র দে; ইঁহারাই পুত্র ডাঃ রামদাস দে; মধ্যম পুত্র গৌরমোহন দে; ইঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস দে; ইনি কলিকাতা সুবর্ণবণিক-সমাজের একজন বিশিষ্ট কর্মী। বৈদ্যনাথবাবুর তৃতীয় পুত্র সাতকড়ি দে ও কনিষ্ঠ পুত্র তিনকড়ি দে।

বৈদ্যনাথ বাবুর পিতার নাম রাধাকান্ত দে। রাধাকান্ত বাবুর দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ বৈদ্যনাথ ও কনিষ্ঠ কাশীনাথ। বৈদ্যনাথ বাবুর প্রথমা কন্যা ব্রজেশ্বরী দাসী। ইঁহারই প্রথমা কন্যা সারদামণি দাসীর সহিত কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের বিবাহ হয়।

চূণীমণি ডাঃ চন্দ্রের অপেক্ষা বয়সে ৪।৫ বছরের বড় ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম মহেন্দ্রলাল চন্দ্র।

বৈদ্যনাথ বাবু 'মধুসূদন মল্লিক এণ্ড কোং' নামক জুয়েলারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ছিলেন। সংসারী হইলেও, তাঁহার আদর্শ জীবন ছিল। ধর্মকর্ম, দানধ্যান, ও হরিকীর্তনাদিতে স্বামী স্ত্রী উভয়েই সর্বদা রত থাকিতেন। তাঁহাদের এই ধর্মভাব ও বৈষ্ণববিনয় আজিও তাঁহার বংশাধরগণের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে চূণীমণির স্বামী বৈদ্যনাথ বাবুর মৃত্যু হয়। ইহারই চারি বৎসর পরে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতে বিপত্নীক অবস্থায় ডাঃ চন্দ্র মারা যান।

ডাঃ চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ (প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টকা) উত্তরাধিকারসূত্রে চুণীমণি লাভ করেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে (১৩০৭ সালের ২১ এ মাঘ) চুণীমণি তাঁহার বাসস্থানের (৭০ নং শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন) সন্নিকটে, ৬।১ নং গোবিন্দ সেনের গলিতে পাঁচ কাঠা জমির উপর একটি দ্বিতল ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরবাড়ীর জমি ক্রয়ে ও বাড়ী তৈয়ারী বাবদ ৪০,০০০ হাজার টাকা খরচ হয় এবং ৭৫,০০০ হাজার টাকা ঠাকুরবাড়ীর সেবাদিকার্য পরিচালনার জন্য অ্যাড-মিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের নিকট জমা রাখেন। উক্ত ৭৫,০০০৲ টাকা বর্তমানে এক লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

ঠাকুরবাড়ীর দরজার পার্শ্বে শ্বেত প্রস্তরে নিম্নলিখিত ফলক উৎকীর্ণ আছে—

"শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেব জীউ ও শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দদেব জীউর
প্রীত্যর্থে পরম ভাগবত ৺বৈদ্যনাথ দের সহধর্ম্মিণী
পরম ভক্তিমতী শ্রীমতী চুণীমণি দাসী কর্তৃক
এই দেবমন্দির
প্রতিষ্ঠাপিত হইল। ২২শে মাঘ সন ১৩০৭ সাল"

রাস, ঝুলন ও দোলের সময় উৎসব হয় কিন্তু রথ-যাত্রায় নয় দিন বিশেষ উৎসব ও ভোগাদি হয়। এই নয় দিন অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সেবা হয়। রথের উৎসবে প্রতি বৎসর ৮০০৲ টাকা খরচ হয়।

ঠাকুরবাড়ীর কার্য-পরিচালনার জন্য একজন পুরোহিত, একজন পাচক, সরকার একজন, এবং একজন চাকর ও একজন ঝি নিযুক্ত আছে। ঠাকুরবাড়ীর বর্তমান সেবাইত শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দে, ইনি চুণীমণি দাসীর কনিষ্ঠ পুত্র ৺তিনকড়ি দের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি দে, শ্রীযুক্ত কানাইলাল দে ও শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দে—ইহারা ঠাকুরবাড়ীর বর্তমান ট্রাষ্টি।

ডাঃ চন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী চুণীমণিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। সার্কুলার রোডের বাড়ীতে থাকিবার সময় মাঝে মাঝে তাঁহার দিদি ও ভাগিনেয়-দিগকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার পত্নী মেরী চন্দ্রও চুণীমণিকে খুব ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। পরস্পরের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষের আদান-প্রদান চলিত। নিম্নে মেরী চন্দ্রের প্রেরিত একখানি Christmas card ও দুইখানি পত্রের প্রতিলিপি প্রদান করিলাম :—

"Christmas 1884

For dear sister with
love and best wishes for
the Happy Christmas
and New Year to her and
her husband
from her affectionate brother & sister
Rajendra & Mary Chandra
London
To Mrs. Buddee Nath Dey"

১ম পত্র

"My dear Sister,

Thank you very much for your present of fruits and sweetmeats. Reggie* and I am both so much obliged.

Hope you are all quite well, always your
affectionately sister
Mary Chandra
To Mrs. Buddee Nath Dey"

দ্বিতীয় পত্র

"93 Lower Circular Road
Calcutta
November 13th/81

My dear Sister,

I send a present I brought for you from England and also a present for coats of

* মেরি চন্দ্র তাঁহার স্বামীকে রেজী বলিয়া ডাকিতেন।
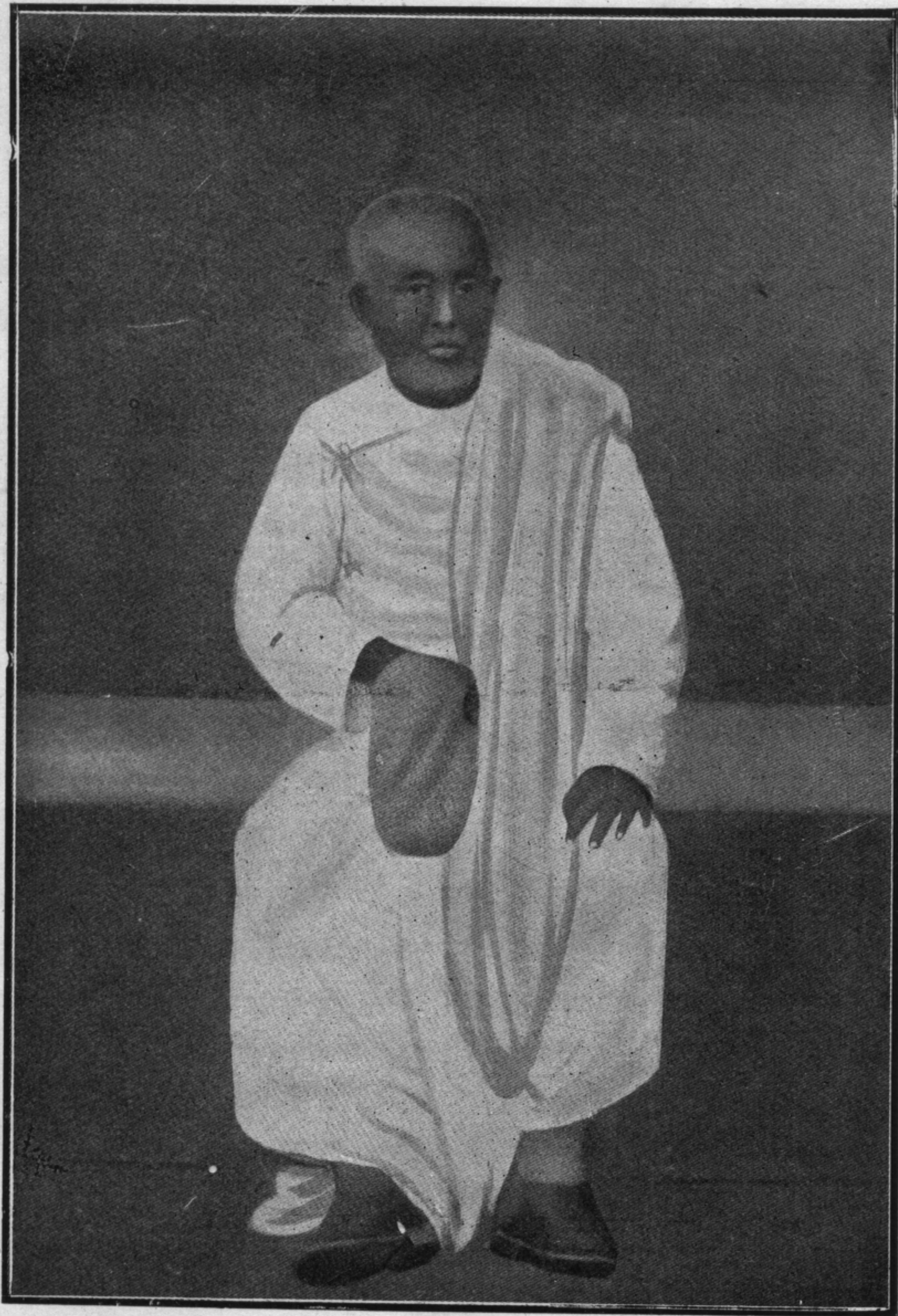
৺বৈদ্যনাথ দে

your two boys as I promised. Your present is a shawl white. I hope you will find comfortable in the cold weather; it is a very choice kind at home; for the boys I have brought three yards' of the best English cloth to make them cold weather clothes. I hope you will all like your presents; I had a great deal of pleasure in getting them for you. I have come back. Much better for my trip to England and will come and see you all as soon as I can manage it. I hope your husband and all are quite well.

I must finish my letter now and good bye.

Always your affectionate sister
Mary S. Chandra"

চুণীমণির তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সাতকড়ি দে মহাশয় Deputy Accountant General of Post and Telegraphs ছিলেন। উপস্থিত তিনি পেন্‌সনভোগী। তিনি পরম বৈষ্ণব ও বহুসদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি।

চুণীমণি স্থাপিত ঠাকুরবাড়ীটি দ্বিতল। একতলায় বহির্বাটিতে বিস্তৃত উঠান, তিন ফুকুরে ঠাকুরদালান, ঠাকুর ঘর, এবং অতিরিক্ত তিনখানা ঘর; ভিতর বাটীতে ভোগের ঘর ও রান্নাঘর এবং দ্বিতলে তিনখানা ঘর আছে।

জাতীয় সংবাদ

নববর্ষ-উৎসব

ঢাকা সুবর্ণবণিক্-মিলন-পরিষদের সভ্যগণের উদ্যোগে কায়েতটুলীস্থ শ্রীঅসিতকুমার নন্দী মহাশয়ের বাটি "হিমানী-বাসরে"র প্রশস্ত অঙ্গনে নববর্ষ-উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকুমার নন্দী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কত করেন। শ্রীমান্ নিখিলেন্দু ও শ্রীমান নির্মলেন্দু শীলের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত সুকুমার শীল ও পরিষদের সম্পাদক মহাশয় নববর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। বহু বালক-বালিকার আবৃত্তি ও সঙ্গীতের পর পরিষদের সভ্যগণ কর্তৃক "বেকার নাশন কোং" নামক একটি কৌতুক নাটিকা অভিনীত হয়। উৎসবের দিন প্রভাতে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মঠের সতী মহারাজ গীতার ব্যাখ্যা ও শ্যামা সঙ্গীতে সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণকে মুগ্ধ করেন। এই সভায় বহু স্বজাতীয় গণ্যমান্য ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

শিবচন্দ্র মণ্ডলের স্মৃতিরক্ষা

চুঁচুড়ার অন্যতম তরুণ কর্মী শিবচন্দ্র মণ্ডল ১৯৩১ সালের ৯ই মে তারিখে গঙ্গায় এক নৌকাডুবির ফলে যখন অকালে স্বর্গারোহণ করেন, সেই সময় চুঁচুড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের পক্ষ হইতে একটি এবং চুঁচুড়া ফিজিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে আর একটি সমিতি গঠিত হয়—কিন্তু এ পর্যন্ত স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই।

এই সকল বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য সম্প্রতি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের সভাপতিত্বে শিবচন্দ্রের বন্ধুগণের এক সাধারণ সভা হয়। জনসাধারণের পক্ষ হইতে গঠিত স্মৃতি রক্ষা সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ আঢ্য প্রকাশ করেন যে, ঐ ভাণ্ডারে তিনি স্বয়ং যে ২৫৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা স্থানীয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ৩৪২ নং পাশ বহিতে জমা ছিল। ব্যয়

বাদ ৩০।১০।১৯৩৪ তারিখে সুদ সমেত জমা ছিল ২৩।৵৫ টাকা। উক্ত সমিতির সভাসমূহে লোকাভাব নিবন্ধন ঐ টাকা ব্যয়ের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় ১৯৩৪ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখের "অ্যাডভান্স" পত্রিকায় সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া, তিনি ঐ অর্থ "বীণাপাণি বিদ্যানিকেতন"এর গৃহনির্মাণকল্পে ব্যয় করিয়াছেন। প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে তিনি বিদ্যালয়ে শিবচন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। সভা বলাইবাবুর এই কার্য সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করেন। ফিজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক কার্যবশতঃ অনুপস্থিত থাকায় তৎকর্তৃক সংগৃহীত অর্থের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই; তবে সংগৃহীত ও অঙ্গীকৃত অর্থের যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা আদায় করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থার ভার দেবেন্দ্র বাবুর উপর ন্যস্ত করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র পাল, বলাইচাঁদ আঢ্য, পুলিন-বিহারী পাল, গিরীন্দ্রনাথ চন্দ্র, নেপালচন্দ্র পাল, ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে শিবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ফিজিক্যাল ইনষ্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা যাহাতে বন্ধ না থাকে, তদ্বিষয়েও আলোচনা করা হইয়াছিল।

আমরা আশা করি শিবচন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার অচিরেই যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইবে।

চুঁচুড়া বার্তাবহ

ডক্টর বিমলা লাহার দান

শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রবৃত্তির জন্য ষোল হাজার টাকা

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিনাব্যয়ে একজন ছাত্রের শিক্ষালাভের ব্যবস্থাকল্পে ১৬ হাজার ৭ শত টাকা উক্ত কলেজে দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আরও জানা গিয়াছে যে, ডক্টর লাহার এই দান গ্রহণে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইয়াছেন। উক্ত বৃত্তি যে ছাত্র পাইবে তাহাকে কলেজ হোষ্টেলে বিনাব্যয়ে বসবাসের সুবিধা দেওয়া হইবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলিকাতা সুবর্ণবণিক্-সমাজ

বর্তমান বর্ষে কলিকাতা সুবর্ণবণিক্-সমাজ হইতে কয়েকজন ছাত্রকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। বৃত্তির জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন
সম্পাদক
কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজ
৩৩এ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ
কলিকাতা

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক সমাচার

২২শ বর্ষ | জৈষ্ঠ, ১৩৪৫ সাল | ৭ম সংখ্যা

কৃষক ও জমিদার

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন

কিছুদিন ধরিয়া আমাদের দেশে জমিদার-শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। দ্বিজদাস দত্ত নামক জনৈক ভদ্রলোক এই আন্দোলন বিশেষভাবে চালাইয়া যান। তিনি অনেক পাঁজি-পুঁথি ঘাঁটিয়া মনু-সংহিতার নবম অধ্যায় হইতে এই শ্লোকটি বাহির করেন যে, কৃষিক্ষেত্রে এক মাত্র কৃষকদিগেরই নির্ব্যূঢ় অধিকার থাকা উচিত, অন্য কাহাকেও তাহাতে অধিকার দেওয়া উচিত নহে। শ্লোকটি পাঠ করিলে সেরূপ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। শ্লোকটি এই :—

"পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভার্যাং পূর্ববিদো বিদুঃ।
স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্॥"

মনু। ৯।৪৪

সম্বন্ধ প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি দৃষ্টান্তস্বরূপ কথিত হইয়াছে। স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রবর ভরত শিরোমণি ঐ শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—"ইহার দৃষ্টান্ত—এই পৃথিবীর অনেকানেক স্বামী হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা; ইহার প্রথম স্বামী পৃথুরাজ; এই জন্য ধরা পৃথিবী নামে বিখ্যাতা অর্থাৎ পৃথুভার্যারূপে বিখ্যাতা এবং জঙ্গল কাটিয়া যে জন আবাদ করে উঁহার নামে ঐ ভূমি বিখ্যাত হয় এবং প্রথম শর দ্বারা যে মৃগকে বিদ্ধ করে উঁহারই ঐ মৃগ; ইহা পূর্বপণ্ডিতরা স্থির করিয়া-ছেন।" স্ত্রীতে স্বামীর অধিকার প্রসঙ্গে মনু শ্লোকটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়াছেন। ইহা পূর্বাপর সম্বন্ধ রাখিয়া পাঠ করিলে মনে হয় যে, অতি প্রাচীনকালে পৃথু রাজা

ইহা চাষের এবং বাসের যোগ্য করেন,—সেইজন্য এই ধরণী তাঁহার অধিকারভুক্ত বা ঘরণীরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে; কারণ যে ব্যক্তি গোড়ায় জমির জঙ্গল কাটিয়া উহাতে আবাদ বা বাস করে সে জমি তাহারই হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা হইয়াছে যে, যে শিকারীর বাণে মৃগ প্রথম বিদ্ধ হয় সেই মৃগ সেই শিকারীরই সম্পত্তি হইবে, পরে বিদ্ধকারী শিকারীর সম্পত্তি হইবে না। ইহাতে বুঝা যায় যে আদৌ দেশের ভূমি-সম্পত্তি রাজারই ছিল। কারণ তিনিই আদিতে লোকজন লইয়া বনভূমি হইতে বৃক্ষলতাগুল্ম সমস্তই ছেদন করিয়া তাহার উপর স্বীয় অধিকার স্থাপন করেন। প্রাচীন যুগের জঙ্গল দুই দশজন লোকের পক্ষে সমবেত হইয়া উচ্ছিন্ন করাও সম্ভব ছিল না। সেই জন্য রাজাই ক্ষিতিপতি, কৃষক ক্ষেত্রাজীব মাত্র।

গোড়ায় কৃষক স্থাণুচ্ছেদ পূর্বক কান্তারকে কেদারে পরিণত করিয়াছিল, তর্কের খাতিরে সে কথা স্বীকার করিয়া লইলেও জিজ্ঞাস্য, স্থাণুচ্ছেদকারী কৃষকের ঐ ভূমিতে পূর্ণমাত্রায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইত কি না? হইত, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই কৃষক সেই ক্ষেত্রকে তাহার ইচ্ছামত দান, বিক্রয় এবং তদ্রূপ করিতে পারিবে। সে যদি তাহা অন্য কোন অকৃষক ব্যক্তিকে উপযুক্ত মূল্য লইয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলে সেই অকৃষক ক্রেতার তাহাতে নির্ব্যূঢ় অধিকার জন্মিবে কি না? জন্মিবেই এবং চিরকাল জন্মিয়া আসিতেছে। তিনজন শিকারী এক বনে মৃগ শিকারে গমন করিল। একটি হরিণকে তিন জনই পরপর শর দ্বারা বিদ্ধ করিল। এরূপ অবস্থায় প্রথম যে শিকারী উহাকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল সেই শিকারীই সনাতন রীতি অনুসারে হরিণটি পাইল। সে যদি উহার মাংস বাজারে আনিয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলে সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ লইবার পর কি তাহার তাহাতে অধিকার থাকিবে? কখনই না। তবে কৃষকেরই বা তাহার ভূসম্পত্তি দান বা বিক্রয়ের পর তাহাতে অধিকার থাকিবে কেন? আর সেই জন্যই কৃষিক্ষেত্র কৃষককেই দিতে হইবে এমন কি কথা আছে?

এদেশে ভূমি চিরকালই সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। উহা অন্যান্য পণ্যের ন্যায় একটা দরে বিক্রীত হয়। লোক তাহাদের পরিবারবর্গের প্রতিপালন জন্য এবং অশক্ত অবস্থায় নিজ ভরণ-পোষণ জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া আসিতেছে। অভাবগ্রস্ত লোক দায়ে পড়িয়া বিক্রয় করিয়া চিরকালই দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় সেই ভূসম্পত্তিতে অকৃষক অধিকারীর অধিকার ক্ষুণ্ন করা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। ইহা অত্যন্ত লজ্জাময় কার্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং এখন যে ভূসম্পত্তি অকৃষকের হাতে আছে, তাহা কৃষক-দিগকে দিবার জন্য চেষ্টা করা কোন মতেই সমর্থনীয় হইতে পারে না। দিতে হইলে তাহার উপযুক্ত মূল্য দিয়া দিতে হয়। সে মূল্য কিবে কে? এ সমস্যার মীমাংসা না করিয়া এই প্রশ্ন উপস্থিত করাই উচিত নহে।

এই মতাবলম্বী লোকেরা আর একটা প্রশ্ন তুলিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, লর্ড কর্ণওয়ালিসই না বুঝিয়া জমিদারদিগকে ভূস্বামিত্ব প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এ ধারণা ঠিক নহে। এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভূস্বামি-সম্প্রদায় রহিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধে ব্যুৎপন্ন স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন যে, অতীত কালে যতদূর ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে বাংলায় জমিদারদিগের অস্তিত্ব ছিল। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় একজন হিন্দু জমিদার নিজ সৈন্য লইয়া দিল্লীর আফগান সম্রাটের একজন বিদ্রোহী সর্দারকে দমন করিয়াছিলেন। তাহার পরবর্তী শতাব্দীতে যখন বঙ্গদেশ দিল্লীর শাসন হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়াছিল, তখন বাংলায় আর একজন হিন্দু জমিদার বাংলা প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সেই রাজ্য তাঁহার পুত্রকে প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন।* ফলে কি

* Vide R. C. Dutt's Open Letters to Lord Curzon, 4th letter, Bengal.

আফগানদিগের আমলে কি মোগলদিগের শাসনকালে বাংলায় চিরদিনই জমিদারি-শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেবলমাত্র মিষ্টার দত্তই সেকথা বলেন নাই। ঢাকার ও বিহারের তদানন্তন রাজস্ব-কমিশনার সার জন শোর (যিনি পরে লর্ড টেনমাউথ নামে বিখ্যাত হন) তাহার ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখের এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখের মিনিটে স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন— "বাংলায় এই জমিদারদিগের জমিতে স্বামিত্বলাভ এবং বংশগত অধিকার কোন্ যুগে হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আকবরের সময় অনেক জমিদার বর্ত্তমান ছিল। ঐ সকল জমিদার আকবরের সৃষ্ট নহে। সম্ভবতঃ তাহারা মুসলমান বিজয়ের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল,—তবে সম্ভবতঃ তাহাদের অধিকার ও বিশেষ ক্ষমতার কিছু তারতম্য ঘটিয়া থাকিবে। দীর্ঘকাল ভোগ-দখল দ্বারা ভূস্বামীরা তাহাদের স্বত্ব কায়েমী করিয়া লইয়াছিল।"† যিনি ঢাকা ও বিহার অঞ্চলে রাজস্ব বিভাগে কাজ করিয়া এই বিষয়ে সেই সময়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তিনিই এদেশে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভেই এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে কথা উপেক্ষা করা কোনমতেই সঙ্গত নহে। তবে যাঁহারা ইচ্ছা করিয়া সত্যের অপলাপ করিবেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। মানুষ স্বার্থে অন্ধ হইয়া অনেক কথা বলে। যাঁহারা এদেশের ইতিহাস জানেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে ভূস্বামীরা বিদ্যমান রহিয়াছেন। আকবরের সময়ে গোবরডাঙ্গা ইছাপুরে রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ নামে একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-ভূস্বামী ছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গোবরডাঙ্গা পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য যেস্থানে ছাউনি করিয়াছিলেন তাহা এখন প্রতাপপুরের মাঠ বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে। এখন সে স্থানে লোকের বসতি ও গ্রাম হইয়াছে। মাঠের কিছু অংশ এখনও উন্মুক্ত আছে। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের বংশধর স্বর্গীয় সুরনাথ চৌধুরী ও ৺পরেশনাথ চৌধুরীও ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত জমিদার ছিলেন। এই রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের পূর্বজগণ কোন্ কাল হইতে জমিদারী করিয়া আসিতে ছিলেন, তাহা বলা কঠিন। এইরূপ তাহিরপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন জমিদার ছিলেন। নলডাঙ্গার বিখ্যাত জমিদারদিগের পূর্বপুরুষ রাজা মানসিংহ কর্তৃক জমিদার হইয়াছিলেন। নাটোরের জমিদাররা বা বর্দ্ধমানের জমিদাররা লর্ড কর্ণওয়ালিসের সৃষ্ট জমিদার নহেন। তবে লর্ড কর্ণওয়ালিস কতকগুলি কর-সংগ্রাহককে জমিদার করিয়া গিয়াছিলেন এই মিথ্যা কথা বলিবার সার্থকতা কি? ইচ্ছা করিয়া জোরপূর্বক মিথ্যা কথা বলিলে কি সত্যের অপলাপ করা সম্ভবে?

এখন জিজ্ঞাস্য জমিদারি-পদ্ধতি উচ্ছিন্ন করিয়া কি কৃষকদিগের উন্নতি ঘটিবে? স্থূল দৃষ্টিতে তাহা মনে হয় সত্য, কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে যে সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহা প্রায়ই অভ্রান্ত হয় না। সামাজিক এবং বার্তিক ব্যবস্থার ফল অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপারের দ্বারা অতি প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এদেশে কৃষীবলের দুর্গতির কারণ কৃষকদিগের যোতের জমার অল্পতা। জমিদারি-পদ্ধতি তাহাদের দুর্গতির কারণ নহে। একজন বিশেষজ্ঞ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে বাংলায় প্রত্যেক কৃষকের যোতে গড়ে ৭ বিঘা করিয়া জমি আছে। কোন কোন কৃষকের যোতে ২০—৩০ বিঘা জমিও আছে, কাহারও যোতে ২—৩ বিঘা জমি আছে। যাহাদের যোতে ৭ বিঘা জমির কম আছে, তাহারা নিজ যোতের জমিতে উৎপন্ন ফসল প্রায় বিক্রয় করে না। উহা তাঁহারা নিজ পরিবারবর্গের

† The origin of the proprietary and hereditary rights of the Zeminders in Bengal was uncertain and that at Akbar's time the Zeminders were numerous, rich and powerful, that they were not his creation but probably existed with some possible variation in their rights and privileges before the Mohamedan Conquest, in Hindustan and without any formal acknowledgment acquired stability by prescription,

ব্যবহারের জন্ম প্রায় রাখিয়া দেয় এবং অন্য উপায়ে কিছু উপার্জন করিয়া সংসারের অন্যান্য খরচ চালায়। কেহ পরের জমিতে ভাগ-চাষ করে, কেহ গাড়ী করিয়া মালপত্র বহন করে,—কেহবা অন্য কাজও করে। যাহাদের নিজ যোতে পাঁচ বিঘা বা তাহার কম জমি আছে, তাহারা অনেক স্থলেই অন্যের জমিতে আধিয়ারী করে। ইহাদের নিজ জমায় যে পরিমাণ জমি আছে, তাহাতে চাষ করিতে ইহাদের অধিক সময় লাগে না। ইহা সহজেই বুঝা যায়। বাংলার চাষীদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৎসরের মধ্যে বড় জোর তিনমাস কাল মাঠে খাটে। বাকি নয় মাস আলস্যেই কাটায়। কেহ কেহ অন্য কাজও করে। বার মাস প্রভাত হইতে প্রদোষ পর্যন্ত কৃষক মাঠে খাটে, ইহা কল্পনা-রাজ্যের কথা; বাস্তবক্ষেত্রে উহার অস্তিত্ব নাই। বৎসরের মধ্যে ৯ মাসকাল যাহারা কর্মহীন হইয়া বসিয়া থাকে, যাহাদের হালের জমি চটকের মাংসবৎ অতিঅল্প; এরূপ অবস্থায় তাহাদের দারিদ্র্য ঘটিবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? তাহাদের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে শিল্পকার্যের প্রসারসাধন করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন কৃষকদিগকে জমির স্বামিত্ব দিলে তাহাদের দুর্গতির অবসান হইবে। অনেক আইনজ্ঞ ব্যক্তি তাহা বলিয়াছেন। আইনে জ্ঞান থাকিলে সর্ব-বিষয়ে জ্ঞান থাকিবে এমন কোন কথা নাই। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয় যদি জমিতে কৃষকের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে জমিকে আপনার বলিয়া যত্ন করিবে। আপন জিনিষে লোক যেরূপ যত্ন করে পরের জিনিষে কি তাহা করে? স্থূল বুদ্ধিতে ইহা সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহা পৃথিবীর কুত্রাপি সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হয় নাই। বাংলার যে জমিতে প্রজা বহুদিন ধরিয়া চাষ করিতেছে, সে জমিতে তাহার দখলিস্বত্ব (occupancy right) জন্মে। জমিদার তাহার নিকট হইতে সেই জমি কাড়িয়া লইতে পারেন না। তাহাকে কেবল জমিদারকে বিঘা করা এক টাকা বা দেড় টাকা খাজনা মাত্র দিতে হয়। কিন্তু সেই জন্যই কি সে জমিতে যত্ন করে না? তাহার জমি বেচিতে পারে না; জমা বেচিতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, একশ্রেণীর লোকের ধারণা জন্মিয়াছে যে, কৃষকদিগকে তাহাদের চাষের জমিতে পূর্ণ অধিকার দিলে কৃষকদিগের কপাল ফিরিবে, কিন্তু সে ধারণা ভুল। পৃথিবীর যে যে স্থানে কৃষকদিগকে ভূমির মালেকান স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানের কৃষকদিগের অবস্থার বিষয় আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। প্রথম ডেনমার্ক। ডেনমার্কের কৃষীবলদিগের যোতে অত্যন্ত অধিক জমি আছে। বাংলার তুলনায় ডেনমার্কের লোকসংখ্যা অনেক কম। তথায় প্রতিবর্গ মাইলে গড়ে এখন ২ শত ৩৭ জনের বাস। বাংলার প্রতি বর্গ মাইলে ৬ শত ১৬ জনের বাস। তথায় কোন কৃষকের যোতে ১২ বিঘা জমির কম নাই। বাংলায় এমন কৃষক আছে, যাহার যোতে দুই বিঘা আড়াই বিঘার অধিক জমি নাই। ডেনমার্কের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র লোক কৃষির সেবা করে, বাংলার শত করা ৭৭ জন লোক কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। ডেনমার্কে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য পরিচালিত হয়, সেই জন্য তথায় কৃষিকার্যে লাভ হয়। বাংলাতেও সেই মান্ধাতার আমলের কৃষিপদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। তাহার উপর ডেনমার্কের কৃষীবল কেবল হল-কর্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না। তথাকার কৃষকরা সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন, পক্ষিপালন প্রভৃতির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। উহার দ্বারা তাহাদের জমির খাজনা উঠিয়া যায় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ও নির্বাহিত হয়। তথাকার ভূমির উপর সরকারী রাজস্বের হার অত্যন্ত অধিক। কৃষককে ভূস্বামিত্ব দিলে তাহা হইবেই; ফলে ডেনমার্কের কৃষীবলের অবস্থা ভারতীয় কৃষীবলের সহিত তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ লক্ষিত হয়। তথাকার কৃষীবল অভাবপীড়িত নহে। সেই জন্য তাহারা স্বীয় যোতের জমি সহজে বিক্রয় করে না। এদেশের কৃষিবল বাল্যে বিদ্যার্জন করে না, এদেশে ডেনমার্কের মত Folk High School নাই। সে দেশের কৃষীবল স্বাধীনভাবে অনেক সমবায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, আর এদেশের কৃষকরা তাহাদেরই সুবিধার জন্য পরিকল্পিত সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি জাহান্নামে পাঠাইবার চেষ্টা

করিতেছে। অতএব ডেনমার্কে কৃষকভূস্বামিত্ব (Peasant proprietorship) যদি সফল হইয়া থাকে, তাহা হইলে এদেশে যে তাহা সফল হইবে ইহা মনে করাই ভুল। বরং অতীত অভিজ্ঞতা হইতে ইহার বিপরীতই প্রতিপন্ন হইতেছে।

তাহার পর ফ্রান্সের কথা। ফ্রান্সে কৃষকভূস্বামিত্ব প্রবর্তিত আছে, তাহার ফল ভাল হয় নাই। এসম্বন্ধে আমি বর্তমান প্রবন্ধে আর অধিক কথা বলিব না। কবডেন সোসাইটীর ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধে লেখক এবং ভূমির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মিষ্টার ওবলিউ ই বেয়ার (W. E. Bear) তাঁহার The Land and the Cultivation নামক সন্দর্ভে এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—

"One of the great evils of a peasant proprietary is the tendency to promote an excessive subdivision of the land, and if for this reason alone, a fair system of tenancy is to be preferred to it."

ইহার মর্মার্থ :—কৃষক-ভূস্বামিত্বের একটা মহৎ দোষ এই যে, ইহাতে জমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া ফেলে, সেই হেতু কেবল এই কারণেই ইহা অপেক্ষা পক্ষপাতশূন্য প্রজাবিলি ব্যবস্থাই ভাল।

এই দোষ যে কেবল ফ্রান্সে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, অন্যান্য দেশেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। মিষ্টার বেয়ার পরে বলিয়াছেন :—

"France has been taken as an example of a country in which a peasant proprietary system is established for the great majority of the agricultural population. In other countries of Western Europe in which the same system of land tenure prevails, the excessive subdivision of the land is, as in France, one of the chief evils connected with that system."

মর্মার্থ—ফ্রান্স রাজ্যেই কৃষীবলের অধিকাংশই ভূস্বামিত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়া থাকে। পশ্চিম ইয়োরোপের অন্যান্য যে যে দেশে ঐ প্রকার ভূসম্পত্তির ভোগস্বত্ব-ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, সেইখানেই ফ্রান্সের ন্যায় এই ব্যবস্থা সম্পর্কে ভূসম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাই ঐ ব্যবস্থার প্রধান দোষ।"

ইহা একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মত। ইনি ফল দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইনি সাধারণ ব্যবহারাজীবদিগের ন্যায় শুষ্ক জ্ঞানকে সম্বল করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই। ইহা ভিন্ন ভূস্বামিকৃষকরা প্রায়ই মহাজনের নিকট ঋণজালে অতিমাত্র জড়াইয়া পরে। ইহা নানা দেশের অভিজ্ঞতা হইতেই জানা গিয়াছে। এ সম্বন্ধে এবার আর অধিক কথা বলিলাম না।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীনদীয়ালাল শীল

ক্ষুদ্র আমি বাণীর পুজারী লও হে ঋষি নমস্কার
শতেক বরষ পরে আজি ঝরিছে মোদের অশ্রুধার।
নিবেদিছে আজি তোমারে অর্ঘ্য কতশত মহারথী
আমিও দিলাম শ্রদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাদের সাথী।

কি মন্ত্র রচিলে হে ঋষি মহান্ "বন্দেমাতরম্" গানে
জন্মভূমিরে বাসিতে ভাল বলিলে সবার কাণে।
দেশমাতৃকার মোহিনী মূরতি আঁকিয়া তুলিকাপাতে
দেশের মাটির স্নেহের পরশ, জাগালে মোদের চিতে।

মন্ত্রবলে খুলিয়া দিলে মোদের রুদ্ধ আঁখিতারা
হেরিয়া মায়ের অপরূপ শোভা হলেম মোরা আত্মহারা।
তোমার প্রতিভা-গগনের পটে কোন তারা আজো হয়নি ম্লান
"বন্দেমাতরম" মন্ত্র তোমার উজ্জ্বলতম দান।

সুদূর হইতে পাঠাও আজিকে নব নব তব বাণী
জগৎ-সভায় ধন্যা পূজ্যা হউক ভারত-রাণী।
যেথায় থাক আজিকে ঋষি অসীম অজানা পারে
পাঠানু সেথায় ক্ষুদ্র অর্ঘ্য গাঁথিয়া লিপিকাহারে।

বহুরূপ তারা

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম্ বি এ এ, ও এ আর এফ্

আকাশে অনেক তারা আছে তাহাদের জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ঐ সকল তারাকে আমার আচার্য, যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল, স্বর্গীয় তারাদর্শক কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহুরূপ তারা বলিতেন। তাঁহার পূর্বে ঐ সকল তারা সম্বন্ধে এদেশে কেহ বড় বেশী কিছু জানিতেন না। আমি তাঁহার ব্যবহৃত কথা বহুরূপ তারা ব্যবহার করিয়া থাকি।

এস্ এস্ অরিগী; ইহার উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ দশম বা একাদশ শ্রেণীর, ক্ষীণতম জ্যোতিঃ পঞ্চদশ বা ষোড়শ শ্রেণীর। ইউ জেমিনোর; ইহার উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ নবম বা দশম শ্রেণীর, ক্ষীণতম জ্যোতিঃ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শ্রেণীর। এস্ এস্ ছিগ্নী; ইহার উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ অষ্টম বা নবম শ্রেণীর, ক্ষীণতম জ্যোতিঃ একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণীর। ইহারা দীর্ঘ কাল অর্থাৎ একমাস হইতে তিন মাস পর্যন্ত, কখন কখন ৬।৭ মাস পর্যন্ত ক্ষীণ অবস্থায় অদৃশ্য থাকে। হঠাৎ একদিনে অথবা কখনও কখনও ৩।৪ দিনের মধ্যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়, এবং ৩।৪ দিন হইতে ১২।১৪ দিন পর্যন্ত উজ্জ্বল অবস্থায় থাকিয়া একদিন বা ৩।৪ দিনের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যায়।

এস্ ইউ টৌরী; ইহার উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ নবম শ্রেণীর, ক্ষীণতম জ্যোতিঃ ষোড়শ শ্রেণীর।

আর কর্ বোর্; উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ ষষ্ঠ শ্রেণীর, ক্ষীণতম জ্যোতিঃ পঞ্চদশ শ্রেণীর।

ইহারা দীর্ঘকাল অর্থাৎ ২।৩ বৎসর হইতে ১০।১২ বৎসর পর্যন্ত সমান উজ্জ্বলতম জ্যোতিতে বিদ্যমান থাকে, দিনের পর দিন উহাদিগকে পর্যবেক্ষণ করা যাইতেছে; কিছুমাত্র পরিবর্তন নাই অথবা হয়ত যৎকিঞ্চিৎ হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। অকস্মাৎ একদিন দেখা গেল উহাদের জ্যোতিঃ হ্রাস পাইতেছে, পরে ৩।৪ দিন কখনও বা ১০।১২ দিনের মধ্যে ক্ষীণতম জ্যোতিতে অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং ৪।৫ মাস হইতে বৎসরাধিক কাল অদৃশ্য থাকিয়া পুনঃ উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়। এই দুই শ্রেণীর বহুরূপ তারা কোনও নিয়মের বাধ্য নয়, সদা উচ্ছৃঙ্খল। মীরা; ইহার উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শ্রেণীর, ক্ষীণতম জ্যোতিঃ অষ্টম হইতে দশম শ্রেণীর। ৩৩১ দিনে একবার ইহার জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। হয়ত কখনও কখনও ২০।২২ দিনের এদিক্ ওদিক্ হয়। তবুও ইহারা কতকটা নিয়ম মানিয়া চলে।

এই সকল তারা কেন এবংবিধ বিচিত্র রূপ ধারণ করে, কেনই বা কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল, কেনই বা কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলে; প্রতিবারে কেন একই প্রকার উজ্জ্বলতা, তাহা উজ্জ্বলতম জ্যোতিতেই হউক বা ক্ষীণতম

জ্যোতিতেই হউক, প্রাপ্ত হয় না; ইহাদের স্বরূপ কি, এই সকল তত্ত্ব অধিকারের জন্য ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মাত্র সাতজন সদস্য লইয়া আমেরিকার হারভার্ড মানমন্দিরে American Association of Variable Star Observers নামে একটি সমিতি স্থাপনা হয়। বর্তমানে উহার শতাধিক পর্যবেক্ষক সারা জগতে ছড়াইয়া আছে। অধম লেখকও একজন সদস্য। উদ্দেশ্য এক স্থানে মেঘ হইলে অন্য স্থানে তারা দেখা চলিবে। এক স্থানে দিন হইলে অন্য স্থানে রাত্রে তারা দেখা চলিবে। এই প্রকারে প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় ঐ সকল তারার পর্যবেক্ষণ-ফল গ্রহণ করিয়া প্রতি মাসে কেন্দ্র সমিতিতে পাঠান হয়। সেখানে ইহাদের সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তাহার ফল পত্রিকা, বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রভৃতিতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। পরবর্তীকালে হারভার্ড ব্যতীত আরও নানা স্থানে এই শ্রেণীর সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

কাজ কি মা আর হেথায় এসে

শ্রীবলাইচাঁদ আঢ্য

(মাগো মা) মনে এই কি ছিল অবশেষে
কোথাও কি আর ঠাঁই ছিল না (তাই) মরতে এলি বাংলা দেশে॥

ধর্মহীন আর লক্ষ্মীছাড়া,
বিলাস-ব্যসন-মত্ত তারা,
(শিখে) বিদেশী চাল সর্বনেশে॥
(তোর) লাগে না কি পাষাণ-বুকে,
বল মা শিবে সে কোন দুখে
সন্তান তোর সহায়-হারা
কাল-সাগরে যায় মা ভেসে॥
মিছে ধরিস "কল্যাণী" নাম
হলি যদি সন্তানে বাম,
ফিরে যা মা, যেথায় ছিলি,
কাজ কি তোর আর হেথায় এসে,
রঙ্গ কেন বঙ্গদেশের
শ্মশানে রাজরাণীর বেশে॥

প্রমীলা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

রাণী চিত্রাঙ্গদার কক্ষসংলগ্ন অলিন্দ

[তখন সাগরের নীল বারিরাশি ভেদ করিয়া তরুণ অরুণের রক্তিম আলোকচ্ছটা সমস্ত পূর্ব দিক্‌চক্রবালকে রাঙাইয়া তুলিয়াছিল। রাণী চিত্রাঙ্গদা এক দৃষ্টে দিগন্ত-চুম্বিত সাগরের দিকে চাহিয়াছিলেন; মুক্তাফলসদৃশ দুই এক বিন্দু অশ্রু তাঁহার আঁখিপাশ হইতে নির্গত হইয়া গণ্ডোদেশে আসিয়া দুলিতেছিল, এমন সময় রক্ষোরাজ রাবণ ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন]

রাবণ। চিত্রা!
একি,—চোখে জল!
বীরমাতা,

কেন ভাবান্তর !

চিত্রা। মহারাজ !

ছুটে গেল উন্মাদ বালক,—

মানিল না মানা।

বাঞ্ছা তার—

রামচন্দ্র সনে রণ।

স্নেহের পুতুলি মোর !

ব্যথা পায় কুসুম-শয়ানে !

রাবণ। রাণি !

ক্ষোভ নাহি কর !

অতি শুভদিন উদয় তোমার !

সুবিশাল রাক্ষস-বাহিনী,

ফেরে আজি—

পুত্রের ইঙ্গিতে তব।

কোন্ বীরমাতা—

নাহি চাহে তনয়ের এহেন গৌরব !

বলবান অরি,

আক্রমিছে পুরী

রহিবে শয়ান এবে, কুসুম-শয্যায় !

কিম্বা লুক্কায়িত রবে রমণী অঞ্চলে !

রাক্ষস-জীবন, নহে বিলাস-ব্যসন !

চিত্রা। সত্য রাজা !

রাক্ষস-জীবন নহে বিলাস-ব্যসন !

দেশরক্ষা, দুঃখার্ত্তের অশ্রু বিমোচনে

কিম্বা পর সহ বাদে, সতত উৎসর্গীকৃত।

কিন্তু রাজা !

দায়ী তুমি এ যুদ্ধের তরে।

স্বেচ্ছায় এনেছ ডাকি, এ মহা আহবে !

সহস্র রমণী মোরা—

সেবিতাম চরণ তোমার।

সাধ তাহে মিটিল না তব।

সরলা কামিনী,—

পতিব্রতা স্বামি-সোহাগিনী,

বলে ধরি আনিয়াছ হরি,—

ইন্ধন যোগাতে তব জঘন্য লালসানলে।

প্রবৃত্তির দাস !

হের,—

সতী রমণীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে,

প্রপীড়িত লঙ্কাবাসী আজি,

শ্বাসহীন সমীরণ !

পক্ষিকুল ভুলেছে কূজন !

পত্নী পতিহারা, মাতা পুত্রহারা,

ভগ্নী ভ্রাতৃহারা—

মহামারী, অন্নাভাব

রাজ্যের পঞ্জর ভেদি,

উঠিছে সহস্র কণ্ঠে দীর্ণ হাহাকারে !

রাজা—রাজা !

এখনো সময় আছে,

ফিরে দাও সীতা !

রাবণ। সীতা—সীতা—সীতা !

মধুর কিন্নর-কণ্ঠে গাহ শুধু—

সীতা—সীতা—সীতা ;

নাহি কহ ফিরে দিতে।

ওই ত্রিভুবন-আলোকরা রূপে,—

জান না কি চেতনা-বিহ্বল দশানন !

সীতা—সীতা !

কারে দেবো ফিরাইয়া সীতা !

সীতা নাহি শোভে জটিল তপস্বি-বামে,

নাহি শোভে, অযোধ্যার জীর্ণ সিংহাসনে,—

নাহি শোভে,

কণ্টক-আকীর্ণ ঘন পঞ্চবটী বনে ;—

পর্ণপত্র-ঘেরা সীমাবদ্ধ কুটীর মাঝারে ;—

সীতা শোভে শুধু রাবণের কনক-লঙ্কায়

পুষ্পিত অশোক বনে,—

উন্মুক্ত উদার আকাশের শ্যামাঞ্চলতলে !

সীতা—সীতা !

একি তুমি সেই দশানন !
প্রথম যৌবনে আঁখিপাশে হেরিছিনু যারে !
সমুন্নত শির, বিস্তৃত ললাট
পীনবক্ষ বীরত্ব আঁধার
আজানুলম্বিত বাহু দৃঢ়তাব্যঞ্জক !
সত্যাশ্রয়ী, বীরচূড়ামণি !
রাজা !
যে দুই সবল হাতে, নিয়ত মুছাতে
দুঃখার্ত্তের নয়নের বারি
সেই হাতে কেমন হরিলে পরনারী !

রাবণ। পরনারী—পরনারী !
অতি তীব্র রূপের ঝলকে
দেছে মোর হৃদয় বিদারি,
চাহি সীতা—হ'ক পরনারী।

চিত্রা। সামান্যা মানবীরূপে—

রাবণ। সামান্যা মানবীরূপে,
মুগ্ধ মোর বিংশতি লোচন।
অফুরন্ত রূপের ভাণ্ডার !
এতরূপ দেখিনি কখনো !
রজতভূধর বিরূপাক্ষ পাশে
দেখেছি শিবানী,—
ততরূপ দেখিনি সেখানে !
দেখেছি ইন্দ্রাণী,—
সহস্র লোচন মুগ্ধ যাঁর রূপের প্রভায়।
সেও তুচ্ছ সীতার নিকট।
জানকীর রূপসিন্ধু, উছলি উঠিয়া,—
তিনলোকে তুলেছে প্লাবন—
সেইরূপ—সেইরূপ !
যে রূপের লাগি,'
একদিন ক্ষীরোদ-সাগরে অনন্ত-শয্যায়,
ধ্যানমগ্ন ছিল নারায়ণ !
নাভিপদ্মে তাঁর,—
যুগ যুগ ধরি, ব্রহ্মা বসি করেছিল স্তব !
আদি যোগী মহেশ্বর,—
যে রূপের লাগি, শ্মশানে মশানে ফিরে
চিতাভস্ম মাখি,—
সীতার মানবী দেহে,
অবিরাম ক্ষরিত সে রূপ।
না—না—না—
কহ অন্য কথা।
ফিরে নাহি দেবো সীতা !

চিত্রা। রাজা—রাজা !
ওই তীব্র রূপের আগুনে,—
ভস্মীভূত হ'বে রাজ্য,—রাজসিংহাসন।
দশদিক্ চুম্বিয়া পড়িবে দশানন !
স্বর্ণপ্রসবিনী স্বর্ণলঙ্কা ধাম,
হ'বে শবদাহ স্থান !
ফিরে দাও সীতা !

রাবণ। ফিরে দেবো সীতা !
গন্ধর্বীর রূপমুগ্ধ হয়ে,
বসন-অঞ্চলে রব বাঁধা !
হাঃ হাঃ হাঃ !

চিত্রা। লম্পট রাজন !
গন্ধর্বীর রূপ বুঝি লেগেছিল ভাল
প্রথম যৌবনে !
তাই বুঝি সকাতরে সাশ্রুনেত্রে
করেছিলে প্রেম নিবেদন !
মিটেছে পিয়াসা
টুটে গেছে যৌবনের নেশা,
ছিন্ন পাদুকার সম,—
তাই চাহ ফেলে দিতে দূরে !
বেশ তাই হো'ক
ক্ষোভ নাহি তাহে'!
কিন্তু শোন দর্পী রক্ষোরাজ !
নারী হ'য়ে নারীর লাঞ্ছনা সহিব না কভু।
বিদ্রোহিনী আজি হ'তে রাণী চিত্রাঙ্গদা।
রণচণ্ডীরূপে,—
মুক্তি আজি দেবো জানকীরে।

রাবণ। যাও—যাও—দাম্ভিকা রমণী !
শিশুর দুর্ব্বল হস্তে,—
রাজ্য রক্ষা করেনা রাবণ,
বিদ্রোহীর সাজা দিতে জানে।
[চিত্রাঙ্গদার প্রস্থান]
গন্ধর্ব-নন্দিনী !
সেও গেল দলিয়া চরণে !
ওঃ অদৃষ্টের কিবা পরিহাস !
[মন্দোদরীর প্রবেশ]
মন্দোদরি—মন্দোদরি !
ঘৃণা কর—ঘৃণা কর মোরে ?

মন্দোদরী। একি প্রশ্ন নাথ !

রাবণ। করিয়াছি জানকী হরণ।
সহোদরে বিনাদোষে দিছি নির্বাসন।
মোর কর্মফলে,—
বলবান্ অরি,
আক্রমণ করিয়াছে পুরী,
পুত্র পৌত্র ভ্রাতা,
একে একে করিতেছে ধরণী শয়ন।
শত শত রক্ষোবধূ,—
কাঁদিতেছে দীর্ণ হাহাকারে !
প্রজাপুঞ্জ মরিতেছে অনাহারে—!
তবু তুমি করিবেনা ঘৃণা ?

মন্দোদরী। না—না—না
তবু আমি করিবনা ঘৃণা
মহারাজ !
পুত্র পৌত্র—
তোমা হ'তে করিয়াছি লাভ।
তব কার্যে দিছি বিসর্জন।
খেদ কিবা তাহে ?
করিয়াছ জানকী হরণ,—
সহোদরে দেছ নির্ব্বাসন ;—
তব কার্য তুমি জান ভাল।
নারী আমি—
কিবা প্রয়োজন মোর—
বৃথা তব কার্য চর্চা করি।

রাবণ। মন্দোদরি !

মন্দোদরী। তুমি স্বামী !
ইষ্টদেব মোর !
আমার জীবন মন দেহ
সমর্পিত চরণে তোমার ;
যখন যে ভাবে রাখিবে আমারে
সেই ভাবে নিরবধি রব।
বাক্য তব,—যত গুরুতর,
নতশিরে সতত পালিব।

রাবণ। মন্দোদরী—মন্দোদরী !

মন্দোদরী। তুষ্ট যদি মোর প্রতি,—
ওগো সুর-অরি !
কহ কৃপা করি—
ভালবাস সীতা ?

রাবণ। সীতা—সীতা—
মানবী রূপেতে চিরারাধ্য দেবী মোর !
মন্দোদরী !
দেখ নাই সীতা ?

মন্দোদরী। না—মহারাজ !

রাবণ। দেখ যেয়ে একদিন অশোক-কাননে।
পুষ্পিত বিটপী-মূল,—
আলোকরি বসি আছে সীতা
আঁখিযুগ হতে,—
রূপের প্রবাহ ঝরে।
মন্দোদরী—মন্দোদরী—
সৌন্দর্যের খনি স্বর্ণলঙ্কা
থেকে যেত অসম্পূর্ণা—
সীতার উদয় যদি নাহি হ'ত অশোক-কাননে।
সীতা— সীতা—

মন্দোদরী। নাথ !
এত তুমি ভালবাস সীতা ?

কিন্তু কই,—
সীতা নাহি চাহে ফিরে !

রাবণ। সত্য মন্দোদরী !
অপরূপ রমণীহৃদয় !
জনকতনয়া রামগতপ্রাণা,
তুচ্ছ করে বিলাস-বৈভব মোর !

মন্দোদরী। নাথ !
কামচারী তুমি
রামরূপ মায়াবলে করিয়া ধারণ
আলিঙ্গন কর জানকীরে !

রাবণ। অসম্ভব প্রিয়ে,
যবে চিন্তা করি নবদূর্ব্বাদল রামরূপ,—
টুটে যায় নিখিল বাসনা মোর।
তুচ্ছ ভাবি ব্রহ্মপদ,—
তুচ্ছাদপি তুচ্ছ প্রিয়ে রমণীর দেহ।

মন্দোদরী। নাথ !
তবে, কেমনে পূরিবে আশা তব ?

রাবণ। আশা পূরিয়াছে সেই দিন,—
যেইদিন রঘুকুললক্ষ্মী আনিয়াছি ঘরে।
জনকনন্দিনী—
সতীশিরোমণি—
হেরিলে তাহাকে,—
কাম লজ্জা পায়,—
ইচ্ছা হয় চরণে লুটাই।

মন্দোদরী। নাথ !
তবে কেন আনিয়াছ সীতা !

রাবণ। কুলনারী অপমান—
করেছিল অযোধ্যার রাজা !
তাই প্রতিবিধিৎসিতে
আনিয়াছি হরি তার নারী !

[প্রস্থান]

মন্দোদরী। জয় ভগবান !
হল আজ সন্দেহ ভঞ্জন। [প্রস্থান]

ক্রমশঃ

সেদিন তুমি একা

শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ

আকাশ-ছোঁয়া বনের ধারে
শিশির-ধোয়া মাঠের পারে
তোমায় আমায় দেখা—
সেদিন তুমি একা।
তোমার গোপন অভিসারে
খুঁজেছ কোন্ অজানারে ;
কাঁপন-লাগা নদীর জলে
স্বপন-ভাঙা গগন-তলে
তোমায় আমায় দেখা—
সেদিন তুমি একা।

আমার মনের একতারা যে
আপনহারা উঠলো বেজে
ব্যথা হোল দূর ;
কাঁপিয়ে রেণু বনের বেণু
ঢেলে দিল সুর।
আমার ভরলো হৃদিপুর।
সেদিন প্রিয় সেই বিজনে
সকলহারা এই দুজনে
প্রথম্ হোল দেখা—
সেদিন তুমি একা।

অকেজো

শ্রীযতীন্দ্রনাথ আঢ্য বিদ্যানিধি, সাহিত্যপুরাণরত্ন

হাসপাতালের দাতার দয়ার দানের একখানি পাতলা সাড়ীতে কোনকরমে অতিকষ্টে সরম-সঙ্কোচে আপনাকে অযথা আবৃত করবার বারবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে অনসূয়া যখন হাসপাতালের ফটকের বাইরে এসে দাঁড়ালে তখনও বেলা বেশী হয়নি। পথ বেয়ে কোলাহলমুখর নগরের নানাশ্রেণীর নানাপ্রকার লোকের সমারোহ চলেছে। যে যার আপন কর্মে উন্মত্ত। কে কার দিকে ফিরে তাকায়। একটি অভাগিনী নারী যে আশ্রয়হীন ভাবে সজল চোখে আজ উদরান্নের জন্য সংসারের দ্বারে এসে আকুল ভাবে দাঁড়ালে, তারজন্য তো কই কারও কিছু এসে যায়না। অথচ এই অনসূয়ার রূপ, ভাগ্য ও দয়াদাক্ষিণ্যের প্রশংসায় একদিন এই সংসারের ঈর্ষাপীড়িতের দলের আগ্রহের সীমা ছিল না। প্রবল পাণ্ডিত্যের প্রভাবে দারুণ দুঃখদুর্ভাগ্যকে জয় করে পণ্ডিতশিরোমনি সদানন্দ পীতাম্বর সার্বভৌম তাঁর এই পালিত কন্যাটিকে এমন শিক্ষা ও স্নেহের মধ্য দিয়ে সংগঠন করে তুলেছিলেন যে, বাস্তবিকই একান্ত অনাথা হলেও এই অনসূয়াকে আপনার সংসারে পেতে অনেক দিন হতেই অনেকের প্রচুর আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল। বানপ্রস্থের পথিক সার্বভৌম মহাশয়ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর নারীবর্জিত আশ্রম হতে কি প্রকারে, কেমন করে কোন উপযুক্ত পাত্রের হাতে অনসূয়াকে সমর্পণ করে তিনি নিশ্চিন্তে তীর্থযাত্রায় গমন করতে সক্ষম হবেন। পাত্র এসেছিল অনেক সত্যই কিন্তু তাদের মধ্যে একটিও তাঁর মনোমত হয় নি, কাজেই দিন ক্রমশই চলে যাচ্ছিল। এমন সময় একদিন তারানগরের প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর হতে অনসূয়ার আহ্বান এলো। সার্বভৌম মহাশয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারেই অনসূয়াকে প্রেরণ করে, চতুষ্পাঠীতে প্রধানশিষ্য গোবিন্দকিঙ্করকে বসিয়ে, কাশীযাত্রা করলেন। নবোঢ়া বধূবেশে নিরাশ্রয়া অনসূয়া এসে জমিদারগৃহে পুরলক্ষ্মীবেশে প্রবেশ করলে। এই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দের দিন। কিন্তু এ আনন্দ অধিক দিন তার ভাগ্যে সইলনা—অসংখ্য দুঃখ-দৈন্যকে যে আহ্বান করে এই জীবরাজ্যে প্রবেশ করে, সুখের প্রবাহ তাকে শীতল করতে পারে সাধ্য কি? তাই শ্বশুরের স্নেহ, শ্বশ্রূর আদর, স্বামীর প্রাণঢালা প্রীতি—সমস্ত পেয়েও অনসূয়াকে পথের ভিখারিণী সাজতে হল।

খেয়ালী উচ্ছৃঙ্খল জমিদারনন্দনের সহধর্মিণীরূপে অনসূয়া দিন কয়েক যথেষ্ট আনন্দে থাকার পরই স্বামীর প্রীতি-উপহারস্বরূপ সর্বাঙ্গে তার পারদ-বিষের ক্ষত ছড়িয়ে পড়লো। যদিও সকলেই জানত বুঝত এ তার গুণবান্ স্বামীরই দান; তথাপি হয়ত অনেক আগে এই অজ্ঞাত কুলশীলা অবলাকে গ্রহণ করিবার সময় যে সমস্ত সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করা উচিত হত, কিন্তু নিরুপমা অনসূয়ার রূপের প্রভায় তখন আর তাহার আবশ্যক হয় নি, আজ সেই বিষয়সমূহের আলোচনাই অন্তঃপুরে অত্যন্ত বেড়ে উঠ্‌ল। একদিন বাহিরে ধাত্রিযাপী পুত্রকে গৃহবাসী করবার কামনায় শাস্ত্রোক্ত যে প্রাচীন শ্লোক "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" বাড়ুয্যে পরিবারে সানন্দে পালিত হইয়াছিল আজ তার অর্থ বিস্মৃত হয়ে "আত্মান সততং রক্ষেৎ" কথাটাই বেশী ভাবে পালিত হতে লাগলো। অনসূয়া দেবতার অভিশাপস্বরূপ অন্তঃসত্বা, তার উপর বেচারার এই অবস্থা হল!

প্রথম প্রথম জমিদারগৃহে তার কিছু কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা হল বটে, কিন্তু তাতে যখন কোন প্রকার ফল দর্শাল না তখন তার অজানিত পিতৃ-

কুলের অজ্ঞাত দোষকে কল্পনা করে অজস্র কটু ভাষণের সহিত অনসূয়াকে বিদায় জ্ঞাপন করা হল। এখন উপায় কি? তবে কোথায় যায় সে? কোন গাঁয়ের পথ তো জানেনা সে, কাহাকেও তো চেনেনা সে, জগতে যে কেহই নাই তার আর আপনার বলতে। তবে তার আর উপায় কি? কিন্তু সত্যই না—সে আর চিন্তা করতেও পারে না—চক্ষু দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো বেচারার—ইহা ছাড়া আর তার উপায় কি? জমিদার-গৃহের গোযান অন্ধকারের মধ্যে যেখানে তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল বহুপূর্বে, তারই ফটক ঠেলে বাধ্য হয়ে সে সেখানে প্রবেশ করলে। আর আজ আবার সেখান হতেই সে বাহির হয়েছে নিষ্কৃতি পায়ে রোগের জ্বালা থেকে। তথাপি একেবারে নিষ্কৃতি দেন নি ঈশ্বর তাকে—এখন যে তার গর্ভে বোধহয় তারই মত এক ভাগ্যহত বর্তমান। না দুঃখ সে আর করবে না, দুঃখ করিতে পারে না সে—ওযে তার একান্ত সয়ে গেছে। তাই সে ধীরে ধীরে অজানিত পথেই পদক্ষেপ করলে। অসুস্থতায় ক্লান্ত চরণ বেশী দূর তাকে বহন করতে সমর্থ হল না। দেবমন্দিরের সম্মুখে কি একটা পর্বের বেশ একটি মেলা বসেছে। তারই একপাশে এসে একটি গাছের তলায় সে বসে পড়লে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় উদর দূরের কথা ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠছিল। একটি মহিলা জাঁকজমকের সহিত বহু টাকার অলঙ্কার পরে যথেষ্ট পূজা-উপচার বয়ে নিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে চলেছিল।

অনসূয়া তার নিকট হাত পাতলে প্রবল অভাবে। "কিছু দিবে মা?" নাক সিঁটকে সে বল্‌লে—"আঃ মর মাগী দেবতার ভোগ দিতে চলেছি, এ রাক্ষুসী কি বলে গো? না বাপু ছোটলোকদের দায় আর পথ চলা যাবেনা দেখছি।" পূজার্থিনী চলে গেলেন বাক্যহতা হয়ে অনসূয়া বসে রইলে। ওপাশে ওই গাছের তলায় দৃষ্টি পড়ল তার একদল মেয়েরা বনভোজন না কি করছে। সেখানে গিয়া একপাশে সে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়ালে। ইচ্ছা কিছু চায়। কিন্তু তার পূর্বেই একটি বুড়ী তার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কইলে—"ওরে মেয়ের দল সামাল, সামাল ছেলেদের খাবারে ঢাকা দে, এই দেখ কে এক ডাইনী মাগী এসে দাঁড়িয়েছে এখানে। মর মর মাগী এখানে মরতে এলি কোত্থেকে? আর তোদেরও বলি বাপু এখানে এমন ফাঁকা জায়গাতে খাওয়াদাওয়া করবার কি আবশ্যকতা ছিল তোদের শুনি?" সেখানে দাঁড়াতেও অনসূয়ার আর প্রবৃত্তি হল না। কে বলে নারী করুণা-মমতার মূর্তি তবে তাদের এ বেশ কেন? অনসূয়া কোনমতে ক্লান্ত পদে পুকুরের জলে এসে নামলে। অঞ্জলী ভরে যতখানি পারে জল খেলে। কিন্তু খালি পেটে তা সইল না। তার পেট ঘুলিয়ে উঠল, মাথা ঘুরতে লাগলো। বেচারা চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলে। সামনের একটি গাছের তলায় শুয়ে পড়লে। কিছুক্ষণের জন্য তার তন্দ্রাকর্ষণ হল। আবার পরমুহূর্তেই নিদ্রা-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড ক্ষুধা এসে তাকে জ্বালাতন করে তুললে। না আর সে ভাববে না, লজ্জা করবে না, এখন হতে যাকে এইভাবেই পেট ভরাতে হবে তার আবার ভীতি-সঙ্কোচ কি?

কোনমতে একটি ময়রার দোকানের সামনে উপস্থিত হয়ে সে হাত পেতে কিছু চাইলে। রূঢ়ভাবে ময়রা কইলে—"আঃ মর এতখানি গতর থাকতে ভিক্ষা? কেন খেটে খেতে পারিস না? যাঃ যাঃ এখানে ওসব চলবেনা। কারও বাড়ীতে দাসীবৃত্তিও তো করলে পেট চলে।" তাই তো আপনা হইতে অনসূয়ার হাত গুটিয়ে এলো। আজ সে সমস্ত দিন উপবাসী, কিন্তু কই কেউ তো তাকে একথা বলে নি যে গতর খাটিয়ে খা। সত্যই তো তার গতর রয়েছে। তবে সে বাস্তবিক ভিক্ষা করবে কেন? রাত্রির অন্ধকার তখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। যাত্রীরা সব গৃহে ফিরছে। তাদের গল্পগুজবে পথ মুখরিত। পথের পাশে এসে সে দাঁড়ালে। একদল মেয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে তাকে দেখে শিউরে উঠলো কর্কশকণ্ঠে একজন বল্‌লে—"কে লো এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে? কি মতলব বল দেখি?"

আর একজন লোক বললে—"মতলব আবার কি? কিছু হাতাবার চেষ্টাতে আছে বুঝছিস না। দেখ ভাই যে যার গয়নাপত্তর সামলে নিয়ে চল।"

অনসূয়া কইলে ধীরকণ্ঠে—"আমি চোর নই, পেটের জ্বালায় মরছি, সমস্ত দিনটা আজ উপোসে গেছে, আমাকে ঝি রাখবে কেউ ভাই?" মেয়েমহলে একটা প্রবল ব্যঙ্গের হাস্য-তরঙ্গ বইল—"বলে কি গো এ্যাঃ, বেশ রসিক তো এপাশে বলছে খেতে পাই না ঝি রাখবে আর ওপাশে বলছে ভাই। সাবাস কিন্তু।" আর একজন করুণার সুরে বললে—"কেন গো আজকাল তোমাদেরও বাজার মন্দা পড়েছে নাকি?"

হায়রে ঈশ্বর, তবে তার উপায়? গিন্নিগোছের একটি মেয়ে বললে—"পথ ছাড় বাছা ঝি তো আর রাখলেই হয় না। কোনদিন কি হাতিয়ে সরে পড়বে তার ঠিক কি? জানচিন লোক না হলে ঝি রাখা চলে না। তাছাড়া তোমার মত মেয়েকে ঘরে তুলে সোয়ামী পুত্তুরের ঘরে কে বিপদ্ ডেকে নেবে বল?" তারা চলে গেল।

হতাশ হয়ে অনসূয়া সেইখানে বসে পড়লে। তার মনের অবস্থা সেই জানে। এমন সময় আবার একটি প্রবীণার আবির্ভাব। অনসূয়া স্থির করেছিল না খেয়ে মরতে হয় সেও ভাল তবু সে আর কাকেও কিছু বলবে না। মাথা ঘুরছিল। দুর্বলতায় সমস্ত দেহ তালপাকিয়ে উঠছিল। তবুও সেই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে নীরবে সে বসে রইলে।

কিন্তু এবার প্রবীণা স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্তা হয়ে কথা কইলে—"কে মা তুই?" অনসূয়া কেঁদে ফেললে। বৃদ্ধা বললে—"চুপ চুপ কাঁদিসনে আর, কিছু খাসনে বুঝি সমস্ত দিন আজ?"

তারপর একছড়া কলা বের করে তার হাতে দিলে; বললে—"খা এইগুলো খা। যাবি আমার সঙ্গে স্বামীজির রক্ষা-মন্দিরে থাকবি সেখানে কোন কষ্ট হবে না, যাবি?"

ধরা-গলায় অনসূয়া বললে—"কিন্তু কোন পরিচয় যে নেই আমার।"

বৃদ্ধা বললে—"তার আবশ্যক নেই সেখানে; তুই মানুষ, এই তোর সব চেয়ে বড় পরিচয়।"

অনসূয়া বললে—"যাব মা চল স্বামীজির রক্ষা-মন্দির ছাড়া আর আমার গতি নেই।"

স্মৃতি

শ্রীমতী এমেলী দে

দিন যায় ধীরে চলে—
অস্তরবির স্বর্ণ-কিরণ
বিদায়ের ক্ষণে তুলিয়া কাঁপন—
আকাশ-ভালের রক্ত লিখন—
পশিছে সাগরতলে।
আধ নিমিলিত নয়নে
বক্ষে রাখিয়া জোড়া দুটি কর
বসিয়া আরাম কেদারার পর
ভাবি অতীতের শুভক্ষণগুলি
এসেছিল যাহা জীবনে।

সেই কথা জাগে স্মরণে,—
আসিতে যখন ওগো প্রিয়তম,
কৌতুকপ্রিয় বালকের সম,
উছল হাসিতে পশ্চাতে মম
চুপি চুপি চোর-চরণে।
ক্ষণিক নীরব থাকি—
আবেশে ভরিয়া দিবস-স্বপন
হৃদয় আঁধার, মধুর লগন
আঁখি দুটি মোর বাহু আবরণে

শুধাতে হাসিয়া ধীরে—
"বিস্মিত ভয়ে হওনি কি বল
ধরিলাম যবে নয়ন যুগল ?"
আমি বলিতাম—"তোমারি এ ছল
বুঝি নাই তাহা কি রে।"

ব্যাকুল অধর শেষে—
মোর অধরের সুধা-পরশনে
চাহিত ব্যাকুল এমোর বয়ানে
ভরিতাম পরে দোঁহে চুম্বনে
হৃদয়ের ক্ষুধা নেশে।

গৃহের অনলরাশি
জ্বলে জ্বলে শিখা পরাজয় মেনে
কামনা মোদের দুর্জয় জেনে
রুদ্ধ বিবরে জমি স্তূপাকারে
হইত ভস্মরাশি।

এত' নহে আজি স্বপ্ন—
দেখি যেন তোমা' দাঁড়িয়েছ হোথা
হৃদি-ভরা নিয়া ছল-চতুরতা ;
মুখে ঝরে তব ওগো প্রিয়তম
বালকের সম প্রশ্ন !

হাসি কান্না কি সাঙ্গ,
ঝরিবেনা কভু ওই মুখ হ'তে
সুধা-ঝরা বাণী এ শ্রবণ-পথে
বিফলে কেবল বিরহ-অনল
পুড়াবে সকল অঙ্গ ?

চোখে নামে মোর বন্যা,
দেয়ালের গায়ে ছবিটির মত
হায়রে অলীক, কল্পনা শত,
স্মৃতি নিয়া তব মুছি আঁখি মোর
থাকিয়া অনূঢ়া কন্যা !

সাধুর প্রভাব

শ্রীশচীন্দ্রনাথ লাহা

(১)

ভারতের অন্যতম পুণ্যপ্রবাহিণী নর্মদা বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশ বিধৌত করিয়া অসীম সাগর-বক্ষে আত্মবিসর্জন করিতেছে। তাহার উভয় তীরে মর্মর প্রস্তরের পাহাড় বিদ্যমান এবং সেই পাহাড়ের উপরিভাগ শাল, পিয়াল, তমাল, আমলকী, হরিতকী, রসাল প্রভৃতি নানা প্রকার তরু, গুল্ম, লতা দ্বারা সুশোভিত। বহুবিধ বিহঙ্গমের কলকূজনে সেই নীরব বনস্থলী মুখরিত। নদীগর্ভের সন্নিকটস্থ পাহাড়ের অংশে শ্বেত মর্মর প্রস্তরের উপর কৃষ্ণবর্ণ মৌচাকগুলি শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দুর মত শোভা পাইতেছে। মৌচাকের ধারে ধারে বহু বন্য কপোত বাস করে।

নর্মদার পবিত্র সলিলে স্নান করিবার জন্য বহু নরনারী সমাগত হয়। অনেকে তীরে বসিয়া দেব-পূজা, ইষ্ট মন্ত্র জপ প্রভৃতি করিয়া থাকেন। অনেক সংসারে উদাসীন সাধু-সন্ন্যাসী ভগবানের আরাধনার জন্য নর্মদার তীরে বাস করেন। নর্মদা-তীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনকে সতত ভগবানের দিকে লইয়া যায়। সেই জন্য সাধু-সন্ন্যাসীরা এইরূপ স্থানে বাস করিতে ভালবাসেন। কোন কোন সাধু দেবমন্দিরে, কেহ লোকালয়ের বাহিরে পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়া, আবার কেহ গুহায় নির্জনে ভগবৎ-ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন।

সাধু লক্ষ্মণদাস নর্মদা-তীরে লোকালয়ের বাহিরে এক গিরিগুহায় ভগবদারাধনা করিতেন। তিনি প্রথম

কবে এই গুহায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন তাহা কেহ জানে না। তিনি কখনও লোকালয়ে যাইতেন না কিম্বা কখনও কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা করিতেন না। কখনও বৃক্ষের গলিত পত্র কখনও বা নদীর জল—এই তাহার একমাত্র ভোজ্য বস্তু ছিল।

সাধু লক্ষ্মণদাসের এই নিস্পৃহ স্বভাবের কথা ধীরে ধীরে জনসমাজে প্রচারিত হইল; তাহাতে বহু নরনারী সাধুর দর্শন মানসে সাধুর সমীপে উপনীত হইত। অনেকে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ হইত এবং বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিত। যদি কেহ শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিত তাহা হইলে সে তাঁহার প্রভাবে ও বাণীর দ্বারা অশান্ত হৃদয়ে শান্তিলাভ করিত। বহু চিকিৎসকের পরিত্যক্ত দুরারোগ্য রোগী রোগের আরোগ্য কামনায় তাঁহার নিকট গমন করিত। ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে অনেক রোগী রোগের হাত হইতে, কেবল মাত্র, সাধুর পদধূলি মাখিয়া মুক্তি লাভ করিত।

এইরূপে দিন দিন সাধুর যশঃ দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভক্তের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিল! যে সমস্ত ভক্ত তাঁহার নিকট আসিত, তাহারা প্রায়ই নানাবিধ উপহার লইয়া আসিত। কেহ কেহ সুদৃশ্য বস্ত্র, কেহ কেহ বহুমূল্য অলঙ্কার, কেহ কেহ হীরা, মণি, মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ মূল্যবান্ রত্ন, কেহ কেহ রসনা-তৃপ্তিকর বহুবিধ ভোজ বস্তু সাধুর চরণমূলে উপহার দিত। কিন্তু ভোগবিলাসে অনাসক্ত সাধু ভক্তের প্রদত্ত মূল্যবান্ দ্রব্যসামগ্রী স্পর্শও করিতেন না। তাহারা অনাদরে গুহার একপার্শ্বে পুঞ্জীভূত হইতেছিল।

(২)

রামদাস সাধুর আশ্রম হইতে ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত কল্যাণপুর নামক গ্রামে বাস করিত। রামদাস বাল্যকালে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মা সরস্বতীর কৃপা তাহার উপর আদৌ ছিল না। পক্ষান্তরে সে বিদ্যালয়ের বালকদিগের পুস্তক, লেখনী, কাগজ, ছাতা প্রভৃতি নীরবে অপহরণ করিত। তাহার এই তস্করবৃত্তি অবলোকন করিয়াও তাহার পিতা, মাতা কোনরূপ তিরস্কার বা শাসন করিতেন না। ইহাতে তাহার সাহস দিন দিন বাড়িতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সে একজন পাকা চোর হইয়া দাঁড়াইল।

কালে তাহার বাপ-মা পরলোক গমন করিলেন। কিন্তু সে নিজের চৌর্যবৃত্তি পরিহার করিয়া অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিল না। লোকের অজ্ঞাতে সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকিয়া টাকা, পয়সা, কাপড় চোপড়, অলঙ্কার ও অন্যান্য জিনিষ চুরি করিত এবং এইরূপে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিত।

চোর বহু অর্থ চুরি করিলেও তাহার নিত্য অভাব লাগিয়া থাকে। সুতরাং চোরকে নিত্যই চুরি করিতে হয়। অসৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থ অসৎ পথে ব্যয় হইয়া যায়।

রামদাসও অভাবের তাড়নায় আজ এবাড়ী, কাল সেবাড়ী, পরশু অন্যগ্রাম, তৎপর দিন দূরবর্তী সহরে চুরি করিয়া বেড়াইত।

একদিন রামদাস শুনিতে পাইল যে, নর্মদাতীরে একজন সাধু বাস করেন। তাঁহার গুহায় ভক্তের প্রদত্ত বহু মণি, মুক্তা, হীরা, জহরৎ, মোহর, টাকা, গিনি, শাল ও অন্যান্য মূল্যবান বস্ত্র স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই কথা শুনিয়া রামদাসের মনে হইল যদি সে কোন প্রকারে সাধুর সেই অর্থ, রত্ন এবং বস্ত্রাদি অপহরণ করিতে পারে, তাহা হইলে সে এক জন বড় লোক হইতে পারিবে এবং তাহাকে আর কখনও চুরি করিতে হইবে না।

মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া এক নীরব সন্ধ্যায় স্বীয় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া রামদাস সাধুর গুহাভিমুখে যাত্রা করিল।

(৩)

রাত্রি প্রথম প্রহর অবসিত হইবার পূর্বেই রামদাস সাধুর গুহার দ্বারে উপস্থিত হইল এবং দেখিল জটাজুটধারী বিভূতিভূষিতাঙ্গ সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসী অজিনাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে কয়েকজন ভগবদ্ভক্ত উপদেশ-শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তি সমাসীন। রামদাসও গুহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করতঃ সাধুর উপদেশ

শুনিতে লাগিল। কিন্তু রামদাসের মন সাধুর উপদেশের দিকে ছিল না; সে গুহার চারিধারে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, যাহাতে সাধুর সঞ্চিত ঐশ্বর্য কোথায় রহিয়াছে তাহা দেখিতে পায়।

রামদাস দেখিল হীরা, মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান্ বসন-ভূষণ, বিবিধ অলঙ্কার ও অপরিমিত রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যদ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া রামদাসের মন চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র-বক্ষের মত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রামদাস ভাবিল—সাধুর এই ঐশ্বর্য সে কোন রকমে আত্মসাৎ করিতে পারিলে তাহার আর কোন অভাব থাকিবে না। সুতরাং রামদাস সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

যামঘোষের বিকট চীৎকার রাত্রির প্রথম প্রহরের অবসান ঘোষণা করিল। সঙ্গে সঙ্গে সমাগত জনমণ্ডলী সাধুকে যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং নিজ নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। রামদাসও লোকগুলির সঙ্গে গুহার বাহিরে আসিল কিন্তু সে বাড়ী গেল না। সে গুহার অদূরে আত্মগোপন করিয়া রহিল এবং প্রতীক্ষা করিয়া রহিল কখন সাধু গুহা হইতে বাহির হয়।

রাত্রি দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রহরও অতিক্রান্ত হইয়া গেল কিন্তু সাধুকে বাহিরে আসিতে দেখা গেল না। অগত্যা রামদাস ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। আরও তিন চারিদিন রামদাস ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিল। অবশেষে একদা তাহার অভীষ্ট পূরণের সুযোগ উপস্থিত হইল।

ঊষার রক্তিম রাগ তখনও পূর্ব গগনে ফুটিয়া উঠে নাই। নিশাচর পক্ষিকুল খাদ্যান্বেষণ পরিহার করিয়া তখনও কুলায় ফিরিয়া যায় নাই। সেই সময়ে হঠাৎ রামদাস দেখিল সাধু গুহা হইতে বহির্গত হইয়া নর্মদার দিকে যাইতেছেন। আনন্দে রামদাসের বুক স্পন্দিত হইল। রামদাস দেখিল, যে সুযোগের জন্য সে এতকাল অপেক্ষা করিতেছিল আজ সেই সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। আজ যদি সেই সুযোগ হেলায় চলিয়া যায় তাহা হইলে এই জীবনে সেই সুযোগ নাও আসিতে পারে, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া রামদাস গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল।

গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রামদাস কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কি কি জিনিষ সে লইবে, প্রথমেই বা কোন জিনিষে হাত দিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। পরিশেষে স্থির করিল—প্রথমে খাদ্য দ্রব্যের কিছু গলাধঃকরণ করিয়া গুহার সমস্ত ধনরত্ন এবং মূল্যবান্ বস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা একটি পুঁটলি বাঁধিয়া সাধু আসিবার পূর্বেই প্রস্থান করিবে—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রামদাস কার্যে প্রবৃত্ত হইল।

সমস্ত জিনিষ পুঁটলি বাঁধিয়া রামদাস যখন গুহার বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল তখন দেখিল গুহার ১০।১২ হাত দূরে সাধু আসিতেছে। সাধুকে আসিতে দেখিয়া রামদাস ভাবিল—যদি এখন সে পুঁটলি লইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে তবে নিশ্চয় সাধু তাহাকে দেখিতে পাইবেন। সুতরাং সে পুঁটলি ফেলিয়া পলায়ন করাই সঙ্গত মনে করিল এবং তদনুসারে গুহা হইতে দৌড়াইয়া বাহির হইল।

ইত্যবসরে সাধু গুহার দ্বারে উপনীত হইলেন। তিনি গুহার সম্মুখে রামদাসের বাঁধা পুঁটলি দেখিয়া তাহা স্বীয় মস্তকে তুলিয়া লইলেন এবং রামদাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন—"ওহে তোমার পুঁটলি নিয়ে যাও।"

সাধু যতই "পুঁটলি নিয়ে যাও" বলিয়া চীৎকার করেন, রামদাস ততই ছুটিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সাধুও দৌড়াইতে থাকেন।

তখন দিনের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজপথে লোকজনের চলাচল সুরু হইয়াছে। পথগামী লোকেরা রামদাস ও সাধুকে তদবস্থায় ছুটিতে দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিল এবং তাহারাও সাধুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে চলিতে চলিতে রামদাস নিজের গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রামদাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাধুও

অনুসরণকারী জনতা রামদাসের সম্মুখে উপনীত হইল। সাধু স্বীয় মস্তক হইতে পুঁটলি নামাইয়া বলিলেন—"বাবা তোমার পুঁটলিটি নিজে না নিয়ে কেন আমার জন্য রেখে এলে? আমি বুড়ো মানুষ—আমি কি তোমার পিছনে পিছনে এত ছুটতে পারি? এই নাও তোমার পুঁটলি।"

সাধুর এই কথা শুনিয়া রামদাসের মনে নবীন ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইল। রামদাস ভাবিল—ইনি এমন কি ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছেন যাহাতে আমি যে ধন-রত্নের জন্য চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি তাহা তুচ্ছ ধূলিমুষ্টির মত পরিত্যাগ করিতেছেন। আমি নিত্য অভাবগ্রস্ত অথচ ইঁহার কোনই অভাব নাই। আমিও যদি ইঁহার মত হইতে পারি তবে আমারও কোন অভাব থাকিবে না।

এই ভাবিয়া রামদাস সাধুর পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া বলিল,—"প্রভু আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার এ ধনরত্ন চুরি করতে গিয়েছিলাম।"

সাধু বলিলেন,—"এত তোমার জিনিষ আমার নিকট এতদিন গচ্ছিত ছিল। তোমার জিনিষ তুমি ফিরিয়ে নেবে তাতে দোষ কি?"

সাধুর এই কথা শুনিয়া রামদাস আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং নিজের কৃতকার্যের জন্য জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল ও ধূলায় গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল।

সাধু তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া সান্ত্বনা দান করিলেন। সাধুর প্রদত্ত ধনরত্নে রামদাসের আর্থিক অভাব দূরীভূত হইল এবং সাধুর প্রভাবে কালে রামদাস অন্যতম সাধুরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। আজও নর্মদা-খণ্ডের লোকের মুখে মুখে রামদাসের বিচিত্র জীবন কথা শুনিতে পাওয়া যায়।*

তুলসী সপ্তশতিকা

শ্রীরামচরণ দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৭৪)

তুলসী যমগণ বোধ বিন কহু কিসি মিটে কলেশ।
তাতে সতগুরু শরণ গহু যাতে পদ উপদেশ॥
যম, গণ বোধ বিনা তুলসীর
কহ কি প্রকারে ক্লেশ যাবে;
লও সদ্গুরু- শরণ যতনে,
তবে তাঁর উপদেশ পাবে।

(৭৫)

ভগণ জগণ কাসে করসি রাম অপর নহি কোয়।
তুলসিপতি পহিচান বিন কোউ তুল কবহুঁ ন হোয়॥
কার সনে কর পিরীতি-বিরোধ
রাম ভিন্ন আর কে আছে আন;
সমতা কি কেহ পায় হে কখন
তুলসী-পতিরে হয়ে অজান।

(৭৬)

তুলসী তগণ বিহীন নর সদা নগণ কে বীচ।
তিনহি যগণ কৈসে লহৈ পরে সগণ কে বীচ॥
বিরাগবিহীন নরগণ সদা
সুখের মাঝারে বিরাজ করে;
কিসে বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবে তাহার
মরণ যে এসে ঘিরেছে তারে।

(৭৭)

ইন্দ্ররমণী স্থর দেবঋষি রুকুমিনী-পতি শুভ জান।
ভোজন দুহিতা কাক অলি আনন্দ অশুভ সমান ॥

ম ন ভ য চারি- গণ শুভ হয়
দেব, ভূমি, শেষ, শশী, বরুণ ;
র স ত জ গণ সতত অশুভ
দেব, সূর্য, অগ্নি, সমর, নিপুণ।

(৭৮)

কো হিত? সন্ত; অহিত ? কুটিল; নাশককো হিত? লোভ।
পোষক তোষক দুঃখদ অরি শোষক তুলসী ক্ষোভ ॥

কেবা হিত ? সাধু ; অহিত কুটিল ;
হিতনাশা লোভ ; পোষে সন্তোষ ;
কে দুঃখদ ? অরি ; বলিছে তুলসী
ক্ষোভে হয় দেহ-মনের শোষ।

(৭৯)

সদা ন গণ পদ প্রীতি যেহি জাস্থ ম গণ সমতাহি।
য গণ তাহি জয় যুত রহত তুলসী সংশয় কহি ॥

কবিতা প্রথমে ন কিম্বা মগণ
বসাইবে জানি উভয়ে প্রীতি ;
তাহাদের পরে যগণ থাকিলে
জয় যুক্ত হয় কবিতা-রীতি।

(৮০)

ভ গণ ভক্তি কর ভরম তজি ত গণ স গণ বিধি হোয়।
স গণ স্থভাগ্য সমুঝি তজো তজেন দূষণ কোয়॥

ভক্তিদ ভ গণ সংশয় ত্যজিয়া
ন, ব, য, ভ গণে কর গ্রহণ ;
ত, জ, র স গণ অশুভদায়ক
অতএব ত্যাগে নাহি দূষণ।

(৮১)

শৃঙ্গজ অশন সংযুক্ত যু বিহরত তীর সুধীর।
যজ্ঞ পাপময় ত্রাণপদ রাজত শ্রীরঘুবীর ॥

সরযূর তীরে বিচরেণ প্রভু
সুধীর গম্ভীর শ্রীরঘুবীর ;
পাদপদ্মে শোভে মখমলময়
পাদত্রাণ-যুগ কিবা রুচির।

(৮২)

বাণ সযুত, যুতট নিকট বিহরত রাম সুজান।
তুলসী কর কমলব ললিত লসত শরাসন বাণ ॥

সরযূ-নদীর তট সন্নিকটে
বিহরেণ প্রভু রাম সুজান ;
কহিছে তুলসী শ্রীকরকমলে
কিবা শোভা পায় ধনুকবাণ।

(৮৩)

মৃদু মেচক শিররুহ রুচির শিশ ত্রিলক ভ্রুবঙ্ক।
ধনুশর গহি যন্থ তড়িত যুত তুলসী লসত মরঙ্ক ॥

মৃদু কৃষ্ণোজ্জল, শিরোরুহ-শ্রেণী
বঙ্কিম ভ্রুমাঝে তিলক-সাজে ;
ধনুশর সহ তড়িত ভাসিত
যেন পূর্ণ দ্বিজরাজ বিরাজে।

(৮৪)

হংস কমল বীচ বরণ যুগ তুলসী অতি প্রিয় যাহিঁ।
তিনি লোক মহঁ যোভজে লহে তাসু ফল তাহিঁ ॥

মরাল, কমল মধ্য দুইবর্ণ
কহিছে তুলসী প্রিয় যাহার ;
তিন লোকে যত ভজনের রীতি
তাতে সব ফল লাভ তাহার।

(৮৫)

আদি মহৈ অন্তহুঁ মহৈ মধ্য রহৈ সো জান।
অন জানে জড় জীব সব সমুঝৈ সন্ত সুজান ॥

সৎসঙ্গ করি শ্রীরামনামের
কহিছে তুলসী মরম জান ;
যেজন না জানে সেই জড়জীব ;
যে বুঝে সে জন সন্ত সুজান।

(৮৬)

আদি দ হৈ মধ্যে রহৈ অন্ত দ হৈ সো বাত।
রামবিমুখকে হোত হৈ রাম ভজনতে যাত ॥

শ্রীরামবিমুখ মানব-হৃদয়ে
অবিরত কত ব্যথা উদয় ;
অবিরাম রাম ভজন যে করে
সর্ব ব্যথা তার বিনাশ হয়।

(৮৭)

ললিত চরণ কটি কর ললিত লসত ললিত বনমাল।
ললিত চিবুক দ্বিজ অধর সহ লোচন ললিত বিশাল॥

ললিত চরণ সুললিত কটি
সুললিত বনমালা বিরাজে ;
ললিত চিবুক দন্ত অধরৌষ্ঠ
ললিত বিশাল লোচন সাজে।

(৮৮)

ভরণ হরণ অব্যয় কমল সহিত বিকল্প বিচার।
কহ তুলসী মতি অনুহরত দোহা অর্থ অপার॥

সংযোগ বিয়োগ অব্যয় বিকল্প
বিশেষ করিয়া করিলে বিচার,
দোহার্থ অসীম কহিছে তুলসী
বুধ মনে নিজ মতি অনুসার।

(৮৯)

বশিষ্ঠাদি লঙ্কারসহ সঙ্কেতাদি সুরীত।
কহে বহুরি আগে কহব সমুঝব সুমতি বিনীত॥

সাহিত্য-বিদ্যায় বশিষ্ঠালঙ্কার
ভেদে সঙ্কেতাদি যত সুরীতি ;
বলিলাম আরও কব অতঃপর
বুঝিবেক নীতিমান্ সুমতি।

(৯০)

কোষ অলঙ্কৃত সন্ধিগতি মৈত্রী বরণ বিচার।
হরণ ভরণ সুবিভক্তিবল কবিহি অর্থ নিরধার॥

কোষ অলঙ্কার সন্ধি মৈত্রী বর্ণে
আগম নিগম বিভক্তি বল ;—
এই সকলের আশ্রয় লইয়া
কবিগণ ভাব প্রকাশে কেবল।

(৯১)

দেশকাল করতা করম বুধি বিদ্যা গতিহীন।
তে সুরতরুতর দারদী সুরসরী তীর মলিন॥

দেশ, কাল, কর্তা, কর্ম, বুদ্ধি, বিদ্যা—
এসব বিষয়ে গতিহীন যে ;
কল্পতরুতলে থাকিয়া দরিদ্র ;

(৯২)

দেশকাল গতিহীন যে করতা করম সজ্ঞান।
তেপি অর্থমগ পগ ধরহি তুলসী শ্বান সমান॥

দেশকাল বোধ হীন যেই জন
কর্তা কর্ম জ্ঞান নাহি যাহার ;
কহিছে তুলসী তার কৃত অর্থ
কুকুরের মত ভুকুনী সার।

(৯৩)

অধিকারী সবওসরি ভলো জানিব মন্দ।
সুধা সদন বসুধা রহৌ চৌথে অথবা চন্দ॥

সময়ে আবার মন্দ হয় ভাল
সময় পাইয়া ভালও মন্দ ;
তৃতীয়াদি স্থানে শুভগ্রহ শনি
চতুর্থাদি স্থানে অশুভ চন্দ্র।

(৯৪)

নরবর নভ সরবর সলিল বিনৈ বনজ বিজ্ঞান।
সুমতি সুক্তিকা শারদা স্বাতী কহহি সুজান॥

হরিভক্ত-চিতে চিন্তা-মেঘ আসি
সারদা-স্বাতীর যোগে যখন ;
মানসে সুমতি-শুক্তিতে বরষে
কবিতা-মুকুতা জন্মে তখন।

(৯৫)

শম দম সমতা দীনতা দান দয়াদিক রীতি।
দোষ দুরিত হর দর দরদ উর বর বিমল বিনীতি॥

ইন্দ্রিয়-দমন, শান্তি, সমভাব,
দৈন্য, দান, দয়া সুরীতিগণ।
হৃদয়ে আসিলে দোষ কুরীতির
ব্যথা হরে, করে বিমল মন।

(৯৬)

ধরম ধুরীন সুধীর ধর ধারণ বর পরপীর।
ধরা ধরাধর সম অচল বচন ন বিচল সুধীর॥

ধীরভাবে ধরে ধরমের ভার
পরদুঃখ নিজে করে ধারণ ;
ধরাধর সম অচল বচন—

(৯৭)

চৌতিশকে প্রস্তারমে অর্থ ভেদ পরমাণ।
কহহুঁ সুজন তুলসী কহহি য়হি বিধি তে পহিচান ॥
অক্ষরে অক্ষরে বিচার করিয়া
করিবে অর্থের ভেদ প্রমাণ ;
কহিছে তুলসী ইহাই প্রশস্ত ;
সুজনেরা কহে এই বিধান।

(৯৮)

বেদ বিষম কবরণ সতর সুতরু রাম কি রীতি।
তুলসী ভরত ন ভরি হরত ভুলি হরহুঁ জনি প্রীতি ॥
মেঘ সুরতরু সম রঘুনাথ
নীর হেতু দাতা নিয়ত ফিরে ;
কহিছে তুলসী ভুলিয়াও কভু
প্রীতি না ছাড়িহ শ্রীরঘুবরে।

(৯৯)

বাতে গুণ কহ জানিয়ে তাতে দিগ দ্বিদ তিন।
তুলসী য়হ জীয় সমুঝি করি জগ জিত সন্ত প্রবীণ ॥
ঠিক একদিন মরণ হইবে
জানিয়া সকল সন্ত প্রবীণ ;
কহিছে তুলসী সংসার জিনিয়া
সদা থাকে রাম-চরণে লীন।

(১০০)

চন্দ্র অমল নহি হৈ কহুঁ ঝুঠৌ বিনা বিবেক।
তুলসী তে নর সমুঝি হৈ জিনহি জ্ঞান রস এক ॥
সুখ দুঃখ বস্তু কোন স্থানে নাই
অজ্ঞানের ইহা মিছা সংস্কার ;
কহিছে তুলসী সে বুঝিতে পারে
সমভাবে জ্ঞান থাকে যাহার।

(১০১)

সতশৈয়া তুলসী সতর তমহর পর পদ দেত।
তুরিত অবিদ্যা জন দুরিত বরতুল সম করি পেত ॥
তুলসী-রচিত সতশৈয়া গ্রন্থ
তমঃ হরে করে মুকতি দান ;
অজ্ঞানী জনের কুরীতি নাশিয়া
ত্বরা করে তারে সাধু সমান।

ক্রমশঃ

রোল্ড অ্যামুণ্ডসেন

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই রোল্ড অ্যামুণ্ডসেন নরওয়ের ক্রিশ্চিয়ানিয়াসাগর-শাখার উপর অবস্থিত উষ্ট-ফোল্ডের অন্তর্গত বর্জ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, উহা নাবিক-পরিবার। তাঁহার পিতাও জাহাজের মালিক ছিলেন।

নাবিক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও, বাল্যকালে, তিনি পরবর্ত্তীকালে যে জীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার কোন আভাস্ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সাধারণ বালকের মত তিনিও বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন এবং পরে ক্রিশ্চিয়ানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অবসানে তিনি দুই বৎসর

কাল চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের ঘটনাবলী সপ্রমাণ করিল যে, তাঁহার প্রকৃত কর্ম সহরের জনকোলাহলের মধ্যে রোগীর রোগ-নির্ণয় ও তাহার চিকিৎসা নহে পরন্তু মহাসমুদ্রের ফেনোচ্ছল-বক্ষে অবস্থিত জাহাজের কেবিনে দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ। সমুদ্র-যাত্রায় স্বীয় অদম্য উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া তিনি অবিলম্বে নৌ-সেনাদলে যোগদান করেন।

নাবিক-জীবনের প্রথম অবস্থা

নাবিক-জীবনের প্রথম ভাগে অ্যামুণ্ডসেন অত্যন্ত কঠোরতার মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন। ডক্টর ফ্রিটজফ নানসেন নরওয়ের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তাঁহার সমুদ্র-ভ্রমণ ও আবিষ্কারমালা অ্যামুণ্ডসেনের মনে অসম-সাহসিকতার সঞ্চার করে। ফলে নিজকে পরবর্তী জীবনের উপযুক্ত করিবার জন্য তিনি মেরুপ্রদেশের মৎস-জীবীর জাহাজে কর্মগ্রহণ করিয়া তুষারমরুর দুঃসহ কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইলেন। উত্তর-মেরুর তুষারমণ্ডিত ক্ষেত্রে জাহাজ চালনার ব্যাবহারিক জ্ঞান লাভার্থ, তিনি এই সমস্ত জাহাজে সামান্য নাবিকের কার্য করিতেন। পরে তিনি পরীক্ষা দিয়া স্বীয় নৈপুণ্য প্রকাশ করত উচ্চতর পদ লাভ করিয়াছিলেন।

অ্যামুণ্ডসেনের স্বাস্থ্য

অ্যামুণ্ডসেন যে কার্য স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন, উহার সংসাধনের জন্য বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহাকে উপযুক্ত দেহ দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ছয় ফিটেরও বেশী দীর্ঘ ছিলেন। তাঁহার সবল দেহ অত্যধিক শ্রম-সহিষ্ণু ছিল। ফলে দুর্বলদেহ লোকেরা যেমন স্বীয় কার্যের পক্ষে অনুপযুক্ত দেহ লাভের জন্য প্রকৃতিরাণীর সহিত কলহ-কোলাহলে অভ্যস্ত হয়, অ্যামুণ্ডসেনের পক্ষে অনুরূপ বিরক্তি প্রকাশের অবসর ছিল না। যে কার্য তাঁহার পুরোভাগে অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন।

আকর্ষণ করিত। সুন্দর কেশকলাপ, সবল মাংসল দেহ ও সমুদ্র-নীল চক্ষু—যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। বস্তুত পক্ষে তিনি ছিলেন নরওয়ের প্রাচীন অধিবাসীর আদর্শমূর্তি।

দক্ষিণমেরু-আবিষ্কারে প্রথম অভিযান

পঁচিশ বৎসর বয়সে অ্যামুণ্ডসেন অধ্যক্ষ Adrien de Gerlacheর পরিচালনায় বেলজিয়াম দেশীয় দক্ষিণমেরু-অভিযানে যোগদানের জন্য আহূত হইলেন। এত অল্প বয়সে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, অ্যামুণ্ডসেন নিশ্চয় নাবিকরূপে প্রভূত অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তাঁহাকে সদস্য নির্বাচিত করা হইয়াছিল।

অ্যামুণ্ডসেন সেই আহ্বানে সাড়া দিতে দ্বিধা প্রকাশ করিলেন না। ফলে তিনি "বেলজিকা" জাহাজে প্রথম সহকারীর পদলাভ করিয়া দক্ষিণ-মেরু-অভিযানে যাত্রা করিলেন। এই অভিযান ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যাত্রা সুরু করে। প্রায় দুই বৎসর এই অভিযানে অতিবাহিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অ্যামুণ্ডসেন স্বীয় নৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদানের বহু সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি উহা কোন সময়েই উপেক্ষা করেন নাই।

এই অভিযান বিস্তৃত অনুসন্ধানের জন্য সম্পূর্ণ সজ্জিত ছিল না; তথাপি এই অভিযানে বহু মূল্যবান্ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। দুঃসহ কষ্ট ও কঠোরতা সত্ত্বেও অ্যামুণ্ডসেন এই প্রথম লব্ধ অভিজ্ঞতায় প্রীত হইয়াছিলেন।

পরবর্তী কার্য

এই অভিযানের অভিজ্ঞতা হইতে অ্যামুণ্ডসেন দেখিলেন যে, দ্বিতীয়বার মেরু-প্রদেশে যাত্রা করার পূর্বে নিজকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা দরকার, এই জন্য তিনি দিবারাত্রি অভেদে অধ্যয়নে নিরত হইলেন। এই নিমিত্ত যে বিপুল সহিষ্ণুতার দরকার, অ্যামুণ্ডসেন উহা যেন

বহু বর্ষ ধরিয়া তিনি ধৈর্য সহকারে অধ্যয়নে নিযুক্ত রহিলেন এবং স্বীয় অভিযানের জন্য নিজকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ফলে তাহার প্রত্যেক অভিযান পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, সামান্য ত্রুটি বা ভুল অনেক সময় বৃহদাকার ধারণ করিয়া সমগ্র অভিযানকে ধ্বংস করিতে পারে। সেই হেতু তিনি স্বীয় জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে প্রত্যেক ঘটনার—উহা যতই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বা বিপদ্‌সঙ্কুল হউক না কেন—জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। এতদ্ভিন্ন দল গঠনের অদ্ভুত প্রতিভা ও কুকুর সম্বন্ধীয় জ্ঞানে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে যে উত্তর-মেরু-অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি উহাতেও ছিলেন এবং বহুবিধ মূল্যবান্ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

ইহার পর নরওয়েতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তুষার-বেষ্টিত সাগরে অভিযান পরিচালনা করিতে হইলে যে ব্যাবহারিক জ্ঞানের দরকার, তিনি উহা লাভ করিয়াছেন।

গুরুত্বপূর্ণ মেরু-প্রদেশ-অভিযান

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন তিনি তাঁহার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভ্রমণে যাত্রা করেন। এই অভিযানে তিনি ৪৭ টনের একটি মৎস্যজীবীর জাহাজে পেট্রোলিয়াম এঞ্জিন বসাইয়া উহাকে কার্যোপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। এই জাহাজের নাম Gjoa। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল উত্তর-মেরুর প্রান্ত-বিন্দু নির্ণয় ও উত্তর-পশ্চিম পথের মধ্য দিয়া আটলান্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে গমন। অবশ্য এই অভিযানকে উচ্চাশার উত্তেজনা রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে, কারণ ইতিপূর্বে বহু নাবিক উক্ত কার্যে জীবন বিসর্জন দিয়াছেন; কিন্তু অ্যামুণ্ডসেন স্বীয় সফলতা বিষয়ে কৃতনিশ্চয় ছিলেন। পরে যাহা দেখা গিয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, তিনি হৃদয়ে যে আশার বাণী বহন করিতেন, তাহার যথেষ্ট সার্থকতা ছিল।

উত্তর-মেরুর প্রান্তবিন্দু নির্ণয়

অ্যামুণ্ডসেন প্রথমে আটলান্টিক মহাসমুদ্র অতিক্রম করিলেন; পরে উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূল ধরিয়া চলিলেন। অতঃপর তিনি মাত্র ৭ জন নাবিক সহ নিজের ক্ষুদ্র জাহাজ "ব্যাফিন বে"র মধ্য দিয়া পরিচালনা করত ব্যাফিন দ্বীপ ও গ্রীনল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া বুথিয়া উপদ্বীপের উপকূলের দিকে চলিলেন। সুদীর্ঘ ১৯ মাস ধরিয়া তিনি একাকী নীরবে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; এই পর্যবেক্ষণ যাথার্থ্য ও সর্বাঙ্গীন পূর্ণতায় লোকপ্রসিদ্ধ। এই পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি প্রমাণ করিলেন যে, সার জন রস ইতিপূর্বে যে পৃথিবীর উত্তর-মেরুর প্রান্তবিন্দু আবিষ্কার করিয়াছিলেন, উহা স্থিতিশীল নহে, পরন্তু অবিরাম গতির কেন্দ্রস্থল। এই আবিষ্কার-কালে তিনি কিং উইলিয়্যাম দ্বীপে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের পক্ষে বহুমূল্য ছিল সন্দেহ নাই। মাত্র এই একটি আবিষ্কারের জন্য অ্যামুণ্ডসেন তাঁহার যুগে মনীষিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি জরীপ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে অতিবাহিত করেন। এই সময় তাঁহারা স্থানীয় এস্কিমোদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"আমরা এস্কিমোদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, আমরা প্রস্তর-যুগে উপনীত হইয়াছি,—যেন হাজার বৎসর পিছাইয়া আসিয়াছি।" এইরূপে তাঁহার ভ্রমণ-তালিকার প্রথমাংশ নিরাপদে সিদ্ধির উপকূলে উপনীত হইল।

অতঃপর অ্যামুণ্ডসেন ভ্রমণের দ্বিতীয়াংশের পরিপূরণের জন্য যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহা উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কার।

উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কার

শত শত বৎসর ধরিয়া নাবিকেরা এই পথ আবিষ্কারে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু উহা আবিষ্কারের সৌভাগ্য ভগবান্ অ্যামুণ্ডসেনের জন্য সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

তিনি শীঘ্রই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, তিনি যে সমস্ত উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পূর্ববর্তী নাবিকগণের অভিজ্ঞতালব্ধ, সুতরাং প্রত্যেকটি ভুল। অতএব তিনি নিজের সংকল্পানুসারে নির্ণীত পথে যাত্রা করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে উত্তর-পশ্চিম পথের মধ্য দিয়া অ্যামুণ্ডসেন তাঁহার যাত্রা আরব্ধ করিলেন। কুইন মডস্ সাগর তুষারাবৃত ছিল; স্থানে স্থানে অত্যন্ত বিপজ্জনক অগভীর স্থানও বিরাজ করিতেছিল; ফলে তাঁহার যাত্রা—"যেন অপরিষ্কৃত পথের মধ্য দিয়া চলিতেছিল।"

ভিক্টোরিয়া প্রণালী বিস্তীর্ণ ভাসমান তুষার-শিলায় আকীর্ণ ছিল, সুতরাং জাহাজ অনেক সময় তুষাররাশির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিত, এই নিমিত্ত কানাডার উপকূলের ধার দিয়া যাত্রা অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল ছিল।

অগ্নি হইতে বিপদ্

ইতিপূর্বে একবার জাহাজ অগ্নির মুখ হইতে আশ্চর্যরূপে রক্ষা পাইয়াছিল। একদিন অ্যামুণ্ডসেন ও তাঁহার নাবিকদল একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের আবিষ্কারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের জাহাজ অদূরে নঙ্গর ফেলিয়াছিল। হঠাৎ তাঁহারা দেখিলেন যে, জাহাজের এঞ্জিন-গৃহ হইতে অর্ধচন্দ্রাকারে ধূমরাশি আকাশমার্গে উত্থিত হইতেছে। অমনি তাঁহাদের জাহাজে যে হাজার হাজার গ্যালন পেট্রোলিয়াম রহিয়াছে—তাহা মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধশ্বাসে জাহাজের দিকে দৌড়াইলেন। সৌভাগ্যবশত সেই সময়ে জাহাজের এঞ্জিনিয়ার তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছিল। পরে দেখা গেল যে, পেট্রোল-সিক্ত কিছু তুলা এঞ্জিনের সংস্পর্শে আসিয়া এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল।

"ঈগল সিটি"তে আগমন

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অ্যামুণ্ডসেন হঠাৎ দীর্ঘকাল তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই এবং প্রায় সকলে তাঁহার নিজের ও তাঁহার অভিযানের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। তিনি তখনও উত্তর-পশ্চিম-পথ আবিষ্কার করেন নাই; পথে তুষারে জাহাজ আবদ্ধ হইয়াছিল; তিনি স্লেজ গাড়ীতে করিয়া জাহাজ হইতে সভ্য জগতের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার এই তুষারাবৃত অজ্ঞাত পথে "ঈগল সিটি"র দিকে যাত্রা অসম-সাহসিকতার কার্য সন্দেহ নাই।

উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহে যতটুকু সময় দরকার, তিনি মাত্র ততটুকু সময় "ঈগল সিটি"তে অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে জাহাজে ফিরিয়া গেলেন।

যশঃ-শিখরে অ্যামুণ্ডসেন

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে তিনি পথের শেষ অংশ অতিক্রম করিয়া কলিনসনের আবিষ্কৃত জলরাশির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে তিনি উত্তর-পশ্চিম পথের আবিষ্কার-কার্য সংসাধিত করিলেন। তিনি আটলাণ্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে যাত্রার পথ প্রথম আবিষ্কার করিয়া জগতের বুকে নূতন কীর্তিস্তম্ভ প্রোথিত করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট যখন তিনি বেরিং প্রণালীতে উপনীত হন, তখন আলাস্কার অন্তর্গত নোমের স্বর্ণখনির মালিকগণ তাঁহাকে বিপুল সমারোহে অভ্যর্থনা করিল এবং অনতিবিলম্বে প্রত্যেক দেশ তাঁহার প্রশংসাগানে মুখর হইয়া উঠিল।

মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে অ্যামুণ্ডসেন আবিষ্কারকদের শীর্ষ স্থানে উপনীত হইলেন এবং বাল্য কল্পনার অধিকাংশ পূর্ণ করেন। শীঘ্রই তিনি যশঃ-শিখরে আরোহণ করিলেন—উহা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি দ্রুত। ইতিপূর্বে তিনি মাত্র নিজের দেশবাসীর নিকট পরিচিত ছিলেন; কিন্তু এইবার তিনি পৃথিবীর বিখ্যাত মনীষিমণ্ডলীর অন্তর্গত হইলেন। পরবর্তী দুই বৎসর তাঁহাকে

বৃটিশ সোসাইটির পুরোভাগে বহুবার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং মেরু-প্রদেশ আবিষ্কারে বৃটেনের প্রচেষ্টার বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এস্কিমো জাতির আচার-ব্যবহার

উপরি লিখিত দুইটি বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কার ছাড়াও অ্যামুণ্ডসেন সমাজ-বিজ্ঞানে বহু আলোক নিক্ষেপ করেন। তিনি মেরু-প্রদেশের অধিবাসী এস্কিমোদের আচার-ব্যবহারের বিষয়ে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন ও উহা জনসাধারণকে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সুদীর্ঘ অষ্টাদশ মাস-কাল একটি জাতির সঙ্গে বসবাস করিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে মাত্র চারিটি জন্ম ও দুইটি মৃত্যু দেখিতে পাইয়াছেন! তিনি এস্কিমো স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গীতে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাদের সমস্ত গানের সুর তাঁহার নিকট ৫টি স্বরের প্রকার-ভেদ বলিয়া অনুমিত হইত। একবার তিনি তাহাদের গান ও ঐক্যতান-বাদনে যোগদানে আহূত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ২০টি স্ত্রীলোক গান করিতেছিল। তাহারা প্রকৃত তানলয় সহকারে এক ঘণ্টা গান করে। এই সময় হইতে অ্যামুণ্ডসেন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন এবং এস্কিমোনারীদের সঙ্গীতের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

নবতর অভিযানের উদ্যোগে অ্যামুণ্ডসেন

উপরি লিখিত অভিযানে অ্যামুণ্ডসেন নিজকে অত্যন্ত কুশলী, দক্ষ, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন এবং শৃঙ্খলা-বিধানে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। সুতরাং তিনি যখন নরওয়েজিয়ান ভৌগোলিক সমিতির নিকট নবতর অভিযান পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিলেন, তখন সমিতি তাঁহার বাণী অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিয়াছিল।

তাঁহার এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল উত্তর মেরুর সন্নিহিত সাগরে ৫।৬ বৎসর বাস করিয়া মেরুপ্রদেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালান। এই অভিযানে তিনি সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো হইয়া আমেরিকার উত্তর প্রান্তে যাইবেন; অতঃপর বরফের স্রোতে জাহাজ ভাসাইয়া দিয়া উত্তর-মেরু-সাগরে উপনীত হইবেন। পরে সুযোগ পাইলে মেরু পর্য্যন্ত ধাওয়া করিতে ইচ্ছুক হন। ইতিপূর্বে যত প্রকার পরিকল্পনা দেখা গিয়াছে, ইহা তদপেক্ষা অধিকতর অসমসাহসিক কার্য।

উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অ্যামুণ্ডসেন তাহার বন্ধু ডক্টর নানসেনের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। এই বিশিষ্ট বন্ধু অবিলম্বে তাঁহাকে সমর্থন করিলেন। ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, নানসেনের পুরাতন জাহাজ Fram নবভাবে এই অভিযানের জন্য সজ্জিত করা হইবে। পরে যখন চাঁদার খাতা খোলা হইল, তখন দেখা গেল দেশের সমস্ত দিক্ হইতে সাড়া পাওয়া যাইতেছে। নরওয়ের রাজা ও রাণী ১১২০ পাউণ্ড চাঁদা দান করেন। কিছুকাল পরে এই নূতন প্রচেষ্টার গতি হ্রাস প্রাপ্ত হয়; ফলে অ্যামুণ্ডসেন মিতব্যয়িতার আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন।

একবার অ্যামুণ্ডসেন মেরু প্রদেশীয় ভল্লুককে শ্লেজ গাড়ী টানিবার জন্য ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি হ্যামবুর্গে কয়েকটি ভল্লুককে শিক্ষিতও করিয়াছিলেন, কিন্তু ভল্লুকগুলি আদৌ শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল না, ফলে তাঁহাকে এই পরিকল্পনা পরিহার করিতে হয়।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে যখন পৃথিবীময় প্রচারিত হইল যে, "পিয়ারী" উত্তর মেরুতে উপনীত হইয়াছেন, তখন অ্যামুণ্ডসেন হতাশ হইয়া পড়িলেন; কারণ তাঁহার বাসনা ছিল—এই গৌরব নরওয়ের পক্ষ হইতে তিনিই অর্জন করিবেন। তিনি এই বিষয়ে বহু চিন্তা করেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না—সমস্তই গোপন রাখিলেন। তিনি স্বীয় পরিকল্পনার সংসাধনে ব্যাপৃত রহিলেন যেন কিছুই ঘটে নাই।

তিনি ১৯১০ সালের প্রথমেই ক্রিশ্চিয়ানিয়া পরিত্যাগের সঙ্কল্প করেন কিন্তু কারণান্তরে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল; ফলে ১৯১০ সালের গ্রীষ্মকালের পূর্বে তিনি সমুদ্র-

যাত্রায় ব্রতী হইতে পারিলেন না। তবে তিনি যাত্রার তারিখ ও সময় গোপন রাখিয়াছিলেন। এক গ্রীষ্মকালীন নিশীথের স্তব্ধ নীরবতায় বিদায়-অভিনন্দনহীন অবস্থায় Fram নঙ্গর তুলিয়া সুদূর পথে যাত্রা করিল।

কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া অ্যামুণ্ডসেনের গতিবিধি জগতের কোন কৌতূহল উদ্রিক্ত করে নাই।

অভিনব পরিকল্পনা

১৯১০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অ্যামুণ্ডসেন Madeiraর অদূরবর্তী Funchal Roads নামক স্থানে নঙ্গর করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থানে এক নিশীথ রাত্রে তিনি সঙ্গিদলের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, তিনি দক্ষিণ-মেরু-আবিষ্কারে যাত্রার প্রয়াসী ; এখন সঙ্গিদল তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত কি না। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"প্রথমে সকলেরই মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকটিত হইল। কিন্তু শীঘ্রই এই চিহ্ন রূপান্তরিত হইল ; এবং আমার বাক্য শেষ করিবার পূর্বেই সকলের মুখে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। আমি এইবার নিঃসন্দেহ হইলাম যে, আমি কি উত্তর পাইব। পরে যখন আমি প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, তখন দেখিলাম সকলেরই মুখে 'হাঁ' কথাটি যেন প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে সঙ্গিদল আমার উপর তাহাদের বিশ্বাস ন্যস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে দেখিয়া আমি যে কিরূপ আনন্দিত হইলাম, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য।"

দক্ষিণ-মেরু-অভিযানে অ্যামুণ্ডসেন

সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে অ্যামুণ্ডসেন Madeira পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎপূর্বে তিনি তাঁহার দক্ষিণ-গমনের অভিলাষ পত্র দ্বারা Madeiraর অধিবাসীদিগকে জানাইয়া যান। ইহাতে পৃথিবীময় পুনরায় তাঁহার কথা আলোচিত হইতে থাকে। কারণ ইতিপূর্বে ইংরেজ আবিষ্কারক স্কট—দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারে যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন লোক উৎসুক হইয়া দেখিতে লাগিল, এই দুই আবিষ্কারকের মধ্যে কে আগে দক্ষিণ মেরুতে উপনীত হয়।

তিনি শীতকাল Bay of Whalesএ অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই স্থান রস্ সমুদ্রের বিপরীত দিকে অবস্থিত। কাপ্তেন স্কট এই স্থানে অবতরণ করেন।

তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী বৃহৎ তুষার-মণ্ডলে উপনীত হন। পথে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। এই স্থানে উপনীত হইয়া অ্যামুণ্ডসেন মনে করিলেন যে, পথের বিপজ্জনক অংশ শেষ হইয়াছে, কারণ তিনি নরওয়ে হইতে দক্ষিণ-তুষারমণ্ডল পর্যন্ত যাত্রাকে বিশেষ ভয়াবহ মনে করিতেন।

এখনও পুরোভাগে প্রায় হাজার মাইল পথ বর্তমান ; উহা বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্র, উত্তুঙ্গ পর্বতমালা ও চলমান তুষার-মরু দ্বারা পূর্ণ ছিল। তিনি নরওয়ে হইতে বহু এস্কিমো দেশীয় কুকুর এই পাঁচ মাসের পথ বহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন অথচ পথে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই ; ইহাতে তাঁহার সংগঠন শক্তি ও কুকুর সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিপুলতার আভাস পাওয়া যায়। তিনি ম্যাঞ্চুরিয়া দেশীয় ঘোড়ার উপর নির্ভর না করিয়া কুকুর দ্বারা স্লেজ গাড়ী টানাইবার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য প্রথমে কুকুর লইয়া খুব ভুগিতে হইয়াছিল ; কিন্তু পরে তাহারা বিশেষ উপকারে লাগে এবং অত্যন্ত বিশ্বাসী প্রতিপন্ন হইয়াছিল। হয়ত অনভিজ্ঞ লোকের হাতে পড়িলে এই কুকুরই বোঝা স্বরূপ হইত, কিন্তু অ্যামুণ্ডসেনের নিকট তাহারা অমূল্য সহায়রূপে পরিণত হইয়াছিল।

তুষারমণ্ডলে উপনীত হইয়া অ্যামুণ্ডসেন তাঁহার দলকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। একদল জলপথের ও অন্য দল স্থলপথের জন্য রহিল। কাপ্তেন নীলসেন জাহাজের তত্ত্বাবধানে রহিলেন ; স্থলপথের দল মেরুপ্রদেশে দ্রুত প্রস্থানের জন্য ব্যস্ত হইল। তুষারমণ্ডল হইতে মেরু পর্যন্ত স্থানে স্থানে বিশ্রাম-শিবির নির্মাণার্থ এবং শীতাবাসকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় করিবার জন্য স্লেজ গাড়ীতে গমনাগমনে গ্রীষ্মকাল কাটিয়া গেল। শীতের পূর্বেই তিন টন খাদ্য

সংগৃহীত হইল এবং ৮২° দক্ষিণ অক্ষরেখায় শেষ শিবির সংস্থাপিত হইল।

২২শে এপ্রিল সূর্য শেষ দেখা দিয়া চারি মাসের জন্য অন্তর্হিত হইল। শীতের ভীষণ প্রকোপ সত্ত্বেও, অ্যামুণ্ডসেন সমস্ত সময় ব্যস্ত ছিলেন; যেহেতু, তিনি স্থির করিলেন যে, প্রত্যহ টাটকা মাংস আহার করিতে হইবে; কুকুরগুলিকে পর্যাপ্ত ভোজ্য বস্তু দেওয়া দরকার সুতরাং বহু সংখ্যক সিলমৎস্য নিয়মিতভাবে ধৃত ও নিহত হইতে লাগিল।

কুকুরের ঐক্যতান-বাদন

দীর্ঘ শীতের রাত্রির একঘেঁয়েমি দূরীভূত করিবার জন্য অ্যামুণ্ডসেন প্রতি রাত্রিতে কুকুরের ঐক্যতান বাদনের ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমে একটি কুকুর চীৎকার করিত; পরে অন্য কুকুর প্রথমটির অনুসরণ করিত; এইরূপে সমস্ত কুকুরগুলি বিকট চীৎকারে হিমযামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিত। অতঃপর যেন কোন ঐন্দ্রজালিক সঙ্কেতে এই ঐক্যতান-বাদন হঠাৎ থামিয়া যাইত। সব সময় কুকুরের চীৎকার হঠাৎ থামিত; অ্যামুণ্ডসেন উহার ব্যাখ্যা স্বরূপ এই উত্তর দিয়াছিলেন যে, কুকুরেরা চিন্তা-রূপান্তরিত করিবার অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ছিল।

এতদ্ভিন্ন তিনি প্রায় ৩০০০ খণ্ড পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। এই সমস্ত দ্বারা সময়ে সময়ে নাবিকগণ শীতের দীর্ঘ অন্ধকারের মধ্যে আনন্দ অনুভব করিত।

২৪শে আগষ্ট তারিখে প্রথম সূর্যরশ্মি দেখা দিল, অমনি নাবিক ও কুকুর সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে অ্যামুণ্ডসেন তাঁহার যাত্রাপথে অগ্রসর হন কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাঁহাকে ফিরিতে বাধ্য করে। ২০শে অক্টোবর আবার নূতন করিয়া যাত্রা আরব্ধ হইল। এইবার মাত্র পাচজন লোক, ৪ খানি স্লেজ গাড়ী ও ৫২টি কুকুর ছিল। এইবার প্রকৃতি নিজেই বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া দিল; এবং প্রত্যহ ৩০ মাইল হিসাবে গমন করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হওয়া গেল। প্রত্যেক অক্ষরেখায় খাদ্য-সরবরাহ-ভাণ্ডার স্থাপিত হইল এবং প্রত্যাবর্তনের রাস্তা স্থির করিবার জন্য তুষার-ধ্বজ নির্মিত হইল।

১১০০০ ফিট আরোহণ

নভেম্বরের মধ্যভাগে অভিযান স্থলে উপনীত হইল; এই স্থান হইতে মেরু-অধিত্যকা আরোহণ করিতে হইবে। একস্থানে ১১০০০* ফিট উঠিতে হইয়াছিল। কয়েকদিন ধরিয়া অভিযানকে তুষার-ঝড়ের মধ্যে অদম্য উৎসাহে পথ চলিতে হইয়াছিল। অভিযানের কয়েকজন তুষার-অন্ধতা অনুভব করিয়াছিল এবং সকলেই ভীষণ শীতে কষ্ট পাইয়াছিল।

দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কার

সেকলটনের গন্তব্যস্থল দক্ষিণ-বিন্দু সকলে আনন্দ সহকারে অতিক্রম করিয়া গেল। এই স্থানে শেষ শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। এইবার সকলে আশায় উৎফুল্ল হইয়া শেষ গন্তব্য স্থলের উদ্দেশে যাত্রা করিল। উহা ৬৮৩ মাইল দূরবর্তী। ১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর প্রকৃতির হাস্যময় মূর্তি নিরীক্ষণ করিতে করিতে সহনশীল শীতে তাঁহারা শেষ কয় মাইল কোনরূপ দুর্ঘটনা ব্যতিরেকে অতিবাহিত করিলেন। যতই তাঁহারা দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের হৃদয় আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে স্পন্দিত হইতে লাগিল; মনে উদিত হইল—তাঁহারাই কি প্রথম? না আবিষ্কারক স্কট কোনরূপ যাদুমন্ত্রবলে তাঁহাদের পূর্বে মেরুস্থলে উপনীত হইয়াছেন? মাইলের পর মাইল নীরবে অভিযান চলিতে লাগিল; উত্তেজনায় হৃদ্-স্পন্দন আরম্ভ হইল; বেলা তিনটায় অগ্রগামী গাড়ীর লোক বলিল—"থাম!" তাঁহাদের যাত্রাপথ শেষ হইয়াছে—তাঁহারা মেরুস্থলে উপনীত

* কোন কোন লেখক উহা ১৫০০০ ফিট লিখিয়াছেন।

হইয়াছেন। কোন প্রাণীর চিহ্ন নাই—মানুষের ত দূরের কথা—কেবল দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত তুষার-ক্ষেত্র বিরাজমান—যাহা যুগ যুগ ধরিয়া সাহসী আবিষ্কারকের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াছে।

অ্যামুণ্ডসেন লিখিয়াছেন—"ইহা সেই পুণ্য মুহূর্ত, যখন পাঁচজন তুষারজীর্ণ শ্রমক্লান্ত লোক দক্ষিণ-মেরুর বক্ষে দণ্ডায়মান হইল এবং কম্পিত হস্তে নরওয়ের পতাকা প্রোথিত করিয়া এই স্থলকে ভৌগোলিক দক্ষিণ-মেরু বলিয়া নির্ণয় করিল।"

যে স্থলে তাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাকে অ্যামুণ্ডসেন "King Haakan VII's Plateau" নাম দান করেন।

পরস্পর অভিনন্দনের পর পাঁচজন সুখী লোক একত্র মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া এই অভিযানের সাফল্য ঘোষণা করিলেন। তাঁহাদের খাদ্য-তালিকা ছিল শুষ্ক পিষ্টক, সিলমাংস, চকোলেট ও চুরুট। তাঁহারা তিন দিন মেরু-প্রান্তে অবস্থিতি করিয়া বহুবিধ পর্যবেক্ষণ-কার্য নিষ্পন্ন করেন এবং যেস্থলে তাঁহারা নরওয়ের পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহা বারবার পরিক্রমা করেন। অতঃপর স্কটের দর্শনার্থ কিছু খাদ্য, কাগজপত্র ও কাপড়-চোপড় রাখিয়া তাঁহারা মেরু-প্রান্ত পরিত্যাগ করেন। প্রত্যাবর্তনও প্রকৃতির অপরিমেয় সহায়তায় সহজেই নিষ্পন্ন হইল—পথে কোন বিপদ্ ঘটে নাই।

প্রত্যাবর্তন

রস্ সাগরের তীরে অ্যামুণ্ডসেন যে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি উহার নামকরণ করেন Framheim। তিনি ১৯১২ সালের ২৫শে জানুয়ারী এই স্থানে উপনীত হইলেন। এই স্থান হইতে মেরুস্থল যাত্রা ও প্রত্যাবর্তনে মাত্র ৯৯ দিন অতিবাহিত হইয়াছিল; পথের বিঘ্ন ও দূরত্ব কল্পনা করিলে ইহাকে খুব কম সময় বলা অন্যায় নহে, এই পথের মোট পরিমাণ ১৮৬০ মাইল।

ইহাও বিস্ময়ের বিষয় যে, ১৮ মাস পূর্বে ১৬ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া অ্যামুণ্ডসেন যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন—উহা কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন ব্যতিরেকে অক্ষরে অক্ষরে ফলবতী হইয়াছিল। তিনি বৃহৎ তুষারমণ্ডলে মাত্র একদিন পূর্বে পৌঁছিয়াছিলেন; মেরুস্থলে নির্ধারিত দিবসে উপনীত হন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পরিকল্পনাও নির্ধারিত সময়ে সিদ্ধিলাভ করে; এমন কি ঘণ্টা পর্যন্ত অবিকল মিলিয়াছিল। আবিষ্কারকের ইতিহাসে অ্যামুণ্ডসেন শৃঙ্খলা-বিধানকারিরূপে চিরকাল পূজা পাইবেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পৃথিবী এই নরওয়ে দেশীয় নাবিকের অপূর্ব সফলতার বিবরণ জ্ঞাত হইল। অভিনন্দন ও সম্মান পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত হইতে তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। সভ্যজগতে পদার্পণ করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী The South Pole রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই পুস্তক অসংখ্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অ্যামুণ্ডসেন পুনরায় অভিযানে যাত্রার পরিকল্পনা করেন কিন্তু পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের জন্য তাঁহার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি পুনরায় উত্তর-মেরু-সাগরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এইবার তিনি উক্ত স্থানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাইবার মনস্থ করিলেন। দেড় বৎসর তাঁহার কোন সংবাদ মিলিল না। অবশেষে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি বেরিং প্রণালীর ব্যবসা-বন্দর Anadyrএ হঠাৎ উপনীত হইলেন। তাঁহার জাহাজ তুষারে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি স্লেজ গাড়ীতে করিয়া শত শত মাইল পথ অতিক্রম করত খাদ্যদ্রব্য ও সাহায্যের জন্য উপনীত হইয়াছিলেন।

জুলাই মাসে তিনি বেরিং প্রণালী অতিক্রম করিয়া নোমে উপনীত হন। এইরূপে উত্তর-মেরু-বৃত্ত সম্পূর্ণ পরিক্রমণ করিলেন। এক পক্ষ পরে তিনি উত্তর-মেরুতে ফিরিয়া আসেন, এবং মেরু প্রদেশের তুষার-ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের জন্য যাত্রার উদ্যোগ করিতে থাকেন।

১৯২৩ সালে তিনি আকাশযানে উত্তর মেরুতে যাত্রার সঙ্কল্প করেন কিন্তু অর্থাভাবে উহা তৎকালে সংসাধিত হয় নাই।

সাতগেছিয়া সান্ধ্য-সম্মিলনীতে গৃহীত আলোকচিত্র

দণ্ডায়মান (বামদিক্ হইতে)—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ দে, হরিদাস দত্ত, মন্মথনাথ দে, রাইচরণ শীল, অক্ষয়কুমার শীল, গোবর্দ্ধন দে, বলাইচাঁদ শীল, মধুসূদন দে, সিদ্ধেশ্বর শীল, অতুলকৃষ্ণ দে, হরেকৃষ্ণ দে, বিভূতিভূষণ দে, বামাপদ দে

উপবিষ্ট (বামদিক্ হইতে)—শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ লাহা, ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, কুমারী কমলা লাহা, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল,

শেষ অভিযান ও মৃত্যু

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে অ্যামুণ্ডসেন দুইখানি আকাশযান সহ উত্তর মেরুতে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন। ৮৭°৪৩' উত্তর অক্ষরেখায় তিনি অবতরণে বাধ্য হন। অমানুষিক শক্তিবলে উত্তরে অগ্রসর হইবার বৃথা চেষ্টার পর তাঁহারা স্পিট্‌স্‌বার্জেনে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। দুই দিন পরে তিনি নেবিল ও এল্‌স্‌ওয়ার্থ সহ ইতালিয় আকাশযানে যাত্রা করেন এবং ১৬ ঘণ্টায় উত্তর-মেরুতে উপনীত হন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে Italia নামক আকাশযানে নেবিল উত্তরমেরু-অভিযানে যাত্রা করেন। কিন্তু ফিরিবার পথে দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁহার উদ্ধারার্থ যাত্রা করিয়া আকাশযান-দুর্ঘটনায় পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত মেরু-আবিষ্কারক অ্যামুণ্ডসেন অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"তিনি মেরু-আবিষ্কারের মধ্যবিন্দু ছিলেন।"

সাতগেছিয়া শ্রীধরপুর অবিনাশ ইন্‌ষ্টিটিউশনের পুরস্কার-বিতরণোৎসব

শ্রীধরণীধর দে এম এস-সি, বি এল

সাতগেছিয়া শ্রীধরপুর অবিনাশ ইন্‌ষ্টিটিউশনের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারী রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে প্রায় ৮ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সাতগেছিয়া গ্রামে গত ১৫ই মে (১৯৩৮ ইং) তারিখে একটি বিশেষ এবং স্মরণীয় উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন সুবর্ণবণিক্ জাতির তথা বাংলার অন্যতম নেতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডক্টর কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম এ, বি এল, পি আর এস, পি-এইচ ডি মহাশয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত এম এ, বি এল, পি আর এস, পি-এইচ ডি, ডি লিট (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত হৃৎসেশ্বর ব্যানার্জি, বার-অ্যাট-ল, স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দে, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার দাস প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত দিবস বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় ডক্টর নরেন্দ্রনাথ তাঁহার দুই আত্মজ শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এবং বন্ধু ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে বরাবর মোটরযোগে, সাতগেছিয়া গ্রামে উপস্থিত হন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শীল, শ্রীযুক্ত বামাপদ দে এবং আরও কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি গ্রামপ্রান্তে ডক্টর লাহা মহাশয়ের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। তঁহারা এইখানেই ডক্টর লাহাকে সাদরে প্রাথমিক অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে গ্রাম-পথে কয়েকটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মিত হইয়াছিল। ডক্টর নরেন্দ্রনাথকে সেই তোরণগুলির মধ্য দিয়া মহাসমারোহের সঙ্গে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দে মহাশয়ের বাটীতে আনয়ন করা হয়। দে মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সমস্ত বাটী হইতে পুরমহিলাগণ শঙ্খধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। ডক্টর লাহা মহাশয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দে মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁহার গৃহে পুত্রদ্বয় ও সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত চা পান ও জলযোগ করেন।

বেলা প্রায় ৯॥ ঘটিকার সময় ডক্টর লাহা মহাশয় সাতগেছিয়া শ্রীধরপুর অবিনাশ ইন্‌ষ্টিটিউশনের পুরস্কার-বিতরণী সভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পূর্বদিন

বৃষ্টিপাত হওয়ায় স্কুলের নিকটবর্তী কিছুপথ মোটর চলাচলের অযোগ্য বিবেচিত হয় এবং স্কুলের কর্তৃপক্ষ ডক্টর লাহার জন্য শিবিকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি শিবিকা গ্রহণ না করিয়া পদব্রজে মাঠ এবং আলের উপর দিয়া দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সাতগেছিয়ায় সমবেত ব্যক্তিগণের সঙ্গে স্কুলগৃহে উপস্থিত হন। ইহা অতুল বিভবশালী জ্ঞানী নরেন্দ্রনাথের উদার এবং মহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক। স্কুলের দ্বারদেশে স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ—প্রায় চারিশত লোক ডক্টর লাহাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ব্রতচারী-প্রথায় অভিবাদন করেন এবং তাঁহাকে পথনির্দেশ করিয়া উৎসব-ক্ষেত্রে আনয়ন করেন। এই ব্যাপারটি সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহিভাবে সম্পন্ন হয়।

বেলা ১০॥ টায় উৎসবের প্রারম্ভে স্কুলের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক "ব্রতচারী" নৃত্য ডক্টর লাহাকে এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে প্রীত করে। পরে ডক্টর নরেন্দ্রনাথের সমভিব্যাহারে সমবেত বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলীর একটি সম্মিলিত আলোকচিত্র গৃহীত হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি বার-অ্যাট-ল মহাশয় ডক্টর নরেন্দ্রনাথকে সভাপতির পদে বরণ করিবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি জমিদার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় দ্বারা সমর্থিত হইলে বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে ডক্টর লাহা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির আসন-গ্রহণান্তে স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ মহাশয় আশীর্বচন পাঠ এবং কুমারী কমলা লাহা সভাপতি মহাশয়কে মাল্যে ভূষিত করিয়া অভ্যর্থনা সঙ্গীত করেন। কুমারী কমলা লাহার সঙ্গীতে উৎসবক্ষেত্রে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। এই সভায় প্রায় ৭০০ লোকের সমাগম হয়। পরে এই সভায় নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ বক্তৃতা করেন।

১। সাতগেছিয়া শ্রীধরপুর অবিনাশ ইনষ্টিটিউশনের সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শীল

২। ঐ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক—শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ দে, বি এ

৩। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪। শ্রীযুক্ত ধরণীধর দে

৫। সুসাহিত্যিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু

৬। ডাক্তার বলাইচাঁদ বন্দোপাধ্যায়

৭। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বি এ (স্কুলের ভূতপূর্ব ছাত্র ও বর্তমান শিক্ষক)

তৃতীয় বক্তা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি তাঁহার স্বোপার্জিত সমস্ত বিত্ত স্কুলের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিয়াছেন, বলেন যে, যখন স্কুলটির উপর স্বয়ং ডক্টর নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার প্রাসাদ হইতে বহুদূরে এই সুদূর পল্লীর বিদ্যামন্দিরে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া উপনীত হইয়াছেন, তখন এই স্কুলটির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর কোন চিন্তার কারণ নাই। পরে চতুর্থ বক্তা নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন—

"মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, আজ আমাদের এই সাতগেছিয়া শ্রীধরপুর অবিনাশ ইনষ্টিটিউশনের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় কিছু বল্‌বার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। এ বিদ্যালয়ের কার্য-বিবরণী এবং অন্যান্য বিষয় যা আপনাদের জ্ঞাতব্য তা আপনারা যোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেছেন ও শুনবেন। আমি কেবল আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি আর এস, পি-এইচ ডি মহাশয়কে ধন্যবাদ নয়—আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব।

"বাংলার জনসাধারণের নিকট এবং বিশেষ করে আমাদের এ সভায় ডক্টর নরেন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ বাংলা দেশে এবং বিশেষ করে এ সভায় তাঁর গুণগ্রাহী এবং ভক্তের অভাব নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মহৎ চরিত্রের দৃষ্টান্ত আমাদের স্কুলের

ছেলেদের উৎসাহিত করবে বলে তাঁর অসামান্য প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু বলবো। ডক্টর নরেন্দ্রনাথকে সভাপতিরূপে পেয়ে আমরা আমাদের স্কুলের ছেলেদের সাম্‌নে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করতে পেরেছি বলে মনে করি। আমাদের অদ্যকার সভাপতিকে শুধু প্রতিভাবান্ বল্লে তাঁর কিছুই পরিচয় দেওয়া হয় না। অল্প কথায় তাঁকে প্রতিভার অবতার বা প্রতিভার খনি বলা যেতে পারে। বাল্যকাল থেকে তাঁর প্রতিভার পরিচয় নানাদিক্ থেকে তিনি দেশকে দিয়ে এসেছেন। তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অষ্টম স্থান অধিকার করেন। এফ এ পরীক্ষায় বৃত্তি পান। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মৌয়াট পদক লাভ করেন।

"ডক্টর নরেন্দ্রনাথের নাম আজ শুধু শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। বাংলার জনসাধারণও তাঁর নাম জানেন। মৌলিক গবেষণার জন্য যে কয়েক জন বাঙালীর নাম সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর তালিকায় স্থান পেয়েছে, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন। বিদ্যায়, জ্ঞানে, কর্মপটুতায়, বংশগৌরবে, বিত্তশালিতায়, বিরাট্ ব্যক্তিত্বে, তিনি আজ শ্রেষ্ঠ ভারতবাসীদের একজন।

"সবাই জানেন ঐশ্বর্য-বিলাস-ব্যসনের মধ্যেই জীবনটাকে বিলিয়ে দেওয়াই যাদের পক্ষে অধিক সম্ভব, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ সেই ধনি-সম্প্রদায়ের একজন হয়েও তাঁর অসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে আজ বিপুল জ্ঞানের অধিকারী। বাংলাদেশের দুদিনের আগেকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখতে পাই বিপুল-সম্পদ্‌শালী জমিদারদের অনেকেই নিজকে ঐশ্বর্যের মোহ থেকে মুক্ত করতে পারেন নি বা নিজেকে জ্ঞান-গরিমায় মহীয়ান্ করে তুলতে সমর্থ হননি। কিন্তু এই আভিজাত জীবনের স্বাভাবিকগতির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হয়েছে ডক্টর নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে! বাণী এবং কমলা তাঁদের চিরবিবাদ ভুলে যেন সমভাবেই অজস্র আশীষ বর্ষণ করেছেন— তাঁদের এই প্রিয়তম সন্তানটির উপর। তাঁর প্রণীত বহু মৌলিক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকাবলীর মধ্যে 'Ancient Hindu Polity' নামক গ্রন্থ মহামূল্য এবং দেশের অতুল সম্পদ্।

"অর্থনীতি-শাস্ত্রে তিনি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত। দেশের শিল্পোন্নতিকল্পে তাঁর উদ্যম ও স্বার্থত্যাগ তাঁকে চিরজীবিত করে রাখবে। হৃষীকেশ অয়েল মিল ও বঙ্গেশ্বরী কটন মিল তাঁর কর্মধ্বজা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের বিজয়স্তম্ভস্বরূপ। তিনি দুইবার ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-স্বরূপ গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের ভূতপূর্ব সভ্য এবং কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের ভূতপূর্ব কমিশনার। এইভাবে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর প্রতিভা কত বহুমুখী এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা অসম্ভব। তিনি যে আজ তাঁর শত সহস্র কাজের মধ্যে সময় করে নিয়ে আমাদের এই সুদূর পল্লীগ্রামের শিশুপ্রতিষ্ঠানটির মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর এই অনুগ্রহ এবং সৌজন্যের কথা আমাদের চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর উপস্থিতির জন্য আজকের দিন আমাদের এই স্কুলের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ও গৌরবময় দিন; এই গৌরবের স্পর্শ লাভ করে আমরা বিপুল আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি, যদিও তার সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র আয়োজনের সহস্র ত্রুটি পদে পদে আমাদের পীড়া দিচ্ছে।

"এই বিদ্যালয়ের প্রতি ডক্টর নরেন্দ্রনাথের অনুগ্রহ প্রদর্শন এই প্রথম নয়। কিছুকাল পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটি যখন নানাকারণে মৃতপ্রায় হয়েছিল, তখন একমাত্র কুমার নরেন্দ্রনাথের করুণায় ও তাঁর সুযোগ্য বন্ধু ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত এম এ, বি এল, পি আর এস, পি-এইচ ডি, ডি লিট্ (লণ্ডন) মহাশয়ের চেষ্টায় এটি নবজীবন লাভ করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানটিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা তখন অপরের পক্ষে দুঃসাধ্য এমন কি অসাধ্য বোধ হলেও ডক্টর নরেন্দ্রনাথের বিরাট্ ব্যক্তিত্বে তা অনায়াসে সম্ভব হয়েছিল। এ স্কুলটি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তাঁর অসীম বিদ্যানুরাগের সহস্র নিদর্শনের মধ্যে একটি বলে গণ্য হবে।

"ডক্টর নরেন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার মত ভাষা আমার নেই। এই উৎসব-মণ্ডপে সমবেত গ্রামবাসী আজ আমরা—আমাদের মালাচন্দন ও ভক্তি-প্রীতির ধূপধুনার আরতি নিয়ে এখানে এসেছি। আমাদের বিশ্বাস আছে তিনি নিজগুণে তা গ্রহণ করবেন। এই প্রসঙ্গে এই স্কুল সম্বন্ধে আর সামান্য কয়টি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমাদের এই পল্লীগ্রামের মধ্যে এই রকম একটি স্কুল গড়ে তুলবার জন্য যে বহু পরিশ্রম, তিতিক্ষা এবং ত্যাগ-স্বীকারের প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। এই স্কুলটিকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলবার জন্য আমাদের এই দুটি পল্লী-গ্রামের অধিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরে বহুদুঃখ ও ক্লেশ স্বীকার করেছেন। তাঁদের এই ক্লেশ স্বীকার করবার কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশকে সমৃদ্ধ করতে হলে আর সব জিনিষের আগে চাই একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান,—যা আমাদের আশা ও ভরসাস্থল ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুশিক্ষিত করে তুলবে। দীর্ঘকাল বহু পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকারের পর এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি যে কত বড় ঝড়-ঝাপ্টার ভিতর দিয়ে তার চলার পথ করে নিয়েছে তা আপনাদের অজ্ঞাত নয়। যে সমস্ত কর্মী ও শিক্ষকমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত ও উন্নত হয়েছে এই সুযোগে আমি তাঁদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এবং বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং এই স্কুলের স্থায়িত্বকল্পে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার ও বহু অর্থ দান করেছেন, এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শীল, বলাইচাঁদ শীল ও ইন্দ্রকুমার দাস মহাশয়গণ তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও তত্ত্বাবধানের জন্য সমস্ত দেশ-বাসীর অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমাদের ভরসা আছে এই দেশবাসীর দুঃখের অবসান অচিরে ঘটবে; কারণ ইহাদের বংশধরগণ সুশিক্ষার সবকটিগুণ অধিকার করে দেশকে গৌরবান্বিত করবে। আজ আমাদের আনন্দের অবধি নেই, কারণ আজ আমরা আমাদের নেতা হিসেবে পেয়েছি ডক্টর নরেন্দ্রনাথকে।"

উপরোক্ত বক্তৃতা-সমূহের অন্তে ছাত্রগণ কর্তৃক আবৃত্তি এবং পুরস্কার-বিতরণ-অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশয় একঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার স্বাভাবসুলভ, সরল ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

ডক্টর লাহা প্রথমেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশকে তাঁহার এই মহৎ কার্যের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং বলেন—"ইহা বাস্তবিকই প্রশংসার কথা যে, তিনি বিদ্যালয়ের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, সুতরাং সকলে যদি তাঁহার আদর্শ আংশিকভাবেও গ্রহণ করেন, তবে দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।"

বালকগণের ব্রতচারী নৃত্য ও নিয়মপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেন,—"বিদ্যালয়ের বালকগণ যদি ব্রতচারী নৃত্য অভ্যাস করে, এবং ব্রতচারী নিয়মাবলী পালন করে, তাহা হইলে, তাহারা ভবিষ্যৎজীবনে নানাভাবে উপকৃত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

ডক্টর লাহা আরও বলেন,—"আজ আমরা শিক্ষার সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছি। মহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত ওয়ার্ধা কমিটির অনুমোদিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। সেই সব বাদানুবাদের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান চলিতেছে, তাহা ত্যাগ না করিয়া ও তন্মধ্যে ব্রতচারী নিয়মাবলী পালন করিয়া চলিলে স্কুলের ও বালকগণের মঙ্গল সাধিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।"

বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে উদ্দেশ করিয়া ডক্টর লাহা বলেন—"আপনাদের বিদ্যালয়ের গৃহ, খেলিবার মাঠ, অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম, কৃষিশিক্ষার আদর্শ ক্ষেত্রের জন্য জমি প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। বিশেষতঃ প্রায় ৪০ বিঘা জমির উপর আপনাদের বিদ্যায়তনের অধিষ্ঠান; এইরূপ স্থানলাভ বহু স্কুলের ভাগ্যে ঘটে না। সুতরাং বহু প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়া যখন আপনারা গমন করিয়াছেন, তখন বর্তমান আশার আলোক পুরোভাগে

কারণ নাই। বিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার কিংবা বিজ্ঞান-শিক্ষকের ব্যয়ের জন্য আপনাদের চিন্তার কারণ নাই। আপনাদের সকলের সমবেত ইচ্ছা থাকিলে, সকল বাধা দূরীভূত হইবে।"

ছাত্রদের উদ্দেশে ডক্টর লাহা বলেন,—"বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষাদান করিতেছে, তাহা জীবন-পথে সকল সময়ে কার্যকরী হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী বেকারের সংখ্যা দেশে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় ছাত্রগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবহারিক শিক্ষাও লাভ করিতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যজীবনে অর্থোপার্জনে কোন ব্যাঘাত না হয়। এখন হইতে ব্যাবহারিক শিক্ষালাভ না করিলে, হাতে-হাতিয়ারে কাজ করিতে না শিখিলে, দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে অন্ন-সংস্থান করা আরও কষ্টসাধ্য হইবে।

"আরও একটি কথা এই যে, শুধু পুথিগত বিদ্যা অধিগত করিলেই হইবে না। জীবনের সমস্যা বহুবিধ এবং জটিল। ছাত্রদিগকে জীবন-সংগ্রামের জন্য উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেইজন্য তাহাদিগকে সংসারের পথে চারিদিক্ চাহিয়া চলিতে ও যে কোন অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহারা যাহাতে সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে এবং দুর্জনকে দমন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষা ছেলেদের দেওয়া প্রয়োজন।

"অনেক সময় বালকেরা অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া অনেক কষ্ট পায়। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। তাহা না পারিলে জীবনে উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে না। গীতায় ভগবান্ উহা অর্জুনকে দিয়া বিশদভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন। অর্জুন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ তাঁহার কর্তব্য; ধর্মযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে প্রতিহত তাঁহাকে করিতেই হইবে—উহাই তাঁহার ধর্ম। কিন্তু তিনি আত্মীয়স্বজন দেখিয়া যুদ্ধে বিরত হইতেছেন, উহা কাপুরুষতার নামান্তর—ধর্মের বহির্ভূত কার্য। সেইরূপ ছাত্রগণের মধ্যেও জীবনের পথে যে যেরূপ কার্য বাছিয়া লইবে, তাহাকে ঠিক তদনুরূপ কার্য করিতে হইবে, উহাতে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না।

"অনেকে মনে করিতে পারে, গ্রাম হইতে ভাল ছেলে বাহির হয় না। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মেদিনীপুর জেলার এক অখ্যাত পল্লী বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহারই জন্মভূমি বলিয়া উক্ত গ্রাম বাঙালীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।"

পরিশেষে ডক্টর লাহা বলেন—"ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষার তুলনা চলে না। ইয়োরোপে টাকা বেশী; আমাদের কম। একমাত্র লণ্ডন সহরে বাৎসরিক ১৫কোটি টাকা প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয়িত হয়। সুতরাং ইয়োরোপের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া আমাদিগের দেশীয় প্রথায়, বৃক্ষমূলে, পর্ণকুটিরে খেজুর-পাতার চাটাই পাতিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতে হইবে। উহাতে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ বেশী বই কম হইবে না।"

সভাপতির বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্কুল কমিটির তরফ হইতে সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও বেলা প্রায় এক ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সভার অধিবেশনের পর ডক্টর লাহা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দে মহাশয়ের বাটিতে মধ্যাহ্ন-ভোজন করেন এবং বিশ্রাম গ্রহণ না করিয়াই সমবেত গ্রামবাসীদের সহিত অতি সরলভাবে আলাপে রত থাকেন এবং কিছু পরে সাতগেছিয়া গ্রাম পরিদর্শন করিতে বাহির হন। এই সময়ে তিনি এই গ্রাম সম্বন্ধে সুন্দরভাবে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া অল্প আয়াসে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিয়া লন। তাঁহার এই অল্প কথায় সমস্ত বিষয় সুন্দরভাবে জ্ঞাত হইবার স্বাভাবিক শক্তি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

সাতগেছিয়া সুবর্ণবণিক্-প্রধান গ্রাম। এই গ্রামে দে

পাড়া, শীলপাড়া, বাজারপাড়া ও পশ্চিমপাড়াস্থ মোট প্রায় এক শত ঘর অধিবাসীর মধ্যে ন্যূনাধিক ৫০।৫৫ ঘর সুবর্ণবণিক্ ও ১৫ ঘর সুবর্ণবণিক্ ব্রাহ্মণের বাস। এই উপলক্ষে গ্রামস্থ সুবর্ণবণিক্ জনগণ ডক্টর লাহার সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিজেদের সম্মানিত ও কৃতার্থ বোধ করেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত মধুসূদন দে মহাশয় গ্রামবাসিগণের সমভিব্যাহারে ডক্টর লাহার অভ্যর্থনার জন্য এক সান্ধ্য সম্মিলনে চা পানের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় প্রায় একশতজন ভদ্রমহোদয় সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান করেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় এই সান্ধ্য-সম্মিলনে সভাপতি নির্বাচিত হন।

সান্ধ্য সম্মিলনের প্রারম্ভে একটি আলোক চিত্র গৃহীত হয়। কুমারী কমলা লাহা প্রাথমিক সঙ্গীতান্তে ডক্টর লাহাকে মাল্যভূষিত করে। নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র পঠিত হয়—

সর্ব্বজনপ্রিয় সুধী ও জননায়ক, পরম শ্রদ্ধেয়
ডক্টর কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম এ, বি এল, পি আর এস, পি-এইচ ডি

মহোদয় করকমলেষু

হে সুধীবর, কমলার কমলকাননে বাণীর বীণার ঝঙ্কার তুলিয়া, আপনি কমলা ও সারদার চিরন্তন কলহের অবসান ঘটাইয়াছেন। সার্থক আপনার সাধনা! আপনার জয়গানে দেশ মুখর হইয়াছে বহুদিন। এতদিন আমরা দূর হইতে, একান্তে নিভৃতে, সে জয়গানে নিজেদের কণ্ঠ মিলাইয়া আসিয়াছি। আজ প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে আমরা শ্রদ্ধার স্রকচন্দনে অভিষিক্ত করিতেছি। সু-স্বাগত, হে বাণী-কমলার স্নেহের দুলাল!

হে সৌম্য! জ্ঞান-গঙ্গার সহিত স্নেহ-যমুনার অপূর্ব সম্মেলন আপনার মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তুষার-শুভ্র হিমাচলের ন্যায় বিদ্যার জ্যোতিঃতে সমুজ্জ্বল আপনার ললাট,—শান্ত, সংযত, স্থিতধী যোগীর মত জ্ঞান-সাধনায়

মগ্ন আপনি। আপনার হৃদয়-কন্দরের করুণা-ধারা দেশ ও দেশের জনসাধারণকে স্পর্শ করিয়াছে—কত তৃষার্ত ভূমিতে নবজীবনের নবীন আশা বহন করিয়া আনিয়াছে। বহু দরিদ্র, নিরুপায় শিক্ষার্থী ও কর্মীর আশ্রয়স্থল আপনি। হে হৃদয়বান্ কোবিদ্, আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন।

হে মনস্বি! অতীত ও অনাগত ভবিষ্যৎ উভয়ই আপনার চিন্তা-ধারায় সমভাবে স্থান পাইয়াছে। অতীতের উত্তর-সাধক! ভবিষ্যতের অগ্রদূত! আত্ম-বিস্মৃত জাতিকে আপনি বর্তমানের ভবিষ্যৎ-পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। শিল্পে বাণিজ্যে আপনার অভিনব কর্ম-সূচনায় দেশ ও জাতি নবীন প্রেরণা লাভ করিয়াছে।

হে নায়ক! আপনি সার্থক-নামা পুরুষ! স্বজাতীয় সমাজ শ্রদ্ধায় আপনাকে সমাজপতির আসনে বরণ করিয়াছে। হে প্রতিভাবান্ কর্মি! আপনার কর্মশক্তি জাতির কর্মপন্থা-রচনায় সব্যসাচীর মত নিযুক্ত হউক।

হে মনীষি, স্বজাতি ও স্ব-সমাজের কৃষ্টি ও উন্নতির চেষ্টায় 'সুবর্ণবণিক্-সমাচার' পত্রিকার কর্ণধাররূপে আপনি সমাজকে নূতন আদর্শের সন্ধান দিতেছেন। অন্যদিকে, স্বজাতীয় যে সমস্ত কীর্তির কথা দেশ ও জাতি ভুলিতে বসিয়াছিল, আপনি আজ পঁচিশ বৎসর যাবৎ জাতিকে সেই সব বিস্মৃত কথা শুনাইয়া, সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। নানাবিধ সদ্গ্রন্থ-প্রকাশে আপনি নিজের বিত্তকে নিয়োজিত করিয়া দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। দেশের আর্থিক সমস্যা-সমাধানে আপনার পরিচালিত সাময়িক পত্র 'আর্থিক উন্নতি' এবং নানাবিধ ব্যবসা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান মূল্যবান্ সহায়তা করিতেছে। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির অনুরক্ত ভক্ত আপনি, ইতিহাস সম্বন্ধে ত্রৈমাসিক পত্র 'ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি' ত্রয়োদশ বর্ষকাল পরিচালিত করিয়া, দেশ-বিদেশে সম্মান অর্জন করিয়াছেন। আপনার এই দেশব্যাপী সম্মানে আমরা গৌরবান্বিত হইয়াছি।

হে বরেণ্য! আমরা নিঃস্ব, আমরা রিক্ত; কিন্তু আমাদের এই পল্লী-আঙ্গিনায় আপনাকে বরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া, আমরা নিজেদের ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ মনে করিতেছি। দীন আমরা, আপনার উপযোগী উপায়ন সংগ্রহে অক্ষম। কিন্তু অন্তরের অনাবিল অর্ঘ্য যদি শ্রেষ্ঠ উপচার হয়, তবে হে মহান্! সে উপচার আপনার উদ্দেশ্যে আমরা অর্পণ করিতেছি, সহৃদয় আপনি, তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদের ধন্য করুন।

হে প্রিয়দর্শন! আপনার দর্শনে আমাদের হৃদয়ে আনন্দের যে তুফান উঠিয়াছে, সেই আনন্দ-সঞ্জাত হৃদয়ে ভগবানের নিকট নিরন্তর আপনার সুদীর্ঘ জীবন ও অটুট স্বাস্থ্য কামনা করি।

সাতগেছিয়া ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ	আপনার গুণমুগ্ধ **সাতগেছিয়া-নিবাসী সুবর্ণবণিক্-অধিবাসিবৃন্দ**

অভিনন্দনপত্র পাঠের পর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু মহাশয় আশীর্বচন উচ্চারণ করেন এবং শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ দে বি এর বক্তৃতার অবসানে সঙ্গীতান্তে ডক্টর লাহা অভিনন্দনের উত্তর প্রদান করেন।

অভিনন্দনের উত্তরে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ বলেন—"আজ বিশ্বব্যাপী অন্ন-সমস্যা দেখা দিয়াছে; যে দেশ বা জাতি

দেশ ও জাতির সহিত প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা করিয়া জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া আছে। এই অবস্থায় সুবর্ণবণিক্ জাতির আর পিছনে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না, ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহযোগিতা করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

ভূমি ছিল। সুবর্ণবণিক্ জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে ধনশালী হইয়াছিল; কিন্তু বিগত ৬০।৭০ বৎসরে এই গ্রামের অবনতি হইয়াছে। এই অবনতির কারণ বহুবিধ। প্রথমত লোক ব্যবসা-বাণিজ্যোপলক্ষে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা সহরে গেল, তাহারা আর গ্রামে ফিরিল না। ফলে গ্রামে বর্ধিষ্ণু লোকের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়ত ব্যবসা-বাণিজ্যও ধীরে ধীরে আমাদের অসাবধানতা বা অজ্ঞতা বশত হস্তচ্যুত হইতে লাগিল, কিম্বা ভিন্ন দেশীয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে যে শিক্ষা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহার অভাব ঘটিল। ফলে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি ব্যবসা হস্তগত করিল আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে পিছাইয়া পড়িলাম। বর্তমানে এইরূপ নিশ্চিন্তভাবে কাল কাটাইলে চলিবে না। যে সমস্ত সদ্‌গুণ ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অপরিহার্য, তাহা আয়ত্ত করিতে হইবে।

"এখন হইতে বালকগণকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা শিক্ষায়ও নিয়োগ করিতে হইবে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড; শৈশবই শিক্ষার উপযুক্ত কাল; সরল শিশু-মনে যে বীজ বপন করা হইবে, কালে তাহাই শাখা-পল্লবে বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করিবে। সুতরাং শৈশব হইতেই ছেলেদের মনে যাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে অনুরাগ বর্ধিত হয় তাহার জন্য অভিভাবকগণ সচেষ্ট হউন, তাহা হইলে আবার আমাদের সুবর্ণবণিক্ জাতির লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবে; আবার এই সাতগেছিয়া গ্রাম ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধির লীলা-নিকেতনে পরিণত হইবে।

"স্বজাতির উন্নতিকল্পে ও পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য এখানে আপনারা কলিকাতার সুবর্ণবণিক্-সমাজের শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার সহিত সমবেতভাবে সুবর্ণবণিক্‌মণ্ডলীর উন্নতি সাধনে যত্নপর হউন। ইহাতে আমাদের জাতির কল্যাণ সাধিত হইবে। আমি এখানে একটি আনন্দের সংবাদ প্রদান করিতেছি যে, কলিকাতা সুবর্ণবণিক্-সমাজ নিজেদের গৃহনির্মাণ করিতেছেন এবং বাড়ীর একতলা পর্যন্ত নির্মিত হইয়াছে।

"আজ আপনারা আমাকে অভিনন্দিত করিয়া যে সম্মান দান করিলেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইলে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ মোটরযোগে কলিকাতা রওনা হন।

যাঁহারা এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার শীল, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ শীল, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দে, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে, শ্রীযুক্ত প্রপঞ্চকুমার বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দে, শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ শীল ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার দাস।

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ শ্রীধরপুর অবিনাশ ইনষ্টিটিউশনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারের জন্য এক সেট বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রদান করিয়াছেন এবং পরে আরও অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও গ্রামবাসী সকলের ধন্যবাদার্হ।

স্বর্গীয় কানাইলাল চন্দ্র

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(১৩৪৪ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(৬)

"মঙ্গলাচরণে"র পরের অধ্যায়ের নাম—"ব্রহ্মমোহন।" এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত ব্রহ্মমোহন-লীলার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন।

গোলোকের ঠাকুর নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া কি ভাবে তাঁহার সৃষ্ট মানবের সহিত লীলা করেন, তাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা স্বর্গবাসী দেবতাগণের মনে জাগিয়া উঠে। এমন কি লোক-পিতামহ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত এই আকাঙ্ক্ষার হাত হইতে অব্যাহতি পান না। কিন্তু লীলা দেখিতে আসিয়া লীলার সম্যক্ তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করিতে অক্ষম হওয়ায়, বিভ্রান্ত ও জ্ঞানহত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবান্ গোপবালকদিগের সহিত মাঠে গোচারণ করিতেন। এই উপলক্ষে তাহাদের সহিত তাঁহার নানাবিধ ক্রীড়া ও বনভোজনাদিরও আয়োজন হইত। এই ঘটনার আলোচনায় কানাইলাল বাবু বলিতেছেন,—"এই বনভোজন ইন্দ্র-আদি দেবতারা আকাশমার্গ হইতে দরশন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং ব্রজবালকদিগকে ধন্যবাদ দিলেন যে, যে ভগবান্‌কে মুনি-ঋষিরা ধ্যানেতে পান না, যে ভগবান্ বেদ ও শ্রুতির অগোচর, সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ গোপবালকদিগের সহিত সামান্য বালকের ন্যায় বিহার করিতেছেন ও তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট অন্ন পর্য্যন্ত উদরস্থ করিতেছেন। দেবতারা কহিয়াছিলেন,—অহো! ইহাদিগের কি ভাগ্য! প্রভু আমাদিগকে স্বর্গ, উর্বশী, ঐরাবত প্রভৃতি দিয়া প্রবঞ্চনা করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। যদ্যপি আমাদিগের ভাগ্যে ব্রজের রাখালত্ব ঘটিত, তাহা হইলে আমরাও এইরূপ ভগবানের সহিত আনন্দ করিতাম।" পৃঃ ১ ও ২

দেবতাদের মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অপার্থিব লীলার কথা শ্রবণ করিয়া এবং ইহার লীলায়িত বিকাশ দেখিবার জন্য ব্রহ্মার মনে প্রবল আগ্রহ হইল। তারপর —"একদা আকাশ-পথ হইতে দেখিলেন যে, অঘাসুর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজবালকদিগকে গ্রাস করিতে আসিয়া আপনি নিহত হইল, ও অন্য প্রতিফল না পাইয়া কৃষ্ণপদে লীন হইল। দেখিয়া ব্রহ্মার আকাঙ্ক্ষা হইল যে, ভগবানের মহিমা আরও কিঞ্চিৎ অধিক দেখিতে হইবেক। অতএব বনভোজনে যখন বালকসকল আনন্দে আহার করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তখন তিনি গো-বৎস সকলকে হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং ভগবান্ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) যখন বৎসসকলের তল্লাসে ব্রজবালকদিগকে ছাড়িয়া যাইলেন, তখন তিনি ঐ বালকদিগকেও হরণ করিলেন।"

পৃঃ ১

ইহা লইয়াই ব্রহ্মমোহন লীলার সূত্রপাত। দেবতারা যায় ব্রহ্মা পর্যন্ত সকল সম্পদের ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলেও, ভগবানের লীলা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না। তাই ব্রহ্মার মনে হইল, ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবানের পক্ষে—এ কিরূপে সম্ভবে। তাই তিনি পরীক্ষার জন্য গোবৎসমূহ ও ব্রজবালকগণকে হরণ করিলেন। কিন্তু যিনি অন্তর্যামী, তাঁহার অগোচর কিছুই রহিল না। তিনি আবার নিজ মায়ায় গোবৎস ও ব্রজ-বালকগণকে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিলেন।

এই বিষয় লইয়া গ্রন্থকার একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মা ভগবানের পুত্রস্বরূপ হইয়া তাঁহার পিতার উপর এ মায়া বিস্তার করিলেন কেন, তিনি ত জানিতেন যে, তাঁহার অল্প মায়া ভগবানের প্রকাণ্ড মায়াকে মুগ্ধ করিতে

পারে না। তিনি যদ্যপি ভগবানের বিশেষ মহিমা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিলেই ত তাঁহার কল্পনা সিদ্ধ হইত। নদ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, বৃক্ষ ও পৃথিবী যাঁহার উদরস্থ, যিনি বিরাট্ ও বিশ্বরূপী, তাঁহার ইহাপেক্ষা আর কি মহিমা অধিক আছে? আর যদ্যপি তিনি বিরাট্ ও বিশ্বরূপী হইলেন, সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার শরীরের ভিতর ও সকল স্থাবর ও জঙ্গম তাঁহা হইতেই সৃষ্টি। যেমন মাকড়সা কীট তাহার আপনার মুখ হইতে সূত্র নির্গত করিয়া আপনার জাল নির্মাণ করে এবং অবশেষে সেই জাল উদরস্থ করিয়া ফেলে, সেইমত ভগবান্ আপনা হইতে সৃষ্টি করিয়া আপনাতেই সমন্বয় করেন। এ বিষয়ে ব্রহ্মার কেন ভ্রম হইল, তাহা বড়ই আশ্চর্য। তবে কি ব্রহ্মা—জড় পদার্থ পদ্ম হইতে তাঁহার জন্ম, তাহার কারণেই কি তিনি হতবুদ্ধি হইলেন?" পৃঃ ২

এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া গ্রন্থকার দুই দফায় তাহার উত্তর দিতেছেন।—"উত্তর—প্রথমতঃ ব্রহ্মা যে এরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের আদেশ না হইলে তিনি কখন এ কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি ভগবানের পুত্র, সকলেই অবগত আছেন; অতএব আমরা মূঢ় হইয়া যে কর্মেতে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হই না, তিনি বেদবক্তা হইয়া কিরূপে বিনা অনুমতিতে তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন? তিনি জানিতেন যে, তাঁহার মায়া ভগবানের মায়ার এক অংশ এবং অংশ হইয়া পূর্ণকে কখন আচ্ছাদন করিতে পারে না। যেমন কোয়াশা অর্থাৎ হিমকণা কিয়দংশ অন্ধকার বটে, কিন্তু ঘোর অন্ধকার রজনীতে কেবল রজনীর অন্ধকারের সহকারী হয়, কিংবা যেরূপ দিবাভাগে জোনাকীকীটের তেজ একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে; ব্রহ্মা জ্ঞাত ছিলেন যে, তাঁহার মায়া ভগবানের মায়ার সম্মুখে সেইমত হইবেক।

"দ্বিতীয়তঃ—ব্রহ্মা যতক্ষণ আকাশমার্গে অঘাসুর-বধ দরশন করিয়াছিলেন, ততক্ষণ কৃষ্ণের উপর তাঁহার ঐশ্বর্য-ভাব ছিল, কিন্তু যে মুহূর্তকে তিনি বৃন্দাবনধামে প্রবেশ

নয়। অক্রুর মহাশয় যখন মহারাজ কংসের আদেশে কৃষ্ণ-বলদেবকে মথুরা নগরে আনয়ন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার মনেতে কত রকম ভাবই উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, রামকৃষ্ণকে কি তাঁহার ভাগ্যে দরশন হইবে? যাঁহারা মনোবাক্যের অগোচর, যাঁহাদিগকে ষড়দরশনে দরশন মেলে না, বেদ ও শ্রুতিতে নির্ণয় করিতে অশক্ত, তাঁহার যে সমীপে যাইব, এ অসম্ভব। কিন্তু যদি দরশন মেলে, তিনি কল্পনা করিলেন যে, অগ্রে গিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া, তবে কংসের নিমন্ত্রণ দিব। কিন্তু কি আশ্চর্য যে, বৃন্দাবনধামে পৌছিবামাত্র তাঁহার এ ভাব আর রহিল না। যখন নন্দালয়ে তিনি উত্তীর্ণ হইলেন, নন্দমহারাজের আজ্ঞানুসারে কৃষ্ণ অক্রুর মহাশয়ের পদধৌত করিয়া দিলেন। অক্রুর মহাশয়ও সেই সেবা গ্রহণ করিলেন।" পৃঃ ৩

"শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে, কৃষ্ণ মায়া-হেতু লীলা-শরীর ধারণ করিয়াছেন।" এখানে গ্রন্থকার কানাইবাবু এই 'মায়া'র অর্থ করিতেছেন, কৃপা। তিনি কৃপা করিয়া দেহধারী হইয়াছিলেন। ভগবান্ যুগে যুগে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া,—করুণা করিয়া দেহধারণ করেন। গোস্বামী-পাদ শ্রীরূপও শ্রীচৈতন্য অবতারের কথা বলিতে গিয়া, বলেন—"করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ"। তিনি নিজে স্বেচ্ছা-পূর্বক করুণা করিয়া দর্শন না দিলে, জীবের ভাগ্যে, তপস্যা, যোগ বা ব্রত সাহায্যে তাঁহার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় না। সুতরাং লীলার বিকাশের জন্য তিনি যাহা করিবেন, তাহা সর্বজীবের বুদ্ধি ও বেদবিধিরও অগোচর।

এই লীলা দ্বারা তিনি ব্রহ্মাকে দেখাইলেন, ব্রজমণ্ডলে নারায়ণ ব্যতীত আর কিছুই নাই। এখানে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ-মূর্তিধারী বিষ্ণু নহেন, এখানে তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর। ব্রজের যাহা কিছু সকলই তিনি, ব্রজের বৎস, ব্রজবালক, গোপ-গোপী সমস্তই তাঁহার ছায়া—ইহাদের সৃষ্টি তাঁহা হইতেই, এবং লয়ও হইবে তাঁহারই মধ্যে।

আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কতক্ষণের নিমিত্ত? যাই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এ ব্রহ্মার কার্য তৎক্ষণাৎ তিনি নিজ মায়া বিস্তার করিয়া মাতৃবৎ গোপীদিগের ও গোসকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।" পৃঃ ৬

তারপর তিনি—"ব্রহ্মার কষ্ট ও মূর্ছাপ্রাপ্তি দেখিয়া মায়া-যবনিকা ব্রহ্মার সম্মুখ হইতে উত্তোলন করিলেন অর্থাৎ মায়া-অন্ধকার হইতে তাঁহাকে পরিত্রাণ করিলেন; কারণ তিনি মায়া-নদীর পর (অতীত), সুতরাং যতক্ষণ ব্রহ্মা মায়া-নদীতে ডুবিয়াছিলেন, অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার চক্ষুগোচর হয় নাই; কিন্তু মস্তক উত্তোলন করিয়াই তাহার ভগবান্ দরশন হইল।" (পৃঃ ৭) এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়, দেহ ও মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মা দেখিলেন, তিনি বৃন্দাবনে দাঁড়াইয়া আছেন, যে বৃন্দাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম এবং যে স্থান হইতে তিনি কখনও অন্তর্হিত হন না।"

ইহার পর গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায়ের নাম—"ব্রহ্মার স্তব।" ইহা একটি বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ইহার আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স্তবের প্রথমেই ব্রহ্মা বলিতেছেন—"হে ঈড্য! অর্থাৎ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত যত রূপ আছে, তাহাদিগের মধ্যে স্তবনীয়। তোমার দেহ জলবিশিষ্ট মেঘের ন্যায়। ইহাতে পূর্বপক্ষ এই যে, রূপ মেঘের ন্যায় হইতে পারে, কিন্তু দেহ কিরূপে মেঘের ন্যায় হইবে? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ, মেঘ কোন স্থূল পদার্থের ন্যায় নয়, কারণ উহার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইলে মেঘের আকারের কোন পরিবর্তন হয় না। সেই মত ভগবানের চিন্ময় দেহের কোন প্রকারে বিকৃতি কিম্বা ভেদ করিতে পারা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, মেঘ যেমন অত্যন্ত উত্তাপ না হইলে বারি দান করে না, তেমনি জীব নিতান্ত উত্তপ্ত হইয়া একান্ত শরণাপন্ন না হইলে, ভগবান্ কৃপা করেন না।" পৃঃ ৯

তারপর ব্রহ্মা বলিলেন—"হে প্রভু! তুমি পীতবস্ত্র পরিধান করিয়াছ, এ পীতবস্ত্র—'তড়িদম্বরায়' অর্থাৎ বিদ্যুতেতে নির্মিত হইয়াছে, সামান্য স্থূল পদার্থে নির্মিত হয় নাই। ভগবানের বস্ত্র দেখিতে বস্ত্রের ন্যায় বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত।" পৃঃ ৯

ইহার অর্থাৎ এই 'অপ্রাকৃতের' আলোচনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"যে সকল পদার্থ আমরা স্থূল চক্ষুতে দেখিতে পাই না, তাহাকে 'অপ্রাকৃত' কহি। প্রকৃতি শব্দে মায়া। এই মায়া-নদীর জলে আমরা ডুবিয়া আছি। জলের ভিতর মস্তক ডুবাইয়া রাখিলে যেমন তটের অর্থাৎ পারের কোন বস্তু দৃশ্য হয় না, সেইরূপ মায়াতীত যে সকল পদার্থ আছে, তাহা আমাদিগের নয়ন-গোচর হয় না। ভগবানের রূপ ও তাঁহার বস্ত্র প্রভৃতি আমাদিগের মায়াবিশিষ্ট চক্ষুতে দেখিতে পাই না। ভগবানের সম্পর্কীয় যত বেশভূষা আছে, সকলি অপ্রাকৃত।" পৃঃ ৯ ও ১০

পুনরায় তিনি প্রশ্নচ্ছলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন—"এখানে ব্রহ্মা এই শ্লোকে কেবল ভগবানের রূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তবে ইহাকে স্তব কি প্রকারে কহা যাইতে পারে?" ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন—"এজন্য ব্রহ্মা পুনরায় কহিলেন যে, হে বিভো! তোমার এ সুলভ রূপেরও মহিমা আমি নিরূপিত করিতে পারিলাম না। কিন্তু যাহারা তোমাকে নির্গুণ ব্রহ্মভাবে ভজনা করে, কিরূপে তাহারা তোমাকে জানিতে সমর্থ হয়?—আমার বড় আশ্চর্য বোধ হইতেছে। যাহারা সাকার ভাব ছাড়িয়া ও ভক্তিপথ ত্যাগ করিয়া, কেবল শুষ্ক জ্ঞান-পথ অবলম্বন করে, তাহাদিগের পরিশ্রম কখনই সফল হয় না।

*　*　*　*　*　*　*

হে অপরিচ্ছিন্ন! অর্থাৎ যাহার আকার কেহ বিভাগ করিতে পারে না, কিম্বা যাহাকে কেহ সহজে দেখিতে পায় না, কিম্বা যাহার সীমা হয়না, তোমার সেই মহিমা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর।" পৃঃ ১০ ও ১১

কলিকাতা যাদুঘরে নূতন সংগ্রহ

জুলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া প্রাণিবিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা যাদুঘরে দুইটি নূতন বর্ণ-বৈচিত্র্যময় বস্তু প্রদর্শিত করিয়াছেন। প্রাণিবিজ্ঞানের গ্যালারীতে প্রদর্শিত বস্তুনিচয় সাধারণকে তেমন আকৃষ্ট করে না। কারণ সঙ্কুচিত ও রেখাসমন্বিত বস্তুগুলিকে সুরাসার বা ফার্মলিনে ডুবাইয়া রাখিলে, উহারা তাহাদের বর্ণ-বৈচিত্র্য হারাইয়া ফেলে। যে সমস্ত অশিক্ষিত লোক আমোদলাভার্থ যাদুঘর দেখিতে যায়, তাহারা অপরিচিত প্রাণিগুলিকে দেখিয়া বিস্মিত হয়, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ বা অনুরাগ সৃষ্ট হয় না। চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক বস্তুগুলির গায়ে যে ব্যাখ্যা-সম্বলিত লেবেল আঁটিয়া দিয়াছেন, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও আকর্ষণী শক্তির অভাবে নিরক্ষর দর্শক উহা পড়িবার জন্য থামে না বা মাথা ঘামায় না।

এই গ্যালারিকে শিক্ষাপ্রদ ও আকর্ষণীয় করিবার অভিপ্রায়ে দুইটি ক্ষুদ্র আধার সংস্থাপিত হইয়াছে; উহা গুপ্ত বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। উক্ত বৈদ্যুতিক আলোকমালা সামুদ্রিক উদ্ভিদ্‌গুলিকে সমুদ্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উজ্জ্বল চিত্রে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যময়রূপে প্রতিভাত করিবে।

কোমল দেহবিশিষ্ট সামুদ্রিক উদ্ভিদ্, যাহারা গভীর তলদেশে স্থির জলে ঠিক ফুলের মত দেখায়, গ্রীষ্মকালীন সমুদ্রের তলদেশে বর্ণসুষমাবিশিষ্ট দেহ অর্ধেক প্রোথিত করিয়া বিরাজ করে, বিভিন্ন বয়সের এই উদ্ভিদ্‌সমূহের একটি আধার সংস্থাপিত হইয়াছে। আর একটি আধারে তপস্বী কাঁকড়া ও সামুদ্রিক উদ্ভিদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তপস্বী কাঁকড়ার খোলা নরম—সাধারণ কাঁকড়ার মত শক্ত নহে। তপস্বী কাঁকড়া আত্মরক্ষার জন্য সামুদ্রিক শম্বুকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে ও শরীরের এমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল বাহির করে, যাহা সমুদ্রতলে খাদ্যান্বেষণে ও চলাফেরায় দরকার।

বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ লোকদের জন্য আধারের গায়ে সাধারণের ভাষায় লিখিত লেবেল আঁটা আছে; উহাতে দ্রব্যনিচয়ের বিশদব্যাখ্যা রহিয়াছে।

প্রাথমিক অবস্থায় সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ জলে সাঁতার কাটে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহারা কঠিন স্তরে আবদ্ধ হইয়া যায়। সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ সামুদ্রিক শম্বুকের খোলায় সংলগ্ন থাকে ও তপস্বী কাঁকড়া সামুদ্রিক শম্বুকের খোলায় আত্মগোপন করে—উভয়ের এই সংস্রব হঠাৎ সংঘটিত নহে—উহা পরস্পরের উপকারার্থ ভগবানের বিধান।

প্রাণি-বিজ্ঞান্‌বিদ্ বলেন যে, সামুদ্রিক উদ্ভিদের শরীরস্থ কন্টকনিভ দাঁড়া তপস্বী কাঁকড়াকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করে; পক্ষান্তরে তপস্বী কাঁকড়াও সামুদ্রিক উদ্ভিদ্‌কে শিকার ধরার উপযোগী স্থানে লইয়া বেড়ায়। তপস্বী কাঁকড়া প্রাণীর যে অংশ ফেলিয়া দেয়, উহা সামুদ্রিক উদ্ভিদের খাদ্য। সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ তাহার দাঁড়া সঙ্কুচিত করিয়া শরীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে। প্রদর্শিত উদ্ভিদ্‌সমূহের মধ্যে একটি ব্যতীত সকলেই দাঁড়া সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে দেখা যায়।

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড

ভারতে টিউবারকিউলোসিস

লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েসন এণ্ড ওভার-সিস লিগের অধিবেশনে স্কুল অফ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভূতপূর্ব ডিরেক্টার সার জন মেগ "ভারতে টিউবারকিউলোসিস" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই সভায় অধিনেত্রী ছিলেন মাননীয়া বড়লাট-পত্নী লেডি লিংলিথগো। সার জন মেগ বলেন যে, টিউবারকিউলোসিস একটি ব্যাপক ব্যাধি, উহা পৃথিবীর সর্বত্রই পরিদৃশ্যমান।

ইহা এক প্রকার বীজাণু, ইহা বাতাসের মধ্য দিয়া কিম্বা খাদ্য-পানীয়ের সহায়তায় মানবদেহে প্রবিষ্ট হইলেও, যতক্ষণ মানবদেহ উহাকে সহায়তা না করে ততক্ষণ উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। যখন মানবদেহ স্বাভাবিক আত্মরক্ষার শক্তি হারাইয়া অতীব দুর্বল হইয়া পড়ে, তখনই দেহ প্রকৃত পক্ষে এই বীজাণুকে সাহায্য করে। বক্তা বলেন যে, ইহা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, যখন আমরা রোগ প্রতিরোধ করি, তখন আমাদের স্বাভাবিক সংরক্ষণী শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সুতরাং বলা চলে যে, টিউবারকিউলোসিস ছদ্মবেশে উপকারই করিয়া থাকে। অতএব উক্ত শব্দ শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। যে সকল লোক পুষ্টিকর খাদ্য আহার করে এবং শ্রমজনক কার্যে ঘরের বাহিরে অধিকাংশ সময় কাটায়, তাহাদের এই রোগাক্রমণের ভয় থাকেনা। অনেকের শরীরে এই বীজাণু বর্তমান থাকিলেও তাহারা তাহা জানে না; অনেকে স্বাভাবিক প্রতিরোধ-ক্ষমতাবলে ইহার স্পর্শ হইতে মুক্তিলাভ করে।

ইহা কৌলিক ব্যাধি বলিয়াও ভীত হইবার কারণ নাই। কৌলিক টিউবারকিউলোসিস বলিয়া কোন বস্তু নাই;—এই ব্যাধি বরাবর আত্মগৃহীত। যখন পিতামাতা উভয়েই টিউবারকিউলোসিস রোগে আক্রান্ত; তখনও নবজাত শিশুকে সম্পূর্ণ রোগস্পর্শহীন মনে করা অসঙ্গত নহে। ইহাকে এই মর্মে কৌলিক বলা হয় যে, কোন কোন বালক এত দুর্বল থাকে যে, তাহাদের রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি খুবই সামান্য। ইংল্যণ্ডে এক শতাব্দী পূর্বে প্রতি দশ লক্ষে ৪৫০০ লোক টিউবারকিউলোসিস রোগে প্রাণত্যাগ করিত, এখন সেই সংখ্যা ৬৫০। এই সংখ্যা-হ্রাসের জন্য জীবন-যাত্রা-প্রণালীর উৎকর্ষই প্রশংসা পাইবার যোগ্য। এই রোগের সহিত সংগ্রামে উৎকৃষ্ট গৃহ, উৎকৃষ্ট সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং উৎকৃষ্ট খাদ্যই প্রধান অস্ত্র। তিনি আরও বলেন যে, কোন কোন লোক বলিয়া থাকে যে, আধুনিক চিকিৎসা টিউবারকিউলোসিস্ রোগগ্রস্ত-লোকের জীবন দীর্ঘস্থায়ী করিয়া রোগ-বীজাণু ছড়াইয়া দেয় এবং কৌলিক রোগগ্রস্ত সন্তানের জন্মদান করে। তিনি বলেন যে, এই যুক্তির কোন সারবত্তা নাই। যাহাতে জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করে, তাহাই টিউবারকিউলোসিস হ্রাস করিয়া থাকে। যদি লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন না হয়, তবে যে-কোন রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতাই ব্যাহত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ বর্তমানে শতাব্দী-পূর্ব ইংল্যণ্ডের স্থানে দণ্ডায়মান। অন্যান্য দেশে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইতেছে, তাহা ভারতের পক্ষে উপকারী। ভারতে সাধারণ দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাব হেতু রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ডাক্তারেরা সকলেই একমত যে, টিউবারকিউলোসিস ভারতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছে; অথচ পূর্বে গ্রামে এই রোগ দৃষ্ট হইত না। বক্তা নিজেও ভারতের গ্রামাঞ্চলে রোগগ্রস্তের সংখ্যা নির্ণয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বলেন যে, উহা ১৫—২০ লক্ষ। তিনি সংখ্যা-গণনার পক্ষপাতী; কিন্তু যেখানে সংখ্যা-গণনা সম্ভব নহে, সেখানেও অনেক কিছু করিবার আছে। তবে লোকদিগকে নিজেদের কাজ নিজে করিবার শিক্ষা দেওয়া সর্বোৎকৃষ্ট। সর্বপ্রকারের আন্দোলন চালানও দরকার। কিন্তু রোগের ভীষণতার দিকে বিশেষ জোর দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ভয় দেখাইয়া কোন উপকার করা সম্ভব নহে। সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল রাখা ও সংক্রামক রোগের হাত হইতে আত্মরক্ষার উপায় জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়াই উৎকৃষ্ট কার্য। যেভাবে জনসাধারণের মন ও অনুভূতি জাগিয়া উঠে সেইভাবে কার্য করাই বাঞ্ছনীয়। মাননীয় লেডি লিংলিথগোর প্রেরণায় শিক্ষিত লোকেরা এই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু যতই জনসাধারণ নিজেদের অংশ নিজেরা সম্পাদন করিবে, ততই রোগ-প্রতিরোধে সুফল পাওয়া যাইবে।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

মাৎগুড়ে জমি উন্নয়ন

মাৎগুড়ের দ্বারা কি প্রকারে জমি উন্নয়ন করা যায়

তাহার সম্বন্ধে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর নীলরত্ন ধর কানপুর কৃষি-কলেজের ছাত্রদিগের নিকট এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন। ভারতে কৃষির উপযোগী জমি জন প্রতি ০°৭৫ একর বা এক বিঘা ১৭ কাঠা কিন্তু আমেরিকার যুক্ত রাজ্য ও ফ্রান্সে জন প্রতি জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৭ বিঘা ১৭ কাঠা ও ৭ বিঘা ৯ কাঠা। ভারতের যুক্ত প্রদেশেই প্রায় ১৫০ লক্ষ বিঘা জমি অনুর্বর আছে। বিহার, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও মহীশূরে বহু অনুর্বর জমি আছে। উহাকে কৃষির উপযোগী করা একটা গুরুতর সমস্যা। ভারতের জমির সম্বন্ধে অসুবিধা এই যে, অধিকাংশ জমিতে অসময়ে বৃষ্টি হয় বা অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় তাহার জন্য জমিতে ক্ষার জন্মে। রুশিয়া, হল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে জমিতে জিপ্‌সাম দিয়া ক্ষার-দোষ দূর করিয়া জমি কৃষির উপযোগী করা হয়। ভারতে ঐরূপ করিতে প্রতি তিন বিঘায় ৭ শত টাকা ব্যয় পড়িবে, তজ্জন্য তাহা সম্ভব নহে। এতদ্ব্যতীত ভারতের জমিতে জিপ্‌সাম সেরূপ উপযোগী নহে। মাৎগুড় দ্বারা জমির ক্ষার-ভাব দূর করা যায়। মহীশূরে দেখা গিয়াছে যে, মাৎগুড় জমিতে দিলে একাদিক্রমে দুই বৎসর প্রায় ৪॥ মণ বেশী চাউল পাওয়া যায়। ইহা সন্তোষজনক হওয়ায় মহীশূর গভর্ণমেণ্ট অধিকতর বিস্তৃতভাবে মাৎগুড়ের পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। চিনি উৎপাদন করিবার কালে যে মাৎগুড় পাওয়া যায় তাহা অনুর্বর জমিতে দিয়া ঐ জমি কৃষিকার্যের উপযোগী করিয়া কার্যে লাগাইলে উহার সদ্ব্যবহার হইবে।

সঞ্জীবনী

স্বর্ণের আমদানি-রপ্তানি

সাল	আমদানি	রপ্তানি
১৯১৪-১৫	৭৬৪৭৪০০০৲	
১৯১৫-১৬		১০৯১০০০৲
১৯১৬-১৭	১৩২৩৫৪০০০৲	
১৯১৭-১৮	২৫১৭৮৬০০০৲	
১৯১৮-১৯		৫৫৬৩৭০০০৲
১৯১৯-২০	৩৫১৩০১০০০৲	
১৯২০-২১	২১০৮২০০০৲	
১৯২১-২২		২৬৬৪৫০০০৲
১৯২২-২৩	৪১১৯০৮০০০৲	
১৯২৩-২৪	২০১৮৬৩১০০৲	
১৯২৪-২৫	৭৩৯২৬৬০০০৲	
১৯২৫-২৬	৩৪৮৫৪৫০০০৲	
১৯২৬-২৭	১৯৪০০৫০০৲	
১৯২৭-২৮	১৮০৯৯০০০০৲	
১৯২৮-২৯	২১১৯৮৭০০০৲	
১৯২৯-৩০	১৪২২০৮০০০৲	
১৯৩০-৩১	১২৭৫১২০০০৲	
১৯৩১-৩২		৫৭৯৭২৮০০০৲
১৯৩২-৩৩		৬৫৫২২৮০০০৲
১৯৩৩-৩৪		৫৭০৫৩৬০০০৲
১৯৩৪-৩৫		৫২৫৩৭৫০০০৲
১৯৩৫-৩৬		৩৭৩৫০০০০০৲
১৯৩৬-৩৭		২৭৮৫০০০০০৲

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

নাস্তিক

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(১৪)

সুশান্ত যখন বাংলোয় ফিরিয়া আসিল তখন বেলা প্রায় ৯টা। তাহার পাশের কক্ষ হইতে দুই তিনটি মহিলার কণ্ঠধ্বনি তাহার শ্রুতিগোচর হইল। সারা পথ সুশান্ত ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে—যে মেঘ শাদা পাল তুলিয়া ভাসিয়া যায় দূর-দূরান্তরে কত শ্যামল তরুশিরে জলধারা বর্ষণ করিয়া, কত জনপদবধূর ভ্রূবিলাসবিহীন উন্মার্গগামী মধুকরের অনুকারী দৃষ্টির মধ্য দিয়া, তাহারই মত কোন শুভ্রবসনা তরুণী যদি আসিত তাহার জীবন-পথে এক শান্ত সন্ধ্যায়।

মাঝে মাঝে এইরূপ কল্পনায় বিভোর থাকে সুশান্ত। অনেক সময় দিন-রাত্রির ব্যবধান পর্যন্ত সে ভুলিয়া যায়। শুক্র তারকা ঊষার কোলে ঢলিয়া পড়ে। পূর্বাচলে সিন্দুর রেখা ফুটিয়া উঠে শ্বেত মেঘমালার বক্ষে। শ্যামল গিরি-শিরে ধূসর অরুণিমা জাগে। বিহঙ্গের মধুর কল-কাকলীর ভিতর দিয়া দিবসের আগমন ঘোষিত হয় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে। কিন্তু তাহাতে টুটিয়া যায় সুশান্তের স্বপ্ন—সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাময়ী অশরীরী নারীমূর্তি মিলাইয়া যায় কোন দূরশূন্যে, যেখানে কল্পনা মূর্ছিত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

কিন্তু পার্শ্বস্থিত কক্ষের বামাকণ্ঠের কলধ্বনি তাহাকে স্বপ্ন-জগৎ হইতে বাস্তবের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিল। সে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পাচক কেশবলালকে হাঁক দিল। কেশবলাল সেলাম করিয়া সামনে দাঁড়াইতেই সুশান্ত চা ও স্যাণ্ডউইচ আনিতে আদেশ করিল। কেশবলাল চলিয়া গেল।

কেশবলাল চলিয়া যাইতেই পার্শ্ববর্তী কক্ষ হইতে সুষমা ও অন্য দুইটি মহিলা বাহিরে আসিল। সুষমা সুশান্তের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাল কোথায় ছিলেন ?"

সুশান্ত—"এক বৃদ্ধার কুটিরে অতিথি হয়েছিলাম।"

সুষমা—"হঠাৎ এ খেয়াল চাপল কেন ?"

সুশান্ত—"ঠিক খেয়াল নয়, তবে বেড়াতে বেড়াতে এত দূরে গিয়ে পড়েছিলাম যে, ফেরা সম্ভব হয় নি। কাজেই আতিথ্য-গ্রহণ ছাড়া এ পাহাড়ী মুল্লুকে আর উপায় কি বলুন!"

সুষমা—"বাবা ত আপনার জন্য ভেবেই অস্থির।"

সুশান্ত—"সে কি! কেন ?"

সুষমা—"আপনি ত আচ্ছা লোক। আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন ? একজন স্বদেশবাসী বিদেশে জঙ্গলে এসে সারা রাত্রি যদি বাড়ী না ফেরে, তবে কি তাঁর জন্য একটুও চিন্তা হয় না ?"

সুশান্ত—"দেখুন বিশ্বে অনেক লোক ত আছে। তাদের জন্য ত কেউ আপনারা ভাবেন না, তা তারা যত জনহীন গভীর অরণ্যেই রাত্রি যাপন করুক না কেন। সুতরাং আমার জন্য ভাবনাটাও ত অস্বাভাবিক।"

সুষমা—"বলেন কি অস্বাভাবিক! বরং ঐটেই স্বাভাবিক। যদি আপনার সঙ্গে আলাপ না হ'ত, তবে হয়ত আপনার কথাই সত্যি বলে মেনে নিতে পার্তাম, কিন্তু পরিচয় হয়েই যে মুস্কিল বাধিয়েছে। প্রথমত আপনি বাঙালী, দ্বিতীয়ত আপনি একা—আপনাকে দেখবার এখানে কেউ নেই। যদি একটি শার্দুল এসে রাত্রিতে আপনাকে জলযোগের জন্য নিয়ে যায়, তবে আপনার পাচক কেশবলালও মাথা ঘামাবে না, বাংলোর দরওয়ানও কাঁদবে না—তারা ঠিক নিজের কাজ করে যাবে। কিন্তু আমরা ত তা পার্বনা। ভগবান্ না করুন, আপনার যদি কিছু হয়, আমরাই সে ব্যথা আগে অনুভব কর্ব।"

সুশান্ত—"আপনার কথা শুনে প্রীত হলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আর আমার জন্য ভাববেন না। আমি ভব-

ঘুরো; কখন কোথায় থাকি ঠিক নেই। যদি কখনো বাঘের পেটেও যাই, তবে সেটা নিজের শক্তিহীনতার পরিচয় বলে মেনে নেব। আর আমার মনে হয়, আত্মরক্ষার ক্ষমতা আমার যথেষ্ট আছে। এ ত সামান্য জঙ্গল—শ্যামরাজ্যের আর মালয় উপদ্বীপের নিবিড় জঙ্গলের গভীর নীরবতায় আমার কোন ক্ষতি কেউ করতে পারেনি।"

সুষমা—"যাক, এখন আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে সময় নষ্ট কর্ব না। আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি দরকার আছে।"

সুশান্ত—"কি?"

সুষমা—"আমার দুটি বন্ধু বেড়াতে এসেছেন। এঁদের একজন মহারাষ্ট্র-নারী, নাম গঙ্গাবাই; দ্বিতীয়া গুজরাটী মহিলা, নাম রত্না।"

এই বলিয়া সুষমা সঙ্গী মহিলা দুইটির সঙ্গে সুশান্তের পরিচয় করাইয়া দিল। পরে বলিল—"এখন এঁদের ইচ্ছা, আমরা পিক্‌নিক্ করি। কিন্তু বাবা কাজ নিয়ে ব্যস্ত; চাপরাসীদের সঙ্গে পিক্‌নিকে যাওয়া আমাদের ইচ্ছে নয়। এখন আপনি যদি আমাদের সঙ্গী হন, তবেই আমরা সাহস করে বেরোতে পারি।"

সুশান্ত উত্তর করিল—"কোন্ দিকে যাবেন?"

সুষমা বলিল—"এখান থেকে তিন মাইল দূরে একটা ক্ষুদ্র জল-প্রপাত আছে। সেখানে একটা বড় আম গাছ রয়েছে। তার তলায় পাথর কুড়িয়ে উনুন জ্বেলে আমরা রাঁধব। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।"

সুশান্ত—"কেশবলালকে সঙ্গে নেব কি? জিনিষ-পত্র-গুলো বয়ে নিয়ে যাবে।"

সুষমা—"বেশ ত নিন না।"

সুশান্ত—"কখন রওনা হবেন?"

সুষমা—"বেলা ১০টায়। সারা দিন সেই জল প্রপাতের ধারে কাটিয়ে সন্ধ্যায় ফেরা যাবে। আপনার কি মত?"

সুশান্ত—"আমার মতের কোন দরকার হবে না। আমি না হয় আজ আপনাদের হাতের পুতুল হব। দেখাই যাক না কেন আপনাদের সঙ্গে দিনটা কাটিয়ে নূতন রকম কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায় কি না।"

সুষমা—"তবে আপনি চা খেয়ে তৈরী হয়ে নিন। আমরাও তৈরী হচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমরা যা বল্‌ব, তাই আপনাকে মেনে নিতে হবে। নিজের প্রভুত্ব খাটান চলবে না বলছি।"

সুশান্ত মৃদু হাসিয়া বলিল—"বেশ তাই হবে।"

এই বলিয়া সুশান্ত স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিল এবং কেশবলালের আনীত চা ও স্যাণ্ডউইচ ভক্ষণে নিরত হইল। ক্রমশঃ

জাতীয় সংবাদ

চুঁচুড়া অনাথ-ভাণ্ডার

আমাদের স্বজাতীয় কর্মী শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ আঢ্য এই জনহিতকর দাতব্য ভাণ্ডারের কার্যকরী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত মহাদেব শীল ও কার্ত্তিকচরণ পাল। তাঁহারাও আমাদের স্বজাতি।

দান

শ্রীযুক্ত সতীশচরণ লাহা যক্ষ্মা-নিবারণ-ভাণ্ডারে ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীবলাইচাঁদ আঢ্য

সুবর্ণবণিকের কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত মনোমোহন দে সম্প্রতি Incorporated

Accountancyর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ দে। তিনি হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাংসারিক অস্বচ্ছলতার জন্য বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় অধ্যবসার বলে ১৯৩৫ সালে বি কম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে রামগোপাল সেন বৃত্তি লাভ করিয়া ও Price Waterhouse Peat & Co.-র সাহায্য লাভ করিয়া Incorporated Accountancy পড়িবার জন্য ১৯৩৬ সালে বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি Howard Pie and Co.র অফিসে কাজ করিতেন ও রাত্রিকালে অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি রেলওয়ে অডিট ও ট্রান্সপোর্ট হিসাব প্রভৃতি বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া Incorporated Accountancyর শেষ পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। বিলাতে পাঠ্যাবস্থায় তিনি London and North Western Railwayর বিভিন্ন বিভাগে হাতে-কলমে কাজ করিয়া প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজ

১৯৩৮-৩৯ সালের ছাত্রবৃত্তি

বর্তমান বর্ষে সমাজ হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রগণকে এক বৎসরের জন্য বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

	নাম	বিদ্যালয়	শ্রেণী	মাসিক সাহায্য
১।	শ্রীমান্ অভয়পদ দত্ত	কলিকাতা মেডিকেল স্কুল	তৃতীয় বার্ষিক	৬৲
২।	,, সুরেন্দ্রনাথ পাইন	বঙ্গবাসী কলেজ	দ্বিতীয় বার্ষিক আই এ	৪৲
৩।	,, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত	পিটি কলেজ	ঐ আই এস-সি	৫৲
৪।	,, মনোময় ধর	বিদ্যাসাগর	প্রথম বার্ষিক আই কম	৪৲
৫।	,, গোপালচন্দ্র দে	রিপণ	প্রথম বার্ষিক আই এ	৪৲
৬।	,, রমেশচন্দ্র দত্ত	বঙ্গবাসী	,, ,, আই এস-সি	৫৲
৭।	,, প্রহ্লাদনাথ দে	...	,, ,, আই এস-সি	৪৲
৮।	,, নিতাইচাঁদ চন্দ্র	...	তৃতীয় বার্ষিক বি এস-সি	৫৲
৯।	,, শিবনাথ দে	গভর্ণমেণ্ট কমার্সিয়াল	প্রথম বার্ষিক আই কম	৪৲
১০।	,, রাসবিহারী দাস	যাদবপুর টেকনিক্যাল	দ্বিতীয় বার্ষিক	৫৲
১১।	,, যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক	ঐ ঐ	প্রথম বার্ষিক ...	৫৲
১২।	,, নেপালচন্দ্র দে	ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল	... আর্ট	৪৲
১৩।	,, সুরেন্দ্রনাথ সেন	বঙ্গবাসী কলেজ	চতুর্থ বার্ষিক বি এ	৩৲
১৪।১৫।	,, আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের ২ জন স্বজাতি ছাত্র			২৲

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন
সম্পাদক

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক সমাচার

২২শ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪৫ সাল | ৮ম সংখ্যা

মেঘদূত

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম্ বি এ এ, ও এ আর এফ

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥"

আরম্ভটা হয়ত ঠিক হইল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেঘদূতের প্রারম্ভে কবি দেবতাকে প্রণাম করেন নাই। আমি অতি মন্দবুদ্ধি জীব; দেবতাকে প্রণাম না করিয়া কথারম্ভ করা আমার পক্ষে শোভনীয় নহে, মনে করিয়া কবির অন্য কাব্য রঘুবংশ হইতে প্রণামটি গ্রহণ করিয়াছি।

প্রসিদ্ধি আছে কালিদাস কোন এক বিদুষী নারীর মূর্খ পতি হইয়াছিলেন। ঐ বিদুষী নারী পণ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে পাণ্ডিত্যে পরাজিত করিবে তিনি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। বহু পণ্ডিত অকৃতকার্য হইলে তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া একজন মূর্খকে আনিতে আদেশ দিলেন। অনুচরগণ দেখিল এক করিতেছে। তাহারা ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত মূর্খ বোধে ঐ বিদুষী নারীর নিকট লইয়া আসিলে, তিনি তাহাকে মৌখিক প্রশ্ন না করিয়া সঙ্কেতে একটি অঙ্গুলী প্রদর্শন করিলেন। কালিদাস যাহাই বুঝুন, উত্তরে দুইটি অঙ্গুলী দেখাইলেন; কন্যা দেখাইলেন তিনটি অঙ্গুলী, কালিদাস দেখাইলেন চারিটি; অতঃপর কন্যা দেখাইলেন পাঁচটি অঙ্গুলী, কালিদাস উহা চপেটাঘাতের সঙ্কেত মনে করিয়াই হউক অথবা আর যাহাই হউক, কন্যাকে মুষ্ট্যাঘাতের সঙ্কেত প্রদর্শন করিলেন। ইহাতে কন্যা নিজেকে পরাজিতা মনে করিয়া তাঁহাকেই বরমাল্য দিলেন। কিন্তু বাসর-ঘরে আলাপ করিবার সময় বুঝিলেন স্বামী মূর্খ; তখন তিনি কালিকাসকে বাসর-ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। কালিদাস মনের দুঃখে সরস্বতী-হ্রদে,

ঐ হ্রদে অবগাহন করে দেবী সরস্বতী তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাহাকে পণ্ডিত করিয়া দেন। তদনুসারে দেবী মূর্খ কালিদাসকে কবি কালিদাস করিয়া দিলেন। অনন্তর কবি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন গৃহদ্বার ভিতর হইতে বন্ধ রহিয়াছে। কালিদাস দ্বার অর্গলমুক্ত করিতে অনুরোধ করিলে তাঁহার স্ত্রী প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিদাস উত্তর করিলেন—

"অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ"

তাঁহার স্ত্রী গৃহমধ্য হইতে উত্তর করিলেন, বিশেষ বাক্য কি বল? তখন কালিদাস দ্বারে উপবেশন করিয়া 'অস্তি' প্রারম্ভে "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ"। এই আদ্যশ্লোকাত্মক কুমারসম্ভব; 'কশ্চিৎ' প্রারম্ভে "কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ" এই আদ্যশ্লোকাত্মক মেঘদূত এবং 'বাগ' প্রারম্ভে "বাগার্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে" এই আদ্যশ্লোকাত্মক রঘুবংশ রচনা করিয়া স্ত্রীকে শুনাইলেন। অতপরঃ অরুণোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তাঁহাদের দাম্পত্য-কলহ দূরীভূত হইয়া মধুর মিলন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

কালিদাসের কাল ও জন্মস্থান সম্বন্ধে নানা বাদানুবাদ প্রচলিত আছে, সুধীবৃন্দ তাহা অবগত আছেন। আমি কালিদাসকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক ও বাঙালী বলিয়া মনে করি। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মালব দেশের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে শকারি বিক্রমাদিত্য নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজসভায় কালিদাস প্রমুখ নয়জন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা নবরত্ন নামে প্রসিদ্ধ।

মেঘদূত কালিদাসের অপূর্ব সৃষ্টি। ইহা খণ্ড কাব্য নামে অভিহিত। কাব্য দ্বিবিধ—মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য। মহাকাব্য কমও নয় বেশীও নয় এই প্রকার আটটির অধিক সর্গবন্ধ এবং কোন দেবতা, সংকুলজাত রাজা কিম্বা একবংশীয় সৎকুলজাত বহু রাজার কাহিনীতে পূর্ণ হইবে। মহাকাব্যের অন্যান্য লক্ষণও আছে, তাহার বর্ণনা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। যে কাব্যে এবংবিধ কোন লক্ষণ নাই, যাহা মাত্র একটি বিষয় বা ঘটনা লইয়া লিখিত তাহাই খণ্ডকাব্য। মেঘদূত স্বর্গবন্ধ নহে, ইহার মাত্র দুইটি অংশ; পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। বিষয় মাত্র একটি; বিরহী যক্ষের প্রিয়া বিরহ-কাতরা; প্রাণের বারতা অলকায় বিরহিণী প্রিয়ার নিকটে প্রেরণ করা। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন— "মেঘদূতকে দেশীয় আলঙ্কারিকেরা খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য বলিয়া কাব্যভেদ করা তাঁহাদের গায়ের জোর মাত্র। মেঘদূত সার ধরিতে গেলে একখানি গীতিকাব্য, এবং উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকে উহাকে গীতিকাব্যই বলিয়া থাকেন। যখন হৃদয়ে আনন্দ বা শোক ধরে না, তখন তাহাকে কাব্যাকারে বাহির করিয়া দেওয়াই গীতিকাব্য। তবে মেঘদূত গীতিকাব্য কেন না হইবে?" তাঁহার দ্বিতীয় কথা— "মেঘদূতকে অলঙ্কারশাস্ত্রে খণ্ডকাব্য বলে; ইংরাজেরা লিরিক বলেন। কোনটি সত্য? খণ্ডকাব্য,—অর্থ যতদূর বুঝা যায়—টুকরা কাব্য বলিয়াই বোধ হয়, টুকরা কাব্য বলিয়া মেঘদূতের উল্লেখ করিলে জিনিষটার অপমান করা হয়। মেঘদূত টুকরা কাব্য নহে—পূরা সর্বাঙ্গে সুশোভিত, সম্পূর্ণ এবং অপ্রমেয়। সুতরাং মেঘদূত টুকরা কাব্য নহে। ছোট কাব্য বলিতে চাও বল। দৈর্ঘে ছোট কিন্তু ফলে ছোট নয়। কিন্তু খণ্ড বলিতে ত খুব ছোট বুঝায় না। লিরিক বলিলে যাহা বুঝায়, উত্তরমেঘে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু তথাপি উত্তরমেঘকে লিরিক বলা যায় না। কারণ উহা গানে লিখিত নহে। লিরিক গান না হইলে হয় না। কাব্যের বাহ্য আকার লইয়াই লিরিক। তবে উৎকৃষ্ট লিরিকে যে ভাবতন্ময়তা আছে, উত্তরমেঘে সেইরূপ ভাবতন্ময়তা আছে বলিয়া উহাকে লিরিক বলিতে ইচ্ছা কর, বলিতে পার। কিন্তু পূর্বমেঘের অবাধ কল্পনার রমণীয় সৃষ্টিকে লিরিক বলিবে, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। তবে যদি কেহ বলে, খণ্ড শব্দের অর্থ খাড় গুড়,—তখনকার প্রধান মিষ্টি সামগ্রী। আমাদের রাতাবী মনোহরা। তন্ময় কাব্য খণ্ড কাব্য। তাহা হইলে কতক রাজি আছি। সেকালে খণ্ড শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে

নৈষধকার খণ্ডনখণ্ডখাদ্য রচনা করেন। ব্রহ্মগুপ্ত জ্যোতিষে খণ্ডখাদ্য রচনা করেন। আমরা এখন যেমন বলি অমিয় নিমাই চরিত, তেমনই সেকালে খণ্ডকাব্য অর্থে মধুময়, অমৃতময় কাব্য। টুকরা ফুকরা বলিলে জমে না। মেঘদূত মহা মহাকাব্য।"

মেঘদূত কবির অপূর্ব সৃষ্টি—অভূতপূর্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ সাহিত্যে অপর যে সকল দূত-কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় সে সকলই মেঘদূতের অনুকরণ বলিয়া মনে হয়। কাব্যেই প্রকাশ, যক্ষ কুবেরের ভৃত্য ছিল; কর্তব্য কার্যে অবহেলা করায়, কুবের তাহাকে অলকা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া রামগিরিতে আবদ্ধ রাখিয়া ছিলেন। যক্ষ অসম্ভব পত্নীপ্রিয় ছিল। আটমাস বিরহ-বেদনা সহ্য করার পরে নববরষায় প্রথম আষাঢ়ে পর্বতসানুদেশে বপ্রক্রীড়ারত মাতঙ্গের ন্যায় মেঘ দেখিয়া যক্ষ কতকটা পাগল হইয়া গিয়াছিল, তাই ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতে লব্ধজন্ম মেঘকে দূতপদে বরণ করিয়া অলকায় প্রিয়ার নিকটে সন্দেশ পাঠাইতে ব্যগ্র হইয়াছিল। কবি বলিয়াছেন ঃ—

"বিচ্ছেদ-উন্মাদে প্রেমিক সকাশে
সজীব-নির্জীব বিচার কোথা!"

বরদাচরণ

কেহ বলেন মেঘদূতের যক্ষ কবি নিজেই। বাংলা দেশ হইতে বহুদূরে উজ্জয়িনীর রাজসভায় থাকিয়া সুরসিক কবি কালিদাস আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘদূত লিখিয়া পত্নীর নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ বা বলেন, বিশ্ববাসী আমরা, নরনারী সকলেই বিরহী। আমাদের প্রেমাস্পদ, আমাদের দয়িত, কোন্ মানস-লোকে—অলকায় বিরাজিত আছেন। কতকাল আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাই তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য—তাঁহাকে পাইবার জন্য আমরা সকলেই ব্যাকুল, কবি রূপকে সেই কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। অবস্থা যাহাই হউক সেদিকে আমার নজর নাই, আমার নজর 'রচনা কালিদাসস্য' এই কথার প্রতি। কবি মেঘের গমন-পথের যে বর্ণনা দিয়াছেন—মধ্য প্রদেশের রামগিরি হইতে যাত্রা করিয়া আম্রকূট, বিন্ধ্যগিরি, দশার্ণা প্রদেশের ভুবনবিশ্রুত রাজধানী বিদিশা, অবন্তী জনপদের রাজধানী উজ্জয়িনী বা বিশালা নগরী, দেবগিরি, দশপুরধাম, ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, কনখল, হরিদ্বার হইয়া ক্রৌঞ্চরন্ধ্র-পথে কৈলাস ও অলকার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে উহারা যেন প্রাণবন্ত হইয়া মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠে। সমস্ত জড়-জগৎ, জীব-জগৎ—পাহাড়-পর্বত, গিরিগুহা, নদ, নদী, বেতস-শাখা, বৃক্ষ, লতা, বল্লরী, ফুল, ফল, নগর, প্রাসাদ, দেবমন্দির, পশু, পক্ষী, নর, নারী, সকলেই যেন রূপে, রসে, শব্দে, স্পর্শে, গন্ধে—এককথায় তাহাদের সমস্ত ঐশ্বর্য লইয়া চৈতন্যময়—প্রেমময়-মূর্তিতে প্রতিভাত হইয়া উঠে। সকলেই যেন বিরহী যক্ষের দুঃখে দুঃখিত, সকলেই যেন যক্ষের সন্দেশবাহককে তাহার গন্তব্য পথে সাহায্য করিতে, তাহার গমন-পথ সুখময় করিতে, তনু-মন নিযুক্ত করিতেছে। এই খানেই কাব্য ধন্য—কাব্যসাধনা সার্থক!

তাহার পরে অলকা। কবির সে এক নূতন সৃষ্টি; ব্রহ্মলোক নয়, গোলোক নয়, ধ্রুবলোক নয়, অলকা—হিমগিরির তুঙ্গশৃঙ্গ—মানবের অগম্য—যে স্থান হইতে অসাধ্য-সাধক পাশ্চাত্যের দিগ্‌বিজয়িগণ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। সেখানকার ভূমি মণিময়, সৈকত স্বর্ণ-বালুকায় পূর্ণ। সেখানকার গৃহে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলেনা, সেখানকার প্রদীপ রতনে উজলা। সেখানে শত-তারা-বিম্ব জ্যোতির ফুল ফুটায়। সেখানে কৌমুদী পরশে চন্দ্রকান্ত মণি হইতে জল ঝরে, তাহাতে বিলাসিনীগণের অঙ্গ শীতল হয়। সে দেশের রমণীগণের—

"সুকুমার করে লীলার কমল অলকে কুন্দফুল,
নব কুরুবক চূড়া শোভা করে শ্রবণে শিরিষ-দুল,
লোধ্র-পুষ্প-রেণু-প্রলিপ্ত বদন সকল শোভার সার,
বরষার নব নীপের মালিকা সীমন্তের অলঙ্কার।"

ক্ষিতিনাথ

তাহার পরে যক্ষের গৃহ। এত ঐশ্বর্য, এরূপ চারু বর্ণনা রত্নময়ী ভারতভূমির কবি ব্যতীত, জগতের কুত্রাপি কোন কবি বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন—

যক্ষপতির পেরিয়ে প্রাসাদ উত্তরে মোর আবাস ভূমি,
দূর হ'তে তা'র দেখবে চারু ইন্দ্র-ধনু-তোরণ তুমি ;
* * * * *
আমার গৃহে দেখবে আছে দীর্ঘ দীঘি চমৎকার !
পান্না চুণীর পাথর দিয়ে তটের সোপান তৈরী তার ;
ফুটছে সেথা সোনার কমল নীল মাণিকের মৃণালদলে,
হংস-মিথুন মনের সুখে নিত্য সেথা খেলছে জলে ;
* * * * *
সেই সরসীর শ্যামল তীরে দেখবে ছোট পাহাড় তুমি,
ইন্দ্রনীলে তৈরী চূড়া নিত্য-লীলার শৈল ভূমি ;
হেম-কদলীর কানন ঘেরা, দেখলে নয়ন জুড়িয়ে যায়,
আমার প্রিয়ার বড়ই প্রিয় বিহার-গিরি দীপ্তি পায় !
* * * * *
দ্বারপাশে যার দেখবে আঁকা শঙ্খ কমল যুগল নিধি,
যক্ষ-পুরে মোর আবাসের জানবে তুমি সেই পরিধি !"

নরেন্দ্র দেব

পার্বতী-পরমেশ্বরের ধনাধ্যক্ষ কুবের, তাঁহার ভাণ্ডারের নিধি অসীম, অনন্ত ! তদীয় অনুচর যক্ষের ধনও নিতান্ত কম নয়। যক্ষ-গৃহের প্রবেশ পথের এক পার্শ্বে শঙ্খ ও অন্য পার্শ্বে পদ্ম অঙ্কিত। ইহা পৌত্তলিকতার নিদর্শন নহে, ধনের পরিমাণজ্ঞাপক। এখনকার ব্যাঙ্কগুলি খবরের কাগজে তাঁহাদের বিজ্ঞাপনে মূলধনের উল্লেখ করিয়া থাকেন, তখন ত আর খবরের কাগজ ছিল না, তাই তখনকার ব্যাঙ্কার, যক্ষগণ দ্বারপার্শ্বে ধনের পরিমাণজ্ঞাপক চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন। যক্ষের দ্বারপার্শ্বস্থ চিহ্ন দৃষ্টে জানা যায় তাঁহার এক শঙ্খ ও এক পদ্ম ধন ছিল। ইহার পরিমাণ কত জানেন ? বর্তমানযুগের সংখ্যা-লিখন প্রণালী অনুসারে এ ধনের প্রকৃত পরিচয় জানা যাইবে না। প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের বানর-সৈন্যের সংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য ইহার বর্ণনা আছে। কোটি কাহাকে তাহা আপনারা অবগত আছেন, অতঃপর :—

"রামের বানর সংখ্যা কি কব কাহিনী।
শতকোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি ॥
শতকোটি বৃন্দে এক মহাবৃন্দ হয়।
শতকোটি অর্বুদে মহার্বুদ লেখা।
শতকোটি মহার্বুদে এক খর্ব শিখা ॥
শতকোটি খর্বে এক মহাখর্ব হয়।
শতকোটি মহাখর্বে শঙ্খ যে নিশ্চয় !
শতকোটি শঙ্খে এক মহাশঙ্খ জানি।
শতকোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম গণি ॥

কাব্যে প্রকাশ ধনাধ্যক্ষ কুবেরের সহিত যক্ষের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ ছিল, কিরূপ ভৃত্য তাহা প্রকাশ নাই। কাজেই এত ধনের অধিপতি যক্ষকে বাগানের মালি বলিব কিম্বা সহকারী ধনাধ্যক্ষ বলিব বুঝিতে পারিতেছি না।

অতঃপর যক্ষপত্নী—মেঘদূতের নায়িকা। ইহার রূপের বর্ণনা কবির ভাষায়, মন্দাক্রান্তা ছন্দে শ্রবণ করুন :—

"তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
সা তত্র স্যাদ্যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥"

প্রসিদ্ধি মেঘদূত নাকি আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে বিরচিত হইয়াছিল। সত্য হউক মিথ্যা হউক ইহা যে বর্ষার কাব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। জগতের কাব্য-সাহিত্যে আর একখানি অনুরূপ বর্ষার কাব্য নাই। 'মেঘৈর্মেদুরম্বরম্' হইতে মনে হয় গীতগোবিন্দও বর্ষার কাব্য। কিন্তু গীতগোবিন্দ এক ধাতুতে গঠিত, মেঘদূত অন্য ধাতুতে গঠিত। আষাঢ়ের প্রথম দিন প্রচলিত হিসাবে বর্ষাঋতুর আরম্ভ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বর্ষা আরম্ভ হয় তখন হইতে যখন সূর্য মৃগশিরা নক্ষত্রে প্রবেশ করেন। এ বৎসর ২৪শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ১২টা ১৫ মিনিটের সময় সূর্য মৃগশিরা নক্ষত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। মৃগশিরা নক্ষত্র অতিক্রম করিতে সূর্যের কমবেশী চৌদ্দদিন সময় লাগে। এই সময় পশ্চিম বঙ্গ, মিথিলা, কৌশল প্রভৃতি দেশে মৃগ বা মৃগের বাত নামে বিদিত। এই সময়ে ঐ সকল দেশে পূর্বদিক্ হইতে জলকণাবাহী শীতল সমীরণ প্রবাহিত হয়। এ দেশে কোন কোন লেখক ইহাকে

করিয়া আকাশ ভাঙ্গিয়া আবির্ভূত হয় না, ধীরে ধীরে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বেগবান্ হয়। মৃগশিরা অতিক্রম করিয়া সূর্য আর্দ্রানক্ষত্রে প্রবেশ করিলে বড় বর্ষা আরম্ভ হয়। আদ্রার প্রথম পাদে সূর্যের অবস্থানকাল অম্বুবাচী নামে প্রসিদ্ধ। আর্দ্রার প্রথম পাদ হইতে সূর্য অপসৃত হইলে বৃষ্টিস্নাতা বসুন্ধরা ফল-পুষ্পধারিণী শস্যশ্যামলা জননীর যোগ্যতা লাভ করেন। মৃগশিরার অর্ধ পথ হইতেছে আষাঢ়ের প্রথম দিন ; এই সময়ে বর্ষা প্রবল না হইলেও বেশ জমিয়া উঠে ; তাই কবিগণ ঐ দিনটা 'বর্ষা মঙ্গল' মনে করেন।

অনেকে মনে করেন মেঘদূতে কোন আদর্শ নাই, ইহা স্বচ্ছন্দ সরল প্রাকৃতিক বর্ণনা ; অলৌকিক ঐশ্বর্যের পরিকল্পনা এবং অপরিমেয় শৃঙ্গার রসের পরিবেশন। কিন্তু উহাতে আদর্শও আছে। সে আদর্শ অপার্থিব প্রেম—নরনারীর প্রতি পরস্পরের অনাবিল ভালবাসা। আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাঠ করিয়াছি :—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য়।"

মেঘদূতের যক্ষ ও যক্ষিণীর অকৈতব প্রেম সম্বন্ধেও এই কথা বলিতে পারা যায়।

স্মৃতির ব্যথা

শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ

অভিমানে ফিরে গেছে
আর সে তো নাই—
জানি মনে সেই কথা ;
ব্যথা কেন পাই ?
কাঁপন লাগে যুথীর বনে
মনে লাগে দোলা
বুকের মাঝে প্রেমের বাঁধন—
কিসে যাবে ভোলা।
চেয়ে তারে তস্‌বিরেতে
দাঁড়াই যখন এসে,
গোপন রাগে অশ্রু ধারা
জাগে মর্ম-দেশে।
মুগ্ধ হৃদয় রুদ্ধ মনের
আগল ছিঁড়ে ধায় ;
কোন্‌খানে সে পাবে বাধা

কোনখানে পাইনে সাড়া
খোঁজে পরাণ তবু ;
কতদিন যে হয়নি দেখা
ভাবিনে আর কভু।
লক্ষ চাওয়া বিফল হোল
তবু চেয়েই থাকা
অন্তরে রয় গভীর ব্যথা
তাজমহলে ঢাকা!
মনের বীণা আজকে ওরে
পায়না খুঁজে সুর ;
শুব্ধ অচল চাঁদনি ভাসে
মৌন হৃদয়-পুর।
সকলবাঁধনহারা সে যে
শাসন নাহি মানে,
গভীর ব্যথা হিয়ার মাঝে

দখিন হাওয়ায় ফুলের কানে
তার কথাটি আসে,
মাতন লাগে মন-ফাগুনে
ভোরের কুঁড়ি হাসে।
মিষ্টি সুরে পাখীর গানে
তার মাধুরী লাগে ;
সকল পরাণ উজাড় করি
তার কথাটি জাগে।
সবুজ ঘাসের সোনার ডগায়
তারি চরণ-রেখা ;
ভোর-কোয়েলার কুহর তানে
তার কবিতা লেখা।
মুগ্ধ বাতাস রুদ্ধ শ্বাসে
শোক-সরযুর ধারে,
উড়িয়ে আনে গন্ধ তাহার
ভাসিয়ে হাহাকারে।
জানি জানি অন্তরে মোর
হে দেবতা তুমি
সকল ব্যথার অর্ঘ্য নিয়ে
চরণ তোমার চুমি।

হারু পাগলা

৺গুরুদাস রায়

সেদিন অফিস থেকে এসে বাড়ীর ভেতরে ঢুকছি, এমন সময় দেখি একটা লোক আমাদের বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। লম্বা লম্বা দাড়ি, লম্বা লম্বা চুল, পরণে একটা ছেঁড়া ময়লা কাপড় হাঁটু পর্যন্ত তোলা, ছেঁড়া কালো রংএর একটা কোট গায় আর হাতে একটা কম্বল আর একটা ঘটি। ভাবলুম পাগল। একবার চেয়েই ভেতরে ঢুকছিলুম, কিন্তু সে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে—"রাণু এই বাড়ীতে থাকে ?"

পাগ্‌লার এই প্রশ্নে আমি একটু বিরক্ত হলুম ; বল্‌লুম—"রাণুকে দিয়ে তোমার কি হবে ?"

পাগ্‌লা হাঃ হাঃ করে হেসে বলে উঠ্‌লে—"রাণুকে দিয়ে আমার কি হবে ? হাঃ—হাঃ—হাঃ—। সে যে দশ বছর থেকে আমার হৃদয়ের অনেকটা জুড়ে বাস কচ্ছে। সে যে আমার কতখানি তা আমি বুঝি, আর সে বোঝে, আমি জানি আর সে জানে। সে যদি এ বাড়ীতে থাকে একবার বলে দিন তাকে যে তার 'হারুদা' এসেছে, তবেই সে চিনতে পারবে।"

আমি জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম,—"তুমি রাণুকে চেন ?"

পাগ্‌লা দাঁত বের করে আবার বিকট হাসি হাস্‌তে লাগ্‌লে, বল্‌লে,—"আমি রাণুকে চিনি না ? আমার মত অমন ভাবে রাণুকে কে চিন্‌তে পেরেছে ? আপনি বোধ হয় রাণুর কেউ নন্। যদি হতেন তবে রাণুর 'হারুদা'কে আপনি ঠিক চিন্‌তেন।"

কিছুক্ষণ চুপ্ করে থেকে আমি বলে ফেল্‌লুম,—"আমি তার স্বামী।"

পাগ্‌লা অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে গেল ; পরে বল্‌লে—"আপনি আমার রাণুর স্বামী ? কক্ষণো না। এ হতেই পারে না। যদি আপনি তার স্বামী হতেন, তবে আমার রাণু কি আপনার কাছে, তার হারুদার গল্প না করে থাক্‌তে পার্‌ত ? তার হারুদা যে তাকে বড় ভালবাস্‌ত। তার জন্য তার হারুদা, আজ পাঁচ বছর, বৃদ্ধ পিতামাতাকে ছেড়ে একমাত্র কম্বল হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই হারুদাকে সে একেবারেই ভুলে গেল! একবার ভুলেও

পাগ্‌লা আর কিছু বল্‌তে পার্‌লে না, তার গলা কেঁপে উঠ্‌লো। সে বার বার চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌লে।

আমারও মনের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠ্‌লো, বল্লুম,—"হ্যাঁ, এই বাড়ীতেই রাণু থাকে, তার সাথে দেখা কর্‌তে হলে ভেতরে এস।"

পাগ্‌লার মুখে আবার আনন্দের হাসি দেখা দিল, বল্‌লে,—"এই বাড়ী আপনার? ওঃ কি সুন্দর বাড়ী, রাণু আজ কি সুখী! এই তো আমার সুখ। রাণী আজ সত্যিই রাজ-রাণী।"

এমন সময় আমার চার বছরের ছেলে বিজন পাঠশালা থেকে এল। বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌তে যাবে এমন সময় পাগ্‌লা বলে উঠ্‌লে—"আমার রাণুর ছেলে না? তাই তো, এমন রাজপুত্র আমার রাণুর ছাড়া আর কার গর্ভে হতে পারে? আয় বাবা, আমার কোলে আয়।" বলে বিজনকে কোলে তুলে বুকে চেপে ধর্‌লে।

বিজন ভয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। পাগ্‌লা বিজনকে কোল থেকে নামিয়ে বললে,—"আমাকে দেখে বুঝি ভয় কচ্ছে? কেন? দাড়ি দেখে? যাও তোমার মাকে বল গে, 'তোমার হারুদা এসেছে, তাকে কিছু খেতে দাও, তার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।' না, থাক্। চল আমিই ভেতরে যাই। রাণু, রাণু, রাণু।" বল্‌তে বল্‌তে পাগলা ভেতরে ঢুকে বারান্দায় বসে পর্‌লে।

সাম্‌নের ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে বল্লুম—"তোমার চেনা একজন কে এসেছে, তোমার সাথে দেখা কর্‌তে চায়।"

রাণু তখন একখানা মাসিকে খুব মন দিয়ে ফেলেছিল, মাসিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বল্‌লে—"কে?"

"তাতো আমি জানি না। তবে সে বল্‌লে,—বলুন গে তার হারু দা এসেছে তবেই সে আমাকে চিন্‌তে পার্‌বে।"

হারুর নাম শুনেই রাণু চম্‌কে উঠলে। সে হতভম্বের মত বসে রইলে—একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বের হল না। আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলে। আমি আবার বল্লুম,—"ওকি! অমন করে বসে আছ যে? হারুকে চেন?

চোখ জলে ভরে উঠ্‌লে—কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌লে।

আমি আবার বল্লুম—"ওকি, তুমি কাঁদছ কেন? বল না হারু তোমার কে হয়, তাকে চেন কি না।"

এ কথার উত্তর না দিয়ে রাণু ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বল্‌লে,—"আমার হারুদা এসেছে? সত্যি এসেছে? এতদিন পর্যন্তও আমার কথা হারুদার মনে আছে?"

"তোর কথা কি হারুদা ভুলতে পারে?" বল্‌তে বল্‌তে হারু ঘরে ঢুকে মেঝের উপর বসে রাণুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলে। তার দু'চোখ জলে ভরে উঠ্‌লো। গাল বেয়ে সেই জল, তার সেই কাল রংএর কোটের উপর পড়তে লাগ্‌লো। রাণুও ঠিক হারুর মত তার দিকে জলভরা চোখে চেয়ে রইলে।

অনেকক্ষণ নীরবে কাট্‌লো। শেষে রাণু বল্‌লে,—"হারুদা? তুমি কেন এরকম হয়ে গেলে হারুদা?"

হারু চোখ মুছতে মুছতে বল্‌লে,—"কি রকম হয়েছি রাণু?"

"তোমাকে দেখ্‌লে কে চিন্‌বে যে তুমি সে-ই লোক।"

"তুই চিন্‌বি, শুধু তুই চিন্‌বি, আর তো কারও চেনা আমি চাই না। আমি শুধু চাই যে, তুই আমাকে তোর হারুদা বলে চিন্‌তে পারিস্।"

"তোমার এ দশা কেন হল হারুদা?" বল্‌তে বল্‌তে রাণু আবার কেঁদে ফেল্‌লে।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় হারু বল্‌লে,—"তুই কি জানিস্ না রাণু, কেন আমার এ দশা হল? যাক্, রাণু, ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দে। কাল রাত থেকে পেটে কিছুই যায় নি।"

*　　*　　*　　*

দু' তিন দিন হল হারু পাগ্‌লাকে আর দেখ্‌ছি না। মাঝে মাঝেই হারু পাগ্‌লার কথা আমার মনে হয়, আর যাকে দেখি তাকেই হারু পাগ্‌লার কথা জিজ্ঞেস্ করি। তার উত্তরে আমি পাই তাদের বিদ্রূপের হাসি, তারা বলে,—"হারু পাগ্‌লা তোমার কে বল্ ত?"

আমি বলি,—"হারু আমার বন্ধু।"

তারা হাসে আর বলে—"বন্ধুত্ব করবার আর লোক পেলে না ?"

এর উত্তরে আমি আর কিছু বলি না, শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি।

আমার ছেলে বিজন দিনে একশবার করে তার পাগ্‌লা মামার কথা বলে আর আমার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে,—"বাবা, পাগ্‌লা মামা আর আস্‌বে না ?"

অন্যমনস্কভাবে আমি উত্তর দি,—"আস্‌বে।"

আর রাণু ? সে দিনের ভেতর কতবার যে জান্‌লার কাছে গিয়ে রাস্তার দিক চেয়ে থাকে তার ইয়ত্তা নেই। মাঝে মাঝে আমি তার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস্ করি—"জান্‌লার পাশে অমনি করে কেন দাঁড়িয়ে আছ ?"

রাণু কোন কথা বলে না, আমার দিকে একবার কাতরভাবে তাকায়, দেখি যে তার চোখ জলে ভরা। কাপড়ের খুট দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলি—"রাণু, কেঁদ না, তোমার হারুদা আবার আসবে।"

রাণু আর নিজেকে বেঁধে রাখ্‌তে পারে না, আমার কোলের ভেতর মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। রাণুর কান্না দেখে আমারও কান্না আসে।

হারু সব বোঝে, সব করে, সব বলে, কিন্তু তবু তাকে সকলে পাগল বলে ; কেন না অন্য লোকের সাথে তার কোনও সাদৃশ্য নেই, সে রাস্তা দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে নিজে নিজেই হাসে, কাঁদে, কথা কয়। তার ঘুমোবার সময়ের কোন ঠিক নেই। অনেক দিন মাঝ রাতেও তার গলার ভাটিয়ালী গান আমরা শুন্‌তে পেয়েছি। সে গেয়ে চলেছে,—

"কোন পথে আজ যাবি রে তুই (ওরে পাগ্‌লা)
কোন্ পথে আজ যাবি……"

গান শুনেই রাণু জেগে উঠেছে। তার চাপা দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ আমার কাণে যেতেই আমি বলেছি—"রাণু তুমি এখনও জেগে আছ ?"

রাণু সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলেছে,—"হারুদা এখনও রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

চার বছর ধরে সে আমাদের বাড়ীর বৈঠকখানায় বাস কচ্ছিল। তার সম্পত্তির ভেতর ছিল একখানা ছেঁড়া কম্বল, কয়েকখানা ছেঁড়া ময়লা কাপড়, এক জোড়া হুঁকো-কল্‌কে।

একদিন অফিস থেকে এসে দেখি, রাণুর সামনে হারু দাঁড়িয়ে আছে। বল্‌তে যাচ্ছিলুম—"এত দিন কোথায় ছিলে হারু ?" কিন্তু তাদের অবস্থা দেখে আর বল্‌তে পারলুম না। রাণু কাঁদ্‌ছে আর হারু বিষাদের হাসি হাসছে আর বলছে—"তোর দুঃখ কি দিদি ?"

রাণু বল্‌ছে—"আমার শুধু দুঃখ যে তুমি পাগল হয়ে এমনি কষ্ট পাচ্ছ।"

হারু হাসছে আর বলছে—"তোর এই দুঃখ আর কিছুই নয় ? তবে তোর কোনই দুঃখ করতে হবে না। আমি পাগল হয়েছি কিন্তু আমার কোন কষ্ট নেই। তুই যে আজ সুখী হয়েছিস এই তো আমার মস্ত বড় সুখ। আমি তো আর কিছুই চাই না। চাই যে তুই সুখী হ'। রাণু, আজ তোর হাতের শেষ খাওয়া খেয়ে যাব। তোর হাতের রান্না আমার বড় ভাল লাগে।"

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে রাণু বলছে—"ওকথা কেন বলছ হারু দা ? শেষ খাওয়া কেন বলছ ?"

"আর তো আমি এদেশে থাক্‌ব না রাণু।"

"কোথায় যাবে হারু দা ?"

"কোথায় যে যাব, তা আমিও জানি না। তবে যাব, এখানে আর থাকব না।"

সেদিন যে হারু পাগ্‌লা চলে গেল, আর ফিরলে না। সেই তার শেষ যাওয়া, সেই তার রাণুর হাতের শেষ খাওয়া।

সত্যং শিবং সুন্দরম্

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণ

(১)

তুমি আছ, তাই আছে বিশ্ব তাই হয় চেতনের খেলা
জলে স্থলে নীলনভে তাই নিত্য স্থূল-সূক্ষ্ম-মেলা।
অণু পরমাণু নৃত্য করে ব্যাপ্ত করি বিশ্বচরাচর;
জ্যোতির তরঙ্গ খেলে মহা ব্যোমে, মূর্ছি ধরা-পর।
অনাহত উঠে ধ্বনি,—ধরে রূপ স্থূল সূক্ষ্ম সুর;
লীলায়িত ক্ষণে ক্ষণে যন্ত্রে যন্ত্রে নিকট সুদূর।
শ্যামস্নেহে স্নিগ্ধ ধরাতল, ফলে ফুলে তাই উঠে ভরি;
গন্ধে বর্ণে মুগ্ধ মন, পুলকিত তনু—আপনা পাসরি।
গাহ নিত্য তব বিশ্বযন্ত্রে মহিমা আপন সুমহান্;
হে সত্য,—হে অনাদি শাশ্বত, লহ দীন আরতির গান।

(২)

তুমি আছ, আছে দ্বন্দ্ব—তাই হয় সুখদুঃখ-খেলা,
আলো-অন্ধকারে, সম্পদ্-বিপদে, হাসিকান্নার মেলা।
আতপের মহাতেজ তাই, হিমানীর অসাড় পরশ,
বসন্তের মধুর সোহাগ, বাদলের হৃদয় সরস।
ছন্দে ছন্দে নাচিছে জীবন, মরণ নাচিছে তারি সঙ্গে;
জীবন মরণ দুই সহোদর—জড়ান দোঁহার অঙ্গে।
মরণ হেতু জীবন মাগি, দুঃখ আছে—সুখ লাগে ভালো;
দুঃখ বোঝে মানুষ বেশী, বড় তাই হৃদয়ের আলো।
গাহ নিত্য তব বিশ্বযন্ত্রে মহিমা আপন সুমহান্;
হে শিব,—হে অনাদি মঙ্গল, লহ দীন আরতির গান।

(৩)

তুমি আছ, তাই আছে শোভা, তাই হয় রূপ-গন্ধ খেলা;
গন্ধে পাগল বিশ্বভুবন, নানা রূপের মেলা।
কনক-কিরণ স্বচ্ছ জলে, ঊর্মি-শিরে জ্যোৎস্না সুমধুর;
দিগ্ দিগন্ত মাতিয়ে মরি, বিহগ তোলে নানান সুর।
রূপ-তরঙ্গ আন্দোলিত, কুঞ্জকানন গন্ধে ভরা;
মধুলোলুপ মত্তভৃঙ্গ গুঞ্জরিয়া আসে ত্বরা।
আকাশ-কোলের ঐ নীলিমা কোমল স্নেহে ডাকছে মরি,
ধরার বুকের শ্যামলিমা বাড়ায় বাহু যত্ন করি।
গাহ নিত্য তব বিশ্বযন্ত্রে মহিমা আপন সুমহান্;
হে সুন্দর,—অনাদি মধুর, লহ দীন আরতির গান।

প্রেম

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী সাহিত্যভারতী

প্রেম শব্দটি অতি মধুর। এমন মধুর শব্দ বোধ হয় সংসারে আর নাই। জগতে নরনারী বালক যুবা বৃদ্ধ সকলেই প্রেমের মোহময় মন্ত্রে মুগ্ধ। প্রেমের কুহকে সকলেই আত্মহারা। এই প্রেম সাহিত্য-দর্শন-জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা প্রতীত হয় না। ইহা স্বভাবতঃই মাতৃ-বক্ষে ক্ষীর সঞ্চারের ন্যায় প্রত্যেক জীবের অন্তরে ফুটিয়া উঠে। ভগবান্ প্রেমময়। প্রেমময় ঈশ্বরের অনন্ত অসীম জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সর্বত্রই তাঁহার প্রেমের ছবি দেদীপ্যমান। ঐ যে বালার্কসিন্দুরবিন্দু ললাটে পরিয়া প্রেমময়ী উষা সতী আবিরমাখা ওড়নাখানি গায়ে দিয়া ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন—উনি প্রেমের ছবি। উষার প্রেমে জগৎ নব জীবন লাভ করিয়া জগতকে হাস্য-আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। উষার সুন্দর মুখখানি দর্শনে বিহগেরা মধুর কূজনে গান করিতেছে। উষার মধুরস্পর্শে কুসুমকুল বিকসিত। কমলিনীনাথ প্রেমভরে নলিনীর বদনখানি চুম্বন করিতেছেন। উষার আগমনে তরু পল্লবগুলিও শিশিররূপ প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। প্রেমমুগ্ধা তটিনীও কুলুকুলু তানে সাগরের অভিমুখে ছুটিতেছে।

যে দিকে চাও দেখিবে এজগৎ প্রেমের বন্ধনেই বাঁধা, প্রেমের জয় সর্বত্র। প্রেম জড়ে ও চেতনে অপ্রতিহত-ভাবে নিত্য জাগ্রত। সকল বস্তুতেই জগৎ-সংসারে প্রেমের আকর্ষিণী শক্তি, ওই ব্যোমরাজ্যে গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলও প্রেমের অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ হইয়া চিরদিন আপন আপন কেন্দ্রপথে ঘুরিতেছে। কিন্তু প্রেম স্থানভেদে অধিকারিভেদে পাত্রপাত্রীভেদে নানা রূপ ধারণ করে। কোথাও প্রেম ভক্তিরূপে, কোথাও প্রেম বাৎসল্যরূপে, কোথাও প্রেম সৌহার্দ্যরূপে, কোথাও প্রেম প্রীতিরূপে, কোথাও প্রেম পূর্ণরূপে বিরাজমান।

চৈতন্য চরিতামৃত বলিতেছেন—প্রেমের সর্বোচ্চ রূপ ভগবৎ প্রেম। যে প্রেমে সাধক জগৎ ভুলিয়া আপনা ভুলিয়া ভগবৎ ভাবে তন্ময় হইয়া যায়। নারদ শুক সনদ ধ্রুব প্রহ্লাদ এই প্রেম লাভ করিয়া ছিলেন আর শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজ গোপীরা পূর্ব জন্মের বহু তপস্যায় এই অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন। গোপী জানিত নিখিল বিশ্বের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ নিখিল, বিশ্বের সৌন্দর্যভাণ্ডার শ্রীকৃষ্ণ। তাই গোপী দ্যুলোকে ভূলোকে লতায় পাতায় আকাশে বাতাসে সর্বত্রই কৃষ্ণ দর্শন করিতেন। কৃষ্ণ-চিন্তা বই দ্বিতীয় চিন্তা-ব্যাধি তাঁহাদের ছিল না। গোপীর প্রেম যে কত উচ্চ, কত মহিমময় তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাবল্লভ; গোপিকারা তাঁহাকে পতিভাবে সেবা করিয়া থাকেন। গোপীর প্রেম কামগন্ধহীন। গোপিকারা আত্মেন্দ্রীয় প্রীতির জন্য শ্রীভগবানকে ভালবাসেন নাই। কৃষ্ণ-সেবাই গোপী-প্রেমের মূলমন্ত্র। সেবাসুখেই তাঁহারা সুখী; তাই চরিত্রামৃত বলিতেছেন—

> "কৃষ্ণপ্রেম নিরমল শুদ্ধ সত্ব গঙ্গাজল
> সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু
> নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
> শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।"

গোপীর প্রেম নির্মল—শুদ্ধ সত্ব। শ্রীভগবানে গোপিকাদের অব্যভিচারিণী ভক্তি স্বর্গীয় সুষমায় ভরা। গোপী বিশ্বসংসার কৃষ্ণময় দেখিতেছেন। লতায় পাতায় ফুলে ভলে সবই কৃষ্ণের ছবি কৃষ্ণময় ত্রিসংসার। এখন ভাবিয়া দেখুন গোপীর প্রেম কি উচ্চ, কি মহিমময়। একবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-উন্মত্ততা দেখুন, যিনি অখিল বিশ্বের স্বামী বিশ্বের নিয়ন্তা সর্বভূতের আধার হইয়াও তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া জগৎকে প্রেমশিক্ষা

দিয়াছেন। রাধানাথ রাধাপ্রেম-মন্ত্রেই দীক্ষিত ছিলেন যে, তাঁহার রাধানামে-সাধা বাঁশী রাধা বই অন্য নাম জানিত না। তিনি প্রেমময়ী শ্রীরাধার প্রেমে তন্ময় হইয়া "দেহিপদপল্লবমুদারম্" বলিয়াছিলেন।

রাধা-প্রেমে রাধানাথের নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত। বৃন্দাবন শ্রীরাধার প্রেমেই প্রভাবিত ;—রাধাপ্রেমে ময়ুর ময়ুরী নৃত্য করিত। যমুনা উজান বহিত—শ্রীবৃন্দাবনের তরুলতা রাধাপ্রেমে দোলায়মান হইত। ভ্রমর ভ্রমরী রাধাপ্রেমে গুঞ্জন করিত। কুঞ্জের শারিশুকও শ্রীরাধে জয়রাধে বলিয়া নৃত্য করিত। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রাধাপ্রেমের জন্যই 'একোঽহং বহুস্যাম' হইয়া ব্রজের মাধুর্য্যরস উপভোগ করিয়াছিলেন এবং যশোদা জননীর বাৎসল্যপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নন্দের বাধা মস্তকে বহন করিয়াছিলেন। রাধার প্রেমে মত্ত কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন।

"উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়ন তারা!
আমার কিশোরী ভজন কিশোরী সাধন
কিশোরী গলার হারা।"

শ্রীবৃন্দাবন তাই মাধুর্য্যরসের পূর্ণ পরিণতির স্থান। বৃন্দাবনের আকাশ-বাতাস মাধুর্য্যরসেই ভরা। প্রেম বস্তুটি এক হইলেও অবস্থাভেদে অধিকারিভেদে প্রেমের নানারূপ বৈচিত্র্য আছে।

জননী যশোদার বাৎসল্য প্রেমে বাঁধা পড়িয়া কর্ম্মহীন বন্ধনহীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধনদশাও ভোগ করিয়াছিলেন। ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে সখ্য প্রেমে আবদ্ধ করিয়াছিলেন ; শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও রাখালবালকগণের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিতেন ও তাহাদের স্কন্ধে লইয়া ক্রীড়া করিতেন। ব্রজ-রাখালগণ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ জন বলিয়াই জ্ঞান করিত।

গোপীকারা পার্থিব সংসারের ছবি ছিলেন না। তাঁহাদের এই স্বর্গীয় প্রেম জগতে দুর্লভ। তাই গোপী—

"সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি করে কৃষ্ণের সেবন।
ইহাতে কহয়ে কৃষ্ণে হয় অনুরাগ
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যথা নাহি লাগে দাগ।"

এই রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেম জগতে সুদুর্লভ। এ প্রেমে ভোগতৃষ্ণা ছিল না, আসঙ্গলিপসা বিন্দু মাত্রও ছিল না। গোপীর প্রেম শুদ্ধ স্বচ্ছনির্মল ছিল। ইহাতে কামনার কালিমা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-পিপাসিতা গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী গানে তাই আকৃষ্ট হইয়া পতি-পুত্র লজ্জা ভয় ভুলিয়া বিজন বিপিনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ মিলিত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে জগৎ বিমুগ্ধ হইত। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে গোপিকাগণ আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। জগৎপতির প্রেম-সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া তাহারা প্রেমময় হরির চরণতলে আসিয়া দাঁড়াইতেন।

"নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনম্
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসা।"—

এই ভগবদ্-প্রেমের তুলনা নাই।

অভাগিনী

শ্রীবলাইচাঁদ আঢ্য

বনপথে অভাগিনী আমি যে মা পথহারা।
জনহীন এ বিজনে কারে বা ডাকি সঘনে,
দিশাহারা হয়ে ফিরি, আকুল পাগলপারা।
সহায়, স্বজন-হীনা নিদয় নিয়তি-স্রোতে
একাকিনী বিষাদিনী ভ্রমি আমি বনপথে ;
এ বিজনে কেবা আছে আসিবে আমার কাছে
করুণা করিয়া মোরে বারেক দিবে গো সাড়া!
তৃষিত আকুল কণ্ঠ অবশ এ দেহ, মন,
কণ্টকিত বনপথে চলে না আর এ চরণ ;
কিবা করি, কোথা যাই, কে আমারে দিবে ঠাঁই
কে আর আমার আছে মুছাতে নয়নধারা!
কোথা তুমি জননী গো, কি দশা আমার হায়,
বনে নানা বিভীষিকা বুঝি বা জীবন যায় ;
বারেক দাও মা দেখা অভাগিনী এ সুতায়,
এ বিপদে আমারে মা, কর না চরণছাড়া!

তুলসী-সপ্তশতিকা

শ্রীরামচরণ দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ সর্গ

(১)

ত্রিবিধ ভাঁতিকো শব্দবর গ্রথিটন লট পরমাণ।
কারণ অবিরল অরুঝিত তুলসী অবিধ ভুলান॥
এজগতে আছে ত্রিবিধ শবদ
একত্র জড়িত জটার মত ;
সদা শুনে কিন্তু বিধি পরিহরি
তুলসী নিরত অবিধি-রত।

(২)

দিগ্‌ভ্রম যা বিধি হোত হৈ কৌন ভুলাবত তাহি।
জানি পরত গুরুজ্ঞানতে সব জগ সংশয় মাহিঁ॥
কে ভুলায় তারে যখন যাহার
দিগ্‌ভ্রমে মতি ভুলিয়া যায় ;
অভ্রান্তোপদেশে ভ্রম যায় যথা
মোহ যায় তথা গুরু-কৃপায়।

(৩)

কারণ চারি বিচারু বর বর্ণত অপর ন আন।
সদা সৌউগুণ দোষময় লখিন পরত বিজ্ঞান॥
মোহের কারণ চারিটি প্রসিদ্ধ
এই চারি ছাড়া নাহিক আন;
সেকারণগুলি গুণ-দোষময়
দেখিতে না পায় বিনা বিজ্ঞান।

(৪)

য়হ করতা সব তাঁহি কো যহিতে য়হ পরমাণ।
তুলসী মরম ন পাইহৌ বিন সদ্‌গুরু বরদান॥
এসব কর্তব্য তাঁহারই জানিবে
তাঁহা হতে ইহা সত্য প্রমাণ;
কহিছে তুলসী মর্ম না জানিবে
না পাইলে সদ্‌গুরু-বরদান।

(৫)

দিগ্‌ভ্রম কারণ চাহিতে জানহি সন্ত সুজান।
তে কৈসে লখি পাই হৈ যে বহি বিষম ভুলান॥
ভ্রমের কারণ চারিটি হইতে
জানিবারে পারে সাধু সুজন;
সে কেমনে বল দেখিতে পাইবে
নিয়ত বিষয়ে নিমগ্ন জন।

(৬)

সুখ দুখ কারণ সো ভয়ো রসনাকো সুতবীর।
তুলসী সো তব লখিপরৈ করৈ কৃপাবর ধীর॥
সুখ দুঃখ যত তাহার কারণ
রসনার সুত শবদ হয়;
রে তুলসি তবে দেখিবারে পারে
করিলে করুণা করুণাময়।

(৭)

অপনে কোদে কুপ মহ গিরে যথা দুঃখ হোই।
তুলসী সুখদ সমুঝ হিয়ে রচত জগত সবকোই॥
আপন কোদিত কূপেতে পড়িলে
মানসে কেবল যাতনা পাই;
কহিছে তুলসী সুখ-খনি জানি

(৮)

তা বিধিতে অপনো বিভব দুখ সুখ দে করতার।
তুলসী কোউ কোউ সন্তবর কীহে বিরতি বিচার॥
সেইরূপ নিজ বিভবানুসারে
জীবে সুখ দুঃখ দেন ঈশ্বর;
কহিছে তুলসী কোন কোন সাধু
বৈরাগ্য আশ্রয়ে উভয় পর।

(৯)

রসনাহিকে সুত উপর করত করণ তরপ্রীতি।
তেহি পাছে জগ সব লগে সমঝন রীতি অরীতি॥
শব্দের উপরে শ্রবণের প্রীতি
শুনে ভালমন্দ যে শব্দ পায়;
সেইরূপ শব্দে মোহিত জগৎ
ভুলিয়া তাহার পশ্চাতে ধায়।

(১০)

মায়াময় জীব ঈশভিন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ।
সুর দেবী ঔ ব্রহ্ম লৌ রসনাসুত উপদেশ॥
জীবই ঈশ্বর, মন মায়াময়
বেদোপনিষদে ইহাই ভনে;
জীবে উদ্ধারিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু বাক্য
অনেক লিখিত বেদ-পুরাণে।

(১১)

বর্ণধার বারিধিঅগম কোগম করৈ অপার।
জগ তুলসী সতসঙ্গ বল পায়ে বিশদ বিচার॥
বর্ণধার অব্ধি অগম অপার
কে পাইবে তার তল কি পার;
কহিছে তুলসী, সৎ-সঙ্গ-বলে
ভক্তগণ পার পায় তাহার।

(১২)

গাহি সুবেল বিরলে সুঝি বহিগয়ে অপর হজার।
কৌটীন বুড়ে খবরি নহি তুলসী কহহিঁ বিচার॥
বিরলে সুতীর আশ্রয় করিয়া
সদা সুখে থাকে ভকত জন;
কত ভেসে যায় কত ডুবে যায়—

(১৩)

শ্রবণ শুনত দেখত নয়ন তুলতন বিবিধ বিরোধ।
কহহুঁ কহা কেহি মানিয়ে কোহ বিধি করিয় প্রবোধ॥

শ্রবণে যা শুনি নয়নে দেখিয়া
মিলেনা তাহাতে বহু বিরোধ;
কহ কার কথা মানিতে হইবে
কিরূপে করিব আত্ম-প্রবোধ।

(১৪)

শ্রবণাত্মক ধ্বন্যাত্মক বর্ণাত্মক বিধি তিন।
বিবিধশব্দ অনুভব অগম তুলসী কহহি প্রবীণ॥

শ্রবণ-আত্মক ধ্বন্যাত্মক আর
বর্ণাত্মক এই তিন প্রকার;
তিনরূপ শব্দ জগতে বিদিত
যথার্থ জানিতে শকতি কার?

(১৫)

কহত শুনত আদিহি বরণ দেখত বর্ণবিহীন।
দৃষ্টিমান চর অচরগণ একহি একালীন॥

বলে শুনে সবে বিশ্ব ব্রহ্মময়
অন্যরূপ কিন্তু দেখিতে পাই;
দৃষ্টিমান যত চরাচর জীব
ভিন্ন ভিন্ন মতে চলে সবাই।

(১৬)

পঞ্চভেদ চরগণ বিপুল তুলসী কহহিঁ বিচার।
নর, পশু, স্বেদজ, খগ, কৃমি, বুধজন মতি নিরধার॥

চরগণ মধ্যে পঞ্চ ভেদ আছে
নর, পশু, পক্ষী, কৃমি, কীটাদি;
কহিছে তুলসী বিচার করিয়া
নির্ধার করেন সকল সুধী।

(১৭)

অতি বিরোধ তিবমহ প্র[illegible] প্রকট পরত পহিচান।
অস্থাবর গতি স্পর্শ নহি তুলসী কহহি প্রমাণ॥

তাহাদেরও মাঝে প্রবল বিরোধ
দেখিবামাত্র প্রকাশ পায়;
নর, পশু, পক্ষী সতত বিরোধে
উদ্ভিদেও ভেদ তার দেখায়।

(১৮)

রোম রোম ব্রহ্মাণ্ড বহু দেখত তুলসীদাস।
বিন দেখে কৈসে কোউ শুনি মানে বিশ্বাস॥

প্রতি লোমকূপে অমিত ব্রহ্মাণ্ড
শ্রীরামে দেখিছে তুলসীদাস;
বিনা দরশনে কি প্রকারে ভাই
অপরের মনে হবে বিশ্বাস?

(১৯)

বেদ কহত জঁহলগ জগত তেঁহিতে অলগ ন আন।
তেঁহি অধার ব্যবহরত লঘু তুলসী পরম প্রমাণ॥

বেদ বলে বিশ্ব যে পর্যন্ত আছে
তাঁহা হ'তে কভু পৃথক নয়;
সে আধারে থেকে সৃষ্টি স্থিতি লয়
জগতের কার্য সকলি হয়।

(২০)

সর্ষপ সুঝত জাসু কঁহ তাহিঁ সুমেরু অসুঝ।
কহে উন সমুঝত সো অবুধ তুলসী বিযত বিসুঝ।

সর্ষপ দেখিতে পায় যেই জন
কিন্তু সুমেরু দেখিতে না পায়;
কহিছে তুলসী বলিলে না বুঝে
জ্ঞান-নেত্র কভু না থাকে যায়।

(২১)

কহত অবর সমুঝত অবর গহত ভজত কছু ঔর।
কহেউ শুনৈ সমুঝত নহি তুলসী অতি মতি বৌর॥

বলে একরূপ বুঝে অন্যরূপ
ত্যজে অন্য, অন্য করে গ্রহণ;
বলে শুনে কিন্তু বুঝেনা কখন
বলিছে তুলসী পাগল মন।

(২২)

দেখৌকরে অদেখইব অনদেখো বিশ্বাস।
কঠিন প্রবলতা মোহকি জলকই পরস পিয়াস॥

দেখিয়াছে তবু না দেখার মত
সংসারে আসিয়া ঘুরিয়া মরে;
মোহাচ্ছন্ন মতি প্রবল পিপাসা

(২৩)

সোই সেমর সোই সুবা সেবত পায় বসন্ত।
তুলসী মহিমা মোহকি বিদিত বখানত সন্ত॥

সেই শিমুলের সেবা করে তবু
যা হ'তে বঞ্চিত হয়েছে ফলে;
সেই সংসারেই বদ্ধ হয়ে জীব
জন্ম জন্ম দুঃখ পায় ভূতলে।

(২৪)

শুন্যো শ্রবণ দেখ্যো নয়ন সংশয় সমন সমান।
তুলসী সমতা অসমভোঁ কহত আন কঁহ আন।

শ্রবণে শুনিয়া, নয়নে দেখিয়া
বাসনা যখন উদয় হয়;
তখনি মনের সমতা পালায়
একেতে অপর ভ্রান্তি উদয়।

(২৫)

বসহি ভব অরি হিত অহিত সোদিন সমুঝত হীন।
তুলসী দীন মলিনমতি মানত পরম প্রবীণ॥

ভব-শত্রু-বশে থাকিয়া মানব
মতিহীন দীন হয় মলিন;
হিতাহিত কিছু বুঝিতে না পারে,
আপনারে কিন্তু জানে প্রবীণ।

(২৬)

ভটকত পদ অদ্বৈততা অটকত জ্ঞান গুমান।
সটকত বিতরণ তে বিহবি ফটকত তুখ অভিমান॥

বিষয়ে আশক্ত মন অবিরত
বদনে অদ্বৈত জ্ঞান গুমান;
হরিভক্তি হতে বিরত নিয়ত
প্রকাশে সতত আত্মাভিমান।

(২৭)

যো চাহত তেঁহি বিন্থ দুখিত সুখিত রহিত তে হোই।
তুলসী সো অতিশয় অগম সুগম রাম তে সোই॥

যারে চায় তার— অভাবে দুঃখিত
সুখী হয় যবে বাসনা নাশে;
কহিছে তুলসী সে অতি অগম

(২৮)

মাত পিতা নিজ বালকহি করহি ইষ্ট উপদেশ।
শুনি মানে বিধি আপ যেহি নিজ শির সহে কলেশ॥

মাতা পিতা নিজ— বালকের প্রতি
করেন সতত ইষ্টোপদেশ;
প্রলয়-সলিলে শুনি পিতৃবাণী
এখনও বিধাতা সহিছে ক্লেশ।

(২৯)

সবসো ভলো মনাই বো ভল হোন কি আশ।
করত গগন কো গেঁড়ুয়া সোশঠ তুলসীদাস॥

সর্বদেব পাশে ভাল যাচ্ঞা করে
আপনার ভাল হবার আশ;
কহিছে তুলসী সে শঠের ইচ্ছা
আপনার করে ধরে আকাশ।

(৩০)

বলি মিস্থ দেখত দেবতা করনী সমতা দেব।
মুয়ে মার অবিচার রত স্বারথ সাধক এব॥

দেবতাও ফল দেন সে মানবে
যে যেমন পূজা দেয় তাঁহারে,
স্বার্থপর নর অধীন জীবেরে
বলী দেয় নিজ হিতের তরে।

(৩১)

বিবহি বীজ তরু একভব শাখা দল ফলফুল।
কো বরণৈ অতিশয় রসিত সব বিধি অকল অতুল॥

বিনা বীজে এক ভব মহীরুহ
তাহাতে শাখাদল ফল ফুল;
কে বর্ণিতে পারে অত্যন্ত সুন্দর
সকল প্রকারে সদা অতুল।

(৩২)

শুক পিক মুনিগণ বুধ বিবুধ ফল আশ্রিত অতি দীন।
তুলসী তেসব বিধিরহিত সৌঙক তাসু অধীন॥

শুক পিক মুনি বুধ কি বিবুধ
ফলাশ্রয় করি দুঃখিত হয়;
কহিছে তুলসী ফলাশাবিহীন-

(৩৩)

কো নহি সেবত আয়ভব কোন সেব পছিতায়।
তুলসী বাদিহি পছতহৈ আপহি আপনশায় ॥

ভবে আসি কেবা না সেবে সে তরু,
সেবিয়া কে অনুতাপ না পায় ;
কহিছে তুলসী বৃথানুশোচনা
আপনার মাথা আপনি খায়।

(৩৪)

কহত বিবিধ ফল বিমল তেহি বহত ন এক প্রমাণ।
ভরম প্রতিষ্ঠা মানি মন তুলসী কথত তুলান ॥

অনেক বিমল ফল কথা কহে
কিন্তু কোন পথে কভু না চলে ;
ভ্রমের প্রশংসা মানিয়া মানসে
কহিছে তুলসী তাতেই ভুলে।

(৩৫)

মৃগ জল ঘটভরি বিবিধ বিধি সিঁচত নভতরু মূল।
তুলসী মন হরষিত বহুত বিনহি লহে ফল ফুল।

মৃগ জল লয়ে ঘটে ঘটে ভরি
নভতরু মূল করে সেচন ;
ফলফুল কিছু যদিও না পায়
কহিছে তুলসী হর্ষিত মন।

(৩৬)

সোপি কহহি হম কহঁ লহৌ নভতরুকো ফলফুল।
তে তুলসী তিনতে বিমল শুনি মানহি মুদ মূল ॥

সেও বলে তাই পাইয়াছি আমি
আকাশ-তরুর কুসুম-ফল ;
কহিছে তুলসী বিশ্বাস যে করে
তার মতি তাহা হতে বিমল !

ক্রমশঃ

দান-প্রতিদান

শ্রীযতীন্দ্রনাথ আঢ্য বিদ্যানিধি, সাহিত্যপুরাণরত্ন

সকলকারই জীবনের মধ্যে এমন একটা পরিপূর্ণতার যুগ আসে যখন রূপে রসে গানে গন্ধে অন্তর বাহির তাহার নব বসন্তের আনন্দ-ঝঙ্কারে পুষ্পিত, পল্লবিত হইয়া উঠে। এই সময়টি কিন্তু তাহার পক্ষে বড় বেশী রকমের পরীক্ষার, কেননা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যারও এমন সময় একটা অভিমান ও গর্বের অনুভূতি পূর্ণত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়া তুলে যাহার প্রভাবে তখন তাহার আর এইটুকুও বুঝিবার যোগ্যতা থাকেনা যে, বাস্তব অভিযান-পথ তাহার কোন্ লক্ষ্যে। কাজে কাজেই ভ্রান্তচিত্তে অধিকাংশ ব্যক্তিই দৈবীপ্রাপ্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে ; করুণাময়ী জননীর করুণা-প্রদত্ত দানের মর্যাদা রক্ষণে সত্যই অক্ষমভাবে তাঁহারই

ক্ষমতা-দর্পে মানবতাকে অস্বীকার করাই যখন কাহারও পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় নয় তখন কাহাকেও প্রতিহত করিবার আকাঙ্ক্ষাও যে বলদর্পীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক—একথাও শাশ্বত সত্য। তবে দর্প-প্রভাবে অন্যায় বা অযৌক্তিক একটা কিছু করিয়া বসা কিছু মাত্র কঠিন না হইলেও তাহার যে কোন কিছু পরিণতি নাই একথা বলা চলে না কোন দিন। দরিদ্র আশ্রয়হীন অনাথকে আমি অকারণে বা সামান্য কারণে পদাহত করিতে পারি ; হয়ত বিনিময়ে সে আমাকে কিছুই দিতে সক্ষম হইলনা, তাহা বলিয়া, তাহার সেই যে নীরব রোদন—বুকের গোপন ব্যথা-বেদনায় নির্গত অশ্রুধারা কোন দিনই ব্যর্থ হইবেনা কিছুতেই। এই জন্যই হিন্দু জন্মান্তরবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী। এই

ব্রাহ্মণ ছিল খুব নৈষ্ঠিক, নিত্য তাঁহার পূজার্চ্চনা সাধন ভজন দান দাক্ষিণ্যে কালাতিপাত হয়। সন্তান তাঁহার একটি; ছেলেটিও পিতার যাবতীয় গুণের পূর্ণ অধিকারী। পিতার শিব পূজার ফুল প্রত্যহ প্রত্যুষে পুত্রকেই আহরণ করিয়া আনিতে হয়। কমবয়স্ক শিশু জগতের সকল লোককেই সমান চক্ষে দেখে সে, উচ্চ নীচ ধনী নির্ধন বিচার বিবেচনার সময় আসে নাই তাহার তখনও। তাই যে দিন যেখান হইতে সুবিধা মত ফুল সংগ্রহ করিতে পারে সেখান হইতেই ফুল লইয়া পিতার কাছে সমুপস্থিত করে। গ্রাম্য জমিদারের সখের পুষ্পোদ্যান, বেচারা সেখান থেকেই কয়েক দিন ফুল সংগ্রহ করিয়া গিয়াছে। ঘটনাটি যখন জমিদার জানিতে পারিল তখন সে রাগে অগ্নিশর্মা। মালীর উপর হুকুম জারী হইল—কল্য আসিলেই যেন তাহাকে জমিদার সকাশে সমুপস্থিত করা হয়। যেই হুকুম সেই কাজ। পরদিন সকালে পুষ্প-চয়নে সমুপস্থিত ব্রাহ্মণ-শিশু জমিদার-সকাশে নীত হইল। জিজ্ঞাসাবাদ বিচার-বিবেচনার কিছু আবশ্যক হইল না। অযথা একটা পাথর-পূজার জন্য তাঁহার সখের পুষ্পোদ্যানের পুষ্প চয়ন মহা অন্যায়। পায়ের জুতা খুলিয়াই ব্রাহ্মণ-শিশুর মাথায় কয়েকটি আঘাত। জ্ঞানহারা শিশু মূর্চ্ছা-গ্রস্ত হইয়া মাটিতে পড়িল। মূর্চ্ছাভঙ্গে গৃহে উপস্থিত হইয়া সাশ্রুনেত্রে সরোদনে পিতাকে আদ্যোপান্ত শুনাইল। পিতা শিব-মন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িলেন। কয়েকদিন পরে প্রত্যাদেশ হইল। কোন কার্যই বিফল হয়না। জমিদারের অত্যাচারও বিফল হইবে না। তবে এই জমিদারের পূর্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলের জন্য এ ঘটনাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হইবেনা। ইঁহার পৌত্রের সময় এই অত্যাচারের ফল ফলিবে।

এই কথাটি দুঃখের সান্ত্বনা বলিয়াই হউক আর কর্মফল বলিয়াই হউক গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। হয়ত এই জন্যই হিন্দু জন্মান্তরবাদী। আর আমিও যখন তাঁহাদেরই সমষ্টিগত তখন আমিও সে প্রথা, সে নীতি না মানিয়া পারি না।

আমাদের ঠিক গো ডাউনের পাশটিতেই রেল্ষ্টেশনের পশ্চিমে একজন বুড়ো কাঠের কারবার করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল। মনে আশা থাকিলেও বুড়োর হাতে যে কিছু পুঁজি ছিল না একথা আমি অন্তত জানিতাম। কেননা তাহার ছোট একটা ছেলের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল কিছু দিন হইতে। এই সূত্রেই ইহাদের পারিবারিক ব্যাপার আমার অজ্ঞাত কিছুই ছিল না। বুড়োর বড় ছেলেটি কাজ করিত দেশে একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে আর ছোটটি থাকিত কাছে। বাড়ীতে স্ত্রী-পরিবার কেউ নাই বলিয়া এবং বাড়ী বলিতেও অবশিষ্ট কিছু ছিল না বলিয়া বাধ্য হইয়া বুড়োকে সহরতলীতে আশ্রয় বাঁধিতে হইয়াছিল অসময়ে জীবনের শেষ ভাগে। মাঝে মাঝে সে নাকি তাহার কে একজন নিকট আত্মীয়ের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পাইত; তাহা হইতে তাহাদের পিতাপুত্রের উদর পোষণ হইত আর সেই আত্মীয়টিকেই যেমন করিয়া হউক বাধ্য করিয়া ভবিষ্যতে কিছু মূলধন লইয়া কাঠের কারবার খুলিবে, এই ছিল বুড়োর একান্ত কামনা।

এমন সময় হঠাৎ একদা ডাক আসিল বুড়োর পরপার হইতে,—একদিন সকালে বুড়োকে কঠিন কলেরা রোগ আক্রমণ করিল। হাতে এমন একটি পয়সা নাই যাহাতে বুড়োকে কিছুমাত্র চিকিৎসা করান চলিতে পারে। অথচ তাহার মনে প্রবল ইচ্ছা সহরের যে কলেরা রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহাকে দিয়াই যেন তাহার চিকিৎসা করান হয়। কাছে ছিল বুড়োর কেবলমাত্র ছোট ছেলেটা; সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টা ও শুশ্রূষা করিয়াও কোন মতে সে অপর কোন চিকিৎসকের এক ফোঁটা ওষুধও বাবাকে খাওয়াইতে পারিল না। বুড়োকে একা তাহার কাছে ফেলিয়া বা সে নিকট আত্মীয়টির কাছে যায়। আর বারম্বার কতবারই বা সে হাত পাতে পরের কাছে খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া। তাহার বাবার পক্ষে হয়ত যা খুবই সম্ভব ছিল তাহার পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। যে কথা খুব

আত্মজনের কাজে বলা চলে না। যাহা হউক এখন আর কিছুতেই এসব ভাব-বিলাসের সময় ছিল না। বাপই ছিল বেচারার একমাত্র জীবনের বন্ধন। মা যে তাহার কবে তাহাকে একলা ফেলিয়া কোন অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ী দিয়াছিল ভাল করিয়া তাই তাহার মনে ছিল না। যেদিন হইতে সে চোখ মেলিয়া এই স্বার্থপর জগতের লোকের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল, সেদিন হইতেই সে কেবলই চিনিয়াছিল এই একমাত্র তাহার স্নেহ-আনন্দের নিকেতন পিতৃদেবকে। তাই আজ আকস্মিকভাবে যখনই তাহার নিরুপায়তার মধ্য দিয়া সেই একমাত্র বন্ধন ছিন্ন হইতে বসিয়াছিল তখন নিঃসহায় নিঃসম্বল বেচারা একান্ত কাতর হইয়া কেবলই ছটফট করিতেছিল। হায়রে কি করিয়া এযাত্রা সে বাবাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? কিন্তু কিছুই যে উপায় নাই তাহার। অবশেষে বেচারা নিরুপায় হইয়া আমাদের হাতে তাহার বাবাকে সমর্পণ করিয়া ছুটিল সেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে। সুখ-সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ শিখরে বসিয়া কেউ কি কখনও দুঃখ-পীড়িতের বেদনা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়? এইজন্যই কবি বলিয়াছেন—"চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে? কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?" সত্যই ডাক্তার সাহেব কিছুতেই তাঁহার দর্শনী পঞ্চাশটি অগ্রিম রৌপ্য মুদ্রার বিনা বিনিময়ে আমার এই ছোট দরিদ্র বন্ধুটির রোদন বা বেদনায় কর্ণপাত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। হায়রে জগৎ, হায়রে স্বার্থ, হায়রে অর্থ। তাঁহার মোটর বারম্বার অর্থের ও আনন্দের সন্ধানে বাহিরে যাতায়াত করিতে লাগিল দীন বন্ধুটিকে আমার পিষ্টক্লিষ্ট করিয়া তবুও একবারটিও ফিরিয়া তাকাইল না তাহার দিকে। অবশেষ বন্ধু আমার যখন বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল তাহার বাসায় তখন আমার মত দীনহীনও আর তাহার সে কারুণ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া কোন মতে আমার মনিবদের অতিকষ্টে স্বীকৃত করিয়া আমার আগামী মাসের বেতন ত্রিশটি টাকা লইয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলাম—"এবার যাও যদি পার, দেখ ডাক্তার আসলেও আসতে পারেন।"

বন্ধু ছুটিল উর্ধ্বশ্বাসে ষ্টেশন হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী লইয়া। কিন্তু অপর সমস্ত অর্থশালী বড় বড় ধনশালী রোগীদের চিকিৎসা শেষ করিয়া ডাক্তার যখন আমাদের এখানে আসিলেন, তাহার বহু পূর্বেই দারিদ্র্য-দুঃখকে ফাঁকি দিয়া দরিদ্রতার জন্যই বিনা-চিকিৎসায় পরপারে পাড়ি দিয়াছে রোগী। বন্ধুটি আমার এত করিয়াও পিতাকে বাঁচাইতে না পারিয়া একেবারে যেন আড়ষ্ট কাঠ হইয়া গেল। তাহার চোখে জল নাই, মুখে ভাষা নাই, নিথর, নীরব, নিস্পন্দ! ডাক্তার বাবুর কিন্তু সে পাশে মোটেই লক্ষ্য নাই। তাঁহার চাই টাকা বলিলেন—"কৈ হে আমার বাকী টাকাটা মিটিয়ে দাও।"

অবাক্ আমি এই আচরণ দেখিয়া। ওঃ মানুষেও পারে এমনতর মর্মান্তিক আচরণ করিতে? কিন্তু তাহার জন্য ডাক্তার সাহেবের কিছু আসে যায় না। টাকা তাঁহার চাইই চাই, সে যে কোন প্রকারেই হোক। উপরোধ, অনুরোধ দূরের কথা, পদধারণ, চোখের জল কিছুই যেন কিছু নয়। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান তবে কোন্ পথে হইতে পারে? আমিও যেন কেন ছাই, ইহার মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিলাম—কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষ বেচারাকে এই অবস্থায় অত্যন্ত হীনভাবে অপমানিত হইতে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলাম—জগতে যখন ইঁহাদের কাছে প্রাণের মূল্য কিছুই নয়, টাকাটাই সব, তখন অযথা কালক্ষেপের আর আবশ্যক নাই। তখন একান্ত মরিয়া হইয়া ডাক্তার সাহেবকে বলিলাম—"দেখুন নিতান্ত নিরুপায় পক্ষে ওকে আপনি না চিনলেও আমাকে বিশ্বাস করুন আমি আপনাকে বাকী টাকার জন্য একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি, এক মাসের মধ্যে বাকী টাকা কয়টা ওয়াশীল করে দিয়ে আসব আপনার বাড়ীতে গিয়ে।"

ডাক্তার অতিকষ্টে কথাটায় নিমরাজী গোছের হইয়া গেলেন, কারণ ইহা ছাড়া তখন অন্য তাঁহার উপায় ছিল না কিছুমাত্র। তাঁহার বিদায়ের প[illegible] নীরব, নিস্পন্দ বন্ধুকে

নাড়া দিয়া সচেতন করিলাম। সে কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া আমার মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। তারপর অতিকষ্টে একটি বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল —"ভাই আর কিছু বলতে চাই না, যে ব্যথা আজ আমার সহস্র চেষ্টাতেও ডাক্তারের মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোককে বোঝাতে আমি সক্ষম হলাম না, ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকে তবে যেন এ বেদনা নিশ্চয়ই একদিন ডাক্তারও বিশেষভাবে বুঝতে সক্ষম হয়।"

ইহার ঠিক এক মাস পরের ঘটনা—বাকী টাকাটার জোগাড় করিয়া ডাক্তারের ঋণশোধের জন্য আসিয়া হাজির হইলাম, ডাক্তারের বাড়ীতে। কিন্তু একি ব্যাপার পুলিশে ডাক্তারের বাড়ীটি ঘেরাও করিয়াছে। পাগলের মত ডাক্তার মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে। অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেও ডাক্তারের ছিল একটি মাত্র ছেলে। গত বৎসর ছেলেটা একটা পাশও করিয়াছিল। অতি শান্তশিষ্ট বুদ্ধিমান, সুবোধ ছেলে। কয়দিন হইতে তাহার একটুখানি জ্বর হইয়াছিল। আজ সকালে অর্থের সন্ধানে আকুল হইয়া ডাক্তার যখন ঠিক ডাকে বাহির হইবে সেই সময় ছেলের জ্বরের অবস্থা দেখিয়া তাহার জন্য কম্পাউণ্ডার বাবুকে প্রেসক্রপসনে অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে "একটা বিষাক্ত ঔষধ" দিবার জন্য লিখিয়া দিয়া চলিয়া যান তাড়াতাড়ি। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন ছেলের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, অন্যান্য রোগীর প্রেসক্রপসন্ সার্ভের ভিড়ে কম্পাউণ্ডার ঐ নামের ঠিক ঔষধটি না দিয়া অন্য একটি তীব্র বিষাক্ত ঔষধ দিয়াছে। সর্বনাশ, অনেক চেষ্টা চরিত্র তদবির চলিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ডাক্তার-নন্দন অচিরেই অজ্ঞাত ধামে প্রস্থান করিল। এই অবস্থায় আমরা আর কি করি টাকা লইয়া সেদিনকার মত বাড়ী ফিরিলাম। দেখিলাম জগতে কিছুই ব্যর্থ যায় না। আমার বন্ধুর প্রাণের ব্যথার অভিযোগও ব্যর্থ হইল না। তাহার বিচারখানা হইল বড় মর্মান্তিকভাবে। ডাক্তার হাজার পাষণ্ড হইলেও মনটা আমার কেবলই যেন তাহার এই দুঃখে বেদনায় কাঁদিতেছিল আর কেবলই যেন বলিতেছিল নিরুপায় নিরাশ্রয় অনাথকে আমি অযথা পদাঘাত করিলে যদিও স্বয়ং তাহার আমার প্রতি প্রতিবিধানের কোন যোগ্যতা থাকে না সত্য; তথাপি সেই পদাঘাত কোন দিন না কোনদিন আমি ফিরিয়া পাইবই পাইব কোন না কোন স্থান হইতে। এইটুকুই হইল জগতের চিরন্তন দান-প্রতিদানের ইতিবৃত্ত।

নব মেঘদূত

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য

কলেজের পথে পুরাণো দোকানে মেঘদূত একখানি
দেখিয়া লইনু টানি
দাম ফেলে দিনু অনেক মাজিয়া কসিয়া।
হাত ঘড়ি দেখি একটা আটাশ
দেরী হয়ে গেছে—বসে গেছে ক্লাস;
ছুটে গিয়ে দ্রুত অনুমতি লয়ে ঢুকে সীটে পড়ি বসিয়া।

সদ্য আহৃত পুস্তকে মন বসানু সঙ্গোপনে।
উলটি মলাটখানি দেখি লেখা আছে, "রাণি,
দিলাম তোমায়—ইতি অবিরহী শ্রীশ।"
নীচে লেখা তার আষাঢ়-সন্ধ্যা, তেরশ উনত্রিশ।
অমনি আমার কল্পনালোকে উঠিল তখন ভাসি,—
মেঘে ভরা এক আষাঢ়-সন্ধ্যা ঘনায় তিমির রাশি;

চেয়ে আছে দূর আকাশে যেথায় বিজলী বেড়ায় হাসি।
সহসা তরুণ আলমারি হ'তে মেঘদূতখানি টানি',
হাসিতে হাসিতে পড়িতে বসিল ভেজায়ে দরজাখানি।
এ ঘর হইল রামগিরি আর অলকা হইল ওটা,
পাশের কক্ষে প্রিয়ারে স্মরিয়া বিরহের ঘনঘটা
মানস-গগন ছাইয়া ফেলিল দ্রুত ;
শ্রীশের কণ্ঠে মেঘদূত-শ্লোক হইতে লাগিল শ্রুত।
রাণী হেসে গড়াগড়ি ;
চলিয়াছে শ্রীশ পড়ি
উচ্চে উচ্চে তুলি স্বরগ্রাম শুনিয়া রাণীর হাসি।
তার পরে চুপে সহসা উঠিয়া আসি'
অতি ধীরে ধীরে রুদ্ধ দরজা খোলে,
ছুটে এসে ধ'রে রাণীরে জড়ায়ে মুখপানে আঁখি তোলে।—
"রোল্ টেন্" আমি চমকি উঠিনু, বজ্র পড়িল যেন ;
ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সুধালাম, "সার্, মোরে ডাকিছেন কেন ?"
"কামস্কাট্‌কা মহেঞ্জোদারো ব্যবধান কতখানি ?"
মনে মনে কহি, "মানুষেতে আর আপনায় যতখানি।"
"রাল্ টেন্" "সার ?" "কি বই পড়িছ ক্লাসে ?"
"মেঘদূত সার।" কহিলাম ধীরে বইখানি রাখি পাশে।
হঠাৎ কণ্ঠস্বর
অদ্ভুত হ'য়ে "মেঘদূত !" বলি' হইল নিরুত্তর।
তার পরে তুলি' সকরুণ আঁখি চাহিয়া আমার পানে
কহিলেন, "কই দেখি মেঘদূত"—রুদ্ধ বেদনা প্রাণে !
বইখানি আমি দিলাম তাঁহার হাতে ;
খুলিয়া মলাট টলমল করে অশ্রু নয়ন-পাতে !
"কোথা পেলে বই ?" বলিয়া রুদ্ধ হইল কণ্ঠ তাঁর।—
ঝরিয়া পড়িল কপোল বহিয়া তপ্ত অশ্রুধার।
সহসা আমার ব্যথিত হৃদয়ে বাজিল করুণ বাঁশী।
ধীরে ধীরে মোর মানস নয়নে ছবি এক উঠে ভাসি,—
নদীতীরে জলে শ্মশানের চিতা, তারি পাশে খাটে শুয়ে
শেষ-শয্যায় কে এক তরুণী ! কেশপাশ চুমে ভুঁয়ে ;
ললাটে সীঁথিতে সিঁদুর, রক্ত চরণ আলতা-রাগে,
লালশাড়ী আছে অঙ্গ বেড়িরা শ্রীশ বসি শিরোভাগে,
দুই নয়নেতে ঝরিছে অশ্রু, রুক্ষ তাহার কেশ,
পাগলের মত ছিন্নভিন্ন মলিন অঙ্গবেশ ;
রাণীরে যখন শোয়াইল চিতা'পরে
মেঘদূতখানি বাহির করিয়া দ্বিধাকম্পিত করে
ফেলে দিতে গিয়ে আগুনের মাঝে পড়ে সেটা ভূমিতলে।
শ্রীশের নয়ন ওপারে তখন দেখিছে দূর্বাদলে !
ডোমটা কুড়ায়ে পুরাণ দোকানে বিক্রি করিল তারে ;
আমি কিনিয়াছি এই সেই বই সিক্ত অশ্রুধারে !
"অতি প্রিয় তব মেঘদূত তাই কিনিয়া এনেছি, সার,
আপনারে দিতে নিন্ দয়া করে' ক্ষুদ্র এ উপহার।"
স্বরগ-মুক্তা-অশ্রু জমিল আমারও নয়ন-কোনে
মুছিয়া লইনু, দেখিনু সকলে বিস্ময়-ভরা মনে—
মেঘদূত ল'য়ে দ্রুত চলে যায় সুনিয়মী প্রফেসার।
আমার জীবনে আজিকে প্রথম পড়ান হ'ল না তাঁর !

প্রমীলা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

স্থান :—রাজোদ্যান ; কাল :—অপরাহ্ণ

[প্রমীলা ও সখীগণ]

(গীত)

সোণার দেশে বাস আমাদের,
সোণার দেশে জন্মরে।
ভোরের হাওয়ায় রাঙিয়ে উঠে
পুব আকাশ ঐ,—কাঁচা সোণার বর্ণরে !
শ্যামল ক্ষেতে সোণার ফসল ;
নদীর বুকে মধুর জল,—
ফুলের গন্ধে পাখীর গানে
জাগায় প্রাণে হর্ষরে।
শমন হেথায় অশ্বপাল,
বরুণ হেথায় যোগায় জল,—
মলয় হেথায় আদেশ মানি'
নিত্য বহে ফুরফুরে।
দেশটি মোদের সবার সেরা
তুচ্ছ স্বরগ তুচ্ছরে।
জনম নিয়ে এমন দেশে—
ধন্য মোরা ধন্যরে॥

[গীতান্তে সখিগণের প্রস্থান]

[প্রমীলা একদৃষ্টে নীলসমুদ্রের দিকে চাহিয়া কি যেন, কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার আয়তলোচন দিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু তাঁহার গণ্ডদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় প্রধানা সখী রঙ্গিলা প্রবেশ করিয়া প্রমীলাকে তদবস্থায় দেখিয়া মনে করিলেন যে প্রমীলা ইন্দ্রজিতের ধ্যানে বিভোর হইয়া আছেন তাই পরিহাসচ্ছলে

(গীত)

সখিরে ! আজি কেনগো আপনহারা।
তোমার পরাণ বঁধুয়া আসিবে অচিরে
মুছগো নয়ন-ধারা॥

[সহসা রঙ্গিলার গানে চমকিয়া উঠিয়া প্রমীলা কহিলেন]

প্রমীলা। এখন রঙ্গ রাখ্ রঙ্গি !

[রঙ্গিলা গাহিলেন]

কিবা প্রণয়-কোপেতে অধর স্ফুরিত,
আঁখি করে ছল ছল।
সতত বঁধুয়া, রাখিবে কেমনে,
আঁচলে বাঁধিয়া বল॥

প্রমীলা। আঃ বিরক্ত করিসনি। যা'না এখন !

[রঙ্গিলা হাসিতে হাসিতে গাহিলেন]

যাই যাই সখি, আনিতে বঁধুয়া—
রহগো ধৈরয ধরি।
কহিব নিঠুরে, এ চাঁদ বয়ান
কেমনে আছ পাশরি॥

[গীতান্তে প্রস্থান]

[সহসা প্রচণ্ড সৈন্য-কোলাহল ও ভয়ঙ্কর বাণের গর্জন শ্রুত হইল, প্রমীলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এমন সময় মেঘনাদ প্রবেশ করিলে, প্রমীলা ব্যস্ততা সহকারে উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন]

প্রমীলা। নাথ !

নিশারণে পড়েছে রাঘব !
রাজানুজ সুমিত্রানন্দন।
তবে কেন রণোল্লাস পুনঃ

মেঘনাদ। রাঘব লক্ষ্মণ,
পুনরায় পেয়েছে জীবন!
প্রমীলা। মৃতে পায় ফিরিয়া জীবন!
মেঘনাদ! নারায়ণ নারায়ণ!
হাঃ হাঃ হাঃ
প্রমীলা। হাসিও না নাথ!
যেন মনে হয়,—
সত্য বুঝি হবে নারায়ণ!
মেঘনাদ। সত্য!
ত্যজি বৈকুণ্ঠ ভবন,—
বানর-কটক লয়ে,
করিয়াছে লঙ্কা অভিযান।
আর কোথা লক্ষ্মী!
বৈদেহী মানবী—
বন্দিনী যে অশোক-কাননে!
প্রমীলা। নাথ!
করো না বিদ্রূপ!
ভেবে দেখ মনে,
কার লাগি
স্বেচ্ছায় জলধি কণ্ঠে
পরে শিলাহার!
কাহার পরশে—
করাল সে নাগপাশ—
ঘুচিল পলকে—
কাহার আদেশে,—
শবদেহে সঞ্চারিত প্রাণ!
মেঘনাদ। ইন্দ্রজাল—ইন্দ্রজাল!
যাদুকর রাম!
প্রমীলা। নাথ!
সামান্যা মানবী লাগি'
লঙ্কার গৌরব-রবি—
রাহুগ্রস্ত আজি!
আহতের মরণ-চীৎকার!
আর নাথ সহিতে না পারি!
মেঘনাদ। সত্য প্রিয়ে!
কিন্তু কি করিব।
নিরুপায় মোরা
প্রমীলা। নিরুপায় কেন?
মুক্ত কর জনক নন্দিনী—অবলা কামিনী—
লঙ্কার সমরানল হ'ক নির্বাপিত।
মেঘনাদ। মুক্তি দেবো সীতা!
প্রমীলা। কেন অসম্ভব প্রিয়তম?
মেঘনাদ। বরাননে!
মনে মনে দেখ বিচারিয়া—
দণ্ডক অরণ্য-মাঝে,—
সরলা কামিনী—সূর্পণখা পিতৃস্বসা—
দেখ বিচারিয়া
অনাথিনী—অরক্ষিতা—বিজন বিপিনে—
বলে ধরি নাসাকর্ণ ছেদিল লক্ষ্মণ—
কুলনারী অপমান করিল দুর্জন!
প্রমীলা। প্রিয়তম!
হয়নি কি তার প্রয়োজন?
তুমি নাহি জান—
আমি শুনিয়াছি।
নাথ!
পিতৃস্বসা তব—
সে কাহিনী কহনে না যায়
স্বৈরিণী রমণী
কামোন্মত্তা—লজ্জাহীনা—
ভজিবারে চাহে পতি জায়ার সম্মুখে!
মেঘনাদ। প্রিয়ে!
পরবশ রমণী-হৃদয়!
কামোন্মত্তা—লজ্জাহীনা যদ্যপি কামিনী
তবু তারে অপমান করে কি পুরুষ?
না বাড়ে পৌরুষ তাহে কভু!

করিয়াছে কুলাঙ্গনা-অপমান।
তাই প্রতিবিধিৎসিতে,
বলে ধরি এনেছেন পিতা—
জনকনন্দিনী।
মুক্তি কেন দেবো তারে ?

প্রমীলা। বলে ধরি এনেছেন বটে !

মেঘনাদ। তবে !

প্রমীলা। স্বর্ণমৃগরূপে মারীচ পালায় !
পিছু রাম ধায়।
গহন কাননে,—
পড়ে মৃগ রাঘবের বাণে।
রামস্বরে ডাকিল মারীচ
সুমিত্রানন্দনে।
ছুটিল সৌমিত্রী,—
একাকিনী ফেলি সীতা কুটিরমাঝারে।
তারপর,
ভুবনবিজয়ী দশানন,
যোগিবেশে দিল দরশন।
ভিক্ষা নিতে গিয়ে,—
চুরি করি সীতা,—
এনেছেন কনক-লঙ্কায় !

মেঘনাদ। রাক্ষসের পতি,
চুরি করি এনেছেন সীতা !

প্রমীলা। সত্য প্রিয়তম !

মেঘনাদ। প্রমীলা—প্রমীলা।
হীনজন নহে দশানন।

প্রমীলা। না—না—না—
নহে হীনজন—
বিজয়ী যে এ তিন ভুবন।
পূর্ণচন্দ্রে আছে কলঙ্কের রেখা,
নিষ্কলঙ্ক হ'ত দশানন
সীতার হরণ যদি নাহি হত।

মেঘনাদ। 'না—না—না—

প্রমীলা। রাক্ষসের নীতি
পরনারী বলেতে হরণ।

মেঘনাদ। সত্য !
প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ।

প্রমীলা। ফলে হ'ল সমুদ্রশাসন।
পঙ্গপাল বনের কটক
ছাইল কনকলঙ্কা ;
রাক্ষসের রক্তে বহে নদী !

মেঘনাদ। কিন্তু এইবার রণে
রক্ষা নাহি পাবে কভু শ্রীরাম-লক্ষ্মণ—
শঙ্করও সাহায্যে আসে যদি।
বিতাড়িব ফেরুপাল সম,
সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমানে—
সমুদ্রের পরপারে।
জাতিদ্রোহী বিভীষণে
বাঁধি আনি,—
ফেলাইব রাজার চরণে।
শঙ্কা ত্যজ প্রাণেশ্বরি !
স্বর্ণলঙ্কা হ'বে নিষ্কণ্টক !

প্রমীলা। কিবা শঙ্কা মোর !
ভুবনবিজয়ী দশানন,
আমি তাঁর পুত্রবধূ,
সোহাগিনী কামিনী তাঁহার
ইন্দ্রজিৎ আখ্যা যাঁর।
শোন নাথ !
যদি প্রয়োজন হয়,—
সম্ভব এ নয়,—
যদি প্রয়োজন হয়—
বেণী কাটি' বিনাইয়া ছিলা,
বাঁধিব কার্মুকে।
পিশাচী সাজিব রণে—
শত্রুরক্তে বহাইব নদী।
কিন্তু নাথ !

এই রণ আয়োজন;
অতি অকারণে
প্রজাকুল হতেছে নির্মূল—
রাজ্যবাসী—
কাঁদে সবে দীর্ণ হাহাকারে!
সহিতে না পারি
তাই কাঁদে প্রাণ।

মেঘনাদ। ক্ষমা কর দেবি!
ইন্দ্রজিৎ মাগে পরাজয়।

প্রমীলা। ক্ষমাযোগ্য নহে অপরাধ।
তবু আমি করিলাম ক্ষমা।
দেখ, নিলর্জ্জের মত,
করিও না অপরাধ পুনঃ।

মেঘনাদ। যথা আজ্ঞা রাজরাজেন্দ্রাণী।
[প্রস্থানোদ্যত]

প্রমীলা। একি!
কোথা যাও!

মেঘনাদ। মন্ত্রনাভবনে।
ভেটিবারে রাক্ষসের পতি।

প্রমীলা। অচিরে ফিরিও নাথ!

মেঘনাদ। অচিরে ফিরিব প্রিয়ে!
পলকের অদর্শন তব,—
যুগযুগান্তের বিরহ আনিয়া দেয় যেন।
[প্রস্থান]

প্রমীলা। চলে গেল!
না—না—শতকার্য পুরুষের!
নাহি শোভে,—
রমণী-অঞ্চলে বাঁধা!
হে সুন্দর!
ক্ষণিকের অদর্শন তব
কত করে উদ্ভ্রান্ত এ চিত,
যদি জানিতে হে নাথ!
[প্রস্থান]

ক্রমশঃ

বাংলা-মায়ের রূপ

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জয়ন্তীতে কয়েক ঘণ্টা

জয়ন্তী হিমালয়ের পাদমূলে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র ষ্টেসন। কিন্তু এই ষ্টেসনের মর্যাদা প্রকৃতির স্বহস্তরচিত অলঙ্কারে যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অনেক বড় বড় জংশন ষ্টেসনও তাহার নিকট হার মানে। অরণ্য-সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিমালয়ের নিম্নভূমির বিশাল জঙ্গল এই ষ্টেসনের সীমানার বহির্ভাগেই বিরাজমান; বৃহৎ বৃহৎ শালগাছ, পাইন-দেবদারুর ঘনবীথি, সেগুণ-শিশু কাঠের সীমাহীন অরণ্য মৃগ স্বচ্ছন্দচিত্তে এই জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়;—মানুষের আগ্নেয়াস্ত্রের তোয়াক্কা রাখে না। তারপর অদূরবর্তী জয়ন্তী নদীর কুলুকুলু ধ্বনি দিবারাত্রি কোন অনাদ্যন্ত সামগানের মত শ্রবণ-বিবরে মধুধারা বর্ষণ করে;—সর্বোপরি, পটভূমিকায় হিমালয়ের অভ্রলেহী শিখররাজির অবস্থিতি ইহাকে মধুর হইতে মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে—চক্ষে না দেখিলে এ সৌন্দর্যের অনুভূতি ভাষার বর্ণনায় ফুটিয়া উঠে না। যাহা অনুভব করিয়াছি, যে সৌন্দর্যসুধা

করিয়াছি, তাহার কতটুকুই বা ক্ষুদ্র লেখনীর মুখে ব্যক্ত করা সম্ভব? মনে হয় মহর্ষি বেদব্যাস যদি এই সৌন্দর্যের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন; লম্বোদর গজানন যদি লেখনী ধারণ করেন; ক্ষিরোদসমুদ্র যদি মস্যাধারে পরিণত হয়; বিশাল নীলাকাশ যদি কাগজরূপে পরিণত হয়, তথাপি এই সৌন্দর্যের অণুকণামাত্র প্রকাশিত হইতে পারে—মাদৃশ জ্ঞানহীন অক্ষমের চেষ্টা ত বাতুলতার নামান্তর!

লালমণির হাট ছাড়াইয়া যাইবার পর একটি ভদ্রলোক আমার কক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন; তিনি ইতিপূর্বে জয়ন্তী দেখিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, জয়ন্তী দেখার প্রশস্ত সময় শিবরাত্রি, কারণ ঐ সময়ে এই স্থানে মহাকালের মন্দিরে যাত্রীর সংখ্যাধিক্য হয় এবং মহাকালের মন্দিরে একটি মেলা বসে। তাহার কিছু পূর্ব হইতে মহাকালের মন্দিরের রাস্তা খোলা হয়। এখন ঐ রাস্তা ঘনজঙ্গলে কণ্টকসমাকীর্ণ বন্য তরুগুল্মে অলঙ্ঘ্য হইয়াছে;—এখন মহাকালের গুহায় প্রবেশের কোন পথ নাই।

সুতরাং মহাকালের মন্দিরে যাইতে না পারিলেও, তিনি আমাকে জয়ন্তী নদীর পুল পার হইয়া একটি সরু পথে একটি ঝরণার তীরবর্তী বৃহৎ আম্রবৃক্ষের মূলদেশ পর্যন্ত গমন করিয়া তথায় প্রকৃতির স্নিগ্ধ-গম্ভীর শ্যামশোভা দর্শনার্থ উপদেশ দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার কথা শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম।

এখন সেই কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেই প্রথমে সেই আম্রবৃক্ষ দর্শনের অভিলাষ মনোমধ্যে দেখা দিল। টিকেট কলেক্টারকে দশ টাকার পাসপোর্ট দেখাইয়া ষ্টেসনের বাহিরে আসিলাম, বাহিরে একখানি মোটর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; কয়েকজন যাত্রী তাহাতে উঠিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহা যাইবে প্রায় ২০ মাইল দূরবর্তী এক চা বাগানে। আমার ইচ্ছা ছিল ঐ মোটরে করিয়া একবার সেই চা বাগান পর্যন্ত ঘুরিয়া আসি, কিন্তু যখন শুনিলাম যে, ঐ আশা পরিহার করিয়া রসালতরুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ষ্টেসনের লৌহ তারের পাশেই শুভ্র-সরল রাস্তা; তাহার পরে গভীর শাল বন। সেই রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। অল্প কিছুদূর গিয়াই জয়ন্তী নদীর পুল পাইলাম। জয়ন্তী নদীর পুলের উপর দাঁড়াইয়া অতীতের কত কথাই মনে পড়িল। ডুয়ার্সের ঘাসমারী চা বাগানে অবস্থান-কালে উক্ত বাগানের অদূরবর্তী গাটিয়া নদীর পুলের উপর সায়ংকালে বেড়াইতে যাইতাম—তখন ঐ সামান্য সময়ের জন্য সংসারের দুঃখদৈন্যজ্বালা ভুলিয়া যাইতাম; প্রকৃতি-মায়ের কোলে সরল শিশুটির মত জলের ধারে বসিয়া নুড়ি লইয়া খেলা করিতাম! সে আজ কত সুন্দর—অথচ কত সুদূর! তখন যদিও সংসারের বিভিন্ন বিভীষিকা ভয়াবহ মূর্তিতে আমার পুরোভাগে উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাহস-সান্ত্বনারও অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। সুখে দুঃখে জীবনের একটি পরিপূর্ণ অধ্যায়ের ছবি আজ জয়ন্তী নদীর পুলের উপর আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অভিনীত হইয়া গেল!

এই জয়ন্তী নদীর পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আমি ভুলিয়া গেলাম আমার বাহ্য অস্তিত্ব। যে জলধারা কত দূর-দুরান্তরের পর্বতবক্ষ ভেদ করিয়া বহমান, শিলা হইতে শিলান্তরে আঘাত করিতে করিতে অট্টহাস্যে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া 'অজানা কতশত নূতন দেশে'র দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল স্বর্গ-নির্ঝরিণী গঙ্গা-অলকনন্দা-মন্দাকিনীর সহোদরা এই জয়ন্তী। সেই স্বচ্ছ জলধারা, সেই উপলব্যাহত কল-ধ্বনিরত গতি, সেই পর্বতমধ্যবর্তিনী নির্ঝরিণী—কোন বিভেদ, কোন বৈষম্য, কোন পার্থক্য দেখিলাম না, কিন্তু একটি বিষয়ে উভয়ের বিভিন্নতা স্পষ্ট হইয়া উঠিল, ভেদ রেখা দিগন্তের বুকে রামধনুর মত জ্বল জ্বল করিতে লাগিল—গঙ্গা-অলকনন্দামন্দাকিনীর তীরে তীরে পাইয়াছি, তীর্থযাত্রীর "জয় বদরী বিশাল কি জয়, কেদারনাথ কি জয়"; আজ সেখানে পাইলাম মোটরের তীব্র তূর্য

হইবার পূর্বেই স্বর্গ-নির্ঝরিণীর তীরস্থিত চটীর যাত্রিদলের মধ্যে কলহ-কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে ভজন গান, পূজা, আরতি প্রভৃতি দেখিতাম; এখানে তাহার কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না—দোকানদারের ক্ষুদ্র লাভ-ক্ষতির হিসাবই শান্ত রমণীয় সন্ধ্যার ধ্যান-পূজারতির স্থান গ্রহণ করে।

নদীর তীরে বসিয়া একটি মহিলা কাপড় কাচিতে ছিল; আমি ঠিক পুলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে নদীর একটানা স্রোতের দিকে তাকাইয়া ছিলাম। হঠাৎ মোটরের তীব্র হর্ণের শব্দে স্বপ্নলোক হইতে জাগৃতির রাজ্যে ফিরিয়া আসিলাম। এক পাশ ঘেসিয়া দাঁড়াইলাম; মোটর চলিয়া গেল পুরোভাগে ধূলি উড়াইতে উড়াইতে—মনে পড়িল—

"আগে আগে চলে মোটর-যাত্রী উড়ায়ে পথের ধূলি"

কিন্তু "ছিন্ন নরের মুণ্ড বর্ষাফলকে তুলি"—দেখিলাম না।

মোটর চলিয়া যাওয়ার পর আমিও পুল অতিক্রম করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। এই রাস্তা দেখিয়া আমার "বদরীনারায়ণ-কেদারনাথের" পথের কথা মনে পড়িল। এই রাস্তার সঙ্গে সেই পথের সাদৃশ্য খুব বেশী,—জয়ন্তী নদী ও এই শুভ্র-বালুকা-কঙ্করমণ্ডিত পথরেখা দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে আবার আমি সেই বহু পুণ্যফললব্ধ স্বর্গীয় পথে চলিতেছি!

কিছুদুর গিয়া বড় রাস্তা ছাড়িয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া আঁকা বাঁকা সরু পথে যাত্রা আরম্ভ হইল। এই পথ যেন ঠিক পথ নহে, কাষ্ঠাহরণকারীদিগের জন্য তৃণ-গুল্ম-কণ্টক বনের মধ্য দিয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা মাত্র। এইবার যে ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহা মানবযাত্রীর পক্ষে প্রকৃতই দুর্গম। কোথাও বৃক্ষশাখা হেলিয়া পড়িয়াছে পথের উপর, কোথাও অযত্নসম্ভূত কত অর্কিড ও ফার্ণ জাতীয় তৃণগুল্ম পথের উপর পড়িয়া রহিয়াছে—কাহারো বক্ষে মানবপদাঘাতের কলঙ্ককালিমা দীপ্যমান; কেহ বা সতেজে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কত বন্য বিহঙ্গ মধুর স্বর-লহরীতে দিগন্ত প্লাবিত করিতে লাগিল; উন্নতশীর্ষ বৃক্ষের উপর বসিয়া রহিয়াছে এমন দুই একটি পাখীকে দেখা গেল—অনেকগুলিকে দেখিলাম না। অথচ তাহাদের করুণ-মধুর ঝঙ্কার শরতের উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।

এক স্থানে আসিয়া দেখিলাম—পার্বত্য নির্ঝরিণী আমার যাত্রাপথকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া বিরাজমান। জলের মধ্যে কত শুভ্র-চিক্কণ উপলখণ্ড শোভা পাইতেছে; তীরে তীরে শুভ্র বালুকা কত অতীত জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। উহা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলাম।

হঠাৎ অদূরে যেন কোন নারী-কণ্ঠের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ইতস্ততঃ তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। কোন লোক দেখিলাম না, মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। কি জানি যদি কোন অশরীরী আত্মা এই জনহীন অরণ্যে আমাকে একাকী দেখিয়া ভয় দেখান!

এই ভয়ের ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া নির্ঝরিণীর তীরে দুইটি পার্বত্য রমণীকে কাষ্ঠাহরণরতা দেখিতে পাইলাম—এইবার বুঝিলাম—কোথা হইতে আসিয়াছিল কণ্ঠধ্বনি। তাহাদিগকে বামে রাখিয়া অগ্রসর হইলাম, কিন্তু অন্য কোন জনমানবের সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

চলিতে চলিতে অনেকক্ষণ পরে ক্ষুদ্র বেগবতী নির্ঝরিণীর উপলব্যথিত জলধারা অতিক্রম করিয়া পর্বতের পাদমূলে উপনীত হইলাম। ঠিক পর্বতারোহণ স্থলে এক বিশালকায় আম্রবৃক্ষ কোন অনাদিকালের সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান। তাহার পাশ দিয়া পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা। আম্রবৃক্ষের অদূরে বৃহৎ পাষাণখণ্ডে দেহ এলাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ স্বাদু-শীতল জল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিলাম; সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—যে যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত তৃষ্ণা বক্ষোদেশে দাবাগ্নির মত জ্বলিতেছিল, তাহা পলকে অন্তর্হিত হইয়া গেল—আমিও হইলাম স্নিগ্ধ-শীতল। এই স্থানে বসিয়া নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি রচনা করিলাম—

বিজন বিপিনে বাজে কাহার বাঁশী!
কোন্ সে দেবতা জাগে হৃদয়-দলে
মধুর হাসি।

তরুলতা ফলফুলে　　বিজন নদীর কূলে
ছবিখানি পুরোভাগে উঠিছে ভাসি।
তোমার বাঁশীর স্বরে ওগো দেবতা,
নাচিছে ভুবন সারা—নব বারতা!
এস ওগো হে অজানা　আর করিবনা মানা
আমার হৃদয়ে ঢাল অরূপ-রাশি।

প্রায় এক ঘণ্টা নীরব বনস্থলে অতিবাহিত করিয়া আবার লোকালয়ের পথে ফিরিলাম। ক্ষুধার আতিশয্য বেশ অনুভব করিলাম। ষ্টেসনে ফিরিয়া নিকটবর্তী বাজারের পথ ধরিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাজারে উপনীত হওয়া গেল। বাজার খুবই ক্ষুদ্র—৫।৬ খানা মাত্র দোকান।

এক দোকানদারের দোকানে দেখিলাম—নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে, সেইখানেই ঢুকিয়া পড়া গেল। যোগবাণীর চিড়ে দই পাওয়া গেল না। পুরি শাক ও লাড্ডুর সহযোগে আবার ভোজনপর্ব শেষ করিলাম।

এই দোকানদারের সহিত ব্যবসা সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্তা হইল। দোকানদার বাঙালীর ব্যবসায় বিফলতার কারণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। কিন্তু কথাগুলি একেবারে মিথ্যা নহে, সুতরাং হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হইল না। অগত্যা দুঃখিতচিত্তে হজম করিলাম। কিন্তু কঠোর আটার পুরি হজম করিতে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

বাজার অতিক্রম করিয়া আরও কিছুদূর জয়ন্তী নদীর তীর ধরিয়া চলিলাম, কিন্তু পরে ট্রেণের সময় অতিক্রান্ত হইবে মনে করিয়া ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিলাম। ষ্টেসনে আসিয়া শুনিলাম, এই স্থানে রেলওয়ে রানিংরুমে ভাত ও মাছের ঝোল পাওয়া যায়। কিন্তু এই যাত্রায় আমি সেই চেষ্টা করি নাই।

গাড়ী ষ্টেসনেই দাঁড়াইয়াছিল, উঠিয়া বসিলাম। দূরে ষ্টেসনের বহির্ভাগে দেখিলাম, শালবনের ভিতর হইতে একটা হরিণ বাহির হইয়া আসিল। এই স্বচ্ছন্দচারী বন্য জীবগুলি আমার বড় প্রিয়, নিরীহ হরিণকে শিকার করা শিকারীর পক্ষে বাহাদুরি হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকট উহা ঘৃণ্য কাজ বলিয়া মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—সে অনেক দিনের কথা—একবার নর্মদা খণ্ডে এই শারদীয় অপরাহ্ণে বিশাল প্রান্তরের বুকে পালে পালে হরিণ চরিতে দেখিয়াছিলাম। আমাদের মোটরের শব্দে উহারা পলায়ন করিয়াছিল দূরে—বহুদূরে।

অবশেষে ৪-৪৫ মিনিটে জয়ন্তী ত্যাগ করিয়া গাড়ী নিম্নাভিমুখে যাত্রা করিল।

পথের বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্য দিয়া পার্বতীপুরে পৌছি এবং দার্জিলিং মেলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই দার্জিলিং মেলে প্রত্যাবর্তন যে কত কষ্টকর তাহা তৃতীয় শ্রেণীর ভুক্তভোগী যাত্রী ব্যতীত অপরের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। কোন মতে গাড়ীতে স্থান সংগ্রহ করি এবং পরদিন কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করি।

ক্রমশঃ

স্বর্গীয় কানাইলাল চন্দ্র

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

[৭]

"ভগবানের মহিমা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর", একথা বলিয়া গ্রন্থকার পুনরায় লিখিতেছেন, শ্রবণ ও কীর্তন দ্বারা জীব ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে এবং ইহাদের সাহায্যে পরমা গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। শ্রুতি ও পুরাণ বহুবার এ কথার উল্লেখ করিয়াছে, "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্"। এ স্থলে তাঁহার মত এই যে, "যদ্যপি শ্রবণ ও কীর্তনই ভগবান্ পাইবার কেবল উপায়, তবে এ উপাসনা সাকারভাব ব্যতীত নিরাকারে পৌঁছে না। কেন না, শ্রবণ কিংবা কীর্তন, আকার না থাকিলে কিরূপে সম্ভবে"। পৃঃ ১১

ইহার পর তিনি ব্রহ্মার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন,—"যে সকল ব্যক্তি নির্গুণ ব্রহ্মের ভাবনা করে, তাহারা তোমার মহিমা যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সগুণের মহিমা বড় দুর্জ্ঞেয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, নির্গুণ ব্রহ্মের ভাবনাতে কিরূপে তাঁহার মহিমা জানিতে পারিবেক? উত্তর,—প্রত্যাহারের দ্বারায় অর্থাৎ প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় যৎকিঞ্চিৎ সমাধা হইতে পারে। অষ্টাঙ্গ-যোগের 'প্রত্যাহার' একটি অঙ্গ। ইহার দ্বারা বাহ্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মনকে আত্মাতে নিক্ষেপ করিতে হয়।" পৃঃ ১২

এই প্রসঙ্গে তিনি মন ও ইন্দ্রিয়কে কি ভাবে সংযত ও প্রত্যাহৃত করিতে হয়, তাহার বিশদ্ আলোচনা করিয়াছেন:—"মনের শক্তি অতি দুর্বল, যদ্যপি বিষয়ে আসক্ত থাকে ব্রহ্ম ভাবনা করিতে পারে না, এবং যদ্যপি বিষয় ভুলিতে পারে, ব্রহ্মতে আপনা আপনি নিক্ষিপ্ত হয়। অতএব যাঁহারা মনকে যোগের দ্বারায় বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত

এক পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, মন বিষয়সকলে ধাবমান হয়, যে হেতু বিষয়সকল বিকারী পদার্থ, কিন্তু আত্মা ত বিকারী পদার্থ নহে; তবে কিরূপে মন আত্মাকে ধারণা করিবেক? ইহার উত্তর এই যে, মন স্বচ্ছ পদার্থ, যেমন আয়না, এবং জীবের মনেতে আত্মা অনাদি কাল অবধি অবস্থিত আছেন; কিন্তু বিষয়রূপ মলিনতাতে ঐ স্বচ্ছ পদার্থকে মলিন রাখে; সুতরাং উহার প্রতিবিম্ব কোনমতে বোধ হয় না। কিন্তু যদ্যপি ইন্দ্রিয়সকলকে যোগেতে প্রত্যাহৃত করা যাইতে পারা যায়, ও মন পরিষ্কার হয়, তখন ঐ ব্রহ্মের তেজোময় প্রতিমূর্তি ঐ মনেতে আপনি উপস্থিত হয়। কিন্তু এ প্রত্যুত্তরেও যদ্যপি সন্দেহ নিবারণ না হয়, ও তথাপি পূর্বপক্ষবাদীরা কহেন যে, যদবধি মন আত্মাকে ভাবনা করে, মন এক পদার্থ, ও আত্মা এক স্বতন্ত্র পদার্থ এবং স্বতন্ত্র পদার্থ-হেতু আত্মা বিকারী পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। উত্তর,—এ তর্ক তাঁহাদিগের সমুদয়ই ভ্রম, এবং কোনমতে স্থাপনা হইতে পারে না। কেন না, মন যখন প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মাকে অনুভব করে, মন তখন সেই আনন্দের আকার প্রাপ্ত হয়, এবং সাক্ষাৎকার প্রভাবে আনন্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়; যেহেতু আত্মা কেবল আনন্দের স্বরূপ। এ প্রমাণে মনের কেবল বৃত্তি অর্থাৎ কর্ম আছে, কিন্তু আত্মা নির্বিষয়ী হেতু মনের কর্মের ফল নাই, এবং যদ্যপি নির্বিষয়ী, অর্থাৎ স্থূল পদার্থ নহে, তখন আত্মা বিকারী বলিয়া কোনমতে সাব্যস্ত হইতে পারে না।"

পৃঃ ১২-১৩

অতঃপর গ্রন্থকার নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের আলোচনা

উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—"নিগুর্ণ ব্রহ্মের কিঞ্চিৎ মহিমা যোগেতে অনুমান মাত্র হইতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত সগুণ ভগবানের মহিমা জানিবার কোনমতে উপায় দেখি না। যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত অর্থাৎ যাঁহাকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ধারণ করিবার স্থান হয় না ও যিনি বলীকে ছলিবার সময়ে কেবল তিন পদের দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ও পাতাল ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, কিরূপে মা যশোমতীর ক্রোড়ের এক পার্শ্বে তাঁহার বসিবার স্থান হইত, কিংবা শ্রীদাম কিরূপে স্কন্ধে করিয়া তাঁহাকে বেড়াইতে পারিতেন, কিংবা শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে কিরূপে তাঁহার শয়ন করিবার স্থান হইত?…… ……এই সকল মহিমা কেবল সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অধিকারীরাই বুঝিতে পারেন, অন্যে পারে না। ব্রহ্মা কহিলেন যে, তাঁহার পক্ষেও ইহা বোঝা অসাধ্য।" পৃঃ ১৩-১৪

ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে অনেক কথাই বলিয়াছেন, এবং ভক্তিমান্ গ্রন্থকারও বিস্তৃতভাবে সে সমস্তের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে আমরা এখানে শুধু নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়া এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করিতেছি—"ব্রহ্মা পুনরায় কহিলেন যে, হে বিভো! আমার আস্পর্দ্ধা দেখুন যে, আপনার উপর আমরা মায়া প্রচার করিয়াছিলাম। যেমন অগ্নির কণারাশি অগ্নির নিকট কোন কার্য করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ আমার ক্ষুদ্র মায়া আপনকার বৃহৎ মায়ার নিকট দৃশ্যমান্ হইতে পারে না।"

"ব্রহ্মার অভিলাষ যে, ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। এ কারণে কহিলেন—'হে অচ্যুত'। অর্থাৎ তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ কর নাই। যদি বল প্রতিজ্ঞা কি? প্রতিজ্ঞা এই যে,—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

অর্থাৎ জীবনের মধ্যে যে একান্ত চিত্তে একবার কহে, 'হে ভগবন্! আমি তোমার শরণাগত হইলাম।' তুমি তাহাকে চিরজীবনের জন্য অভয় দান কর, কারণ ইহাই তোমার প্রতিজ্ঞা। যদ্যপি তাহাই হয়, যদিও আমার গুরুতর দোষ, তত্রাচ আমাকে ক্ষমা করুন। রজোগুণে আমার উৎপত্তি, এ কারণে আমি আপনা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। সত্ত্বগুণের চিহ্ন—সদাচার ও ভগবন্নিষ্ঠা, রজোগুণের—ঐশ্বর্য ও অহঙ্কার এবং তমোগুণের আলস্য ও পাপাচরণ। যেমন কোন বস্তু পূর্বদিকে অবস্থিত থাকিলে তাহার অন্বেষণে পশ্চিমদিকে ধাবিত হইলে, বস্তুর সন্নিকটস্থ না হইয়া বরং অধিক দূর হইয়া পড়ে, তেমনি যদিও আমার মানস হয় যে, তোমার নিকটবর্তী হই, আমার স্বভাব বশতঃ তোমা হইতে দূর হইয়া পড়ি। আমাকে ঐশ্বর্যমদে ও অহঙ্কারে অন্ধ করিয়াছে। আমি মনে মনে ধারণা করিয়াছিলাম যে, আমি 'অজ' অর্থাৎ প্রাকৃত মাতাপিতা হইতে জন্ম না হওয়া হেতু ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। যদিও সে ধারণা আমার অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। কিন্তু সৃষ্টির ভার আমার উপর আছে এবং আপনিই আমাকে এই কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। যেমন সূর্যকান্ত কাচ যদিও অগ্নি উৎপন্ন করিতে পারে বটে, তত্রাপি সে ক্ষমতা কেহ সূর্যের ব্যতীত ঐ কাচের কহিবেক না, সেইরূপ আমার এই স্বামিত্ব অবশেষে আপনাতে গিয়া পৌঁছিবে। আপনকারই তেজে আমি তেজীয়ান্, অতএব আপনি আমাকে দাস ভাবিয়া আপনকার অনুকম্পনীয় মনে করুন ও ক্ষমা করুন।" পৃঃ ১৭-১৮

ভগবানের মাহাত্ম্য ও লীলা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, তাঁহার ব্রহ্মত্বের পরিবর্তে ব্রজের তৃণ হইবার কামনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা দেখিতে আসিয়া তাঁহার মনের মোহ ও নয়নের বিভ্রম অপসারিত হইল। তিনি দেখিলেন একমাত্র ভক্তি ও প্রেমে ব্রজের অধিবাসীরা দুর্লভকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

"ব্রহ্মার স্তবের" পরে গ্রন্থকার "শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়" লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের মধ্যে এই দশমেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীব্যাসদেব কেন যে, নয়টি স্কন্ধের পরে দশমে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিলেন, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার

বলিতেছেন—"মনুষ্যের মন এত সংকীর্ণ যে, সেই বিরাট্‌-রূপীর যশ হঠাৎ কীর্তন করিলে, তাহা কখনই মনেতে ধারণা হইতে পারিবেক না। এই নিমিত্ত ব্যাসদেব সকল অংশ-অবতারের লীলা কীর্তন করিয়া মনকে প্রথমে ধারণাশক্তি প্রদান করিলেন এবং পরে পূর্ণলীলা বর্ণনা করিয়া, যেমন আহারীয় দ্রব্যসকল মধুর রসে সমাপন করে, সেইরূপ তিনি এই পরম মধুর শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিয়া ভাগবত সমাধা করিলেন।" পৃঃ ৭৪

কানাইলাল অতঃপর লিখিতেছেন,—"শ্রীধর স্বামী অধ্যায়ের প্রারম্ভে কহিলেন,—'শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংধাম।' 'কৃষ্‌' শব্দের অর্থ 'অপরিমিত' অর্থাৎ পরম, ও মূর্দ্ধন্য (ণ) শব্দের অর্থ—'আনন্দ'। 'ধাম' শব্দের অর্থ 'আশ্রয়'। এই পরম আনন্দ আশ্রয় প্রাপ্ত হইবা মাত্র সকল দুঃখ নিবৃত্ত হইয়া যায়। যেমন আলোক প্রকাশ হইলে অন্ধকার আপনি নষ্ট হইয়া যায়, সেইমত এই পরম আনন্দ আশ্রয়ে সকল অশুভ বিনষ্ট হইয়া, জীব নিত্যসুখে অবস্থান করিতে থাকে। এই কারণে সকল পুরাণের যে দশটি লক্ষণই আছে, তাহার মধ্যে প্রধান লক্ষণ এই 'আশ্রয়' এবং এই আশ্রয়েতে সমস্তই পর্যবসান হয়।" পৃঃ ৭৪

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা,—ইঁহাদের উভয়ের স্বরূপ কি তাহা গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ইঁহাদের উভয়ের পরিচয়মূলক নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"রাধিকা হয়েন [illegible] প্রণয় বিকার*।
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী, নাম যাহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা, গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্বস্ব সর্বকান্তাশিরোমণি॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
'সর্ব লক্ষী' শব্দ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্বলক্ষীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ, পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥" পৃঃ ৭৬

ইহার পর গ্রন্থকার দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এ আলোচনাতেও তাঁহার জ্ঞান ও বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে ভক্তিমান্ ও ভগবদ্‌বিশ্বাসী তাহা তাঁহার রচনা পাঠ করিলে স্বতই প্রতীতি হয়। তাঁহার ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল।

গ্রন্থের পরিশেষে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আঠারটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রদান করিয়াছেন। ২১ পৃষ্ঠার মধ্যে এই অংশ সমাপ্ত হইয়াছে।

সমাপ্ত

* "রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-

পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ "কুইন্ এলিজাবেথ"

পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ কুইন্ এলিজাবেথ শীঘ্রই জাহাজের কারখানা হইতে বাহির হইবে। ইংল্যণ্ডের রাজ্ঞী স্বহস্তে এই জাহাজকে ভাসাইবেন। মেসার্স জন ব্রাউনের জাহাজ-নির্মাণ-কারখানায় এই জাহাজ পূর্ণতার তীরে উপনীত হইতেছে। ইহা কুনার্ড হোয়াইটষ্টার লাইনের জাহাজ।

এই জাহাজ পূর্বতন বৃহত্তম জাহাজ কুইন মেরী অপেক্ষা প্রায় ৪০০০ টন বেশী ও ১২ ফিট দীর্ঘ। ইহাতে এই জাহাজকে কুইন মেরী অপেক্ষা কিছু বড় বলিয়া ধারণা জন্মে; কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিলে উভয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া থাকে।

কুইন মেরীর নির্মাণ-বৎসরের পর সামুদ্রিক এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা ও নৌনির্মাণ-বিদ্যা দ্রুত উন্নতির পথে প্রধাবিত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে চালন-শক্তির জন্য বিরাটকায় ট্রান্স্-আটলাণ্টিক জাহাজসমূহে চারিটি ধূম-নির্গম-নল থাকিত; অ্যাকুইট্যানিয়া জাহাজেও অনুরূপ চারিটি ধূম-নির্গম-নল দেখা যায়। কুইন মেরী জাহাজে এই সংখ্যা হ্রাস করিয়া তিনটি নলে আনা হয়। বর্তমান নূতন জাহাজে মাত্র দুইটি নল বিদ্যমান—ইহাতে যে বিস্তৃত স্থান পাওয়া গিয়াছে, তাহা খেলার স্থান, প্রমোদার্থ পাদচারণভূমি ও যাত্রি-নিবাসরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই জাহাজে একটি ক্লাস্ মেইন ডেক থাকিবে। এই জাহাজের আর একট উৎকর্ষ এই যে, উহার পশ্চাদ্ভাগ অধিকতর ঢালুকরা হইবে, যাহাতে দুইটি নঙ্গর ফেলিতে পারা যায়।

কুইন এলিজাবেথ ২৪০০ জন যাত্রী বহন করিতে পারিবে—ইহা কুইন মেরী অপেক্ষা ৩০০ যাত্রী বেশী; অথচ যে সুখ-সুবিধা কুইন এলিজাবেথে পাওয়া যাইবে, তাহা আজিও সমুদ্র-ভ্রমণে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

এই জাহাজের অভিনব বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রমোদ-ভ্রমণার্থ ডেকে থিয়েটার ও উদ্যান থাকিবে এবং কেবিনের সঙ্গে সান ডেকে জাফরি দেওয়া বারান্দাও থাকিবে।

টুরিষ্ট ক্লাসের যাত্রীর জন্য সাঁতার দেওয়ার জলাশয় ও ব্যায়ামশালা থাকিবে; তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রির জন্যও ব্যায়ামশালার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সব শ্রেণীর জন্য সাধারণ খেলার ডেক ত আছেই। প্রত্যেক কক্ষে ঠাণ্ডা ও গরম জল বহমান থাকিবে।

জনসাধারণের কক্ষগুলিতে চারিটি ডেক ব্যবহৃত হইয়াছে; সূর্যালোকিত বিরামাগার, শীতকালীন উদ্যান, সিনেমা, সাধারণ বৈঠকখানা ও ধূমপানের কক্ষও সাধারণ কক্ষের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৪০ সালে আধুনিকতম সাজসরঞ্জাম ও সুখসুবিধা-সমন্বিত এই জাহাজ প্রথম সমুদ্র-যাত্রা নির্বাহ করিবে। জাহাজের তলদেশে অনেকগুলি আংটা আছে। ১০০০ ফিট দূরে অবস্থিত মঞ্চে দাঁড়াইয়া রাজ্ঞী বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিয়া এই আংটাগুলিকে শ্লথ করিয়া দিবেন ও জাহাজ জলে ভাসিয়া যাইবে।

এই জাহাজ ৮৫,০০০ টনের; দৈর্ঘ্য—১,০৩০ ফিট; প্রমোদ-ভ্রমণ ডেক—৭২৫ ফিট দীর্ঘ। এই জাহাজে ডেকের সংখ্যা ১৪; কুইন মেরীর ডেক-সংখ্যা ১২। কুইন এলিজাবেথের বিস্তৃতি ১১৮ ফিট। ইহার চারিটি পরিচালক—প্রত্যেকটির ওজন ৩২ টন। ইহার পাওয়ার ষ্টেসন দ্বারা ২০০,০০০ জন লোকবিশিষ্ট নগরীর অভাব মোচন করা চলে।

ওভার-সিস ডেলি মেল

সমুদ্র-তলের আবিষ্কারে অধ্যাপক পিকার্ড

ধাতুনির্মিত গোলাকার পদার্থের সাহায্যে ভাসমান থাকিয়া ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের সুবিখ্যাত আবিষ্কারক অধ্যাপক জঁ পিকার্ড প্রশান্ত মহাসাগরের ১২০০০ ফিট নিম্নের দৃশ্য

দর্শন করিবেন, যাহা ইতিপূর্বে কোন মানব-নয়ন দেখিতে পায় নাই।

বর্তমানে তিনি এই অভিনব আবিষ্কারে যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। তিনি ব্রুসেল্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত তাঁহার পরীক্ষাগারে গবেষণা-কার্যে রত আছেন; এই স্থান হইতে তিনি ক্যানারী দ্বীপের সন্নিকটে সাগরগর্ভে অবতরণের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, আমার মতবাদ সম্বন্ধীয় পরীক্ষাসমূহ শেষ করিতে এক বৎসর লাগিবে। যে গোলকে আমি অবতরণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ নির্মাণ করিব। এই আদর্শ গোলক প্রকৃত গোলকের $\frac{১}{১০}$ অংশ হইবে। আদর্শ তৈয়ারী হইলেই উহাকে বিশিষ্ট ইস্পাত-কক্ষে লইয়া গিয়া উচ্চতম চাপের নিম্নে পরীক্ষা করা হইবে।

তিনি বলেন—মানুষ বিগত ৩০ বৎসর ধরিয়া সমুদ্র-তল আবিষ্কারে যত্নবান্ হইয়াছে। ধাতব গোলকের সাহায্যে অবতরণের কথা প্রথমে আমার মনে উদিত হয়। আমি উহাকে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার গমনের উপযোগী মনে করি ও উহাতে পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য হই।

ইতিমধ্যে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক উইলিয়্যাম বীব জাহাজ হইতে ঝুল্যমান লৌহ কেবিনে অর্ধ মাইল পর্যন্ত সমুদ্র-তলে গমন করিয়াছেন। এই গভীরতার পর সমুদ্রগর্ভের স্রোত ও জাহাজের উত্থান-পতন সুদীর্ঘ তারের উপর অত্যন্ত চাপ দেয়; ইহাতে উক্ত তার সহজে ছিন্ন হইতে পারে।

সুতরাং অধ্যাপক পিকার্ড মুক্ত ধাতব গোলক লইয়া গবেষণা করিতেছেন। উহার পশ্চাতে একটি তার বাঁধা থাকিবে যেমন ঘুড়ীর পশ্চাতে সূতা থাকে।

ভারকেন্দ্র স্থির করিবার জন্য তিনি একটি অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বৃহত্তর নলাকার লৌহ নির্মিত ব্যালাষ্ট ট্যাঙ্ক লইয়াছেন। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক যন্ত্র টিপিলেই উহা হইতে অল্প পরিমাণে লৌহের ভারকেন্দ্র স্থিরকারী ক্ষুদ্রাংশ অল্প অল্প পড়িতে থাকিবে; তবে ইলেকট্রো-ম্যাগনেট দ্বারা উহা চালান হইবে। তার বিযুক্ত করিলেই উহা পড়িয়া যাইবে।

চুম্বকের সাহায্যে অধিকাংশ যন্ত্রাবলী স্থির রাখা হইবে। যদি উহারা মগ্নশৈল দ্বারা প্রতিহত বা অন্য কোন প্রকারে ব্যাহত হয়, তবে অভ্যন্তরস্থ একটি বোতামের স্পর্শই উহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া দিবে। অধ্যাপক পিকার্ড ইহার পরীক্ষা প্রদর্শন করেন—২০ পাউণ্ড লৌহখণ্ড চুম্বক দ্বারা ধৃত ছিল; তিনি উহাকে মুক্ত করেন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের একটি বোতাম টিপিলেই গোলক স্বতঃ-কার্যকরী হইবে; তখন বিপদের বার্তা বহনকারী ক্ষুদ্র নিশান লইয়া গোলক ভাসিয়া উঠিবে।

অধ্যাপক পিকার্ড বলেন—"ইহাতে প্রকৃত কোন বিপদ্ নাই—নির্বোধের মত জীবন দেওয়ার প্রয়োজন এই কার্যে হয় না। রাস্তায় চলিতে হইলে গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়িবার যেরূপ আশঙ্কা; ইহাতে তাহার বেশী ভয়ের কারণ বিদ্যমান নাই।

আমি প্রথমে বিভিন্ন গভীরতায় ডুব দিয়া দেখিব। অতঃপর প্রাণিবিজ্ঞানবিদ্ ও সমুদ্রতলের আবিষ্কারকেরা এই গোলক ব্যবহার করিতে পারিবেন।

গোলক উৎকৃষ্ট অ্যালুমিনিয়ম বা বিশিষ্ট ইস্পাতের দ্বারা তৈয়ারী হইতে পারে।

যে লোক ছয় ফিটের অধিক দীর্ঘ, তাহার পক্ষে ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি পরিধির গোলক উপযোগী। তবে উহা দুইজনের পক্ষে একটু চাপাচাপি হইতে পারে। আমার মতে ৬ ফিট ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ গোলক বিশেষ উপযোগী।"

ষ্টেট্স্ম্যান

আকাশপথে ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতে চিঠি-বিলি

১৯১১ সালে এরোপ্লেন ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে গমন করিয়া ১১॥০ সের ওজনের চিঠি ২০ মাইল দূরে বিলি করা হয়। ১৯৩৮ সালে গত ২২এ ফেব্রুয়ারী হইতে ইংল্যাণ্ড হইতে ৩২০০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট চারি এঞ্জিনের এরোপ্লেনে ভারতাভিমুখে চিঠি আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

২৮ মণ চিঠি ছিল। ঐ এরোপ্লেনে যে চিঠি আসিয়াছে তাহা জাহাজে বহন করিতে যত মূল্যের সাধারণতঃ ডাক টিকিট লাগিত উহাতেও তাহাই লাগিয়াছে। উহা ঘণ্টায় ১৫০ মাইল বেগে চলিয়া করাচী ও কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছে। ভারত হইতে ইতিপূর্বে ইংল্যণ্ডে এরোপ্লেন যোগে চিঠি পাঠাইতে হইলে দশ পয়সা ব্যতীত আরও অধিক মূল্যের ডাক টিকিট লাগিত ও নীল বর্ণের একটি মুদ্রিত লেবেল লাগাইয়া দিতে হইত। তাহাতে বিমান-ডাকে যাইবে লিখা থাকিত। ২৭এ ফেব্রুয়ারী ভারত হইতে ইংল্যণ্ডে যে সকল পত্র এরোপ্লেনে প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে মাত্র দশ পয়সার ডাক টিকিট লাগিয়াছে। উহা ৪½ দিনে ইংল্যণ্ডে পৌছিবে। ইতিপূর্বে জাহাজে চিঠি পাঠাইতে ১৬ দিন লাগিত। এখন হইতে প্রতি সপ্তাহে চারিবার এরোপ্লেনে ইয়োরোপে ডাক যাইবে।

১৮৫৩ সালে মাসে দুইবার করিয়া ভারত হইতে ইংলণ্ডে চিঠি যাইত। এই চিঠি বহন করিতে ৮৭ দিন লাগিত। তাহার পূর্বে ২৮৪ দিন লাগিতেছিল। সেই স্থানে এক্ষণে সপ্তাহে চারিবার ডাক যায় ও পৌছিতে ৪½ দিন লাগিতেছে। কলিকাতা হইতে বাংলার নিভৃত পল্লীতে চিঠি পৌছাইতে অনেক ক্ষেত্রে ৩।৪ দিন লাগিয়া থাকে কিন্তু ইংল্যণ্ডে যাইবে ৪½ দিনে। ওলন্দাজ এরোপ্লেন ভারত হইতে ২½ দিনে ইয়োরোপ যাইতেছে।

সঞ্জীবনী

মানুষের শরীরের মূল্য কত ?

মাত্র ৫৲ টাকা

একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরের মূল্য কত তাহা জনৈক বিজ্ঞানবিদ্ প্রকাশ করিয়াছেন। মানুষের শরীর যে সমস্ত ধাতুতে গঠিত তাহা কোনটা কতখানি আছে এবং সেই পরিমাণ ধাতুর দাম কতখানি তাহাই হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহার দাম পাঁচ টাকারও বেশী হয় না। অথচ এই মানুষের শরীর লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও কেহ তৈয়ারী করিতে পারে না।

(১) মানব দেহে যে স্নেহ জাতীয় পদার্থ (চর্বি) আছে তাহা দ্বারা ৭ খানা কাপড়কাচা সাবান প্রস্তুত হইতে পারে।

(২) মানুষের শরীরে যে পরিমাণ লৌহ আছে তাহা দ্বারা একটা বড় সাইজের তার-কাঁটা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

(৩) দুধের সঙ্গে আমরা যতখানি চিনি খাই ততখানি চিনি আমাদের শরীরে আছে।

(৪) আমাদের দেহে যে চুণ আছে তাহা দ্বারা আমাদের ছোট রান্নাঘরের দেওয়াল চুণকাম করা যাইতে পারে।

(৫) ৫৫টি দিয়াশলাইয়ের বাক্স তৈয়ার করিতে যে পরিমাণ ফস্‌ফরাস দরকার হয় একটি মানুষের দেহে তাহা পাওয়া যায়।

(৬) ইহা ছাড়া ৩০।৩৫ সের জল আমাদের শরীরে আছে। এই সমস্ত বাজে জিনিষ দিয়া কি সুন্দর মানুষের দেহ তৈরী হইয়াছে!

হিন্দুরঞ্জিকা

কাপ্তেন জেমস কুক

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্‌ এ, বি এল্‌

একটি স্মরণীয় ঘটনা

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে জেনারেল উল্‌ফের অধীনে বৃটিশ সৈন্যগণ কুয়েবেকস্থ ফরাসীদিগকে অবরুদ্ধ করে। সেই অবরোধ-কালে চ্যাপটা তলাবিশিষ্ট একখানা নৌকা সেণ্ট লরেন্স নদী বাহিয়া যেই তীরে ফরাসী সৈন্যগণ অবস্থিত, সেই তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই ক্ষুদ্র নৌকায় যে কয়জন সাহসী লোক বিদ্যমান ছিল, তাহাদের পুরোভাগে বিপজ্জনক কষ্টসাধ্য কর্তব্য পড়িয়াছিল—কষ্টসাধ্য যেহেতু নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রখর এবং স্থান অন্ধকারময়; বিপজ্জনক যেহেতু উহা ফরাসী কামানের নলের মুখে অবস্থিত স্থানে সম্পন্ন করিতে হইবে।

কয়েক ঘণ্টা এই ক্ষুদ্র নৌকার পরিচালক ক্ষণভঙ্গুর নৌকাকে নদী বাহিয়া লইয়া যাইতে থাকেন এবং তীরের উপকূল পর্যন্ত বহু স্থানে নদীর গভীরতা পরিমাপ করেন। অতঃপর স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনান্তে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন ফরাসী কর্তৃপক্ষ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া নিহত করিবার জন্য দেশীয় লোক দ্বারা পরিপূর্ণ কয়েকখানা ডোঙ্গা প্রেরণ করেন। ক্ষুদ্র বৃটিশ-নৌকার পরিচালক যখন দেখিলেন যে, শত্রুপক্ষ তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে, তখন তিনি দ্রুতবেগে নৌকা চালাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই, অচিরে শত্রুপক্ষ তাঁহার নাগাল ধরিতে উদ্যত হইল; এই বুঝি তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গিগণের জীবন বিপন্ন হয়! শত্রুপক্ষের চোখে ধূলি নিক্ষেপ ব্যতিরেকে তাঁহার এত শ্রমলব্ধ সংবাদ মাঠে মারা পড়িবে, সুতরাং তিনি আরও দ্রুত দ্বীপের দিকে চলিলেন। কিন্তু যখন তিনি উপকূল হইতে মাত্র কয়েক গজ ব্যবধানে, তখন ডোঙ্গাগুলি তাঁহার নৌকার সন্নিকটে উপনীত হইল। অমনি তীর হইতে করিল। এই সুযোগে পরিচালক তাঁহার নৌকাকে তীরে লাগাইলেন—তাঁহার এক মিনিটও সময় নষ্ট করার উপায় ছিল না, যেহেতু, তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা যেই মুহূর্তে তীরে লাফাইয়া পড়িলেন ঠিক সেই মুহূর্তে শত্রুপক্ষ নৌকার পশ্চাদ্ভাগে আরোহণ করিল। সামান্য যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষ বিতাড়িত হইল এবং পরিচালক মূল্যবান্ সংবাদ-সমন্বিত সেণ্ট লরেন্স নদীর মানচিত্র অধ্যক্ষের হাতে অর্পণ করিল; পরে দেখা গিয়াছিল এই বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সত্য।

অসমসাহসী এই তরুণ পরিচালকের নাম জেমস কুক। সার চার্লস সৌন্দর্সের অধীনস্থ বৃটিশ রণপোতমালা দুর্ভেদ্য ফরাসী দুর্গ আক্রমণে অভিলাষী হইয়া তরুণ পরিচালক জেমস কুককে সেণ্ট লরেন্স নদীর গভীরতা পরিমাপের ভার অর্পণ করেন। কুক ইতিপূর্বেই স্বীয় নৌপরিচালনা কৌশল ও সাহসী ব্যবহারের দ্বারা সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। সেইজন্য উপরিলিখিত নদীর গভীরতা পরিমাপের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।

জন্ম ও বাল্যজীবন

জেমস কুক ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত মার্টন নামক গ্রামে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর তারিখে সামান্য মজুর-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধাত্রীর ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হন; তথা হইতে দোকানে কাজ করিতে থাকেন, কিন্তু যৌবন প্রাপ্তির পূর্বে জেমস কুকের প্রকৃতিদত্ত প্রতিভার বিকাশ পরিলক্ষিত হয় নাই। সাধারণত তিনি সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন বালক বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন।

অদম্য উচ্চাভিলাষ

ভাবী গৌরবের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে আদর করে নাই; কিন্তু তাঁহার একটি বিশেষত্ব ছিল; উহা দ্বারা তাঁহাকে সহস্র সহস্র বালকের মধ্য হইতে বাছিয়া বাহির করা কঠিন হইত না, এই গুণ উচ্চাভিলাষ। সুতরাং ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে যখন তিনি নিজকে বস্ত্র-বিক্রেতার সহকারিরূপে দেখিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। যেহেতু মৎস্যজীবি-প্রধান ক্ষুদ্র গ্রামে কোন দুঃসাহসিক কার্যের স্থান ছিল না। ফলে তিনি স্বীয় বর্তমান জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দিল।

তাঁহার পিতা কৃষিক্ষেত্রের বেলিফ ছিলেন। একদিন তিনি কর্মক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় দোকানের মালিকের লোক তাঁহাকে দোকানে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার পিতা আসিয়া দেখিলেন কুক একখানা নূতন অর্ধগিনি চুরি করিয়াছে। পরে তিনি স্বীয় দোষশূন্যতা সপ্রমাণ করিলেও, লোকের মুখে মুখে তাঁহার কুৎসা প্রচারিত হইয়া পড়ে। ফলে তিনি নাবিক-জীবনের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন।

কয়লাবাহী জাহাজে শিক্ষানবিশ কুক

অচিরে ভাগ্য-দেবী প্রসন্ন হাসি হাসিলেন। মিঃ জন্ ওয়াকার হুইটবির কয়লাবাহী জাহাজ কোম্পানীর অংশীদার ছিলেন। কুক অচিরে এই কোম্পানীর শিক্ষা-নবিশীতে ভর্তি হন। জন ওয়াকার কুককে প্রথম দর্শনেই পুত্রের মত স্নেহ করিতে থাকেন। তিনি শিক্ষানবিশীর কালের কষ্ট ও কঠোরতায় কুকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, প্রতিনিয়ত কুককে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন এবং সর্বোপরি কুকের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের ভার ন্যস্ত করিতে থাকেন। কুক এই মহৎহৃদয় পরোপকারী পৃষ্ঠ-পোষকের কথা জীবনে কখনো বিস্মৃত হন নাই—তিনি যে ওয়াকারের নিকট কত ঋণী তাহা সর্বদা স্মরণ ধ্বনিত হইতে লাগিল, তখনও মিঃ জন ওয়াকার কুকের সর্বপ্রধান বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন।

নৌসৈন্যদলে কুক

পরবর্তী কালে তিনি নৌচালন-বিদ্যায় যে প্রভূত কৌশলের পরিচয় দান করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ এই সময় অধিগত হইয়াছিল। এই সময় তিনি যে ব্যাবহারিক জ্ঞানলাভ করেন, তাহা বাস্তবিকই অমূল্য। ফলে যখন আমেরিকায় ফরাসীদিগের সহিত বৃটিশের বিবাদ বাধিয়া উঠিল, তখন কুক নৌসৈন্যদলে যোগদান করেন। ইহাতে তিনি নিজকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার অন্তরে উচ্চাভিলাষের আগুন দিবানিশি তুষানলের মত জ্বলিতে থাকিত। এই সময় হইতে তাঁহার প্রতিভা বিকাশের বিস্তৃতক্ষেত্র লাভ করিল; ফলে চারি বৎসর পরে তিনি এতদূর যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন যে, জেমস্ কুককে পেমব্রোক জাহাজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হইল। কোন কোন লেখক বলেন যে তিনি প্রথমে মার্কারি নামক জাহাজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই জাহাজে তিনি সেণ্ট লরেন্স নদীতে বহুবিধ কার্য করেন। অতঃপর তিনি নর্দাম্বার-ল্যাণ্ড জাহাজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ফরাসীদিগের নিকট হইতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড অধিকারে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

এই সময় কুক তাঁহার ভবিষ্য জীবন সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইলেন। সুতরাং তিনি নিজকে উক্ত কার্যের জন্য পূর্ণরূপে উপযোগী করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি মনে মনে নিশ্চিত ছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেই হইবে। সুতরাং অবসরের একটি মুহূর্তকেও তিনি বৃথা অতিবাহিত হইয়া যাইতে দিলেন না—অঙ্কশাস্ত্র ও গণিত-জ্যোতিষে তিনি নিজকে ব্যুৎপন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোন শিক্ষক ছিল না—সুতরাং তিনি নিজেই নিজের শিক্ষক হইলেন। অবশেষে যে সমস্ত বিদ্যা তাঁহার উপকারে লাগিবে বলিয়া তিনি

তাঁহার অধ্যবসায় ও সর্বতোমুখী প্রতিভার ইহাই আদর্শ-স্বরূপ।

দুর্ঘটনা

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সামুদ্রিক সার্ভেয়ার নিযুক্ত হইলেন। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে এই জরীপ-কার্য নিষ্পন্ন করিবার সময় তিনি একটি দুর্ঘটনায় প্রায় জীবন হারাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি বৃহৎ বারুদপূর্ণ পিপা ছিল; ইহা অপ্রত্যাশিতভাবে প্রজ্বলিত হইয়া ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার হাতও দীর্ণ করিয়া ফেলে। সৌভাগ্যবশত অবিলম্বে ডাক্তারের সহায়তা লাভ করা গেল এবং তাঁহার জীবন রক্ষিত হইল; কিন্তু আহত হস্ত চিরতরে অকর্মণ্য হইয়া রহিল।

অভিযানের অধ্যক্ষ-পদে কুক

সার্ভেয়াররূপে তিনি বিশিষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং লাব্রাডার ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলভাগের জরীপ করেন। কিছুকাল পরে তিনি কুয়েবেকের নিম্নস্থ নদীর বিস্তৃতভাবে জরীপ করিবার জন্য কমিশন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মানচিত্র এতদূর ঠিক হইয়াছিল যে, নৌবিভাগ উহা প্রকাশের আদেশ দান করেন। ইহা কুকের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক যেহেতু তিনি কোনরূপ শিক্ষালাভ করেন নাই; এতদ্ভিন্ন নক্সাকারীর কার্যেও তাঁহার কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে, মানচিত্র-অঙ্কন-দক্ষতাই তাঁহাকে বিশ্বখ্যাতির দ্বারে উপনীত করে। এই মানচিত্র-অঙ্কন-দক্ষতা দেখিয়া রয়্যাল সোসাইটি তাহাকে বৈজ্ঞানিক অভিযানের অধ্যক্ষ মনোনীত করেন।

শুক্রগ্রহের গতি-দর্শনার্থ অভিযান

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন শুক্রগ্রহ সূর্যকে অতিক্রম করিয়া গমন করিবে। এই ঘটনা খুব বিরল। সুতরাং ইহার সন্দর্শনার্থ রয়্যাল সোসাইটি বৈজ্ঞানিক অভিযান প্রেরণের সঙ্কল্প করেন। রয়্যাল সোসাইটি স্থির করিলেন অভিযান প্রেরিত হইবে, যেহেতু ঐ স্থান হইতে পর্যবেক্ষণের সর্বপ্রকার সুবিধা পরিলক্ষিত হইবে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও নোভাস্কোশিয়ায় সর্বজনপ্রশংসিত বিস্তৃত জরীপ কার্যের জন্য এই অভিযানের অধ্যক্ষের পদ কুককে প্রদান করা হয়। সুতরাং যে অভিলাষ দিবানিশি তাঁহার হৃদয়ে তুষানলের মত ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, তাহা অবশেষে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধির মন্দির-দ্বারে উপনীত হইল।

কুক ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত হন। তিনি ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখে Endeavour নামক জাহাজে প্লিমাথ পরিত্যাগ করেন। তিনি যে জাহাজে যাত্রা করেন, তাহা নিজে নির্বাচিত করিয়াছিলেন এবং উহা ৩৭০ টনের জাহাজ ছিল। তাঁহার জাহাজে ৮৫ জন নাবিক ছিল এবং দেড় বৎসরের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য ছিল। সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিদ্ জোসেফ ব্যাঙ্কস্ এই অভিযানে কুকের সঙ্গী ছিলেন।

তৎকালে পথের বিঘ্ন সম্বন্ধে বহু তথ্য জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও কুক হরণ্ অন্তরীপ সহজেই অতিক্রম করিলেন। অনতিবিলম্বে তিনি কয়েকটি মানব-নিবাস-সমন্বিত দ্বীপ দেখিতে পাইলেন; তিনি ঐগুলি আবিষ্কারের জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন; কিন্তু ব্যক্তিগত ইচ্ছা এখানে ফলপ্রসূ হইল না। উহা মনে চাপিয়া রাখিয়া কুক অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে প্রধাবিত হইলেন।

অবশেষে ১৬ই এপ্রিল তাহিতি দ্বীপ দেখা গেল। অথচ এই দ্বীপে উপনীত হইবার জন্য অধ্যক্ষের সহযোগীরা দীর্ঘ দিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরদিন দেশীয় লোকেরা ডোঙ্গা বাহিয়া জাহাজে উপনীত হইল, হাতে ছিল তাহাদের শান্তির চিহ্ন বৃক্ষশাখা। কুকও ঐ বৃক্ষ-শাখা শান্তির চিহ্নরূপে মাস্তুলের উপর স্থাপিত করিতে আদেশ দিলেন। দেশীয় লোকেরা তাহাদের বন্ধুভাব প্রকাশার্থ প্রচুর পরিমাণ শাকসব্জী ও ফলমূল লইয়া জাহাজে আসিত এবং কুকও বিনিময়ে তাহাদিগকে রেশমী রুমাল ও অনুরূপ সামান্য উপহার প্রদান করিয়া তুষ্ট

ভোজসভায় পকেট-চুরি

দ্বীপে অবতরণ করিবার পর দলপতিরা কুক ও তাঁহার সঙ্গিগণকে সাদরে অভিনন্দিত করিলেন এবং আবার উপহারের বিনিময় চলিল। সন্ধ্যায় আগন্তুকদল একটি ভোজে নিমন্ত্রিত হন ; তাঁহারা ভোজ-সভার আনন্দে মজগুল ছিলেন ; কিন্তু পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদের পকেটস্থ টাকা-পয়সা ও মূল্যবান্ দ্রব্যসমূহ অপহৃত হইয়াছে ! কিছুকাল পরে দলপতিগণের সহায়তায় অপহৃত দ্রব্যাদির পুনরুদ্ধার করা হয়।

অচিরে কুক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, চতুর দেশীয় লোকগুলি চুরিবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার বিশিষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, অপেরা গ্লাস, ক্ষুদ্র কুঠার ও বন্দুক প্রভৃতি নিত্য অপহৃত হইতে লাগিল। দলপতিরা ক্ষমা প্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণে খুব উদার ছিল ; কিন্তু কুক তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, দ্রব্যগুলির প্রত্যর্পণই একমাত্র ক্ষতিপূরণ। এই দ্বীপের লোক সম্বন্ধে কুক লিখিয়াছেন যে, তাহারা চুরি-বিদ্যায় বাল্যাবধি ওস্তাদ।

অভিযানের সফলতা-লাভ

যতই ৩রা জুন নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই কুক একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনার দিন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় পরিলক্ষিত হইল না—সুন্দর পরিষ্কার দিন পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিল। কুক দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে পর্য্যবেক্ষক-দল সংস্থাপিত করিলেন, যাহাতে অভিযানের উদ্দেশ্য—শুক্রগ্রহের যাত্রা-পথ পরিদর্শনে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। শুক্রগ্রহের গতিপথ বেশ সুন্দরভাবে দেখা গেল ; এবং কুক তাঁহার অভিযানের কার্য পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে সম্পন্ন করিলেন।

কুক তিন মাস এই দ্বীপে অবস্থিতি করিয়া দেশীয় লোকগুলির আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। অবশেষে ১৩ই জুলাই তিনি তাহিতি দ্বীপ পরিত্যাগ করেন। তিনি "তুপিয়া" নামক একটি দেশীয় লোককে সঙ্গে লইয়া যান।

ক্রমশঃ

জাতীয় সংবাদ

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মণ্ডলের তৈলচিত্র উন্মোচন

গত ৪ঠা আষাঢ় রবিবার আমাদের স্বজাতীয় কর্মী শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মল্লিক মহাশয় চুঁচুড়া "বীণাপাণি বিদ্যা নিকেতন" ভবনে স্বজাতিবৎসল, বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর ভূতপূর্ব সভাপতি স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের একখানি চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ আঢ্য মহাশয় বিদ্যালয়ের সহিত রমেশবাবুর আন্তরিক সহানুভূতির কথা উল্লেখ করিবার পর, প্রসাদদাসবাবু চিত্রখানির আবরণ উন্মোচন করেন। তৎপরে প্রসাদবাবু, বলাইবাবু, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ, ছাত্রছাত্রীবৃন্দের পক্ষ হইতে দুইজন, রমেশবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রবাবু এবং অন্যান্য কয়েকজন চিত্রে মাল্যদান করিলে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-নাথ মণ্ডল, দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় ও বলাইচাঁদ দত্ত রমেশবাবুর গুণকীর্তন করিয়া বক্তৃতা করেন। চিত্রখানি বিদ্যালয়ে উপহার দিয়াছেন রমেশবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার মণ্ডল।

উপাধি লাভ

চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বরতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ পাল মহামান্য সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে "রায় সাহেব" উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি বাংলা সরকারের অফিসে হোম ডিপার্টমেণ্টের হেড ক্লার্ক ছিলেন। সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এই উপাধি লাভে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

কলিকাতা কর্পোরেশনে সুবর্ণবণিক্ এসোসিয়েট মেম্বর
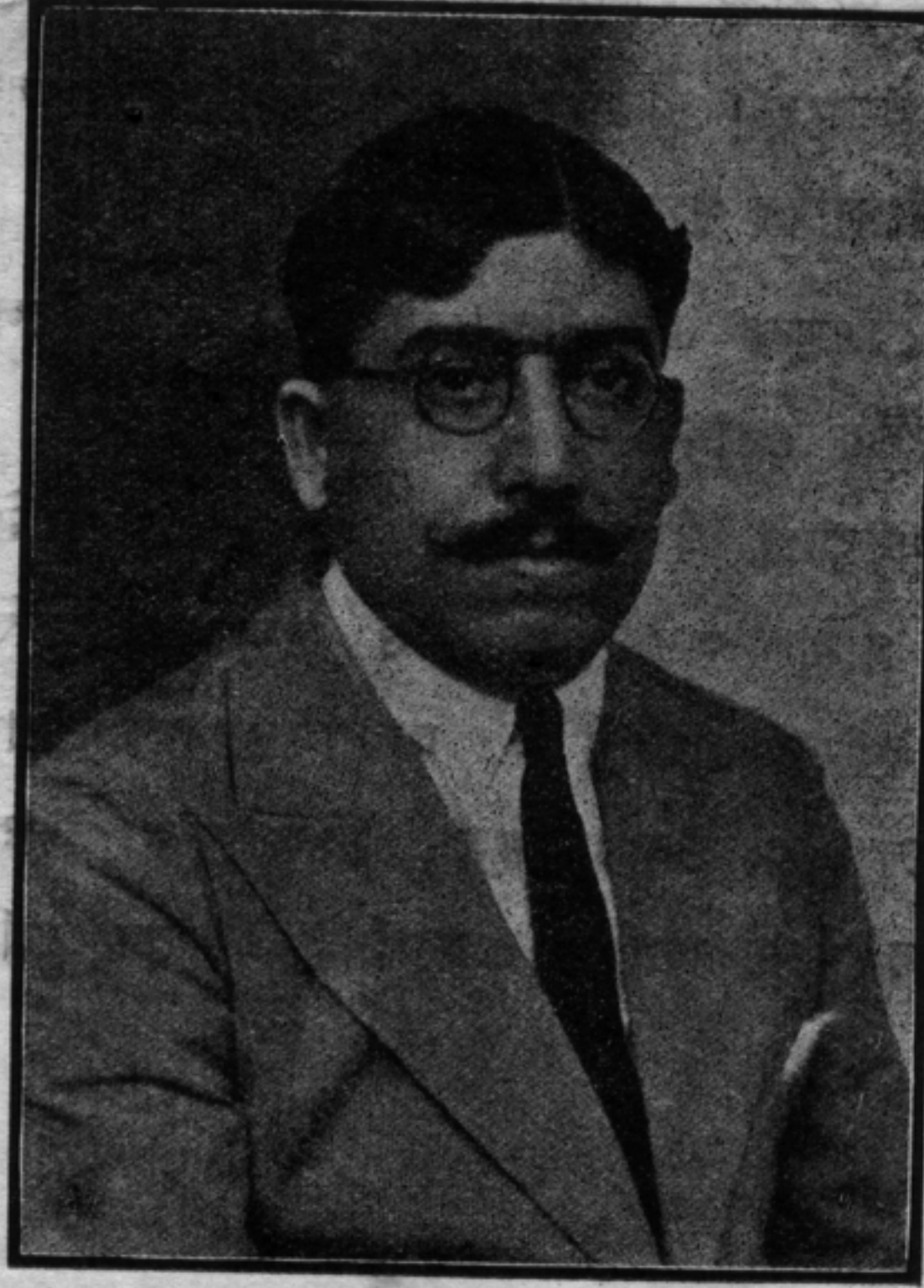
পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী স্বর্গীয় যদুলাল মল্লিক মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মল্লিক এ বৎসরও কলিকাতা কর্পোরেশনের ২নং ডিষ্ট্রিক্টের এসোসিয়েট মেম্বর নির্বাচিত হইয়াছেন।

তাঁহার এই নব নির্বাচনে আমরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক সমাচার

২২শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৪৫ সাল | ৯ম সংখ্যা

খোল দুয়ার খোল

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি এল, বাণীকণ্ঠ

ভোরের পাখী উঠ্‌ল ডাকি
রাত্রি প্রভাত হ'ল
খোল দুয়ার খোল।
দেখ না ঐ পূর্ব্বগগন-
প্রান্তে অরুণ-আলো—
খোল দুয়ার খোল।
বনে বনে ফুট্‌ল ফুলদল ;
গগনে ঐ জাগলো কোলাহল ;
দখিন পবন পুলকচঞ্চল—
খোল দুয়ার খোল।

আধিব্যাধি দুঃখভারে
চিত্ত যাদের ম্লান,
খোল দুয়ার খোল ;
সংসারের এই জটিলতায়
ক্লিষ্ট যাদের প্রাণ,
খোল দুয়ার খোল।
শোনরে ঐ আশার গানে ভর্‌ল আকাশ ;
জাগরণী মন্ত্র লয়ে চলে বাতাস ;
তুই কি কেবল ঘুমিয়ে র'বি,স্বপ্ন-উদাস—
খোল দুয়ার খোল।

হিন্দুর উদ্ভিদ-পূজা

শ্রীসতীশচন্দ্র আঢ্য

হিন্দু চিরকালই প্রকৃতির উপাসক। প্রকৃতির যাহা কিছু বিরাট্, যাহা কিছু সুন্দর হিন্দু চিরদিনই তাহার ভক্ত, চিরদিনই তাহাকে পূজা করিয়া আসিতেছে। তাঁহারা প্রকৃতির সর্বত্রই দেবতার অস্তিত্ব দেখিতে পান। তাঁহারা মনে করেন, জগতের সকল বস্তুতেই অদৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ, দেবতা বাস করেন। প্রত্যেক বস্তুরই এক অশরীরী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। এই যে গাছ-পালা গজায়, ফুল ফোটে, ফল হয়—এ সবই দেবতার খেলা, তাই আমরা চারিপাশে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই আমাদের দেবতার অভাব নাই—নদ-নদী-পর্বত-শিলা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষ, গুল্ম, লতা-পাতা বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপচারে পূজা আমাদের মধ্যে প্রচলিত।

প্রকৃতি যখন তাহার নব সৌন্দর্যসম্ভার লইয়া আমাদের উপহার দিত তখনই আমাদের মনে জাগিত উৎসবের কথা, কিন্তু কি লইয়া উৎসব করিবে? প্রাচীনকালে লোকেরা প্রতিমা নির্মাণ করিতে জানিত না। কুম্ভকার-শিল্পিগণ তখন তত উন্নত হয় নাই—তাই গাছপালা, লতা-পাতা, ফুল-ফল হইত তখনকার পূজার দেবতা। সকল দেশেই এইরূপ গাছপালা লতা-পাতা লইয়া উৎসব-প্রথা বর্তমান আছে। অ্যান্থ্রপলজির পুস্তক পড়িলে দেখা যায় পৃথিবীর নানা স্থানে শীতের প্রারম্ভে গাছ-পালা লইয়া উৎসব হইয়া থাকে। শরতের প্রারম্ভে যখন কাদা শুকাইয়া যাইত, পথ-ঘাট সুগম হইত, খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য আসিত তখনই আমাদের পূর্ব-পুরুষগণের মনে উদয় হইয়াছিল আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব—শারদীয়া পূজার কথা। কঠোর গ্রীষ্মের পর আকাশে যখন নবনীরদপুঞ্জ তাহাঁদের কমনীয়কান্তি লইয়া আমাদের মনে শান্তির বারতা বহন করিয়া আনে তখনই আমাদের বর্ষামঙ্গল উৎসব। কিছুকাল একঘেয়ে জীবন যাপনের পর মানুষ পরিবর্তনের জন্য আকাঙ্ক্ষা তখন তাহার প্রবল। ইহার উপর যখন মন্দ ঋতু হইতে ভাল ঋতু আসিত তখন উৎসবের মাত্রা খুবই বাড়িয়া যাইত। এই জন্য হিন্দুদের যাহা কিছু প্রধান উৎসব তাহা অনুষ্ঠিত হইত প্রকৃতিপ্রদত্ত উপভোগ্য ঋতুতে।

এদেশে চিরদিনই বৃক্ষলতাদির প্রাচুর্য। প্রকৃতি দেবী সামান্য তরুগুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহান্ মহীরুহ পর্যন্ত দিয়া এ দেশকে নয়নাভিরাম, মনোরম করিয়া সাজাইতে কোনদিনই কার্পণ্য করেন নাই। শ্যাম-সবুজের এমন অবাধ নয়নতৃপ্তিকর প্রচুরতা প্রকৃতই অন্য দেশে বিরল। এইরূপ সহজাত প্রাচুর্যের ফলে প্রকৃতির দুলাল এ দেশের অধিবাসিগণ চিরদিনই গাছপালার অনুরক্ত—বৃক্ষবল্লরীর উপাসক। বৃক্ষলতাকে বাদ দিয়া তাহার কোনও পর্ব বা ক্রিয়াকলাপই হইতে পারে না। উৎসব বা পূজার সময় গৃহদ্বারে যেমন চাই তাহার কদলীবৃক্ষ ও আম্রশাখা তেমনই পঞ্চপল্লব, দূর্বা ও তুলসী না হইলে তাহার পূজার উপচার অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। অন্নপ্রাশন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাদ্ধ পর্যন্ত চাই তাহার কদলী।

মানব-শিশুর জন্ম হইবার পূর্ব হইতে যেমন নানারূপ সংস্কার বা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে বৃক্ষ উদ্গম বা জন্মের পূর্ব হইতেও অনুরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেখা যায়।

বিধবাদিগের 'অম্বুবাচী' একটি পর্ব, এই সময় বসুমতী ঋতুমতী হন বলিয়া কথিত আছে। অম্বুবাচীর সময় তিন দিন হলকর্ষণ, মৃত্তিকা খনন ও বীজবপন নিষেধ। কৃষি কার্য আরম্ভ হইবার ইহাই প্রাথমিক অধ্যায়। পরে বৃক্ষাদি রোপণের পর শরৎকালে শারদ লক্ষ্মী যখন তাঁহার সবুজবরণ গালিচা পাতিয়া ধরণীতে অবতীর্ণা হন—মাঠের পর মাঠ এক বিস্তৃত নীলাম্বুরাশির ন্যায় সঞ্চরিতা পূর্ণগর্ভা ধান্যবৃক্ষসমূহে শোভা পাইতে থাকে তখন আশ্বিন সংক্রান্তিতে কৃষকেরা এ দেশে যে উৎসব করে তাহার

বাঁধিয়া অতি প্রত্যুষে নানারূপ ছড়া আবৃত্তি করিয়া প্রতি ধান্যক্ষেত্রে ঐ নল গাছ রোপণ করা হয়। এই উৎসবে মুসলমান কৃষকেরাও বাদ পড়ে না। ইহা হইল ধরণীর 'সাধভক্ষণ' উৎসব। অবশেষে অগ্রহায়ণ মাসে আমাদের চিরকাম্য ও চিরাচরিত "নবান্ন" উৎসবের কথা বাঙালীর সুবিদিত।

অঙ্কুর উদ্গম বা বৃক্ষ জন্মের পূর্বে এই সকল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহার পর বৃক্ষ বড় হইলে নিদাঘের আতপতাপে যাহাতে সে শুষ্ক বা রসহীন হইতে না পারে তাহার জন্য বৈশাখ মাসে আমরা 'বসুধারার' ব্যবস্থা করিয়া থাকি। বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা করা বা বৃক্ষের বিবাহ দেওয়া যে কত বড় পুণ্য কার্য তাহা আমাদের গৃহের নিষ্ঠাবতী পুণ্যশীলা রমণীগণ খুব ভালরূপেই জানেন।

প্রতীচ্যের জড়বাদ আমাদিগকে এখন সংশয়াপন্ন করিলেও আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে প্রত্যেক পদার্থে ভগবানের সত্ত্বা অনুভব করিতেন বা প্রত্যেক জড়ে চৈতন্য আরোপ করিতেন ইহা হইতেই তাহা নিঃসন্দেহভাবে প্রতিপন্ন হয়। ঈশ্বরের পরম অনুকম্পা যে আমাদেরই প্রাচ্যের আর্য বংশধর স্বনামধন্য সার জগদীশচন্দ্র আজ প্রতীচ্যের এই ভ্রম অপনোদনে সক্ষম হইয়াছেন।

বর্ষারম্ভে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে 'আরণ্যষষ্ঠীতে' ও বর্ষার অন্তে রবিশস্যবপনোপযোগী সময়ে 'মন্থনষষ্ঠী' পূজার ব্যবস্থা আছে।

পূজার পূর্বদিন 'পাঁচকলাই' ভিজানো হয় ও তাহা লইয়া দেবতার নিকট নিবেদন করা—এই পূজাগুলির একটি বিশেষ অঙ্গ।

তাহার পর 'জিতাষ্টমী' পূজার কথা, ইহাতে কলাই ভিজাইয়া অঙ্কুর উদ্গম হইলে তাহা লইয়া পূজা দিতে হয়। এ পূজা যদিও সূর্যদেবের পূজা কিন্তু একটি কদলী চারার সহিত মানকচু, ধানগাছ, কচুগাছ, যুগ্মবেল প্রভৃতি বন্ধন করিয়া একটি গোষ্ঠের মধ্যে স্থাপন করা হয় ও পূজা হয়। হলুদ গাছ, আদা গাছ, আখ গাছ, নটে শাক প্রভৃতি ওষধিসমূহ এই পূজার প্রধান অঙ্গ।

রবিশস্য জন্মাইবার সময় বা চাষের সময় আমাদের দেশে যে পূজাগুলি অনুষ্ঠিত হয় তাহাদের অনেকেরই ঐরূপ ফল-পাতা ও বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। সারা অগ্রহায়ণ মাসব্যাপী আমাদের গৃহে গৃহে যে ইতু বা মিত্রঠাকুর বিরাজ করেন তাহাও এইরূপ কতকগুলি উদ্ভিদের পূজা। প্রতি রবিবার এই দেবতার পূজার সময় আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা মুগ, বিরি, সরিষা প্রভৃতি রবিশস্যসমূহ দুটি দুটি করিয়া ঠাকুরের ভাণ্ডে বপন করিয়া দেন ও তাহাতে যথা সময়ে অঙ্কুর উদ্গম হয়।

'ঝুলনযাত্রা', 'রাস' প্রভৃতি উৎসবসমূহ যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলা উৎসব বলিয়া কথিত হইলেও আমার মনে হয় ইহা তৎকালীন ব্রজবাসিগণের বৃক্ষানুরাগের নিদর্শন মাত্র। বর্ষা ও শীতঋতুর অবসান সময়ে, কিছু-দিন গৃহমধ্যে কষ্টযাপনের পর প্রকৃতিদেবী যখন তাঁহার নয়নমনোমুগ্ধকর রমণীয় শোভাসম্পদ্ লইয়া ধরণীতে আবির্ভূতা হইতেন—আকাশে পূর্ণিমার নিষ্কলঙ্ক শশধর দশদিক্ ভাসাইয়া দিত—বিহঙ্গমকুল তাহাদের সুমধুর গানে গগন-পবন আকুল করিয়া তুলিত তখন কাহারও গৃহে অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। "তখন ঘর হইত বাহির, বাহির হইত ঘর।" ব্রজবাসিগণ ছুটিতেন লোকালয়ের বাহিরে নির্জন অরণ্যানীর আকুল আহ্বানে, কদম্ব কেতকীর দিগন্তপ্লাবিত সৌরভ ও বনজ অরণ্যানীর মিশ্র সুমিষ্ট গন্ধ যেখানে অরণ্যে স্বর্গসৃষ্টি করিয়াছে। পৌরাণিকগণ এই উন্মাদনাকে আমাদের মনে চিরস্থায়ী করিবার জন্য ইহাতে দেবতার লীলা আরোপ করিয়াছেন।

হিন্দুর প্রধান উৎসব দুর্গাপূজাও এইবার একটি গাছ-পালার পূজা। দুর্গোৎসবের প্রধান কার্য নবপত্রিকা পূজা। মাটির ঠাকুর গড়িয়া তিন দিন পূজা করিয়া পরে বিসর্জন দেওয়া কেবল বাংলাতেই আছে আর কোন দেশে নাই। কিন্তু নবপত্রপালনী ও নবপত্রিকা পূজা ভারতের অনেক দেশে হইয়া থাকে। আর বাংলার এই প্রতিমা গড়িয়া পূজাও বরাবরের নহে। ডাকিনী-শাখিনীর পূজা খৃষ্টীয় আট শতকের পূর্বে ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহাযান ও মন্ত্রযানের পর বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযানেই

ডাক-ডাকিনী শাখ-শাখিনী প্রভৃতি উপদেবতার পূজার বিষয় উল্লেখ পাওয়া যায়।

রামমুকুটের স্মৃতির পুস্তকে জগদ্ধাত্রী পূজার কথা আছে কিন্তু দুর্গোৎসবের কথা নাই। তিনি ১৪৭১ খৃঃ এই পুস্তকগুলি লেখেন। দুর্গোৎসব সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুস্তক মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির লেখা। তিনি তাঁহার পুস্তকে দুর্গোৎসব সম্বন্ধে জিকন ও ধনঞ্জয়ের মত তুলিয়াছেন ও মধ্বাচার্যের মত উদ্ধার করিয়াছেন। কাজেই মহামহোপাধ্যায় শূলপাণিকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ফেলা যায় না। রঘুনন্দন ১৬ শতকের লোক। তিনি ১৬ শতকের প্রথম ভাগে তাঁহার 'তত্ত্ব' রচনা করেন। তাঁহার 'তিথিতত্ত্বের' মধ্যে নবপত্রিকার পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময় হইতেই মনে হয় বাংলায় দুর্গা-পূজার প্রচলন হইয়াছে। রঘুনন্দন বলিয়া গিয়াছেন প্রতি বৎসরই দুর্গাপূজা করিতে হইবে।

দুর্গোৎসবের প্রধান কার্য নবপত্রিকা পূজা। বাংলার বাহিরে কল্পারম্ভ হয় প্রতিপদে ও নয় দিন পূজা-অর্চনা হয়। এই জন্য উহাকে নবপত্র বলে। উহাতেও নবপত্রিকার পূজা করিতে হয়। ইহাতে নয়টি পাতা একত্র করিয়া অপরাজিতা লতায় বাঁধিয়া অধিবাস ও পূজা হয়। আপাত-দৃষ্টিতে দুর্গোৎসবের মূর্তিগুলিকে ভিন্ন দেখা গেলেও বা পদ্ধতিকারেরা গণেশ-কার্তিক প্রভৃতিকে ভিন্ন দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাঁহারা দেবী হইতে ভিন্ন নহেন। কারণ দুর্গা-মাহাত্ম্যেও আছে বিসর্জনের সময় সমস্ত আবরণ-দেবতাকে দুর্গা-শরীরে লয় করিয়া বিসর্জন দিতে হয়।

নবপত্রিকায় থাকে নয়টি পত্রিকা। কলাগাছ, কচুগাছ, হলুদ গাছ, জয়ন্তি ডাল, বেল ডাল, দাড়িম গাছ, অশোক ডাল, মানকচু গাছ ও ধান গাছ। অধিবাসের পর কলা গাছ হন ব্রহ্মাণী, কচু হন কালিকা, হলুদ হন দুর্গা, জয়ন্তী হন কার্তিকী, বেল হন শিবা, দাড়িম হন রক্তদন্তিকা, অশোক হন শোকরহিতা, মানকচু হন চামুণ্ডা আর ধান হন লক্ষ্মী।

দুর্গা-প্রতিমার বিসর্জন হইয়া গেলে নবপত্রিকার স্বতন্ত্রভাবে বিসর্জন করিতে হয়, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিনদিনই এই পত্রিকার পৃথকভাবে ষোড়শোচারে পূজা করিতে হয়। তবে সন্ধিপূজার সময় চামুণ্ডা ব্যতীত অন্য কোনও দেবতার অধিকার না থাকায় সন্ধিপূজায় মানকচুর দেবতা চামুণ্ডার একটি বিশেষ পূজা হয়।

এই নবপত্রিকাকে আমাদের দেশে 'কলা বৌ' বলে ও গণেশের পাশে রাখা হয় বলিয়া বলা হয় গণেশের 'কলা বৌ'। কিন্তু ইনি গণেশের কলা বৌ নন। আমাদের দুর্গাপূজা এই নবপত্রিকারই পূজা। এই প্রসঙ্গে এদেশে প্রচলিত মনসা পূজায় মনসা গাছ পূজা, পুত্রের মঙ্গল কামনায় জিয়ান ষষ্ঠী গাছ পূজা ও ভুঞাদের করম গাছ পূজার উল্লেখ করা যায়।

এইভাবে প্রাচীনকালের লোকেরা প্রথম প্রথম গাছ-পালা লইয়া উৎসব করিয়াই মনে তৃপ্তি পাইত। তখনও তাহাদের মনে পূজা বা দেবতার কথা ঢুকে নাই। তাহারা মনে করিত এইভাবে ইহাদের সন্তুষ্ট করিলে আমাদের সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে, আমরা আনন্দে থাকিব। কিন্তু ক্রমেই যত বুদ্ধি পরিণত হইতে লাগিল তাহারা লক্ষ্য করিল মানবের মত গাছেরও ক্ষয় বৃদ্ধি আছে, তাহাতেও নব কিশলয় উদ্গত হয়, ফুল ফোটে, ফল হয়। তখন তাহাদের মনে হইল গাছপালা দেবতা নহে। কোনও অশরীরী, অদৃশ্য অপ্রত্যক্ষ দেবতা গাছের মধ্যে বাস করেন। প্রাচীন গ্রন্থে এইজন্য 'বৃক্ষাভিমানিনী দেবতা,' 'পর্বতাভিমানিনী দেবতা'র উল্লেখ দেখা যায়। অর্থাৎ দেবতা আপনাকে গাছপালা বলিয়া মনে করেন ইহাই 'অভিমানিনী' দেবতার অর্থ। ক্রমে যতই বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল, জগতে কার্য-কারণ ভাবের উদ্বোধ হইতে লাগিল তখন ইহাও অসঙ্গত বোধ হইল।

সেই সময় পুরোহিত ঠাকুরেরা বলিলেন উহা ত গাছ-পালার পূজা নয়, উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা। তখন আমাদের মধ্যে সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, নব নব শিল্পের উন্মেষ দেখা দিয়াছে, হল প্রস্তুত হইয়া কর্ষণ চলিতেছে, কুম্ভকার মূর্তি গড়িতে শিখিয়াছে। কাজেই দেবতাগণের মূর্তি কল্পনা করিয়া মূর্তি গড়া হইতে লাগিল। দেবদেবী মাহাত্ম্য নামক পুস্তকসকলের রচনা হইল। কোন

দেবতার কয় হাত, কয় মস্তক, কয় চক্ষু হইবে নিরূপিত হইল ও ধ্যান-মন্ত্রসকলের সৃষ্টি হইল। এইভাবে গাছ-পালার পূজা ক্রমে ক্রমে অদ্বৈতে পরিণত হইল ও বিভিন্ন বিভিন্ন দেবতা বিভিন্ন বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন উপচারে ভক্তের গৃহে অধিষ্ঠিত হইয়া ষোড়শপচারে পূজা পাইতে লাগিলেন।

পরিশেষে বিষ্ণুরূপধারী অশ্বত্থ বৃক্ষকে ও জগদ্ধাত্রী তুলসী দেবীকে প্রণাম করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

"ওঁ অশ্বত্থবৃক্ষরূপোঽসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ।
বিষ্ণুরূপধরোঽসি ত্বং পুণ্যবৃক্ষ নমোঽস্তুতে॥
ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িন্যৈ সত্যবত্যৈ নমোনমঃ॥""

স্তোত্র

রায় সাহেব শ্রীঅমলচন্দ্র পাল

পরম কারণ　　পতিত পাবন
　　প্রাণিগণে তুমি প্রাণ।১
পরমেশ প্রভো　　প্রকৃতীশ বিভো
　　জয় জয় ভগবান্॥২
সত্য সনাতন　　নিত্য নিরঞ্জন
　　তুমি অখিলের পতি।৩
শিব শুভঙ্কর　　পাপতাপহর
　　তুমি অগতির গতি॥৪
সৃজন পালন　　প্রলয় কারণ
　　তুমি ব্যাপ্ত চরাচর।৫
অনন্ত মহিম　　অসীম সসীম
　　তুমি নিত্য নাট্যধর॥৬
সগুণ নির্গুণ　　বিকারবিহীন
　　স্বরাট্ বিরাট্ তুমি।৭
অব্যক্ত অচিন্ত্য　　অনাদি অনন্ত
　　কেমনে বুঝিব আমি॥৮
প্রকৃতি পুরুষ　　মায়া মায়াধীশ
　　একাধারে তুমি নাথ।৯
মরি কি সুন্দর　　রূপ মনোহর
　　বিশ্বরূপে বিশ্বনাথ॥১০
সত্বরজস্তমঃ　　ত্রিগুণ মিলন—
　　তোমাতে সমতা পায়।১১
গুণের স্ফুরণ　　করিয়া পূরণ
　　অশরীরী ধর কায়॥১২
ধর্ম স্থাপিবারে　　কর্ম শিখাবারে
　　যুগে যুগে দেহ ধর।১৩
উচ্চ নীচ যোনি　　যখন যেমনে
　　দেখো প্রভো অবসর॥১৪
মীন কুর্ম বরাহ　　বামন নৃসিংহ
　　কত রূপ অপরূপ।১৫
কখন বা রাম　　নয়নাভিরাম
　　ধর রূপ বিশ্বরূপ॥১৬
কভু রুদ্রমূর্তি　　হয় তব স্ফূর্তি
　　তীব্র কালানল সম।১৭
ধরিয়া কুঠার　　কর বার বার
　　ক্ষত্রহীন ধরাধাম॥১৮
কভু ক্রীড়াচ্ছলে　　মাতাও রাখালে
　　বনে বনে গোচারণ।১৯
কভু রণাঙ্গনে　　শিষ্য সন্নিধানে
　　ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ॥২০

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

কখন আবার করুণা অপার
প্রকাশিতে জীবকুলে ।২১
দিব্য মাতৃরূপ ধরি অপরূপ
এস মা অবনীতলে ॥২২
অসংখ্য চন্দ্রমা সুশীত সুষমা
কোটি সূর্য সমুজ্জ্বল ।২৩
সে রূপ তুলনা কোথাও মিলে না
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল ॥২৪
হিমাদ্রি-শিখরে ব্রহ্মাবিষ্ণুহরে
সুচির সাধন ফলে ।২৫
বোধিল যে শক্তি তারি অভিব্যক্তি
তুমি মা ধরণীতলে ॥২৬
ধরণীর ভার করিতে সংহার
বার বার অবতর ।২৭
দুষ্টেরে দলিতে শিষ্টেরে পালিতে
কত কত রূপ ধর ॥২৮
হয়ে মহাকালী অতীব করালী
সৃষ্টি-বাধা কর নাশ ।২৯
মহালক্ষ্মী রূপে নাশি দৈত্যপাপে
দূর কর সুরত্রাস ॥৩০
প্রচণ্ডা চামুণ্ডা তুমি উগ্রচণ্ডা
চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ।৩১
তুমিই মা সতী মহাসরস্বতী
শুম্ভাদিদৈত্যমর্দিনী ॥৩২
আবার কদাপি শতবর্ষ ব্যাপি
অনাবৃষ্টি মর্ত্যলোকে ।৩৩
ক্ষুধায় আকুল হ'লে জীবকুল
বাঁচাও দেহজ শোকে ॥৩৪
কি দয়া আ মরি ওগো শাকম্ভরি
এমন করুণা কার ।৩৫
নিজ দেহ দিয়ে শস্য উপজিয়ে
কে রাখিবে এ সংসার ॥৩৬
তোমার মহিমা কে করিবে সীমা
বিধি হরি-হর হারে ।৩৭
বুদ্ধির অতীত অনন্ত প্রসূত
কে তাহা বুঝিতে পারে ॥৩৮
যে দিকে যখন ফিরাই নয়ন
তোমারি মহত্ত্ব দেখি ।৩৯
স্তম্ভিত হৃদয়ে নিরখি সময়ে
অবাক্ হইয়া থাকি ।৪০
অথবা যখন হয়ে স্থির মন
নির্জনে বসিয়া ভাবি ।৪১
বিরাট্ ব্যাপার এ বিশ্ব-সংসার
গ্রহ তারা শশী রবি ॥৪২
ঐ নীলাম্বরে ফুটে স্তরে স্তরে
রয়েছে অসংখ্য তারা ।৪৩
যাদের প্রমাণ গঠিত বিজ্ঞান,
নির্ণয় করিতে সারা ॥৪৪
যে মহা আকাশে এরা সবে ভাসে,
আশ্রয় তাহার কোথা ? ৪৫
মীমাংসার শাস্ত্র, তুমি সেই সূত্র,
মণিমালা যাতে গাঁথা ॥৪৬
এই রূপ বিশ্ব দৃশ্য ও অদৃশ্য
আরো আছে কোটি কোটি ।৪৭
নিজ শক্তি দিয়া সবারে সৃজিয়া
ধরে আছ পরিপাটী ॥৪৮
এ বিরাট্ ভাবে ভাবি তোমা যবে
স্বভাবে থাকিতে নারি ।৪৯
সর্বেন্দ্রিয় স্তব্ধ হৃদয় নিরুদ্ধ
জ্ঞান বুদ্ধি যায় হারি ॥৫০
আবার যখনি ভাবি গো জননী
স্নেহমাখা রূপ তব ।৫১
ভুলে যাই সব এ সব বিভব
জাগে ভাব অভিনব ॥৫২
কি সৌম্য মূরতি দয়া মূর্তিমতী
প্রসারিয়া বাহুদ্বয় ।৫৩
যেন লবে তুলে সন্তানে স্বকোলে
এমন মনেতে হয় ॥৫৪

স্নেহের পীড়নে ক্ষরিছে সঘনে
ঔরস পীযূষধারা ।৫৫
কে আছ রে জীব হবে যদি শিব
এস এস করি ত্বরা ॥৫৬
আস্বাদে এ সুধা যাবে ভব ক্ষুধা
হবে তুমি মৃত্যুঞ্জয় ।৫৭
যাহার জননী ত্রিলোকতারিণী
আবার কি তার ভয় ॥৫৮
জয় ভগবতী জয় ভগবতী
জয় ভগবতী জয় ।৫৯
জয় জয় সতী জয় জয় চিতি
জয় জয় আনন্দময় ॥৬০

রথযাত্রা-উৎসব

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ, বেদশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "যাত্রা-যাপনমুৎসবঃ"। যাত্রা শব্দের একটি অর্থ উৎসব। যাত্রাকে চলিত কথায় যাৎ অথবা মেলা বলা হয়; নদীয়া জেলায় বীরনগরের নাম উলা, সেখানে প্রতি বর্ষে এক বিরাট্ মেলা হয়, তাহার নাম "উলার যাৎ"। এইরূপ আমরা অনেক স্থানেই "মেলা" কথাও শুনিতে পাই যেমন "অগ্রদ্বীপের বারুণী মেলা," ইত্যাদি। অতএব রথযাত্রা শব্দের মুখ্য অর্থ রথোৎসব। অদ্যকার প্রসঙ্গের এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ রথ বলিয়া ইহরি নাম রথযাত্রা। অতএব যাত্রা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—লোক সকল যে স্থানে উৎসবার্থে মিলিত হইয়া থাকে। ইহা হইতেই "যাৎ" কিংবা "মেলা" বলা হয়। আমরা লৌকিক প্রসঙ্গেও রথযাত্রার এই মূল কথার অর্থটি পাই—"আষাঢ় মাসে রথযাত্রা লোকের হুড়া হুড়ি" এই কথাটি আসিয়াছে। এই অনাদি কাল প্রচলিত হুড়াহুড়ি শব্দের অর্থ ভীড় বলা হইয়া থাকে। হুড় শব্দটি সঙ্ঘার্থক সংস্কৃত হুড় ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, সুতরাং যাত্রা শব্দের "মেলা" অর্থটি প্রাচীন শব্দ-বিজ্ঞানসম্মত। শরতের দুর্গোৎসব, বর্ষারম্ভে রথোৎসব বা রথযাত্রা এবং পূর্ণ বসন্তে দোলোৎসব অথবা দোল-যাত্রা,—এই তিনটি হিন্দুর প্রধান উৎসব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফল কথা—উৎসব শব্দে সমারোহময় আনন্দ-জনক ব্যাপার বুঝায়।

স্কন্দ পুরাণে দেখিতে পাই—আমরা বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি দোলযাত্রা পর্যন্ত বারটি যাত্রা বা উৎসবের বিধান ও তন্মূলে ঐ সকল আনন্দময় ব্যাপার ভারতের স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত দেখিতে বা শুনিতে পাই। জীব মাত্রেই বিশেষতঃ সুসভ্য ভারতীয় আর্যজাতি বিশেষ করিয়াই এই আনন্দের চির উপাসক, অতএব উৎসবপ্রিয়। ইহাদের ছোট বড় প্রত্যেকটি কার্যের মূলে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে আনন্দের স্পৃহা যোগায়। ফলতঃ, কর্ম-প্রেরণার মূল,—প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির অন্যতম নিদান ইষ্টসাধনতার জ্ঞান, অর্থাৎ এইটি আমার প্রয়োজনীয়, এইরূপ বুদ্ধি; এখন আনন্দতেই পরমানন্দ বুঝিয়া থাকি,—আনন্দই আমাদের মুখ্য প্রয়োজন। ইহার একমাত্র কারণ যাহার উদ্দেশ্যে কর্মপ্রচেষ্টা হয়, তাহারই নাম প্রয়োজন। আমরা ভাল বা মন্দ যাহা কিছু কর্ম করি, উহাদের মুখ্য লক্ষ্য সুখ বা আনন্দ। জগদ্ধিতৈষী পূজ্যপাদ মহাভারতকার স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"সুখের ইচ্ছায় জীব করে সর্ব কর্ম।
কিন্তু নাহি মিলে সুখ না করিলে ধর্ম॥"

অতএব, উৎসবের মূল উদ্দেশ্যই হইল একমাত্র আনন্দ বা সুখ, তাহাই আমাদের ধর্ম। কারণ, ধর্মই সুখের মূল প্রস্রবণ। এ জাতির ধর্ম ভিন্ন আদরের বস্তু আর কিছুই নাই। তাই ধর্মকেই সার পদার্থ মনে করিয়া এ জাতি চিরকালই ধর্মের পথে চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুর হিন্দুত্ব, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, ধর্মই হিন্দুর ইহকাল পরকালের পরম সহায় এবং যে ধর্মকে বর্ণাশ্রম ধর্ম বলা যায়, সেই ধর্মের অভ্যুদয়ে হিন্দু জাতি এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের আসনে অধিরূঢ় ছিলেন। আমাদের পূর্বতন পুরুষগণ এককালে এতাদৃশ উন্নত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সভ্য জগতের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা যে তৎকালে সমগ্র জগতের মধ্যে সকল জাতির শ্রেষ্ঠত্ব লাভে এত বরণীয়, এত পূজনীয় হইয়াছিলেন—ধর্মে গভীর ঐকান্তিকতাই তাহার এক মাত্র কারণ। তখন হিন্দু সমাজের ধর্মনীতি সনাতন ও সমগ্র জগতের আদর্শ স্থানীয় ছিল। বস্তুতঃ একমাত্র ধর্মই মানব সমাজকে দেবভাব—বিশিষ্ট, উন্নত ও শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখে। তাই আজও এই বাঙালী হিন্দুরা এক উৎসাহশীল জাতি বলিয়া পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিতেছে। হিন্দুর জীবনে এই সর্বাপেক্ষা মহত্তর তত্ত্বটি এত সহজ ও সরলভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, হিন্দু জাতির বার মাসে তের পর্বে বা উৎসবে উহার বহিরঙ্গ আমোদ-প্রমোদের সহিত অন্তরঙ্গ দান-ধ্যানগুলি অজ্ঞাতসারে ও নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই ধর্ম বর্তমান দুর্দিনেও আধুনিক হিন্দুগণও সকাম উৎসবের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে নিরাড়ম্বরে নিষ্কাম ধর্মের পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হ'ন। সকাম ভাবে আরব্ধ হিন্দুর তামসিক ও রাজসিক দানও বহু স্থলে এইভাবে সাত্ত্বিকতায় পরিণত হয়। সেই জন্য আলোচ্য রথযাত্রার মুখ্য ফল শ্রুতিতে আমরা মোক্ষলাভের কথাই জ্ঞাত আছি, —তাই সর্বাগ্রেই উল্লেখ করিয়াছি—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" জন্মজন্মান্তরের পুণ্যপুঞ্জের প্রভাবে ধর্মক্ষেত্র ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বধর্মের যথাযথ আচরণে পুনর্জন্ম নিবৃত্তি বা কৈবল্য প্রাপ্তি হিন্দুর জন্মসুলভ পরম ও চরম আদর্শ। সংযম ও পুত্রপ্রবৃত্তি মূলক ভোগের দুর্গম পথ দিয়াই ধর্মের আবরণে সুরক্ষিত সুগম মোক্ষ মার্গে উপস্থিত হওয়া হিন্দুর বৈদিক উত্তরাধিকার। অতএব আলোচ্যমান রথযাত্রার ফল কীর্তন প্রসঙ্গে ধর্মের ফল অর্থ কাম লভ্য ভোগ হইতে পরিণামে মুক্তির বার্তাও শুনিতে পাই। তন্নিমিত্ত স্কন্দ পুরাণে উক্ত আছে, যে,—বৈশাখ মাসের চন্দন যাত্রা উৎসব হইতে ফাল্গুনের দোলযাত্রার অনুষ্ঠানে ইহাদের প্রত্যেকটি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ পুরুষার্থ দান করিয়া থাকে।

এই বাক্যে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া তলাইয়া বুঝিবার বিষয় হইতেছে যে, হিন্দুর জীবন ইতর প্রাণীর জীবনের মত কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই চরিতার্থ নহে। উহাতে বাল্য যৌবনাদি কালে যেমন ধর্মসাধ্য অর্থ কামের ভোগ অনিষিদ্ধ, বানপ্রস্থ বার্দ্ধক্যেও ঠিক তেমনই মোক্ষের সাধনা সুব্যবস্থিত। বলা বাহুল্য, সংসারের বিচিত্র ভোগ্য বস্তুনিচয় যেমন ভগবানের সৃষ্টি, উহাদের ভোক্তা জীবও তেমনই ভগবানের সৃষ্ট সামগ্রী। অনন্তরত্নশালিনী বসুন্ধরায় অনন্ত গুণে গুণী অনন্ত জীবের যদি সত্তা না থাকিত, তাহা হইলে শ্রীভগবানের সর্বজ্ঞতা ও সৃষ্টি-শক্তির মহিমার কিছুই মূল্য থাকিত না। জগতে ভোগ এবং মোক্ষ দুই-ই ভগবানের অপূর্ব দান। সেই জন্য উহা ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত থাকায় মানব-জীবনে যৌবনের মত ভোগের সৌন্দর্য এবং মাধুর্যও অল্প নহে। তবে যৌবনের স্থায়িত্ব ও শোভা যেমন সংযমে, ভোগের পূর্ণতা ও সাফল্য তেমনই ত্যাগমূলক মোক্ষে। এইভাবে দেখিলে ও বুঝিলে আমরা হিন্দুর উৎসবের দুইটি মনোহর রূপ দেখিতে পাই। একটি বাহ্য এবং অস্থায়ী আমোদ-প্রমোদ, আর অপরটি এই বাহ্য আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া আভ্যন্তরীণ ও স্থায়ী আনন্দের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। দিব্য-দৃষ্টি শাস্ত্রকার রথে বামন দেব দর্শনে মুক্তিলাভ হয় বলিয়াছেন। বামন শ্রীভগবান্ নারায়ণের পঞ্চম অবতার —কশ্যপ মুনির কনিষ্ঠ পুত্র রূপে—"উপেন্দ্র" নামে দেবরাজ ইন্দ্রের অনুজ হইয়া অবতীর্ণ হওয়া বা আবির্ভাব—বলিয়া জানি। বামনের অপর একটি নাম ত্রিবিক্রম। মুখ্যতঃ শ্রীভগবানের যেমন অনন্ত নাম, তেমনই

তাঁহার অনন্ত কোটি উক্ত জীব। যিনি যে নামে, যে রূপে এবং যে ক্ষেত্রে রথে শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তিনিই মুক্তি লাভের অধিকারী হন। তাই শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ দেব রথযাত্রায় গুপ্ত বৃন্দাবন—শান্তিপুরে শ্রীরঘুনাথ, গুপ্তিপাড়ায় শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র, কুচবিহারে শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি সকলই বামন দেবের নামান্তর ও রূপান্তর। ইহার প্রধান কারণ ত্রিবিক্রম বামনের একপাদ বিভূতিতেই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত। তাই বলিরাজা বলিয়াছেন—"পরিত্রাহি মধুসূদন।"

যুগ প্রয়োজনে কলিতে নীলাচল-ক্ষেত্রে পুরীধামে রথারূঢ় দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাৎকার লাভ জীবের নিঃশ্রেয়সাধক। এই বিষয়ে বঙ্গের বৈষ্ণবচূড়ামণি সাধকাবতার শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের সুমধুর উপদেশে তাহা স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে দেখা যায়:—

"দারু জল রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকুতি॥
দারু-ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হল জল-ব্রহ্ম সম॥"

—চৈ, চ। মধ্য ১৫ প

এই শ্রীক্ষেত্রের রথযাত্রার অন্তর্নিগূঢ় তথ্য বহিরঙ্গ রূপে যে কোনও পুণ্যক্ষেত্রে আষাঢ়ের শুক্লাদ্বিতীয়ায় ব্রহ্ম-প্রতীক্ বামনদেবের দর্শনলাভ করিয়া অন্তরঙ্গরূপে নিজ নিজ অন্তরে অন্তর্যামী শ্রীভগবানের উপলব্ধি যে ভাগ্যবান্ মনীষী করিতে পারিবেন, প্রকৃতই তিনি ভবপারাবারের কাণ্ডারীকে পাইয়া অনায়াসেই এই দুস্তর ভবসিন্ধু পারে চলিয়া যাইবার প্রকৃত পথ নির্দেশ করিতে পারিবেন। কেন না সকল ধর্মের সারধর্ম আত্মদর্শন। রথযাত্রায় এই আত্মদর্শনের স্বরূপটি ধর্মরাজ আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ঋষি বালক নচিকেতাকে সরলভাবে সহজে ও স্বল্প কথায় ইঙ্গিত করিয়াছেন। সংক্ষেপে উহার উল্লেখ করিলেই সকলেই বুঝিবেন যে, হৃষীকেশকে হৃদয়ের স্থানে দর্শনেই বামনদেবের দর্শন লাভ।

"হে ব্রহ্মন্! দেহরথে কর্মফলভোক্তা জীবাত্মা রথী। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ দেহরথকে সর্বদা আকর্ষণ করে। অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি উহার সারথি; কারণ বুদ্ধিই এই রথের প্রধান পরিচালিকা, সংশয়াত্মক মন ইহার প্রগ্রহ অর্থাৎ রজ্জু। অশ্ব যেমন রথ আকর্ষণ করে, ইন্দ্রিয়গণ তেমনই দেহ আকর্ষণ করে। ঘোটক যেরূপ পথে বিচরণ করে, ইন্দ্রিয়বর্গ সেইরূপই সতত বিষয়-পথে ধাবমান হয়। যাঁহারা বিবেকী তাঁহারা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন সংযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা অর্থাৎ কর্মফল সুখদুঃখভোগী সংসারী বলিয়া জানেন। বুদ্ধিনামা সারথি যদি অনিপুণ অর্থাৎ বুদ্ধি যদি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিষয়ে অবিবেকী হয় এবং প্রগ্রহ স্থানীয় মন-রজ্জু যদি সর্বদা অগৃহীত থাকে, কিম্বা অসমাহিত হয়, তবে সেই অকুশলবুদ্ধি সারথির ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বনিচয় দুষ্ট ঘোটকের ন্যায় সারথির অবাধ্য হইয়া থাকে। যে বুদ্ধি-সারথি নিপুণ, কি না বিবেকী এবং প্রগ্রহরূপ মন যাঁহার গৃহীত অর্থাৎ সমাহিত, সেই সুদক্ষ বুদ্ধি-সারথির ইন্দ্রিয়াশ্বগণ সাধু অশ্বের ন্যায় সারথির বশীভূত থাকে। ইহার অধ্যাত্ম তাৎপর্য সাধকের নিকট যেরূপ বিকাশ হয়, সাধারণের সাধনা ব্যতীত সেরূপ হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। কিন্তু যে বিদ্বান্ ব্যক্তি তপস্যা ও বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি-সারথিযুক্ত এবং মন যাঁহার রজ্জুস্থানীয় অর্থাৎ সমাহিত, সেই সাধক ব্যক্তিই সংসার-গতির পরপারে গমন করিয়া সর্বব্যাপক পরমাত্মা বাসুদেবের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" ফলতঃ দেহরথের বাহক উদ্দাম ইন্দ্রিয়-অশ্বগণকে সমাহিত মন-রজ্জুর দ্বারা তপোবিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি-সারথির সাহায্যে বন্ধুর বিষয়-পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মায় সাক্ষাৎকারই রথযাত্রা দর্শনের মুখ্য লক্ষ্য। এই মনোজ্ঞ তথ্যটি জ্ঞানীভক্ত রায় রামানন্দ অতি অল্প ও স্পষ্ট কথায় শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"রায় কহে চরণ-রথ হৃদয়-সারথি।
যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব-রথী॥"

চৈ, চ। মধ্য। ১১ প

বর্তমান রথযাত্রা-উৎসবে স্ব স্ব হৃদয়-রথে শ্রীশ্রীবামনদেবকে দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ক্রীতদাসত্ব

হইতে মুক্তিলাভ করাই প্রত্যেক রথযাত্রা-যাত্রীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অন্যথায় আক্ষেপের উন্মত্ত প্রলাপ ও আপশোষের তপ্তশ্বাসে যেন এই সুদুর্লভ মানবজনম কত শত জন্ম জন্মান্তরের ন্যায় এবারও একান্ত বৃথা ও নিষ্ফলে ব্যয়িত না হয়। এখনও বহু বহু তপোরত একনিষ্ঠ সদাচারী লোক—যাঁহারা অনাচার ও ব্যভিচারকে দূর করিতে কৃতসংকল্প হন বলিয়া এখনও মাতৃত্বের অভাব হয় না; সমাজে নারী যেখানে শান্তি ও সুখ লাভ করে, সেখানে শ্রী, লক্ষ্মী, প্রীতি সর্বদাই সুরক্ষিত হয়। অতএব শ্রীভগবানের আবির্ভাবে যে গৃহ সমুজ্জ্বল হয়, ইহাও কি আবার বুঝাইতে হয়? এই জন্য শ্রীশ্রীমাতাজী মহারাণী তপস্বিনী মহাকালী নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়াই এই সূক্ষ্মতত্ত্বটি বর্তমানের নরনারীর মধ্যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই হিন্দুরা ভাবের ঘরে চুরি করেন না। হিন্দুর সাম্যবাদ অনেক উচ্চে। তাঁহারা বলেন যে, মানুষের যখন আত্মজ্ঞান জন্মে যখন তিনি দ্বৈতভাবাতীত হইয়া পড়েন, তখনই কেবল তিনি সর্বপ্রাণীতে সমবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তখন পণ্ডিত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানিগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে আর গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে এবং চণ্ডালে সমদর্শী হন। সকল সাম্যবাদে যাঁহাদের অধিকার জন্মিয়াছে, উহা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত মন যাঁহাদের প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহারাই যথার্থ সাম্যবাদী। তাঁহাদের সে সাম্যবাদে মানুষে এবং পশুতে ভেদ নাই। তাই আমাদের শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥"

কিন্তু যতদিন তাঁহারা সাধনা-বলে সে সংস্কার লাভ না করিতেছেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা অবিদ্যার প্রভাবে ব্যবহারিক সংস্কারানুরূপ ভেদবুদ্ধি লইয়া কার্য করিবেন। অন্তরে প্রকৃত সমত্ব-বুদ্ধি না জন্মিলে সর্বত্র সমত্ব-বুদ্ধির ভান করা হিন্দুমতে নিষিদ্ধ। উহা উপকার না করিয়া বরং অপকারই করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুরা কোন জীবকে পীড়া দেন না, কারণ সকল জীব-দেহে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। ভারতীয় পাপীতাপী নরনারীর যদি ক্ষণকালের জন্য একবার মায়াতীত ভগবৎ-কৃপা লাভ ঘটে, তবে সেই আত্মদর্শনের ফলে পূর্বাবস্থার পরিবর্তন হইয়া সেখানে স্বর্গের সুষমা ফুটিয়া উঠিতে দেখে; কিন্তু মায়ায় আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মায়া স্বভাবতঃ ভ্রান্ত পথে লইয়া যায়। আত্মতত্ত্ব ভাল করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে ভ্রান্ত ধারণার ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের হাত এড়ান বড় কঠিন।

এই ঘোর কলিযুগে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সমগ্র দেশের সকলেরই চেষ্টা করা আবশ্যক। বাহ্যিক রথযাত্রা দর্শনে বাহ্য আমোদে ভুলিয়া থাকা কর্তব্য নহে। জ্ঞানী লোকের উচিত যে, অবশিষ্ট অজ্ঞানীকে বাঁচাইতে হইবে। বর্তমানে আমাদের হিন্দু সমাজে সে চেষ্টার বিশেষ অভাব, আমরা তাহা অতীব দুঃখের সহিত স্বীকার করি। তথাপি আমরা আর্যজাতি, আমাদের পূর্বপুরুষগণের পদাঙ্কানুসরণ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

একমাত্র ব্রহ্মই সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ বস্তু। অসংখ্য বস্তুপূর্ণ বিচিত্র জগদাদি প্রত্যক্ষ হইলেও এই একমাত্র ব্রহ্ম বস্তুই সত্য, অন্য বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞান মিথ্যা—ইহাই অদ্বৈত-বাদ। যাহা বলে—যাহা নিত্য সত্য নহে অর্থাৎ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে যাহা সমভাবেই বিরাজ করিবে না, যাহার আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তনশীল, যাহার আবির্ভাব ঘটে, সেই নিত্য পরিবর্তনশীল অনির্বচনীয় পদার্থই মায়া নামে অভিহিত। কিন্তু ব্রহ্ম চিরকালই অপরিবর্তনশীল, এই জন্য ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু। শ্রুতি বা বেদ নিখিল দার্শনিক মতের ও অন্য সমস্ত জ্ঞানেরই মূল প্রস্রবণ। কিন্তু সাধারণের বোধগম্যের জন্য ভগবৎ কৃপায় শাস্ত্রের স্বতন্ত্র ভাবে প্রবর্তনের পরে মহাভারত ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত অষ্টাদশাধ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকেও বেদান্তে স্মৃতিপ্রস্থাপকরূপে সাধারণতঃ গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং গীতায় যে রথযাত্রার বর্ণনা আছে উহাই প্রকৃত রথযাত্রা।

তুলসী-সপ্তশতিকা

শ্রীরামচরণ দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৩৭)

তেপি তি হৈ যচহি বিনয় করি করি বার হজার।
তুলসী গাড়র কিটরণ জানে জগত বিচার ॥

তাহা দেখি কত   সহস্র আসিয়া
বিনয় করিয়া প্রার্থনা করে ;
কহিছে তুলসী   গাড়র প্রবাহ
দেখিবারে সদা পাই সংসারে।

(৩৮)

শশিকর স্রগ রচনা কিয়ে কত শোভা সরসাত।
স্বর্গ সুমন অবতংস খল চাহত অচরজ বাত ॥

শশিকর-সূত্রে   মালিকা গাঁথিয়া
তার শোভা কত বর্ণিত করে ;
আকাশ-কুসুম   ভূষণ পরিয়া
শোভা পেতে খল বাসনা করে।

(৩৯)

তুলসী বোল ন বুঝই দেখত দেখন জোয়।
তিন্‌হ শঠ কো উপদেশ কা করব সুচতুর কোয় ॥

বলিছে তুলসী   বলিলে না বুঝে
দেখিয়াও দেখিতে না পায় ;
এইরূপ শঠ   দুর্মতি মানবে
কোন্ সুচতুর শিখাতে চায় ?

(৪০)

যোন শুনৈ তেহি কা কহিয় কহা শুনাইয় তাহি।
তুলসী তেহি উপদেশিয় তাসু সরিস মতি যাহি ॥

যে জন না শুনে   তারে কি শুনাবে
বল তুমি পার যত প্রকার ;
হেন জনে যেবা   উপদেশ দেয়
[illegible]

(৪১)

কহত সকল ঘট রামময় তো খোজত কেহি কাজ।
তুলসী কহ অহ কুমতি শুনি উর আয়ত অতি লাজ ॥

কহে সর্ব ঘটে   রাম বিরাজিত
তবে তাহারে খুঁজে কি কাজ ;
কহিছে তুলসী   এ কুমতি শুনি
হৃদয়ে উপজে বিষম লাজ।

(৪২)

অলখ কহহি দেখন চহহি এই সে পরমপ্রবীণ।
তুলসী জগ উপদেশহি বনি বুধ অবুধ মলিন ॥

ঈশ্বর অদৃশ্য   এই কথা বলে
এম্‌নি প্রবীণ দেখিতে চায় ;
বলিছে তুলসী   অবুধ মলিন
পণ্ডিত সাজিয়া লোকে শিখায়।

(৪৩)

হুহরত হারত রহিত বিদ বহত ধরে অভিমান।
তে তুলসী গুরুয়া বনহি কহি ইতিহাস পুরাণ ॥

বুঝিতে না পারে   জ্ঞানবিরহিত
সদা অভিমান ধরিয়া রয় ;
কহিছে তুলসী   সেই গুরু সাজি
কথা ইতিহাস-পুরাণ কয়।

(৪৪)

নিজ নৈনন দীখত নহি গহি আঁধরে বাঁহ।
কহত মোহবশ তেঁহি অধম পরম হমারে নাহ ॥

নিজে অন্ধ হয়ে   অপর অন্ধেরে
হাত ধরে পথ দেখাতে যায় ;
সে অন্ধও মোহ-   বশে মনে করে
মিলেছেন মহাপ্রভু [illegible]।

(৪৫)

গগন বাটিকা সিঁচহি ভরি ভরি সিন্ধু তরঙ্গ।
তুলসী মানহি মোদ মন এই সে অধম অভঙ্গ॥

ভরিয়া ভরিয়া সিন্ধুর সলিল
গগন-বাটিকা সেচন করে;
কহিছে তুলসী এম্নি অধম
তাতেই মোহিত হরষ ভরে।

(৪৬)

দৃষত করত রচনা বিহরি রঙ্গরূপ সমতুল।
বিহঁগ বদন বিষ্টাকরে তাতে ভয়ো ন তুল॥

পাষাণ ক্ষোদিয়া ভাব অনুরূপ
ভকত শ্রীমূর্তি প্রকাশ করে;
অজ্ঞান-বিহঙ্গ তাহে বিষ্ঠা ত্যজে
সমদর্শী তাহে ক্রোধ না করে।

(৪৭)

চাহ তেহা রো আপুতে মানন আন ন আন।
তুলসী করু পহিচান পতি যাতে অধিক ন আন॥

বাসনার বশে নিজে হারিয়াছ
মনে করিও না হারালো আন;
কহিছে তুলসী চিনে প্রভু ধর
যাঁর হ'তে নাই অধিক আন।

(৪৮)

আতম-বোধ বিচার অহ তুলসী করু উপকার।
কোউ কোউ রাম প্রসাদতে পাবত পরমত পার॥

এই আত্মবোধ বিচার করিয়া
করহ তুলসি! ভবে প্রচার;
কেউ কেউ তবে শ্রীরামপ্রসাদে
পাইবে পরম মতের পার।

(৪৯)

জঁহা তোষ তহ রাম হৈ রাম তোষ নহি ভেদ।
তুলসী দেখি গহত নহি সহত বিবিধ বিধি খেদ॥

যেখানে সন্তোষ সেইখানে রাম
শ্রীরামে সন্তোষে নাহি প্রভেদ;
তুলসী দেখিয়া গ্রহণ না করি
সহিতেছে সদা বিবিধ খেদ।

(৫০)

গোধন গজধন বাজিধন ঔর রতনধন খান।
যব আবৈ সন্তোষ ধন সবধন ধুরি সমান॥

গোধন অথবা গজবাজি-ধন
আর রত্নধন জগতে যত;
যবে হৃদে আসে সন্তোষ-রতন
সব ধন তবে ধূলার মত।

(৫১)

কথি রতি অটত বিমূঢ় লট ঘট উদঘত ন জ্ঞান।
তুলসী রটত হটত নহি অতিশয় গতি অভিমান॥

বিষয়-কথায় রত অবিরত
হৃদয়ে উদয় না হয় জ্ঞান;
কহিছে তুলসী মুখে এক কথা
গতিভরা তার অভিমান।

(৫২)

তু ভুবঙ্গ গত দামভব কামনু বিবিধ বিধান।
তো তন মে বর্তমান যৎ তত্তুলসী পরমাণ॥

ভূপতিত রজ্জু অন্ধকারে যথা
ভুজঙ্গ বলিয়া ভ্রম জন্মায়;
কহিছে তুলসী অজ্ঞান-আঁধারে
অসত্য সংসার সত্য দেখায়।

(৫৩)

ভো উরশুক্তি বিভব পড়িক মনগত প্রকটলখাত।
মন ভো উর অপি শুক্তিতে বিলগ বিজ্ঞানব তাত॥

হৃদয়-শুক্তিতে বিভব-কিরণ
পড়ি রৌপ্যভাবে মন ভুলায়;
সে হৃদয় হ'তে পৃথক হইলে
মন সব ঠিক দেখিতে পায়।

(৫৪)

রাম চরণ পহিচান বিনু মিটিন মন কি দৌর।
জন্মগবায়ে বাদি হি রটন পরায়ে পৌর॥

শ্রীরাম-চরণে সত্য প্রীতি বিনা
কখন মনের দৌড় না যায়;
পরের দুয়ারে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
বিফলে তাহার জনম যায়।

(৫৫)

শুনৈবরণ মানৈবরণ বরণ বিলগ নহি জ্ঞান।
তুলসী গুরু প্রসাদ বল পরত বরণ পহিচান॥
শুনিতে বরণ বুঝিতে বরণ
বরণ ব্যতিত নাহিক জ্ঞান ;
কহিছে তুলসী গুরুকৃপাবলে
মানবের জন্মে বরণ-জ্ঞান।

(৫৬)

বিটপ বেলীগণ বাগকে মালাকার ন জান।
তুলসী তা বিধি বিদবিনা কর্তারাম ভুলান॥
বাগানের বৃক্ষ লতিকা সকল
মালাকারে কভু জানিতে নারে
কহিছে তুলসী তথা জ্ঞান বিনা
কর্তা শ্রীরামেরে ভুলেছে নরে।

(৫৭)

কর্তব হি সো কর্ম হৈ কহ তুলসী পরমাণ।
করণ হার কর্তার সো ভোগৈ কর্ম নিদান॥
যাহা কর তব তাহাই করম
কহিছে তুলসী করি প্রমাণ ;
যে করে সে কর্তা সেই ভোগ করে
আপন কর্মের ফল নিদান।

(৫৮)

তুলসী লট পটতে মটক অটক অপিত নহি জ্ঞান।
তাতে গুরু উপদেশ বিহু ভরমত ফিরত ভুলান॥
কর্মফল শুভ অশুভ লইয়া
অস্থির হয়েছে অজ্ঞান জন ;
তাই গুরুদেব উপদেশ বিনা
ভুলিয়া করিছে ধরা ভ্রমণ।

(৫৯)

জোঁ বরদা বণিজারকে ফিরত থনেরে দেশ।
খাঁড় ভরে ভুষ খাতই বিন গুরুকে উপদেশ॥
যথা বণিকের বলদ সকল
বহু বহু দেশ ভ্রমণ করে ;
পিঠে চিনি বোঝা না বুঝি অবোঝ
কেবল ভুষা খাইয়া মরে

(৬০)

বুদ্ধ্যা বারত অনয়পদ স্বপিন পদারথলীন।
তুলসী তেহি রাসভ সরিস নিজমন গহহি প্রবীণ॥
অনীতির বশে বুদ্ধিহীন যেই
শ্রীরামচরণে না হয় লীন ;
কহিছে তুলসী সে গর্দভ সম
নিজ মনে জানে আমি প্রবীণ।

(৬১)

কহত বিবিধ দেখে বিনা গহত ন অনেকন এক।
তে তুলসী সোনহা সরসি বাণী বদহি অনেক॥
না দেখিয়া বলে বিবিধ প্রকার
গ্রহণ করে না কিসেরও এক ;
কহিছে তুলসী, স্বর্ণকার সম
সঙ্কেত-বচন তার অনেক।

ক্রমশঃ

সাড়ে তিন টাকা

শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ

ফরিদপুর জেলায় মধুমতীনদীর তীরে 'বারুইখালি' নামে ক্ষুদ্র গ্রাম। তারই এক প্রান্তে নদীর ধারে সনাতন চক্রবর্তীর বাড়ী। গ্রামখানি শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সনাতনের নাম ছিল কিন্তু খ্যাতি ছিল না। অর্থাৎ তিনি প্রসিদ্ধ কৃপণ ছিলেন। গ্রামস্থ সবাই সনাতনকে দা'ঠাকুর বলিয়া থাকিত। যাহার দা'ঠাকুর তাহার তো বটেই, যাহার নয় তাহারও তিনি দা'ঠাকুর। দা'ঠাকুর ধনী। তবে সমস্ত অর্থই তাঁহার স্বোপার্জ্জিত। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পাইয়াছিলেন মাত্র সাড়ে তিন টাকা। পরে বাড়াইয়া গুছাইয়া সুদে খাটাইয়া সেই টাকা বর্দ্ধিত করিয়া দা'ঠাকুর এককাড়ি টাকায় পরিণত করিয়াছিলেন। তাই বোধ করি তিনি সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেন—"পরের সঞ্চিত ধনে হয়ে ধনবান, আমি কি থাকিতে পারি পশুর সমান?"

তিনি পশুর মত ছিলেন কি না জানি না, তবে তাঁহার জীবন-ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ;—সেবারে—সাল্ মনে নাই—অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টিতে বছর দুই ধরিয়া অজন্মা চলিয়াছিল। খাদ্যাভাবে চাষীরা দলে দলে আসিতে লাগিল দা'ঠাকুরের কাছে টাকার জন্য। কেহ ঘটী, কেহ কলসী, কেহবা রূপার পইছা, কেহ তাবিজ বাঁধা দিয়া দা'ঠাকুরের নিকট হইতে মোটা সুদে টাকা নিল। শেষে বছর কয়েক বাদে, পাঁচ টাকার স্থলে কেহ দিল পঁচিশ, কেহবা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গুণিয়া দশ স্থলে বাহান্ন টাকা সাত আনা তিন পাই দিয়া রেহাই পাইল। এইটাই ছিল দা'ঠাকুরের সব চেয়ে মোটা রোজগারের পথ। ইহা ছাড়া হোমিওপ্যাথী, ঝাড়, ফুঁক কোব্‌রেজি পর্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। কিছু কিছু রোজগারও হইত।

নবনে তেলীর ছিল পেটব্যথার ব্যামো। হঠাৎ একদিন একটু বাড়াবাড়ি হওয়ায় নব্‌নে দা'ঠাকুরের শরণাপন্ন হইল। দা'ঠাকুর চারগণ্ডা পয়সা গুণিয়া নিয়া নব্‌নেকে "কোষ্ঠশুদ্ধি বিরেচক" না কি একটা খাওয়াইয়া দিলেন। তারপর শোনা গিয়াছিল—নব্‌নের বেদনা গিয়াছিল বটে কিন্তু গাড়ু হাতে প্রায় বার পঞ্চাশেক একটা নির্দিষ্ট স্থানে যাতায়াত করিয়া তেলীর পোর প্রাণ যায় আর কি! এই গেল দাঠাকুরের আয়ের দিক্‌টা। ব্যয়ের দিক্‌টাও একটু দেখান আবশ্যক।

দা'ঠাকুর বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকে আমরা কখনও দেখি নাই। শোনা যায় পাশের গাঁয়ের জীবনরতন কাঞ্জিলালের প্রথমা কন্যা সারদেশ্বরীই ছিলেন সেই ভাগ্যবতী। সেবারে গ্রামে কলেরা রাক্ষসী হানা দেয়। সারদেশ্বরী যখন কলেরার কবলে বিশেষ কাহিল হইয়া শয্যা আশ্রয় করিলেন তখন প্রতিবেশিগণের অনেকেই বলিলেন—"দা'ঠাকুর সহর থেকে ভবানী ডাক্তারকে আনাও। আট টাকা ভিজিট নেবে, কিন্তু কলেরায় একেবারে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী।"

দা'ঠাকুর চট্ করিয়া ঘর হইতে একটা হোমিওপ্যাথির বাক্স বাহির করিয়া আনিয়া তাহাদের সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন—"এই দেখ, এই হোমিওপ্যাথী। কুড়ি বছর ধরে আমি এই চিকিৎসা করছি। আর আজ আমার বাড়ীতে আসবে শহর থেকে পাশ করা ধন্বন্তরি? আট টাকা ভিজিটের ডাক্তার? তার আগে আমার এই হাড় ক'খানা শ্মশানে পুড়ে ভস্ম হবে, আর এই বাক্স যাবে ওই মধুমতীর জলে। হেঃ, আট টাকা! আট পয়সার মুরদ নেই যার তার আবার আট টাকা!"

এইটুকু বেশ একটু জোরের সঙ্গে বলিয়াই দাঠাকুর অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় বলিলেন—"কিছু না—কিছু না,

ভগবানে বিশ্বাস থাকে তো যা দিয়েছি ওতেই ভাল হবে। বেঁচে থাক আমার হোমিওপ্যাথী। শহরের ধন্বন্তরি আমি চাইনে।"

ভগবানে বিশ্বাস ছিল এবং হোমিওপ্যাথীও বাঁচিয়া ছিল কিন্তু রোগী বাঁচিয়া রহিল না। রাতারাতি তাহারই হাড় ক'খানা শ্মশানে ভস্ম হইয়া গেল। ইহার পর দা'ঠাকুর স্বপাকেই খাইতে লাগিলেন আর বিবাহ করিলেন না। কারণ সেটা ব্যয়বাহুল্য।

সুবিমল বোসেরাই গ্রামের সেরা ধনী। এই বোসেদের বাড়ীতে নূতন দুর্গোৎসব হইবে। চারিদিকে হৈচৈ পড়িয়া গেল। তিনদিন ধরিয়া ভূরি ভোজন চলিবে। ছোট বড় কেহই বাদ যাইবে না—নিমন্ত্রিত হইবে। নেমন্তন্ন ইত্যাদি সমারোহ ভোজন-ব্যাপারে দা'ঠাকুরের উৎসাহ অফুরন্ত। বাড়ীতে কাঁচকলার ঝোল এবং কুচা চিংড়ির সাহায্যে কৃচ্ছ্র সাধন যেমন তাঁহার অসংযত রকমেই চলিত, নেমন্তন্ন খাইতে বসিয়াও ভাল ভাল সুস্বাদু খাদ্যের সাহায্যে দেহের সৌষ্ঠব সাধনের চেষ্টাও তেমনি অসংযত রকমেই চলিত। সংযত ছিল কেবল তাঁহার খরচের হাতটা।

শুধু কৃপণতাই নয়, নোংরামীতেও দা'ঠাকুরকে পরাস্ত করিবার লোক ছিল না। ধোপা-নাপিতের ব্যয় তাঁহার কাছে একেবারেই বাহুল্য ছিল। পোষাকের মধ্যে তাঁহার ছিল—থান দুই কাপড়, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একখানি গোলাপী রংয়ের সিল্কের ওড়না। কাপড় দুইখানি তিনি বছরে ১২ বার জলকাচা করিতেন এবং ওড়না ত বছরে একবার। চুল দাঁড়ি ছাটা বা কামান তাঁহার অভ্যাসের বাইরে। উহাদের তিনি স্বেচ্ছানুরূপ বৃদ্ধিলাভের স্থায়ী আদেশ দিয়াছিলেন।

গ্রামের মাতব্বর ছেলেরা দল বাঁধিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন হইয়া না গেলে বোসেদের বাড়ীতে কেহ নেমন্তন্ন খাইতে পাইবে না। বাড়ীর গেটেই জামা-কাপড় পরীক্ষা করিয়া ছাড়া হইবে। গোঁপ-দাড়িতে যাহার মুখ নোংরা তাহার অবস্থাও ঐরূপই হইবে।

অতএব দা'ঠাকুরের বাড়ীতে এই প্রথম ধোপানাপিতের ডাক পড়িল। একখানি ময়লা মোটা কাপড় এবং সেই লাল রংয়ের ওড়নাখানি ধোপার হাতে দিয়া দাঠাকুর বলিলেন—"দেখ বাপু, তোমরা তো কাপড় ছেঁড়ার যম। আমার এই দামী কাপড়টা যেন ছিঁড়ে দিও না। একটু নষ্ট হলে দাম আদায় করবো।"

হারু নাপিত চুল ছাটিয়া দাড়ি-গোঁপ কামাইয়া পয়সা চাহিল। দা'ঠাকুর কাছার খুঁট খুলিয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া উহার পাক ছাড়াইলেন তারপর অনেকবার গণিয়া ঘসিয়া তিনটি পয়সা তাহার দিকে ছুড়িয়া দিলেন। হারু আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল—"একি দিচ্ছেন দা'ঠাকুর? দাড়ি এবং চুলের তো দুই আনা রেট।" দাঠাকুর অবিচলিত। তিনি রীতিমত গম্ভীর হইয়াই বলিলেন—"ওরে বাপু, সে তো বুঝলাম তোমার চুলদাড়ির দুই আনা রেট। কিন্তু চুলেরও তো তারতম্য আছে! মাথাটাও দেখতে হবে।" এই বলিয়া তিনি মাথাটা তাহার দিকে হেলাইয়া ঘন ঘন হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"এই যে সারা মাথা তেলের মত চক্‌চক্ করছে এখানটার কোন্ চুল কেটেছ বাপধন? চুপ করে থাক্‌লে চলবে না। বল্ কোন্ চুল কেটেছিস্? টাক দেখেই গাল ফাঁক হয়ে গেল? কথাটা একটু হিসেব করে বলতে হয়। তোদের চোখের পর্দা নেই?"

হারু কাতর হইয়া জবাব দিল—"ওর জন্য আর দামের কম বেশী হয় না। চুল কি আর সবার মাথায় সমান থাকে? আর তা ছাড়া আপনার চুলটা যেমন কমেছে দাড়িটাও তো তেমনি বেড়েছে!"

দা'ঠাকুর মুহূর্তে চোখ দুইটা রক্তের মত লাল করিয়া ফেলিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বেড়েছে, আমার দাড়ি বেড়েছে? বেড়েছে কিন্তু পাকে নি। কাঁচা দাড়ি কামাতে সহজ। মাথার চার পাশের গাছ দুই চুল ফেলে—দাও দুই আনা। অত বোকা আমি নই। যা বেটা, আর পয়সা পাবিনে। আমার এই অনাপিতস্পর্শা দাড়িতে যে তোকে হাত দিতে

কিছুক্ষণ ধরিয়া দুই পক্ষের মধ্যে পয়সা লইয়া চলিল টাগ-অপ-ওয়ার। উভয়ের চেঁচামেচিতে লোক জুটিল অনেক কিন্তু পয়সা জুটিল না আর একটিও। দা'ঠাকুর অবশ্য কাহাকেও অগ্রাহ্য করিলেন না। টাক-সর্ব্বস্ব মাথাটি সকলকে দেখাইয়া একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করিলেন।

ধোপা কাপড় কাচিয়া আনিয়া দাম চাহিল। দা'ঠাকুর তাহার হাতেও তিনটি পয়সা গুজিয়া দিয়া কহিলেন— "কিরে কালু! হেসে ফেল্‌লি যে, খুব খুশী! সিল্কের ওড়না কেচেছিস কি না তাই একটা পয়সা বেশী দিলাম। আমার কাছে কোন ছল-চাতুরী পাবিনে। ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা হিসেব করে মিটিয়ে তবে আমার অন্য কাজ।"

হারু উত্তর দিবে কি? দা'ঠাকুরের বাক্‌চাতুর্যে প্রথমটা সে একেবারে থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ঢোক গিলিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল—"দশ পয়সা তো দাম হইছে দা'ঠাকুর। আপনি না হয় দুটো কম দ্যাও। তিনডে পয়সা দিতিছ কেনে? এ আমি নেবনা, তুমি ও তুলে রাহো।"

মিনিটখানেক দা'ঠাকুর নীরব রহিলেন; তারপর ভড়-ভড় করিয়া থেলো হুকাটি প্রাণপণে টানিয়া এক পাশে নামাইয়া রাখিয়া এক গাল ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন— "সে তো বুঝলাম কালু, পয়সা কম দিচ্ছি। কাপড়খানা একবার মেপে দেখেছ? ওরে বাপু, পুরো দাম দিতে হবে বলেই তো পুরো কাপড় পরিনে। এটি আট হাত কাপড়। এক ইঞ্চিও তার বেশী নয়। ওসব আমার কাছে চল্‌বে না বাপধন! আটঘাট বেঁধে তবে আমি কাজ করি। তোরা হলি কি রে কালু? হিসেব না করেই দাম চেয়ে বসিস? হেঃ হেঃ হেঃ—এবার যে একেবারে হেসেই ফেললি!" এই বলিয়া তিনি নিজেই জটিল কাসির সঙ্গে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মুখটা কাচুমাচু করিয়া কালু বলিল—"ওর আর হিসেব কি দা'ঠাকুর? ছোট বড়র একদাম। আপনি ছোট লোকের সাথে মস্করা করতিছ কেন দা'ঠাযুর? আমার পাওনা-গণ্ডা চুহোয়ে দ্যাও, আমি চলে যাই।"

দা'ঠাকুর এবার চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—"আর একটা পয়সাও না। আমাকে খুন করলেও না।"

এই বলিয়া তিনি রীতিমত গম্ভীর হইয়া হুকায় টান দিলেন—ভড়-ভড়-ভড়। কালু আর কি করিবে? খানিক ক্ষণ বৃথা চেঁচামেচি কান্নাকাটি করিয়া ওই তিন পয়সাও ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। দা'ঠাকুর অবিলম্বে তাহাও কুড়াইয়া লইয়া কাছার খুঁটে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

"কল্যাণ-সঙ্ঘের" প্রচেষ্টায় সেবারে একটা দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা গ্রামস্থ সকলেই আশা করিতে-ছিলেন এবং সকলেই সাধ্যানুরূপ চাঁদা দিতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন। দা'ঠাকুরকে চাঁদা ধরা হইয়াছিল সাড়ে তিন টাকা। সঙ্ঘের যুবকেরা সকলেই আসিয়া দাঠাকুরের নিকট টাকার তাগিদ দিল। দা'ঠাকুর চাঁদার কথা শুনিয়া গুণছেঁড়া ধনুকের মত লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"সাড়ে তিন টাকা? সাড়ে তিন পয়সা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। সাড়ে তিন টাকা? ছাপ্পান্ন আনা? দুশো চব্বিশ পয়সা?"

সঙ্ঘের যুবকেরা সকলেই অনুরোধ করিতে লাগিল —"দা'ঠাকুর এ একটি বিশেষ কাজ। গ্রামস্থ সকলেই উপকৃত হবে; প্রতি বছর ম্যালেরিয়াতেই অসংখ্য লোক মারা যায়। এর আশু প্রতিকার আবশ্যক।

কিন্তু এসব কথায় দা'ঠাকুরের মন টলে না। তিনি দৃঢ়স্বরেই জবাব দিলেন—"আমার থাকলে তো আমি দেব ভাই! আমার কানাকড়িও নেই। তোমরা তো জানো আমি পয়সা অভাবে দুবেলা খাইনে। তোমাদের ঠানদি মারা গেলে আমি আর একটা বিয়ে পর্যন্ত করতে পারলাম না ভাই, ওই পয়সারই অভাবে। এ কি কম দুঃখের কথা? একি আমি ইচ্ছে করে করি? অভাব ভাই অভাব। অভাবেই স্বভাব নষ্ট। থাকলে আমি সাড়ে তিন কেন সাড়ে দশ দিতাম।"

যুবকেরাও নাছোড়বান্দা। তাহারা নানাপ্রকারে চেষ্টা করিল—একবার চেঁচাইয়া, একবার স্বর নামাইয়া, একবার খোসামোদ করিয়া, একবার ভয় দেখাইয়া—কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। দা'ঠাকুর হিমালয়ের ন্যায় অচল।

তাহারা ফিরিতে উদ্যত হইল। কিন্তু যাইবার পূর্বে সঙ্গের একটি যুবক বলিল—"আচ্ছা, আপনার যদি কিছুই না থাকে তো চাবিটা আমাদের হাতে দিন, আমরা আপনার ঘরের মেঝেয় পোতা লোহার সিন্দুকটা একবার খুলে দেখি।"

এই যুবকের নাম নরেন ঘোষাল। নরেন সর্বদাই একরোখা এবং স্পষ্টবাদী। চেহারাও পালোয়ানী।

দা'ঠাকুর বলিলেন—"সেকি হয়? কিছু নেই। তবু দুচার পয়সা খরচা বাবদও তো আছে। তাও নিয়ে গেলে এক বেলা যে দুটো খাচ্ছি তাও বন্ধ হবে। শেষে কি না খেয়ে মরবো?"

অগত্যা কল্যাণ-সঙ্ঘ ফিরিতে বাধ্য হইল। ফিরিলও কিন্তু দা'ঠাকুরের অন্তরে একটা মর্মস্পর্শী প্রভাব রাখিয়া গেল। দা'ঠাকুরের মনের মধ্যে ঘা মারিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল কল্যাণ-সঙ্ঘের শেষ উচ্চারণটুকু—"টাকা আমরা আদায় করবোই, ভালয় ভালয় দেন ভালই, নইলে আপনার সবই যাবে।" সবই যাবে! বাপ রে! খুন করিবে নাকি? কি করা যায়, কোথায় রাখি! সামলাইব কি করিয়া? গুণ্ডার দল, বিশ্বাস নাই। ওরা সবই পারে। খুন করিবে। গলা টিপিয়া মারিবে! রাত্রে আসিয়া ঘাড় মট্‌কাইবে। নেমন্তন্ন বাড়ীতে বিষ খাওয়াইবে। জলে ডুবাইয়া মারিবে। আমি যাই ক্ষতি নাই, কিন্তু টাকা না যায়! দা'ঠাকুর প্রায় পাগল হইলেন। শুইতে খাইতে সর্বদাই ওই চিন্তা—"নইলে আপনার সবই যাবে।" দা'ঠাকুর মরিয়া হইয়া গেলেন—প্রাণ যায় সেও স্বীকার, এক কপর্দকও কল্যাণ-সঙ্ঘের হাতে না যায়। রাত্রে ঘুম নাই। রোজ শেষ রাত্রে উঠিয়া দরজা-জানালা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া তহবিলটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

কিছু দিন ধরিয়া বাহিরের কোন কাজে আর দা'ঠাকুরকে দেখা গেল না। সর্বদাই ঘরের মধ্যে থাকেন এবং সর্বদাই বিমর্ষ। এই প্রকারে মাসাবধি কাটিল; তারপর হঠাৎ একদিন দা'ঠাকুরকে দেখা গেল রীতিমত প্রফুল্ল। আগে তিনি সন্ধ্যা না হইতেই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বিছানার উপর কাত হইয়া হুকা টানিবার ফাঁকে ফাঁকে রামপ্রসাদী গানের সুর অবিশ্রাম ভাজিয়া যাইতেন। কিন্তু এখন হইতে রোজই দা'ঠাকুর সন্ধ্যার পূর্বেই নদী কিনারের "জামাই ভোলান" বেল গাছটার তলায় বসিয়া উদাস ভাবে মধুমতীর কল্লোলিত স্রোতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গাইতেন—"ওরে আমার মন, ধেয়ে যাস্ কোন বিদেশে কার উদ্দেশে কোন্ অজানার পারে।"

কেন যে মধুমতী তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে এমন করিয়া আকর্ষণ করিল, উহার স্রোতের মধ্যে তিনি কি যে দেখিতে পাইলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। দা'ঠাকুরকে ঘিরিয়া সে কুণ্ডলীকৃত তামাকের ধোঁয়াও আর নাই, সে হোমিওপ্যাথীর প্রার্থী রোগীও আর নাই। আছে শুধু তাঁহারই স্বহস্তরচিত সেই 'জামাই ভোলান'র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শাখা-প্রশাখা। আর উভয়দিকে দিগন্তে বিলীন সেই খরস্রোতা মধুমতীর জল। মাঝে মাঝে দুএকটা মাছরাঙ্গা পাখী 'কুইই' শব্দ করিতে করিতে যদি বা উড়িয়া পালায়, যদি বা দুই চারিটা নিশাচর পাখী সোঁ সোঁ শব্দে সুমুখ দিয়া চলিয়া যায়, দা'ঠাকুরের তন্ময়তা তাহারা ভাঙ্গিতে পারে না। তিনি উদাসীন—যেন পরপারের আহ্বান আসিয়া তাহার কানে পৌছিয়াছে!

বছর কয়েক ধরিয়া মধুমতীর এই দিক্‌টাতে কিছু ভাঙন ধরিয়াছিল। কিছুদিন হইতে দাঠাকুরের এই "জামাই-ভোলান"কে বেষ্টন করিয়া খানিকটা স্থান মধুমতীর গর্ভে আশ্রয় পাইবার জন্য চিড় ধরিয়াছিল। সান্ধ্যবিশ্রাম যথারীতি সমাপন করিয়া, দা'ঠাকুর সবে মাত্র বাড়ী ফিরিয়া একটা রামপ্রসাদী একটু নীচু গলায় খুব নরম করিয়াই ভাজিতেছিলেন। অকস্মাৎ ঝপাং করিয়া একটা বিরাট্ আওয়াজ হইল। দা'ঠাকুর সেই শব্দে চমকাইয়া উঠিলেন। রামপ্রসাদী গেল থামিয়া। দা'ঠাকুর ঝড়ের বেগে 'জামাই-ভোলান'র দিকে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার সে প্রাণপ্রিয় "জামাই-ভোলান" আর সেখানে নাই। বিরাট্ তরুরাজের দীর্ঘদেহের অতি নগণ্য অংশ মধুমতীর স্রোতে তখনও দৃশ্যমান হইতেছে। দা'ঠাকুর পাগলের মত চীৎকার করিয়া নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া

পড়িতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু দৌড়াইয়া কিনারা পর্যন্ত যাইয়া সামলাইয়া ফেলিলেন। শেষে বালকের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন—"এ কি করলি মা গঙ্গা! আমার যথাসর্বস্ব গ্রাস করলি মা? আমি যে নিজে না খেয়ে জমিয়ে রেখেছিলাম মা?"

তারপরে একটু সামলাইয়া কান্নার সুরেই বলিয়া চলিলেন—"এইবার, এইবার দেখবো কল্যাণ-সঙ্ঘ? এইবার দেখবো নরেন! কেমন করে তোমরা এক কপর্দকও স্পর্শ কর। সাড়ে তিন টাকা চাঁদা। কর আদায়? দেখবো কতখানি শক্তি রাখে তোমার কল্যাণ-সঙ্ঘ! সবই নেবে? নাও এবার সব। সাড়ে তিন টাকা, ছাপান্ন আনা দুশো চব্বিশ পয়সা—বাপরে নাও, নাও এবার সব। আমি নিশ্চিন্ত।"

দৈবযোগে নরেনও সেই মুহূর্তে দা'ঠাকুরের বাড়ীতে আসিয়াছিল। সে উহা সমস্তই স্বকর্ণে শুনিতে পাইল। দা'ঠাকুরের দুর্দশায় আজ সত্যই সে দুঃখানুভব করিল। সে অগ্রসর হইয়া বলিল—"কি দা'ঠাকুর। এই খানে পুতে রেখেছিলেন বুঝি?"

তাহাকে দেখিয়া দা'ঠাকুর প্রথমটা শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"এই যে চোর এসেছ? টাকা আদায় করতে এসেছ? নেবে সেই সাড়ে তিন টাকা? তা আর হচ্ছে না। তোদের ঐ সঙ্ঘের ভয়েই আমি এইখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তাতেও নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। রোজ যক্ষের মত পাহারা দিয়ে ফিরেছি। আজ একেবারে নিশ্চিন্ত। মা ভাগীরথীই নিজেই নিয়ে লুকিয়ে রাখলেন আপন বক্ষে। নাও, নাও এবার আদায় কর। হাঃ হাঃ হাঃ এক কপর্দকও আমি চাঁদা দেব না—সাড়ে তিন টাকা? ছাপান্ন আনা? হাঃ হাঃ হাঃ। কি নরেন, তোমাকে জব্দ করেছি—তোমার কল্যাণ-সঙ্ঘকে জব্দ করেছি, হাঃ হাঃ হাঃ!"

চিনেছি আমার আমিরে

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য

একি সহসা আমার অন্তর কেন
মাতিয়া উঠিল গানে!
সহসা কেনরে প্রাণে—
দুকূল ছাপায়ে পুলকের বান
সংশয়-দ্বিধা করি' খান খান
জাগিয়া উঠিল, মাতিয়া উঠিল,
গাহিল আকুল তানে!

ওরে জানিস কি তোরা অন্তর মোর
মাতিল কিসের গানে?
এতদিন মোর এই আনন্দ,
এতদিন মোর এ গীতিছন্দ,
এতদিন মোর প্রাণের গন্ধ,—
বন্ধ আছিল অন্তরে মোর
অন্ধ সে কোন খানে?

ওরে এতদিন কেন এই ঝঙ্কার
ধ্বনিয়া ওঠেনি প্রাণে?

ওরে জানিস না তোরা জানিস না মোর
অন্তর কার লাগিয়া,
উঠেছে আজিকে জাগিয়া;
নবীন ছন্দে, নব আনন্দে,
নবীন প্রাণের নবীন গন্ধে;
নবীন রঙের নব তুলিকায়
কেন বা উঠিল রাঙিয়া?

ওরে জানিস না তোরা অন্তর কেন

উঠিল আজিকে জাগিয়া ?
নিজেরে চিনেছি আজিকে ;
ওরে অন্তরে মম অন্তরতম
জেনেছি আমার আমিকে।
আমি জানিয়াছি মোরে, চিনিয়াছি মোরে ;
তাই জাগিয়াছে মোর অন্তরে
নূতন ছন্দ, নব আনন্দ,
নূতন প্রাণের নূতন গন্ধ ;
গাহি উদাত্ত হরষ মত্ত
ছুটে তারা দিক্-বিদিকে।
ওরে অন্তরে মম অন্তরতম
চিনিয়াছি মোর আমিকে !
ধন্যরে তুই, ধন্য, ধন্য,
ওরে দ্বিধা-সংশয়,
জয় জয় তোর জয় !
তোরই কৃপায় জানিয়াছি আজ
আমিটি আমার এই তনু-মাঝ
নহেক বদ্ধ ; এতই ক্ষুদ্র
আমার আমি ত' নয় !
সে যে সুবিশাল, সে যে সীমাহীন ;
জড়, সচেতন, সব তাতে লীন ;
নহে সে তুচ্ছ, নহে নগণ্য
সে যে ত্রিভুবনময় !
তোরই কৃপায় জানিয়াছি তারে,
ধন্য রে সংশয় !
জয় জয় তোর জয় !

প্রমীলা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্য
স্থান—প্রান্তর ; কাল—সায়াহ্ন
[শনির প্রবেশ]

শনি। বাপ্ রে! হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম! দিনরাত কি ঠুলি পরে ঘোরা যায়! [চারিদিক্ চাহিয়া] বাঃ বাঃ দিব্যি ফাঁকা মাঠটি ত! যাক! দেখি চোখের ঠুলিটে খুলে একটু বিশ্রাম করতে পারি কি না! নাঃ আমার চোখের তারিফ করতে হয়। প্রাণ খুলে একবার চাইলেই, বাস্, একদম ফর্সা! তাই না দুর্ভোগ! দেবরাজের হুকুম হল—লাগাও শনির চোখে ঠুলি! বাঃ রে চোখ দিয়ে চাইব, তাও নিজের ইচ্ছে মত পারব না। নাঃ এ ঘোরতর অন্যায়! এ-দেবরাজের স্বেচ্ছাচারিতা! হায় কি দুর্ভোগ! আমার স্বজাতি দেবতারা কোথায় আমার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করবে, না তারা আমায় দেখে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে। হাঁ দেখ ত ব্যাভারটা! কিন্তু মর্তে একি দেখছি! ছেলে বুড়ো, মেয়ে মদ্দো, সবার চোখে ঠুলি! অবাক কাণ্ড! অবাক কাণ্ড! এটা নাকি এদের ফ্যাসান! নাঃ মর্তবাসীদের রুচির তারিফ করতে হয়—তারিফ করতে হয়। আচ্ছা মর্তের লোকগুলো সব আমার মত শনি নয় ত! তাহলে ত সুবিধে হবে না!

[পবনের প্রবেশ]

পবন। ওহে গ্রহরাজ! এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি বক্‌ছ হে! বলি অভিনয়ের মহড়া দিচ্ছ নাকি!

শনি। নাঃ বাপের শ্রাদ্ধের মন্তর আওড়াচ্ছি! তুমি

যাও—তফাৎ যাও, নইলে তোমার গিন্নির মাছ-ভাত উঠে যাবে।

পবন। ওহে গ্রহরাজ! তোমার চতুস্পদে থুড়ি শ্রীচরণ চতুষ্টয়ে দণ্ডবৎ। ওহে চোখে ঠুলি লাগাও হে ঠুলি লাগাও, আমি ততক্ষণ পেছন ফিরে দাঁড়াই।

শনি। [চোখে ঠুলি পরিয়া] আরে পবন দা! এস-এস-এস! কদ্দিন দেখাই হয়নি। এস-এস-এস; এই ফাঁকা মাঠে বসে প্রাণখুলে একটু আলাপ করেনি।

পবন। বাপ্‌রে! আলাপ বার করছিলে আর কি! শনি হে এক্ষুণি ত পৈত্রিক প্রাণটা বেমালুম নিয়েছিলে! কি দশা হ'ত বলত!

শনি। কার কি দশা হ'ত পবনদা?

পবন। আহা-হা! তোমার বৌদির গো! সে যে বড় অনাথিনী, বড় বিরহিণী! তার যে মটর ডাল সহ্য হয় না—তার মাগুর মাছের ঝোল না হ'লে রুচে না। সে যে উপোষ করতে পারে না—সে একাদশী করত কেমন করে! আহা-হা!

শনি। আরে যেতে দাও হে যেতে দাও। সত্যি সত্যিই যদি তোমার দফা রফা হত, তাহ'লে বৌদির কোন কষ্টই হ'ত না!

পবন। সত্যি বল্‌ছিস শনি!

শনি। হ্যাঁ, এ আমি হলপ করে বল্‌তে পারি।

পবন। আচ্ছা তবে হলপ নিয়ে বল।

শনি। আমি শ্রীশনৈশ্চর পিতা শ্রীতমিস্রহা সাকিন স্বর্গধামে হালসাকিন মর্তলোক অত্র উন্মুক্ত প্রান্তরে দণ্ডায়মান পূর্বক আমার অতি প্রিয় ও পবিত্র ঠুলি তথা মর্তবাসীদের চশমা স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার পূর্বক কহিতেছি যে আমার শুভ দৃষ্টিতে যদি শ্রী উনপঞ্চাশৎ বায়ুর পটল প্রাপ্তি-ঘটিত তাহা হইলে তস্য পত্নীর কোন অসুবিধাই হইত না, অসুবিধার মধ্যে একমাত্র নরুণপেড়ে ধুতি পরিধান করিতে হইত।

পবন। আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ! যাক্‌-যাক-যাক! ওসব বাজে কথা যাক্‌-যাক!

শনি। আরে যেতে দাও হে যেতে দাও।

পবন। ওহে শনি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস্ করব।

শনি। কথা জিজ্ঞেস্ করবে এই। তা একটা কেন —বিশ্‌টে জিজ্ঞেস কর। তুমি পট্‌ পট করে প্রশ্ন করতে থাক, আর আমি হড় হড় করে জবাব কাটতে থাকি।

পবন। শনি! তোমার চোখ ত খুবই চোস্ত!

শনি। নিশ্চয়ই। দেখ্‌বে নাকি!

পবন। আরে নাহে না। গরীবের উপর নজর কেন? যাওনা রাবণ রাজার কাছে।

শনি। বুঝ্‌লে কি না পবনদা, ওখানে সুবিধে হয় না।

পবন। হুঃ তোমার যত কেরামতি বুঝি গরীবদের পরে। রাজারাজড়ার ধারেও ঘেঁস না।

শনি। বুঝ্‌লে না দাদা। এইটেই ত সনাতনী রীতি—মেনে চল্‌তে হবে না?

পবন। নিশ্চয়ই মেনে চল্‌তে হবে।

শনি। আরে যেতে দাও হে যেতে দাও। আচ্ছা পবনদা কদিন ত যমকে দেখ্‌ছি না। বেচারাকে একদম গাধার খাটুনি দিয়েছে!

পবন। তা আর দেবে না। এ্যাদ্দিন শুধু ভড়্‌কো লোকের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌তেন—এবার যাহু শক্ত পাল্লায় পড়েছেন। হ্যাঁ, যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল!

শনি। আরে যেতে দাও হে যেতে দাও। ও দাদা! পায়ের শব্দ শুনছ! আমি লম্বা দি।

[সভয়ে প্রস্থান]

পবন। যাঃ শালা! আমি লোকটাকে না দেখে যাচ্ছি না। একটু ঘাপটি মেরে দেখি।

[অন্তরালে গমন]

[যমের প্রবেশ]

যম। এই ছিল ভালে!

মৃত্যুরাজ আমি!

আমার স্মরণে জীব

আতঙ্কে শিহরে।

আমার পরশে

মুহূর্তে জীবত্ব হয় নাশ।
কিন্তু ব্যর্থতায় ভরা,
সমস্ত প্রতিভা মোর রাবণের কাছে।
জীব করে ভুবন বিজয়!
নিল অধিকার,
পরিবর্তে তার,
দেছে অশ্ব-পরিচর্যা-ভার।
ধিক শতধিক! অদৃষ্টে আমার!

[পবনের প্রবেশ]

পবন। হাঃ হাঃ হাঃ একদম যাত্রা! একদম যাত্রা!

যম। [সক্রোধে] যাত্রা কি রকম! তুমি আমায় ব্যঙ্গ করছ পবন?

পবন। রাম-রাম, থুড়ি রাবণ-রাবণ। তোমায় আমি ঠাট্টা করতে পারি। তুমি ত আর শ্বশুর-কন্যার ভাই নও।

যম। পবন!

পবন। আরে চটো কেন যম, চটো কেন। তুমি যাত্রা শোননি?

যম। ফের যাত্রা!

পবন। আহা-হা! কথা বোঝ না কেন। শোনই না।

যম। বল।

পবন। বলি যম ভায়া, তুমিও ত আমার মত ঢের ঢের বার মর্তে এসেছ। মর্তবাসীদের যাত্রা শোননি। বটতলায় চাঁদোয়া খাটিয়ে মর্তবাসীরা কেউ বা রাজা কেউ উজীর সেজে লম্ফ ঝম্ফ করে। সেই "অহো ধিক!" "অহো ধিক!" শোননি। তোমার বিলাপ শুনে মর্তবাসীদের যাত্রার কথাই মনে পড়্‌ছিল। বুঝলে?

যম। বুঝ্‌লুম।

পবন। কি বুঝ্‌লে?

যম। বুঝ্‌লেম তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু।

পবন। তোমার গোঁফ, আমার দাড়ি। রাগ করলে ভায়া রাগ করলে। ঘাট হয়েছে স্বীকার কচ্ছি। যাক!

যক। তা আবার জিজ্ঞেস করতে হবে কেন। নিজে বুঝছ না?

পবন। আমি! না-কিছু না।

যম। তুমি তা'হলে বেশ আছ!

পবন। আমি! বেশ আছি। খাচ্ছি, দাচ্ছি ঘুমুচ্ছি। আর তুমি বা মন্দ আছ কিসে। ছিলে ত পাতালে—একটা গোভাগাড় বল্লেও হয়। সাত জন্মেও চন্দ্র-সূর্যের মুখ দেখনি। তার কাছে লঙ্কা ত ইন্দ্রপুরী। চড়তে ত বাবা একটা মহিষ, এত তবু একটু আধটু ঘোড়ায় চাপ্‌তে পারছ। বেশ খাচ্ছ, দাচ্ছ ঘুমুচ্ছ। দিব্যি একটু ভুঁড়িও গজিয়েছে দেখছি। বেশ আছ মন্দ কি?

যম। মন্দ কি!

পবন। হ্যাঁ। তা বলতে পার বইকি। ঐ ঘোড়ার ঘাস কাটার কথাটা বল্‌তে পার বৈকি। তা বুঝলে ভায়া; ষোল আনা সুবিধে জোটে না। রাবণ রাজা ত আর বেয়াকুব নয়। জানে শুধু বসে বসে খেলে বাতে ধরে—তা ভায়া তোমার বাত তাড়াতে এই সামান্য পরিশ্রম—ঘোড়া-সেবাটা করতে দিয়েছে। দুখ্‌খু করো না ভায়া দুখ্‌খু করো না।

যম। দেখছি তাঁবেদারীটে তোমার মজ্জাগত হয়েছে।

পবন। আরে ভায়া তা আর হবে না। জান ত ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। স্বর্গে দেবরাজের তাঁবেদারী খাটতুম, এখানে না হয় রক্ষোরাজের তাঁবেদারী খাটছি। বাঁধা কুকুরের সোণার শিকল আর লোহার শিকলের তফাৎটা কোথায়! হাঃ হাঃ হাঃ

যম। তুমি চুলোয় যাও! তুমি দেবাধম! ধিক তোমাকে। [সক্রোধে প্রস্থান]

পবন। একদম যাত্রা, একদম যাত্রা। আ হা হা চটো কেন। দাঁড়াও হে ভায়া দাঁড়াও। [প্রস্থান]

[কালনেমীর প্রবেশ]

কালনেমী। লঙ্কা—লঙ্কা!

ওগো মোর পিতৃরাজধানী!
ওগো জন্মভূমি!
আজ তোমার দুয়ারে ফিরি,
লাঞ্ছিত ভিক্ষুক সম।
পরদত্ত অশন-বসনে,
কোনমতে রক্ষা করি কায়া!
দুর্বল দেখিয়া মোরে,
সহোদরা-পুত্র মোর রাজ্য-সিংহাসন,
সবলে লইল কাড়ি আমারে বঞ্চিয়া!
তীব্র অপমানে,
অন্তর দহিছে মোর!
বলে না পারিব,
ছলে ও কৌশলে,
রাবণে করিব ধ্বংস।
রাবণ—ভাগীনেয় মোর!
না—না—
দেখে নেবো—দেখে নেবো—
রাবণ! দেখো নেবো—
কতদিন থাকে রাজ্য রাজ-সিংহাসন
তেজ-দর্প-অহঙ্কার তব।

[শুকের প্রবেশ]

শুক। মাতুল!
কোথা মহারাজ!

কালনেমী। নাহি জানি।

[শুক চলিয়া যাইতেছিল]

শুক!

শুক। মাতুল!

কালনেমী। কোনজন সেনাপতি অদ্যকার রণে?

শুক। বীরবাহু।

কালনেমী। বীরবাহু! চমৎকার—চমৎকার!
উত্তেজনা কর তারে;—
যেন ঘরে নাহি ফিরে,
বিনাশ না করি রাঘব-লক্ষ্মণে।

শুক। মাতুল!
অপার আনন্দ যার রণে,—
তাহারে করিব উত্তেজনা!
বয়সে নবীন বটে—যুদ্ধেতে প্রবীণ।
কোটি বাণ ছাড়ে বীর চক্ষের পলকে
মাতুল!
হের কি কৌতুক!
নল নীল, গবয় সুষেণ,
হনুমান, অঙ্গদ, সুগ্রীব—
বার বার করে পলায়ন।
আঁখির সম্মুখে,
অস্ত্রহীন করিল লক্ষ্মণে।

[প্রস্থান]

কালনেমী। হাঃ হাঃ হাঃ
নিভিবার কালে,
দেউটি যেমতি করে
আলো বিকিরণ!
এখনি পড়িবে রণে
শ্রীরামের বাণে।
রাবণ—রাবণ!
দেখে নেবো—দেখে নেবো
হাঃ হাঃ হাঃ! [প্রস্থান]

ক্রমশঃ

কাপ্তেন জেমস কুক

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তুপিয়ার কার্য

দেশে ফিরিবার পূর্বে তুপিয়া কুকের দোভাষীর কার্য করিত। এতদ্ভিন্ন আরও বহু বিষয়ে তুপিয়া অত্যন্ত উপকারে লাগিয়াছিল। নিকটবর্তী বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপগুলি কুক নিজে আবিষ্কার করিয়া তাহাদের মানচিত্র তৈয়ারী করেন; কিন্তু তুপিয়া আরও বহুবিধ দ্বীপের সঠিক সংবাদ প্রদান করিয়া কুককে সাহায্য না করিলে, কুক পৃথিবীর এই অপরিজ্ঞাত অংশের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অঙ্কন করিতে সমর্থ হইতেন কি না সন্দেহ। এই মানচিত্র অদ্যাবধি বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

নিউজীল্যাণ্ডে কুক

তাহিতি দ্বীপ পরিত্যাগের পর তিন মাস অতিবাহিত হইবার কিছু পূর্বে নিউজীল্যাণ্ডের উত্তরস্থ দ্বীপ দৃষ্টি-গোচর হইল। অসভ্য ম্যায়োরিস জাতির কয়েকজন লোক উপকূলে মাছ ধরিতেছিল। তাহারা Endeavour জাহাজকে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল। প্রথম দর্শনে তাহারা ভাবিল —উহা বুঝি একটি বৃহৎ আশ্চর্য পক্ষী—ডানা বিস্তৃত করিয়া উড়িয়া আসিয়াছে। পরে যখন ছোট বাচ্চাটিকে উহার পার্শ্বদেশ হইতে বাহির হইতে দেখিল, এবং উহা তীরের দিকে অগ্রসর হইল তখন তাহাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। এই ছোট বাচ্চা অন্য একখানি নৌকা যাহাতে কুক ও তাঁহার লোক তীরে অবতরণ করেন। কুক যে উপসাগরে জাহাজ নঙ্গর করেন উহার নাম "পভার্টি বে।"

কুক ম্যায়োরিস জাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে অত্যন্ত প্রয়াসী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বিবর্ণ মুখ ও অদ্ভুত পোষাক অসভ্য জাতির নিকট কুককে দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিল; ফলে তাহারা দলে দলে দ্রুতগতিতে পলায়ন করিল। দ্বীপের যে অংশে কুক অবতরণ করেন, সেই অংশে তাঁহার পূর্বে অন্য কোন শ্বেতাঙ্গ জাতি পদার্পণ করে নাই—মাত্র টাসম্যান পূর্ববর্তী শতাব্দীতে পশ্চিম উপকূল আবিষ্কার করেন।

বিরোধী দেশীয় লোক

ম্যায়োরিসেরা আদৌ বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না; সুতরাং কুক কোনরূপ বিঘ্ন-বিপদ্ এড়াইবার জন্য উত্তর মুখে জাহাজ চালাইলেন, তবে জাহাজ নিউজীল্যাণ্ডের উপকূলের নিকটতম সমুদ্র দিয়া যাইতেছিল। কিছুদূর পর্যন্ত বিরোধী দেশীয় লোকেরা ডোঙ্গায় চড়িয়া জাহাজের অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে বন্দুকের গুলি তাহাদিগকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

নাবিকেরা দেশীয় লোকের সহিত ব্যবসা করিতে ইতস্তত করিত না। কিন্তু দেশীয় লোকেরা কঠোর সওদাগররূপে প্রতিভাত হইল। অথচ উহারা আদৌ বিশ্বাসী ছিল না।

একদিন একখানি দেশীয় লোকের ডোঙ্গা জাহাজের ধারে আসিলে কুক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, তাহাদের মধ্যে একজন একখানি ভল্লুকের চামড়ার পোষাক পরিধান করিয়াছে। তখন তিনি ঐ ভল্লুকের চামড়ার পরিবর্তে একখণ্ড রক্তবস্ত্র প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। অমনি নিউজীল্যাণ্ডবাসী উহা খুলিয়া ফেলিল কিন্তু রক্তবস্ত্র হাতে পাওয়ার পূর্বে উহা দিতে স্বীকৃত হইল না। ফলে উক্ত রক্তবস্ত্র জাহাজের ধার দিয়া ছুড়িয়া ফেলিবার পরামর্শ

নাবিককে উক্ত বস্ত্রখণ্ডের এক প্রান্ত ধরিয়া অন্য প্রান্ত ডোঙ্গায় ছুঁড়িয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু যেই অপর প্রান্ত ডোঙ্গায় পৌঁছিল, অমনি ধূর্ত দেশীয় লোক উহা টান দিয়া কাড়িয়া হইল এবং উভয় বস্ত্র লইয়াই পলায়ন করিল।

কুক-প্রণালী আবিষ্কার

অতঃপর কুক যাত্রাপথে একটি প্রণালী দেখিতে পাইলেন। এই প্রণালী "কুক-প্রণালী" নামে অভিহিত হইয়া আজো কুকের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কুক দেখিলেন যে, এই প্রণালী নিউজীল্যাণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। কুক ইহা দ্বারা প্রমাণিত করিলেন যে, টাসম্যানের আবিষ্কৃত স্থলভাগ বিশাল দক্ষিণ মহাদেশের অংশ নহে। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ এই উভয় দ্বীপ সুন্দর-ভাবে জরীপ করেন। কুক নিউজীল্যাণ্ডকে উপনিবেশ স্থাপনের উপযোগী মনে করিয়া লিখিয়াছেন—"আমি এই দেশীয় লোকদের প্রতিভা যতদূর বিচার করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে মনে হয়, বৈদেশিকগণের পক্ষে এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা আদৌ কষ্টসাধ্য নহে; যেহেতু দেশীয় লোকেরা নিজেদের মধ্যে এতদূর বিভক্ত যে, সমবেতভাবে বাধাদানের চেষ্টা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।"

নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রতিষ্ঠা

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি কুক-প্রণালীর ভিতর দিয়া গমন করিলেন এবং অষ্ট্রেলিয়া বা তৎকালে কথিত নিউ হল্যাণ্ডের দিকে জাহাজ চালাইলেন। দুই দিনব্যাপী ঝড়ে জাহাজকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অনতিবিলম্বে তিনি নিউ হল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলের দর্শন পান। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তারিখে তিনি একটি উপসাগরে জাহাজ নঙ্গর করেন; তীরে বহুবিধ বৃহৎ-লতা-গুল্ম দেখিয়া তিনি এই উপসাগরের নামকরণ করিলেন "বোটানি বে।" তীরে অবতরণে দেশীয় লোকেরা বাধা দান করিল। সুতরাং কুক আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তীরে অবতরণ করেন।

বোটানি বে সম্বন্ধে কুক লিখিয়াছেন—"আমরা একটি উপসাগর আবিষ্কার করিলাম যাহা যে কোন প্রকার বায়ু-প্রবাহ হইতে আত্মরক্ষার পক্ষে উৎকৃষ্ট; আমি ইহার মধ্যে জাহাজ সহ প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলাম।"

কুক যেস্থানে অবতরণ করেন, সেখানে ৫।৬ ঘর বসতিপূর্ণ একটি গ্রাম ছিল। গ্রামবাসীরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য না করিয়া মৎস্য রন্ধনে ব্যস্ত ছিল। এই সম্বন্ধে কুক লিখিয়াছেন—"যখন আমরা পাহাড়ের নিকট উপনীত হইলাম, দুইটি লোক ১০ ফিট লম্বা বল্লম লইয়া নীচে নামিয়া আসিল; তাহারা আমাদিগকে যথাসাধ্য বাধা দানে কৃতসঙ্কল্প ছিল। অবশেষে ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধের পর দুইটি বন্দুকের গুলি ছোড়া হইল; অমনি তাহারা পলায়ন করিল। তাহারা বাড়ীতে গিয়া ফিতা ও মালা বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।" এইরূপে কাপ্তেন কুকের অষ্ট্রেলিয়ায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অবতরণ নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

এইবার কুক অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে বৃটিশ পতাকা উড্ডীন করিয়া রাজা জর্জের নামে উহার অধিকার গ্রহণ করেন এবং উহার নামকরণ করেন নিউ সাউথ ওয়েলস্। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরস্থ অন্তরীপের নামকরণ করেন কেপ ইয়র্ক।

পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিয়া কুক পোর্ট জ্যাকসন অতিক্রম করিয়া গেলেন—এই বন্দর ১৮ বৎসর পরে কমোডোর ফিলিপ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তিনি সিডনি কোভকে প্রথম বৃটিশ উপনিবেশের যোগ্যস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন, যেহেতু উহার ঝরণার জল উত্তম এবং নদীর উপকূলের সন্নিকটে জাহাজ নঙ্গর করিবার উৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যমান।

উপকূলভাগ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কুক উহাকে বালুকাময় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—বাস্তবিক উহা বোটানি বে অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

কুক উপকূলভাগের এত নিকট দিয়া অগ্রসর হইতে-ছিলেন যে, তিনি গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের অস্তিত্ব জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন নাই, যদিও উহা ঐ অঞ্চলে উপকূলের খুব নিকটেই অবস্থিত।

তিনি প্রথম প্রবাল দ্বীপ দেখিলেন; খুব সতর্কতা সহকারে জাহাজ চালাইয়াও তিনি অব্যাহতি পাইলেন না—জাহাজ হঠাৎ প্রবল শৈলশৃঙ্গে আহত হইল। এই সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক লিখিয়াছেন—"আমরা এই দুঃসংবাদ শুনিয়া শঙ্কিত হইলাম যে, জাহাজ মগ্ন শৈলে আহত হইয়াছে। * * * আমরা মগ্ন প্রবাল দ্বীপের উপর অবস্থিত—এই প্রবাল মগ্ন শৈল অত্যন্ত বিপজ্জনক যেহেতু, উহার প্রান্ত ভাগ সূচ্যগ্রবৎ ও উহার জাহাজ বিনষ্ট করিবার শক্তি খুব বেশী।"

অবস্থা নৈরাশ্যজনক প্রতীয়মান হইল; কিন্তু কঠোর চেষ্টার পর উহা মুক্ত হইল এবং গভীর জলে ভাসিয়া চলিল। পরে তীরে তুলিয়া দেখা হইল, দেখা গেল যে, —শৈল-চূড়া ছিপির মত জাহাজের তলদেশে বিদ্ধ হইয়া বিরাজিত।

ক্যাঙ্গারু আবিষ্কার

যখন জাহাজের সংস্কার চলিতেছিল, তখন তাঁহারা সকলে দেখিলেন—গ্রে হাউণ্ডের মত একটি প্রাণী দুই পায়ে ভর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে যাইতেছে। ইহার বর্ণ ইন্দুরের মত কিন্তু উহার গতি খুব দ্রুত। এইরূপে অষ্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট জন্তু ক্যাঙ্গারু অভিনয়-স্থানে উপনীত হইল।

এণ্ডেভার নদী পরিত্যাগ করিয়া কুক ব্যারিয়ার রিফের মধ্য দিয়া যাত্রা করিলেন; কিন্তু ইহাতে তিনি অধিকতর বিপদে পতিত হন। ব্যারিয়ার রিফের উপর পুনরায় তিনি বাণিজ্য-বায়ু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইলেন। এই পথ বর্তমানে তাঁহার নামে চলিতেছে। পুনরায় তিনি ঐ পথের মধ্য দিয়া গমন করত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কালাতিপাত করেন এবং অবশেষে টরেস প্রণালী অতিক্রম করিলেন। টরেস-প্রণালীর অস্তিত্বের কথা তিনি লোকমুখে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি লিখিয়াছেন—"সন্দেহজনক বিষয়কে সন্দেহমুক্ত ব্যতীত অন্য কোন প্রশংসার দাবী আমার নাই।" টরেস-প্রণালী নাবিকগণের পক্ষে সত্যসত্যই বিপজ্জনক; কিন্তু সৌভাগ্যবশত কুক কোনরূপ বিপদে পতিত হন নাই; ফলে তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে লিখিয়াছেন—"দক্ষিণ-পশ্চিমের তরঙ্গোচ্ছ্বাস আমাকে সন্দেহ মুক্ত করিয়াছিল যে, বর্তমানে আমি মুক্ত সমুদ্রের বুকে ভাসমান, এবং পশ্চিমাভিমুখে চলিতেছি।"

প্রত্যাবর্তন

অভিলষিত কার্য সম্পন্ন করিয়া কুক স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। অষ্ট্রেলিয়া পরিত্যাগ করিয়া কুক মালক্কা দ্বীপে অবস্থিত টাইমর নামক স্থানে নঙ্গর করেন। এই স্থানে ওলন্দাজদিগের সুদূর দুর্গ বর্তমান। অতঃপর তিনি যবদ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হয় এবং সুণ্ডা প্রণালী অতিক্রম করিয়া ব্যাটাভিয়া উপনীত হন। এই স্থানে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সম্ভবত এই প্রণালী মানচিত্রে ভুল দেখান হইয়াছে, অথবা তাঁহার দ্রাঘিমার নির্ধারণ ভ্রমসঙ্কুল। প্রকৃত পক্ষে তাহার নির্ধারিত দ্রাঘিমায় ৩ ডিগ্রি ভুল ছিল; ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে তৎপূর্ববর্তী নাবিকগণের নির্ধারিত দ্রাঘিমা কোন মতে বিশ্বাসযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে তাঁহাদের নির্দিষ্ট অক্ষরেখা খুব ঠিক ছিল।

ব্যাটাভিয়ায় জাহাজকে মেরামত করা হইল। কিন্তু উক্ত দেশের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু নাবিকগণের মধ্যে ম্যালেরিয়া-বিষ সংক্রামিত করিল। ফলে বহু নাবিক মৃত্যুমুখে পতিত হইল কিম্বা রোগে ভুগিতে লাগিল। এই দেশ সম্বন্ধে কুক লিখিয়াছেন—"ব্যাটাভিয়ার অস্বাস্থ্যকর বায়ু পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ব্যাটভিয়ায় অধিক সংখ্যক ইয়োরোপীয়ের মৃত্যুর কারণ।"

ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণে কুক তাঁহার দুই তিনজন অপরিত্যজ্য নাবিককে চিরবিদায় দানে বাধ্য হন।

মৃত্যুর করাল কবল হইতে মুক্ত হইয়া কুক অবশিষ্ট নাবিকগণ সব ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দ্রুতবেগে দেশের দিকে চলিলেন। পথে তিনি মাত্র কেপ টাউনে নঙ্গর করিয়াছিলেন। অবশেষে সুদীর্ঘ ভ্রমণের অবসানে কুক ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ক্রমশঃ

অভিশপ্ত মণি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ লাহা

(১)

আমি একটি অভিশপ্ত ইন্দ্রনীলমণি। কোন্ অতীতে খনির অন্ধকারগর্ভে আমার জন্ম হইয়াছিল, জানি না। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া চূণ-বালি-পাথরের সঙ্গে আমি ছিলাম অন্ধকারে ভূগর্ভের এক নিভৃত প্রদেশে। তারপর আসিল আমার জীবনে এক নব দিনের জাগরণ। হঠাৎ আলোক-রশ্মি দীর্ঘ কালের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া ফুটিয়া উঠিল আমার নয়নের পুরোভাগে। অতল গহ্বর হইতে আমি উঠিয়া আসিলাম ধরণীর শ্যামল বক্ষে। তখনও আমার দেহে সংলিপ্ত ছিল কত চূণ-বালির আবরণ। তারপর একে একে আবরণ খসিয়া পড়িল। আমি হইলাম দীপ্ত ভাস্বর জ্যোতিষ্মাণ—আমার অঙ্গের রক্তাভ-নীল জ্যোতিঃ লোকের মন মুগ্ধ করিল। আমি এক খনির মালিকের গৃহের অধিবাসী হইয়া রহিলাম।

কয়েক মাস পরে খনির মালিক আমাকে লইয়া চলিলেন ব্রহ্মদেশের রাজধানী পাগান সহরে। পথে কত বিচিত্র দৃশ্য দেখিলাম। কত বনবিহঙ্গের মধুর কূজন, কত পার্বত্য নির্ঝরিণীর কুলুকুলু ধ্বনি, কত পুষ্পিতা বল্লরীর অনুপম শোভা সারা পথে আমাকে আনন্দ দান করিয়াছিল। তারপর বিরাট্ ফটকের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলাম রাজধানীতে।

এইবার দেখিলাম পাগান সহরের রাজপথ। সেকি বিপুল লোক-কোলাহল, যান-বাহনের আনাগোনা, দোকানে দোকানে ক্রেতা-বিক্রেতার দরকষাকষি।

একদিন প্রভাতে প্রবেশ করিলাম রাজপুরীতে কত সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়া, কত রাজপারিষদের পার্শ্ব দিয়া, কত পরিচারক-পরিচারিকাকে অতিক্রম করিয়া। তারপর প্রবেশ করিলাম রাজার বিশ্রাম-কক্ষে। আমাকে দেখিয়া রাজার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাজা আমাকে স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং খনির মালিককে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দানের আদেশ দিলেন।

দুই বৎসর পরের কথা।

রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের বহির্ভাগে বিশাল দেবমন্দির নির্মিত হইতেছে দেখিলাম। দেবমূর্তিও গঠিত হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন আমাকে দেবতার ললাটে স্থাপিত করিল—আমি হইলাম দেবমূর্তির তৃতীয় নয়ন। মহাসমারোহে ঢাক, ঢোল, কাংস্য-করতাল, বেণু, বীণা প্রভৃতির মধুর ধ্বনি সহকারে পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। লক্ষ লক্ষ নরনারী ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

কালক্রমে ভিন্ন জাতির আক্রমণে রাজার রাজ্য লুপ্ত হইয়া গেল, রাজধানী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল; কণ্টক তরুগুল্মে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মন্দির জীর্ণ হইয়া গেল। আমি ভগ্ন মন্দিরের দেবতার ললাট-ফলকে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

(২)

বহু শত বৎসর অতীতের কোলে ঢলিয়া পড়িল। হঠাৎ দেখিলাম একদিন এক ইয়োরোপীয় পরিব্রাজক কণ্টক বন ভেদ করিয়া মন্দিরের দ্বারে উপনীত হইলেন। তিনি হস্তস্থিত বৈদ্যুতিক আলো প্রজ্বলিত করিয়া দেবমূর্তিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমার উপর আলোক রশ্মি নিপতিত হইতেই পরিব্রাজকের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই দিন আলোক নির্বাপিত করিয়া পরিব্রাজক চলিয়া গেলেন।

দুই দিন পরে আবার আসিলেন এইবার তাঁহার হস্তে একখানি শাণিত ছুরিকা। পরিব্রাজক ধীরে ধীরে দেবমূর্তির দিকে অগ্রসর হইলেন এবং অতর্কিতে আমারি পার্শ্বে দেবতার ললাটে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু ছুরিকা

কঠিন পাষাণ খণ্ড ভেদ করিতে পারিল না, ঠিকরাইয়া পড়িল। তখন পরিব্রাজক বাহিরে গিয়া তীক্ষ্ণধার বাটালি লইয়া আসিলেন এবং সেই বাটালি দেবতার ললাটে বসাইয়া দিয়া তাহার উপর প্রস্তর দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে বাটালির আঘাতে দেবমূর্তির ললাট-ফলক বিদীর্ণ করিয়া পরিব্রাজক আমাকে তাঁহার হস্তগত করিলেন এবং আনন্দ-প্রফুল্ল মুখে দেবমন্দির ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। আমি শুনিলাম—জীর্ণ মন্দির প্রতি-ধ্বনিত করিয়া দেবতার অভিশাপ-বাণী উচ্চারিত হইতেছে —"আমার তৃতীয় নয়ন যাহার কাছে যাইবে তাহাকে ধ্বংস করিবে।"

(৩)

পরিব্রাজকের সঙ্গে আমি চলিলাম সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সুদূর ফরাসী দেশে। পথে দেখিলাম ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ আর নিম্নে অন্তহীন নীল জলধি। মনে পড়িল কবির কথা :—

"নীলিমায় নীলিমায়
মহিমায় মহিমায়
মিশাইয়ে পরস্পরে মহা আলিঙ্গন ;
মহা দৃশ্য—অনন্তের অনন্ত মিলন।"

অবশেষে আসিলাম শ্বেতাঙ্গ নরনারীর দেশে। ফরাসী দেশের ঐশ্বর্য-সম্পদ্, জনকোলাহল, মূর্তি-পরিশোভিত উদ্যান-মালা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সন্ধ্যায় সীন নদীর তীরে তীরে প্যারিশের উপকণ্ঠে বিলাস-প্রসাধন-সজ্জিত নর-নারীর সঙ্গে কত আনাগোনাই চলিল। অবশেষে একদিন প্রবেশ করিলাম রাজ-প্রাসাদে। ফরাসী সম্রাটের সম্মুখে নীত হইলাম ; আমাকে দেখিয়া ফরাসী সম্রাট্ হর্ষোৎফুল্ল নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমার দেহাভ্যন্তর হইতে যে রক্তাভ-নীল দ্যুতি নির্গত হইতেছিল তাহা দেখিয়া সম্রাট্ বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। শেষে আমার মূল্যস্বরূপ পরিব্রাজককে এক লক্ষ ফ্রাঁ দেওয়ার আদেশ প্রদান করিলেন। পরিব্রাজক টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন, আমি স্বর্ণহারে গ্রথিত হইয়া সম্রাজ্ঞীর কণ্ঠদেশে দুলিতে লাগিলাম।

পরিব্রাজক মনে করিয়াছিলেন আমার বিক্রয়লব্ধ অর্থে শেষ জীবন সুখে শান্তিতে কাটাইবেন কিন্তু দেবতার অভিশাপ পরিব্রাজকের ললাটে সুখশান্তি লেখে নাই ; ফলে কয়েক দিন পরে পরিব্রাজকের পুত্র পিতার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়া গেল। পরিব্রাজক অর্থ-শোকে এবং পুত্রের দুর্ব্যবহারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কালবশে ভাবাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে অর্থ-লোভী পরিব্রাজক আবার কোন দেবমূর্তির দেহ হইতে রত্নরাজি অপহরণের অভিলাষে পুনরায় তিব্বত যাত্রা করিলেন। কিন্তু দেবতার অভিশাপ মৃত্যুদূতের মত পরি-ব্রাজকের অনুসরণ করিতেছিল। সুতরাং দক্ষিণ তুর্কীস্থান অতিক্রম করিবার সময়ে এক নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একদল বন্য কুকুর তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরগণকে আক্রমণ করে। অনুচরগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল কিন্তু পলায়নে অক্ষম পরিব্রাজককে কুকুরগুলি দংষ্ট্রাঘাতে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া নিহত করিল।

(৪)

ফরাসী সম্রাটের অন্তঃপুরে আমার দিন বেশ সুখে কাটিতে লাগিল। একদিন সম্রাজ্ঞী আমাকে তাঁহার কন্যার গলায় পরাইয়া দিলেন। রাজকন্যার কণ্ঠদেশে আমার দিন বেশ সুখে কাটিতে লাগিল।

সহসা একদিন রজনীভোরে জাগিয়া দেখি সহরের প্রজাবৃন্দ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হইল। সংক্ষুব্ধ জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল। কি সে ভয়াবহ দৃশ্য! প্রাসাদের সর্বত্র মারামারি কাটাকাটি খুনাখুনি চলিতে লাগিল। প্রাঙ্গণে অলিন্দে উদ্যানপ্রান্তে রক্তের ঢেউ খেলিয়া গেল। প্রাসাদ-রক্ষিগণ প্রাসাদ রক্ষায় অসমর্থ হইয়া একে একে জনতার হাতে প্রাণ দিল এবং উন্মত্ত জনমণ্ডলী রাজা এবং রাজপরিবারকে বন্দী করিল। সম্রাট্-সম্রাজ্ঞী-রাজকন্যা একে একে সকলেই ঘাতকের কুঠারতলে আত্মবিসর্জন করিল। দেখিলাম কি সে ভীষণ দৃশ্য—একদিকে বন্দীদের করুণ আর্তনাদ

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে রাজকন্যার কণ্ঠদেশ হইতে একটি ঘাতক আমাকে অপহরণ করিল।

দুই তিন দিন পরে ঘাতকটি আমাকে এক মণিকারের দোকানে বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিল। কিন্তু সেই অর্থ তাহার ভোগে লাগিল না। যে ঘাতক শতসহস্র নরনারীর মস্তকচ্ছেদন করিয়াছে মৃত্যু তাহাকেও অব্যাহতি দিল না—হতভাগ্য অর্থ লইয়া গৃহে ফিরিবার সময়ে প্রচুর মদ্যপান করিয়া মাতাল হইয়া উঠে এবং অশ্বচালিতযানের নিম্নে পড়িয়া ইহজীবনের অবসান করিল।

(৫)

প্যারিসের উজ্জ্বলালোকমণ্ডিত রাজপথের পার্শ্বে মণিকারের শো-রুমে মূল্যবান ভেলভেট-খচিত কাস্কেটে আমি শোভা পাইতে লাগিলাম। কত বিচিত্র পরিচ্ছদ-পরিহিত নরনারী আমাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত; অনেকে মণিকারের সঙ্গে আমার মূল্য লইয়া দরকষাকষি করিত। কিন্তু কেহই মণিকারের প্রার্থিত মূল্য দিয়া আমাকে ক্রয় করিতে পারিল না।

তিনমাস পরের কথা।

রাত্রি তখন প্রায় তিনটা। উৎফুল্ল প্যারিস নগরী আমোদ-প্রমোদের অবসানে সুপ্তি-ক্রোড়ে নিমগ্ন। হঠাৎ নিস্তব্ধ পল্লী মুখরিত করিয়া ঝনঝন শব্দে মণিকারের দোকানের লৌহ কপাট উন্মুক্ত হইল, প্রবেশ করিল একদল মুখোশধারী লোক। তাহারা মণিকারের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিল, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও লইয়া গেল। মণিকার নিঃস্ব অবস্থায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিল।

দস্যুদলের সমভিব্যহারে আমি স্পেনে উপনীত হইলাম। পিরেনিজ পর্বতের এক গহ্বরে দস্যুদল লুণ্ঠিত ধনরত্ন নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইল। আমি দস্যুদলপতির ভাগে পড়িলাম। দস্যুদলপতি আমাকে মাদ্রিদ সহরে লইয়া গেল এবং একজন ইংরাজ বণিকের নিকট ৩০ হাজার পাউণ্ডে বিক্রয় করিল, কিন্তু বিক্রীত অর্থ লইয়া স্বীয় গৃহে গমন করিবার পথে দস্যুদলপতি ধৃত হইল এবং বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হইল।

ইংরাজ বণিক্ আমাকে লইয়া পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইলেন। তিনি উত্তর মেরুর নিশীথ সূর্য্য দেখিবার জন্য উত্তর অন্তরীপে যাত্রা করেন। গ্রীণল্যাণ্ডের অদূরে জাহাজ তুষার-স্তূপে আহত হইয়া জলমগ্ন হয়। বণিক্ অতিকষ্টে প্রাণ লইয়া ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে বণিক্ তাঁহার একমাত্র সম্বল আমাকে বিক্রয় করিবার জন্য লণ্ডনের অন্য একজন ধনী বণিকের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। পরের দিন সেই বণিক্ আসিলে আমাকে লইয়া অনেক কথাবার্তা চলিল অবশেষে দুই হাজার পাউণ্ডে আমাকে বিক্রয় করাই সাব্যস্ত হইল। বণিকের সঙ্গে টাকা না থাকায় তিনি পরদিন টাকা লইয়া আসিবেন বলিয়া চলিয়া যান কিন্তু সেই কালরাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই আমার বর্তমান প্রভু হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোকের পথে যাত্রা করেন।

পরদিন বণিক্ টাকা লইয়া আসিয়া দেখিলেন আমার মালিক পর্ণশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তিনি আমার মালিককে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাঁহার জীবনের চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে বহুক্ষণ। তখন তিনি আমার মালিকের কোটের পকেট হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিলেন এবং আমাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে পকেটে ফেলিয়া রাজপথে বাহির হইলেন। হতভাগ্য মৃত বণিকের দিকে আর ফিরিয়াও তাকাইলেন না।

আবার আমি লণ্ডনের রাজপথের ধারে বণিকের হীরাজহরতের দোকানে প্রদর্শনী-কক্ষে স্থান পাইলাম। তিন দিন পরে একটি আমেরিকান মহিলা দোকানে আসিয়া আমাকে দেখিয়া পছন্দ করিলেন এবং অনেক অর্থ দিয়া আমাকে ক্রয় করিলেন।

আমি চলিলাম আটলান্টিক মহাসাগরের পরপারে। ছয় দিন ছয় রাত্রি অনন্ত নীল সাগরের বুকে ভাসিয়া রহিলাম এক অর্ণবযানে; সপ্তম দিবসে নিউইয়র্কে উপনীত হইলাম।

নিউ ইয়র্ক হইতে চলিলাম প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে কালিফোর্নিয়ায়। পথে দেখিলাম কত বিচিত্র দৃশ্য—সুদীর্ঘ তৃণমণ্ডিত প্যারী দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত তাহাতে

কত বন্য গো মহিষ বাইসন প্রভৃতি চরিয়া বেড়াইতেছে, গোচো এই বন্য জন্তুগুলিকে ধরিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে।

তারপর দেখিলাম রকী পর্বতের ভীমগম্ভীর দৃশ্য। পর্বতবক্ষ ভেদ করিয়া, সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিল। রেলপথের দুই পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল; দীর্ঘদেহ বনস্পতি আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান; কোথাও পার্বত্য কৃষকের কুটির; তাহার পার্শ্বে কুলুকুলু রবে বহিয়া চলিয়াছে পার্বত্য নির্ঝরিণী; কখন আত্মপ্রকাশ করিল ভীষণ জলপ্রপাত; শত শত বজ্রধ্বনিকে উপেক্ষা করিয়া তাহার গম্ভীরনিনাদ আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইল। অবশেষে ক্যালিফোর্ণিয়ার প্রধান সহর সানফ্রানসিস্‌কোতে উপনীত হইলাম।

তিনদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থ দিবসে মহিলাটি স্বপ্ন দেখিলেন—এক ভীমকায় মূর্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—"তুই শীঘ্র আমার ললাটের মণি প্রত্যর্পণ কর নতুবা সর্বনাশ হইবে।" মহিলাটি তাহাতে তেমন বিচলিত হইলেন না কিন্তু সেইদিন অপরাহ্ণে যখন তাঁহাদের বাণিজ্য-জাহাজ ডুবিবার খবর আসিল তখন তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সেই দিন তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার গৃহে বেড়াইতে আসিয়া আমাকে দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং আমাকে লাভ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন আমার অধিস্বামিনী আমাকে সাগ্রহে হস্তান্তরিত করে।

আমি আর এক ধনবতী মহিলার গৃহে আগমন করিলাম। তিনি আমাকে কণ্ঠহারের মধ্যমণিরূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাড়ীতে বহু উৎসব, বহু নৃত্যগীত, বহু উদ্যান সম্মিলন ও প্রীতিভোজে আমি উপস্থিত ছিলাম; বেশ সুখে দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ এক রাত্রিতে মহিলা স্বপ্ন দেখিলেন—পাগানের জঙ্গলের দেবতা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিল,—"দে আমার ললাটের মণি ফিরাইয়া দে নতুবা তোর সর্বনাশ হইবে।" ঘুম ভাঙ্গিলে মহিলা জাগিয়া উঠিলেন এবং স্বপ্নের বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন হয়ত স্বপ্নের মধ্যে কোন সত্য নিহিত রহিয়াছে। এই রত্ন কাছে রাখিলে কোনরূপ অমঙ্গল হওয়া বিচিত্র নহে। আবার পরক্ষণে ভাবিলেন—স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র; সুতরাং তদনুসারে কাজ করা মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে—এই ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

তিনদিন পরে তাঁহার একমাত্র কন্যা বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকে প্রস্থান করিল। সেইদিন রাত্রে দেবতা আবার মহিলাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য বলিল, কিন্তু মহিলা তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

সাত দিন পরে মহিলাটির স্বামী মোটর-দুর্ঘটনায় আহত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন এবং দশ দিন পরে ভবের খেলা সাঙ্গ করিলেন। স্বামীর মৃত্যু-দিবস রাত্রে মহিলাটি আবার স্বপ্ন দেখিলেন—দেবতা আবার রক্তিম চক্ষে তাঁহাকে বলিতেছেন—"এখনও তুই আমাকে ফিরিয়ে দিলিনে তোর আরও কি সর্বনাশ হয় দেখ।" নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া মহিলা আমাকে সজোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"না না তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না তাতে আমার যত সর্বনাশই হউক।" আজও আমি এই মহিলার নিকটে অবস্থান করিতেছি। জানিনা আবার কবে ভগ্ন মন্দিরে দেবতার ললাটে স্থান পাইব!

ত্রিশ বৎসরব্যাপী কৃষিসম্বন্ধীয় গবেষণা

ইম্পিরিয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্যবিবরণ

বিগত ত্রিশ বৎসরে ইম্পিরিয়্যাল অ্যাগ্রিকাল্‌চ্যারাল ইন্‌ষ্টিটিউটের পিছনে যে ব্যয় হইয়াছে, বিগত এক বৎসর কৃষকদিগের কৃষিকার্যে যে আয়-বৃদ্ধি হইয়াছে উহা উক্ত ব্যয়ের সমান।

এই উক্তি ইম্পিরিয়্যাল অ্যাগ্রিকালচ্যারাল ইন্‌ষ্টি-টিউটের ১৯৩৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার কার্য-বিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবস হইতে ইহা যে সকল বৈজ্ঞানিক কার্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণার ধারা প্রথমাবধি অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার উপর দৃষ্টি রাখিয়া নির্বাহিত হইয়াছে, সুতরাং উহার লক্ষ্য ছিল শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি।

জমির উৎকর্ষবিধায়ক উপযুক্ত সার সমবায়ে গাছের খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি, উন্নত-প্রণালীর ও বিভিন্ন প্রকারের শস্য উৎপাদন, বৃক্ষ-রোগসমূহের নিরাকরণ ও তাহাদিগের হাত হইতে বৃক্ষসমূহের রক্ষাবিধান ও পতঙ্গের আক্রমণ হইতে শস্যরক্ষা—উল্লিখিত উপায়সমূহ অবলম্বনে শস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে।

উন্নত ধরণের বিভিন্ন প্রকারের শস্যবীজ উৎপাদন ও প্রদান দ্বারা কৃষকদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করা হইয়াছে। কৃষকেরা বিভিন্ন প্রকার উন্নত ধরণের বীজ আসিতে দেখিয়া উহার সুযোগ গ্রহণে বিমুখ হয় নাই; বর্তমানে কোটি কোটি একর জমিতে বিভিন্ন রকমের শস্য উৎপন্ন হইতেছে।

পুষার গম ৬০ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয় এবং মোট গম চাষের ২০% পুষা গম চাষ হইতেছে। কয়ম্বাটুরের শাখা প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন ইক্ষু দেশীয় ইক্ষুর ৭০% স্থান অধিকার করিয়াছে।

পূর্বে ভারতে ১০ লক্ষ টন ইক্ষু বাহির হইতে ক্রয় করিতে হইত। কয়ম্বাটুর ইক্ষুর উৎপাদনে বর্তমানে ভারতের চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত ইক্ষু ভারতেই উৎপন্ন হইতেছে। কয়ম্বাটুর শাখা প্রতিষ্ঠান কাঁচা মাল সরবরাহ না করিলে, শুল্ক যত উচ্চে নির্ধারিত থাকুক না কেন, উহাতে দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধিত হইত না।

ভারতের উৎপন্ন ইক্ষুর ⅔ অংশ গুড় তৈয়ারী কার্যে ব্যবহৃত হয়। গুড় উৎপাদনেও একটি নব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। উহাতে কাঁচা রসকে জ্বাল দিয়া ঘনীভূত করিবার পূর্বে কাঠ কয়লা, তুষ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত ছাকনি দ্বারা পরিষ্কৃত করা হয়। ইহাতে রসের শুদ্ধি নিষ্পন্ন হয় এবং ঘনীভূত করিয়া জমাইয়া রাখিবার সময় উহাকে পরিষ্কৃত করে ও বর্ণ বিনষ্ট হইতে দেয় না।

আর একটি বিশিষ্ট উন্নতি গানটুরে চুরটের তামাকের উৎকর্ষ সাধন। ইহাও এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় সম্ভবপর হইয়াছে। ইহাতে যে কেবল সিগারেটের উপযুক্ত তামাক পাওয়া যাইতেছে তাহা নয়, পরন্তু বিশিষ্ট অনু-সন্ধানের ফলে ভারতীয় আবহাওয়ায় উক্তরূপ তামাক উৎপাদন করা হইয়াছে।

বহু বৎসরের গবেষণার ফলে তিনটি কুটির-শিল্পে বিশিষ্ট উৎকর্ষ দেখা গিয়াছে—উহা লাক্ষা, রেশম ও মৌমাছি পালন; উহাতে সাধারণত পতঙ্গের উপর বেশী নির্ভর করিতে হইলেও, বর্তমানে উহাদিগকে অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান সম্ভব হইয়াছে।

ইন্‌ষ্টিটিউট প্রথম হইতে মিশ্রচাষের পরিকল্পনা করিয়াছিল। ভারতীয় কৃষির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ জমি ও পশুর পরস্পর সমতা রক্ষণের উপর নির্ভর করে। জমির উর্বরতা সম্বন্ধীয় পরীক্ষা এই প্রথা সমীচীন বলিয়া নির্ণয় করিয়াছে। জমির উৎপন্ন শস্য পশুকে আকার করাইয়া এবং পশুর মলমূত্র জমিতে সাররূপে প্রয়োগ করিয়া কেবল-মাত্র জমির উর্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি ও রক্ষা করা সম্ভব-তাহা

নহে, পরন্তু, প্রত্যেকটিকে স্বতঃসম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করা চলে। পুষা কৃষিক্ষেত্রে কেবলমাত্র গোবরের সঙ্গে ফসফেট মিশাইয়া ১৫ বৎসরে ৪১৩ একর জমির উর্বরতা-শক্তি এমন বৃদ্ধি করা হইয়াছিল যে, উক্ত জমির উৎপন্ন দ্রব্যে ৩০০—৩৫০টি পশুর স্বচ্ছন্দে আহার-যাত্রা নির্বাহ হইত। এতদ্ভিন্ন ইক্ষু এবং দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধও উহা হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

পশুপালের উন্নতিরও বিশিষ্ট ফল দেখা গিয়াছে। নিউ দিল্লীতে শাহীওয়াল পশুর যে বংশলতিকা রহিয়াছে, তারা বিচারপূর্বক নির্বাচন, খাওয়ান ও জন্মদানের ফল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ২২ সের দৈনিক দুধ দেয় এমন গাভী লইয়া কার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। বর্তমানে উহার দুগ্ধের পরিমাণ দৈনিক ১০২ সের।

পশুপালের মধ্যে অল্প বয়সে জন্মক্ষমতা লাভের জন্য বর্তমানে গবেষণা চলিতেছে। এই সম্বন্ধে সুফলও কথঞ্চিৎ লাভ করা গিয়াছে। পূর্বে প্রজননকাল বৃষের পক্ষে তিন বৎসর ও বকনার পক্ষে ২২ বৎসর ছিল; বিশেষ খাদ্যের প্রভাবে উহা কমাইয়া বৃষের পক্ষে ১ বৎসর ৭ মাস ও বকনার পক্ষে ১২ বৎসর পর্যন্ত নামিয়াছে। এই সমস্ত গাভীর দুগ্ধ অল্প নহে—পূর্ণযৌবনা গাভীর সমান—কোন কোন স্থলে বরং বেশী।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি একটি বিশেষ কথা। এই দিকেও গবেষণা চলিতেছে, জমির উৎপাদন-শক্তিবৃদ্ধিকল্পে সার প্রয়োগের খরচ—উহার প্রধান বাধা।

সারের মধ্যে নাইট্রেট্স্ ও ফস্ফেটস্ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত দ্রব্য সস্তায় পাইলে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া খুব সোজা। ভারতীয় জমির স্বাভাবিক ক্ষতিপূরণ-ক্ষমতা অন্য কোন নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের জমি অপেক্ষা বেশী, সুতরাং এই প্রক্রিয়াকে চাষের উৎপাদন-কৌশল দ্বারা আয়ত্ত করা সহজ। ফস্ফেটস্ সম্বন্ধে বলা যায় যে, হাড়ের গুঁড়াই বিশেষ প্রচলিত। কিন্তু উহার ব্যাপকতা হাড় প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে। স্বল্প ব্যয়ে ফস্ফেট দেওয়ার প্রথা এই যে, জমি যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া দেওয়া;—পশুরা যাহা খায়, গোবরের দ্বারা তাহার শতকরা ৯০ ভাগ ফস্ফেট জমিতে ফিরিয়া আসে।

পতঙ্গ ও ব্যাধির নিবারণকল্পে যথেষ্ট গবেষণা চলিতেছে। পতঙ্গের দ্বারা বার্ষিক যে শস্য নষ্ট হয় উহার আনুমানিক মূল্য ৫০০০ লক্ষ টাকা।

উপযুক্ত ছাত্রকে শিক্ষাদানও এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস খোলার পর ১০৪ জন ছাত্র ভর্তি হইয়াছিল। ১২ জন চাকুরীর জন্য পড়া শেষ না করিয়া চলিয়া গেল। ৬৭ জন শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ২৫ জন এখনও অধ্যয়ন করিতেছে।

বর্তমান বর্ষে নিউ দিল্লীতে নিজস্ব গৃহে প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত হইয়াছে। পুষায় ইহার ল্যাবরেটরী বিহার ভূমিকম্পে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

এই ইনষ্টিটিউট বর্তমানে ছয়টি প্রধান বিভাগে বিভক্ত;—কৃষি, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জমি-বিজ্ঞান ও রসায়ন, কীটতত্ত্ব, বৃক্ষ-রোগ-নিদানতত্ত্ব এবং ইক্ষু উৎপাদন। এই বিভাগ কয়ম্বাটুরে অবস্থিত। দিল্লী হইতে ৭৬ মাইল দূরে কর্ণালে কৃষি-বিভাগের শাখা বর্তমান। উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার শাখা পুষায় অবস্থিত এবং গাণ্টুরে তাহাদের পরীক্ষা কেন্দ্র বর্তমান এবং সিমলায় আলুর চাষ করা হয়। ইক্ষু বিভাগের শাখা কর্ণালেও আছে, উহাতে পরীক্ষা ও নির্বাচন হইয়া থাকে।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

নিব তৈয়ারী

যে লৌহ নির্মিত নিব দিয়া আমরা লিখি উহার উৎকর্ষ নির্ভর করে উহার মসৃণতার উপর। যদি লিখিবার সময় উহা কাগজের উপর আঁচড় কাটে, তবে উহা ভয়ানক দোষাবহ। এই দোষ দূর করিবার জন্য বর্তমান নিব তৈয়ারীর কারখানায় মাইক্রোফোন ও লাউড স্পীকারের সাহায্যে নিবকে পরীক্ষা করা হয়। যদি নিবে কোন দোষ থাকে যে উহা আঁচড় কাটে, তবে উহার আঁচড় কাটার শব্দ বজ্রধ্বনির মত শোনা যাইবে। সেই হেতু

বিশেষজ্ঞের দ্বারা বিশিষ্টভাবে পরীক্ষার পর কোন প্রকার নিব বাজারে বাহির করা হইয়া থাকে।

টিট্-বিট্স্

ইলিশ মৎস্যের তৈল বনাম কড লিভার অয়েল

আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ কডলিভার অয়েল ইয়োরোপ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। যাহারা অপুষ্ট, যাহাদের ফুসফুসের দোষ আছে তাহাদের পক্ষে ইহা মহোপকারী। কড মৎস্য ধরিয়া তাহার যকৃৎ বাহির করিয়া তাহা হইতে পিত্তকোষ নিষ্কাশন পূর্বক আধারে রাখিয়া বাষ্প দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। কিছুক্ষণ পরে যকৃৎ হইতে তৈল বাহির হইতে পাকে। তাহা হইতে চর্বি বাহির করিয়া ও ফিল্টার করিবার পরে তৈল বোতলে বন্ধ করিয়া বিক্রয় হয়। এই ব্যবসায়ে নরওয়ে দেশের অধিবাসীদের প্রচুর লাভ হইয়া থাকে।

আমাদের দেশেও এই শিল্প চলিতে পারে। আমাদের দেশে ইলিশ মৎস্যের যকৃতে যে সকল গুণ আছে তাহা কড মৎস্যের অনুরূপ। বিখ্যাত চিকিৎসকগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা বিদেশে অর্থ না পাঠাইয়া যদি বাংলা দেশের সমুদ্রের নিকট কারখানা স্থাপন করিয়া ইলিশ মাছের তৈলের কারখানা খুলিতে পারি তবে আমাদের দেশের অনেক অর্থ দেশে থাকিতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন ইলিশ মৎস্যের তৈলে 'ক' শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণ ব্যতীত, ইহার রোগ জীবাণু নষ্ট করিবার শক্তি আছে। কাশি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে ইহা উপকারী, ইহা জীবনী শক্তি প্রদান করে। আমরা আশা করি কোনও উদ্যমশীল ব্যক্তি এই শিল্পের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন।

সঞ্জীবনী

পরলোকে সাহিত্যিক রাধাচরণ চক্রবর্তী

বিগত ৩২শে শ্রাবণ, বুধবার রাত্রি ১১টায় সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্তী ৪৫ বৎসর বয়সে বেরি-বেরি রোগে আক্রান্ত হইয়া হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজসাহী জেলার নাটোরের চৌকি পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺হরিচরণ চক্রবর্তী খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

রাধাচরণ বাবু 'কেয়া', পঞ্চপ্রদীপ', 'বঙ্গলক্ষ্মী', অগ্নি, 'জলছবি' প্রবৃতি মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

তাঁহার রচিত উপন্যাস—'হোয়াইট কেবিন' 'সাওন' 'ঘরমুখনী' 'তপ ও তাপ' 'মৃগয়া' 'জড়;' গল্পের বহি—'বুকের ভাষা' 'বৈরাগির চর' 'চক্রবাক' এবং কবিতার বহি—'আলেয়া', 'দীপা' 'পল্লব' 'তিলক ধারী' সুধীজনের প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

তিনি বিধবা পত্নী ও তিন পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুরঞ্জিকা

ভারতে মোটর গাড়ী নির্মাণ প্রচেষ্টা

সর্বপ্রথমে বাংলা দেশেই মোটর গাড়ী নির্মাণের জন্য প্রস্তাব হয়। কয়েকজন উৎসাহী এই মোটর গাড়ী নির্মাণের কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহারা মূলধনের জন্য ভারতের নানাস্থানে গমন করেন। এই কারখানা স্থাপনের কথা অবগত হইয়া বোম্বাইর ব্যবসায়ি-গণ মোটর গাড়ীর কারখানা স্থাপন করিতে মনস্থ করে। সার এম বিশ্বেশ্বরায়া এই জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা দেশের মোটর গাড়ীর কারখানা পরিদর্শন করিতে যান। শীঘ্রই এবিষয়টি নানা প্রদেশের শিল্পমন্ত্রীদের কনফারেন্সে উপস্থিত করা হইবে এবং সম্ভবতঃ বোম্বাই প্রদেশে মোটর গাড়ীর কারখানা স্থাপিত হইবে। যদিও বাংলা দেশ মোটর গাড়ীর সর্বাপেক্ষা বড় ক্রেতা ও এই কারখানা স্থাপন করার পরিকল্পনা বাংলা দেশই করিয়াছে তথাপি বাংলা দেশে এই কারাখানা স্থাপনের আর কোনও চেষ্টা নাই। এদেশে মোটর গাড়ী নির্মিত হইলে ভারত হইতে যেমন বহু অর্থ বিদেশে যাওয়া বন্ধ হইবে তেমনি বাংলায় মোটর গাড়ীর কারখানা হইলে বাংলা দেশ সমৃদ্ধশালী হইতে পারিত, বহু শিক্ষিত বাঙালী চাকরী

পাইবে। এই প্রস্তাব হইয়াছিল যে, জামশেদপুর হইতে মোটর গাড়ীর অংশ সকল তৈয়ারী করিয়া আনাইয়া কলিকাতার সন্নিকটে উহা সম্মিলিত করিয়া গঠন করা হইবে।

বাংলায় সাইকেল নির্মাণ করিবার জন্য এক সময়ে কলিকাতায় সাইকেল আমদানীকারকগণ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। বাঙালী মহাজন ও ধনিগণ যদি এই কারখানা স্থাপন করেন তবে এই কারখানায় প্রভূত লাভ হইতে পারে। আমরা সে বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া বিদেশ হইতে সাইকেল আনাইয়া দেশের অর্থ স্বেচ্ছায় বিদেশে পাঠাইতেছি। ঐরূপ এদেশে মোটর সাইকেল তৈয়ারী হইতে পারে। কিন্তু এসকল কারবারের প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে না। কিছুকাল পরে যখন বোম্বাইর ধনিগণ মোটরগাড়ী, সাইকেল প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করিয়া বহু বোম্বাইবাসীর বেকার-সমস্যা দূর করিবে তখনও আমরা বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলা দেশে অস্থির হইয়া পড়িব!

এ সকল কারখানা অবিলম্বে স্থাপন করার জন্য ব্যবস্থা করিলে বাঙালীর তাহা গৌরবের জিনিষ হয় এবং আয়ের পথ হয়। সুলভে ঐ সকল যান পাওয়া যাইবে, তাহার ফলে অনেকেই তাহা ক্রয় করিতে পারিবে। বাঙালী ধনিগণ কি এই সকল শিল্পে অর্থ নিয়োজিত করিবেন?

সঞ্জীবনী

স্বর্গীয় মাণিকলাল দত্ত

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(১)

স্বর্গীয় মাণিকলাল দত্ত হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার অধিবাসী। তিনি জাতিতে সুবর্ণবণিক্। তাঁহার পিতার নাম ৺বিশ্বম্ভর দত্ত, তাঁহার পৈত্রিক বাসভবন শ্রীরামপুরের রাজা কিশোরীমোহন গোস্বামী ষ্ট্রীটে অবস্থিত।

শ্রীরামপুরের অধিবাসী হইলেও কলিকাতা সহরেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন। কলিকাতায় তিনি বিশ্বনাথ মতিলাল লেনস্থ বাড়ীতেই থাকিতেন।

রাধাবাজারে জে দেব এণ্ড কোং নামে তাঁহার চুরটের দোকান ছিল। এই দোকান বেশ চলতি কারবার ছিল এবং উহা হইতে তাঁহার প্রভূত আয় হইত। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে দীর্ঘকাল উক্ত দোকান বন্ধ ছিল। দোকান বন্ধথাকাকালে তিনি এক দিন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ মহাশয়ের বাড়ী আগমন করত তাঁহার হাতে দোকানের চাবি দিয়া উক্ত দোকানের আসবাবপত্র সমুদয় বিক্রয় করিতে বলেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সপ্তগ্রাম উদ্ধারণ দত্ত স্থায়ী সেবা ভাণ্ডারে প্রদান করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে উপেনবাবু উক্ত দোকানের বিক্রয়লব্ধ অর্থে সপ্তগ্রাম শ্রীপাট উদ্ধারণ দত্ত স্থায়ী সেবা ভাণ্ডারে ৩॥০ টাকা সুদী ৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া দিয়াছেন।

তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁহার পত্নী তাঁহার জীবিতকালেই স্বর্গারোহণ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণ করেন নাই বা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন নাই।

তিনি ১৩৩৪ সালে ১৫ই ও ১৬ই পৌষ তারিখে অনুষ্ঠিত কলিকাতায় বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর অধিবেশনের অব্যবহিত পরে পরলোক গমন করেন।

মৃত্যুর পূর্বে ১৯২৭ সনের ১২ই আগষ্ট তারিখে তিনি একটি উইল ও কডিসিল দ্বারা তাঁহার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর

সম্পত্তি দেবসেবা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় সুপরিস্ফুট। এই দানের পরিমাণ আনুমানিক ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। বঙ্গদেশের অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেল এই উইলের এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টী। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল পাইন, সলিসিটার, শ্রীযুক্ত কনকচন্দ্র বড়াল এম বি, ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দে—এই তিনজন এই উইলের সাক্ষী। এই উইল ১৯২৭ সনের ১৩ই আগষ্ট তারিখে বেলা ১টার সময় কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার অব অ্যাসিউরেন্সের নিকট রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে।

কলিকাতায় ৩১নং হিদারাম ব্যানার্জি লেন, ৭১১,৯ ও ৯১২ নং বাবুরাম শীলের লেন, ২১৩ নং বিশ্বনাথ মতিলাল সেন, এবং ২নং কৃষ্ণলাহা লেনস্থ বাটী, শ্রীরামপুরে রাজা কিশোরী মোহন গোস্বামী ষ্ট্রীটস্থ বসতবাটীর অর্দ্ধাংশ, বেনিয়াপাড়া লেনস্থ জমির অর্দ্ধাংশ ও শ্রীরামপুর বাজারে অবস্থিত তিনখানি দোকান ঘরের অর্দ্ধাংশ তাঁহার উইলের স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, গভর্ণমেণ্ট বণ্ড, জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর অংশপত্র, ডিবেঞ্চার, স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার, হীরাজহরৎ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে উইলের মর্ম উদ্ধৃত হইল :—

"১। আমি এতদ্দ্বারা আমার পূর্ব্বকৃত উইলসমূহ প্রত্যাহার করিতেছি এবং ১৯২৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের উইল বাতিল করিতেছি। ইহাই আমার শেষ উইল।

* * * *

"৫। ৩১নং হিদারাম ব্যানার্জি লেনস্থ বাটীতে আমি ঠাকুর রাধাকান্ত জিউ ও গোপাল জিউ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। পরবর্ত্তী নির্দ্দেশ মত অন্য ঠাকুর বাটী প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত এই বাটী ঠাকুরবাটীরূপে ব্যবহৃত হইবে, এবং ইহার দ্বারদেশে 'মাণিকলাল দত্ত প্রতিষ্ঠিত সৌদামিনী

"৬। আমি নির্দ্দেশ করিতেছি যে আমার সম্পত্তি হইতে ৪৫০০০্ কলিকাতা সহরে কমবেশ ৪।৫ কাটা জমি ক্রয়ের জন্য ও রাধাকান্তজিউ ও গোপাল জিউ ঠাকুরদ্বয়ের বাসস্থানের জন্য বাটীপ্রস্তুতার্থ অথবা ৪।৫ কাঠা জমির উপর কোন নূতন প্রস্তুত বাড়ী উপরোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার উপযোগী বিশিষ্ট ভদ্রপল্লীতে ক্রয়ের জন্য পৃথক করিয়া রাখিবেন। উক্ত ঠাকুরবাটী নির্ম্মিত বা ক্রীত হইলে উহার দ্বারদেশে "মাণিকলাল দত্ত প্রতিষ্ঠিত সৌদামিনী দাসী ঠাকুরবাটী" এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ ফলক স্থাপন কারতে হইবে। এই বাটী ও উহার সংলগ্ন জমি ঠাকুর রাধাকান্তজিউ ও গোপালজিউর সম্পত্তি হইবে।

* * * *

"৯। আমি নির্দ্দেশ করিতেছি যে, আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ৩।০ টাকা সুদী কোম্পানীর কাগজে রূপান্তরিত করিবেন এবং ইহা 'রাধাকান্ত জিউ গোপাল জিউ দেবোত্তর ফণ্ড' নামে অভিহিত হইবে। এই ফণ্ড উক্ত ঠাকুরের সম্পত্তি হইবে। এই ফণ্ডের আয় হইতে ঠাকুরবাটীর সাময়িক সেবার খরচ প্রদত্ত হইবে। উদ্বৃত্ত আয় হইতে মাসিক ২৫০্ টাকা ঠাকুরের নিত্য সেবা ও ভোগের জন্য সেবায়তকে দিতে হইবে। পূজারী, রাঁধুনী, চাকরদিগের বেতন ও অন্যান্য খরচ ইহার অন্তর্ভুক্ত। ঠাকুরবাটীর মেরামত খরচ, সেবা ও ভোগের জন্য মাসিক ২৫০্ টাকা ও অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের টাকা আদায়ের কমিশন প্রভৃতি বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা নিম্নলিখিত প্রকারে সাময়িক উৎসবাদিতে ব্যয়িত হইবে :—

ঝুলন যাত্রা	...	১২৫০্
দোল ,,	...	৭৫০্
বার্ষিক মহোৎসব এবং দরিদ্র ও অতিথিসেবা এবং অন্যান্য উৎসব	...	৭৫০্

সেবা ও ভোগাদির জন্য পরিকল্পনা করিবেন। আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি উদ্বৃত্ত আয় হইতে ঠাকুরবাটীর উন্নতি ও আকস্মিক খরচের জন্য ১০,০০০ টাকা 'রিজার্ভ ফণ্ড'রূপে রাখিতে অধিকারী হইবেন।

"১০। আমি নির্দেশ করিতেছি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী কিরণবালা দাসী তাহার জীবিতকাল পর্যন্ত ঠাকুরবাটীতে বাস করিয়া ঠাকুরের সেবাপূজার তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে। এই দেবোত্তর ফণ্ডের আয় হইতে তাহার ভরণপোষণ চলিবে। অন্য কোন সেবায়ত বা তাহাদের আত্মীয় ঠাকুরবাড়ীতে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাস করিতে পারিবে না।

"১১। আমার ভ্রাতা শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভাগিনেয় চন্দননগরের হরিপদ শীলের পুত্র শ্রীহীরালাল শীল, স্বর্গীয় জয়গোপাল দত্তের পুত্র আমার খুড়তুত ভাই যোগেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় রাধানাথ দত্তের পুত্র, আমার খুড়তুত ভাই মাণিকলাল দত্ত এবং ৮নং হিদারাম ব্যানার্জি লেনস্থ সুবর্ণবণিক্ সমাজের সেক্রেটারী—এই কয়জনকে আমি ঠাকুরের সেবায়ত নিযুক্ত করিলাম।

* * * *

"১৩। আমি নির্দেশ করিতেছি যে, আবার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের কার্যনির্বাহক সমিতি বা সাময়িক কর্তৃপক্ষকে আমার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ 'বিশ্বম্ভর দত্ত বালক-বালিকা ওয়ার্ড' প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণের জন্য ২০,০০০ টাকা দিবেন; তবে সর্ত এই যে, এই উইলের ১৪ দফা অনুসারে দুইটি ছাত্রকে কলেজে ভর্তি করিতে হইবে। উহাদের বেতন আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি দিবেন।

"১৪। আমি নির্দেশ করিতেছি যে, আমার ট্রাষ্টি ও এক্সিকিউটার ২০০০ টাকা ৩।০ টাকা সুদী কোম্পানীর কাগজে রূপান্তরিত করিবেন। উহা আমার মাতার নামে 'গোলাপমণি দাসী ফণ্ড' নামে অভিহিত হইবে। এই ফণ্ডের আয় হইতে আদায়ের খরচ বাদে ৩।৪টি সুবর্ণবণিক্জাতির হিন্দু দরিদ্র ছাত্রের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত অন্য কোন মেডিকেল কলেজে সমগ্র পাঠ্যকালের বেতন দিতে হইবে। এই ছাত্রগণ কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক মনোনীত হইবে; যদি কখনো এই সমাজের অস্তিত্ব না না থাকে তবে উক্ত কার্যের জন্য ট্রাষ্টী কর্তৃক নিযুক্ত ৪ জন সুবর্ণবণিক্ দ্বারা ছাত্রগণ মনোনীত হইবে। নির্দিষ্টসংখ্যক সুবর্ণবণিক্ ছাত্র পাওয়া না গেলে অন্য জাতীয় দরিদ্র হিন্দু ছাত্রকে উক্ত বিনা বেতনে পাঠের সুযোগ দেওয়া হইবে। যখনই কোন ফ্রি-ছাত্রের স্থান পাঠশেষ হেতু, অথবা পাঠত্যাগ হেতু বা অন্য কারণে শূন্য হইবে, অমনি তাহা আমার পূর্ব নির্দেশ মত পূর্ণ করিতে হইবে।

"১৫। আমি নির্দেশ করিতেছি যে, আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি ৫০,০০০ টাকা ৩।০ সুদী কোম্পানীর কাগজে রূপান্তরিত করিবেন, উহা 'আশুতোষ দে মেমোরিয়্যাল ফণ্ড' নামে অভিহিত হইবে। ইহার মোট আয় হইতে আয়কর ও আদায়ের খরচ বাদ দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত ২০টি হিন্দু বাঙালী ছাত্রকে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজে ১০টি ছাত্রকে—তন্মধ্যে ৬টি আই এ বা আই এস-সি ও ৪টি বি এ বা বি-এস সি—বিনা বেতনে পড়িবার সুবিধা দান করিতে হইবে। উক্ত ২০ ও ১০ জন ছাত্রের মধ্যে যথাক্রমে ১০ জন ও ৫ জন সুবর্ণবণিক্ ছাত্র হইবে। যদি নির্দিষ্টসংখ্যক সুবর্ণবণিক্ ছাত্র না থাকে, তবে অন্য জাতীয় বাঙালী হিন্দু ছাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ট্রাষ্টি দ্বারা নির্বাচিত দুই জন সুবর্ণবণিক্ জাতীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সহিত একযোগে পরামর্শ করিয়া করিতে হইবে। যখন কোন ছাত্রের স্থান পাঠশেষ, পাঠত্যাগ, বা অন্য কারণে খালি হইবে, অমনি সেই স্থান আমার নির্দেশানুসারে পূর্ণ করিতে হইবে।

"১৬। আমি আরও নির্দেশ করিতেছি যে, আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি এক লক্ষ দশ হাজার টাকা মূল্যের ৩।০ টাকা সুদী কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিয়া আমার স্ত্রী শ্রীমতী প্রেমবতী দাসীর নামানুসারে 'প্রেমবতী দাসী

বিধবা ও বিবাহ ফণ্ড' গঠন করিবেন। এই ফণ্ডের আয় হইতে প্রত্যেক মাসে আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি ১০০৲ টাকা কলিকাতা, শ্রীরামপুর, হুগলী, চুঁচুড়া ও চন্দননগরের ২৫টি বিধবাকে বিভাগ করিয়া দিবেন। আমি আরও নির্দেশ করিতেছি যে, অবশিষ্ট আয় কলিকাতা, শ্রীরামপুর, হুগলী, চুঁচুড়া ও চন্দননগরের দরিদ্র সুবর্ণবণিক্‌গণকে তাঁহাদের কন্যার বিবাহদানার্থ এককালীন ১০০৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করিবেন। এক্সিকিউঠার ও ট্রাষ্টি এই কার্য নির্বাহের জন্য তাঁহার মনোনীত সুবর্ণবণিক্ জাতীয় ৪জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সহিত একযোগে পরামর্শ করিয়া কার্য করিবেন।

"১৭। আমি শ্রীরামপুর গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালের সংলগ্ন 'মাণিকলাল দত্ত দাতব্য চক্ষু চিকিৎসালয়' নামে একটি দাতব্য চক্ষু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের হাতে ৫০ হাজার টাকা দান করিতেছি। আমি নির্দেশ করিতেছি যে উক্ত ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ৫ হাজার টাকা উক্ত চক্ষুচিকিৎসালয়ের গৃহ-নির্মাণার্থ ব্যয়িত হইবে। অবশিষ্ট ৪৫ হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজে খাটাইয়া উহার সুদ হইতে চক্ষু-চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইবে। আমি আমার ট্রাষ্টি ও এক্সিকিউটারকে উক্ত টাকা গভর্ণমেণ্টের কর্মচারী বা শ্রীরামপুরে উক্ত হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করিতে নির্দেশ করিতেছি।

"১৮। আমি নির্দেশ করিতেছি যে, আমার এক্সি-কিউটার ও ট্রাষ্টি ১০ হাজার টাকা হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় পানীয় জলের জন্য নলকূপখননার্থ পৃথক করিয়া রাখিবেন। যে যে স্থানে নলকূল খনন করিতে হইবে, তাহা তিনি হুগলীর কলেক্টারের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন। প্রত্যেক নলকূপের নিকট 'শ্রীরামপুরের মাণিকলাল দত্তের স্মৃতিরক্ষার্থ' এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ ফলক স্থাপন করিতে হইবে।

"১৯। আমি বেনিয়াপাড়া লেনস্থ জমির অর্দ্ধাংশ শ্রীরামপুর এম্ ই স্কুলকে দান করিতেছি। উক্ত স্কুলের আমার ট্রাষ্টি দেখিবেন যেন, অচিরে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মিত হয়।

"২০। আমি ইটালির ২৪নং গোরাচাঁদ রোডস্থ চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদ্‌কে উহার সংশ্লিষ্ট প্রসূতি বিভাগের ফ্রি বেড বৃদ্ধির জন্য দশ হাজার টাকা দান করিতেছি। এই ফ্রি বেড 'মাণিকলাল দত্ত ফ্রি বেড' নামে পরিচিত হইবে।

"২১। আমি ৪৪নং ইয়োরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনস্থ কলিকাতা মেডিকেল এইড এণ্ড রিসার্চ সোসাইটি ও ২৪ পরগণার যাদবপুরে অবস্থিত চন্দ্রমোহন ঘোষ মেমোরিয়াল সেনেটেরিয়াম নামক যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ে দশ হাজার টাকা দান করিতেছি। ইহা দ্বারা যতগুলি সম্ভব ফ্রি বেড প্রতিষ্ঠিত হইবে ও উহা 'মাণিকলাল দত্ত ফ্রি বেড' নামে অভিহিত হইবে।

"২২। আমি আমার শ্রীরামপুরের রাজাকিশোরী-মোহন গোস্বামী ষ্ট্রীটস্থ বসতবাটী আমার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্তকে তাহার জীবিতকালে ভোগদখলের জন্য দান করিতেছি। তাহার মৃত্যুর পর উহা আমাদের গৃহ-দেবতা ঠাকুর শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দন জিউর সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে। আমি শ্রীরামপুর বাজারে তিনখানা দোকানের অর্দ্ধেক অংশও আমাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দন-জিউকে দান করিতেছি; তবে সর্ত এই যে, উহার আয় হইতে প্রত্যেক মাসে মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে শ্রীরামপুরের বেনিয়াপাড়ার খালধারে অবস্থিত মহাপ্রভু ঠাকুরের সেবা-পূজার জন্য দিতে হইবে।

* * *

২৪। আমার সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ হইতে, প্রথমে শ্রীরামপুর বালিকা বিদ্যালয়ের উপযোগী গৃহ নির্মাণার্থ দুই হাজার টাকা দিতে হইবে। তৎপরে ৫ হাজার টাকা পূর্বলিখিত নলকূপের সংরক্ষণার্থ ব্যয়িত হইবে এবং উক্ত অবশিষ্টাংশ রাধাকান্তজিউ ও গোপালজিউর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।"

উপরি লিখিত ২৪ দফা উইল ব্যতীত তিনি ১৯২৭

করেন। এই কডিসিল রেজিষ্ট্রিকৃত নহে। উহার সাক্ষী শ্রীযুক্ত মদন গোপাল দে ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র পাল।

উপরি লিখিত উইল ও কডিসিল তাঁহার দ্বিতীয় উইল। তিনি প্রথমে অন্য একখানি উইল করিয়াছিলেন। উহা ১৯২৪ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দে মহাশয়ের সৌজন্যে উপরিলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত। ক্রমশঃ

বাংলা-মায়ের রূপ

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ময়মনসিংহ ও মুক্তাগাছা

আবার রাত্রির দার্জিলিং মেলে চলিলাম ময়মনসিংহ ও মুক্তাগাছার অভিমুখে। সাধারণত ময়মনসিংহ ও মুক্তাগাছার যাত্রীরা সিরাজগঞ্জ হইয়া যাইয়া থাকে। কেহ কেহ গোয়ালন্দ ও ঢাকা হইয়াও যায়। কিন্তু আমার যাত্রা-পথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, যেহেতু সিরাজগঞ্জ ও জগন্নাথ-গঞ্জের মধ্যবর্তী খেয়া ষ্টীমার রেল কোম্পানীর নিজস্ব নহে; সেই হেতু উহা আমার দশ টাকার টিকিটের বহির্ভূত। অগত্যা আমাকে যাইতে হইবে তিস্তামুখঘাট ও বাহাদুরাবাদ এবং সিংজানি জংসনের মধ্য দিয়া।

দার্জিলিং মেলে এইবার আমি একটু আগে গিয়া সামান্য স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। রাত্রি প্রায় ২টার সময় সান্তাহারে দার্জিলিং মেল ত্যাগ করিয়া তিস্তামুখঘাট প্যাসেঞ্জারে আরোহণ করিলাম। এই গাড়ী বগুড়া হইয়া যাইবে।

গাড়ীতে উঠিয়া শয়নের স্থান পাইলাম। অবিলম্বে বিছানার চাদর পাতিয়া শয্যা রচনা করিলাম এবং পদ্ম-নাভের নাম স্মরণ করিয়া নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইলাম। নিশীথের শান্ত বাতাস দিগ্‌বালার অঞ্চল-প্রান্ত দুলাইয়া আমাকে ঘুম পাড়াইয়া গেল। ভুলিয়া গেলাম বিশ্বজগৎ; লুপ্ত হইল - অগণিত নক্ষত্র-তারকা-গ্রহ-উপগ্রহ সমন্বিত আমি চলিলাম—কোথায়?--স্বপ্নলোকে—উপনিষদ্ যাহাকে আত্ম-সাক্ষাৎকারের প্রথম সোপান বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছেন।

কখন গাড়ি ছাড়িল জানি না—কত প্রান্তর, কত নদী, কত গ্রাম-জনপদ, কত পল্লী-কুটীর অতিক্রম করিয়াছিলাম। ভোর বেলা বোনারপাড়া জংসনে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম—প্রভাতের রক্তিমাভা দূরে শ্যামল ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহু যাত্রী উঠানামা করিতেছে। গাড়ী নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

আমি অবতরণ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া চা পানের ব্যবস্থা করিলাম। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এইবার গাড়ী যে পথে চলিল, তাহা ইতিপূর্বে আমি কখনো দেখি নাই। এই পথের দৃশ্যে তেমন বৈচিত্র্য কিছুই নাই। সর্বত্র সমতল ভূমি, স্থানে স্থানে অধিবাসী-দের পর্ণকুটীর। কৌতূহলপ্রিয় পল্লী-বালকেরা তেমনি ভাবে গাড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়া অপলক নয়নে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

৫-৩০ মিনিটে ফুলছড়ি ষ্টেসন পাইলাম। শুনিলাম পৌষ সংক্রান্তিতে এই স্থানে এক বিরাট মেলা বসে। এই স্থান কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার মহারাজা প্রদ্যোৎ-কুমার ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্গত।

স্থানে কোন প্ল্যাটফরম না থাকায় গাড়ী হইতে জিনিষ-পত্র সহ অবতরণ করা একটু কষ্টসাধ্য। যাহা হউক কোন মতে গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টীমার ঘাটের দিকে চলিলাম।

ষ্টীমারের ব্যবস্থা আমার বেশ ভাল বলিয়া মনে হইল। যাত্রীদের বসিবার জন্য বেঞ্চি পাতা আছে। বেশ ভাল খাবারের দোকানও ষ্টীমারে বর্তমান।

বেলা ৬টায় ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। ষ্টীমারে প্রায় দুই ঘণ্টা থাকিতে হইবে।

ষ্টীমারে একটি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তাঁহার বাড়ী মালদহ জেলায়। তিনিও আমারই মত দশটাকার মোসাফের। ব্রহ্মপুত্র নদের বক্ষ ভেদ করিয়া ষ্টীমার চলিল। ধীরে ধীরে তটরেখা দূর হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। কত নৌকা শাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে, কত অজানাদেশের অজানা পথে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নৌকাও বিস্তর ছুটাছুটি করিয়া মৎস্য ধৃত করিতে নিযুক্ত।

তীরস্থিত পল্লীকুটিরগুলি একখানি চিত্রপটের মত দেখা যাইতে লাগিল। কোথাও শ্যামল তরুবনস্পতির ঘন সমাবেশ—মনে হয় যেন কোন ঐন্দ্রজালিক শিল্পী ঘনজঙ্গল-রেখা আঁকিয়া রাখিয়াছেন এই নদীতীরে। যখন পূর্ণ-চন্দ্রোদয়ে রজতরশ্মি ছড়াইয়া পড়ে পল্লীকুটীরের প্রাঙ্গণে, নদীর কল্লোলিত, জলরাশিতে, রৌপ্যনিভ বেলাভূমিতে, শ্যামল তরুরাজির শাখাবাহুপল্লবে—তখন যে অনির্বচনীয় শোভা ফুটিয়া ওঠে, কে তাহার ইয়ত্তা করে। সে দৃশ্য মনে মনে মৌনভাবে অন্তরের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া উপভোগ করা চলে—কালীর অক্ষরে তাহার রূপ দেওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা বলিয়াই মনে হয়।

মালদহের ভদ্রলোকটি আমাকে গৌড় দেখিয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আমি যখন বলিলাম যে, আমি গৌড় দেখি নাই, তখন তিনি একটু বিস্মিত হইলেন, মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"সারা ভারত বেড়িয়েছেন আর ঘরের দুয়ারের জিনিষটা দেখেন নি!"

আমি উত্তর করিলাম—"জানেনই ত ঘরের গরু গোয়ালের ধারের ঘাস খায় না। যে জিনিষ যত দুর্লভ, তা ততই মানব মনকে আকর্ষণ করে; ঈশ্বর সর্বাপেক্ষা দুর্লভ বলেই পৃথিবীর যত দর্শন ও দার্শনিক তাঁর খোজ নেবার জন্য দেশে দেশে কালে কালে মাথা ঘামিয়েছেন। তার জন্য কত রক্তপাত, হত্যা, লুণ্ঠন ইতিহাসের পৃষ্ঠা মসীময় করে রেখেছে। সেই জন্যে যেটা সুলভ সেটা বাস্তবিক কৌতূহলকে তেমন জাগ্রত করে না—কোথায় যেন কি একটা বাধা এসে দাঁড়ায়।"

উভয়ে গিয়া ষ্টীমারের খাবার ঘরে লুচি ও রসগোল্লা সহযোগে জলযোগ নিষ্পন্ন করিলাম।

দূরে বাহাদুরাবাদঘাট দেখা যাইতে লাগিল। একদল পুরনারী নদীজলে স্নান ও জল আহরণার্থ সমাগত হইয়াছিল। তাহারা আমাদের ষ্টীমারের দিকে উৎসুক নয়নে তাকাইয়া রহিল।

এইবার ষ্টীমার তীরের খুব নিকট দিয়া যাইতেছিল। অসম তটরেখা দেখিয়া মানব-জীবনের বৈচিত্র্যের কথাই মনে পড়িল। কত উত্থান, কত পতন—কত আন্দোলন এই মানবজীবনের পুরুষকার লইয়া। অথচ তাহার পরিণাম শ্মশানের ধূলিমুষ্টির মধ্যে চিরসমাধি!

বেলা ৮টার সময় বাহাদুরাবাদঘাটে ষ্টীমার লাগিল। বহু কুলী যাত্রিদলের মালপত্র লইবার জন্য উপনীত হইল। আমাদের কুলীর দরকার ছিল না। উভয়ে ষ্টীমার ত্যাগ করিয়া তীরে অবস্থিত গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম—শরতের পীত রৌদ্রে শ্যামল শস্যক্ষেত্র হাসিয়া উঠিয়াছে। সতেজ সবুজের অফুরন্ত লীলা দেখিয়া চোখ যেন জুড়াইয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে তিস্তামুখঘাট ও বাহাদুরাবাদঘাটের তুলনা মানস-ফলকে বিম্বিত হইল—তিস্তামুখঘাটে তেমন শ্যামল ধান্য-ক্ষেত্র প্রভাতী বায়ু হিল্লোলে দুল্যমান দেখি নাই,—দেখিয়াছি জলাভূমি, সামান্য কৃষিক্ষেত্র কোথাও নজরে পড়িয়াছিল; কিন্তু এখানে দিগন্তব্যাপী সবুজের মেলা—ধান্যক্ষেত্র প্রভাতী বায়ুর মুক্ত স্পর্শে তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে—সেকি মনোহর, কি লোভনীয়, কি নয়ন তৃপ্তিকর!

ক্রমশঃ

জাতীয় সংবাদ

শিল্প-শিক্ষার্থ সুবর্ণবণিক্ যুবকের ইয়োরোপ যাত্রা

বিগত ২৯শে আগষ্ট তারিখে সুপ্রসিদ্ধ সাইকেল ব্যবসায়ী মেসার্স এইচ্ ডি নন্দী এণ্ড কোংএর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ মধুসূদন নন্দী বি এন্ রেলওয়ের বম্বে মেলে ইয়োরোপ যাত্রা করিয়াছে। শ্রীমান্ মধুসূদন জার্মাণি, ইতালি, ইংল্যণ্ড ও অন্যান্য শিল্প-কেন্দ্রে পরিভ্রমণ করিয়া সাইকেল শিল্প ও ব্যবসা হাতে কলমে শিক্ষালাভ করিবে। শ্রীমানের ইচ্ছা বিদেশ হইতে সাইকেলের বিভিন্ন অংশের নির্মাণ-কৌশল শিক্ষা করিয়া দেশে উক্ত দ্রব্যের কারখানা স্থাপন করিবে। আমরা সর্বান্তঃকরণে শ্রীমান্ মধুসূদনের সাফল্য কামনা করি।

শ্রীমান্ মধুসূদন নন্দী ১৯৩৭ সালের বি ও এ সাইকেল চ্যাম্পিয়ানশিপে বিজয় লাভ করিয়াছিল।

ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্রের ত্রিবর্ণ চিত্র

এই সংখ্যায় ব্রিগেডিয়ার সার্জন ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্রের ত্রিবর্ণ চিত্র মুখচিত্ররূপে প্রকাশিত হইল। এই ত্রিবর্ণ চিত্র মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স তাঁহাদের নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের এই সৌজন্যের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিনাপণে বিবাহ

গত ২২এ শ্রাবণ রবিবার (ইং ৭ই আগষ্ট ১৯৩৮) ৬৭ বি রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দলাল মল্লিক মহাশয়ের পঞ্চম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মল্লিক মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণমোহন মল্লিকের সহিত কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের প্রবীণ সভ্য বালীগঞ্জ ২।২ সেবকবৈদ্য ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিক মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র (৺মোহিনীমোহন মল্লিকের প্রথমা কন্যা) শ্রীমতী প্রতিভাবালার বিবাহ বিগত ১৩৩৬ সালের ৭ই পৌষ তারিখে এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত বিরাট সভায় পরিগৃহীত নিয়মাবলী ও নির্দিষ্ট সংক্ষিপ্তসার তালিকানুযায়ী নিষ্পাদিত হইয়াছিল—বলা বাহুল্য উভয় পক্ষই সর্বপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর পরিবর্জ্জনে কৃতসংকল্প ছিলেন, যদ্দ্বারা শুভকার্য অতি সুষ্ঠুভাবে ও নির্বিবাদে সুসম্পন্ন হইয়াছিল—এমন কি উভয় পক্ষীয় পুরোহিতগণও দক্ষিণাদি ব্যাপারে খুব সংযত ছিলেন। বরপক্ষ কাঁটাপুকুরের (বাগবাজার) বিখ্যাত মল্লিক পরিবার বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের বংশীয় আভিজাত্য সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও এই বিবাহে সমাজ কল্যাণকর প্রাগুক্ত বিরাট্ জাতীয় সভায় গৃহীত নিয়মাবলী প্রতিপালন করিয়াছিলেন। আরও অতীব সুখের বিষয় যে বরপক্ষীয় মহিলাগণও সাগ্রহে ও সানন্দে সর্বপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর পরিবর্জ্জনের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই উচ্চ আদর্শ ও মহাপ্রাণতা সমাজের কল্যাণকামী কি ধনী কি গৃহস্থ প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়! আমরা ভগবৎ চরণে নবদম্পতীর সুদীর্ঘ ও সুখশান্তিময় জীবন প্রার্থনা করিতেছি।

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক সমাচার

২২শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪৫ সাল | ১০ম সংখ্যা

পূজা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম্ এ

সব ঘরে মোর ঘর,
কেহ নয় মোর পর,
সব দিকে মোর পথ,
সব ঘাটে মোর খেয়া ;
নাই মোর মতামত ;
নাই কিছুতেই মায়া ;
সবদেশে মোর দেশ
নাই ভেদ আপন পর এই ত আছি বেশ।
আত্মা আমার সকল ঘটে
আত্মীয় মোর সবাই বটে
বদ্ধ হয়ে কারও প্রেমে
পাই না আমি ক্লেশ।
সব ঘটে মোর বাস
তবু নাই ত মায়া-পাশ

নাই মনে রাগ-দ্বেষ,
পাই না আমি ক্লেশ।
নিজ হতে তুমি নিজে হাতে ধরে
মোরে নিলে আপন করে।
দয়া করে মোরে দিয়েছ ব্রত ;
স্নেহের শাসনে বসায়ে আসনে
সতত সাধনে রেখেছ রত ;
আপন মনের অজানা আবেগে
সরে যাই দূরে ছলনার বেগে
তবু বাঁধা আছি প্রেম-অনুরাগে
কৃপার কঠোর বাঁধনে
জাগে না ত প্রাণ
বাজে না ত গান
এ ভাঙ্গা বীণার এ শিথিল ছেঁড়া তারে

করুণ অশ্রুধারে।
গেল না ত বুঝা
হবে কি না পূজা
এ দীন হীনের এ উপহারে
হেলায় ছড়ানো উপচারে।
তবু কেন মনে নাহি হয় লাজ
পূজকের মত পরি নাই সাজ
সেবকের মত করি নাই কাজ
করি নাই আয়োজন।
আপন বলিয়া ধরি নাই বুকে ঐ রাঙ্গা শ্রীচরণ;
জানি আমি তবু অশ্রু-সলিলে হ'বে পূজা সমাপন।
দিনান্তের শেষ আলো
দিগন্তে মিলায়ে।
নিশার আঁধার আসে
ভাবনা বিলায়ে॥

শ্রান্তিহরা শান্তিভরা
এস কাছে এস ত্বরা
সান্ধ্য সমীরে দাও
দুহাত বুলায়ে।
জনশূন্য পৃথিবীতে
এস বিচলিত চিতে
প্রেমের আলোকে দিতে
প্রদীপ জ্বালায়ে।
হৃদয়ের মুক্ত দ্বারে
রয়েছ দাঁড়ায়ে॥
জনশূন্য চরাচরে
আছি এই আশা করে
মিলন মাধুরী দিতে
বেদনা ভুলায়ে।

ঝুলন-পূর্ণিমা

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী সাহিত্যভারতী

ঘন বরিষার মেঘ-মেদুরাম্বরে কি মনোরম শোভা। শ্রাবণের ঘন ঘন গুরু গুরু মেঘগর্জনে বর্ষাবাতান্দোলিত মাধবী লতা দোলায়মানা। পুষ্পিত তরুপাদপসকল নব কিসলয়-বাসে অঙ্গ ঢাকিয়া কি নয়নাভিরাম হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ঝিমি ঝিমি রবে বৃষ্টিধারা পড়িতেছে। বৃষ্টির মিঠে-কোমল স্বরে একটা সু-স্বর উঠিতেছে। আজ শ্রাবণের পৌর্ণমাসী। আকাশে পূর্ণ শশধর ঈষৎ ম্লান। মধ্যে মধ্যে খণ্ড মেঘ আসিয়া পূর্ণশশীকে আচ্ছাদন করিতেছে। আবার পরক্ষণেই চন্দ্রদেব ছিন্ন মেঘের ফাঁকে আসিয়া হাসিতেছেন। মেঘ-দরশনে ময়ুর-ময়ূরীরা পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে। আর বর্ষাস্নাত টগর গোলাপ জাতি যুথী মল্লিকা কদম্ব কেতকী আদি প্রস্ফুটিত হইয়া জগতের মনোহরণ করিতেছে। আজ বন-উপবনে যেন শ্যামের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে। আজ ব্রজগোপীগণ কুঞ্জবনে হিন্দোল-লীলা করিতেছে। রাশি রাশি কদম্ব কেতকী পুষ্পসম্ভারে চৌদিকে বেষ্টন করিয়া শাখায় শাখায় ঝুলনা বাঁধিয়া ফুলের আস্তরণে ফুলশয্যার উপর যুগলকিশোর শ্রীরাধা-শ্যামকে বসাইয়া আনন্দে দোলনায় দোল দিতেছে। কোন কোন গোপী বীণা-বাঁশী মঞ্জুরা-মন্দিরা সহ কৃষ্ণগুণ গান করিতেছেন। কোন গোপী করতালী দিতেছেন। কেহ বনমালা গাঁথিয়া রাধাশ্যামের গলে পরাইতেছেন, কেহ বা অগুরু চন্দন আনিয়া শ্রীঅঙ্গে মাখাইতেছেন, আর মাঝে মাঝে বাদলের ধারার শব্দে পুলকিত ব্রজগোপিকাগণ হিন্দোল উৎসব করিতেছে। মন্দ-মারুতে বিনোদ সুন্দরের মালতী-মালাটি প্রেমানন্দে তাঁহার চরণ চুম্বন করিতেছে। উভয়ের চরণে নূপুর রুণু রুণু রবে

বাজিতেছে। শ্রীমতীর নীলাঞ্চল শ্রীকৃষ্ণকে অর্দ্ধাবৃত করিয়া কি মধুর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে যেন তমাল বেষ্টিতা মাধবীলতা শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া আছে। তাই ভক্ত কবি লিখিয়া গিয়াছেন—

দোঁহার রূপের নাহিক তুলনা
প্রেমের নাহিক ওর।
কিবা শোভা মনোলোভা কুঞ্জ কানন
শ্রাবণে ঘন ঘন গরজে নব ঘন
মহে মন বহে মন্দ পবন।
বন ফুল তুলি যতনেতে হার ভক্তিভরে গোপী
গলেতে দেন দোঁহার
মরি কি শোভাকর যুগলরূপে মোর
ভুলিল নয়ন-মন।

শ্যামরূপ নব জলধরের পার্শ্বে শ্রীমতী শোভমানা। পীতবাস শ্রীকৃষ্ণের পীত বসনের সঙ্গে শ্রীমতীর নীলাম্বর মিশিয়া কি অপরূপ শোভাই হইয়াছে। শ্যামসুন্দরের বিনোদ চূড়াটিও মন্দ মন্দ দুলিতেছে। চূড়ার লক্ষ্যও ঐ রাইচরণের দিকে। ব্রজ-গোপিকাগণ হিন্দোলে মন্দ মন্দ দোল দিতেছেন। তাঁহাদের কজ্জল-নিবিড় আয়তলোচনে কৃষ্ণপ্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। হিন্দোলে দোল দিতে দিতে করবী মালাগুলি লুণ্ঠিত হইতেছে। কোন কোন গোপীর নীবিবন্ধন শিথিল হইয়াছে। কাহারও কটিবাস কঞ্চুলিকাগ্রস্ত। কেহ বা কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বলা হইয়া প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণের চরণচুম্বন করিতেছেন কেহবা শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-গানে বিবসা কলিকার ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। কোন গোপিকা তাম্বূল-কর্পূর দোঁহার মুখে তুলিয়া দিতেছেন। কেহবা হিন্দোলে দোল দিতে দিতে কৃষ্ণ গুণ গান করিতেছেন। আর শ্যামসুন্দর মদন-মোহন শ্রীমতীকে বামে লইয়া হিন্দোলে দুলিতেছেন। এইরূপে ব্রজগোপিকাগণ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের কুঞ্জবনে হিন্দোললীলা করিতেছেন আর ধারাস্নাত তরুলতাগুলি বর্ষাবায়ুর হিল্লোলে মন্দ মন্দ দোলায়মান। মস্তকের বেণী পৃষ্ঠে দোদুল্যমান। তাঁহারা প্রেম পুলকিত নয়নে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-চরণে অঞ্জলী দিতেছেন।

ময়ূর ও শকুন

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়

কপোতাক্ষ উপকণ্ঠে ছিল দুটি বৃক্ষ,
নীরস নিম্বক আর পুষ্পিত কদম্ব
তিক্তকে বসিত গৃধ্র কদাকার পক্ষ।
কদম্বে নাচিত শিখী গাত্রে স্বর্ণবিম্ব।
সম্বোধি গৃধ্রেরে শিখী গর্বভরে বলে,—
"অতিষ্ঠ হইনু বন্ধু তব কদাচারে,
অরণি ঘরষে যেন বনবহ্নিজ্বালা
পক্ষের সঞ্চারে তব গন্ধে জীব মরে।
নীরস কণ্ঠের স্বর শিরে নাই চূড়া;
পক্ষহীন বক্ষ তব তৃণহীন মরু,
অমসৃণ অঙ্গ তব শিমুলের তরু,
অস্থি চর্ম সার যেন মান্ধাতার খুড়া।
গলিত বসার গন্ধে মরি বুঝি প্রাণে,
প্রাশনের অন্ন উঠে নিশ্বাস গ্রহণে।
সুন্দর সুঠাম মোরে "কবিশ্রেষ্ঠ" বলে,
সুদীর্ঘ সুপুচ্ছ আমি রাজা বিহগের,
চন্দনা-মরাল-শুক লোটে পদতলে,
নীলকণ্ঠে কেকাধ্বনী শুনি ময়ূরের
এক চন্দ্র নভস্তলে লক্ষচন্দ্র অঙ্গে,
আমার শিরের চূড়া উপমাবিহীন,

মোর পুচ্ছ শিরে ধরি কৃষ্ণ রাধা রঙ্গে।
কণ্ঠরাগে ইন্দ্রধনু আকাশে বিলীন।
মেঘমন্দ্রে সচকিতে করি নৃত্য যবে;
মেনকা উর্বশী রম্ভা লাস্যময়ী যত,
সরমে স্বরগে বসে হয়ে মর্মাহত,
তাণ্ডবের নৃত্যকলা পদে দুইভাবে।
প্রকাশি পেকলী আর বহুরূপী নৃত্য,
শিখীনী কেবল নয় সংসার উন্মত্ত"।
ময়ূরের গর্বে কহে শকুন গাম্ভীর্যে,
"সকলি সত্যের শ্রেষ্ঠ কহিলা আপনি,
দূষিব কেমনে বল বিধাতার কার্যে।
নির্গুণ—কুরূপ—ভিক্ষু সৃজিলেন যিনি।
পরিকল্পী বিশ্বধর্ম বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ,
তাঁহার কল্পনা মাঝে দেখ উচ্চনীতি,
উত্তমে—অধমে রাখি দেখালেন স্পষ্ট।
অন্ধকার আছে তাই সমুজ্জ্বল বাতি।
নির্গুণ—মূর্খের হেতু বিদ্যার শোভন;
মরুভূ দাহিত তরে শীতল সরসি,
বিকটা দানবী তাই অপ্সরী রূপসী,
দরিদ্র অভাবে কাঁদে, ভোগী ধনীজন।
নির্গন্ধ কিংশুক হেতু চম্পকে বৈভব,
আমি না থাকিলে তব কিসের গৌরব?"

স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(১৩৪৪ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র কুড়ি বৎসর বয়সে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ধাত্রীবিদ্যায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া 'গুডিভ্‌ মেডাল' পুরস্কার লাভ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত গমন করেন। সেখানে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এম আর সি এস (Member of Royal College of Surgeons) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি হইতে প্রাণিবিদ্যায় (Zoology) বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া একখানি রৌপ্যপদক লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত ইউনিভার্সিটি হইতে অন্যান্য সাধারণ পারদর্শিতার পুরস্কার-স্বরূপ তিনি একখানি স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হয়েন। নিম্নে এই তিনখানি পদকের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল—
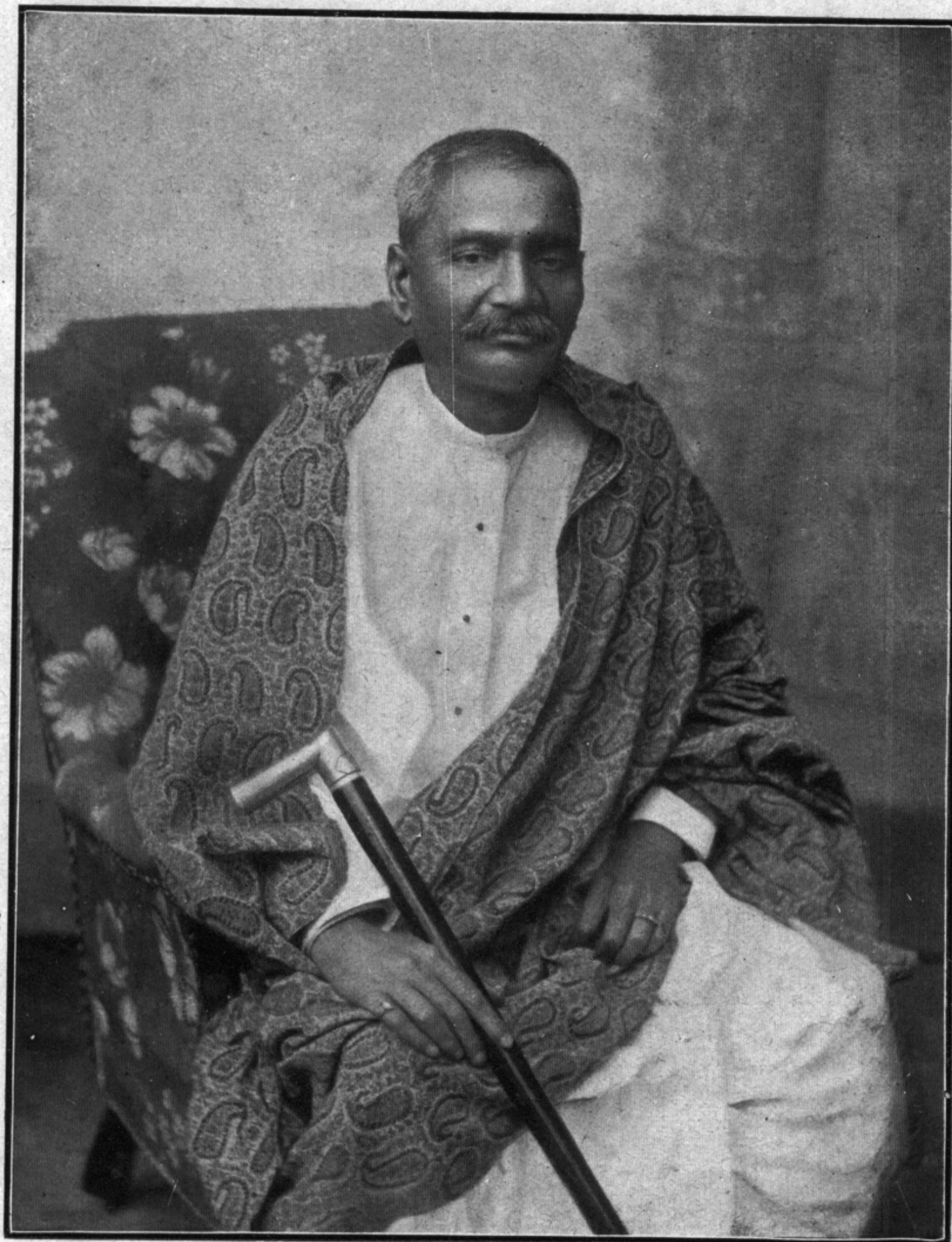
৺গৌরমোহন দে

১। গুডিভ মেডাল

সম্মুখ ভাগ   পশ্চাৎ ভাগ

২। জুলজি মেডাল

সম্মুখ ভাগ   পশ্চাৎ ভাগ

৩। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি মেডাল

সম্মুখ ভাগ   পশ্চাৎ ভাগ

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার চন্দ্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সেই সময়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ তাঁহাকে দুইটি অভিনন্দন প্রদান করেন; তন্মধ্যে একটি রৌপ্যনির্মিত কাস্কেট, অপরটি হস্তিদন্তনির্মিত একটি সুদৃশ্য বাক্সে প্রদত্ত হয়। অভিনন্দনপত্র দুইখানিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাস্কেট এবং বাক্সটি তাঁহার অন্যতম ভাগিনেয় ৺গৌরমোহন দের মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দের নিকট আছে। তাহাতে এইরূপ লেখা আছে।

কাস্কেট—

"Presented,
to
Brigade Surgeon R. C. Chandra
By the Pupils of the
Medical College
The Lady Students
The Civil European
And Native Students."

আইভরি বাক্স—

"Presented
by
The Military Students
of the
Calcutta Medical College
to
Brigade Surgeon R. C. Chandra
On Retirement."

ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, ডাক্তার চন্দ্রের অধ্যাপনায়ও সদয় ব্যবহারে তাঁহার ছাত্র ও ছাত্রীগণ তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার চন্দ্রের সহধর্মিণী মেরী চন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ডাক্তার চন্দ্র একখানি দানপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে পূর্বে যে সমস্ত দানের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহা ছাড়া তাঁহার দুইজন শ্যালককে (মেরী চন্দ্রের সহোদর) কিছু নগদ টাকা, তাঁহার ভগ্নী চুণীমণি দাসীকে মাসিক একশত টাকা, তিন ভাগিনেয় গৌরমোহন দে, সাতকড়ি দে ও তিনকড়ি দে প্রত্যেককে পাঁচশত টাকা দিবার ব্যবস্থা ছিল। মেরী চন্দ্রের মৃত্যুর সময় রাজেন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বিলাত গমন করেন এবং তাঁহার স্ত্রীর নিকট আনুমানিক আট লক্ষ নগদ টাকা যাহা ছিল তাহার কিছুই তিনি পান নাই। এই কারণে তিনি সম্ভবতঃ সন্দিহান ও ক্রোধপরবশ হইয়া স্বহস্তে কাঁচি দ্বারা শ্যালকদ্বয়ের নাম কর্তন করিয়া উইলখানি বাতিল করেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহার জীবিতা ভগ্নী চুণীমণি দাসীও ভ্রাতার বিষয়ের অর্দ্ধাংশ পাইবার আশায় বিলাতে লর্ড হ্যালস্‌বেরির নিকট আবেদন করেন এবং প্রকাশ করেন যে, যদিও ডাক্তার চন্দ্র তাঁহার চরম দানপত্র স্বহস্তে বাতিল করিয়া গিয়াছেন তথাপি তাঁহার ইচ্ছা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার দানপত্রে লিখিত উদ্দেশ্যে তাঁহারা যাবতীয় অর্থ প্রদান করিবেন এবং সেই টাকা বাদ অবশিষ্ট অর্থ তাঁহাদের ভ্রাতাভগ্নী উভয়ের মধ্যে সমভাবে দিবার ব্যবস্থা করা হউক। ইহাতে লর্ড চ্যানসেলার হ্যালসবেরি অতিমাত্র প্রীত হইয়া লণ্ডনের বিখ্যাত সলিসিটর Dulston Elimeus & Sons কে আবশ্যক দলিল সম্পাদনের পরামর্শ দেন। তাহাতে চুণীমণির ভ্রাতা মহেন্দ্রবাবু অসম্মত হওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্টে মাননীয় বিচারপতি সেল সাহেবের এজলাসে মামলা হয় এবং বিচারে উভয় ভ্রাতা এবং ভগিনী সমভাবে প্রায় সাত লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়েন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চুণীমণি দাসীর স্বামী বৈদ্যনাথ দে মহাশয় একজন সরল এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর চারি বৎসর পরে চুণীমণি দাসী তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার চন্দ্রের বিষয় প্রাপ্ত হয়েন। তখন তাঁহার তিন পুত্র বর্তমান; জ্যেষ্ঠ নরসিংহচন্দ্র দের ইহার পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। ডাক্তার চন্দ্রের সম্পত্তি লাভ করিয়া চুণীমণি দাসী তাঁহার পুত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি ঠাকুর

বাটী প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। তদনুযায়ী ৪০,০০০৲ হাজার টাকা ব্যয়ে গোবিন্দ সেন লেনে ঠাকুরবাটী নির্মাণ করিয়া এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের নিকট ৭৫,০০০ হাজার টাকা জমা দিয়া একটী ট্রাষ্টডিড সম্পাদন করিয়া তাঁহার পুত্রত্রয়কে ট্রাষ্টী এবং সেবায়ত মনোনীত করেন। মাতৃভক্ত সন্তান গৌরমোহন তাঁহার জীবদ্দশায় ঠাকুরবাটীর কার্য, দেবসেবা ও সাময়িক পার্বণাদি যথাযথরূপে ও কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করেন।

গৌরমোহন দে তাঁহার পিতার ন্যায় ধর্মানুরাগী ও দেবদ্বিজে ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় পূজা-আহ্নিকে অতিবাহিত করিতেন। মাতার প্রতিষ্ঠিত দেবায়তন ও শ্রীবিগ্রহের প্রতি তিনি অহর্নিশ ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ ও পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যয়াদি নির্বাহ করিয়া স্বোপার্জিত সঞ্চিত অর্থে স্বীয় বাসভবনের সন্নিকটে ১৬।১ নং হাড়কাটা লেনে একখানি বাটী খরিদ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে ঐ বাটীখানির আয় দানপত্র দ্বারা দেবসেবায় অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানপত্রে লিখিত আছে যে তিন বৎসর অন্তর তাঁহার পুত্রগণের পালার সময় উক্ত বাটীর আয় হইতে সঞ্চিত অর্থের আনুমানিক অর্ধপরিমাণ অর্থ—২৫০০৲ হাজার টাকা—রাসোৎসবে ব্যয়িত হইবে এবং অপরার্ধে জাতিবর্ণনির্বিশেষে দীনদরিদ্রগণের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হইবে। এইরূপে তাঁহার স্বোপার্জিত একমাত্র সম্পত্তি পুত্রগণকে না দিয়া দেবোদ্দেশে অর্পণ করিয়া তিনি নিঃস্বার্থ দানশীলতা এবং ধর্মাত্মতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া জনসমাজে মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণও পিতার এই ব্যবস্থা পরম এবং চরম কর্তব্যজ্ঞানে যথাযথভাবে পালন করিয়া আসিতেছেন। এতদুপলক্ষে তাঁহাদের পালায় রাসোৎসবে মহাসমারোহ অষ্টপ্রহর হরিনাম সঙ্কীর্তন, দরিদ্রনারায়ণের সেবা ও অনাথ-আতুরগণকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই বিষয়টি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পিতৃপিতামহের ভক্ত ও অনুরক্ত বংশধর গৌরমোহন বাবুর মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দে তাঁহার বাসভবনের দ্বারোপান্তে মর্মর-ফলকে নিম্নলিখিত বচন গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন—

"শ্রীপাট অম্বিকা কালনার সিদ্ধ বৈষ্ণব
শ্রীমদ্ ভগবান্‌দাস বাবাজী
মহাশয়ের প্রিয়তম শিষ্য পরম ভাগবত
৺বৈদ্যনাথ দে
মহাশয়ের মধ্যমপুত্র
যিনি ৬।১, গোবিন্দ সেন লেনস্থ
ঠাকুর বাটীর প্রথম ট্রাষ্টী ও সেবায়ৎ
নিযুক্ত হইয়া নিজ পালায়
মহাসমারোহে রাসোৎসব সম্পন্ন
ও দীন জনের সেবা এবং শীতবস্ত্র
বিতরণ করিবার জন্য স্বোপার্জিত অর্থ
দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন
সেই পরম ভাগবত গৌরগতপ্রাণ
৺গৌরমোহন দে
মহাশয়ের স্মরণার্থ
তদীয় মধ্যমাত্মজ ও অন্যতম সেবায়ৎ
বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকৃষ্ণদাস দে
কর্তৃক এই ফলক স্থাপিত।"

গৌরমোহন দে ১২৫৯ সালে ২রা আষাঢ় তারিখে গোবিন্দ সেন লেনস্থ পৈত্রিক বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি মিলিটারী একাউণ্টস অফিসে উচ্চপদে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুদিন চাকুরী করিবার পর তাঁহার অফিস রাওলপিণ্ডিতে স্থানান্তরিত হয় এবং কর্তৃপক্ষগণ গৌরমোহন বাবুকেও তথায় যাইবার আদেশ দেন। কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে অনুমতি না দেওয়ায় গৌরমোহন বাধ্য হইয়া সামান্য পেন্সন লইয়া কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার ন্যায় [illegible] বৈষ্ণব-ধর্মে নিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিতেন। প্রতিদিন তিনি পিতার নিকট শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেন এবং

তাঁহার পিতা বৈষ্ণনাথ দে মহাশয় আত্মীয়-বন্ধুগণের সমক্ষে বোধগম্য এবং সুললিত ভাষায় তাহা ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি কলুটোলা নিবাসী স্বর্গীয় তারকনাথ দত্তের দ্বিতীয়া কন্যা অমৃতকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন কন্যা এবং পাঁচপুত্র ; কানাইলাল, কৃষ্ণদাস, গোপালদাস, চৈতন্যদাস ও নন্দলাল। পুত্রগণ সকলেই পিতৃপিতামহের অনুরূপ গুণসম্পন্ন, ভক্তিমান্ এবং বিনয়বিনম্র। মধ্যমপুত্র কৃষ্ণদাস সর্বজনপরিচিত। তিনি পরোপকারী এবং স্বজাতির ও সমাজের সর্ব কার্যে অগ্রণী।

গৌরমহন বাবুর পত্নী এখনও জীবিতা, বর্তমানে তাহার বয়স ৮৫ বৎসর। গৌরমোহন বাবু শেষ জীবন কেবল ধর্মালোচনায় যাপন করিতেন। তিনি অল্পভাষী ছিলেন এবং কখনও পরচর্চা করিতেন না ; জীবনে তিনি কখনও আদালতে পদার্পণ করেন নাই। তাঁহার দানপত্রে লিখিত রাসোৎসবের ব্যবস্থা নিজ হস্তে সম্পন্ন করিবার জন্য পুত্রগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, নিজ হস্তে দানাদি করিলে পাছে তাঁহার মনে তমঃ উপস্থিত হয় সেই জন্য তিনি পুত্রগণের উপর তাহার ভার অর্পণ করিয়া যাইতেছেন।

১২৯৮ সালে তাঁহার পিতা ৺বৈষ্ণনাথ দের মৃত্যু হইলে গৌরমোহন পিতার নির্দেশানুসারে শ্রীধাম নবদ্বীপে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন করেন। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কার্য ধর্মানুমোদিত ছিল এবং প্রতিদিন আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে শাস্ত্রালোচনা ও সঙ্কীর্তন করিতেন। তাঁহার মাতার ঠাকুর বাটীর প্রথম ও প্রধান ট্রাষ্টী এবং সেবায়ত রূপে তিনি দেবালয়ের কার্য প্রাণপাত পরিশ্রমে ও অচ্ছিদ্রভাবে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় দেবালয় হইতে কখনও অতিথি বিমুখ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তিনি সকলকে শোক করিতে নিষেধ করিয়া হরিনাম শুনাইতে আদেশ করেন। সন ১৩১৭ সালের ২২শে আশ্বিন সজ্ঞানে হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

স্নেহের চেয়ে বড়

শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ

মছলন্দপুরের রায়বংশ ডাকসাইটে বংশ। ভারি জমিদার। এককালে খ্যাতি ছিল খুবই—আজ আর নাই। আছে খালি ঐ নামে-মাত্র নামটা—সে বিত্ত আর নাই। রাজা খেতাব কোন্‌কালে কে আদায় করিয়াছিল তাহার ইতিহাস অবিদিত, তবে আজও তাহা এই বংশের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া চলিতেছিল। আভ্যন্তরিক অবস্থার যদি কেহ সাক্ষী থাকিত, সে অনায়াসে প্রকাশ করিয়া দিতে পারিত যে, সেকালের সেই পাকা ইমারৎ ধূলিমলিন ছিন্নদেহে সগর্বে দাঁড়াইয়া থাকিলেও খাদ্য-সামগ্রী এবং পোষাক-পরিচ্ছদের দিক্ দিয়া অধুনা এই রায়-পরিবার আমাদেরই মত সাধারণ গৃহস্থ। তবে পার্থক্য এইটুকু যে, অবস্থা যাই থাক, এখনও মছলন্দপুরের রায়বংশ বলিলে একডাকে যশোর জেলার সকলেই চেনে। চাকুরি-বাকুরি ইহাদের পেশা নয় এবং কেহ কখনও চাকুরীর খোঁজে বাহির হয় নাই।

এ হেন জমিদার-বংশের বড় তরফের বড় ছেলে নলিনীনাথ তিনবার বি এ ফেল করিয়া চাকুরির চেষ্টায় লাগিয়া গেল। বছর তিনেক বাদে পিতা প্রিয়নাথ বাবু খবর পাইলেন যে, তাঁহার ছেলেটি অধঃপাতে গিয়াছে এবং রাত্রিতে মাতাল অবস্থায় যে সকল স্থানে তাহাকে

দেখা যায়; তাহাতে অনুমান করা চলে যে তাহার আর নষ্ট হইতে বাকি নাই। এই সংবাদে প্রিয়নাথ বাবু খুবই আঘাত পাইলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরের বেদনা তাঁহার সদা প্রফুল্ল সহাস্য আননের বার্ধক্যজনিত অর্ধ-স্তিমিত সৌম্যতার এতটুকু অপচয় করিতে পারিল না। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র অমরনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোর দাদার কীর্তি শুনেছিস? থাক সে কথা তোকে না বললেও চলে। তবে তার এ বাড়ীতে আর আসা হবে না। তুই জেনে রাখ।" ইহার উত্তরে অমরনাথ কি বলিতে যাইতেছিল। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—"না, না, আর দাদার হয়ে উমেদারী নয়, কোন অনুরোধ-উপরোধ, তদ্বির-তাগাদায় কিছু ফল হবে না। এ বিষয়ে আমি অটল।"

অমর চুপ করিয়া গেল। প্রিয়নাথ বলিয়া চলিলেন—"তুই কলকাতায় যাচ্ছিস যা, এই জন্যেই তোকে আমি তার সঙ্গে রাখিনি। কোলকাতায় গিয়ে আর ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করিসনে, তোর এম এ পরীক্ষা শেষ হলেই বাড়ী চলে আসবি, আর চাকুরির চেষ্টাও করিসনে।"

প্রিয়নাথ বাবুর ছোট ছেলেটি যেবার টায়ফয়েড় রোগে পঁয়ষট্টি দিন ভুগিয়া মারা যায়, সেবারে তিনি প্রায় পাগলের মত হইয়াছিলেন, কিন্তু অমরনাথ কাছে ছিল এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষা পরিত্যাগ করিয়া বহু সেবা-যত্নে এবং সঙ্গদানে জ্যেষ্ঠতাত প্রিয়নাথকে সুস্থ অবস্থায় আনিতে পারিয়াছিল। নলিনীনাথ ছোট ভাইকে দেখিবার জন্যও একবার বাড়ীতে আসে নাই। পুত্রের সহিত পিতার সাংসারিক বন্ধন ক্রমে ক্রমে একেবারে ছিন্ন হইয়াছিল, তাঁহার সমস্ত স্নেহ গিয়া পড়িয়াছিল অমরনাথের উপর। সেই যেন তাঁহার আপনার ছেলে। এই অমর হইতেই তাহার সমস্ত দুঃখ ঘুচিয়াছিল, নলিনীর জন্য তিনি মনে কোন ক্ষোভ রাখেন নাই। অমরকে তিনি ভাল মাষ্টার এবং ভাল বোর্ডিংএ রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতে কখনও কার্পণ্য করেন নাই। নিজের স্ত্রীকে প্রিয়নাথ অর্ধ বয়সে হারাইয়াছিলেন। সেই হইতে ইহ-সংসারে দাবা এবং একমাত্র অমরই ছিল তাঁহার সঙ্গী। অমর যখন বাড়ী থাকিত তখন তো কথাই নাই—কি করিয়া তাহার চরিত্রের উন্নতিবিধান করা যায়, কি করিয়া তাহাকে আনন্দ দেওয়া যায়, এই লইয়াই এই সদালাপী সচ্চরিত্র বৃদ্ধ সর্বদাই ব্যাপৃত থাকিবেন। তারপর সে যখন উচ্চতর বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় চলিয়া যায় তখনও বৃদ্ধ কদাচিৎ কখনও সেখানে গিয়াও উহার তদারক করিয়া আসিতেন। মাঝে মাঝে যখন তাঁহার হিতৈষীরা তাঁহাকে বলিত—"আপনি করছেন কি বড়রাজা! নিজের ছেলে গেল ভেসে, পরের ছেলেকে বুকে করে মানুষ করে তুলছেন? কিন্তু পর চিরকালই পর, আজ না হয় ভাইয়ে ভাইয়ে সদ্ভাব আছে, কাল যখন অসদ্ভাব হবে, তখন কি মনে করেন ঐ ছেলে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে? সে মনেও যায়গা দেবেন না।"

বৃদ্ধ এই কথার বিশেষ কোন জবাব করিতেন না, অন্য কথায় আলাপের পরিসমাপ্তি করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন।

(২)

এই সংসারে আশ্চর্য বলিয়া বোধ করি সত্যকার কিছুই নাই, তাহা না হইলে এতখানি স্নেহপ্রবণ যে মানুষ সে নিজের ছেলের প্রতিই বা এমন উদাসীন রহিল কি প্রকারে? তাহার চেয়েও আশ্চর্য এই যে এমন সর্বগুণান্বিত পিতার পুত্র এমন কদাচারী হইলই বা কেন? এবং তাহা অপেক্ষাও আশ্চর্য প্রিয়নাথের এতখানি স্নেহ অমরনাথের পিতা এবং মাতা সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন এই উল্টা স্নেহের মধ্যে প্রিয়নাথের নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে। হয়ত বা অমরনাথ যে নাতিপ্রশস্ত মাতুল-সম্পত্তি মাতুলবিহীনতার জন্য লাভ করিয়াছিল, তাহারই প্রতি প্রিয়নাথের লোভ আর না হয়ত অমরনাথ মেধাবী ছাত্র—সম্প্রতি এম এ পড়িতেছে—তাহার বুদ্ধিমত্তা এবং জীবনের সফলতার সম্পূর্ণ ফলটুকু বুড়া উপভোগ করিতে চায়। নইলে এমন অসম্ভব কি করিয়া ঘটিল।

স্বামী-স্ত্রীতে এই প্রকারের আলাপ-আলোচনা কিছু

দিন ধরিয়া চলিতেছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া ইহা বৃদ্ধের নিকট বলিতে কেহ সাহস পায় নাই। কিন্তু ক্রমাগত ব্যাপারটা এমনই দাঁড়াইয়া গেল যে প্রিয়নাথ বাবু নলিনীনাথের কোন খোঁজ-খবরই লয়েন না, উপরন্তু তাহার নাম শুনিলেই চটিয়া উঠেন, অপরপক্ষে অমরনাথের পত্র প্রতি সপ্তাহে একখানা করিয়া না আসিলে কলিকাতা পর্যন্ত ছুটিয়া যান। কাজেই আর বিলম্ব করা চলেনা। স্বামী-স্ত্রীর গোপন বৈঠক এইবার আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। একদিন রাত্রিতে প্রিয়নাথ যখন সবেমাত্র দাবার আড্ডা হইতে ফিরিয়াছেন তখন ছোট ভাই সুরেন্দ্রনাথ খুব বিনয়সহকারে কহিল—"দাদা, একটা কথা অনেক দিন ধরে বলি-বলি করেও বলা হয়না, আজ বলবো ভাবছি।"

প্রিয়নাথ কহিলেন—"তা বলার বাধা কি? তুমি নির্ভয়ে বল।"

সুরেন্দ্রনাথ ঢোক গিলিয়া, ইতস্ততঃ করিয়া, কহিল—"দাদা, আমরা তো এক রকম কাটিয়ে দিয়েছি, একদিনের তরে দুকথা হয়নি। কিন্তু আমি বলছিলাম কি আজ-কালকের ছেলেছোকরাদের মধ্যে বনিবনাও হয় কি না হয়। অমর—নলিনী তো দুটি দুই প্রকারের।"

"সে তো বটেই! তা কি করতে বল?"

"তাই আমি বলছিলাম যে বিষয়-আশায়গুলো সব একটু নিশেনা করে নিলে হোতনা?"

একটা অজানা বিষয়ে মুহূর্তের জন্য প্রিয়নাথের অন্তরটা একবার দুলিয়া উঠিয়াই আবার স্থির হইল। আরও মুহূর্ত কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া প্রিয়নাথ কহিলেন—'হুঁ, কিন্তু কি তুমি বলতে চাও?"

"আমি বল্‌ছিলাম যে এলোমেলো বিষয়গুলো একটু চিহ্ন দিয়ে নিলেই হোত।" প্রিয়নাথ ক্ষণকালের জন্য সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া খুব ধীরে এবং গম্ভীর কহিলেন—"সুরো! তুমি কি পৃথক হতে বল্‌ছো আমাকে?"

সুরেন্দ্রনাথ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জবাব দিল—"না, না, ঠিক তা নয়, তবে একটু চিহ্নিত করে রাখতে চাই যে পরিণামে যেয়ে,—আর তোমার কি দাদা! তুমি তো একবেলা একমুঠো আতপ চাল সিদ্ধ আর কাঁচকলা ভাতে খাও। খরচ এক প্রকার নেই বললেই হয়।"

প্রিয়নাথ কহিলেন—"কিসে চিহ্ন লাগাবে? বিষয়-আশয় আমার কোন্ কাজে লাগবে? ও সবই অমরের—আমি বিষয় পৃথক করে নিয়ে কি করবো বল?"

সুরেন্দ্রনাথ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"সে কি দাদা? সে কি হয় কখনও? নলিনীর অংশ যাবে কোথায়? তার অংশ তাকে দিতে হবে তো।"

"তোমার গরজ হয় তুমি পরে দিও তখন, আমি সে প্রয়োজন দেখিনে। এ বংশের উপর যে কলঙ্ক এনেছে, তার উপর আমার সহানুভূতি নেই। এই আমার শেষ কথা। এর বেশী যেন আমাকে বলতে না হয়, এবং শুনতেও না হয়।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিল—"পৈতৃক বিষয় আর আমাদের কিই বা আছে। যেয়েথুয়ে যা আছে সামান্যই। তবে হালে যে-সব সম্পত্তি আমি খরিদ করেছিলাম, সে গুলো আর ভাগ-বাটোয়ারা করবো না। পুরোনো আমলের বিষয়গুলোর অর্দ্ধেক অংশ সে পাবে।"

এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া যাইতেছিল। প্রিয়নাথ পিছন হইতে চেঁচাইয়া ডাকিলেন—"সুরো! শুনে যাও।" সুরেন্দ্রনাথ আসিলে বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন—"বিষয় চুল চিরে ভাগ করে দাওগে। শুধু অমরের মাতুল-সম্পত্তি ভাগ হবে না, তাছাড়া যাবতীয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ আমার।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিল,—"সে কেন হবে দাদা? আমি নিজে যা টাকা দিয়ে কিনেছি তা ভাগ হতে যাবে কেন।"

"যাবে জয়েণ্ট ফ্যামিলি ব'লে, যাবে তুমি কোন দিন চাকুরি করনি বলে।"

"না, আইনে তা হয় না দাদা। সমস্তই আমার স্ত্রীর নামে খরিদ করা।"

প্রিয়নাথ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"স্ত্রীর নামেই হো'ক আর পুত্রের নামেই হোক অর্দ্ধেক আমি চাই, একচুল তার কমতি না পড়ে।"

দুই ভাইয়ের এই প্রকারের আলাপের মাঝখানে হারাধন ডাক্তার হঠাৎ আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করিলেন। আর অনধিকারই বা বলি কেন! ডাক্তার বলিয়া তাঁহার গতিবিধি সর্বত্র এবং অবাদ। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সুরেন্দ্রনাথ যেন একটা কিনারা পাইল। সে আগ্রহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল—"ও ডাক্তার! শুনছো দাদার কথা? আমার স্বোপার্জিত সম্পত্তিতেও নারি ওঁর অংশ আছে?"

হারাধন প্রথমে একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল, কারণ ইহারা যে আলাদা হইতে পারে সে প্রশ্ন অবান্তর। তারপর উভয়ের মুখের দিকে দৃক্‌পাত করিয়া মুহূর্তে অনুমান করিয়া লইল, একটা কিছু ঘটিয়াছে নিশ্চয়ই। বুঝিল, জবাব একটা কিছু দিতে হইবেই। সুরেন্দ্রনাথই বিষয়-আশয় দেখিত, ডাক্তারকে সে দু-চার বার "কলও" দিয়াছে। ডাক্তার দেখিল সুরেন্দ্রকে হাতছাড়া করা যায় না। সে কহিলেন—"হ্যাঁ, তুমি নিজে যা ক্রয় করেছ, তার অংশ উনি চাইবেন কেন? আর তাছাড়া বিষয়ের দিকে ওঁর তো তেমন ঝোঁকও দেখিনে, ও সব বিষয়ে তো দেখি প্রিয়নাথ বাবু একেবারে নিষ্ক্রিয়।"

প্রিয়নাথ এতক্ষণে তাঁহার গড়গড়ায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষণকালের জন্য মুখ তুলিয়া কহিলেন —"সম্প্রতি ঝোঁক হয়েছে, হারাধন, এবং কতকটা সক্রিয়ও বটে।"

হারাধন ডাক্তার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সুরেন্দ্রনাথ একটা বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হারাধন ডাক্তার কহিল— "তুমি কেন ঘাবড়াচ্ছ সুরেন, রমজানপুরের সেকেদের যে বিষয়টা সেবারে তুমি কিনেছ, ওর আর অংশটংশ কি? সে তো তোমারই।"

এই কথার প্রিয়নাথ কোন জবাব করিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হইয়া শুইতে চলিয়া গেল। এইবার ডাক্তার আরম্ভ করিল—"কি বল বড়বাবু! ওতো এক পাগল। বিষয় বিষয় করেই গেল। দিলাম একটু আশ্বস্ত করে। ভাগ দেবে না, ভাগ দেবে না কি? সংসার যখন এক সঙ্গে, তখন আলবৎ দেবে, আপনিও যেমন বিচলিত হয়ে পড়েন! আদালত তো আছে। ওর সাধ্য কি ভাগ না দেয়।"

প্রিয়নাথ কোন কথারই জবাব দিলেন না। নির্বিকার-চিত্তে তামাক টানিতে লাগিলেন।

প্রিয়নাথকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত মনে করিয়া ডাক্তার আবার সুরু করিল—"আপনিও তো নিজের ছেলেকে দিলেন ভাসিয়ে, যত স্নেহ পড়লো আপনার অমরের উপর। পরের ছেলেকে ভালবেসে কি লাভটা হোল? এই তো আজই পৃথক হতে হোল? এখন কে সে আপনার?"

প্রিয়নাথ গড়গড়ার নলটিকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি দিয়া পূর্বের গাম্ভীর্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া কহিলেন— "এ লাভ-লোকসানের প্রশ্নই নয় ডাক্তার। এ বস্তু আলাদা।"

ডাক্তার আরও খানিক ভরসা পাইয়া কহিল—"আর না, এবার ছাড়ুন, অমরের দিক্ থেকে স্নেহটাকে ঘুরিয়ে এবার নলিনীর দিকে এনে ফেলুন, যেখানে কোন অধিকার নেই—"

প্রিয়নাথ ডাক্তারের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন —"অধিকার?" হ্যাঁ অধিকার নেই বটে। কিন্তু দেখ ডাক্তার, এ স্নেহ জিনিষটা বাইকের হ্যাণ্ডেল নয় যে ইচ্ছে মত ঘুরিয়ে এদিক্ থেকে ওদিকে চালিয়ে দেব।" এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন। তারপর হারাধন ডাক্তার আরও দুই চারিটা কথা যোগ করিয়াছিল কিন্তু তিনি আর জবাব দেন নাই।

(৩)

পরদিন সকালে উঠিয়া প্রিয়নাথ যেমন-তেমনই চলিতে লাগিলেন। কোনও প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না। নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ীর ঝি আসিয়া খাইতে ডাকিল না দেখিয়া তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন। আরও খানিকটা সময় কাটাইয়া দিলেন, তখনও ডাকিল না দেখিয়া তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে নিজেই বাড়ীর মধ্যে গেলেন এবং ছোট বৌকে উদ্দেশ করিয়া বাহির হইতেই শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন—"তোমাদের তো দেখছি

সব খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে বৌমা ! কৈ আমাকে তো ডাকলে না ? বুড়ো মানুষকে অভুক্ত রেখে তোমরা খেতে পারলে ত ? ছোট বৌয়ের তরফ হইতে কোন জবাব আসিল না দেখিয়া তিনি একেবারে বারান্দায় উঠিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন—"ছোটবৌ অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া অশ্রু মুছিতেছে। কি বৌমা! কাঁদছো? কেন, কি হয়েছে ? সুরো কি তোমায় কিছু বলেছে নাকি ? বকাবকি ঝগড়াঝাটি করেছে বুঝি ? ওটা একটা পাগল !"

ছোটবৌ ভাসুরের সহিত কথা কহিত, কিন্তু অন্তরালে থাকিয়া, একেবারে ঠিক মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কখনও কথা কহে নাই। আজ কি জানি কি মনে করিয়া ঠিক সেই-খানে থাকিয়াই জবাব দিল—"না কোন ঝগড়াঝাটি হয় নি। আপনি ঘরে গিয়ে একটু বসুনগে, আমি আপনার ভাত রেঁধে দিচ্ছি। শরীরটা খুব খারাপ বোধ করছিলাম, তাই একটু বিশ্রাম করতে গিয়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

প্রিয়নাথ একথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, আবার অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিতেও পারিলেন না। কি একপ্রকার সন্দেহে তাঁহার মন দুলিতে লাগিল। যাহা হউক তিনি ধীরে ধীরে আপনার ঘরে চলিয়া গেলেন।

ছোটবৌ তৎক্ষণাৎ সুরেন্দ্রনাথকে বহির্বাটী হইতে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলে—"দেখ, তোমার কালকের কথা শোনার পর থেকে আমার মন সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। ওঁর মুখ দেখে আর কথাবার্তা শুনে আমার কিন্তু ওঁর কথা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হচ্ছে। ঐ যে উনি বলেছেন—'ভাগবাটোয়ারা কি, সবই থাকবে অমরের,' আমার মনে হচ্ছে এ কথা তাঁর সত্যি।

সুরেন্দ্রনাথ গলা একটু খাটো করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিল—"তুমি কি যে বল, তার ঠিক নেই। মেয়ে মানুষ কাহে বলে কাকে! দেখ, ও আমরা অনেক দেখেছি। ঐই সোজা কথাটা তুমি বুঝলে না যে নিজের ছেলেকে যে ভালবাসে না, পরের ছেলের উপর তার স্নেহ একেবারে উথলে পড়ে না। সবই ভণ্ডামী। ও শুধু আমাদেরকে ভোলাবার একটা সহজ উপায় মাত্র! ওকি! এত বেলায় উনুন জ্বলছে যে, কি করছো বল ত? কি রাঁধছো ওটাতে?"

ছোটবৌ বলিল—"বড়ঠাকুরের জন্য আলোচাল আর কাঁচকলা সিদ্ধ চড়িয়ে দিয়েছি।"

"সে আর আমাদের ঘরে কেন? সম্পত্তিই যখন পৃথক করে নিচ্ছে, তখন আর হাঁড়িটা এক রেখে লাভ কি হবে? দেখ, আর জড়াতে যেওনা, আসল বুদ্ধিটা যখন মাথায় সময় মতই খেলেছে, তখন আর চক্ষুলজ্জা করতে যেও না, শেষে ঠকবে। দেখ, ভগবান্ আছেন।"

"সে তো তুমি বললে, কিন্তু বুড়ো মানুষ, 'বৌমা' বলে ডেকে এসে, কাছে দাঁড়িয়ে, খেতে চাইলে, আমি কি চুপ করে থাকতে পারি? পুরুষে আর মেয়ে মানুষে তফাৎ এইখানে।"

সুরেন্দ্র এবার একটু রাগতভাবেই বলিল—"পার আর নাই পার, ছেলের ভবিষ্যৎ মঙ্গল চাইলে তোমাকে পারতেই হবে, দেখ তুমি এক কাজ কর। তুমি না হয়, দিন কয়েক বাপের বাড়ী গিয়ে থাকগে, মাসখানেক বাদে এসো, ততদিনে আমি সব ঠিক করে নিতে পারবো। পুরুষে আর মেয়েমানুষে তফাৎ বুদ্ধিতে—স্নেহের মধ্যে নয়।"

"দেখ, অত ছল চাতুরীতে কাজ নেই, আজ তো তাঁকে দুটো ভাত রেঁধে দিই। আর দেব না। তুমি সে কথা তাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিও যে আমরা পৃথক হতে চাই। সত্যে ভয় কি?"

এইবার সুরেন্দ্রনাথ একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল—"হ্যাঁ, তা বৈকি। তোমাকে তবু তো সে কথা বলিনি, দাদা বলেন কি জান? বলেন যে আগাগোড়া সমস্ত সম্পত্তির সমান ভাগ করে তাকে অংশ দিতে হবে। তা না হইলে মোকদ্দমা করে বের করে নেবেন? শুনেছ কথা?"

"কৈ সে কথা তো তুমি আমাকে কাল বলনি। তুমি তো বললে তিনি বলেছেন—এসবই থাকবে।"

"বলিনি এই মনে করে যে ও পাগলামীর আর তোমাকে বলবো কি? হারাধন ডাক্তার এসেছিল; সে শুনে বললে ও একটা বাজে কথা, আদালতে ও কথা

টিকবে কেন ? ও তো শুধু গায়ের জোরেই বলা চলে।’

ছোটবৌ এবার বলিল,—“তোমার কাজের বিচার করা আমার স্বভাব নয়, উচিতও নয়। তবে আমার মনে কিন্তু ঐ একটা কথাতেই খটকা লেগে গেছে সে আমি তোমাকে বললাম।”

“কোন কথা ?”

“ঐ যে—যাকিছু সবই অমরের।”

“দুর, দুর, ও বাজে কথা, ভণ্ডামী দেখনা এই কালই তার প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি।”

“সে বাজেই হোক্ আর কাজেরই হোক তুমি যা ভাল বোঝ কর। আমি ভাত চড়িয়ে দিয়েছি, যাই আজ তো তাঁকে দুটো খাইয়ে দিইগে আর দেবনা।”

(৪)

পরদিন সকালে উঠিয়া প্রিয়নাথ দেখিলেন সুরেন্দ্র লম্বা ফিতা হাতে বাড়ীর চারিদিকে মাপামাপি করিয়া বেড়াইতেছে। জনকয়েক মিস্ত্রীও আসিয়াছে। কোন্ যায়গা দিয়া পাঁচিল উঠিবে তাহা সুরেন্দ্রনাথ পরিষ্কার করিয়া তাহাদেরকে বুঝাইয়া দিতেছে। প্রিয়নাথ বাধা দিলেন না—একটা বাক্য উচ্চারণ করিলেন না। কাজটা একটু সোর-গোলের সঙ্গেই হইতেছিল যাহাতে প্রিয়নাথ স্পষ্টই জানিতে পারেন এবং খাইবার সময় সরাসরি বাড়ীর মধ্যে না গিয়া একটা ব্যবস্থা নিজেই করেন। যাইবার সময় পর্যন্ত আর পৌঁছাইতে হইল না। প্রিয়নাথের অনুরক্ত চাকর বিহারী, সে প্রিয়নাথের সমবয়স্ক। সে বেলা ১০টা আন্দাজ আসিয়া সংবাদ দিল—“বাবু ছোটবাবুর তো পাঁচিল উঠে গেল।”

প্রিয়নাথ শুধু মাত্র কহিলেন—“সে তো দেখতেই পাচ্ছি।”

“আপনার ভাত তো বোধ করি আজ আর এক সঙ্গে হবেনা। উপায় কি ?”

প্রিয়নাথ সংক্ষেপে কহিলেন—“উপায় তুই।”

কি ভাবিল সে সেই জানে। বিহারী জিভ কাটিয়া কহিল—“ওপাড়ার মাতঙ্গিনী ঠাকরুণকে ডেকে আনবো। তেনার তো ঐ কাজ। মাসে একজোড়া কাপড় আর পাঁচটা টাকা দিলেই হবে।”

“কিন্তু কেন বিহারী ? তুই কি আমাকে একবেলা দুটো ভাতে ভাত রেঁধে দিতেও পারিবিনে ? আমার খাওয়া তো তুই জানিস; আর তোর খাওয়াও তো আমি জানি। এ কি এমনই দুঃসাধ্য ?”

বিহারী কহিল—“বাবু আমি যে জাতিতে মাহিষ্য, সে তো তুমি জান বাবু ?”

“কিন্তু মানুষ তো। নে, তুই যা বেহারী। এই বুড়ো বয়সে জাতবিচারটা না হয় একটু কমই করবো। তুই দুটো রাঁধগে। আমি বেশ মজার সঙ্গে খাব।”

বিহারী ইতস্ততঃ করিতেছিল। ভাবিয়াছিল বড়বাবু তাহাকে ঠাট্টা করিতেছেন। প্রিয়নাথ এবার ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন—“বিহারী তুই তাহলে পারবিনে ? স্পষ্ট করে সেই কথাটাই বল।”

বিহারী চলিয়া গেল। যাইবার কালে বলিয়া গেল—“তুমি যা বলতেছি তা আমি না করে পারিনে, কিন্তু আমার কনো দোষ নেই এতে।” এই বলিয়া সে কপালে একবার হাত ঠেকাইয়া কোন্ এক অজ্ঞাত ইষ্টদেবকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

প্রিয়নাথ কোন কথাতেই গা মাখাইতে চাহিতেন না; বিহারীর সহিত রোজই ছোট খাটো একটু আধটু কলহ কচিকচি হইতে লাগিল। দিন দশেক পরে স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের হেডমাষ্টার আসিয়া প্রায় কান্নার সুরেই বলিল—“বড়বাবু এই স্কুল আপনার নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত। আজ বত্রিশ বছর এই স্কুল আপনাদেরই সাহায্যে শৃঙ্খলার সঙ্গেই চলে আস্‌ছে। আর আজ তারই মাসোহারার পাঁচটা টাকা বন্ধ হয়ে যাবে ?”

প্রিয়নাথ খুব স্থির ভাবেই বলিলেন—“কালীচরণ আর দু’দিন সবুর কর ভাই, আমি অমরকে আসতে লিখে দিয়েছি, সে এসে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ব্যস্ত হতে হবে না।”

কালীচরণ “আচ্ছা” বলিয়া চলিয়া গেল।

এই ব্যাপারের আন্দাজ ঘণ্টা দুই পরে বিহারী

কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া জানাইল যে ছোট বাবু খামোখা তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়াছেন। তাহার অপরাধের মধ্যে উঠানের দক্ষিণধারে বারান্দার সিঁড়ির কোল ঘেসিয়া যে ডালিম গাছটি ছিল বিহারীর নিজের হাতে পোতা, তারই মূলচ্ছেদ না করিলে পাঁচিলের গতিটা বক্র হইয়া যায়, এইজন্য ছোটবাবুর হুকুমে সেই বেচারা গাছের প্রাণ সংশয় হইতে দেখিয়া সে চেঁচামেচি করিয়াছিল এবং সেই গাছেরই বিরুদ্ধে উদ্যত কুঠারের প্রতিরোধ কল্পে আপনার পৃষ্ঠদেশ দিয়া গাছের গুঁড়িটাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কি জমিদারের হুকুম-চালিত কুঠার বাগ মানে? বেচারা গাছ তো গিয়াছেই এবং ছোটবাবুর নিজের হাতের ধাক্কায় হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া বৃদ্ধ বিহারী একটা দাঁতও হারাইয়াছে। কাজেই এই ব্যাপার বিহারীর মর্মে শেলাঘাত করিয়াছে! তাহাই নানাপ্রকারে এবং নানাভঙ্গিমায় ব্যক্ত করিয়া দিতে বৃদ্ধ বিহারী হাউমাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল তাহা না যায় শোনা, না যায় বোঝা—উহা শুধু তাহার কান্নাটাকেই বিকৃত করিয়া তুলিতে লাগিল।

প্রিয়নাথ তাহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন—"বিহারী দুই দিন একটু সহ্য কর বাবু, অমরকে আসতে চিঠি লিখে দিয়েছি সে এলো বলে।"

বিহারীর কান্না থামিল বটে কিন্তু চেঁচানি থামিতে চাহে না। সে চেঁচাইয়া আরও অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়া পরিসমাপ্তির মুখে বলিয়া উঠিল—"খোকাবাবু কি তোমার দিকে হয়ে এর পিরতিকার করিতে পারবেন? তিনিও তো বাপের বেটা! তোমার—"

"ওরে নারে বিহারী! সে তার জ্যেঠামশায়কে চেনে। সে জানে, জ্যেঠামশায় সম্পত্তি নিয়ে বৃথা দ্বন্দ্ব করেনা। কোথায় এর গলদ, এই ঝগড়ার মূল কোথায় সে এক আঁচড়ে ধরতে পারবে। আর তা যদি না পারে তাহলে বুঝবে বিহারী আমি বৃথাই পরের ছেলেকে বুক দিয়ে মানুষ করেছি। ওরে না, না তা হয়না রে বিহারী তা হয় না। এতখানি স্নেহ বৃথা যায় না। জগৎটা এত অকৃতজ্ঞ আজও হয়নি। বাইরের লোকে যে নজরেই দেখুক না কেন, যাকে আশ্রয় করে আমার এই বুকভরা স্নেহ দাঁড়াবার বিশ্বাস এবং ভরসা পেয়েছে সে নিজে কখনও এতবড় ভুল করতে পারে না। তোরা ভাবিসনে, নির্ভাবনায় আর দুটো দিন কাটিয়ে দে দেখি।"

সংসারের শান্তি আর নাই। কিছুদিন ধরিয়া ভিতরে ভিতরে যে অসন্তোষের চাপা আগুন এই রায়-পরিবারের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমগ্র স্নেহকে শোষণ করিতে করিতে শুধু ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিতেছিল, তাহা এখন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শহরের একটা দায়রা মোকদ্দমায় প্রিয়নাথের জুরী হিসাবে ডাক পড়িয়াছিল। তিন দিন সেখানে কাটাইয়া বাড়ী ফিরিয়া প্রিয়নাথ বিহারীকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"বিহারী অমর এসেছে রে?"

বিহারী বলিল—"কাল আসিছেন। আজ সকালেই আবার কলকাতায় ফিরে গেছেন।" প্রিয়নাথ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমার কথা কিছু বলেছিল?"

"হ্যাঁ, পথে আমার সঙ্গেই তাঁর আগে দেখা হইছেলো আপনার কথাই তো জিজ্ঞেসা করতি করতি আসতিছেলো কিন্তু বাড়ী আসি আর খোঁজ নিলনা। তারপর আমি একবার মিথ্যে করে তুমি আইছো বলে ডাকতি গেছেলাম তা ছোটবাবু বলে দিলো এই যা যা ওর শরীর ভাল নেই ও যাতি পারবে না।"

প্রিয়নাথ শুধু মাত্র বলিলেন—"হুঁ"। তারপর ক্ষণপরে বলিলেন—"অমর সে কথা শুনেছিল?"

"হ্যাঁ, তিনি তো সামনেই বসেছেলেন।"

"যা, বিহারী তুই যা।" বলিয়া প্রিয়নাথ বাবু ঢিলাহাতা পাঞ্জাবীটি খুলিয়া দেওয়ালে টাঙানো একটা আলনায় বাধাইয়া রাখিলেন।

সেই দিনই বিকালের দিকে সুরেন্দ্রনাথ আসিয়া সবিনয়ে কহিল—"দাদা, বসৎবাটীটির ঝঞ্ঝাট তো এক রকম চুকে গেল। আমার মহাল আমি যথাসম্ভব পৃথক

করে নিয়েছি। তবে মেঠো জমি এবং রায়তজন প্রভৃতি বাইরের সম্পত্তির জন্যে কি সালিস ডাকবো?"

প্রিয়নাথ গড়াগড়ার নল মুখ হইতে নামাইলেন না। পরন্তু একটু জোরে জোরে টানিতে লাগিলেন। দাদার তরফ হইতে কোন জবাব আসিলনা দেখিয়া সুরেন্দ্র কহিল—"পৈতৃক বিষয়ের আপনি অর্ধেক মালিক; হালে যা কিছু নতুন খরিদ করা হয়েছে, সবই আমার একলার; এ তো আপনি মেনে নিতে চান?"

"সব সম্পত্তি সমান দুই ভাগ ক'রে এক ভাগ আমার আর এক ভাগ তোমার। এতো আমি পূর্বেই বলে দিয়েছি।"

এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিশেষ রুষ্ট হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল এবং সমস্ত বড় বড় প্রজার বাড়ী ঘুরিয়া যাহা তথ্য সংগ্রহ করিল তাহাতে বিশেষ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। তাহারা সকলেই বলিল—"আমরা আপনাকে খাজনা দিতে যাব কেন, বিশেষ যখন বাড়বাবুর সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য হয়েছে জানতে পেরেছি, আপনাকে তো শুধু খাজনা আদায়ের সময় মাঝে মাঝে দেখা যায়, ম্যালেরিয়ায় ভুগে আমরা যখন মরতে বসি তখন তো টাকা আসে ঐ বড়বাবুর পকেট থেকে, আপনাকে তখন কোনদিনই তো দেখতে পাইনে।" অতএব আদালতে মামলা রুজু হইয়া গেল। মাস ছয়েক ধরিয়া মামলা চলিল। শেষে আদালতের আদেশক্রমে সমস্ত বিষয় সমান দুইভাগে ভাগ হইয়া গেল। জজের আদালতে আপিল হইল। পরিশেষে উচ্চ আদালতে। সর্বত্রই ঐ একই রায় বহাল রহিল। সুরেন্দ্রনাথ আর দাদার সহিত কোন সূত্রে আলাপ করিতে আসে না। দাদার মহালের দিক্‌বর্তী তাহার ঘরের জানালাগুলি পর্যন্ত চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল।

অমরের এম এ পরীক্ষার ফল ভালই হইল। ১ম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া সে পাশ করিয়াছে; সেই সংবাদ লইয়া সে বাড়ীতে ফিরিল। অমরের পাশ করা এবং বাড়ী আসা উপলক্ষে বাছা বাছা বিশ ত্রিশ জন আত্মীয়-বন্ধুকে সমাদরে নিমন্ত্রণ করা হইল। অমরের জ্যেঠামহাশয়কে বলা হইল না। অমর-জননী নিমন্ত্রণের কথা উত্থাপন করিয়া ধমক খাইয়া চুপ করিয়া গিয়াছেন। অমর অত্যন্ত গোপনে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া জ্যেঠা-মহাশয়ের কাছে আসিয়া বলিল—"জ্যেঠামশায় বাবার ইচ্ছে নয়, তোমাকে নেমন্তন্ন করা। কিন্তু তুমি যে আমাদের মধ্যে নেই, সে আবার আমোদ কিসের। তাই আমি আবার গোপনে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। তোমার পায়ের ধুলো নিতে এলাম।"

প্রিয়নাথ বলিলেন—"কিন্তু তোর যাওয়া হবে না অমর। এতগুলো ভদ্রলোককে অপ্রস্তুত করতে পারবি না। এই তোর শিক্ষা? তোর জ্যেঠামশায় তোকে আজীবন সে শিক্ষা দেয়নি। তুই আজ ভুল করেছিস অমর। ফিরে যা, অতিথি-অভ্যাগত সবাইকে আদর-আপ্যায়িত করগে বাবা, তার বেশী তৃপ্তি তোর জ্যেঠা-মশায়ের আর নেই।"

"কিন্তু জ্যেঠামশায়, যেখানে তোমার অপমান।—"

"কিসের অপমান রে অমর? অপমান যাই বলিস্ আমিও তো তোর বাপ্‌কে অপমান করেছি। আদলতে মামলা করে তার কেনা সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছি। তার এত বড় আশার উপর আঘাত করেছি, সেই কি কম অপমান? আমি তো তাকে একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছি।"

অমর দেখিল জ্যেঠামশায়ের হৃদয় মহাসাগরের মত অগাধ। সেই সদাহাস্যময় প্রসন্ন চিত্তকে বিচলিত করিবার মত ঝঞ্ঝা আজিও প্রবাহিত হয় নাই। কোন সংঘাতেই সেই নিবাতনিষ্কম্প অসীম হৃদয়ের এতটুকু অপচয় ঘটে না। অমর একটু ভরসা পাইয়া বলিল—"জ্যেঠামশায় তোমায় যেতে হবে। আমি তোমাকে বলছি। বাবা না বললে তোমার অপমান কিসের?"

প্রিয়নাথ বাবু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"অপমানের কথা তুই বারবার কেন বলছিস অমর? আমাকে অপমান করার শক্তি তোর বাপের নেই। তুই যা, আমি যাব। তুই সময় মত ডেকে নিয়ে যাস। তোর পাশের আমোদ-আহ্লাদ আমি না থাকলে করবে কে?"

ইহারই খানিক পরে একটা ব্যাপার ঘটিল! পুকুর-

পাড়ে বসিয়া অমর ছিপে মাছ ধরিতেছিল এবং বিহারী তাহারই পাশে বসিয়া বেশ খুশীর সঙ্গে তাহাকে কি বলিতেছিল। ইহা সুরেন্দ্রনাথের লক্ষ্যীভূত হইবামাত্র সে কটু ভাষায় বিহারীকে গালিগালাজ করে, ইহাতে বিহারী কি একটু প্রত্যুত্তর করিয়াছিল; আর যায় কোথা, ছোটবাবু ক্রোধের উত্তেজনায় সে বেচারীকে ধাক্কা মারিয়া একেবারে জলের মধ্যে ফেলিয়া দিল। বুড়া সাঁতার জানিত না। নাকানিচোবানি খাইয়া কোন প্রকারে অমরের ছিপ ধরিয়া অর্ধপেট জলশুদ্ধ যখন উঠিয়া আসিল তখন তাহাকে দেখিয়া সুরেন্দ্রের নিজেরই পর্যন্ত মমতা বোধ হইতেছিল। সে তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া আসিয়া এই কথা যখন বড়বাবুকে জানাইল (অবশ্য এবারও যে সে কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য) তখন বড়বাবু বলিলেন—"আচ্ছা আমি ডাকছি অমরকে, দেখি এর কোন প্র—"

"আবার সেই অমরকে—অমর কি তোমার হয়ে, আমার হয়ে তার বাপের সঙ্গে ঝগড়া করবে? তোমারে অমরে পাইছে বড়বাবু।"

"ওরে হ্যাঁ, করবে রে করবে। সে আমার হাতে গড়া মানুষ। মানুষের এত লাঞ্ছনা তার প্রাণে সইছে না, তাকে আমি চিনি তোরা তাকে চিনিসনে।"

বুড়া গলার স্বর কি একপ্রকারে বিকৃত করিয়া কহিল—"ন চিনিনে! তিনি তো ছিল সেখানে।"

"কে ছিল? অমর? সে কি বল্লে, বল সে কি বললে?"

"কিছু না।"

"না? সে দেখেনি নিশ্চয়। দেখলে কি কখনও—"

"দেখেছে, দেখেছে, এতখানি ব্যাপার গড়ালো, এতগুলো লোক জড় হয়ে গেলো, আর তিনি তিন হাত দূরে বসে, কিছু দেখলো না!"

প্রিয়নাথ এখানেও সেই পূর্ববৎ শুধু—'হুঁ' করিয়াই নীরব হইলেন।

বিহারী বলিতে লাগিল—"তুমি এতো বোঝনা বড়বাবু, তার বাপ-মা তার কাছে ঢের বড়। তুমি না একটু ভালবাসো। কিন্তু তাই বলে কি বাপ-মাকে অগ্রাহ্যি করতে পারে।"

বড়বাবু ধমকাইয়া উঠিলেন—"বিহারী! তুই যা বলছি! যা বুঝিসনে তার মধ্যে কথা ক'সনে।"

বিহারী অন্তরালে গিয়া বাবুর বিনা অনুমতিতেই বাবুর তামাক সাজিতে লাগিল। আবার আহ্বান আসিল—বিহারী! বিহারী! বিহারী!

বিহারী বাবুর তামাকই একটু আস্বাদন করিয়া দেখিতেছিল, এবং তামাকটা কলিকার মধ্যে আধপোড়া করিয়া রাখিয়া বাবুর তামাকু সেবনের আরাম বর্ধন এবং উপশমের চেষ্টা পাইতেছিল। হঠাৎ ঝাঁঝালো গোটা কয়েক ডাক আসিয়া কাণে লাগায় সে কেমন থতমত খাইয়া গেল এবং কতকটা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় একেবারে হুঁকা সমেত দৌড়াইয়া আসিয়া হাজির হইল। বাবুর একেবারে নিকটবর্তী হইয়া হঠাৎ হুঁকার কথাটা স্মরণ হওয়ায়, জিভ্ কাটিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রিয়নাথ গুরুতর মনের অবস্থা লইয়াই তাহাকে ডাকিয়াছিলেন কিন্তু তাহার এই অবস্থা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। রসিকতা করিয়া বলিলেন,—

"প্রসন্ন মুখ নাহি কোন দুখ, অতি অকাতর চিত্ত
ছাড়ালে না ছাড়ে কি করিব তারে, মোর পুরতান ভৃত্য।"

সে তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল—অবশ্য জিভের অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ঘুচাইয়া। বড়বাবু হঠাৎ আবার গম্ভীর হইয়া কহিলেন—"আচ্ছা বিহারী! তুই যে ভালবাসার কথা বল্লি, ভালবাসা কি এ জগতে বড় নয়? তার বাবার চোখ রাঙানী কি ভালবাসাকেও ছাপিয়ে উঠবে?"

বিহারী তখনও নীরব রহিল।

প্রিয়নাথবাবু তাহার অপ্রস্তত অবস্থাটা [illegible] করিয়া কহিলেন—"বিহারী তুই যা; অমর এখুনই আমাকে ডাকতে আসবে। তখন তার কাছে আমি জিজ্ঞেস করবো, দেখি সে কি বলে।" এই বলিয়া তিনি নিজেই অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

বিহারীকে ভাত রাঁধিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, এদিকে অমর ডাকিতে আসিল না। যৎকিঞ্চিৎ ধুমধামের সঙ্গে যে প্রীতিভোজ চলিতেছে তাহার আয়োজন তিনি বাড়ী হইতেই পাইলেন। আরও খানিকটা অপেক্ষা করিলেন, আরও খানিকটা, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! সন্ধ্যা পর্যন্তও অমরের খোঁজ না পাইয়া তিনি ছোট বৌয়ের ঝি মোক্ষদাকে যাইতে দেখিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"ওরে অমর কোথায় রে?"

"খোকাবাবু? তিনি তো তাঁর বন্ধু জলবিম্বর বাড়ী নেমতন্ন খাতি গেছে। ওবেলায় ওরা খালো, এবেলায় খোকা বাবু খাবে।" এইটুকু সঙ্কুচিতভাবে বলিয়াই সে চলিয়া গেল। পারতপক্ষে সে বড় একটা বড়বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইত না। সেইদিন রাত্রিতে দাবা খেলিতে বসিয়া প্রিয়নাথবাবু পুনঃ পুনঃ হারিয়া যাইতে লাগিলেন। যে বিরিঞ্চি গাঙ্গুলী তাঁহার কাছে একদিন একটি বাজীও পায় নাই, তাহারই কাছে তিনি পুনঃ পুনঃ হারিতে লাগিলেন। পরিশেষে কি একটা 'চাল' লইয়া কথা কাটাকাটি হইয়া বড় বাবুর মাথা এত গরম হইয়া গেল যে রাজাটাকে উল্টা করিয়া ধরিয়া তিনি গাঙ্গুলী মশায়ের মাথায় এমন ঠোকর মারিলেন যে তাহার মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। মুহূর্ত মধ্যে সেখানে 'বঙ্গেবর্গীর' দ্বিতীয় অঙ্কের ৬ষ্ঠ দৃশ্যের মত একটা সিন্ হইয়া গেল। বৃদ্ধের মাথায় ফেটি বাঁধা অবস্থায় যাইতে দেখিয়া সুরেন্দ্রের দয়া হইল। সে তাহাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া কহিল—"কাল আমার সঙ্গে চল থানায় তারপর যদি না পুরো এক বছর জেল খাটাতে পারি তো আমার নাম বদলে রেখো।"

গাঙ্গুলী কহিলেন—"আর যা হয়ে গেছে ভাই, আদালতে দিয়ে দাঁড়ালেই তো এই ঘা শুকিয়ে যাবে না। এ আমারই কুগ্রহ, নইলে প্রিয়নাথের মত লোক, যে সাতচড়ে কথা কয় না তারই বা এমন দুর্মতি হবে কেন? এ আমারই অদৃষ্ট ভাই। আর আদালতে কাজ নেই।" পরদিন পরাণে নাপিত কামাইতে বসিয়া দাঁড়ির নীচেটা একটু কাটিয়া ফেলিয়া যে ঘুসি খাইল, তাহাতে তাহার সংজ্ঞা ফিরিতে প্রায় তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তারপর হারাধনের চিকিৎসাধীন থাকিতে হইল।

চারিদিকে একটা টি-টি পড়িয়া গেল যে বড় বাবুর মত লোকও এমন হইয়া গেল। সবাই বলিতে লাগিল যে তাঁহার এই পঞ্চান্ন বছর বয়সের মধ্যে আর কখনও এমন ভাবান্তর দেখা যায় নাই। যাহারা অশিক্ষিত তাহারা বলিতে লাগিল—ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে। যাহারা আলোকপ্রাপ্ত তাহারা বলিল—বড় বাবুর মস্তিষ্কের বিকার দেখা দিয়াছে, অর্থাৎ সোজা বাংলায় যাহাকে বলে পাগল। অশিক্ষিতও নয় আলোকপ্রাপ্তও নয় এমন যে বিহারী সে দেখিল, ভিন্ন দৃষ্টিতে। সে দেখিতে পাইল বড় বাবুর শরীর দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে। মেজাজ খিটখিটে হইয়া উঠিতেছে। শেষ রাত্রে উঠিয়া গড়গড়ার নল মুখে পুরিয়া তিনি যে কাসিতে আরম্ভ করেন সে কাসি সকাল পর্যন্তও থামিতে চাহে না। অমর বাড়ীতেই রহিয়াছে। তাহার বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে তাহার দৈবক্রমেও সাক্ষাৎ ঘটে না। ইহার কয়েক দিন বাদে দেখা গেল প্রিয়নাথ বাবুর মহালে সাড়াশব্দ নাই। ঘর দরজা খাঁ খাঁ করিতেছে। চাকর বিহারী এবং মনিব প্রিয়নাথের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না।

মহা ধুমধামে অমরের বিবাহ হইয়া গেল। দুই পক্ষের বিষয়-আশয়ই সুরেন্দ্রনাথ দেখিতে লাগিল। কোন গোলযোগ নাই। বহির্জগতের গোলযোগ নিরাময় হইয়া মিটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে অমরের অন্তর্জগতে। তাহার মন প্রায়ই ভাল থাকে না। তাহার মনে স্বতই এই কথা তোলপাড় করিয়া যায় যে, যে সকলই পরিত্যাগ করিয়া গেল সে কেন মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া শেষ বিন্দু পরিমাণ জমি পর্যন্ত আদায় করিল। তবে কি তার বাবা তাহাকে মিথ্যা বলিল যে জ্যেঠামশায়ের সকলই ফাঁকি—একটা মিথ্যা স্নেহের ভাণ। বিষয়ের উপর তাঁহার পুরাপুরি আশক্তি। ঐ অলীক স্নেহটা তাহার সমগ্র বিষয়টাকে হাত করিবার একটা ফন্দী। না, না, না কখনই—না। এমন অনাসক্ত সদাশিব আর নাই!

অমর রোজ ভোরে উঠিয়া জ্যেঠামহাশয়ের ঘরের দিকে ছুটিয়া যায় দেখে ঘর তেমনি খোলা পড়িয়া আছে। গড়গড়াটা পর্যন্ত মাথার শিয়রে তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি লইয়া গিয়াছেন মাত্র তাহার জ্যেঠাইমার একখানি তৈলচিত্র যাহা শিয়রের কাছে দেওয়ালে টাঙানো ছিল।

বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে প্রায় প্রত্যহই দুই একখানা চিঠিপত্র আসে। একদিন একখানা খামের চিঠি খুলিয়া অপরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া নীচের প্রেরকের নামের দিকে চোখ ফেলিয়া দেখিল—"আঃ শ্রীপ্রিয়নাথ রায়চৌধুরী।" সর্ব্বাঙ্গ তার শিহরিয়া উঠিল—এ কার চিঠি! বিস্ময়ের সঙ্গে চিঠি পড়িল।—তাহা এইরূপ :—

কল্যাণবরেষু—

অমর! আভ্যন্তরিক কি এক বিশ্রী উত্তেজনায় নিজের চরিত্রকে দিনের পর দিন হারিয়ে ফেলছিলাম। কয়েক দিন ধরে কেবলই অনুভব করতে লাগলাম—পূর্বের সে প্রিয়নাথ রায় আর নেই। এ যেন আর কে। হৃদয়ের মধ্য দিয়ে অনুভব করলাম—এইবার যদি না সবার ভেতর থেকে নিজেকে টেনে নিয়ে এক অপরিচিত দেশে ফেলি, রায়বংশের কলঙ্ক হবে আমা হতেই। যাক, এসব কথা পুরোণো।

আজ বুঝতে পারছি সব লাভলোকসান দুঃখ-সুখের বাইরে এইবার চলেছি, তাই ভাবলাম সবাই যদি আমাকে অবিশ্বাস করে থাকে, অমর নিজেও কি করবে? আর তা করলেই বা। মৃত্যুপথ-যাত্রীকে তো আর একটা "পক্ষ" হিসাবে ধরে নেওয়া চলে না, তাই একবার শেষ দেখা, তাও কি আশা করতে পারিনে? যেদিন আমার অন্তরের উপর আঘাত পড়েছিল, সেদিনও বিচলিত আমি খুব হইনি। শুধু ভেবেছিলাম—এ আমার কোন পাপের ফল। পাপ নিশ্চয়ই; তবে এতখানি পাপ এলো কোন পথে তাই ভাবি। তবে হিন্দুশাস্ত্র জন্মান্তরের কথাও তো চলে। আমিও তো হিন্দু।

তোমার যদি কোন অভিমান থাকে, আজ আর রেখো না, আসতে বিলম্ব কোরনা। শেষে হয়ত মজুরী পোষাবে না। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে এই আশাই রইল, যদি নাই হয়, বিহারীর হাতে তোমাকে আমার শেষ দান রইল। আমার স্নেহটাকে সুরো অবিশ্বাস করেছিল, তা মেপে দেখানর যন্ত্র ছিল না—বৈজ্ঞানিকরা এমন কোন ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট আবিষ্কার করেন নি যাতে করে স্নেহ মাপা যায়। আশা করি এ দান তোমরা কেউই অবিশ্বাস করবে না। এর সাক্ষীও আছে। সর্বান্তঃকরণে তোমার কল্যাণ কামনা করি। তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি যেন মানুষ হতে পার।

আঃ—শ্রীপ্রিয়নাথ রায় চৌধুরী

অমর যখন রওনা হইয়া যাইতেছিল, তাহার মা ধরিয়া পড়িলেন তিনিও যাইবেন। অমর তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঠিকানা অনুযায়ী কাশীর মদনপুরায় পৌছিয়া দেখিল বিহারী বারান্দায় বসিয়া কাঁদিতেছে। অমরকে দেখিয়া বলিল—"খোকাবাবু! আর একদিন আগে এলে দেখা পেতে। মরার সময়ে অনেকবার তোমার কথাই বলে গেছেন।" এই কথা বলিয়া বিহারী প্রকাণ্ড একখানি দলিল আনিয়া অমরের হাতে দিল। অমর দেখিল সেটা উইল। তাহাকে তিনি সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। বিহারীকে ১০৲ মাসোহারা দেবার নির্দেশ আছে। অমর বলিল—"মা! জ্যেঠামহাশয়ের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে আমি কাশীতে তাঁর নামে মঠ করবো, এতে তোমরা কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

মা বলিলেন—"আমাদের পাপের তার চেয়ে বড় কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না ভেবে দেখতে পারিস বাবা?"

কাশীপঞ্চকম্

শ্রীদেবীপ্রসাদ গুপ্ত

(১)

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ
সা তীর্থবর্যা মণিকর্ণিকা চ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥

বাসনা হইতে চিত্ত বিরত মনে এ পরমা শান্তি
সেই ত তীর্থ মণিকর্ণিকা দিব্য-উজল-কান্তি।
জ্ঞানের প্রবাহ সেই ত বিমল আদি-গঙ্গার ধারা
আত্মজ্ঞানরূপে কাশীধাম আমা হ'তে নয় ছাড়া।

(২)

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং
চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্।
সচ্চিৎসুখৈকা পরমাত্মরূপা
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥

ইন্দ্রজালের মতই মিথ্যা কল্পনাগড়া বিশ্ব
মনের মায়ায় হেরি অভিনব এই জগতের দৃশ্য।
সচ্চিৎসুখ স্বরূপ যাঁহার পরমানন্দে গড়া
আত্মজ্ঞান রূপে কাশীধাম আমা' হ'তে নয় ছাড়া।

(৩)

কোষেষু পঞ্চস্বধিরাজমানা
বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহম্।
সাক্ষী শিবঃ সর্বগতোঽন্তরাত্মা
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥

পাঁচটি কোষের মধ্যে ভবানী বুদ্ধির রূপ ধরি'
প্রতি দেহ তাঁর গেহ অনুপম, বিরাজেন অবতরি';
জীব শিব তিনি সাক্ষী আত্মা চেতনে আপনহারা
আত্মজ্ঞানরূপে কাশীধাম আমা' হতে নয় ছাড়া।

(৪)

কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্বপ্রকাশিকা।
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা ॥

মনের কাশীতে কাশীর প্রকাশ পরম আত্মজ্ঞান,
এ কাশী চিনেন সুজন যেজন কাশী ত তিনিই পান।

(৫)

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃ সাক্ষীভূতোঽন্তরাত্মা
দেহে সর্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যং কিমস্তি ॥

কাশীক্ষেত্র শরীর আমার ব্যাপিয়া ত্রিলোক মাতা
জ্ঞানের গঙ্গা মুক্তিদাত্রী পরমানন্দস্রোতা;
ভক্তি শ্রদ্ধা মোর গয়াধাম, প্রয়াগ আমার মনে
কল্যাণময় শ্রীগুরুদেবের চরণপদ্মধ্যানে;
ত্রিগুণ অতীত বিশ্বনাথ তুরীয় মোর অন্তরে
নির্বিকার ও সাক্ষীমাত্র আত্মার রূপ ধ'রে;
দেহেই সকল তীর্থ আমার কাজ কি তীর্থে ঘুরা
আত্মজ্ঞানরূপে কাশীধাম নয় আমা' হ'তে ছাড়া ॥

ভুলের তলে

শ্রীযতীন্দ্রনাথ আঢ্য, বিদ্যানিধি, সাহিত্যপুরাণরত্ন

সেবার একটু দেরী করেই বর্ষা নেমেছিল। তাই মাসটা আশ্বিন হলেও শারদরাণীর মেঘশূন্য নির্মল নীলাকাশ তখনও দেখবার সুযোগ কারও ভাগ্যে ঘটে উঠছিল না। প্রতিদিনই প্রায় সন্ধ্যার সময় একটু আধটু বৃষ্টি নামছিল। গ্রামের ভট্‌চায মশায় পাঁজি দেখে বলেছিলেন এবার মা নাকি আসছেন নৌকায়; হতেও পারে হয়ত, নইলে এত বৃষ্টি হবে কেন?

কদিন ধরে যেই ওপাশ থেকে আসছিল তারই মুখে শোনা যাচ্ছিল "কলকাতায় নাকি মস্ত বড় দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছে হিন্দু আর মুসলমানে।" এক পক্ষে শিখ, মাড়োয়ারী আর বাঙালী আর এক পক্ষে কাবুলী পাঠান আর এদেশী মুসলমান। দুই পক্ষে প্রতিদিনই অল্পবিস্তর হত আহত হচ্ছিল। আর্যসমাজিদের কি একটা শোভাযাত্রা বুঝি কোন একটা মসজিদের সামনে দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যাওয়ার ফলেই বেধে উঠেছিল এটা কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই দাঙ্গা এত বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল যে বিদেশী কোন লোকের পক্ষেই কলকাতা আসা বড় সুবিধাজনক হয়ে উঠছিল না। আর সেই সঙ্গেই সংক্রামক হয়ে সেই ব্যধি সমস্ত বাংলায় ছড়িয়ে পড়ছিল। উভয় শ্রেণীর গুণ্ডা ডাকাত আর বদমাইস দলের সুবিধা হয়ে উঠেছিল সেই ধুয়া ধরে লুট তরাজ করবার। শান্তিরক্ষকদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাই মুসলমানবিরল বীরপুর গ্রামেও সে চাঞ্চল্যের অভাব হয় নি। কোথা থেকে কে নাকি একজন মোল্লা এসে প্রচার করেছিল "একটা" কাফের মারা অনেকখানি পুণ্য সঞ্চয়ের পথ।"

সেদিন তাই কৃষ্ণাষ্টমীর নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও সন্ধ্যা না নামতেই মালাবতীর জঙ্গলের ভিতর ছোট্ট ভাঙ্গা মসজিদটির উঠানে অজস্র বারিধারাকে তুচ্ছ করেও একটা দলের কি একটা পরামর্শ-বৈঠক চলছিল্। বেঁটে কালপানা দাড়ীওলা একটা লোক ঝুপ ঝুপ করে জঙ্গলের মাঝখান থেকে বার হয়ে এল। সে এসে খবর দিলে "দুষমনেরা নাকি আজ এখানে এই মসজিদ ভাঙ্গতেই আসছে।" সর্দার চীৎকার করে উঠলে—"তোবা তোবা, এত আস্পর্দ্ধা ব্যাটাদের, এ কখনই হতে দেওয়া হবে না। কতদূর আর পথ ছ, সাত মাইলের বেশী হবে না। চাঁদ না উঠতে উঠতেই আমরাই চল্ ওদের ওড়গাঁদা' গাঁয়ের ভৈরব মন্দিরটা একেবারে চুরমার করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আসি ব্যাটা বামুনদের কত ক্ষমতা দেখা যাক্।"

দু' একজন বলে উঠলে—"কিন্তু সর্দার আমাদের নিজেদের এই আস্তানাটা কে দেখবে?" সর্দার বললে—"ভাবনা কি রে একা সাধুখাঁই একশ কেমন সাধু? পারবি ত? সেই বন্দুকটা না হয় তোরই কাছে থাকবে।"

সাধু অধোবদনে রইলে। সর্দার বললে—"কিরে ব্যাটা পারবি ত? ভাব একবার সেই সেদিনকার কথা।" সাধু বললে—"আমি নেমকহারাম নয় সর্দার, আপনার হিতার্থে আমার তুচ্ছ প্রাণটাও হাসতে হাসতে বলি দিতে পারি।" সর্দার বললে—"সাবাস ব্যাটা এই ত মরদমাফিক বাত।" তারপর সর্দারের হুকুমে আশেপাশের ছোটখাট ঝোপজঙ্গল থেকে কতকগুলে কাল কাল বোতল বার করা হল।

বোতলের ভিতরের জিনষটা মাছপোড়া, আলুচাটনী দিয়ে শেষ করেই গুণ্ডার দল হুড়মুড় করে বার হয়ে পড়লো তাদের মন্দির-ধ্বংসের অভিযানে। সাধুখাঁ ধীরে ধীরে তার অভ্যস্ত হাতে বন্দুকটা তুলে নিয়ে চারপাশ একবার ঘুরিয়ে দেখলো সব ঠিক আছে কি না। তারপর একটা খুব বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনেকক্ষণ তার সহকর্মীদের যাত্রাপথপানে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলে। এইভাবে প্রায় আধঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর কি জানি কেন

তার শাদুলের মত প্রদীপ্ত নয়ন দুটি হ'তে দরদর ধারে, ব্যথার ধারা ঝরে তার প্রশস্ত বক্ষকে সিক্ত করে তুলতে লাগলে। বেচারা বন্দুকটি মাটিতে রেখে মাথায় হাত দিয়ে সেইখানে বসে ভাবতে লাগলে তার অতীত জীবনের স্মৃতি।

বাহিরের ভীষণ নিবিড় অন্ধকারের মত ভিতরেও তার অন্ধকারের প্রচণ্ড পর্বত জমে উঠে; চারিপাশের গভীর বনানীর মতই প্রবল প্রভঞ্জন হু হু শব্দে আন্দোলিত হয়ে উঠছিল। ভাবছিল কি ছিল আর আজ হয়েছে কি সে। কিন্তু সে কার অপরাধে? সে কি প্রকৃতই তার জন্য দায়ী? কথাটার উত্তরে অন্তর থেকে অন্তরাত্মা তার দৃঢ়ভাবে না না বলে অস্বীকার করে উঠলে। যে ওড়গাঁদা গ্রাম আজ আক্রমিত হচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে তার সহকর্মিদের দ্বারা, সেই ওড়গাঁদাই না তার জন্মভূমি, কেবল জন্মভূমি নয়, পিতৃ-পিতামহ-পূর্ব পুরুষের, জননী, স্বর্গাদপী গরীয়সী তীর্থক্ষেত্র পুণ্যস্থান। তবে তার বাহুতে আজ এত বল, বুকে এত শক্তি থাকতে, কাপুরুষ, ভীরুর মত সে তাই দাঁড়িয়ে দেখবে শুনবে, আবার কেবল তাই নয়, দেশদ্রোহী হীন কুকুরের মত সে তার সাহায্য করবে, সহযোগিতা করবে। ধিক শতধিক তাকে, গভীর আত্ম-গ্লানিতে তার চিত্ত হাহাকার করে উঠলো।

কিন্তু ঈশ্বর? ও নির্মম ঈশ্বর, দোষ কার? কোন্ পাপে সে আজ এই জঘন্য ধ্বংসপথের পথিক? তার এখনও বেশ মনে আছে যে ভৈরব-মন্দির আজ হয়ত দুষ্ট বুদ্ধি শয়তানদের অত্যাচারে একটু পরে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হবে যেখানে ঠিক সেইখানেই তার মা, ঠাকুর মা তার নিজেরই অন্নপ্রাশনের সময়, বিয়ের সময়, যে কোন শুভ কাজে পূজা দিয়েছে একথা সে দেখেছে, শুনেছে, জানে। যে পাহল জাতি আজ এই শয়তানদের প্রতিপক্ষ সেই পাহল জাতির রক্ত-স্রোতই না তার প্রতি ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত। সে নিজে না সাহসী সাধুচরণ। তবে একি বিধাতা!

সে ভাবলে সর্দারের কথা—"সাধু সেদিনের কথা মনে করে দেখ্।" ঠিকই সেদিন, যেদিন তার অনুপস্থিতিতে তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অপরূপ সুন্দরী ভগ্নী সাবিত্রীকে দুর্বৃত্ত জমিদার প্রিয়নাথের অনুচরবর্গ গভীররাত্রে এসে তার ঘুমন্ত পিতাকে বেঁধে ফেলে চুরি করে নিয়ে যায়—সেদিনের কথা। সমাজের কুলধ্বজীদের কথাতেই যে সাবিত্রীকে তারা আড়াই বৎসরে বিয়ে দিয়ে গৌরী-দানের পুণ্য সঞ্চয়ে ব্রতী হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে আর দুটো বৎসর যেতে না যেতেই সেই সাবিত্রীকে মাথার সিন্দুর মুছে অভাগিনী সাজতে হয়েছিল তারপর যখন বার বৎসরের কিশোরী সে যৌবনের পরিপূর্ণতা তার শরীরে আর ধরে রাখতে সে সক্ষম হচ্ছিল না, তখন সাধু চেয়েছিল আবার একজনের হাতে তাকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভর হতে। কিন্তু এই কুলধ্বজীদের আদেশমতই শাস্ত্রে নাকি নিষেধ আছে বলেই তাকে সে পথ হতে নিবৃত্ত হতে হয়েছিল।

কিন্তু তারপর, যেদিন সে শীলদাগ্রামে তার বাল্যের সহচরী বাক্‌দত্তা কন্যা লক্ষীর সঙ্গে নিজের বিয়ের কথা পাকা করে আসবার জন্যে চলেগিল সেই দিনই রাত্রে তার ঘুমন্ত পিতাকে বেঁধে রেখে, তার মায়ের সহস্র আর্তনাদ উপেক্ষা করে দুর্বৃত্ত দুস্যুদল সাবিত্রীকে না চুরি করে নিয়ে পালায়। আর আজ পর্যন্ত সে সাবিত্রীর জন্য, বহু চেষ্টা করেও সে তার অনুসন্ধান করতে পারেনি। তবুও তাদের এই বিপদের সময় সাধুর মায়ের, সাবিত্রীর, দিক্‌-বিদারী আর্তনাদে গ্রামের যে প্রতিবাসীরা আত্মরক্ষার্থে স্ব স্ব গৃহদ্বার সুদৃঢ় অর্গলবদ্ধ করে বসেছিল, তারাই না সাবিত্রীকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করে ঘরের বাইরে এসে সাধুর পিতাকে যা হবার তা হয়েছে সেজন্য অনুতাপ করতে নিষেধ করে এর জন্য ভাল ভাবে একটা প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজ-ধর্ম বজায় রাখতে উপদেশ দিতেও কার্পণ্য করলেনা।

কথাটা কিন্তু সাধুচরণ বাড়ী ফিরে এসে যখনই শুনলে তখনই সে যেন একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলে; সমাজধ্বজীদের কোন কথাই তার কানে ঢুকলনা মোটেই। বরং সে কুলত্যাগী বোনটার সন্ধান না পেলেও তারই সন্ধানে দিনরাত লেগে রইলে। ফল কিন্তু এর খুব সুবিধা হোলনা।

সে সমাজ-পতিত বলে সমাজপতিরা গ্রামে গ্রামে ঘোষণা দিলে। কাজেই লক্ষীর বাবা তার বাক্‌দত্তা কন্যাকে অরক্ষণীয়া বলে অপর পাত্রে অর্পণ করতে কার্পণ্য করলনা। এতেও কিন্তু সমাজপতিদের প্রতিশোধ স্পৃহা কমল না। দিনরাত খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করে সাধুও যত ভগ্নীর অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যস্ত করে তুললো, তাঁরাও কি প্রকারে তার মহাপাপ অনুষ্ঠান হতে সে বিরত হয় তার জন্য প্রাণপণ সচেষ্ট হয়ে উঠলে। শারীরিক পরিশ্রমেই সাধুর সংসার চলত। এখন কিন্তু সে আর কেবল ধোপা নাপিত ছাড়া হয়েই নিস্তার পেলেনা যেখানে বাঁধা বার্ষিক বেতনে কাজ করত সেটুকু ত গেলই উপরন্তু গ্রামের ও তার পার্শ্বস্থ কোন গ্রামেই কেউ আর তাকে কোন কাজ দিতে চাইলে না। ধীরে ধীরে সঞ্চিত যৎসামান্য ঘটি বাটি পুঁজি-পাটা সব নিঃশেষ হয়ে গেল—এখন সংসার চালান দায়। যেমন করে হোক তিনটি উদর তাকে পুষ্ট করতে হবে, বেচারা ভিক্ষার জন্য নয়, গতর খাটিয়ে অর্জন করবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ালে—কেউ তার দিকে মুখ তুলে চাইলে না!

এক দুই করে পূর্ণ চারদিনের অনাহারের পর নিজে না খেতে পেয়ে মারা যাক্ কিন্তু বৃদ্ধ জনক-জননীর মুখে সে কি দেবে এই চিন্তামগ্ন হয়ে সে যখন অনির্দিষ্ট ভাবে পথে চলেছিল, ঠিক সেই সময় তার দেখা হল এই সর্দারের সঙ্গে। কি জানি কেন তার শুকনো মুখ আর সবল বাহুপেশী দেখেই বোধ হয় সর্দার তাকে কাছে ডেকে সমস্ত তথ্য জানতে চাইলে। সত্যবাদী নির্ভীক বেচারা সরলভাবে সমস্ত কথা তার কাছে ব্যক্ত করলে।

সর্দার বল্‌লে—"আমি তোমায় কাজ দিতে পারি, কিন্তু এক সর্তে যখন আমি যা বলব যেমনই হোক তা তোমাকে স্বীকার করে নিতে হবে।" এই আত্মবিক্রয়ে যদিও সাধুর বীর হৃদয় একবার সতেজে অস্বীকৃত হয়ে উঠতে চাইলে সত্য কিন্তু পরক্ষণেই সে বৃদ্ধ জনক-জননীর উপবাস-ক্লিষ্ট মুখখানা স্মরণ করে তার কথা গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

সে থেকে সে সর্দারের কাছে বিভিন্নভাবে উপকৃত। বাধ্য হয়ে সে ধর্ম ত্যাগ করেছে, তার বাপ মাকে নিয়ে এসে তার আশ্রয়ে রয়েছে। দলের সঙ্গে সঙ্গে বেচারা দু এক জায়গাতে ডাকাতি করতেও গেছে। কিন্তু আজ আর তার মন কোথাও বা কোন কাজে কেন কি জানি যেতে চাইছিল না। কেননা প্রায় মাস খানেক তার মা ভয়ানক ভাবে আমাশয় রোগে ভুগে ভুগে একেবারে জীবনের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর অবস্থা এখন তখন। এমন সময় হঠাৎ পঞ্চায়তের জন্য আখড়া থেকে তার কাছে সর্দারের আহ্বান গিয়ে পৌছাল। তাই বিশেষ কোন বিপদ্ যদি এর মধ্যে ঘটে তবে তাকে খবর দিতে বলে, সে এখানে এসেছিল। কিন্তু সর্দারের দৃঢ় আদেশ পেয়ে বাধ্য হয়ে তাকে সেখানেই থেকে যেতে হল। তাই সে ভাবছিল এতক্ষণ মা তার কেমন রইল, তাই ত?

এমন সময় হঠাৎ পাশে একটু দূরে যেন কয়েকটা ছোট ছোট গাছ পালা নড়ে উঠল। ধ্যানমগ্ন সাধুর সমাধি ভঙ্গ হয়ে গেল,—"তাই ত শয়তান নাকি? তবে?" বন্দুক-খানা তাক করে সাধু সেই পাশে উঠিয়ে চীৎকার করলে—"কে রে?"

আগন্তুক উত্তর দিলে—"তোর বাবা।"

"বটে?" দড়াম করে সাধু ঘোড়া টিপলে, প্রবল ধুম উদ্গীরণ করে গুলি ছুট্‌লো।

"উঃ মাগো" বলে মাটিতে আগন্তুক লুটিয়ে পড়লে। সাধু অতি ত্রস্তে ছুটে এসে দেখলে—"একি ঈশ্বর একি করলে এযে সত্যই তার বাবা!" সাধু মাটিতে লুটিয়ে পড়লে।

প্রমীলা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম অঙ্ক—পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ-কক্ষ ; কাল—শারদ পূর্ণিমানিশি

[মুক্ত বাতায়ন-পথে চন্দ্রকরোজ্জ্বল সাগর দৃষ্ট হইতেছিল]

(রাবণ একাকী ; পাদচারণা করিতে করিতে)

রাবণ। নারায়ণ!
জাতিস্মর তোমার প্রসাদে!
তাই সদা মনে পড়ে বৈকুণ্ঠ-তোরণ!
মনে পড়ে সনকের অভিশাপ!
মনে পড়ে তোমার আশ্বাসবাণী ;—
তিন জন্ম বৈরীভাবে সাধনার ফলে,
অভিশাপ হইবে মোচন!
স্বপ্ন সম একে একে,
আমার মানস-পটে
ভেসে আসে ধীরে,
অতীত জনম কথা।
মনে পড়ে,
সেই আমি হিরণ্যকশিপু!
মনে পড়ে,
মুক্তি হ'ল জানুপরে তব,
অতি শুভ গোধূলি সময়!
মনে পড়ে,
মূর্তি তব মধুর ভীষণ!
ওগো মোর নারায়ণ,
যবে প্রভু বৈরিভাবে
কিঙ্করেরে দিলে আলিঙ্গন!
কিন্তু একি মূর্তি ধরি,
লঙ্কায় এসেছ প্রভু!
এ নহে ত বৈরিরূপী মূর্তি ভয়ঙ্কর!
এ যে নবীন নীরদ-কান্তি
শ্যামময় ভুবন-সুন্দর,
দাস্যভাবে ভজনা যাদের
সেই ভক্ত-জন-মন-চোরা মূর্তি মনোহর!
রামরূপে তুমি কিগো মোর
সেই নারায়ণ!
বল প্রভু!
রামরূপে এসেছ কি তুমি,
কিঙ্করেরে করিতে মোচন।
স্মৃতি-বিস্মৃতির দ্বন্দ্বে
জ্ঞান-দৃষ্টি আচ্ছন্ন আমার।
শ্যামতনু সীতাপতিরূপে
তুমি নারায়ণ!
দারুণ সংশয় জাগে প্রাণে।

[পরিক্রমণ]

(প্রতিকামীর প্রবেশ)

সংবাদ!

প্রতিকামী। রাজমন্ত্রী দরশন যাচে।

রাবণ। যাও,
লয়ে এস সাথে।

[প্রতিকামীর প্রস্থান ; পরে রাজমন্ত্রী সারণের সঙ্গে পুনঃ প্রবেশ ও অভিবাদনান্তর প্রস্থান]

এস মন্ত্রি!
তত্ত্ব কিছু করেছ সংগ্রহ
বিপক্ষ-শিবির হ'তে?

সারণ। রক্ষোনাথ!
নিরুৎসাহ রাম অনিকিনী।
বারবার নিষ্ফল প্রয়াসে

করি আক্রমণ,—
ফিরে গেছে সমুদ্রের পারে।
স্তব্ধ সব বাণের গর্জন।

রাবণ। উত্তম!
[পাদচারণা করিতে করিতে সহসা]
মন্ত্রি!
অবিলম্বে রামসৈন্য মাঝে
করহ প্রচার ;—
রক্ষোপতি দশানন,
বেত্রাঘাতে জর্জরিত করেছে মৈথিলী
অচৈতন্য চারুদেহ হ'তে তার,
অনর্গল ঝরে রক্ত-স্রোত।

সারণ। মহারাজ—

রাবণ। সারণ!

সারণ। এ হেন দারুণ মিথ্যা,
কোন প্রাণে—

রাবণ। হাঃ হাঃ হাঃ
এ হেন দারুণ মিথ্যা
কোন প্রাণে করিবে প্রচার ?

সারণ। সত্য মহারাজ!

রাবণ। সারণ!
জেনো রাজনীতি করায়ত্ত মোর!
যথাকালে প্রয়োজন হইবে বিদিত।
প্রশ্ন নাহি কর।
রাজ-আজ্ঞা পালহে সত্বর

সারণ। যথা আজ্ঞা দেব!
[প্রস্থান]

রাবণ। নারায়ণ নারায়ণ!
কোথা তুমি বৈরিরূপী অন্তরের ধন।
তোমার দর্শন-আশে
করিলাম স্বর্গ অভিযান ;—
না মিলিল দরশন সেথা।
পুরন্দর দেবগণ সহ,
মেগে শুধু নিল পরাজয়।
করিলাম পাতাল প্রবেশ,
সাগর শুকাল ভয়ে,
মিটিল না আশা।
রাজকর,—
বরুণ আনিয়া দিল।
মিথ্যা হ'ল ভুবনবিজয়
না মিলিল দরশন তব।
সীতাপতি!
তুমি যদি বৈরিরূপী মোর নারায়ণ!
নবোদ্যমে ছুটে এস শক্তিশেল হাতে।
ছুটে এস নারায়ণ,
লক্ষ্মীর লাঞ্ছনা শুনি।
রণক্ষেত্রে অস্ত্রে অস্ত্রে বাজুক ঝঞ্চনা।
বর্মে বর্মে হ'ক আলিঙ্গন।
[পরিক্রমণ]

(প্রতিকামীর পুনঃ প্রবেশ)
সংবাদ

প্রতিকামী। রক্ষোনাথ!
যুবরাজ চরণদর্শন-প্রার্থী।

রাবণ। আন সমাদরে।
[প্রতিকামীর প্রস্থান ; মেঘনাদের সঙ্গে পুনঃ প্রবেশ, পরে অভিবাদন পূর্বক প্রস্থান]
এস পুত্র!
নয়ন আনন্দ মোর!
একি!
বিশুষ্ক আনন কেন হেরি!
কি হয়েছে প্রিয়তম!

মেঘনাদ। পিতা পিতা!

রাবণ। একি!
কণ্ঠে কেন নাহি সরে বাণী!
বীরমণি!
এ ক্লৈব্যতা কিসের কারণ ?

মেঘনাদ। পিতা—পিতা!
চুরি করি এনেছেন সীতা!

রাবণ। [কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া]
এতদিন শুনিয়াছ কিবা?
মেঘনাদ। শুনিয়াছি এতদিন,
পিতৃস্বসা-অপমান প্রতিবিধিৎসিতে
পঞ্চবটী বনে—
পরাজয় করি রাঘব-লক্ষ্মণে,
এনেছেন রঘুকুলরাণী।
রাবণ। শুনিয়াছ মিথ্যা কথা।
শোন নাই—
রাবণ-শাসনে,
স্বর্ণমৃগ সাজিল মারীচ।
ছলে ভুলাইল রামে গহন কাননে।
পড়িল মারীচ বাণে,
রাম আর্তনাদে মুখর হইল বনভূমি।
চঞ্চল সৌমিত্রি,
ফেলে সীতা অমনি ছুটিল।
তারপর,—
আমি রাজা দশানন,
দীন ভিক্ষুকের রূপ করিয়া গ্রহণ;—
মুষ্টি ভিক্ষা মাগি, বৈদেহীর আগে,
সরলা মৈথিলী,
ভক্তিনম্র চিতে, আকুল আগ্রহাশয়ে,
ভিক্ষা দিতে ছুটে এল যবে,—
কেশে ধরি আঁখির পালটে,
অমনি তুলিনু রথে।
মেঘনাদ। পিতা—পিতা!
রাবণ। হাঃ হঃ হাঃ
পুত্র! একি!
নয়নে উদ্গত অশ্রু!
মেঘনাদ। পিতা!
রাবণ। একি!
অশ্রুর প্রবাহ বহে!
পুত্র!
ভেবেছ কি,—বলী রাম!
বলী সুমিত্রা-নন্দন!
তাই পরিহরি রণ,
ভীত দশানন,
হরণ করেছে জানকীরে?
তাই বহে অশ্রুর প্রবাহ?
তাই ভয়ে চঞ্চল পরাণ?
দীন মেঘনাদ!
মেঘনাদ। সত্য পিতা!
দীন মেঘনাদ!
কার্যে তব বিস্মিত জগৎ।
বুঝি কান্তা রেখে ঘরে,
লুব্ধকে না যাবে বনে কভু,
মৃগের হননে।
তপস্বীর মর্যাদা টুটিল।
ভিখারীর অন্ন উঠে গেল।
আর্তজনে দেখিবে না কেহ।
পিতা—পিতা!
রক্তনেত্রে ত্রৈলোক্য যে করিল শাসন,
সেই দশানন,
তপস্বীর ভয়ে
কেমনে সে ছলে সীতা করিল হরণ!
রাবণ। না—না—না—
নাহি জান তুমি।
আমি শুনিয়াছি, রাম—নারায়ণ!
জানকী—কমলা।
তাই পরীক্ষা করিতে,
সেই চক্রী নারায়ণে,
দেব নর রাক্ষস কিন্নর;—
মুগ্ধ যাঁর যাদুমন্ত্র বলে,—
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
ফিরে যাঁর আজ্ঞা অনুসারে;—
সেই চক্রী সহ বাদে,
মায়াজাল করিনু বিস্তার।
মুগ্ধ রাম!

মুগ্ধ স্থমিত্রা নন্দন !
মুগ্ধা সীতা বিদেহ-কুমারী।
নারায়ণ !
না-না-না
তুচ্ছ নর, নহে নারায়ণ !

মেঘনাদ। পিতা !

রাবণ। তবু ভীতমন !
চলে গেছে বিভীষণ !
যাও-যাও সাজাও স্যন্দন।
দীন বেশে শ্রীরামের লওগে শরণ।
ওই-ওই বুঝি ভেঙে পড়ে
স্বর্ণ-সৌধ-চুড়া।
ওই বুঝি ভাঙিল প্রাকার।
ওই বুঝি কাতারে কাতারে কপিসেনা
ছাইল লঙ্কার মাটি।
রোধিবারে সৈন্যস্রোত,
তুমি শুধু একাকী রাবণ।
পুত্র ? সেও বিপক্ষে দেবে হানা।
যাও যাও !
কি দেখ চাহিয়া মেঘনাদ !
দীন বেশে শ্রীরামের লওগে শরণ।

মেঘনাদ। পিতা পিতা !
ধরি পায়।
করিও না তিরস্কার আর !
ক্ষণিক দৌর্বল্য মোর,
টুটে গেছে বাক্য-কশাঘাতে।
নব উন্মাদনা,
শিরায় শিরায় করে উত্তেজনা।
পিতা পিতা !
রাখিব লঙ্কার মাটি
সৌধচুড়া প্রাকার তাহার,
শত্রুসেনা মুহূর্তে ফিরাব।

রাবণ। এস-এস পুত্র !
লঙ্কার গৌরব !
বক্ষে এস মোর।

[বিরাম]

ক্রমশঃ

ধরম-বাপ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ লাহা

(১)

রাজপুতানায় বিকানীর নামক একটি সহর আছে। সেই সহরের একটি ব্যাঙ্কে একদিন সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত লোক চলে গেছে। খালি ম্যানেজার আছেন। তিনি বসে টাকা গুণছেন। হঠাৎ তিন জন দস্যু এসে বললে,—"আমাদের টাকা দাও নইলে তোমায় মেরে ফেলবো।" তখন সেই ম্যানেজার বললে,—"আমি এ টাকা দিতে পারবো না। এ টাকা ব্যাঙ্কের।" তারা তখন সেই ম্যানেজারকে মেরে সমস্ত টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল।

ডাকাতদের পিছনে পিছনে বহুলোক ছুটলো কিন্তু তারা কিছু করতে পারলে না। দস্যুরা সন্ধ্যার অন্ধকারে পিছনে গুলি ছুড়তে ছুড়তে মরুভূমির মধ্যে পালিয়ে গেল।

(২)

এই ভাবে দুইদিন কেটে গেল তারা জল ও খাবার

যা এনে ছিল তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যতদূর দেখা যায় শুধু-ধূ-ধূ-মরুভূমি! তারা দেখলে দূরে একটা কি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ তারা সেটা লক্ষ্য করে ছুটলো। কিছু দূর যাবার পর তারা দেখলে একটা মরূদ্যান এবং একটা গাড়ীর মত দেখা যাচ্ছে। তারা কাছে গিয়ে দেখলে একটা গাড়ী এবং গাড়ীর মধ্যে একটি স্ত্রীলোক এবং একটা ছেলে। গাড়োয়ানটি নিকটে মরে পড়ে আছে। তারা তাই দেখে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে যে কি হয়েছে। তখন মেয়েটি বললে—"এই গাড়োয়ানটি কলেরায় মরে গেছে এবং আমিও এখনি মরে যাব। তোমরা ছেলেটির ধরম-বাপ। তোমরা যেমন করে পার আমার এই ছেলেটিকে বাঁচাও। আমার স্বামী বিকানীর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। আমি ছেলেটিকে নিয়ে স্বামীর কাছে যাচ্ছিলাম; পথে এই অবস্থা হয়েছে!" মেয়েটির ও সেই ছেলেটির অবস্থা দেখে দস্যুর হৃদয় ও গলে গেল। তখন তারা সব বুঝতে পেরে সেই ছেলেটিকে নিয়ে পুনরায় বিকানীর সহরের দিকে ফেরবার জন্য অগ্রসর হল। সেই মেয়েটির যা জল ও খাবার ছিল সেইগুলি নিয়ে তারা রওনা হল।

(৩)

কিন্তু তারা ঘোড়া ফেলে দিয়ে গেল কারণ দুটো ঘোড়া জলাভাবে সেই জায়গাতেই মরে গিয়েছিল। এইভাবে তারা একদিন, দুদিন ও তিনদিন চল্‌লে। তখন তাদের ভেতর একজন বললে,—"আমরা একজনকে আমাদের সমস্ত খাবার দিয়ে এই বালকটিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই। তা না হলে আমরা ছেলেটিকে বাঁচাতে পারবো না।" এই বলে তারা ছেলেটাকে একজনের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে ও তারা দুজনে পথে চলতে চলতে চার দিন পরে মরে গেল। এখন সেই লোকটি যার হাতে ছেলে আছে সে তার সমস্ত জল খেয়ে ও ছেলেটিকে খাইয়ে ফুরিয়ে ফেলেছে। জলের অভাবে সে দেখলে সহরে পৌঁছান তার পক্ষে অসম্ভব। এমন সময়ে সে দেখলে দূরে একটা জলাশয়ের মত দেখা যাচ্ছে।

প্রথমে সে ভাবলে উহা মরীচিকা; কিন্তু পরে যখন জলের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা গেল তখন সে দৌড়ে তার কাছে গেল এবং দেখলে যে সেই পুকুরের জল খারাপ ও উহার তীরে সাইনবোর্ডে লেখা যে এই পুকুরের জল বিষাক্ত, কেহ খেয়ো না। তখন সে ভাবলে যদি আমি এই জল না খাই তবে আমি ছেলেটিকে বাঁচাতে পারবো না। আমার প্রাণ অচিরে বহির্গত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি জল পান করি, তবে শরীরে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ হবার আগেই সহরে পৌঁছাতে পার্ব। এই ভেবে সে খুব জল খেয়ে নিয়ে পুনরায় দৌড়াতে আরম্ভ করলে। এই ভাবে দুদিন চলবার পর সে দেখলে যে তার পা যেন অবশ হয়ে আসছে এবং সে আর চলতে পারছে না। তখন সে দেখতে পেলে যে দূরে একটি মন্দির; তার মধ্যে বহুলোক রয়েছে এবং মন্দিরে দেবতার আরতি হচ্ছে। সে তখন আরও জোরে ছুটতে লাগলো এবং মন্দিরের কাছে এসে চীৎকার করে বলে উঠলো—"কে আছ এই ছেলেটিকে রক্ষা কর" এই বলে সে ছেলেটিকে রেখে পড়ে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করে অনন্ত শূন্যে মিলিয়ে গেল। তখন লোকে তাড়াতাড়ি এসে দেখে যে একটি লোক মরে রয়েছে এবং তার কোলে একটা ফুল্লকুসুম-কোরকের মতন শিশু হাসছে। শিশুটির গলায় একখণ্ড কাগজে কি লেখা আছে। সে লেখা পাঠ করে লোকগুলো জানতে পারলে যে এই মাতৃহারা শিশু দস্যুহস্তে নিহত ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের ছেলে। তাদের মধ্যে এক জন মহিলা ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন,—"আমি এই ছেলের লালন-পালন করব।"

এরূপে দস্যুরা তাদের প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে প্রকৃত "ধরম-বাপে"র পরিচয় দিয়েছিল।

কাপ্তেন জেমস কুক

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কুকের প্রথম অভিযানের সফলতা

কুকের প্রথম অভিযান বহুবিধ সাফল্যে পরিমণ্ডিত। এই অভিযানে প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বহু অজ্ঞাত দেশ ও দ্বীপ আবিষ্কার করিয়া তাহাদের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন; বৃটিশের নূতন রাজ্য সুদূর সমুদ্র-পারে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিশেষত ব্যাঙ্কের উদ্ভিদ্-সম্বন্ধীয় সংগ্রহ এই অভিযানকে অধিকতর গৌরবান্বিত করে। নৌবিভাগ কুককে কম্যাণ্ডার পদে উন্নীত করিল। তাঁহার প্রশংসায় মুখর নৌবিভাগ লিখিলেন—"মাননীয় ওমরাহ্গণ আপনার সমুদয় কার্য পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। আপনি আপনার অধীনস্থ কর্মচারী ও অন্যান্য সকলের ব্যবহারের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সন্তোষজনক; বিশেষত যেরূপ সতর্কতা ও কৌশল সহকারে তাহারা দুঃখ এবং বিপদের মধ্যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাও প্রশংসার্হ।"

কিন্তু কুক নিন্দা-প্রশংসায় অবিচলিত ছিলেন। তিনি পুরস্কারকে যেরূপ তুচ্ছ মনে করিতেন, পথের কষ্ট বা বিপদ্‌কেও সেইরূপ অগ্রাহ্য করিতেন। তাঁহার সমস্ত অভিযানে যে বিপুল দায়িত্ব, উদ্বেগ ও শারীরিক কষ্ট মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কুক সেই সমুদয় কেবলমাত্র সুদূর দেশের লোকগুলিকে দেখিবার কৌতূহল ও দুঃসাহসিকতায় অন্তরদেশ হইতে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম অভিযানের ঘটনাবলী তাঁহার এই কৌতূহল আরও বর্ধিত করিয়াছিল; ফলে তিনি পুনরায় দ্বিতীয় অভিযানে যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় অভিযান

দক্ষিণ মহাদেশ বিদ্যমান। এই বিশ্বাসের সত্যতা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কুক দ্বিতীয় অভিযানে যাত্রা করিলেন। এইবার দুইখানি জাহাজ তাঁহার সঙ্গে চলিল; হুইটবিতে Resolution জাহাজ নির্মিত হইয়াছিল; আজও হুইটবির যাদুঘরে উহার আদর্শ দেখা যায়। এই জাহাজে কুক নিজের পতাকা উত্তোলিত করিলেন। ইহা ৪৬২ টনের জাহাজ; এই অভিযানে লোক-সংখ্যা ছিল ১৯৩ জন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে (কেহ কেহ বলেন ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে) কুক ইংল্যণ্ড পরিত্যাগ করেন এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া সুদূর দক্ষিণে যাত্রা করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তিনি দক্ষিণ মেরুবৃত্ত ৬৬° ৩´ দক্ষিণ অক্ষরেখায় অবস্থিত দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কোনরূপ স্থলের দেখা মিলিল না। বিশাল তুষাররাশি তাঁহার পথ রুদ্ধ করিয়া অবস্থিত। তিনি কয়েক মাস খুব পরিশ্রম সহকারে বিশাল দক্ষিণ মহাদেশ আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমস্তই বৃথা! অবশেষে ৩৫০০ লীগ পরিভ্রমণ করার পর কুক সিদ্ধান্ত করিলেন—টলেমিকথিত এই দক্ষিণ মহাদেশ মানবের কল্পনারাজ্যের বস্তু—বাস্তবিক উহার কোন সত্তা নাই। এই সম্বন্ধে এইচ আর মিল লিখিয়াছেন—"যে দক্ষিণ শীতমণ্ডল অ্যারিষ্টটল পূর্বভাগে দেখিয়াছেন, যাহার সম্বন্ধে গ্রীক দার্শনিকগণ অনেক যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন করিয়াছেন, মধ্যযুগের ধর্মমঠ যাহাকে বিধর্মীর স্থান বলিয়া উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে, তাহাকে ইতিপূর্বে কেহই তেমনভাবে অনুসন্ধান করে নাই—অবশেষে Resolution তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বিশাল তুষার-মরু ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে

তিনি সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কয়েক মাস ঘোরা-ফেরা করিলেন। অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা পূর্বের অনুরূপ—উহারা কঠোর ব্যবসাদার ও চুরিবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত।

একবার একজন বৈজ্ঞানিকের জুতামোজা চুরি গিয়াছিল, তিনি তাঁহার পায়ের অবস্থা দেশীয় লোকদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য প্রস্তরময় উপকূলে খালি পায়ে পাদচারণ করিতে বাধ্য হন।

আর একবার তিনি কতকগুলি দেশীয় লোককে ব্যাগ-পাইপ বাদ্য দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে যখন অন্য কোন নাবিক উক্ত দ্বীপে যাইত, তখন অধিবাসীরা উক্ত আশ্চর্যজনক বাদ্যযন্ত্রের কথা উল্লেখ করিত।

একটি দ্বীপের অধিবাসীরা তাঁহাকে দেখিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। শূকর ছানা উপহার দেওয়া বহু দ্বীপের সাধারণ বন্ধুত্বের নিদর্শন। একটি দ্বীপে তিনি একটি আশ্চর্য প্রথা লক্ষ্য করেন; উহা পরস্পরের নাক মলিয়া অভিবাদন জ্ঞাপন।

দক্ষিণ মহাদেশের অস্তিত্ব নাই ইহা সপ্রমাণ করিয়া কুক পুনরায় নীউ জিল্যাণ্ডে গমন করিলেন। আবার তাহিতি দ্বীপ দেখিয়া কুক পুনরায় নীউ জীল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসেন। পুনরায় একাকী ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। অবশেষে শেষ বিন্দু ৭০° ১০′ দক্ষিণ অক্ষরেখায় উপনীত হইলেন। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"ভোর চারিটার সময় আমরা দিগন্তের মেঘকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখিলাম। ইহাতে আমরা বুঝিলাম যে আমরা তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছি। বেলা ৮টায় আমরা উহার ধারে উপনীত হইলাম। ৯৭টি তুষার-পর্বত—একটির পর একটি মাথা তুলিয়া দূর শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে—আমাদের দৃষ্টি-পথে পড়িল। দৃষ্টির বহির্ভাগে আরও ছিল। সম্মুখে এক ইঞ্চি অগ্রসর হওয়ারও উপায় ছিল না। অগত্যা উত্তরে ফিরিতে বাধ্য হইলাম।"

মধ্যে কুক পিত্তশূল বেদনায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং ভগবানের কৃপায় রক্ষা পান। পরে ইষ্টার দ্বীপে গমন করেন ও উহার মূর্তি ও গৃহের ছাদ তাঁহাকে আনন্দিত করে।

কুক ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নিউক্যালিডোনিয়া দ্বীপ আবিষ্কার করেন। পরিশেষে উত্তমাশা অন্তরীপে নঙ্গর করিয়া কুক ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই স্পিটহেডে জাহাজ নঙ্গর করিয়া দ্বিতীয় অভিযান শেষ করিলেন। মাজেলানের পর এইরূপ সুদীর্ঘ ভ্রমণ তৎকালে অপর কেহ নিষ্পন্ন করেন নাই।

দ্বিতীয় অভিযানের বিশেষত্ব

এই অভিযানে কুক বিষুবরেখার পরিধির তিন গুণ পথ পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রয়্যাল সোসাইটি তাঁহাকে উহার সদস্য নির্বাচিত করিল। ভৌগোলিক আবিষ্কারের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই অভিযানে কুকের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কি প্রকারে দীর্ঘ সমুদ্র-ভ্রমণে নাবিকগণের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, তিনি তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার সুনিয়মে স্কার্ভিরোগ দূরীভূত হইয়াছিল এবং এই সুদীর্ঘ অভিযানে মাত্র ৫টি লোককে চিকিৎসা করিতে হয়। তাঁহার কর্ম-প্রণালী এই যে, তিনি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সর্বদা জাহাজে বাতাস পূর্ণ রাখিতেন এবং খাদ্যের সঙ্গে টাটকা শাক-শব্জি, সুপ ও মল্ট রাখিতেন। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"যখন দক্ষিণ মহাদেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দার্শনিকগণের বাদানুবাদ এবং জনসাধারণের কৌতূহল বিস্মৃতির অতল-তলে ডুবিয়া যাইবে তখনও এত-গুলি নাবিক এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া বিভিন্ন আবহাওয়ার ভীষণ কষ্ট ও ক্লান্তির মধ্যে কি প্রকারে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাই এই অভিযানকে বিশেষত্বপূর্ণ করিয়া তুলিবে।"

স্কার্ভিরোগ নিবারণ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কুক রয়্যাল সোসাইটির কপ্‌লে স্বর্ণপদক লাভ করিলেন।

তৃতীয় অভিযান

দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক

মহাসাগরে যাওয়ার পথ বাহির করিবার সঙ্কল্প ইয়োরোপীয় জাতির মধ্যে দেখা গিয়াছে। অবশেষে বৃটিশ জাতি দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া এই দিকে অভিযান প্রেরণের সঙ্কল্প করিল। কিন্তু নৌবিভাগ এমন একজন সুদক্ষ নাবিকের সন্ধান করিতে লাগিলেন, যিনি এই অভিযান পরিচালনায় সমর্থ। নৌবিভাগ কুককে একজন নাবিকের নাম প্রস্তাব করিতে বলিলেন। কুক কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু নৌবিভাগ সবই বাতিল করিয়া দিল, তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমি নিজে যাইব।"

নৌবিভাগ অভিলষিত লোককে লাভ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এই সময় কুকের বয়স ছিল ৪৮ বৎসর ও তিনি গ্রীণউইচ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু অসমসাহসিক কার্যের অভিলাষ তখনও তাঁহার মাথায় উঠানামা করিতেছিল। ফলে কুক ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই প্লিমাথ ত্যাগ করিয়া আবার প্রশান্ত মহাসাগরের উদ্দেশে Resolution জাহাজে পাড়ি দিলেন।

এই অভিযানে কাপ্তেন ক্লার্ক তাঁহার সহকারী ছিলেন। তিনি Discovery জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং কয়েক সপ্তাহ পরে যাত্রা করেন।

তিনি পথে ফরাসী কর্তৃক আবিষ্কৃত Kerguelen দ্বীপ পরীক্ষা করিলেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নীউ জীল্যাণ্ডে উপনীত হন এবং স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপ পুনরাবিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি উত্তর আমেরিকার উপকূল ধরিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইলেন। ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে নুটকা সাউণ্ডে জাহাজ মেরামত করিয়া তিনি আলাস্কার উপকূলে পরীক্ষা চালাইতে থাকেন, যাহাতে হাডসন উপসাগরে উপনীত হইবার প্রণালী খুঁজিয়া পান। উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি আমেরিকার উত্তরতম অন্তরীপের নামকরণ করিলেন—প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ কেপ। আবার তিনি এসিয়ার উপকূল ধরিয়া চলিলেন; পথে এশিয়া মহাদেশের পূর্বতম অন্তরীপের নামকরণ করেন পূর্ব অন্তরীপ। আবার আমেরিকার দিকে ফিরিয়া তিনি আমেরিকার উপকূল ধরিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে চলিলেন; এবং ৭০° ২৯′ উত্তর অক্ষরেখা ও ১৬১° ৪২′ পশ্চিম দ্রাঘিমায় তাঁহার গতি তুষার-স্তূপে ব্যাহত হইল। তিনি এই স্থানের নামকরণ করিলেন "ফার্দেষ্ট নর্থ।"

তিনি সমুদ্রের পরিমাপ করিয়া দেখিলেন যে, বেরিং সমুদ্রের নিকটবর্তী সমুদ্র অত্যন্ত অগভীর এবং এখানে স্রোতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। আবার এশিয়ার দিকে ফিরিয়া তিনি ৬৫° ৫৬′ উত্তর অক্ষরেখা ও ১৭৯° ১৬′ পশ্চিম দ্রাঘিমায় উপনীত হইলেন; তিনি এই স্থানের নামকরণ করেন—"উত্তর অন্তরীপ"।

প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যাত্রা করিয়া কুক একটি উপসাগরের নামকরণ করিলেন নর্টন সাউণ্ড। এই স্থানে অবতরণ করিয়া তিনি বিয়ার প্রস্তুত করিতেছিলেন এমন সময় দুইজন রুশ ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তাঁহাদের নিকট হইতে কুক অনেক মূল্যবান্ সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত অন্য কোন নাবিক কুকের এই তুষার-অন্তরীপ অতিক্রম করে নাই।

দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া কুক হাওয়াই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। তিনি এই দ্বীপে শীতকাল কাটাইবার অভিলাষ করিলেন। কুকের ব্যবহার সর্বত্রই দেশীয় লোকদিগকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিত। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, এই শ্বেতাঙ্গ মলিনমূর্তি লোকগুলি স্থায়িভাবে তাহাদের দেশে বাস করিতে ইচ্ছুক, তখন তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা নিজেদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিল; তাহাতে বুঝা গেল—কুক ও তাঁহার সঙ্গিদলকে অবিলম্বে এই দেশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে; অবশেষে জাহাজের একখানি নৌকা চুরিতে ঘটনা শেষ সীমায় উপনীত হয়।

কুকের মৃত্যু

কুক দেশীয় রাজার সহিত রফা-বন্দোবস্ত করিবার জন্য অল্প কয়েকজন নাবিক সহ দেশীয় রাজার প্রাসাদে গমন করেন। যখন তিনি রাজার সঙ্গে রফার কথা চালাইতেছিলেন, তখন সংবাদ গেল যে, একজন দেশীয়

অতএব, উৎসবের মূল উদ্দেশ্যই হইল একমাত্র আনন্দ বা সুখ, তাহাই আমাদের ধর্ম। কারণ, ধর্মই সুখের মূল প্রস্রবণ। এ জাতির ধর্ম ভিন্ন আদরের বস্তু আর কিছুই নাই। তাই ধর্মকেই সার পদার্থ মনে করিয়া এ জাতি চিরকালই ধর্মের পথে চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুর হিন্দুত্ব, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, ধর্মই হিন্দুর ইহকাল পরকালের পরম সহায় এবং যে ধর্মকে বর্ণাশ্রম ধর্ম বলা যায়, সেই ধর্মের অভ্যুদয়ে হিন্দু জাতি এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের আসনে অধিরূঢ় ছিলেন। আমাদের পূর্বতন পুরুষগণ এককালে এতাদৃশ উন্নত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সভ্য জগতের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা যে তৎকালে সমগ্র জগতের মধ্যে সকল জাতির শ্রেষ্ঠত্ব লাভে এত বরণীয়, এত পূজনীয় হইয়াছিলেন—ধর্মে গভীর ঐকান্তিকতাই তাহার এক মাত্র কারণ। তখন হিন্দু সমাজের ধর্মনীতি সনাতন ও সমগ্র জগতের আদর্শ স্থানীয় ছিল। বস্তুতঃ একমাত্র ধর্মই মানব সমাজকে দেবভাব—বিশিষ্ট, উন্নত ও শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখে। তাই আজও এই বাঙালী হিন্দুরা এক উৎসাহশীল জাতি বলিয়া পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিতেছে। হিন্দুর জীবনে এই সর্বাপেক্ষা মহত্তর তত্ত্বটি এত সহজ ও সরলভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, হিন্দু জাতির বার মাসে তের পর্বে বা উৎসবে উহার বহিরঙ্গ আমোদ-প্রমোদের সহিত অন্তরঙ্গ দান-ধ্যানগুলি অজ্ঞাতসারে ও নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই ধর্ম বর্তমান দুর্দিনেও আধুনিক হিন্দুগণও সকাম উৎসবের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে নিরাড়ম্বরে নিষ্কাম ধর্মের পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হ'ন। সকাম ভাবে আরব্ধ হিন্দুর তামসিক ও রাজসিক দানও বহু স্থলে এইভাবে সাত্ত্বিকতায় পরিণত হয়। সেই জন্য আলোচ্য রথযাত্রার মুখ্য ফল শ্রুতিতে আমরা মোক্ষলাভের কথাই জ্ঞাত আছি, —তাই সর্বাগ্রেই উল্লেখ করিয়াছি—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" জন্মজন্মান্তরের পুণ্যপুঞ্জের প্রভাবে ধর্মক্ষেত্র ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বধর্মের যথাযথ আচরণে পুনর্জন্ম নিবৃত্তি বা কৈবল্য প্রাপ্তি হিন্দুর জন্মসুলভ পরম ও চরম আদর্শ। সংযম ও পুত্রপ্রবৃত্তি মূলক ভোগের দুর্গম পথ দিয়াই ধর্মের আবরণে সুরক্ষিত সুগম মোক্ষ মার্গে উপস্থিত হওয়া হিন্দুর বৈদিক উত্তরাধিকার। অতএব আলোচ্যমান রথযাত্রার ফল কীর্তন প্রসঙ্গে ধর্মের ফল অর্থ কাম লভ্য ভোগ হইতে পরিণামে মুক্তির বার্তাও শুনিতে পাই। তন্নিমিত্ত স্কন্দ পুরাণে উক্ত আছে, যে,—বৈশাখ মাসের চন্দন যাত্রা উৎসব হইতে ফাল্গুনের দোলযাত্রার অনুষ্ঠানে ইহাদের প্রত্যেকটি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ পুরুষার্থ দান করিয়া থাকে।

এই বাক্যে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া তলাইয়া বুঝিবার বিষয় হইতেছে যে, হিন্দুর জীবন ইতর প্রাণীর জীবনের মত কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই চরিতার্থ নহে। উহাতে বাল্য যৌবনাদি কালে যেমন ধর্মসাধ্য অর্থ কামের ভোগ অনিষিদ্ধ, বানপ্রস্থ বার্ধক্যেও ঠিক তেমনই মোক্ষের সাধনা সুব্যবস্থিত। বলা বাহুল্য, সংসারের বিচিত্র ভোগ্য বস্তুনিচয় যেমন ভগবানের সৃষ্টি, উহাদের ভোক্তা জীবও তেমনই ভগবানের সৃষ্ট সামগ্রী। অনন্তরত্নশালিনী বসুন্ধরায় অনন্ত গুণে গুণী অনন্ত জীবের যদি সত্তা না থাকিত, তাহা হইলে শ্রীভগবানের সর্বজ্ঞতা ও সৃষ্টি-শক্তির মহিমার কিছুই মূল্য থাকিত না। জগতে ভোগ এবং মোক্ষ দুই-ই ভগবানের অপূর্ব দান। সেই জন্য উহা ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত থাকায় মানব-জীবনে যৌবনের মত ভোগের সৌন্দর্য এবং মাধুর্যও অল্প নহে। তবে যৌবনের স্থায়িত্ব ও শোভা যেমন সংযমে, ভোগের পূর্ণতা ও সাফল্য তেমনই ত্যাগমূলক মোক্ষে। এইভাবে দেখিলে ও বুঝিলে আমরা হিন্দুর উৎসবের দুইটি মনোহর রূপ দেখিতে পাই। একটি বাহ্য এবং অস্থায়ী আমোদ-প্রমোদ, আর অপরটি এই বাহ্য আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া আভ্যন্তরীণ ও স্থায়ী আনন্দের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। দিব্য-দৃষ্টি শাস্ত্রকার রথে বামন দেব দর্শনে মুক্তিলাভ হয় বলিয়াছেন। বামন শ্রীভগবান্ নারায়ণের পঞ্চম অবতার —কশ্যপ মুনির কনিষ্ঠ পুত্র রূপে—"উপেন্দ্র" নামে দেবরাজ ইন্দ্রের অনুজ হইয়া অবতীর্ণ হওয়া বা আবির্ভাব—বলিয়া জানি। বামনের অপর একটি নাম ত্রিবিক্রম। মুখ্যতঃ শ্রীভগবানের যেমন অনন্ত নাম, তেমনই

নেতা জাহাজের লোকের গুলিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ফলে দেশীয় লোকগুলি ক্ষেপিয়া গেল,—একজন দীর্ঘ বর্শা লইয়া কুককে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। কুক গুলি করিলেন; লোকটি পড়িয়া গেল; কিন্তু কুক দেখিলেন দেশীয় লোকেরা সংখ্যায় অধিক; সুতরাং তিনি সঙ্গিগণকে ধীরে ধীরে পশ্চাদনুসরণ করিয়া জাহাজে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। যতক্ষণ কুক দেশীয় লোকদিগের দিকে মুখ করিয়াছিলেন, ততক্ষণ কেহই তাঁহার কোন অনিষ্টসাধন করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তিনি আদেশ দেওয়ার জন্য মুখ ফিরাইলেন, অমনি একটি দেশীয় লোক তাঁহার পার্শ্বদেশে বর্শাবিদ্ধ করিল। অন্যান্য দেশীয় লোকেরাও তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং তিনি বীরের মত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন।

এইরূপে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী কুক অমরলোকে প্রস্থান করেন।

বহু তর্কবিতর্কের পর কুকের খণ্ডবিখণ্ড মৃত দেহ এক সপ্তাহ পরে ক্লার্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে নাবিক-প্রথায় মহাসমুদ্রের গভীর জলে সমাহিত করা হয়।

তাঁহার পত্নী তাঁহার মৃত্যুর পরও ৫৬ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। কুক ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথ ব্যাটসকে বিবাহ করেন।

কুক অত্যন্ত সাহসী নাবিক ছিলেন। তাঁহার কল্পনা সহজ সরল এবং বুদ্ধিবৃত্তিও দূরপ্রসারী ছিল। এতদ্ভিন্ন মহৎকর্তব্যজ্ঞানও তাঁহার জনপ্রিয়তার কারণ। তাঁহার স্বল্পকালব্যাপী জীবনের মধ্যে তিনি বহু উপকূলভাগ জরীপ করিয়াছেন, যাহা অন্যকেহ সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি প্রশান্ত মহাসাগরকে মানচিত্রে নবরূপে প্রদর্শন করেন; অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউ জীল্যাণ্ডকে তিনি স্বীয় জন্মভূমিকে দান করিয়া গিয়াছেন।

প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা

দেশবাসী এই মহান্ আবিষ্কারে তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ লণ্ডনে তাঁহার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উক্ত প্রতিমূর্তির পাদমূলে লিখিত আছে—"পৃথিবী পরিভ্রমণকারী—প্রশান্ত মহাসাগরের আবিষ্কারক—অষ্ট্রেলিয়া ও নীউ জীল্যাণ্ড রাজ্যদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা—তিনি নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলের মানচিত্র অঙ্কন করেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে কানাডার সমুদ্র-দ্বার অতিক্রম করিয়াছিলেন।"

পঞ্চপুষ্প

বালিকার অদ্ভুত শক্তি

ল্যাটভিয়ান দেশীয় দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা Ilda Kirps অদ্ভুত মনোবৃত্তিসম্পন্না। এই বালিকা যে কোন লোকের মনের ভাব অবিকল বুঝিতে ও প্রকাশ করিতে পারে। যদি অন্য কোন লোক, যে ভাষা বালিকা জানে না সে ভাষায় মনে মনে কোন পুস্তক পাঠ করে, তবে বালিকা তাহা অবিকল বলিয়া যাইতে পারে।

বালিকার শিক্ষক বালিকাকে প্রথমে লেখাপড়া শিখাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি একদিন রুশীয় ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তক মনে মনে পাঠ করিতেছিলেন; বালিকা একটু দূরে বসিয়াছিল। অবিলম্বে বালিকা শিক্ষকের পুস্তকের পাঠ অবিকল আবৃত্তি করিতে লাগিল।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Ferdinand Von Neureiter ও বালিকাকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন।

টিট্-বিট্স্

সর্পদংশন-চিকিৎসা

ময়মনসিংহের বাবু শিশিরকুমার চন্দ বি এল নিজ

উদ্ভাবিত প্রণালীর দ্বারা বহু সর্পদষ্ট ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। তাহার খ্যাতি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয় পড়ায় সর্পদষ্ট হইলে বহুদুর হইতেও রোগীকে তাঁহার নিকটে আনা হয়। অনেক অজ্ঞান ও মরণোন্মুখ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আত্মীয়স্বজনগণ আশায় পূর্ণ হইয়া আসে। আমরা তাঁহার প্রণালী জনসাধারণকে জানাইবার জন্য ও গভর্ণমেণ্ট যাহাতে তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রকাশ করেন তজ্জন্য ইতি পূর্বে কয়েকবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি চারুমিহির পত্রিকায় শিশির বাবু সর্প দংশন চিকিৎসার উপায়সকল বিবৃত করিয়াছেন।

সর্পদংশনের হাত হইতে প্রাণরক্ষা করিতে হইলে বন্ধনযোগ্য স্থানে দংশন করিলে সর্বাগ্রে সুদৃঢ় বাঁধ দিতে হইবে। অতঃপর রোগীকে বিশুদ্ধ গব্যঘৃত এক ছটাক আন্দাজ উষ্ণ করিয়া সেবন করাইতে হইবে। উষ্ণ গব্যঘৃত পানে বিষ ঊর্ধ্বগামী হইতে পারেনা।

উল্লিখিত উপায়ে বিষ দষ্টস্থানে নিরুদ্ধ থাকিলে রক্ত মোক্ষণ প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিষদুষ্ট রক্ত দংশন স্থান হইতে বাহির করিয়া লওয়া সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ণ মাত্রায় রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে লবণ দ্বারা ছুরিকাবিদ্ধ স্থান চাপিয়া রাখিতে হইবে।

সর্বাঙ্গে বিষ ছড়াইয়া পড়িলে রক্ত-মোক্ষণ প্রণালী দ্বারা কোন সুফল পাওয়া যাইতে পারে না। ঐস্থলে উগ্রবীর্য ভেষজ পদার্থ প্রয়োগ ভিন্ন গতি নাই।

সর্পদষ্ট রোগীর পক্ষে মধু সহ অর্ধ তোলা আন্দাজ বাবুই তুলসীর পাতার রস পুনঃ পুনঃ সেবন বিধেয়। বাবুই তুলসীর পাতার রস মধু সহযোগে পান করিলে ক্রমে ক্রমে বিষবেগ মন্দীভূত হইতে থাকে। শ্বেত অপরাজিতার পাতার রস দুই এক ফোটা অজ্ঞান রোগীর চক্ষে দিলে তৎক্ষণাৎ রোগীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারা যায়।

সবিষ সর্প দংশনের কিছুকাল পর হইতেই অনেকস্থলে রোগী অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া শীতল জল পান করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে। ঐ স্থলে রোগীকে কস্মিনকালেও শীতল জল পানার্থ প্রদান করা বিধেয় নহে। শ্বেত দুর্ব্বার রস এক তোলা, সম পরিমাণ কাঁচা হরিদ্রার রস ও লবণ যত্নসহকারে রোগীকে সেবন করাইতে হইবে।

শ্লেষ্মাজনিত রোগীর শ্বাস রোধ হইবার উপক্রমে বমনকারক ঔষধ ব্যর্থ হইলে নিসিন্দার রস, অর্ধ তোলা আন্দাজ মধু ও ৩।৪টি গোলমরিচ সহ সেবন করাইয়া দিলে প্রশমিত হয়।

সর্পবিষের উল্লিখিত ক্রিয়াসমূহ বিশ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল যাবৎ বহু রোগী চিকিৎসাকালে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ও সর্পবিষচিকিৎসা বিজ্ঞানের অভ্রান্ত নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ঐ চিকিৎসা-প্রণালীর প্রতি দিন দিন জনসাধারণের মন আকৃষ্ট হইতেছে।

সঞ্জীবনী

জাতীয় সংবাদ

মিউনিসিপ্যালিটির সুবর্ণবণিক্‌ কমিশনার

মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালটির কমিশনার নির্বাচনে যথাক্রমে নিম্নলিখিত সুবর্ণবণিক্‌গণ কমিশনার নির্বাচিত হইয়াছেন।

২নং ওয়ার্ড—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য

৪নং ওয়ার্ড—ডাঃ শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র নাথ সিংহ এম বি

৫নং ওয়ার্ড—শ্রীযুত সত্যরঞ্জন দত্ত

আমরা তাঁহাদের সাফল্যে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক্‌-সমাজ

কার্য-নির্বাহক সমিতির অধিবেশন

২৮শে শ্রাবণ শনিবার সন্ধ্যা ৭৷৹ ঘটিকার সময় সমাজের কার্যনির্বাহক সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল। কুমার শ্রীযুক্ত কার্তিক চরণ মল্লিক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভারম্ভে সম্পাদক বিজ্ঞাপিত করেন যে, কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীগোপালমল্লিক :লেন নিবাসী আনন্দলাল মল্লিক (১) এবং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিবাসী অবিনাশচন্দ্র সেন পরলোক গমন করিয়াছেন। সমবেত সভ্যগণ লোকান্তরিত সভ্যদ্বয়ের মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোকসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

স্থিরীকৃত হইল যে উক্ত প্রস্তাবের অনুলিপি পরলোকগত সভ্যদ্বয়ের পরিবারবর্গের অবগতির জন্য প্রেরিত হইবে।

সমাজের গত ২৪শে বৈশাখ তারিখের অধিবেশনের বিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

শিক্ষা সাব-কমিটির মন্তব্য গৃহীত হইল এবং কমিটির অনুমোদিত ছাত্রগণকে এক বৎসরের জন্য বৃত্তি দেওয়া হইল।

৺মাণিকলাল দত্তের এষ্টেট হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত মেডিকেল কলেজে এবং কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে পাঠার্থী ছাত্রগণের বার্ষিক পরীক্ষার ফল জানাইয়া অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেল অফ বেঙ্গল যে কয়খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, ঐ পত্রগুলি সভায় পঠিত হইল।

স্থিরীকৃত হইল যে, মেডিকেল কলেজের দুইজন ছাত্রকে যাহারা বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল হইয়াছে, পরীক্ষা পাশ করিবার জন্য আর একবার সুযোগ দেওয়া হউক এবং উক্ত এষ্টেট হইতে তাহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া হউক।

সমাজের সভ্য থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় অথবা ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ না দিয়া বহুদিবস স্থানান্তরে থাকায়, কিম্বা সন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ বা তাহার পূর্ববর্তী বৎসরের চাঁদা নিয়মিত ভাবে না দেওয়ায় নিম্নলিখিত সভ্যগণের নাম তালিকা হইতে অপসারিত করা হইল—

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মল্লিক, আশুতোষ চন্দ্র, আশুতোষ পাল, কার্তিকচরণ সেন, কানাইলাল বড়াল, কালীকিঙ্কর শীল, কালীপদ নন্দী, কেদারনাথ আঢ্য, কেদারনাথ দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, কানাইলাল দত্ত, গণেশচন্দ্র আঢ্য, গোকুল চন্দ্র দে, গোরাচাঁদ শীল, জিতেন্দ্রনাথ শীল, জিতেন্দ্রলাল দে, তারকনাথ ধর, তারকনাথ দে, তিনকড়িলাল দত্ত, ত্রিলোচন মল্লিক, দুর্লভচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ শীল, ধীরেন্দ্র নাথ মল্লিক, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, নটবর দত্ত ভক্তিবিনোদ, নন্দলাল দে, নন্দলাল পাইন, নিতাইচাঁদ বড়াল, নিমাইচাঁদ দে, নিমাইচাঁদ ধর, গৌরচন্দ্র বর্ধন, গৌরমোহন দত্ত, গোকুলচন্দ্র পাল, চারুচন্দ্র নন্দী, চৈতন্যদাস দে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে, পুলিনবিহারী ধর, পূর্ণচন্দ্র শীল, প্রহ্লাদচন্দ্র সেন, প্রেমলাল দে, প্রসাদদাস শীল, প্রভাসচন্দ্র দে, পাঁচকড়ি দে, পাঁচুগোপাল সেন।

সমিতির অন্যতম সভ্য আনন্দলাল মল্লিকের মৃত্যুতে তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য মনোনীত হইলেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ সমাজের নূতন সভ্য নির্বাচিত হইলেন—

শ্রীযুক্ত মনোহরদাস পাইন, জিতেন্দ্রলাল পাইন, চিন্তামণি মল্লিক, দুর্লভচন্দ্র দত্ত, সন্তোষকুমার দত্ত, কিশোরীমোহন দত্ত, বল্লভচন্দ্র দত্ত, গোপালচন্দ্র সেন, লভচাঁদ বড়াল, ননীগোপাল দাস, কালাচাঁদ দাস, অভয়পদ দত্ত, গোকুলচন্দ্র দত্ত, সতীশচন্দ্র বড়াল, ত্রিকূটনাথ সেন, রাধাবল্লভ দাস, কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী, মধুসূদন দে, কেশবচন্দ্র শীল, সাতকড়ি দত্ত, কমলকুমার নন্দী, নগেন্দ্রনাথ লাহা, কৃষ্ণমোহন মল্লিক, মধুসূদন মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ লাহা।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা-ভঙ্গ হইল।

বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবাহ

বিগত ২২শে শ্রাবণ রবিবার চোরবাগান ৩০এ পার্বতী ঘোষ লেন নিবাসী শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ধরের একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী যমুনাবালার সহিত মজিলপুর জয়নগর নিবাসী ৺জীবনকৃষ্ণ দের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ গোপীকৃষ্ণ দের শুভপরিণয় হইয়া গিয়াছে। কন্যাপক্ষ রাঢ়ী শ্রেণীর এবং বরপক্ষ আহিরীটোলা শ্রেণীর হইলেও উভয় পক্ষ নিজ নিজ কুলাচার মত তথা বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীতে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য সর্বপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর পরিবর্জনপূর্বক যথেষ্ট ব্যয় সংক্ষেপ সংসাধিত হইয়াছিল এবং বরপক্ষ জয়নগর হইতে সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া গ্রেষ্ট্রীটস্থ এক আত্মীয়কুটুম্বের বাটীতে থাকিয়া অষ্টাহব্যাপী বিবাহাদি সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য সমাধা করিয়া গিয়াছেন। কন্যার মাতামহ শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিক বিবাহে উভয় শ্রেণীর সামঞ্জস্য বিধানে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। আমরা নব দম্পতীর দীর্ঘায়ু ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করিতেছি।

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক সমাচার

২২শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪৫ সাল | ১১শ সংখ্যা

ইন্দোর-মান্ধাতা ও উজ্জয়িনী

শ্রীমণিমোহন মল্লিক

কোন পুরাতন কাহিনী বা বস্তুর উল্লেখ করিতে আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি "মান্ধাতার আমলের" এবং পুরাণেতিহাসে সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার নামও দেখিতে বা শুনিতে পাই। প্রবাদ যে, ইনি ইঁহার পিতা যুবনাশ্বরাজের বামপার্শ্বদেশ হইতে উৎপন্ন হন এবং স্নেহাতিশয্যে পুত্রপালনের জন্য মাতৃস্তন্যের পরিবর্তে ইন্দ্র নিজ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বালকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন; সেই-জন্য তদনুসারে তাঁহার "মান্ধাতা" নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বর্ণনীয় মান্ধাতা রাজা নহেন, উহা স্থান-বিশেষ। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দিল্লী-প্রবাস-কালে সপ্তমোক্ষদায়িকা ধামের অন্যতম অবন্তী বা উজ্জয়িনী দর্শন-লালসায় সস্ত্রীক ইন্দোর গমন করি। আমাদের এক নাতজামাই শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ধর এম এ (ইনি হেলিকার রাজ কলেজের ঐতিহাসিক অধ্যাপক) ভাই জীউর সাদর আহ্বান ও আমন্ত্রণে তথায় প্রায় একমাস অবস্থান কালে ইন্দোরের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া একদিন পুণ্যধাম অবন্তিকা বা উজ্জয়িনী যাত্রা করিয়া-ছিলাম। কারণ ইতিপূর্বে আমাদের অন্য ছয়টি মোক্ষদায়িকা ধাম সন্দর্শন ঘটিয়াছিল। সপ্তমোক্ষদায়িকা ধাম যথা :—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

সিপ্রানদীতীরে অবস্থিত এই পুরাণপ্রসিদ্ধস্থল অবন্তিকা পরবর্তী কালে উজ্জয়িনী নামে অভিহিত হয় এবং তাহার যশঃ-সৌরভ তদানীন্তন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভারতের সর্বত্র প্রসারিত হয়। এই স্থানেই আবার

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম "মহাকাল" বিদ্যমান; প্রমাণ যথা :—

"সৌরাষ্ট্রে" সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে "মল্লিকার্জ্জুনম্"।
উজ্জয়িন্যাং "মহাকালম্" ওঙ্কারে "অমরেশ্বরম্"॥
পরল্যাং "বৈদ্যনাথঞ্চ" ডাকিন্যাং "ভীমশঙ্করম"।
বারাণস্যাং তু "বিশ্বেশং" "ত্র্যম্বকং" গৌতমীতটে॥
সেতুবন্ধে তু "রামেশং" "নাগেশং" দ্বারকাপুরে।
হিমালয়ে তু "কেদারং" "ঘুমেশঞ্চ" শিলালয়ে॥
এতানি জ্যোতিলিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্মরণাদেব নশ্যতি॥"

উপরোক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় ছত্রে আমাদের বর্তমান বিষয়ীভূত দুইটি স্থান ও মূর্তির পরিচয় পাইতেছি :—

(১) উজ্জয়িনীতে "মহাকাল"

(২) ওঙ্কারে (মান্ধাতায়) "অমরেশ্বর"

কিন্তু এই দুইটি পুণ্যতীর্থের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে আমার প্রধান কেন্দ্র ইন্দোরের ঐতিহাসিক ও আধুনিক অবস্থা পাঠক-পাঠিকার পরিতৃপ্তির জন্য উপহার দিতেছি।

ইন্দোর

ইহা মধ্যভারতে হোল্কারের রাজধানী। হোল্কার অর্থে হোল্বাসী। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মল্হাররাও দাক্ষিণাত্য প্রদেশস্থ হোল্ বা হাল্ গ্রাম নিবাসী জনৈক মেষপালকের পুত্র। যৌবনে পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া জনৈক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়ের অধীনে কর্ম করেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পেশোয়ার অধীনে ৫০০ অশ্বারোহীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং ৪ বৎসর পরে জায়গীর পুরস্কার পান। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিকে পরাজিত করেন এবং সেই সঙ্গে ইন্দোর দেশ লাভ করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার বালক পৌত্র মালীরাও রাজ্যভার গ্রহণ করেন; কিন্তু ৯ মাস পরে উন্মাদরোগে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার মাতা সুপ্রসিদ্ধা অহল্যাবাঈ রাজভার গ্রহণ করিয়া ৩০ বৎসর ইহা পরিচালনা করেন। তাঁহার সহযোগী ও সেনাপতি তুকাজীর পুত্র যশোবন্ত রাও ইন্দোরের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে যশোবন্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার উপপত্নী তুলসীবাঈ অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজপুত্র মল্হাররাওএর পক্ষে রাজ্য পরিচালনা করেন। কিন্তু অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তুলসীবাঈ ইংরাজের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। এই সময়ে পেশোয়ার সহিত ইংরাজের মনোমালিন্য উপস্থিত হয় এবং ইন্দোর ইংরাজের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন। তাহাতে তুলসীবাঈ ধৃতা ও নিহতা হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী 'মণ্ডেসর' নামক স্থানে যে সন্ধি স্থাপনা হয়, তাহার ফলে হোল্কার ইংরাজের করদরাজরূপে পরিণত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইন্দোর পর্যবেক্ষণের ভার ব্রিটিশ রেসিডেন্টের উপর অর্পিত হইয়াছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শিবাজীরাও দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র তুকাজীকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

দিল্লী হইতে ইন্দোর যাইবার রেলভাড়া ৮৸৹। তথায় অধ্যাপক শৈলেন ধরের আশ্রয়ে সস্ত্রীক প্রায় একমাস অবস্থান করি। জলবায়ু দিল্লীর ন্যায় তত প্রচণ্ড নয়। তথায় অতি সমাদরে ও সযত্নে আতিথ্য স্বীকার করিয়া পরমানন্দে দিনাতিপাত হইতেছিল; কিন্তু অধ্যাপক ভায়ার অবসর না থাকায় প্রত্যহ কোন বিশেষ স্থানে যাওয়া ঘটে নাই; তবে মুখ্য ও মূল দর্শনীয় বস্তু ও স্থান দর্শন তাঁহার সাহচর্য ও অভিজ্ঞতায় সুন্দররূপে ঘটিয়াছিল। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তদ্দর্শনে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

(১) "গোপাল মন্দির"—ইহা রাণী অহল্যাবাঈ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত; প্রকাণ্ড মন্দির ও সুন্দর শ্রীবিগ্রহ এবং পরিপাটি সেবার বন্দোবস্ত আছে।

(২) নিকটেই তাঁহার নামীয় "অহল্যাবাঈ ছত্রম্" (অতিথিশালা)।

(৩) শেঠ হুকুমচাঁদের সুবৃহৎ "জৈন মন্দির" (দিগম্বরীয়)। এই মন্দিরের আগাগোড়া বেলোয়ারী কাচ ও আয়না নির্মিত; প্রত্যেক কক্ষ বিভিন্ন প্রকার বর্ণের

মেজ, ছাদ সমস্তই কাচের ও আয়না নির্মিত; চলিতে চলিতে নিজের ছায়া দেখিয়া চমকিত হইতে হয়। এতদ্‌ভিন্ন দেবস্থানের সম্মুখে (নাটমন্দিরের ন্যায়) হলঘরের চতুষ্পার্শ্বে কাচের উপর কাচের দ্বারা অঙ্কিত পুরাণোক্ত নানা দেবদেবীর প্রতিকৃতি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় এবং তাহার উপর বৈদ্যুতিক আলোক-প্রপাতে সমুদয় কক্ষ এরূপ উজ্জ্বলভাব ধারণ করে যে কিছুক্ষণ দেখিলে চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়। সমস্ত মন্দিরটি পর্যবেক্ষণ করিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে।

(৪) "বিস্কোপার্ক"—একটি মনোরম উদ্যান; বর্তমান রাজার সখে জাপানী কারিগর দ্বারা নির্মিত। ইহার একাংশ জাপানী জাতীয় পতাকার অনুকরণে বৃহৎ আকারে ঘাস দ্বারা নির্মিত। অপরাংশে কেবল জাপানী লতাগুল্মে সুবিন্যস্ত ফুলের কেয়ারী ও তাহার আবেষ্টন জাপানী তলতা বাঁশের প্রস্তুত—দেখিতে অতি সুন্দর। মধ্যস্থলে ইডেনগার্ডেনের ন্যায় ব্যাণ্ড ষ্টাণ্ড এবং চারিদিকে বহুবিধ চন্দ্রমল্লিকা পুষ্পের বৃক্ষ রোপিত ও পুষ্পভরে সজ্জিত।

(৫) তৎসন্নিকটেই "যশোবন্ত প্রাসাদ,—ইহা সম্পূর্ণ বিলাতি ধরণের ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের যাবতীয় অনুষ্ঠান তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট, সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই।

সিপ্রাতীরে রামঘাট ও মন্দিরাবলী, উজ্জয়িনী

(৬) "পিপলাই পালা"—আর একটি সুবৃহৎ বাগান তন্মধ্যে মাছ ধরিবার ও পান্‌সী করিয়া বেড়াইবার সরোবর বা ঝিল আছে। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানে চড়ুইভাতি করিতে আসে।

(৭) "লালমালেকাবাস"—অন্যতম প্রাসাদ বা রাজ-মাতার আবাস।

(৮) "হোলকার রাজ কলেজ"।

(৯) "টিলখানা" বা চিড়িয়াখানা—নানা প্রকার পশু পক্ষী ও হস্তি-ব্যাঘ্রাদি জন্তু আছে।

(১০) "রেসিডেন্সি" বা ইংরাজ রেসিডেন্টের প্রাসাদ।

এইবার আমরা উজ্জয়িনী যাইবার চেষ্টা করি। ইন্দোর হইতে উজ্জয়িনী যাইতে রেল ভাড়া জনপ্রতি ॥৵১০ সাড়ে এগার আনা। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ধর সপরিবারে সঙ্গী হইলেন কারণ—শৈলেনের স্ত্রী বা তাহার কন্যারা এতদিন ইন্দোরে আছে বটে, কিন্তু উজ্জয়িনী দেখে নাই; তাই তাহাদিগকেও সঙ্গে লইলাম। প্রাতে ৯ টায় বাড়ী ছাড়িয়া উজ্জয়িনী পৌঁছিতে ১০॥টা বাজিল। তথায় শৈলেনের এক বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উঠি। ইনি একটি স্কুলের মালিক ও যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। তাঁহার আতিথ্য

স্বীকার করিলাম বটে, কিন্তু কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহারই নির্দেশমত একখানি টাঙ্গা করিয়া আমরা দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

(১) সিপ্রানদীতে প্রস্তরনির্মিত সুবৃহৎ রামঘাটে গিয়া তথায় যথাবিধি তীর্থপূজাদি সারিয়া এবং স্নানাহ্নিক করিয়া নদীতে সস্ত্রীক হাত ধরাধরি করিয়া অবগাহন করিতে হইল। ঘাটে উঠিলে শৈলেন উক্ত রামঘাটে আমাদের সকলের একটি ফটো লইল; ঘাটের উপরিস্থিত অনেকগুলি দেবমন্দির দর্শন করিলাম। পরে পদব্রজে নিম্নলিখিত মন্দির ও দেবদর্শনে যাইলাম।

(২) হরসিদ্ধি মন্দির এখানে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ও শ্রীশ্রীকালী মূর্তি দেখিলাম।

(৩) কিছুদূরে পঞ্চমুখ হনুমান ও প্রকাণ্ড গণেশ মূর্তি দেখিয়া আসিলাম।

(৪) গণেশ ও হনুমান দর্শন করিয়া যাত্রার সুফল স্বরূপ এইবার আমরা মূল মন্দির বা প্রধান দ্রষ্টব্য "মহাকাল"-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রকাণ্ড মন্দির চারিদিকে পাথর বাঁধান উঠান ও তাহার মধ্যে নানা দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির বিদ্যমান; দর্শকগণ নিজ নিজ ইষ্ট দেবদেবীর পূজা করিয়া যাইতেছেন। মূল মন্দিরের
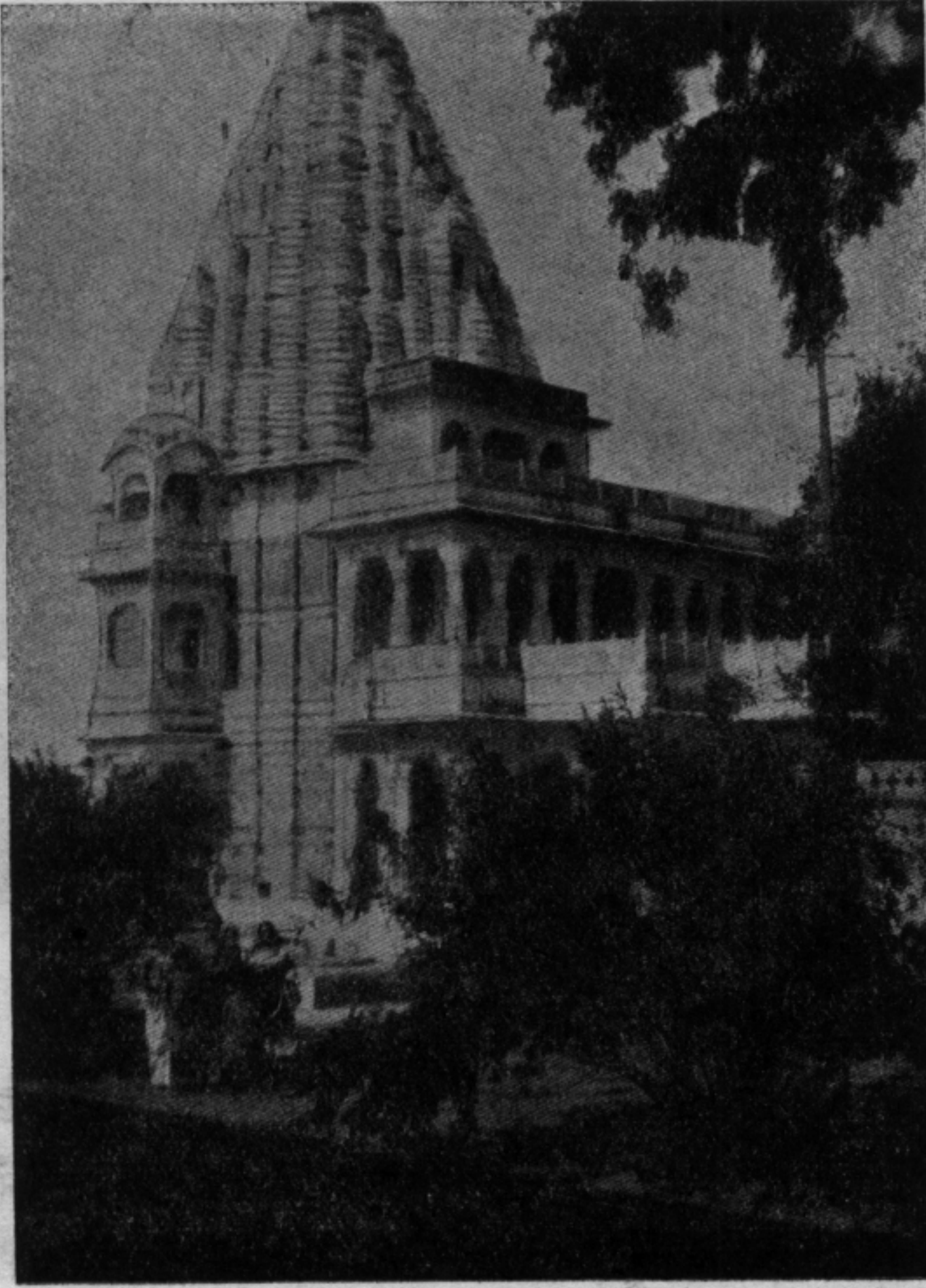
মহাকালের মন্দির, উজ্জয়িনী

অভ্যন্তরে (নীচে) স্বয়ম্ভু মূর্তি ও উপরে ভোগমূর্তি বিচিত্র বেশে সজ্জিত। উঠানের একপ্রান্তে একটি সুবিধাজনক স্থানে দাঁড়াইয়া শৈলেনের ক্যামেরা-সাহায্যে একখানি ফটো লওয়া হইল। ফুল ও মিষ্টান্নাদি মন্দির-প্রাঙ্গণেই পাওয়া গেল এবং পাণ্ডার সাহায্যে যথাবিধি পূজা সারিয়া আমরা বাসায় ফিরিবার চেষ্টা করিলাম। একখানি টাঙ্গা করিয়া বাসায় ফিরিতে প্রায় ১২টা বাজিল। ইতিমধ্যে হরিদাস বাবু আমাদের আহারের সমস্ত যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন ও সকলকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিলেন। আমার জন্যও প্রচুর ফল-মিষ্টান্নাদি যোগাড় করিয়াছিলেন;

তাহাতেই উদর পূর্তি করিয়া পূর্বাহ্ণে হাটিয়া হাটিয়া মন্দিরাদি দর্শনের শ্রম অপনোদনার্থ সকলেই কিছু বিশ্রাম করিলাম। পরে বেলা ২ টার সময় আবার একখানি টাঙ্গা করিয়া আমরা অবশিষ্ট দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।

(৫) অবন্তীকুণ্ড অতি প্রাচীন। এখানে প্রভাতে আসিলে তীর্থপূজাদি ও স্নান করিতে হয়। আমরা অপরাহ্ণে যাওয়ায় কেবল দর্শন, স্পর্শ ও ভোগপূজা দিয়া নিকটে নদীতটে (সিপ্রা) গেলাম।

(৬) সিদ্ধবট—প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজ, অতি প্রাচীন। এখানে মানস পূজা বা মানসিক করিলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। আমরা নিজ নিজ সাধ্যমত পূজা দিয়া নদীতে গিয়া দেখি প্রচুর মৎস্য ও তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্য (এখানে কেহ মৎস্যাহার করে না) ঘাটে ছোলাভাজা ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। আহারের লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিতে বড় সুন্দর। অহিংস লোকদের হাত হইতে আহার লইতে তাহারা ভয় করে না। ঘাট খুব পিচ্ছিল, তাই বড় সাবধানে মেয়েদের লইয়া মাছের খেলা দেখিতে হইল।
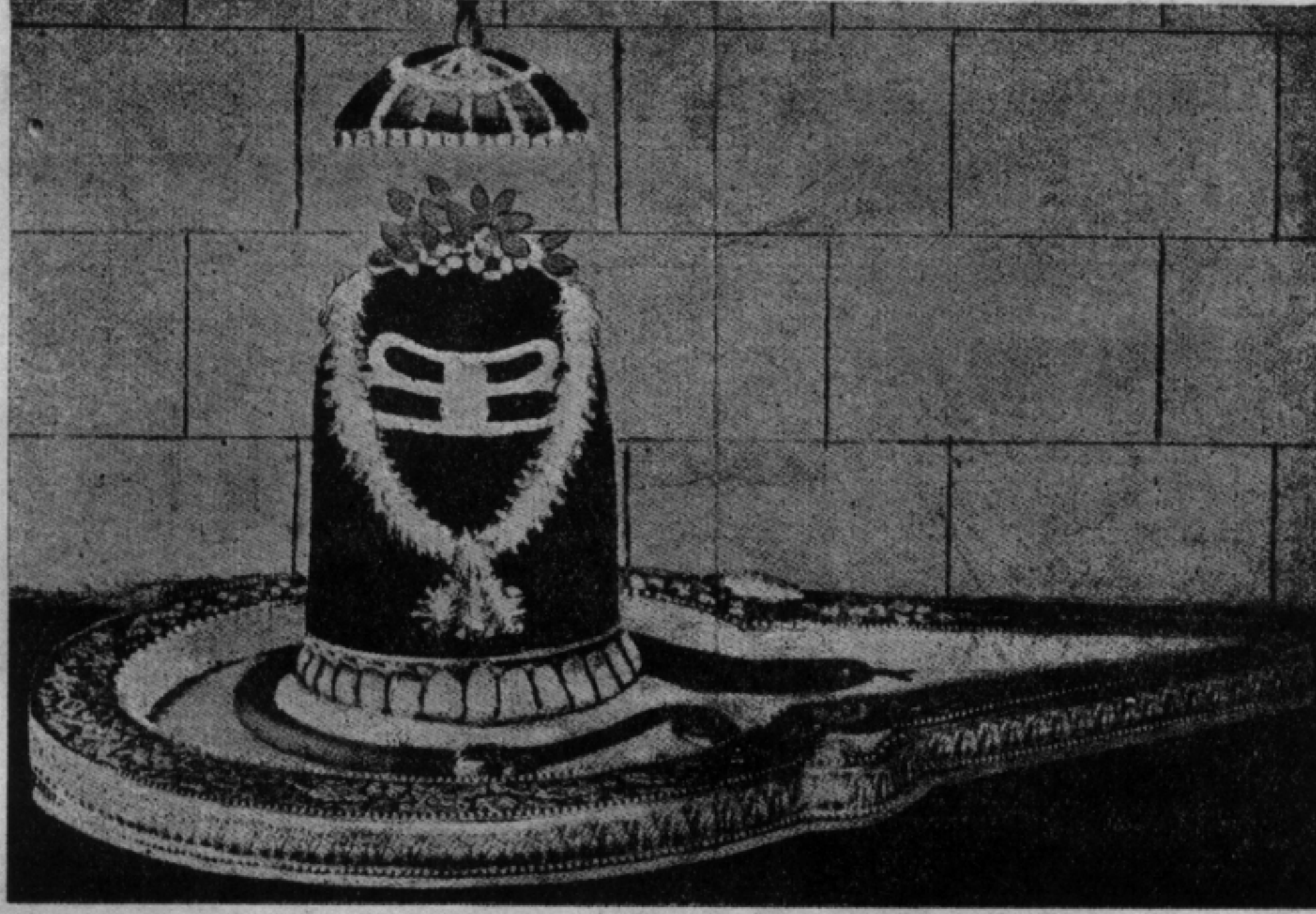
শ্রীশ্রী৺মহাকাল মূর্তি, উজ্জয়িনী

(৭) কালিকামাতা (কালীমাতা) ও কিছুদূরে ভৈরব—ইহা একান্নপীঠের অন্যতম বলিয়া আখ্যাত ; কিন্তু পঞ্জিকার তালিকায় ইহার নাম পাওয়া যায় না।

(৮) কবি ভর্তৃহরির ভজন-গুহা,—কথিত আছে, ইনি রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা। রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রপাঠাদিতে দিনপাত করিতেন, পরে এই ভজন-গুহায় আশ্রয় লইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। গুহার বাহিরে গোরক্ষনাথের মন্দির ; —প্রবাদ, ইনি ভর্তৃহরির গুরু ছিলেন। উজ্জয়িনী হইতে ইহা প্রায় এক ক্রোশ দূরে সিপ্রানদীর ভূগর্ভে অবস্থিত।

(৯) বিক্রমাদিত্যের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ—প্রকাণ্ড তোরণ দ্বারের কিয়দংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত স্থান দেখিতে দেখিতে বেলা ৫ টা বাজিয়া গেল ; আমরাও রেল ধরিবার জন্য বরাবর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যার কিছু পরেই ইন্দোরে ফিরিয়া আসিয়া উজ্জয়িনী বা অবন্তিকার অতীত ইতিহাস ও গৌরবের কথা আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি ১১ টা বাজিয়া গেল। সকলেই সারাদিন পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিল,—আহারান্তে শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

আমি শৈলেনকে এইবার মান্ধাতা দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলাম। দেখিতে দেখিতে ৫ দিন কাটিয়া গেল। ২৬শে জানুয়ারী শৈলেন তাহার এক বন্ধুর মোটর গাড়ীর বন্দোবস্ত করিল। পরদিন (২৭শে) আমরা সকলেই সেই মোটর যোগে মান্ধাতা রওনা হইলাম। মান্ধাতা যাইতে হইলে ইন্দোর হইতে রেলযোগে মর্তকা ষ্টেশন পর্যন্ত (৪০ মাইল) রেল ভাড়া ৸৶০; তথা হইতে মোটর বাসে ৭ মাইল, ভাড়া।০; মোট ৪৭ মাইল; ভাড়া জন প্রতি ১৶০ লাগে। আমাদের গতায়াতে মোটর জন্য পোল পাশ দিতে হইয়াছিল ২৲ হিসাবে ৪৲ চারি টাকা। রেলে যাইতে ৩ ঘণ্টা ও মোটরে ২ বা ২৷৷০ ঘণ্টা লাগে। আমরা বাড়ী (ইন্দোর) হইতে নিজ বন্ধুর মোটরে বরাবর মান্ধাতা পর্যন্ত গিয়াছিলাম প্রাতে ৯ টায় মোটর ছাড়িয়া ১১৷৷০ টায় পৌছাই। নদীতীরে (নর্মদা) গাড়ী রাখিয়া খেয়া নৌকায় নদী পার হইলাম। নৌকা ভাড়া জন প্রতি এক পয়সা মাত্র। পরপারে পর্বতোপরি (বিন্ধ্যাচলোপরি) অবস্থিত ওঁকারেশ্বরের মন্দির ও রাজ প্রাসাদ দেখিতে খুব সুন্দর।
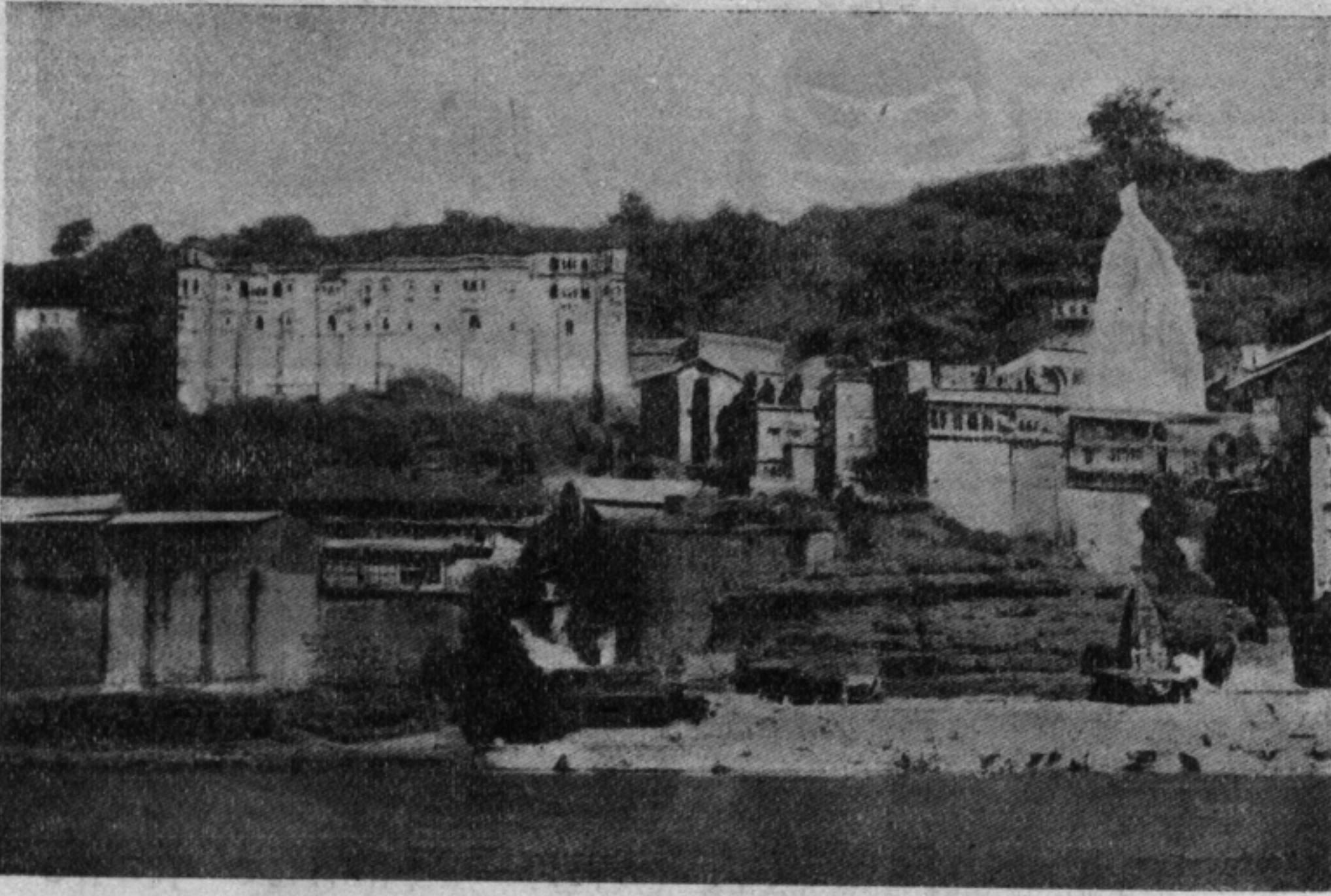
নর্মদাতীরে ওঁকারেশ্বরের মন্দির ও রাজপ্রাসাদ

দূর হইতে দেখিতে ঠিক একখানি ছবির ন্যায়। নর্মদার জল যেমনি স্বচ্ছ তেমনি বেগবতী; উভয়দিকে পাহাড়, সেই পাহাড় ভেদ করিয়া খরস্রোতা নর্মদা প্রবাহিতা; ঘাটে অসংখ্য বৃহদাকার মৎস্য খেলিয়া বেড়াইতেছে। ওঁকারেশ্বর প্রধানতঃ সন্ন্যাসীদিগের দর্শনীয় স্থান; গৃহস্থ যাত্রী খুব অল্পই এই তীর্থে আসিয়া থাকে। তাই আমাদিগকে স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইতে দেখিয়া বিশেষতঃ বাঙালী বলিয়া নদীপার হইয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া স্বাভাবিক শোভা সন্দর্শন কালে মন্দির ও বাজারের লোকেরা নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল ও আমাদের কথাবার্তা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল।

কিন্তু তীর্থকৃত্য করাইবার জন্য ঘাটে পাণ্ডা (উপকরণাদি লইয়া) উপস্থিত ছিল। আমরা যথাবিধি নর্মদা পূজা ও স্নানাদি সারিয়া মন্দির ও দেবদর্শন (ওঁকারেশ্বর) করিলাম। মন্দিরাভ্যন্তরে (নীচে) স্বয়ম্ভূমূর্তি ও উপরে ভোগমূর্তি। প্রবেশে বা পূজাদি করিতে কোন বিশেষ বিধি-নিষেধ বা খরচ নাই। মন্দিরদ্বারে পুষ্প ও বাতাসাদি বিক্রয়ার্থ লোক বা দোকান আছে। আমরা সেই ঘাট-পাণ্ডাকেই সাথী করিয়া পূজাদি সমাপন করিয়া নিকটেই পর্বতোপরি এক ধর্মশালায় উঠিলাম। এই সব ব্যাপারে প্রায় ১টা বাজিল। শৈলেন ও তাহার ছোট মেয়েদের ক্ষুধার্ত দেখিয়া আমার স্ত্রী ধর্মশালার বাহিরে

নদীতীরে পান্থপাকশালায় আসিয়া বাজার হইতে সংগৃহীত চাল, দাইল, ঘৃতাদি এবং কিছু আলু লইয়া খিচুড়ী পাকাইয়া দিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই খিচুড়ী ও ভাজি প্রস্তুত হইয়া গেল; আমরাও সকলে আহার করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম। তদনন্তর ধর্মশালার একটি কক্ষে (নদীর উপর আগাগোড়া প্রস্তর নির্মিত প্রকাণ্ড বাড়ী ও ঘরগুলিও বৃহদায়তন) শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। ভিজা কাপড় শুকাইতে দিবার সময় জানালা হইতে মন্দির ও পাদদেশে প্রবাহিতা নর্মদার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া আকৃষ্ট ও লুব্ধ হইয়া শৈলেন ভায়া নিজের ক্যামেরা দ্বারা মন্দিরের একটি ফটো তুলিল। রাজবাড়ী দেখিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তখন রাজা
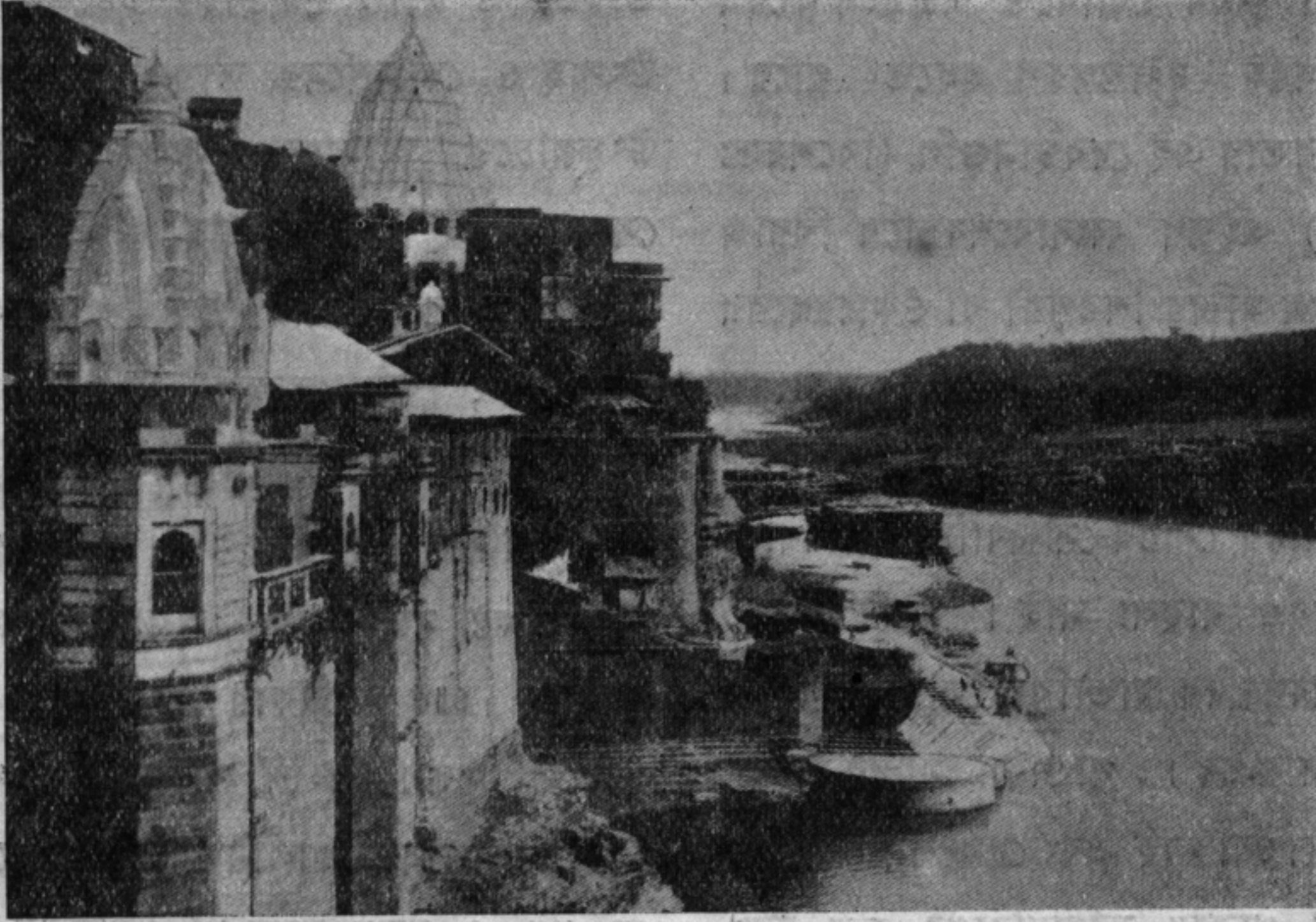
ধর্মশালার বারান্দা হইতে ওঁকারেশ্বরের মন্দির-দৃশ্য

সপরিবারে অবস্থান করায় আমাদের অদৃষ্টে উহা দেখা হইল না; অপরাহ্ণে তিনটার সময় পুনরায় নদী পার হইয়া এপারে আসিলাম। পরপারে যেমন মান্ধাতা বা ওঁকারেশ্বর শিবপুরী এপারে ব্রহ্মপুরী ও বিষ্ণুপুরী; কিন্তু উভয়েরই ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান। তথাপি তাহা দেখিলে তাহাদের পূর্ব গৌরব ও বিশালত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিছু দূরে একটি ঝরণা আছে শুনিলাম, কিন্তু তাহা দেখিয়া নৌকাযোগে যাওয়াতে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম। প্রবাদ যে, নর্মদা এই স্থানে (মান্ধাতায়) ওঁ আকারে মন্দিরটি বেষ্টন করিয়া আছে ও সেই হেতু ওঁকারেশ্বর নাম হইয়াছে। আরও কথিত আছে (আমরা পাণ্ডা ও অন্যান্য লোকমুখে শুনিলাম) যে, এখানে দেবমূর্তি দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া দাঁড়াইলে দর্শক বা যাত্রী তিন জন্মের কথা (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান) জানিতে পারিত বা দেখিতে পাইত। তাহা শুনিয়া একদা বাদশাহ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দেবদর্শনে যান এবং পাণ্ডাদের নির্দেশমত পরিক্রমা করিয়া ওঁকারেশ্বরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলে প্রথমে তাঁহার অতীত জীবনের এক সাধুমূর্তি ও বর্তমানের রাজমূর্তি বিগ্রহগাত্রে প্রতিফলিত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও আনন্দিত হন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আকার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া দণ্ডায়মান হইলে এক শূকর মূর্তি দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়েন এবং তদ্দণ্ডেই শ্রীমূর্তি ও মন্দিরাদি ধ্বংসসাধনের হুকুম দেন। প্রবাদটি কাল্পনিক বা অমূলক হইলেও ইহার নিহিত তথ্য কিন্তু যুক্তিযুক্ত। বিশেষতঃ প্রত্যেক জন্মান্তরবাদী ইহা

স্বীকার করিবেন। কারণ অতীতে সাধুভাবে জীবন যাপন করিয়া তজ্জনিত পুণ্যপ্রভাবে বর্তমান জীবনে তাঁহার বাদশাহত্বলাভ বিচিত্র নহে এবং বর্তমান বাদশাহী জীবনে নানা উচ্ছৃঙ্খল ও উৎপীড়নাদি কর্মজনিত পাপে ভবিষ্যতে শূকরযোনি, লাভও আশ্চর্যজনক নহে। আমরা হিন্দু বিশ্বাস করি এবং শাস্ত্রেরও নির্দেশ যে, মানুষ নিজের কর্মফলজনিত উত্তম বা অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। উক্ত কিম্বদন্তীটি তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতে পারে। যাহা হউক তদবধি মান্ধাতার এই দেবস্থানগুলি (বিশেষতঃ ব্রহ্মপুরী ও বিষ্ণুপুরী) এইরূপ ধ্বংসাবশেষভাবে বিরাজ করিতেছে। পরপারে মূল মন্দির শিবপুরী বা ওঁকারেশ্বরের মন্দিরের অনুরূপ নহে। আমরা অনুসন্ধানে আরও অবগত হইলাম যে, ইহা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের তীর্থ সুতরাং মন্দির ও বিগ্রহাদির সৌষ্ঠব-সৌন্দর্যাদির পারিপাট্য নাই এবং সেবাপূজাদিরও বাহুল্য নাই। যাহা হউক, নর্মদার ও তত্তীরবর্তী পর্বতাদির স্বাভাবিক সৌন্দর্য অতীব মনোহর ও চিত্তের শান্তিপ্রদ। পাণ্ডা বা মন্দির-রক্ষকদিগেরও কোন দাবী-দাওয়া নাই এবং দেবদর্শনাদির জন্য কোনরূপ বিধিনিষেধ না থাকায় সর্বসাধারণের জন্য উহা সর্বদা উন্মুক্ত। আমরা যে পাণ্ডাটির সাহায্য লইয়াছিলাম, তিনি নর্মদা পূজা ও তীর্থস্নানাদি হইতে সুরু করিয়া সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখাইয়া ও স্থানীয় কৃতকার্যাদি সমাধা করাইয়া দিনান্তে বিদায়কালীন ষোলআনা পারিশ্রমিক লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া যান। ব্রহ্মপুরী দর্শন করাইয়া পাণ্ডা বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে আমরা বিষ্ণুপুরী দর্শনার্থ পর্বতারোহণ আরম্ভ করিলে শৈলেন স্ত্রী ও ছোটকন্যা মৈত্রেয়ীকে লইয়া মন্দিরের দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যা ভারতী ও দীপ্তি রৌদ্রক্লিষ্ট হইলেও আমার স্ত্রীর অদম্য উৎসাহ ও দেবদর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ দেখিয়া উৎফুল্লচিত্তে আমাদের সহগামী হইল। পর্বতোপরি সোপানরাজি (উর্ধে প্রায় ২০০।৩০০ ফিট) অতিক্রম করিতে হাঁপ লাগায় দুই একস্থলে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু দেবদর্শন ও পাহাড়ের গাত্রে ও প্রস্তর-নির্মিত তোরণগাত্রে বিচিত্রকারুকার্য দর্শনে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হইয়াছিল। অবতরণ কালে আমাদের কোনও কষ্ট নয় নাই। অতঃপর সকলে মিলিত হইয়া অপরাহ্নে ৪৷৷০ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া ইন্দোরে ফিরিতে সন্ধ্যা ৬৷৷০টা বাজিল। অপরাহ্নে দ্রুতগামী মোটরে প্রত্যাবর্তনকালীন পার্বত্য প্রদেশের চড়াই-উৎরাই-এর পথ ও মধ্যে মধ্যে "বিপজ্জনক" সাইনবোর্ড দেখিয়া কেদারবদরীর কথা মনে পড়িল এবং সকলেই পাহাড়ীয় রাস্তা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম ও পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

মাতৃপূজা

শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ

জমিদার কয়—ওহে দীনুরায়, আদায় করেছ কই
হয়ে এল ক্ষীণ পূর্জার সে দিন, শান্ত কেমনে রই ?
পুরোণ গোমস্তা জানতো অবস্থা যেথানে মুনাফা যত
খরচের হাত শুধু দিন রাত চলেছে জলের মত।
বেশী কিছু আর নাই বলিবার সুদটি আদায় কর
এক কড়া তার ছাড়িব না আর একথা মনেতে ধর।

শুনি এই কথা ঘুরে যায় মাথা বৃদ্ধ নায়েব কয়—
কিবা কহি কর্তা মন্দ যে পর্তা আদায় কেমনে হয় ?
বহুদিন ধরি প্রাণপণ করি ঘুরেছি সকাল-সাঁঝ—
অনাহারে তারা সবে যায় মারা কি কব তোমারে আজ ?
আছে তারা বাধ্য নেই কিছু সাধ্য শুধিতে তোমার ঋণ
ফেলে আঁখিজল শুধু অবিরল—প্রজারা বড়ই দীন !

দয়াময় কর্তা ক্রোধে কন বার্তা শুনিতে চাইনে কিছু
টাকা আমি চাই এই কথাটাই জানাও কৃষাণ পিছু।
বহুকাল ধরি মা'র পূজা করি জীবন করেছি ধন্য
টাকা বিনা আজ ছাড়ি সেই কাজ সমাজে হইব ঘৃণ্য ?
দিন অবশেষে ভেবে হই শেষ মগজে ঘুরিছে চাকা
মনেতে আমার কিছু নেই আর স্বপনেও দেখি টাকা।
রোগে রোগে ভুগি বহুরাত জাগি গৃহিণী ভেঙেছে স্বাস্থ্য
সেও এককথা মনে দেয় ব্যথা হয়েছি দারুণ ব্যস্ত।
পূজাটায় সারি করি তাড়াতাড়ি—চুণার স্বাস্থ্যবাস
খুশী মনে গিয়ে পুঁজি টাকা নিয়ে কাটাব বারটি মাস।
তুমি কহ সাফ কর বাবু মাপ প্রজারা হয়েছে দিন
সুদ যাহা চলে ছেড়ে দিতে বলে তবেই শুধিতে ঋণ।
কথা রাখ ফাঁকা আমি চাই টাকা ; আদায় করিয়া দাও
তা যদি না পার চাকরিটি ছাড় স্বদেশে চলিয়া যাও।
মুখখানি চুণ রেগে হয় খুন—শুনি সে কঠিন বাক্য
বুড়ো দীনুরায় বহু বেগে ধায় আদায় করিয়া লক্ষ্য।
পেয়াদার সাথে লাঠি নিল হাতে নয়ন করিল লাল
প্রজাগণ ঘরে হাহাকার করে অকালে ধরিছে কাল।
শ্রীনাথের কুড়ে কাল গেছে পুড়ে তবু তো ছাড়িল হাঁক
ওরে বেটা ছিরে সমাচার কিরে খাজনা আনিয়া রাখ।
জোড় করি হাত কহিল শ্রীনাথ আজিকে কিছুই নাই
ছোট মেয়ে ঘরে শুয়ে কাঁদে জ্বরে ; কৃষাণ খাটিতে যাই।
সারাদিনমান খেটে হয়রান্ কর্ণে লাগায় তালা
মোর দেহখান করে আনচান্ উদরে ক্ষুধার জ্বালা !

পেয়াদারা জুটি ধরি তার টুঁটি সজোরে মারিল ঝাঁকি
শুধু কথা আর নাহি শুনিবার শুধিবি আজিকে বাকি।
কাতরে সে কয় বাবু মহাশয়, উপায় হ'য়েছে বন্ধ
সব গেছে তলে বন্যার জলে কপাল করেছি মন্দ।
উনোনেতে হাঁড়ি মোর এই বাড়ী চড়েনি তিনটি দিন
কিছু কোথা নাই করি খাই-খাই—উদরে বাজিছে বীণ !
বোস্‌পাড়া গিয়ে বিছে বাঁধা দিয়ে এনেছি সাতটি টাকা
ম্যালেরিয়া জ্বরে মেয়ে মোর মরে বিফল জীবন রাখা।
ভেবেছিনু তাই কিছু যদি পাই কিনিব দুইটি ফল
কচি মেয়ে জ্বরে বাঁচে কিবা মরে খেতেছে শুধুই জল।
বিকারের ছলে নানা কথা বলে অকাট বিকট স্বরে
কবিরাজ তায় কসায়ের প্রায় ভিজিট আদায় করে।
পেয়াদারা তেড়ে টাকা নেয় কেড়ে নগদ আদায় তরে
বুড়ো দীনুরায় মুখে ধম্‌কায় ভিতরে কাঁদিয়া মরে।
ছিরে কহে হায় ঠেকিনু যে দায়, পড়িনু বিষম ফাঁদে
বহু যাতনায় দিন কাটি যায় মেয়েটি সদাই কাঁদে।
দিন ছয় পরে দ্বিতীয় প্রহরে ফুরাল সকল জ্বালা
সেই মেয়ে তার বাঁচিল না আর মিটাল ভবের পালা !
আর-কোলা করি মড়াটায় ধরি শ্রীনাথ চলিল ধেয়ে
শুধু আঁখিজল ঝরে অবিরল চোখের কোলটি বেয়ে।
জমিদার-বাড়ী গিয়ে তাড়াতাড়ি মড়াটি ফেলিয়া ভুঁয়ে
পাদুটি সে ধরি খুব জোর করি সটান পড়িল শুয়ে।
কেঁদে কেঁদে কয় ওগো মহাশয়, পূজায় আমোদ কর
পেয়াদার লাঠি বুকখানা ফাটি খাজনা করেছে জড়।

কর বাবু পুণ্য মোর ঘর শূন্য আদায় করেছ শুষি
ঘটা করি পূজা খুব কর মজা দেবতা হইবে খুশী !
তুমি প্রভু রাজা নাহি জান সাজা বদনে সদাই হাসি
আমি হই চাষা নেই হেন আশা মেয়েটারে ভালবাসি।
কোঠা ঘরে বাস কর বারমাস আরামে দিবস যায়
গরিবের বুক কত সহে দুখ কেমনে বুঝিবে হায় !

প্রতিমারাণীর দুর্গোৎসব

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ

(১)

নদীয়া জেলার চিত্রপুর গ্রামের সর্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যোমকেশ যে বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম এ এবং রিপন কলেজ হইতে ল পাশ করিল, সমস্ত গ্রামে একটা তুমুল হৈ চৈ পড়িয়া গেল, কারণ ইতঃপূর্বে গ্রামে আর কাহারও ভাগ্যে এরূপ সুকৃতিলাভ ঘটে নাই। এই উপলক্ষে সর্বেশ্বর বাবুও গ্রামস্থ সকলকে সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করিয়া পুত্রের অসাধারণ কৃতিত্বে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সর্বেশ্বর বাবুর আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। গ্রামে প্রায় তিন হাজার বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমির উপস্বত্ব ব্যতীত তিনি তেজারতি ব্যবসা করিতেন; সুতরাং তাঁহার আয় বেশ ছিল এবং তিনি আয়ের অনুপাতে মুক্তহস্তে ব্যয়ও করিতেন। পুত্রকে কলিকাতায় হোষ্টেলে রাখিয়া এম এ এবং আইন পড়াইবার জন্য উপযুক্তরূপে খরচ করিতেন। পুত্র ব্যোমকেশও লেখা-পড়ায় যেরূপ মেধাবী, চরিত্র-গুণেও তদ্রূপ গুণবান ছিল। উপরন্ত তাহার সুন্দর আকৃতি এবং দয়াদাক্ষিণ্য-বিনয়াদি গুণগুলি তাহাকে সর্বজনপ্রিয়রূপে পরিচিত করিয়াছিল। সেই নিমিত্ত তাহার উক্ত প্রকার সাফল্যে সকলেই প্রীতি অনুভব করিয়াছিল। প্রথম উন্মাদনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই নানা প্রকার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। বহু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তাহাকে জামাতৃপদে বরণ করিবার আশায় সর্বেশ্বর বাবুর উমেদারি করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত আশা এবং মন্তব্যের মধ্যে ব্যোমকেশ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পিতাকে জানাইল যে, সে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাইবে। সর্বেশ্বর বাবু পুত্রকে সমুদ্রপারে পাঠাইতে প্রথমে রাজী ছিলেন না। গ্রামের রক্ষণপন্থী মাতব্বরগণও বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাকে সামাজিক অনুশাসনে জাতিচ্যুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই। শেষে ব্যোমকেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং কয়েকজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর পরামর্শে সর্বেশ্বর বাবু পুত্রের বিলাত গমনে সম্মতি দান করেন। তৎসঙ্গে ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, জন্মভূমি ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি পুত্রকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া পাঠাইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই শান্তিপুর নিবাসী শশিশেখর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা প্রতিমাসুন্দরীর সহিত যথাশাস্ত্র এবং ধুমধামের সহিত শুভ বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

প্রতিমাসুন্দরী শ্বশুরালয়ে আসিলে সকলেই তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীত তাহার ললিত অঙ্গকান্তি সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট করিল। রূপমুগ্ধ ব্যোমকেশ নবপরিণীতা প্রণয়িনীর সৌন্দর্যে প্রীত হইয়া তাহাকে হৃদয়াসনে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিল। সর্বেশ্বর বাবুও মনে মনে আশ্বস্ত হইলেন যে, প্রতিমার অতুলনীয় রূপজ্যোতি ব্যোমকেশকে শ্বেতদ্বীপ-নিবাসিনী অঙ্গনাগণের মোহ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। প্রতিমা পিতার নিকট হইতে দেবদেবীগণের স্তোত্র, ব্রতকথা, চাণক্য শ্লোক, গীতা ও চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়াছিল। তাহার নিষ্ঠাবান পিতার আদরে এবং যত্নে তাহার বাল্যজীবন আদর্শ হিন্দুত্বে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার আগমনে ও আচরণে তাহার স্বামিগৃহ রমণীয়ত্বে ও কমনীয়ত্বে ভরিয়া উঠিয়াছিল। একদিন শুভলগ্নে ব্যোমকেশ সকলের নিকট বিদায় লইয়া বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিল।

সর্বেশ্বর বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র হৃষীকেশ গ্রামের উচ্চ ইংরাজী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করে। সেও তাহার

ভ্রাতার ন্যায় মেধাবী ও পরিশ্রমী। সংসারে নবাগতা বৌদিদির রূপে এবং গুণে সে তাহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল। ব্যোমকেশ ইংল্যণ্ড যাত্রা করিবার পর সে তাহার বৌদিদির মানসিক ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়াছিল এবং সুযোগ পাইলেই তাহাকে কথা, গল্প ও হাস্য-পরিহাসে প্রফুল্লিত রাখিতে চেষ্টা করিত। একদিন সে প্রতিমাকে রহস্য করিয়া বলিল যে, তাহার দাদা বিলাত হইতে একেবারে সাহেব হইয়া ফিরিবেন, তখন তাঁহার সহিত বাংলায় কথা-বার্তা আদৌ চলিবেনা; সুতরাং এই তিন বৎসরের মধ্যে প্রতিমাকে ভাল করিয়া ইংরাজীতে কথা-বার্তা শিক্ষা করিতে হইবে এবং যদি সে সম্মত হয় তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ভার হৃষীকেশ লইবে। বলা বাহুল্য প্রতিমাও সাগ্রহে এবং সানন্দে দেবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে তিনটি বৎসর কালের অনন্ত স্রোতে মিশাইয়া গেল। ইহার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে; হৃষীকেশ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতায় আই এ পড়িতেছে। তাহার শিক্ষাগুণে প্রতিমা আজকাল ইংরাজীতে বেশ লিখিতে এবং কথা কহিতে শিখিয়াছে। সর্বাপেক্ষা পরিবর্তন হইয়াছে তাহার আকৃতিতে। প্রকৃতি দেবী তাহার দেহভাণ্ডারে নিসর্গের শোভা নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া তাহার রমণীয়ত্ব সহস্রগুণে বর্ধিত করিয়াছেন। এখন সে পূর্ণাঙ্গী ষোড়শী যুবতী, ললিত-লাবণ্য-সৌন্দর্যে তাহার রূপ দুকূলপ্লাবনী তটিনীর ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে। স্বামীর প্রত্যাগমন আসন্ন জানিয়া সেও পুলকিতচিত্তে শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতেছে।

(২)

নিরবচ্ছিন্ন সুখ মানবের ভাগ্যে দুর্লভ। সর্বেশ্বর বাবু আশা করিয়াছিলেন যে শেষ জীবনে তিনি বিদ্বান ও গুণবান পুত্র লইয়া সুখী হইবেন। অবশ্য তিনি পুত্রের উপার্জিত অর্থে নিজ সুখসুবিধা বৃদ্ধি করিবেন এ আশা কখনও হৃদয়ে স্থান দেন নাই, কারণ তাঁহার নিজকৃত আয়ই তাঁহার এবং পরিবারবর্গের ব্যয় নির্বাহে যথেষ্ট মনে করিতেন; অপিচ তিনি দ্বিধাশূন্যচিত্তে ব্যোমকেশের বিলাতের পড়িবার খরচ বরাবর দিয়া আসিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে পুত্রকে লইয়া শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করিবেন এ আশা তাঁহার অন্তরে উদিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ ব্যোমকেশের একখানি চিঠি পাইয়া তিনি স্তম্ভিত ও মর্মাহত হইলেন। পত্রখানি ইংরাজীতে লেখা, কলিকাতার বালিগঞ্জ হইতে লিখিত। আরম্ভ My dear father এবং শেষ Yours affectionately B'Case Mokerjea। পত্রখানি দীর্ঘ, তাহার মর্ম এইরূপ—প্রায় একমাস হইল সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে; বাটীতে সংবাদ না দেওয়ার জন্য সে দুঃখিত, কিন্তু সংবাদ না দিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। তাহাকে কলিকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করিতে হইবে, তজ্জন্য তাহার কলিকাতায় স্থায়িভাবে থাকা আবশ্যক। বিলাত হইতে আসার পর তাহার দেশের বাড়ীতে অবস্থান করা অসম্ভব। পূর্ববঙ্গ নিবাসী জনৈক বন্ধুর সহিত সে একত্রে বিলাত হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছে এবং বালীগঞ্জে ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া আছে এবং উভয়েই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। শেষে লিখিয়াছে প্রতিমা যদি তাহার মতানুবর্তিনী হইতে স্বীকৃতা হয়, তাহা হইলে ব্যোমকেশ তাহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। পরিশেষে তাহার আজীবন বিপুল ব্যয়ভার বহন করিয়া তাহাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য পিতাকে ধন্যবাদ মাতাকে বিনয় সম্ভাষণ (respectful compliments) এবং প্রতিমাকে ও রেসিকে (Resee—হৃষীকেশ) ভালবাসা (love) জানাইয়া পত্রের উপসংহার করিয়াছে।

সর্বেশ্বর বাবু পত্রখানি পাঠ করিয়া বিহ্বলের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল, নয়ন হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; তিনি পত্রখানির উপর অনিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় রহিলেন। প্রতিমাসুন্দরী সেই সময় গৃহে আসিয়া শ্বশুরের ভাববিপর্যয় অবলোকন করিয়া ব্যস্তভাবে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা আপনি এরকম ক'রে বসে রয়েছেন কেন? আপনার কি কিছু অসুখ করেছে?"

সর্বেশ্বর বাবুর বিশীর্ণ নয়নপ্রান্ত হইতে এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল, তিনি মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না।

প্রতিমা শ্বশুরের এবম্বিধ ভাব অবলোকন করিয়া অতিমাত্র বিচলিত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা! কি হয়েছে?" তৎপরে স্বামীর হস্তলিখিত চিঠিখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"এযে আপনার ছেলের চিঠি দেখছি, কিছু কি মন্দ খবর আছে বাবা?" বলিয়া চিঠিখানির দিকে হস্ত প্রসারণ করিল। তাহা দেখিয়া সর্বেশ্বর বাবু উত্তেজিতভাবে বলিলেন,—"ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, ওটা বিষ, ওটা অভিশাপ, ওটা তোমার আর আমার শক্তিশেল।"

তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া প্রতিমাসুন্দরী অতিমাত্র ভীত এবং স্তম্ভিত হইল এবং কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা! আমি পড়তে পারি কি?"

সর্বেশ্বর বাবু উন্মাত্তের ন্যায় ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"তুমি ত বুঝতে পারবে না মা, ও যে ইংরাজিতে লেখা।"

"পারব বাবা" বলিয়া প্রতিমা ক্ষিপ্রহস্তে পত্রখানি তুলিয়া লইল এবং পড়িতে লাগিল। সর্বেশ্বর বাবু অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি দেখিলেন প্রতিমা যেন পত্রের প্রতি ছত্র আকুল আগ্রহে নয়ন দ্বারা গ্রাস করিতেছে। তাহার মুখের ভাব নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষের ন্যায় স্থির প্রশান্ত। অনতিকাল মধ্যে সুদীর্ঘ পত্রখানির পাঠ শেষ করিয়া প্রতিমা উহা ভাঁজ করিয়া শ্বশুরের সম্মুখে রাখিয়া একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মিনতি-পূর্ণকণ্ঠে বলিল—"আপনি এতে এত বিচলিত হ'চ্ছেন কেন বাবা?"

সর্বেশ্বর বাবু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি সব বুঝতে পেরেছ?" প্রতিমা সলজ্জভাবে গ্রীবা দোলাইয়া জানাইল যে সে বুঝিয়াছে। সর্বেশ্বর বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ইংরাজী লেখা প'ড়তে পার?" প্রতিমা ধীরভাবে উত্তর দিল—"হ্যাঁ বাবা, আমি ঠাকুরপোর কাছ থেকে শিখছি।"

সর্বেশ্বর বাবু ব্যাকুল আগ্রহে প্রতিমার হাতখানি ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলেন—"ওরে মা আমার, আমি ত জীবন-নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছি, আমার আর কদিন, কিন্তু তুই যে আমার স্বর্ণমন্দিরের প্রতিমা, তোর কি হবে মা?"

প্রতিমা শ্বশুরের পদদ্বয়ে হাত রাখিয়া বলিল,—"এ সাময়িক উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই নয় বাবা, আপনি এর জন্য মন খারাপ ক'রবেন না, আপনার আশীর্বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"তাই হ'ক মা তাই হ'ক; আমি তোকে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করছি যেন তোর গুণে সব বিঘ্ন কেটে যায়; আমি যেন মরবার আগে তোকে সুখী দেখে মরতে পারি" এই বলিয়া সর্বেশ্বর বাবু প্রতিমার মাথায় সদয় হস্ত স্পর্শ করিয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রতিমাও স্বামীর পত্রখানি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

(৩)

মিঃ সানিয়াল কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। তিনি সপ্তাহে দুই দিন রিপন কলেজের ল'ক্লাসে মোকদ্দমার তদ্বির, সাক্ষীগণের জেরা, সওয়াল-জবাব প্রভৃতি মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় প্রক্রিয়া থার্ড ইয়ারের ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্রগণের মধ্যে বাদী এবং প্রতিবাদী দুইটি দল গঠন করিয়া নিজে বিচারকরূপে সাজান মোকদ্দমা করিতেন। এইরূপ তর্কযুদ্ধে ব্যোমকেশ বাদী কিম্বা প্রতিবাদী যে পক্ষই অবলম্বন করিত বেশ বিচক্ষণভাবে তাহার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিত। তাহার বাক্‌পটুতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং তত্ত্ব-নিরূপণের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়া সানিয়াল তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলেন যে, ল পাশ করিবার পর কোনও বিচক্ষণ আইনজ্ঞের শিক্ষাধীনে কার্য করিতে পারিলে ব্যোমকেশ ভবিষ্যতে একজন সুদক্ষ ব্যবহারজীবী হইতে পারিবে। তিনিই তাহার মস্তিষ্কে বিলাত যাত্রার কল্পনা জাগাইয়া দিয়াছিলেন এবং আইন পাশ করিবার পর ব্যোমকেশও তাহার কল্পনা কার্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হয়।

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর ব্যোমকেশ সানিয়াল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করে; তিনিও তাঁহার উপদেশ কার্যে পরিণত ও সাফল্যমণ্ডিত দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ব্যোমকেশকে নিজ অন্যতম জুনিয়াররূপে গ্রহণ করেন। সানিয়াল সাহেবের শিক্ষা প্রভাবে এবং স্বীয় অমানুষিক মেধা ও অধ্যবসায় বলে দুইমাসের মধ্যেই ব্যোমকেশ 'বারে' সুনাম অর্জন করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ এবং স্বাবলম্বী হইতে সমর্থ হইল।

কিন্তু ব্যোমকেশের অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর আচরণে চিত্রপুরে তাহাদের সংসারে এক দারুণ অশান্তির মলিন ছায়া সকলের হৃদয় আবিষ্ট করিল। প্রতিমা প্রতিনিয়ত কায়মনোবাক্যে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর মনস্তুষ্টিবিধান করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের মানসিক দৈন্য ঘুচাইতে পারিল না। অপিচ সর্বেশ্বর বাবু যেন সে নিকটে আসিলে আরও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেন। ইহাতে প্রতিমা নিজেকে বড়ই বিপদগ্রস্ত মনে করিতে লাগিল। এই নিদারুণ বিপদে দেবর হৃষীকেশ তাহার একমাত্র বন্ধু ও উপদেষ্টা। কিন্তু সেও কলিকাতায়। প্রতিমা নিজের মনোব্যথা প্রকাশ করিতে না পারিয়া সময়ে অন্তরালে গিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিত এবং তাহা সময়ে সময়ে জানিতে পারিয়া তাহার শ্বাশুড়ী অধোবদনে বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জনা করিতেন। এই সমস্ত ব্যাপারে প্রতিমা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল; সে সংসারের সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া হৃষীকেশকে পত্র লিখিল এবং অবিলম্বে চিত্রপুরে আসিতে বারম্বার মাথার দিব্য দিয়া অনুরোধ করিল। ইতিপূর্বে হৃষীকেশ সমস্ত বৃত্তান্তই শুনিয়াছিল। ভ্রাতৃজায়ার পত্র পাইয়া সে উত্তরে জানাইল যে, এক সপ্তাহ পরে গ্রীষ্মাবকাশের জন্য কলেজের ছুটী হইলেই সে অবিলম্বে বাড়ী ফিরিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিবে।

যথা সময়ে হৃষীকেশ বাটী ফিরিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং পরিজনবর্গের মানসিক অবস্থা বিশেষতঃ তাহার বৌদির মলিনমূর্তি দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইল। প্রতিমা তাহাকে স্বামীর চিঠিখানি দেখাইল এবং প্রতীকার সম্বন্ধে তাহার পরামর্শ চাহিল। সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া হৃষীকেশ বলিল,—"বৌদি! এসমস্তর প্রতীকার একমাত্র তোমার হাতে, এসময় তুমি কাতর হ'লে সব নষ্ট হবে, তুমি শক্ত হও, তারপর দুজনে ঠাণ্ডা হ'য়ে পরামর্শ ক'রে কাজে নামতে হবে।"

প্রতিমা অকূলে কূল পাইল, তাহার প্রাণে নব বলের সঞ্চার হইল, সে দেবরের উপদেশ অনুযায়ী নির্বিচারে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

প্রায় সপ্তাহব্যাপী নিভৃত আলোচনার পর একদিন সকলের আহারান্তে প্রতিমা শ্বশুরের নিকট গমন করিল। তিনি শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রতিমা গিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া সর্বেশ্বরবাবু অনুমান করিলেন তাহার কিছু বক্তব্য আছে। তিনি স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"বউমা! কিছু কথা আছে কি?" প্রতিমা অধোবদনে বলিল,—"হ্যাঁ বাবা।" সর্বেশ্বরবাবু বলিলেন,—"বল মা, কি বলবে নিঃসঙ্কোচে বল।"

প্রতিমা বলিল,—"বাবা! আপনার যদি অমত না থাকে, আর যদি আমায় অনুমতি দেন আমি আপনার ছেলের সঙ্গে একবার দেখা করি।"

সর্বেশ্বরবাবু ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন,— "আমারও ক'দিন ধরে এই কথাই মনে তোলপাড় করছে। আমি অনেক ভেবে দেখেছি যে এক্ষেত্রে এ ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু মা আমার, তোমার পিতৃবংশ আর শ্বশুরবংশের কুলমর্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়ে তুমি ধর্মান্তর গ্রহণ করবে এধারণা যে আমি মনে আনতেই পাচ্ছি না।"

"তা কি হয় বাবা" প্রতিমা ঈষৎ অনুযোগসহকারে বলিল,—"তাকি হয় বাবা? হিন্দুধর্মের প্রত্যেক খুঁটিনাটি আমার প্রাণের সঙ্গে যে গেঁথে গেছে। আমিও তা ছাড়তে পারবো না বাবা। ধর্মান্তর গ্রহণ ত দূরের কথা, আপনি আশীর্বাদ করুন ধর্মান্তর গ্রহণের কল্পনা আমার মনে আনবার আগে যেন আমার মরণ হয়।"

"তা কি সম্ভব হবে মা, তুমি ত ব্যোমকেশের চিঠি প'ড়েছ।"

"একবার চেষ্টা ক'রে দেখি বাবা, আপনার আশীর্বাদে

কতদূর কি হয়। যদি বিফলমনোরথ হই, আবার আপনার কাছে ফিরে আসব।"

সর্বেশ্বরবাবু সর্বান্তঃকরণে সম্মতিদান করিলেন। একদিন শুভলগ্ন দেখিয়া প্রতিমা দেবরের সহিত স্বামি-সন্দর্শনে যাত্রা করিল।

(৪)

শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে একখানি ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করিয়া প্রতিমা ও হৃষীকেশ বালিগঞ্জের ঠিকানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্দিষ্ট নম্বরের বাড়ীতে আসিয়া দেখিল দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। কড়া নাড়িতে একজন উড়িয়া চাকর দরজা খুলিয়া দিল, তাহার পরণে একখানি ধপধপে সাদা কাপড়, গায়ে কোট জামা, দুই কাণে মোটা সোনার রিং, স্কন্ধে একখানি ফরসা তোয়ালে। সে দরজা খুলিয়া আধা হিন্দী আধা উড়িয়া ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল তাঁহারা কাহাকে খুঁজিতেছেন। উত্তরে হৃষীকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"এই বাড়ীতে বাবু ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় থাকেন?" ভৃত্য স্কন্ধের তোয়ালেখানি একবার নামাইয়া ঝাড়িয়া তাচ্ছল্যভরে জানাইল যে ঐখানে কোন বাবু থাকেন না, উহা সাহেবের কোঠী।

প্রতিমাসুন্দরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"ঠাকুরপো, তুমি আমাকে এত করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিজেই শেষকালে বেতালা হচ্ছ? তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন যে তোমার দাদা আজকাল মিষ্টার বি'কেশ মোকার্জি।"

তাহা শুনিয়া ভৃত্য অনুমান করিল যে তাহারা তাহার প্রভুর কোন আত্মীয় হইবেন এবং সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল,—"হাঁ, মায়ী, এ মোকার্জি সাবকা কোঠী অছন্তি।"

আশ্বস্ত হইয়া হৃষীকেশ জিজ্ঞাসা করিল সাহেব বাড়ী আছেন কি না। তদুত্তরে ভৃত্য বলিল যে তিনি কোর্টে গিয়াছেন পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় ফিরিবেন। তখন বেলা প্রায় চারটা। হৃষীকেশ ভৃত্যকে বলিল,—"দেখ সাহেব আমাদের পরিচিত বন্ধু। এই মায়ী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবেন; তুমি ইঁহাকে লইয়া গিয়া ঘরে বসাও।" এই বলিয়া সে বউদিদির নিকট হইতে বিদায় লইয়া হোষ্টেলে চলিয়া গেল। ভৃত্যও প্রতিমাকে সসম্ভ্রমে উপরে লইয়া গিয়া ড্রয়িংরুমে বসাইয়া ফ্যান খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল চা আনিবে কি না। তাহাকে নিবারণ করিয়া প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল তাহার নাম কি। উত্তরে সে বলিল তাহার নাম নিধিরাম বেহারা।

প্রতিমা তাহার দেশ কোথায়, পিতা মাতা আছে কি না, কয়টি পুত্রকন্যা প্রভৃতি সংবাদ জানিয়া পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে বাড়ীতে আর কেহ থাকেন কি না। উত্তরে জানিল যে, পূর্বে সেখানে আরও একজন সাহেব থাকিতেন; কিন্তু সাহেবের সহিত মিল না হওয়ায় কুড়িদিন হইল তিনি অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

প্রতিমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সে মনে করিল তাহার স্বামীর শনি ছাড়িয়া গিয়াছে। আর ভাবিল যে প্রথম স্বামী সন্দর্শনে তাহার অগ্নিপরীক্ষার সময় তাহাকে অপর কোনও জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিত হইতে হইবে না। সে নিধিরামকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলের প্রকোষ্ঠগুলি দেখিতে লাগিল। ঘরগুলি সমস্ত বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটি ড্রয়িংরুম, একটি ডাইনিংরুম, তাহাতে একখানি ছোট সুদৃশ্য টেবিল চারিদিকে চারখানি চেয়ার; টেবিলের উপর চীনদেশীয় পুষ্পাধারে একটি ফুলের তোড়া। তাহার পার্শ্বে ড্রেসিংরুম, বাথরুম, পায়খানা। একটি সজ্জিত বেড্রুম তাহারই একধারে একখানি ছোট খাটে পরিষ্কার বিছানা, ঘরের মেঝেয় একখানি মূল্যবান কার্পেট পাতা—সমস্তই মার্জিত রুচির পরিচায়ক। আরও কয়খানি ঘর অব্যবহার্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, বোধ হয় এইগুলি অপর সাহেবের ব্যবহার্য ছিল। নীচে আসিয়া দেখিল একটি রন্ধনশালা তাহাতে উচু গাঁথা চুল্লী, কেটলিতে জল ফুটিতেছে; নিকটে একটি টেবিলের উপর চার সরঞ্জাম। পার্শ্বে একখানি ভাণ্ডার ঘর। অপর ঘরগুলি ভৃত্যগণের অধিকৃত। ঘরগুলির সম্মুখে একটি দীর্ঘ বারাণ্ডা, তাহার একপার্শ্ব দিয়া দ্বিতলের সিঁড়ি; অপর পার্শ্বে একটি দরজা তাহা খুলিয়া একটি ছোট সুন্দর বাগান দেখিতে পাওয়া গেল। বাগানটির অল্পপরিসর জমি, চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। তাহাতে গোলাপ,

বেলা ও নানাবিধ মরসুমী ফুলের গাছ। অদূরে দূর্বাদল-পরিবেষ্টিত একটি ঝাঁকড়া কৃষ্ণতুলসীর গাছ শোভা পাইতেছে। তুলসী গাছটি দেখিয়া প্রতিমা অতিমাত্র পুলকিত হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। এই সময় গেট হইতে ইলেকট্রিক বেল বাজিয়া উঠিল এবং নিধিরাম "সাব আইছি" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রতিমা কয়েকটি গোলাপ ও বেলফুল লইয়া তুলসীতলে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিল— "মাতঃ বৃন্দারাণি! তোমার অপ্রত্যাশিত দর্শনে আমার মন অপার আনন্দে ভরিয়া উঠিল, আশীর্বাদ কর যেন আমার অভিযান সফল হয়।"

উদ্যান হইতে ভিতরে আসিয়া প্রতিমা কম্পিতপদে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। তাহার মনে হইল যেন তাহার বক্ষের স্পন্দন এবং কম্পন তাহাকে অভিভূত করিয়া তাহার সমস্ত সঙ্কল্প পণ্ড করিয়া দিবে। ক্ষণকাল সে সিঁড়ির চত্বরে দাঁড়াইয়া নিজকে সামলাইয়া স্থির পদক্ষেপে উপরে উঠিতে লাগিল, উঠিয়া দেখিল ব্যোমকেশ যেন কাহার প্রতীক্ষায় ড্রয়িং রুমে অপেক্ষা করিতেছে এবং তাহাকে আসিতে দেখিয়া উৎফুল্ল-বিস্ময়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—"Hello Protima my darling! How shall I welcome thee?"

প্রতিমা গৃহের ভিতর গিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার সবুট পদস্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে ব্যোমকেশ পিছাইয়া গিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং বিরক্ত হইয়া বলিল—"Oh! old nasty things."

প্রতিমা মুখের অবগুণ্ঠন নিরাকৃত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া সাহসের সহিত বলিল—"I am sorry. That's due to old habit. Please excuse me." বলিয়া করমর্দনের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল।

ইহা দেখিয়া ব্যোমকেশ অতিমাত্র প্রীত হইয়া প্রতিমার দক্ষিণ হস্ত নিজে দুই হাতে সাগ্রহে ধরিয়া বলিল —"Oh! Pretty well. My darling how I love you." প্রতিমা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সহাস্যে বলিল— "Really? Thanks so much for your kind memory."

ব্যোমকেশ সানন্দে বলিল,—"That's it more than what I expected. Quite enlightened and upto date."

প্রতিমা তখন নিজের হাতখানি টানিয়া লইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল,—"নিশ্চয়, আবশ্যক হ'লে আরও পরিচয় পাবে, কিছুরই অভাব হবে না। এখন কাজের কথা বলি, আর সেটা নিজেদের মাতৃভাষায় হ'লেই ভাল হয়। আরও বিশ্বাস তুমি এই তিন বছরে বাঙ্গলা ভুলে যাওনি। আমার বক্তব্য—আমি তোমার কাছে এসেছি।"

ব্যো। আমি তাতে খুব খুসী আছি। But you should know আমি ধর্মত্যাগ ক'রেছি।

প্র। তুমি ধর্মত্যাগ ক'রেছ? কই তা ত জানি না।

ব্যো। I mean আমি ব্রাহ্মধর্ম নিয়েছি, তুমি converted হ'তে পারবে?

প্র। কেন পারব না; কিন্তু কিছু আবশ্যক আছে কি? ব্রাহ্মধর্ম সে ত হিন্দু ধর্মেরই নামান্তর—নিরাকার উপাসনা—উচ্চ স্তরের সাধনা। দেখ আজকাল গীতার ফিলজফি সুদূর ইয়োরোপেও সমাদৃত। সেই গীতায় ভগবান্ বলেছেন—'আমাকে যাহারা যেভাবে ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগৃহীত করি।' সমস্ত নদ-নদীর যেমন চরম পরিণতি মহাসাগর, সেই রকম সমস্ত ধর্মেরও চরম লক্ষ্য ঈশ্বর-প্রাপ্তি। আমার ধর্মই মোক্ষ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় অন্য ধর্ম নিষ্ফল ও নিরর্থক এরকম ভাবা সম্পূর্ণ অন্যায়, এতে নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তির পরিচয় দেওয়া হয়। এইজন্যই পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব ধর্মসমন্বয় প্রচার করেছেন। 'যত মত তত পথ' এতে ত বিরোধের কোনও কারণ নাই। আর সাকার নিরাকার উপাসনা, সেও ত মানসিক সংযম ও চিত্তশুদ্ধির উপর নির্ভর করে। শিশুরা প্রথম প্রথম দাঁড়াবার সময় একটা অবলম্বনের সাহায্য নেয়, কিন্তু তাদের পা শক্ত হ'লে আর অবলম্বনের দরকার হয় না। মানুষের 'মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর ও বিচারবিমূঢ়'; যতক্ষণ না শাস্ত্রবাক্য গুরূপদেশ ও সংযমের দ্বারা তাকে আয়ত্ত কর্তে পারা যায় ঈশ্বরের

স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য তাকে সাকার সাধনরূপ একটা অবলম্বন দিতে হয়। মন বিষয়বিনিবৃত্ত ও শুদ্ধ হ'লে তখন তাঁর সাকার আর নিরাকারে কোনই প্রভেদ থাকবে না। আমার বাবার কাছে গল্প শুনেছিলুম জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ মহাপণ্ডিতকে অন্তিম কালে তীরস্থ করা হলে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে—'আপনি একজন পরম জ্ঞানী ও শাস্ত্রদর্শী, চিরজীবন শাস্ত্রালোচনায় জীবন অতিবাহিত করেছেন, আপনি এই সময়ে আমাকে অনুগ্রহ করে বলুন সাকার ও নিরাকারের প্রভেদ কি ও কোনটি প্রশস্ত। তদুত্তরে পণ্ডিত প্রবর একটি শ্লোক আবৃত্তি করে বলেন, ভগবান্‌কে কেহ বলেন সাকার কেহ বলেন নিরাকার; আমার কিন্তু জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে বলিতে পারি তিনি "নিরাকার" অর্থাৎ জলের যেমন নিজস্ব কোনও আকার নাই, তাকে যখন যে আধারে রাখা হয় সে সেইরূপ আকার ধারণ করে, ভগবান্‌ও সেই রকম জলের আকার অর্থাৎ ভক্ত সাধক তাঁকে যে রূপে পূজা করেন, তিনি সেইরূপেই পূজা গ্রহণ করেন। * সুতরাং তোমার আর আমার ধর্মমতে ত কোন পার্থক্য থাকতে পারে না।

ব্যো। **My sweet, you talk nice like a parrot and I admit that there are sense and reasons in what you say. But you shall have to accommodate yourself to the mode of living here,**

প্র। সেটাও ত সময়সাপেক্ষ। মানুষ যেমন অবস্থার দাস তেমনই সংস্কারের অধীন; সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করতেও ত কিছু সময়ের আবশ্যক। এই তোমার কথাই বলি, ধরনা তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করে বিলাত যেতে এখানে ফিরে এলে যদি তোমাকে কেউ একটি মেথর বা মুচীর মেয়ে বিয়ে করতে বলত, তুমি কি একেবারে রাজী হ'তে পার্তে? বিলাতের সভ্যতার আলোর রেখাপাত সত্ত্বেও পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মজনিত সংস্কার কি মাথা খাড়া করে দাঁড়াত না? অতএব আমি আশা করি তুমি আমাকে উপস্থিত এ স্বাধীনতাটুকু দেবে।

ব্যো। **Oh yes, I quite agree. You shall have full liberty to follow your own course.**

প্রতিমা এই অভাবনীয় সাফল্যে উল্লসিত হইয়া স্বামীকে তাহার উদার মতের জন্য মনে মনে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া প্রার্থনা করিল, হে স্বামি। আমার ইহপরকালের পরম দেবতা। আশীর্বাদ কর যেন আমি তোমারই অস্ত্রে তোমাকে জয় করিতে পারি।

ব্যোমকেশ নিধিরামকে ডাকিয়া ভিতরের ঘরগুলি মেমসাহেবের জন্য তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করাইয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি দিয়া সাজাইয়া দিতে বলিয়া বেশ পরিবর্তনের জন্য ড্রেসিং রুমে চলিয়া গেল। নিধিরামও অপর ভৃত্যগণকে লইয়া শশব্যস্তে কাজে লাগিয়া গেল।

পরদিন সকাল বেলা হৃষীকেশ সংবাদ লইতে আসিলে ব্যোমকেশ তাহাকে পরম স্নেহ এবং সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। হৃষীকেশ দাদার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলে এবার আর সে সরিয়া না গিয়া হাসিয়া বলিল,—"তোমাদের ঐ অভ্যাসগুলো এখনও গেল না।" তদুত্তরে প্রতিমা হাসিয়া বলিল,—"ও আগে কালাপানি ঘুরে আসুক তবে ও অভ্যাস ছাড়বে।"

প্রতিমা দেবরকে লইয়া নিজের ঘরে গেল এবং পূর্বদিনের সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল, হৃষী শুনিয়া আনন্দিত হইল। কিছুক্ষণ পরে ব্যোমকেশ ঘরের দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি কি ভিতরে আসতে পারি?"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল,—"দেখেছ, তোমাকে সংস্কার কতটা গ্রাস করে ফেলেছে যে তুমি নিজেকে স্ত্রীর ঘরে আসতে অযোগ্য মনে ক'রছ?"

ব্যোমকেশ ভিতরে আসিয়া বসিল এবং হৃষীকে তাহার বউদিদির জন্য দাসী ও অপরাপর আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিয়া স্নানঘরে চলিয়া গেল। স্নান সারিয়া সে পুনরায় আসিয়া হৃষীকে বলিল,—"হৃষী, তুমিও এখানে স্নান ক'রে খেয়ে নাও, আমি কোর্টে যাব আমার সঙ্গে যাবে এবং মোটর তোমায় হোষ্টেলে পৌছে দেবে।"

---

* 'কেচিদ্বদতি সাকারং নিরাকারং তথাপরে।
বয়ন্তু দীর্ঘসংযোগাৎ নিরাকারমুপাস্মহে॥' মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

হৃষী চুপ করিয়া রহিল। প্রতিমা কিন্তু তাহাকে নিষেধ করিয়া ক্ষণপরেই বিদায় দিল।

(৫)

প্রতিমার আসার পর চার মাস কাটিয়া গিয়াছে। মোকার্জি সাহেবের বারে বেশ সুনাম ও পসার হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে অনেক খ্যাতনামা পুরাতন ব্যারিষ্টারদিগের সহিত সমানভাবে পাল্লা দিয়া অনেক মামলা জিতিয়াছে। গৃহেও প্রতিমা আসার পর হইতে সংসারিক শৃঙ্খলা ও সুশ্রী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে সে প্রতিমার প্রতি অতীব প্রসন্ন। প্রতিমা কিন্তু এযাবৎ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে সাহেব কোন বাধা দেন নাই। ভৃত্যাদি সকলেই প্রতিমার সদয় ব্যবহারে একান্ত বাধ্য। সাহেবের রন্ধন নীচে বাবুর্চি করে; ভৃত্যগণ ও প্রতিমার রন্ধন উপরে স্বতন্ত্র হয়।

হৃষী এখন আর আসেনা, ইহাতে সাহেব দুঃখিত। তিনি হৃষীকে আসিতে অনুরোধ করিয়া একখানি চিঠি দিয়াছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক হৃষী আসেও নাই বা কোন উত্তর দেয় নাই। মধ্যে মধ্যে সাহেব প্রতিমার নিকট পিতামাতার নাম উল্লেখ করেন, কিন্তু বাড়ীতে কোন পত্রাদি লিখিতে সাহস করেন না। অবশেষে একদিন হৃষীর কথা উপলক্ষ্য করিয়া পিতাকে একখানি চিঠি লিখিলেন এবং অনুরোধ করিলেন যেন হৃষী গ্রীষ্মাবকাশের ছুটির পর আর হোষ্টেলে না গিয়া তাহার বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করে। বলা বাহুল্য প্রতিমার দুষ্টামি বুদ্ধিতে এ পত্রেরও বড় কোন জবাব আসিল না।

রেজিষ্ট্রারের নিলামে মুর্শিদাবাদ জেলার সুনামগঞ্জ পরগণা নামে একটি জমিদারী বিক্রয়ের সংবাদ খবরের কাগজে দেখিয়া তাহার বিবরণ অনুসন্ধানের জন্য মোকার্জি সাহেব রেজিষ্ট্রারের অফিসে গমন করেন এবং রেজিষ্ট্রার সাহেব তাঁহাকে উহা খরিদ করিতে পরামর্শ দেন। নিলামের দিন মিঃ মোকার্জি প্রতিমার নামে ডাক দেন এবং সুবিধাজনক ক্রেতা না থাকায় উক্ত জমিদারী অতি অল্প মূল্যেই তিনি ক্রয় করেন। বৈকালে বাড়ী ফিরিয়া সাহেব প্রতিমাকে এই সংবাদ শুনাইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

পূজা আগতপ্রায়। আগমনীর বোধন-মন্ত্রে প্রতি বঙ্গগৃহ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মোকার্জি সাহেব ছয় মাস হইল বিলাত হইতে আসিয়াছেন এবং এই স্বল্পকালের মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে যশঃ এবং অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মনের মধ্যে প্রকৃত শান্তি নাই। পিতা-মাতার সহিত তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার জন্য সময় সময় মনে গ্লানি অনুভব করিতেন এবং প্রতিমাও সুযোগ বুঝিয়া ক্ষতে লবণ প্রক্ষেপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না।

একদিন মোকার্জি সাহেব অতিষ্ঠভাবে প্রতিমার নিকট আসিয়া প্রস্তাব করিলেন যে পূজার বন্ধে তাঁহারা একবার দার্জিলিং ঘুরিয়া আসিবেন। প্রতিমাও স্বামীর ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়াছিল এবং এই প্রকার অবসরই খুঁজিতেছিল। প্রতিমা সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল,—"বেশ ত চল না আমরা আমাদের নূতন জমিদারীটা একবার দেখে আসি।"

মোকার্জি সাহেব বিরক্তভাবে বলিলেন,—"না না, আমার মনটা বড়ই unsettled, আমি একবার মাথাটা ঠাণ্ডা কর্‌বার জন্য দার্জিলিংএই যেতে চাই।"

প্রতিমা বলিল,—"বেশ তা হ'লে এক কাজ কর, আমাকে সুনামগঞ্জে রেখে তুমি দার্জিলিং ঘুরে এস। আবার ফিরবার সময় আমাকে নিয়ে আসবে; এতে তোমার দার্জিলিং যাওয়া আর জমিদারী দেখা দুকাজই হবে।" সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রতিমার উপর ভার দিলেন। তাঁহাদের পৌঁছিবার দিন স্থির করিয়া নায়েবের নিকট পত্র গেল এবং সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক রাখিবার আদেশ দেওয়া হইল।

রওয়ানা হইবার দুইদিন পূর্বে প্রতিমা সাহেবকে বলিল,—"আমি শুনেছি সুনামগঞ্জ হিন্দুপ্রধান স্থান, সেখানে হ্যাট-কোটের পরিবর্তে তুমি ধুতি-চাদর প'রে গেলে প্রজারা তোমাকে দেখে বেশী খুসী হবে। আর ধুতি-চাদর ত আমাদের ন্যাসনাল ড্রেস। আজকাল অনেক

বড় বড় ব্যারিষ্টাররা ধুতি-চাদর এমন কি খদ্দর পর্যন্ত পরছেন। আমার অনুরোধ তুমি যখন সুনামগঞ্জে যাবে তখন ধুতি-চাদর পরে নামবে। আমি তোমার কাপড়, চাদর ও জামার ব্যবস্থা করে নেব। আশা করি তোমার এতে অমত হবে না। আর এক কথা, তুমি দার্জিলিংএ স্যানিটেরিয়ামে থাকবে, সেখানে বাবুর্চিকে নিয়ে যাবার কোন দরকার হবে না। সুনামগঞ্জে যে একরাত্রি বা দুরাত্রি থাকবে তখন বোধ হয় আমার রান্না খেতে আপত্তি হবে না, কারণ বাবুর্চির অসুখের সময় আমার রান্না খেয়েছ ত? সেই জন্য আমি বলি তুমি শুধু নিধিরামকে সঙ্গে নিয়ে যাও; আর সব চাকররা বাড়ী থাক। আমার সেখানে নিশ্চয়ই চাকর-বাকরের অভাব হবে না। এতে খরচ ঢের কম হবে।"

মোকার্জি সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার মৎলব কি বল ত, তুমি কি আমায় reconvert করতে চাও না কি?"

প্রতিমাও হাসিয়া উত্তর করিল,—"ভয় নেই, ধুতি চাদর প'রলে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান অন্তর্ধান হবে না।" এই বলিয়া সে কার্যান্তরে চলিয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে তাঁহারা সুনামগঞ্জ পৌছিলে নায়েব-গোমস্তা-আমলাবর্গ সকলে আসিয়া তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিল। পরদিন প্রাতঃকালে প্রতিমাকে সঙ্গে লইয়া ব্যোমকেশ কাছারীতে বসিলে প্রজারা আসিয়া নজর দিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। সাহেব প্রতিমার অনুরোধে কোন রকমে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। পরিশেষে যখন কয়েকজন মাতব্বর আসিয়া প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে জানাইল যে প্রতিবৎসর জমিদার বাড়ীর প্রাঙ্গণে তাহাদের সাধারণ দুর্গাপূজা হইয়া থাকে এবং জমিদার সরকার হইতে তাহারা বার্ষিক বৃত্তি পায় এবং এবৎসরও তাহা করিবার হুকুম প্রার্থনা করিল, তখন তিনি একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন,—"Preposterous! Me encouraging idolatry! It is out of the question." তিনি ক্রোধভরে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া সকলেই ভীত হইল। তাহা দেখিয়া প্রতিমাসুন্দরী প্রধান কর্মচারীকে বলিলেন,—"এঁদেরকে কাল সকালে আসতে বলুন আমরা এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করে মত প্রকাশ ক'র্ব।"

অন্দরে আসিয়া প্রতিমা স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তিনি বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"কখনই না, ও প্রতিমা ট্রতিমা একেবারেই চলবে না।"

প্রতিমাও দৃঢ়স্বরে বলিল,—"তুমি কি মনে কর প্রজাদের মনে এই রকমে অশান্তি সৃষ্টি ক'রে তুমি জমিদারী শাসন করবে। ওদের ধর্ম-বিশ্বাসে বাধা দেবার তোমার কি অধিকার আছে? আজ এই কথা তুমি সরল রাজভক্ত হিন্দু প্রজার কাছে নিঃসঙ্কোচে ব'লতে পারলে; কিন্তু যদি এরা মুসলমান হ'ত এতক্ষণ একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটে যেত। আর প্রতিমার ওপর যদি এতই বিদ্বেষ, ঘরের প্রতিমাকে এতদিন বিসর্জ্জন দাও নি কেন?"

মোকার্জি সাহেব অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া বলিলেন, —"Oh don't talk nonsense and don't misunderstand me."

প্রতিমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বলিল,—"কি রকম?"

মো। আরে বাড়ীর সামনে কদিন ঢাক ঢোল বাজিয়ে হৈ চৈ ক'রে একটা regular nuisance ক'রে তুলবে, সে তুমি tolerate ক'রতে পারবে না; আমার কি, আমি ত আজই রাত্রে চ'লে যাচ্ছি। তার পর সব চেয়ে horrible thing কি জান ওরা সব brutally ছাগল ভেড়া কেটে একটা বিতিকিচ্ছি ব্যাপার ক'রে তুলবে।

প্র। সেটা অবশ্য প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। যাই হ'ক আমার অনুরোধ তুমি এবিষয়ে অতটা কড়া হোয়ো না। এর মীমাংসার ভার যদি আমার ওপর দাও আমি আশা করি একটা সামঞ্জস্য ক'রে দিতে পারব।

মো। All right do it by all means.

রাত্রের ট্রেনে মোকার্জি সাহেব পুনরায় হ্যাট কোট ভূষিত হইয়া দার্জিলিং রওয়ানা হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মাতব্বর ও প্রজাগণে কাছারী ও প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল। পূর্বদিনে জমিদারের কঠোর আদেশে সকলকেই মর্মাহত হইয়াছিল, আজ তাহার চূড়ান্ত ফলাফল জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক আগ্রহে সমবেত। প্রতিমাসুন্দরী আজ পরদার আড়ালে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং জানিতে চাহিলেন যে উদ্যোক্তাগণের মধ্যে পুরোহিত বা যাজকগণের কেহ উপস্থিত আছেন কি না এবং যদি থাকেন তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে মুখপাত্র নির্বাচন করিতে আদেশ দিলেন। পরে পরদার অন্তরাল হইতে তাঁহাকে পূজা সম্বন্ধে পূর্ব পূর্ব বৎসরের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও যথাযথ উত্তর দিলেন।

পরে প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পূজায় ছাগ-মেষাদি পশুবলি হয় কি না।"

পূজারী উত্তর করিলেন,—"হয়"।

প্র। শাস্ত্রে ত পশুবলির পরিবর্তে বিকল্প বিধান অর্থাৎ ইক্ষু কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বলির ব্যবস্থা আছে।

পু। আজ্ঞে তা আছে, তবে কি না বহুদিনের প্রথা।

প্র। দেশকাল পাত্রভেদে প্রথারও ত পরিবর্তন হ'তে পারে?

সকলে পরস্পরে মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। প্রতিমা পুনরায় বলিলেন,—"আপনাদের পূজা প্রতি বৎসর যেরূপ হয় সেইরূপভাবেই আয়োজন করুন; কেবল আমার একটি অনুরোধ আপনারা পশুবলি রহিত করুন, আমি আপনাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে জমিদার মহাশয়ের মত করাইয়া দিব।"

জনতার মধ্যে একটা অস্ফুট মৃদু গুঞ্জন উত্থিত হইল। প্রতিমাসুন্দরী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জমিদার সরকার হইতে কতক টাকা বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হইত?"

পূজক উত্তর করিলেন,—"পঞ্চাশ টাকা"

প্রতিমা বলিলেন,—"এ বৎসর আপনারা একশত এক টাকা পাইবেন।"

জনতার মধ্য হইতে বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল এবং কেহ কেহ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"রাণীমার জয় হোক।"

প্রতিমা পুনরায় পূজককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে আপনারা আমার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া আমায় জানাইলে আমি অপর ব্যবস্থা করিব।"

পুরোহিত মহাশয় তাঁহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইয়া অনুযোগস্বরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাহাতে গ্রামবাসিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল,—"রাণীমা যখন ক'রছেন তার ওপর আবার কথা কি? গ্রামের তরফ থেকে আমরা মত দিচ্ছি।"

গ্রামবাসিগণের ভাবগতিক দেখিয়া পুরোহিত আর বিরুক্তি করিলেন না। মণ্ডপ নির্মাণ, বাদ্যাদির আয়োজন, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি কার্য পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল।

(৬)

শুভ সপ্তমী পূজা। সারা গ্রামখানি আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। জমিদারবাটী পূজা দেখিবার জন্য আবাল-বৃদ্ধবনিতা নববস্ত্র পরিধান করিয়া দলে দলে আসিতেছে ও ভক্তিপরিপ্লুতপ্রাণে আনন্দময়ীকে দর্শন করিয়া হৃদয়ের প্রেম অর্ঘ্য দিতেছে। সারাদিন জনসমাগমের অন্ত নাই। সন্ধ্যারতির পর পূজামণ্ডপের দক্ষিণদিকে মহিলাগণের জন্য নির্দিষ্ট স্থান হইতে জনৈকা দর্শনার্থিনী আপাদমস্তক আবৃত করিয়া প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া জমিদারবাটীর অন্দরাভিমুখে চলিয়া গেল। কেহ কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বোধ হয় অপর গ্রামের কোন দর্শনার্থিনী"; কেহ বলিল, "তাহা হইলে জমিদার বাড়ী গেল কেন?" কেহ বলিল, "বোধহয় রাণীমার সঙ্গিনী"; কেহবা সন্দেহ করিল "রাণীমা স্বয়ং"। তাহা শুনিয়া কেহ বলিল, "অসম্ভব কারণ তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী"—এই প্রকার মন্তব্যের মধ্যে প্রকৃত রহস্য গোপন রহিয়া গেল।

মহাষ্টমী রাত্রি আটটার পর সন্ধি পূজা। আরতি দেখিবার জন্য বহু নরনারী সমবেত। পূজামণ্ডপ, প্রাঙ্গণ, চতুষ্পার্শ্ব—লোকে লোকারণ্য। সন্ধিপূজা শেষ হইলে অনেকে প্রণাম করিয়া, কেহ প্রণামী দিয়া কেহ কিঞ্চিৎ নির্মাল্য বা সিন্দুর লইয়া চলিয়া গেল। জনতা অপেক্ষাকৃত কম হইলে দিব্যাভরণভূষিতা পট্টবস্ত্রশোভিতা প্রতিমোপরূপ-শালিনী জনৈকা রমণী অগ্রসর হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে

ঠাকুর প্রণাম করিয়া পূজারীকে বলিল,—"বাবা আমাকে একটু চরণামৃত দিন।"

অনেকেই অনুমান করিল ইনিই পূর্বরাত্রের অপরিচিতা অবগুণ্ঠনবতী রমণী। পূজারী তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিল,—"রাণী মা!"

প্রতিমা বলিলেন,—"হাঁ বাবা, আমি।"

পূজারী আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, "আপনি চরণামৃত চাইছেন? আপনারা……"

প্র। ব্রহ্মজ্ঞানী। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী কি হিন্দু নয়? ব্রহ্মজ্ঞানীর কি চরণামৃত সেবনে বাধা আছে?

পূ। কিন্তু মা আপনারা ত মূর্তিপূজা মানেন না।

প্র। মানি বাবা, এখনও মানি। শৈশবে বাবার কাছে চণ্ডীস্তোত্র শিখেছিলাম—

"যা দেবী সর্বভূতেষু ভক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

আজও তার প্রতিধ্বনি আমার হৃদয়ে স্পন্দিত হচ্ছে; সে ভক্তির কণামাত্র এখনও অপচয় হয় নি। আমার জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত সন্ধিপূজার পূর্বে জীবনে কখনও জলগ্রহণ করি নাই, আজও নয়।

শুনিয়া পুরোহিত লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"রাণীমা আমায় মার্জনা করুন আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম।" এই বলিয়া ত্রস্তপদে তাম্রকুণ্ড আনিয়া প্রতিমাকে চরণামৃত দান করিলেন এবং বলিলেন—"যান মা, আপনি এইবার আহারাদি করুন।"

তাহা শুনিয়া প্রতিমা বলিল,—"ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নাই বাবা, আপনারাও ত অভুক্ত, আপনাদের সেবা না হলে কি আমি জল স্পর্শ কর্তে পারি?"

পুরোহিত যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন —"আচ্ছা মা তাই হোক।"

প্রতিমা পুনরায় "বাবা আর একটি অনুরোধ; কালকের নবমীবিহিত পূজার যাবতীয় দ্রব্যাদির একটা তালিকা কাছারীতে দিবেন, সমস্ত জিনিস জমিদার সরকার থেকে দেওয়া হবে।" এই কথা বলিয়া প্রতিমাকে

অল্পকাল মধ্যেই এই সংবাদ সাধারণ্যে প্রচার হইয়া গেল এবং বিরাট জনসঙ্ঘ হইতে "দুর্গা মায়ীকি জয়", "রাণী মায়ীকি জয়" "প্রতিমারাণীর জয়" রবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল।

নবমীর রাত্রে সন্ধ্যারতির পর প্রতিমা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম ও চরণামৃত ধারণ করিয়া পূজারীকে বলিল— "বাবা! কাল আপনাকে একটু কষ্ট করে একটা কাজের ভার নিতে হবে যে।"

পূজারী ঠাকুর সাগ্রহে বলিল—"বলুন রাণীমা, কি কর্তে হবে।"

প্র। কাল বৈকালে প্রতিমা বিসর্জনের পর সমস্ত গ্রামবাসী এইখানে এসে সিদ্ধি ভোজন ও মিষ্টিমুখ করবে, আপনাকে তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

পূ। এত সুখের কথা রাণী মা, আপনার আদেশ সানন্দে প্রতিপালিত হবে।

প্রতিমা চলিয়া গেল। পুরোহিত ঠাকুর ভাবিতে লাগিলেন এত অল্প বয়সে এত গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, অচলা ভক্তি, ঐকান্তিক ধর্মানুষ্ঠান তৎসহ অনন্যসুলভ প্রজা-বাৎসল্য। তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে তাঁহার বিলাতফেরৎ স্বামী ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও রাণীমা সনাতন হিন্দুধর্মের মর্যাদা সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

(৭)

প্রতিমার সুখ্যাতিতে শুধু সুনামগঞ্জ নহে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহ ভরিয়া উঠিল। জমিদারীর প্রজাগণ সকলেই রাণীমার মহানুভবতায় প্রীত ও অনুরক্ত হইয়া পড়িল। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল এবারকার পূজার ন্যায় সমারোহ ও আনন্দ কোনবারেই হয় নাই। প্রজাগণ স্বতঃপ্রনোদিত হইয়া হাল-বকেয়া খাজনা দিতে লাগিল, নজর সওগাদ ও উপহারে কাছারী বাড়ী ভরিয়া গেল।

পূজার তিন সপ্তাহ পরে মোকার্জি সাহেব সুনামগঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন। কোর্ট খুলিতে আর এক সপ্তাহ বাকী, তাঁহাকে শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হইলে প্রজাগণ তাঁহাকে

"প্রতিমারাণীর জয়" বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। সকলের মুখেই রাণীমার অজস্র সুখ্যাতি ও প্রশংসা। লোকপরম্পরায় তিনি সমস্তই অবগত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন এবং প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যালো প্রতিমারাণী! এখানে পূজা কি রকম কাটল?"

প্রতিমা ঈষৎ হাস্যে নয়নদ্বয় উদ্ভাসিত করিয়া বলিল, —"প্রজাদের পরম আনন্দে, আমার কিন্তু কতকটা নিরানন্দে।"

ব্যোমকেশ ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, কেন? তোমার কি কিছুর অভাব বা অসুবিধা হ'য়েছিল?"

প্র। তুমি কাছে ছিলে না, আনন্দ উপভোগ করবার সঙ্গী পাই নি।

ব্যোমকেশ "I See" বলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন,—"দেখ to speak the truth তোমাকে ছেড়ে গিয়ে আমিও দার্জিলিংএ বেশ heartily enjoy কর্ত্তে পারি নি।

প্রতিমা দেখিল তাহার ঔষধের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, সে হাসিয়া বলিল,—"তাহ'লে ত আমরা দুজনেই loser হ'য়েছি।"

ব্যোমকেশ হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,— "No doubt"; পরক্ষণে বলিলেন,—"এখন ফেরবার arrangement কর।"

প্রতিমা ঈষৎ গম্ভীর অথচ মিনতিপূর্ণস্বরে বলিল, "আমাদের বাড়ী ফেরবার পথে একবার চিত্রপুর হ'য়ে গেলে হয় না, কোর্ট খুলতে ত এখনও দেরী আছে। পূজার পর বাবা মা এঁদের সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত নয়?"

ব্যোমকেশের প্রসন্নমুখ অকস্মাৎ বিষাদমলিন হইয়া গেল, তিনি নিরুত্তর রহিলেন, তাহা দেখিয়া প্রতিমা বলিল,—"চুপ ক'রে রইলে যে?"

তাচ্ছল্যভরে মাথা নাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিলেন,— "তুমি যেতে চাও যাও, আমার যাওয়া অসম্ভব।"

প্রতিমা সবিস্ময়ে পুনরুক্তি করিয়া বলিল,—"অসম্ভব! কেন? কিসে?"

ব্যোমকেশ বিমর্ষভরে বলিলেন,—"আমি যেতে পারব না, আমার সেখানে মুখ দেখাবার উপায় নাই।"

প্রতিমা বলিল,—"পাগল হ'য়েছ না কি? বাপ মা চিরকালই বাপ মা। কথায় বলে 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়' তাঁদের যদিও মনে কোন অভিমান থাকে তুমি গেলে সব ভুলে তোমায় কোলে নেবেন। তুমি সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে চল।"

স্বামীকে তথাপি নিরুত্তর দেখিয়া প্রতিমা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাতদুখানি সস্নেহে ধরিয়া বলিল,—"লক্ষ্মীটি আমার কথা শোন, জীবনে যে ভুল ক'রেছ, তা সংশোধন করবার এখনও খুব দেরী হয় নি। তোমার মনেও ত এ কথা মাঝে মাঝে উদয় হয়? চল আর বিলম্ব ক'র না, এই উপযুক্ত সময়।"

প্রতিমা অন্তর্যামী না কি? সত্যই ত পিতামাতার চিন্তা মধ্যে মধ্যে চিত্ত মথিত করিয়া তাঁহাকে আকুল করে। প্রায় চার বৎসর তিনি স্নেহময়ী মাতাকে দেখেন নাই। তাঁহাদের কত সুখের সংসার! কিন্তু এখন বোধ হয় বিষাদ-রাহুগ্রস্ত। পিতামাতার অন্তরে সম্ভবতঃ নিদারুণ মর্ম্মবেদনা তাঁহাদিগকে অহর্নিশ পীড়া দিতেছে। সেই জন্যই বোধ হয় হুবীও আর আসে না। তদুপরি গুণবতী পত্নী প্রতিমা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া আসায় তাঁহারা হয়ত অধিকতর শোকাকুল। এসমস্ত অশান্তির জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী। বিলাত হইতে ফিরিয়া একবার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলে কোনও গোলোযোগই হইত না, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার কলিকাতা বাস অনুমোদন করিতেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার কি আবশ্যকতা ছিল, এবং উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার কি সুখ-সুবিধা বাড়িয়াছে? এই প্রকার চিন্তা-রাশি প্রায়ই তাঁহার অন্তরে উদিত হইত এবং সময়ে সময়ে পিতামাতার সহিত দেখা করিবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহাকে চিত্রপুরের দিকে আকর্ষণ করিত; কিন্তু সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সাহস তাঁহার চিত্তে স্থান পাইত না।

আজ প্রতিমার অভয় বাণী তাঁহার হৃদয়ের দুর্বলতা জয় করিল। ব্যোমকেশ সম্মত হইলেন। প্রতিমা ঠাকুর-ঘরে গিয়া তাহার দৌত্যকার্যের নির্বাধা পরিসমাপ্তির জন্য ইষ্টদেবতার বর প্রার্থনা করিল।

(৮)

সমস্ত মালপত্র গুছাইয়া লগেজ ডেসপ্যাচ করিয়া নিধিরামকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ ও প্রতিমা চিত্রপুর যাত্রা করিলেন। তাঁহারা রাত্রের ট্রেনে রওয়ানা হইয়া ভোরের সময় চিত্রপুরে পৌঁছিয়া বরাবর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। বহির্বাটীতে চাকর সবে-মাত্র উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছে; তাঁহাদিগকে দেখিয়া সে শশব্যস্তে উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিল। প্রতিমা তাহার নিকট জানিল যে কর্তাবাবু এখনও নিদ্রিত গিন্নীমা হয়ত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া জপে বসিয়াছেন। ছোট দাদাবাবু বাড়ীতেই আছেন এবং এখনও ঘুমাইতেছেন। তাহাকে কোন প্রকার সোর-গোল করিতে নিষেধ করিয়া প্রতিমা স্বামীকে লইয়া একেবারে শ্বশুরের শয়নগৃহে উপস্থিত হইল।

সর্বেশ্বর বাবু স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যেন ব্যোমকেশ পূজার পর তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছে এবং তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেছে। ব্যোমকেশ ও প্রতিমা তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া বসিল এবং প্রতিমা ধীরে ধীরে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া ডাকিল,—"বাবা, ঘুমুচ্ছেন?"

সর্বেশ্বর বাবু চক্ষু চাহিয়া সম্মুখে পুত্র এবং পুত্রবধূকে দেখিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বসিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। সর্বেশ্বর বাবু মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। পিতৃহৃদয়ের নিরুদ্ধ স্নেহ-প্রস্রবণ তাঁহার সমস্ত বাক্‌শক্তি লোপ করিয়া দিল।

তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া প্রতিমা ত্বরিতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবরের শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আর কত ঘুমুবে, শীগ্র ওঠ।"

হৃষীকেশ সম্মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে বৌদিকে দেখিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"বৌদি, কখন এলে?"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল,—"মন্ত্রী মশায়, আপনার মন্ত্রণা সফল হ'য়েছে। তোমার দাদা এসেছেন, তিনি বাবার ঘরে রয়েছেন।"

হৃষী একলম্ফে শয্যা হইতে নামিয়া দ্রুতবেগে মাতাকে ঠাকুরঘরে শুভ সংবাদ জানাইয়া দৌড়িয়া পিতার ঘরে প্রবেশ করিল, এবং ভ্রাতাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

ইত্যবসরে প্রতিমাকে সঙ্গে লইয়া গৃহিণীও তথায় আগমন করিলেন। ব্যোমকেশ মাতার চরণ বন্দনা করিলে তিনি তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সর্বেশ্বর বাবু বলিলেন,—"গিন্নি! কেঁদনা আজ পরম আনন্দের দিন, আনন্দ কর; আজ আমার আনন্দময়ী প্রতিমার বোধন বসাও। আমার কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মী প্রতিমার গুণে আমি ছেলে ফিরে পেয়েছি।" এই বলিয়া তিনি সস্নেহে প্রতিমাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

বাটীতে প্রকৃতই আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। প্রতিমা ও হৃষীর নিরালা আলাপন এবং হাস্য-পরিহাসের অন্ত নাই। তাহাদের পরস্পরের ভাবগতিক দেখিয়া ব্যোমকেশের সন্দেহ হইল যে, পূর্ব হইতেই দুজনার মধ্যে দুষ্টামি ও ষড়যন্ত্র ছিল। যাহা হউক সে অনুভব করিল যে তাহার বক্ষের উপর হইতে দুর্বহ পাষাণ-ভার অপসৃত হইয়াছে, এতদিন পরে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল এবং ইহার জন্য সে মনে মনে প্রতিমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিল।

চিত্রপুরে পাঁচদিন থাকিয়া পিতামাতার অনুমতি লইয়া ব্যোমকেশ সস্ত্রীক কলিকাতায় ফিরিল। এবার কিন্তু হৃষীকেশকে ছাড়িয়া আসিল না এবং স্থির হইল যে ছুটীর পর কলেজ খুলিলে হৃষী দাদার বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিবে।

কলিকাতায় ফিরিয়া ব্যোমকেশের মানসিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল। সাধ্বী এবং গুণবতী স্ত্রীর কমনীয়

চরিত্রে প্রীত হইয়া এবং তাহার মহানুভবতা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি একখানি দলিল সম্পাদনপূর্বক আবশ্যক অর্থ গবর্ণমেণ্টে জমা দিয়া প্রকাশ করিলেন যে ঐ টাকার সুদ হইতে প্রতিবৎসর সুনামগঞ্জ পরগণার সাধারণ দুর্গাপূজার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হইবে। তদবধি প্রতিবৎসর এই পূজা সুনামগঞ্জে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে এবং ইহাকে সকলেই বলে **প্রতিমারাণীর দুর্গোৎসব**।

জন্মাষ্টমী

শ্রীরঘুনাথ দত্ত

(১)

নিবিড় নীরদে ঢাকা গগনমণ্ডল।
সূচিভেদ্য অন্ধকার,
করিয়াছে একাকার,
ধরাতল আর নভস্তল॥

(২)

আলোক গিয়াছে যেন জগৎ ছাড়িয়া।
সুধাংশুর অংশুরাশি,
নক্ষত্রমালার হাসি,
বিস্মৃতি-সলিলে ডুবাইয়া॥

(৩)

উপস্থিত নহে হেরি জ্যোতিষ্কমণ্ডল।
অক্ষম দম্ভীর মত,
মিলিয়া খদ্যোৎ যত,
পুচ্ছ-প্রভা প্রকাশে পাগল॥

(৪)

প্রবল বিশ্বাস দিবাকরে নিশাকরে।
বিতরি কিরণরাশি,
তামসীর তমঃ নাশি,
যা করে তা খদ্যোতেরা করে॥

(৫)

নিরখিয়া জোনাকীর বিফল প্রয়াসে।
জলধর-কোলে থাকি,
ব্যঙ্গচ্ছলে থাকি থাকি,
সৌদামিনী মৃদু মৃদু হাসে।

(৬)

মধুর গম্ভীরে মেঘ প্রিয়াকে কি বলি।
ঢালিল সলিল রাশি,
জোনাকি চলিল ভাসি,
খল খল হাসিল বিজলী॥

(৭)

এই ভাদ্র কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমী নিশায়।
ভাবের বিমানে মন,
মথুরা করে গমন,
সঙ্গে ল'য়ে সখী কল্পনায়॥

(৮)

নিদ্রিত নগরী যেন বিষম বাদলে।
তিমিরের কৃষ্ণবাসে,
ঢাকি দেহ আশে পাশে,
শু'য়ে আছে সুষুপ্তির কোলে॥

(৯)

শাখিশাখে বসি পাখী ক'রেনাকো গান।
পাইয়া প্রফুল্ল ফুল,
গুঞ্জরেনা অলিকুল,
পিককুল ধরেনাকো তান॥

(১০)

বালকের কলরব শুনা নাহি যায়।
যুবকযুবতীগণ,
করেনাকো বিচরণ,
হাসি তুলি কথায় কথায়॥

(১১)
নিদ্রাগত পণ্যজীবী আবদ্ধ আপণে।
ক্রেতা-বিক্রেতার রোল,
কেনা-বেচা-গণ্ডগোল,
কিছুমাত্র শুনিনা শ্রবণে ॥

(১২)
কেবল মথুরাপতি করে জাগরণ।
চিন্তাজ্বরে জর্জরিত,
মহাভয়ে শশঙ্কিত,
কণ্টকিত কোমল শয়ন ॥

(১৩)
ক্ষণে বসে ক্ষণে উঠে কভুবা বিচরে।
কখনও বা বীর দাপে,
দন্তে দন্ত দিয়া চাপে,
কভু কাঁপে কভুবা শিহরে ॥

(১৪)
কারাগার হ'তে রাজশয়ন-মন্দির।
সাবধানে দূতগণ,
করি নিশা জাগরণ,
বার্তা বহে বসু-দেবকীর ॥

(১৫)
অকস্মাৎ কি জানি কি মায়ার ছলনে।
ভুলি জ্বালা-যন্ত্রণায়,
নিদ্রায় অবশকায়,
কংশরাজ পড়িল শয়নে ॥

(১৬)
সতর্ক প্রহরীগণ যে যেখানে ছিল।
স্থানাস্থান না বিচারি,
অস্ত্রশস্ত্র পরিহরি
সকলেই নিদ্রায় মজিল ॥

(১৭)
ক্রমে মায়া মথুরার সর্বত্র ব্যাপিল।
স্থাবরজঙ্গমগণ
হল নিদ্রানিমগন
নীরবতা আবার বাড়িল ॥

(১৮)
মথুরার কারাগারে একটি কুটীরে।
দেখিলাম দুই জন,
কাঁদিতেছে অনুক্ষণ,
চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করে।

(১৯)
একটি প্রদীপ তথা মিট মিট জ্বলে।
মাঝে মাঝে উজ্জলিয়া
প্রতিভাত হয় গিয়া
গণ্ড-প্রবাহিত অশ্রুজলে ॥

(২০)
হস্ত পদ বদ্ধ দোঁহে লোহার শিকলে
রুক্ষকেশ রুক্ষবেশ,
আশার নাহিক লেশ,
দুঃখার্নব পার হবে ব'লে ॥

(২১)
দৈবকীর পানে চাহি বসু মহাশয়।
গভীর উচ্ছ্বাসভরে,
বলিল কাতর স্বরে,
"হরি! তব ইচ্ছা দয়াময়॥"

(২২)
কি কথা বলিলে নাথ "হরি দয়াময়।"
আমি জানিয়াছি বেশ,
নাই হৃদে দয়া-লেশ,
তিনি অতি কঠিনহৃদয় ॥

(২৩)
বলোনা বলোনা দেবি! ওকথা বলোনা।
কেহ যদি কর্মফলে
বাড়ব অনলে জ্বলে,
অগ্নিময় অম্বুধি বলেনা ॥

(২৪)
দয়াময়! দয়াময়! দয়াময় হরি।
কর্মফলে কষ্ট পাও,
তাঁর কেন দোষ দাও
বিপদে বিশ্বাস পরিহরি ॥

(২৫)
হৃদয় হইতে দূর কর এ ধারণা ।
কষ্টে প'ড়ে ভ্রান্তমতি
ভগবান্ প্রতি সতী
ভক্তিহারা হয়োনা হয়োনা ॥

(২৬)
সরিল শারদ মেঘ জ্ঞান-দিবাকর ।
নিজ কর বিকিরণে,
উজলিল সেই ক্ষণে
দৈবকীর অন্তর-অম্বর ॥

(২৭)
যোড়করে ভয়ক্ষাম কণ্ঠে দৈবকীর ।
কি বলিনু হায়! হায়!
ক্ষম নাথ অবলায়,
দয়াময়! হরি দয়াময় ॥

(২৮)
অকস্মাৎ কি সৌরভে পূরে কারাগার ।
কি দিব্য আলোক আসি,
নাশিল আঁধাররাশি
সুখদ সুস্নিগ্ধ জ্যোতি তার ॥

(২৯)
চপলা-চকিত নেত্রে দেখিল দম্পতি ।
জ্যোতি মধ্যে শোভা পায়,
নবীন সন্তান কায়
চতুর্ভুজ সুন্দর মূরতি ॥

(৩০)
শিরে শিখি পুচ্ছ পাখা উড়ে বায়ুভরে ।
বিহীন কলঙ্ক-মসী,
বদন শারদ-শশী,
কুণ্ডল দুলিছে গণ্ডোপরে ॥

(৩১)
অরুণ কমলনেত্র বঙ্কিম ভ্রূতলে ।
সুগঠিত নাসিকায়
মুক্তাদুল শোভাপায়
বিম্বাধরে মৃদু হাসি খেলে ॥

(৩২)
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে শোভা পায় ।
বনমালা বক্ষোপর,
পরিধান পীতাম্বর,
স্থিরা সৌদামিনী ঘনবরে ॥

(৩৩)
প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম চরণযুগল ।
কনক নূপুর তায়
সুরবে সবে মাতায়
কোকনদ কর-পদতল ॥

(৩৪)
ভু'লে গেল শোক দুঃখ দম্পতি তখন ।
দেহে নাই চেষ্টা-চিন,
নয়ন পলকহীন,
করে সেই রূপ দরশন ॥

(৩৫)
মধুর গম্ভীর স্বরে তবে নারায়ণ ।
বলিলেন দম্পতিরে
ভুলেছ কি একেবারে
তোমাদের পূর্ব বিবরণ ॥

(৩৬)
মনু আর শতরূপা ছিলে দুইজন ।
বহুদিন বহু ক্লেশে
হরি আরাধিয়া শেষে,
পেয়েছিলে মোর দরশন ॥

(৩৭)
মম রূপ দেখি দোঁহে বাৎসল্যে মজিয়ে ।
চে'য়ে নিলে এই বর
জন্মি যদি ধরাপর
সর্বপূর্ণ ক'রো পুত্র হয়ে ॥

(৩৮)
ভক্ত আশা পূর্ণতরে নররূপ ধরি ।
জনম লভিব ভবে
তুমি মোর মাতা হবে
পুত্ররূপে পাবে তুমি গোলকের হরি ॥

(৩৯)

এত বলি ভগবান অন্তর্ধান হৈল।
আকাশেতে দেবগণ
করে পুষ্প বরিষণ
দম্পতি হেরিয়া তাহে আনন্দে মজিল ॥

তুলসী-সপ্তশতিকা

শ্রীরামচরণ দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৬২)

বিনপায়ে পরতীতি অতি করৈ যথারথ হেত।
তুলসী অবুধ অকাশ ইব ভরি ভরি মুঠি লেত ॥
পরতীতি বিনা সুখের লাগিয়া
বহু দেব-দেবী করে সেবন;
কহিছে তুলসি সেই অবোধেরে
মুষ্টিতে করিয়া নভঃ গ্রহণ।

(৬৩)

বসন বারি বাঁধত বিহঠি তুলসী কৌন বিচার।
হানি লাভ বিধি বোধ বিন হোত বহি বিরধার ॥
কহিতে তুলসী হঠবশে সেই
বসনেতে বারি বাঁধিতে চায়;
হানি লাভ আর বিধিবোধ বিনা
নাহি হয় কভু নির্ধার তায়।

(৬৪)

কাম,ক্রোধ মদ লোভকি যবলগি মনমে খান।
কা পণ্ডিত কা মূরখে দুনো-এক সমান ॥
কাম,ক্রোধ লোভ মদমৎসরতা
যতদিন ধরে থাকিবে মনে;
পণ্ডিত কি মূর্খ কিছু ভেদ নাই
সমান বলিয়া জান দুজনে।

(৬৫)

ইত কুলকী করণীতজে উত নভজে ভগবান্।
তুলসী অধবর কেভয়ে জোঁ বঘুর কো পান ॥
বৈরাগী সাজিয়া কুলকর্ম ত্যজে
করে না ভগবানও ভজন;
কহিছে তুলসী ঘুরে' বুলে সেই
ঘুরুণি বাতাসে পাতা যেমন।

(৬৬)

কীর সরিস বাণী পঢত চাখন চাহত খাড়।
মন রাখত বৈরাগ সহ ঘর সহ রাখত রাঁড় ॥
শুকের সমান মুখে মাত্র পড়ে
সতত বাসনা খাইতে খাড়;
মনে করে আমি পরম বৈরাগী
ঘরের ভিতরে রাখিয়া রাঁড়।

(৬৭)

রাম চরণ পরচৈ নহি বিন সাধন পদ বেহ।
মুড়মুড়ায়ো বাদিহি ভাঁড় ভরে তজি গেহ ॥
শ্রীরাম-চরণে পরিচয় নাই
নাহিক সাধন শ্রীপদে স্নেহ;
বৃথাই সেজন মাথা মুড়াইয়া
ভাঁড় হয় মাত্র ত্যজিয়া গেহ।

(৬৮)

কাহভয়ে বন বন ফিরে যো বনি আরো নাহি।
বনতে বনতে বনি গয়ো তুলসী ঘরহি মাহি॥

বনিলনা যদি বনে বনে ফিরে
সেজনার ফল কি হল; বল;
কহিছে তুলসী বনিতে বনিতে
বনে যদি ঘরে সকলি হল।

(৬৯)

যোগতি জানৈ বরণ কি তনুগতি সো অনুমান।
বরণ বিন্দু কারণ যথা তথা জানু নহি আন॥

বর্ণের যে গতি তনুর সে গতি
অনুমান ক'রে দেখহ সবে;
মাত্রাযোগে যথা বরণের ভেদ,
বাসনাতে দেহ সেরূপ হবে।

(৭০)

বর্ণযোগ ভব নামজগ জানু ভরমকি মূল।
তুলসী করতা হৈ তুহি জান মান জানি ভুল॥

জগতে থাকিয়া যে যে নাম পাও
ভ্রমময় সব বাসনা-মূল;
কহিছে তুলসী সে নামের কর্তা
তুমিই ইহাতে নাহিক ভুল।

(৭১)

নাম জগত সম সমুঝ জগ বস্তু করিচিত চৈন।
বিন্দু গয়ে জিসি গৈনতে রহন ঐনকো ঐন॥

জগৎ যেরূপ অনিত্য দেখিছ
নামও সেইরূপ অনিত্য জান;
বিন্দু দিলে ঐন গৈন হয় যথা
বিন্দু ঘুচাইলে ঐন সে ঐন।*

(৭২)

আপুহি ঐন বিচার বিধি সিদ্ধি বিমল মতিমান।
আন বাসনা বিন্দু সম তুলসী পরম প্রমাণ॥

বিচারিয়া দেখ নিজে ঐন সম
বিমল সিদ্ধ নিত্য মতিমান;
তুলসী বাসনা- বিন্দু সহযোগে
সুখদুঃখময় জীব প্রমাণ।

(৭৩)

ধনধন কহে ন হোত কোই সমুঝি দেখ ধনবান।
হোত ধনিক তুলসী কহত দুঃখিত ন রহত জহান॥

বুঝে দেখ মনে ধন ধন বলি
কভু কেহ ভবে হয় না ধনী;
কহিছে তুলসী তাই যদি হ'ত,
ধনীতে পূরণ হ'ত ধরণী।

(৭৪)

হিম কি মুরতি কে হিয়ে লাগি নীর কি প্যাস।
লগত শব্দ গুরুতর নিকর সোমৈরহিন আশ॥

হিমের মুরতি মানব-হৃদয়
লাগে আসি যবে জল-পিয়াসা;
গুরুদত্তজ্ঞান রবি করে গলে
রহেনা কো আর বিষয়-আশা।

(৭৫)

যাকে উর বর বাসনা ভই ভাস কছু আন।
তুলসী তাহি বিড়ম্বনা কেহি বিধি কথহি প্রমাণ॥

নির্মল হৃদয় জীবের মানসে
প্রকাশিলে অন্য বাসনা-ভাস;
কহিছে তুলসী তাহে বিড়ম্বনা
কত সহে কেবা করে প্রকাশ।

(৭৬)

রাজ তনভব পরচৈ বিনা ভেষজ কর কিমি কোয়।
জান পরৈ ভেষজ করৈ সহজ নাশ রুজ হোয়॥

দেহজাত রোগ না জানিলে বল
কিরূপে তাহার ঔষধ হয়;
রোগ জানা গেলে ঔষধ-প্রয়োগে
সহজেই হয় রোগের ক্ষয়।

* পার্শী ভাষায় ঐন অক্ষরে বিন্দু দিলে গৈন হয়।—লেখক

(৭৭)

মানস ব্যাধি কুচাহতব সদগুরু বৈদ্য সমান।
সাধু বচন অলবল অবশ হৈতে সকলরাজ হান ॥
কুবাসনা মনে সেই হয় ব্যাধি
সদ্‌গুরু হন বৈদ্য সমান ;
যাঁহার বচন- বলেতে হইবে
অচিরেই সব রোগাবসান।

(৭৮)

রুচিবাঢ়ে গত সঙ্গ সহঁ নীতি ক্ষুধা অধিকায়।
হোত জ্ঞান বল পীন অল বৃজিন বিপতি মিটে যায় ॥
নীতি ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে অমনি,
রুচি বাড়ে সত-সঙ্গে তখন ;
পায় জ্ঞানবল ভকতি পুষ্টতা
মিটে সব পাপ বিপত্তি ঘন।

(৭৯)

শুক্লপক্ষ শশী স্বচ্ছ ভো কৃষ্ণপক্ষ জ্যোতিহীন।
বঢ়ত ঘটত বিধি ভাতি বিধি তুলসী কহহিঁ প্রবীণ ॥
শুক্লপক্ষে শশী বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ
কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় পেয়ে আঁধার ;
হ্রাস বৃদ্ধি দুই বিধি সর্বত্রই
কহিছে তুলসী করি বিচার।

(৮০)

সত সঙ্গতি সিতপক্ষ সম অসিত অনন্ত প্রসঙ্গ।
জান আপ কঁহ চন্দ্র সম তুলসী বদত অভঙ্গ ॥
সত-সঙ্গ হয় সিতপক্ষ সম
অসিত সমান অসত-সঙ্গ ;
আপনাকে জান চন্দ্রের সদৃশ
কহিছে তুলসী বাক্য অভঙ্গ।

(৮১)

তীরথ-পতি সতসঙ্গসম ভক্তিদেবসরী জান।
বিধি উল্টাগতি রাম কি তরণী সুতা অনুমান ॥
সৎসঙ্গ হয় প্রয়াগ সমান
ভক্তিসুরধুনী বহিছে যথা ;
ভক্তি বিপরীত কর্ম-কথা সব
প্রবাহিত যেন তরণি-সুতা।

(৮২)

বরমেধা মানহুঁ গিরা ধীর ধর্ম নিগ্রোধ।
মিলন ত্রিবেণী মলহ্‌ বণী তুলসী ভজহুঁ বিরোধ॥
নিশ্চয়-আত্মিকা বুদ্ধি-সরস্বতী
অবিচল ধর্ম বট-অক্ষয় ;
সাধুর সমাজ পবিত্র ত্রিবেণী
বিরোধ ত্যজিয়া তুলসী কয়।

(৮৩)

সমুঝব সম সজ্জন বিশদ মল অনীতি গই ধোয়।
অবশি মিলন সংশয় নহি সহজ রামপদ হোয় ॥
হৃদয়ে ধারণা সজ্জন সমান
অনীতির মলা ধুইয়া যায় ;
সহজ মিলন শ্রীরামচরণে
সংশয়বিহীন অবশ্য পায়।

(৮৪)

ক্ষমা বিমল বারাণসী সুর অপগগা সমভক্তি।
জ্ঞান বিশ্বেশ্বর অতি বিশদ লসত দয়াসহ শক্তি ॥
নিরমল ক্ষমা সেই বারাণসী,
তাহে ভক্তি সুরসরি সমান ;
দয়া-অন্নপূর্ণা শক্তি সহ তথা
বিরাজেন বিশ্ব-ঈশ্বর জ্ঞান।

(৮৫)

বসত ক্ষমাগুণ জাসুমন বরাণসী ন দূরী।
বিলসত সুরসরী ভক্তি জঁহ তুলসী নরকৃত ভুরী ॥
ক্ষমা যার হৃদে নিয়ত নিবসে
বারাণসী তার দূরেতে নয় ;
ভক্তি-সুরধুনী বিরাজে যথায়
সুকৃতিতে পূর্ণ সেই হৃদয়।

(৮৬)

সিত কাশী মগহর অসিত লোভমোহমদকাম।
হানি লাভ তুলসী সমুঝি বাস করহুঁ বসুযাম॥
ক্ষমা-কাশী হয় সিতপক্ষ সম
কৃষ্ণপক্ষ লোভ মোহ মগহ ;
কহিছে তুলসী হানি-লাভ বুঝি
[illegible]

(৮৭)

গয়ে পলটি আয়ে নহি হৈসো করু পহিচান।
আজু জেই সো কাল্হি হৈ তুলসী ভর্ষন মান॥

গত হল যাহা　　　ফিরে না আসিবে
যাহা আছে তাহে এখনো জান ;
আজ যেই তুমি,　　　কাল সেই তুমি
কহিছে তুলসী ভ্রম না মান।

(৮৮)

বর্তমান অধীন দোঁউ ভাবীভূত বিচার।
তুলসী সংশয় মন ন করু জৈ হৈ সো নিরবার॥

ভূত ভবিষ্যৎ　　　বর্তমানাধীন
দেখহ তুলসী করি বিচার ;
সংশয় না করি　　　বর্তমানে ভজ,
নাহি ভাবী ভূত ভাবনা আর।

(৮৯)

মানস উরবর সম মধুর রাম সুযশ সুবিনীর।
হটেউ বৃজিন বুধি বিমলভই বুধনহি অগম সুথির॥

বাসনা-বিহীন　　　হৃদয়-মানস
রাম-যশঃ তাহে পবিত্র নীর ;
দুঃখ নাশে বুদ্ধি　　　নিরমল হয়
বধে নহে ইহা অগম স্থির।

(৯০)

অলঙ্কার কবিরীতিযুত ভূষণ দূষণ রীতি।
বারিজাত বরণন বিবিধ তুলসী বিমল বিনীতি॥

কবিরীতিযুত　　　অলঙ্কার আদি
আছে যে সব ভূষণ দূষণ ;
কহিছে তুলসী　　　সে মানস-সরে
বিবিধ বরণ কমলগণ।

(৯১)

বিনয় বিচার সুহৃদতা সোপরাগরসগন্ধ।
কামাদিক তেঁহি সর লসত তুলসী ঘাট প্রবন্ধ॥

বিনয় বিচার　　　আর সুহৃদতা
পরাগ রস গন্ধের সমান ;
ধর্ম অর্থ কাম　　　মোক্ষ চারিঘাট

(৯২)

প্রেম উমঁগ কবিতাবলী চলি সরিত শুচিধার।
রাম বরাবরি মিলন হিত তুলসী হর্ষ অপার॥

প্রেমের তরঙ্গ　　　সে মানসসরে
উঠিলে কবিতা-সরিতা চলে ;
অপার হরষ　　　তুলসীর মনে
সেই নদী রামচরণে মিলে।

(৯৩)

তরল তরঙ্গ সুছন্দবর হরত দ্বৈত তরুমূল।
বৈদিক লৌকিক বিধি বিমল লসত বিশদ বরকুল॥

সুছন্দ সকল　　　তরল তরঙ্গ
দ্বৈত তরুমূল তুলিয়া ফেলে ;
বৈদিক লৌকিক　　　বিধি নিরমল
সুশোভিতা নদী এদুই কূলে।

(৯৪)

সন্তসভা বিমল নগরী সিগরী সুমঙ্গল খান।
তুলসী উর সুরসর সুতা লসত সুথল অনুমান॥

সন্ত-সভা সেই　　　বিমল অযোধ্যা
সর্ব সুমঙ্গল উৎসব-খনি ;
তুলসীর উর-　　　সুরসরসুতা
বিরাজে তথায় সুস্থল জানি।

(৯৫)

মুক্ত মুমুক্ষু বরবিষয়ী শ্রোতা ত্রিবিধ প্রকার।
গ্রাম নগর পুর যুগ সুতট তুলসী কহহি বিচার॥

মুকত মুমুক্ষু　　　বিষয়ী ত্রিবিধ
শ্রোতাই নগর গ্রাম পুর তার ;
উভয় তটেতে　　　করে অবস্থান
কহিছে তুলসী করিয়া বিচার।

(৯৬)

বারাণসী বিরাগ নহি শৈলসুতা মন হোয়।
তিসি অয়ধহি সরযূ নত্ত জৈ কহত সুকবি সবকোয়॥

বারাণসী প্রতি　　　শৈলসুতামনে
যে মন কখনও বিরাগ নয় ;
তথা তুলসীর　　　কবিতা-সরযূ

(৯৭)

কহব শুনব সমুঝব পুন শুনি সমুঝায়ব আন।
শ্রমহর ঘাট প্রবন্ধবর তুলসী পরম প্রমাণ ॥*

বলিব শুনিব বুঝিব আবার
শুনি বুঝাইব অপর জনে;
কহিছে তুলসী ভবশ্রম হরে
এ প্রবন্ধ সরোবরের স্নানে।

ক্রমশঃ

প্রমীলা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক—১ম দৃশ্য

স্থান—অশোক কানন; কাল—রাত্রি

[সীতা আসিল]

সীতা। রঘুনাথ! রঘুনাথ!
কোথা তুমি প্রভু!
সাগরের পারে—
কিংবা হেথা লঙ্কার মাঝারে,—
কিংবা সেই পঞ্চবটী বনে,
সীতা—সীতা করি,
জ্ঞানহারা ধরণী লুটাও!
হেথায় জানকী তব,
ফেলিবে কি আঁখিজল,
শাশ্বত কালের তরে!

[যোদ্ধবেশে চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ]

চিত্রা। ছুটে এসো—ছুটে এসো সীতা!
শুনিতে বারতা,—
নিদ্রামগ্ন সব চেড়ীগণ,
কেহ নাহি করিবে বারণ।
অদূরে দাঁড়ায়ে রথ!
মুক্ত তুমি আজি।
চলো—ছুটে চলো অযোধ্যার রাণী!

সীতা। কে তুমি রমণি!

চিত্রা। আমি—আমি—
না—না—না—
চিন না—চিন না—
চিনিতে চেয়ো না
শুধু জেনো আমি নারী!
ব্যথার দরদী তব!
চঞ্চল রথের হয়,—
আকাশে বাতাসে ভনে রামজয়।
করিওনা কালক্ষেপ!
ছুটে এসো সীতা!
আনিয়াছি মুক্তির পতাকা।

সীতা। সত্য যদি না কহ বারতা
নাহি যাবো আমি।
কহ, কেবা তুমি?

চিত্রা। আমি—আমি—
না—না—না—।
শুনি পরিচয় মোর,
শিহরি উঠিবে তুমি।
কুঞ্চিত করিবে তব,
বঙ্কিম ঐ ভ্রূযুগ—।
হর-মন লোভা,—
পূর্ণশশী জিনি মুখশোভা,
পলকেতে কালিমা পড়িবে।
আমি—আমি—
লজ্জাবাসি কহিতে সে বাণী!
শোন—শোন—রঘুকুলরাণী।
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া রামের,—
এই অশোক-কাননে,
যেই জন রেখেছে গোপনে
অতি যত্ন করি,—
আমি তার নারী!

সীতা। তুমি—রাণী—মন্দোদরী!

চিত্রা। না—না—না—
আমি চিত্রাঙ্গদা।

সীতা। অন্তরের লহ কৃতজ্ঞতা।
মুক্তি নাহি লব আমি!

চিত্রা। কেন—কেন!
না করি ছলনা।
কেন বিষাদিনি!
সত্য, মুক্ত তুমি রাজেন্দ্রনন্দিনী!

সীতা। হে মমতাময়ি,
তোমার করুণা,
আজীবন স্মরিব যতনে!
মুক্তি—মুক্তি কোথা মোর!
স্বামী তব করেছে বন্দিনী,
তুমি তারে মুক্তি দেবে ধনি!
আমারে করিতে প্রবঞ্চনা,
কেন এই অহেতু করুণা!
যাও মুক্তি নাহি লব।
যাও ফিরে ঘরে রাজরাণী!

চিত্রা। না—না—না—
নহে প্রতারণা!
স্বামী মোর নারীদ্রোহী!
নারীর মর্যাদা-হানি,
নারী হয়ে সহিব ভামিনী!
তাই আজি বিদ্রোহিণী আমি!
হে বন্দিনি!
অনুমানি শোননি কাহিনী
পণ করি স্বামীর নিকট,
আসিয়াছি হেথা।
তোমারে করিব মুক্ত!
তাহে যদি যায় প্রাণ,
করি হেয় জ্ঞান।
চলো—ছুটে চলো—

সীতা। শোন সতি!
স্বামী তব রোধিবেক গতি!
আমার কারণে,
লাঞ্ছনা সহিবে কেন সতি!
না—না
মুক্তি নাহি লব,
যাও ফিরে রাজ-রাজেন্দ্রাণী!

চিত্রা। হে শোভনে,
হের খড়্গ,
হস্তে শোভে মোর।
হের মহাধনু;
পৃষ্ঠে যুগ্ম তূণ!
স্বামী যদি সাধে বাদ,
তীক্ষ্ণ তীরে হৃদয় বিঁধিব,
চামুণ্ডার মত,
ভীম খড়্গে, দশমুণ্ড ছেদিয়া ফেলিব।
নর করে নারীর লাঞ্ছনা;

নারী আর কভু সহিবে না।
চলো—ছুটে চলো!
সীতা। নর করে নারী-দ্রোহ!
নারীদ্রোহ নিবারে পুরুষ!
নারী কভু বিদ্রোহ না করে!
রাজরাণি!
আমি রাজার নন্দিনী
বন্দিনী কপাল-দোষে!
পিতা মোর মিথিলা-শাসক,
সর্ব্বগুণধাম,
রাজর্ষি জনক নাম;
শ্বশুর আমার,
অনুমানি শুনেছ কাহিনী,
বীরশ্রেষ্ঠ দশরথ!
স্বামী—সত্যবদ্ধ রামচন্দ্র
আমি সীতা—বনিতা তাঁহার!
নর-নারায়ণ!
মনে স্থান দেছ রাজেন্দ্রাণী,
ক্ষত্রিয়ানী জনকনন্দিনী,
ভিখারিণী সম,
যুক্ত করে,
মুক্তি ভিক্ষা মেগে লবে তোমার নিকট!
তুমি স্বামি-বিদ্রোহিণী!
চিত্রা। কর তিরস্কার!
পুরস্কার সম লব হাত পাতি।
শত বজ্র-জিনি অভিশাপ,
লবো নতশিরে।
তবু আমি মুক্তি তোমা দেবো অনিন্দিতা।
করি অনুনয়!
না—না—না—
নহে অনুনয়!
ভিক্ষা চাহি সতী!
এসো—চলে এসো!
অবসর পাবেনা'ক আর!

লঙ্কার বাতাসে কথা কয়,
যেন মনে হয়,
অচিরে আসিবে দশানন,
এই সন্ধিক্ষণ,
চলো চলো সীতা!
ছুটে চলো অশোক-কানন পারে!
[মন্দোদরীর প্রবেশ]
মন্দো। বিদ্রোহিনী কে তুমি রমণি!
মুক্তি দিতে আসিয়াছ সীতা!
আঁখি মোর সতর্ক প্রহরি!
চতুর্দিকে দৃষ্টি আছে তার,
শত্রু হ'তে দেশ রক্ষা করে রক্ষোরাজ!
আমি রক্ষা করি অন্তঃপুর।
স্পর্ধিতা রমণি!
রাজদ্রোহে অভিযুক্ত তুমি।
চিত্রা। অভিযুক্ত আমি!
হাঃ হাঃ হাঃ
মন্দোদরী—মন্দোদরী,
এস, এই শুভ অবসর,
মুক্ত করি পিঞ্জরের পাখী।
মন্দো। একি!
তুমি চিত্রাঙ্গদা!
না—না—না
মুক্ত করে নাহি দেবো সীতা!
আরো সুদৃঢ় শৃঙ্খলে,
বন্দী করি রেখে দেবো তারে।
চিত্রা। মন্দোদরি!
স্বামী করে রমণী-নিগ্রহ,
নারী হ'য়ে দেখিছ কেমনে!
পতি হরে পরনারী,—
পত্নী হয়ে,
দিবে কি প্রশ্রয় তার?
নারীত্বের অবমানকারী,
স্বামী তব নির্মম পিশাচ!

মন্দো। শ্রেষ্ঠ তবু দেবতার চেয়ে !
পাপ পুণ্য ধর্মাধর্ম,
কিছু নাহি জানি,
জানি শুধু স্বামী !
লোকচক্ষে স্বামী মোর যতই দুর্জন,
তবু মোর অন্তরের ধন,
প্রিয় হ'তে প্রিয়তম।

চিত্রা। মন্দোদরি !
আপনি মজিবে।
মজাবে কনকলঙ্কা।
স্বামী পুত্র পৌত্র ও কলত্র
লক্ষ্মী-রোষে সকলি মজিবে !

মন্দো। ভগ্নি !
পুত্র পৌত্র কলত্র সকলি,
কোথা হ'তে পাইয়াছ সতি ?
পতির চরণ কর সার,
কার্যাকার্য তাঁর করনা বিচার !
মজে যদি পুত্র পৌত্র,
মজে যদি স্বর্ণ-সিংহাসন,
তাঁহার কারণ,
কিবা ক্ষতি তাহে !
ত্রিভুবনজয়ী পতি,
সমুন্নত দশশির,
করে নাই কভু নত কাহারো নিকট !
আজ মুক্ত করি সীতা,
পতির সে চিরোন্নত শির,
দিতে চাও হতে বিলুণ্ঠিত শত্রুপদতলে !

চিত্রা। মন্দোদরি—মন্দোদরি !
নহে শত্রু ! রাম নারায়ণ !

মন্দো। হোন নারায়ণ !
কিন্তু শত্রুরূপে করেছেন পুরে আগমন !
পূজাস্থান নহে ত মন্দির।
অর্ঘ নহে পুষ্প বিল্বদল !
পূজা হবে—পূজা হবে সমর-অঙ্গনে,
সুতীক্ষ্ণ সায়ক বরিষণে !

চিত্রা। মন্দোদরি—মন্দোদরি।
মদমত্তা হয়ে,
কেন আজ ভোল নারায়ণে !

মন্দো। কেবা নারায়ণ !
নাহি জানি—নাহি চিনি অন্য নারায়ণ,
স্বামীর চরণ পূজি,
পরাগতি যদি হয় লাভ,—
বৃথাই অর্চনা তবে অন্য নারায়ণে।

[প্রস্থান]

সীতা। ফিরে যাও—ফিরে যাও ঘরে,
রাণী চিত্রাঙ্গদা !
রামের বনিতা,
মুক্তি নাহি লবে হাত পেতে।

চিত্রা। মুক্তি যদি নাহি লবে অযোধ্যার রাণী !
তবে কাঁদ কেন সতী !
তোমার আঁখির ধারে,
সাগর কাঁদিয়া ফেরে,
দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমীরণ !
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা,
কাঁদিয়া আকুল তারা ;
পশুপক্ষী তরু লতা,
তারাও ক্রন্দনরতা
দশদিক্ কাঁদিয়া আকুল !

সীতা। আমি কাঁদি—আমি কাঁদি,
রাঘবের আঁখিজল স্মরি।
আমি কাঁদি পুত্রোপম লক্ষ্মণের লাগি।
আমি কাঁদি সহোদরা উর্মিলার লাগি।
যৌবনে যোগিনী—স্বামি-বিরহিণী !
তপ্ত অশ্রুজলে,
সিক্ত করি নৈশ উপাধান,
দীর্ঘশ্বাসে কাটায় যামিনী !

আমি কাঁদি,—
সরযূ-মেখলা-পূত অযোধ্যার লাগি।
চিত্রা। তবে তাই কাঁদ সতি!
কাঁদ হাহাকারে,
কেশবের বক্ষ দীর্ণ করি!
লক্ষ্মীহারা নারায়ণ,—
হো'ন সচেতন!
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী!
মুক্তি দিতে আসুন ছুটিয়া!
সমুদ্র মন্থনে,
বরুণের অন্তঃপুর হতে,—
যেমতি তোমারে একদিন,
উদ্ধার করিয়াছিল।

[প্রস্থান]

ক্রমশঃ

বাংলা-মায়ের রূপ

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাহাদুরাবাদ ঘাটে গাড়ীতে বসিয়া আছি; গাড়ীর নিকট আসিয়া হোটেলওয়ালারা বেশ চীৎকার করিয়া যাত্রী পাকড়াও করিবার জন্য বক্তৃতা সুরু করিল। কেহ বলিল—আসুন, গরম চা, লুচি খেয়ে যান," কেহ বলিল—"গরম গরম মাছের ঝোল ভাত খাবেন আসুন," ইত্যাদি। এই দৃশ্য দেখিয়া গোয়ালন্দের হোটেলওয়ালাদের কীর্তি-কাহিনী মনে পড়িল। সে অনেক দিনের কথা—বোধ হয় ১৯১২ সালে পাটনা হইতে চন্দ্রনাথ যাইতেছিলাম। তখন প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে বেলা প্রায় ৯টার সময় গোয়ালন্দ পৌছি। সঙ্গে আরও দুইতিনজন বন্ধু ছিলেন। হোটেলওয়ালার বুকনীতে ভুলিয়া পদ্মার জলে স্নান করিয়া খাইতে বসা গেল, ডাল ও তরকারি দিয়া ভাত খাওয়া হইয়াছে; ঠিক এমনি সময় হোটেলওয়ালা চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল—"বাবু ষ্টীমার ছেড়ে যাচ্ছে।" তখন বুঝিতে পারি নাই উহা নিছক প্রতারণা—ষ্টীমার ছাড়িবার তখনও প্রায় ২॥ ঘণ্টা বাকী। আমরা তাড়াতাড়ি খাওয়া ফেলিয়া হাতমুখ ধুইয়া ষ্টীমারঘাটে চলিলাম, গিয়া দেখি—কোথায় ষ্টীমার ছাড়ার কথা, না, তখনও কাকস্য পরিবেদনা! ষ্টীমারে যাত্রীই নাই! চট্টগ্রাম মেইল কলিকাতা হইতে পৌছিবার আধ ঘণ্টা পরে ষ্টীমার ছাড়িবে। হোটেলওয়ালা মৎস, ডিম্ব প্রভৃতি মূল্যবান্ দ্রব্য বাঁচাইবার জন্য এই চালাকী খেলিয়াছিল!

বাহাদুরবাদে সেই চালাকীর পুনরভিনয় দেখার সৌভাগ্য হইল না, গাড়ী ছাড়িয়া দিল কিছু বিলম্বে। শুনিলাম আজ ষ্টীমার খুব বিলম্বে আসিয়াছে। আমার বিলম্ব ও সকালে কোন পার্থক্য নাই—যেহেতু আমি এইবার স্বচ্ছন্দচারী—১৫ দিনের মধ্যে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলেই হইল।

দুইধারের পল্লীকুটীর ও শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র প্রভাতের উজ্জ্বলালোকে দীপ্যমান। এইবার চলিয়াছি ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া। এই জেলায় ইতিপূর্বে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কিন্তু পল্লীর শ্যামল-সুষমা দেখিয়া চোখ জুড়াইয়া গেল। আর গৃহস্থের পর্ণকুটির দেখিয়াও কেমন যেন মনে হইল এই জেলার লোকের ঘরে ভাত আছে।

গাড়ীর বিকট শব্দ এবং ধুলা অত্যন্ত কষ্টদায়ক বলিয়া

মনে হইল। বেলা প্রায় সাড়েদশটায় সিংজানি জংসনে উপনীত হইলাম, যাঁহারা সিরাজগঞ্জ হইয়া ময়মনসিংহ যাইবেন, তাঁহারা এইস্থানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

সিংজানি বেশ বড় ষ্টেশন। বহুলোক উঠা-নামা করিতেছে দেখিলাম। অনেকক্ষণ গাড়ী থামিবে, আমরাও ষ্টেসনে বসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লইলাম। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখি—আমরা উভয়ে আমাদের যে বিছানা পাতিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা অদৃশ্য হইয়াছে; তৎস্থানে কয়েকজন লোক মৌরসীপাট্টা জারি করিয়া উপবেশন করিয়াছে। এই দৃশ্য সম্পূর্ণ নূতন। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী এবং আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু যাত্রীর পাতা বিছানা লোপাট করিয়া যে অন্য লোক উপবেশন করিতে পারে, তাহা ইতিপূর্বে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। জীবনের পথচলায় নবীন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া হৃতস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টিত হইলাম। প্রথমে কিছুতেই তাহারা আমাদিগকে আমল দিতে চাহিল না; অগত্যা কিঞ্চিৎ ভয় প্রদর্শন করিতেই স্থান মিলিল; তবে সম্পূর্ণ নহে। আমাদের বিছানাপত্রও দেখিলাম উহারাই উপরের বাঙ্কে তুলিয়া রাখিয়াছে।

পথে বিদ্যাগঞ্জ, বাইগুণবাড়ী প্রভৃতি ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় ময়মনসিংহ ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। ষ্টেসনে ঢুকিবার পূর্বেই গাড়ীতে বসিয়াই সহরের কতকাংশ দেখা গেল। উহা দেখিয়া বুঝিলাম এখানে লোকগুলি বেশ সমৃদ্ধিশালী—লোকের ঘরে যে বেশ দু'পয়সা আছে তাহা সহরের বাহ্যিক চেহারাতেই বেশ মালুম হইল। ষ্টেশন বহুলোকে পূর্ণ। এইস্থানে আমার অবতরণের পালা। গাড়ী কিছু বিলম্ব করিয়া আসিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

গাড়ী হইতে বাহির হইয়াই দেখি বন্ধুবর কালীশঙ্কর সেন আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে অগ্রসর হইতেছেন। অগত্যা তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া আহ্বান করিলাম। পরে ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া মুক্তাগাছাগামী বাসে আরোহন করা গেল। পথে কালীশঙ্কর বাবু কি সব জিনিষপত্র সওদা করিলেন।

আরও কয়েকটি যাত্রী লইয়া বাস সহরের জনপূর্ণ পথের ভিতর দিয়া চলিল, পথে আনন্দমোহন কলেজ, বিদ্যাময়ী গার্ল স্কুল প্রভৃতি দেখিলাম। এইবার গাড়ী চলিল বেশ দুইধারে শস্যশ্যামল মাঠের মধ্যবর্তী রাস্তা ধরিয়া। এই রাস্তা বেশ ভাল—সমতল রক্তপ্রস্তরমণ্ডিত রাজপথ অজানা কত শত নূতন দেশে চলিয়া গিয়াছে। পথের দুই ধারে কত বিপুলদেহ বনস্পতির সারি চলিয়াছে; ঊর্ধ্বে রৌদ্রতপ্ত নীল আকাশ; নিম্নে শ্যামল বসুন্ধরা শস্য-সম্ভারে সমৃদ্ধা; উভয়ের মাঝখানে ঊর্ধ্বশীর্ষ বটঅশথ-দেবদারু-বীথি যুগযুগান্ত ধরিয়া কোন অনাদি মহানের ধ্যানে নিমগ্ন; কত অজানা পাখীর ডাকে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে—কত শারদ প্রাতে; কত বনান্ত-সঞ্চারী পরিমলবাহী শীকরসংপৃক্ত মন্দসমীরণ তাহাদের দেহে স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে কত বাসন্তী সন্ধ্যায়; কত নিশীথের গভীর নীরবতায় শুক্র তারার সমুজ্জ্বল জ্যোতি তাহাদের প্রাণে হারাণগীতের সন্ধান দিয়াছে; অথচ আজ এই রৌদ্রদীপ্ত অলস মধ্যাহ্নের প্রখর তাপে শুষ্কপত্র বনস্পতির নিবিড় ছায়া যেন কোন স্বপ্নলোকের আভাস টানিয়া আনিল আমার স্মৃতির দুয়ারে।

দুই একখানা বাস আমাদের বাসকে অতিক্রম করিয়া সহরের দিকে যাইতেছে আর আমরা চলিতেছি সহর-ছাড়িয়া সুদূর পল্লীর অভিমুখে। পথে মাঠের মাঝখানে সহরের প্রান্তভাগে দেখিলাম জেলখানা—সুদীর্ঘ লাল প্রাচীর বেষ্টিত গৃহাবলী দূর হইতে বেশ দেখা গেল।

পথের একস্থানে আসিয়া বাস বেচারা অচল হইয়া গেল, সে বলিয়া উঠিল—"আমারও আছে একটা স্বাধীন সত্বা; আর আমি নড়িব না, যদি না আমাকে কর মেরামত উপযুক্তরূপে।" যাত্রিদলকে নামিতে হইল, আমিও নামিয়া বৃক্ষমূলে পায়চারি করিতে লাগিলাম। ধূলিধূসর পথের ধারে ফণিমনসার জঙ্গলের বেড়া—ধান-ক্ষেতের প্রান্তে থামিয়াছে; কোথাও কোথাও দু'একটা বাবলাবৃক্ষ ক্ষেতের মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে, কিন্তু

দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত এক অফুরন্ত সবুজের মেলা—মনোহর, লোভনীয়। মনে পড়িল বঙ্কিমচন্দ্রের—

"সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং ;
মাতরম্।"

অনেক সাধ্যসাধনার পর ড্রাইভারের বহু খোসামোদ লাভ করিয়া বাসপ্রবর গর্জন করিয়া উঠিলেন যেন বৃত্রাসুরের নিধনকালে ইন্দ্রের হাতের বজ্রধ্বনি। আমরা আবার বাসের কোলে স্থান লাভ করিলাম। আবার বাস চলিল সহজ সরল গ্রাম্য পথে।

অবশেষে বেলা প্রায় ১।টার সময় মুক্তাগাছা দেখা গেল, মুক্তাগাছা বহু সমৃদ্ধিশালী জমিদারের বাসস্থান। একটা হাইস্কুলের অদূরে বাস থামিল। আমরা উভয়ে অবতরণ করিলাম। একটি সরু গলির মুখেই অবস্থিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ী। তিনি বন্ধুবর কালীশঙ্করের পিতা তাঁহার গৃহে আমার এই প্রথম আগমন। সুতরাং আমার অপ্রত্যাশিত আগমনে সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন। যথাযোগ্য প্রণাম-অভিবাদন প্রভৃতির পরে স্নানপর্ব শেষ করিয়া ভূরি-ভোজনের পালা। চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় সহযোগে জঠরানলে আহুতি দান করা গেল। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অতঃপর কিছুক্ষণ নিদ্রাদেবীর উপাসনা করা গেল।

মুক্তাগাছায় একরাত্রি

সন্ধ্যার সময় চা পান শেষ করিয়া কালীশঙ্কর বাবুর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলাম। কিছুদূর এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া কালীশঙ্কর বাবুর মামার বাড়ী যাওয়া গেল। সেখানে দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত গ্রামোফোন শুনিয়া বেশ আমোদে অতিবাহিত করিলাম। জলযোগের সময় মুক্তাগাছার সুবিখ্যাত মিষ্টান্ন-বিক্রেতা গোপাল পালের বৃহদাকৃতি মোণ্ডার সহিত মোলাকাৎ হইল। দেখিলাম খাইতে বেশ সুস্বাদু, কলিকাতার সন্দেশের অনুরূপ। কালীশঙ্করবাবুর নিকট শুনিলাম, যে মুক্তাগাছায় আসিয়া গোপাল পালের মোণ্ডা আহার করিল না, তাহার মুক্তাগাছা আগমন বৃথা।

রাত্রি অধিক হওয়ায় গান শোনা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। অতঃপর ভোজনের অবসানে নিদ্রাদেবীর উপাসনা করা গেল বেশ দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায়।

এই কয়দিন অবিরাম রেলগাড়ীর কঠোরতার মধ্যে রাত্রি কাটাইয়া আজ কোমলতার মধ্যে উভয়ের পার্থক্য-রেখা টানিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বেলাহত সমুদ্র-তরঙ্গের মত বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইল। কারণ দেখিলাম—উভয়ের মধ্যে বাহ্য বৈসাদৃশ্য ভিন্ন স্বরূপত কোন ভেদ নির্ণয় করা কঠিন। যতক্ষণ জাগিয়া থাকা যায়, ততক্ষণই কোমল ও কঠোরের অনুভূতি অন্তরলোকে দেখা দেয়। নিদ্রার অভ্যন্তরে কোমল-কঠোর এক হইয়া ধরা দেয়। যদি শরীর ঠিক নিদ্রার উপযোগী থাকে, তবে রাস্তার ফুটপাথে মুটেরাও স্বচ্ছন্দে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যায় ; পক্ষান্তরে স্প্রিংয়ের খাটে সুকোমল গদিতে শয়ন করিয়াও হয়ত অনেক সময় নিদ্রাদেবীর কৃপালাভ ঘটে না। তাই খবরের কাগজে দেখা যায়, ধনী বিলাসী ব্যক্তি বহুসহস্র মুদ্রার বিনিময়েও নিদ্রাদেবীর সাক্ষাৎকারের জন্য পাগল।

আমি বেশ নিদ্রা গেলাম, খুব সকালে শয্যাত্যাগে অভ্যস্ত হইলেও, উঠিতে বেশ বেলা হইয়া গেল।

সকাল বেলা চা পান ও জলযোগের অবসানে আবার মুক্তাগাছা গ্রাম পরিভ্রমণে বাহির হইলাম। গতকল্য নৈশান্ধকারে এই গ্রামের বিশেষ কিছুই চোখে পরে নাই। বহু সমৃদ্ধিশালী জমিদারের বাড়ী, স্কুল, বাজার প্রভৃতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম, পথিমধ্যে কালীশঙ্কর বাবু ময়মনসিং যাইবার মোটরের ব্যবস্থা করিলেন।

একস্থানে একটি দেবায়তন দেখিলাম, শুনিলাম উহা রূপজীবিনী স্বীয় অর্থে তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল নীতিশাস্ত্রের বাণী—"গরু মারিয়া জুতা দান করিলে উহা নীতিশাস্ত্র সমর্থন করিবে কি না।" পাঠ্যা-বস্থায় সমর্থন করিবে না বলিয়া জানিতাম কিন্তু জীবনের বাস্তবতার তীরে দাঁড়াইয়া যখনই ভাবি—তখন দেখি

বিশ্বগ্রন্থের নির্ঘণ্টে উহারও সার্থকতার রেখা জল-জল করিতেছে। দার্শনিকপ্রবর স্পিনোজার মতে বিশ্বনিয়ম ধরিয়া বিচার করিলে কিছুই অনর্থক বলা চলে না। তবে আমরা যে কোন বস্তুর উদ্দেশ্যহীনতা প্রত্যক্ষ করি, উহা আমাদের ক্ষীণদৃষ্টিপ্রসূত। যদি ভগবান্ এক হয়, যদি বিশ্ব তাঁহারই বিকাশ হয়, তবে গরু মারা এবং জুতা দান উভয়ই তাঁহার কার্য হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং কোন কাজকেই হীন বলিয়া উল্লেখ করা চলে না। কিন্তু মানবের মানদণ্ডের অনুরূপ সমাজের ইষ্টানিষ্ট লইয়া বিচার করিলে উপরিলিখিত 'গরু মারিয়া জুতা দানকে' সমর্থন করা চলে না। যেহেতু উহাতে ভালমন্দের মধ্যবর্তী ভেদ-রেখা বিলুপ্ত হইয়া যায়—তাহাতে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী।

বেলা ৯টায় স্নানার্থ একটি পুষ্করিণীতে গমন করিয়া দীর্ঘকাল পরে অবগাহন স্নান করা গেল। আহারাদির পর মোটরের জন্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। গতকল্য রাত্রিতে ভোজন করার পর কালীশঙ্কর বাবুর ভগ্নী মলিনার নিকট চাহিয়াছিলাম জল, আজ দেখি 'মেঘ না চাহিতেই জল'—টেবিলের উপর পানের ডিবার পাশেই এক গ্লাস জল রক্ষিত হইয়াছে। বুঝিলাম মলিনার সেবাযত্নের দিকে নজর আছে। যে ঘরে যাইবে সে ঘরে নেহাৎ অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করিবে না।

অবশেষে মোটর আসিয়া দ্বারদেশে হর্ণ দিল। গুরুজনকে প্রণাম করিয়া এবং মলিনা, গজন প্রভৃতির নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া কালীশঙ্কর বাবুর সমভিব্যাহারে মোটরে উঠিয়া বসিলাম।

পথিমধ্যে বিশেষ কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না। ময়মনসিং ষ্টেসনে মোটর উপনীত হইল। ষ্টেশনে উপস্থিত হইবার অল্প পরে ঢাকাগামী গাড়ী উপস্থিত হইল। উঠিয়া বসিলাম। কালীশঙ্কর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুদ্ধ এইখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দীর্ঘদিবসের ময়মনসিংহ দর্শনের বাসনা পূর্ণ করিয়া ঢাকার দিকে যাত্রা করিলাম।

ঢাকার পথে

ময়মনসিংহ জেলা পাটের জন্য বিখ্যাত। এই জেলার বহুস্থানে পাটের চাষ হইয়া থাকে। বহুলোক পাটের কারবারে অর্থশালী হইয়াছে—তবে পাটের দর উঠা-নামার জন্য অনেকে সর্বস্বান্তও হইয়াছে বলিয়া জানি। সুতরাং পাটের ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনাপূর্বক আত্মনিয়োগ করা দরকার। নতুবা বিফলতার ঊষর মরুবুকে সৌভাগ্যরবির বিলুপ্তি আশা করিলে খুব অশোভন হইবে না।

ময়মনসিং ষ্টেশনের অদূরে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর আসামবেঙ্গল রেলপথের সেতু। পথে টাঙ্গি জংশনে আবার আসামবেঙ্গল রেলপথের সহিত মোলাকাৎ হইয়াছিল।

জয়দেবপুর ষ্টেশনের কিছু পূর্ব হইতে একপ্রকার শাল-জঙ্গলের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিল। পাহাড়হীন দেশে এইরূপ নিবিড় বনভূমি খুব বিরল। তবে বর্ধমান জেলার বহুস্থানে এইরূপ শালজঙ্গল দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা এই শালবনকে "গজারি বন" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। গাড়ীতেও একটি ভদ্রলোক আমি শালগাছ বলায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় আমার যতটুকু জ্ঞান ছিল, তাহাতে শালগাছ ও গজারি গাছে কোন পার্থক্য দেখিলাম না। মনে পড়ে বিক্রমপুরের রামপাল ভ্রমণকালে বল্লালসেনের দিঘির তীরেও অনুরূপ দুইটি শাল বা গজারি গাছ দেখিয়াছিলাম। তখনও উভয়ের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানিতে পারি নাই ; আজও পারিলাম না।

জয়দেবপুর ষ্টেশন হইতে ভাওয়াল রাজপ্রাসাদ দেখা গেল না। শুনিলাম ভাওয়ালের মধ্যমকুমার এখন ভাওয়ালে নাই।

বেলা প্রায় ৪টার সময় ঢাকা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম।

ঢাকায় কয়েকঘণ্টা

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া সতীশ সরকার রোড ধরিয়া আনন্দমনে আনন্দ-আশ্রমে চলিলাম। এইস্থানে আমার

একটি আত্মীয়ার বন্ধু একটি বালিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, বালিকাটির নাম শান্তি; সে আনন্দ-আশ্রমে থাকিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পড়ে।

ফরাসগঞ্জে লৌহসেতুর অদূরে আনন্দমাষ্টারের ভূতপূর্ব বাগানবাড়ী আজ আনন্দ-আশ্রমে রূপান্তরিত। জনৈক বিদুষী মহিলা এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী। মনে পড়ে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই আনন্দ-আশ্রমে আসিয়াছিলাম, তখন উহার মধ্যস্থলে একটি পুষ্করিণী ছিল; এইবার তাহা দেখিলাম না। উহা ভরাট করিয়া বহুবিধ গৃহাবলী নির্মিত হইয়াছে দেখিলাম। ওয়েটিং রুমে বসিয়া স্লিপ দিতে হইল, দেখা করিবার কারণ ও নামধাম লিখিয়া। কিছুক্ষণ পরে বেহারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমার নাম সাক্ষাৎকারিগণের নামের তালিকায় আছে কি না। "না" বলায় বেহারাটি ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেল এবং আমাকে বসিতে বলিল। কয়েকমিনিট পরে বেহারাটি ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, শান্তি স্নান করিতে গিয়াছে; স্নান সারিয়া প্রতিষ্ঠাত্রী অনুমতি দিলে আমার সহিত দেখা করিবে।

আর একটি ভদ্রলোক আমার পাশে বসিয়া স্লিপ দিলেন, বেহারা উহা লইয়া চলিয়া গেল এবং একটু পরে ভদ্রলোককে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওয়েটিং রুমে বসিয়া আশ্রমবাসিনীদের কথাবার্তাও শুনিতে পাইলাম; কয়েকটি মহিলা আমার ওয়েটিং রুমের সম্মুখ দিয়াও চলিয়া গেল দেখিলাম।

কয়েকমিনিট পরে শান্তি আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সে এইবার ম্যাট্রিক দিবে। তাহার নিকট জানিতে পারিলাম আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী দীর্ঘকাল আমেরিকায় ছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আমাদের বাঙালী মহিলার শিক্ষা-সৌকর্যার্থ এই আশ্রম খুলিয়াছেন। শান্তির সহিত কথাবার্তা শেষ করিয়া অস্তমান সূর্যরশ্মির সমবায়ে আনন্দ-আশ্রম ত্যাগ করিলাম।

ক্রমশঃ

পঞ্চপুষ্প

এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড

এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের সাহিত্যিক খ্যাতি কেবলমাত্র তাঁহার রচিত অমর-কাব্য ওমর খৈয়ামের উপর নির্ভর করে। তিনি আরও বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সবই বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। কিন্তু এই একমাত্র কাব্য তাঁহাকে অমর করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই পুস্তক পারস্য দেশীয় কবি ওমর খৈয়মের কবিতার স্বাধীন অনুবাদ। ওমর প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। ফিটজেরাল্ড প্রাচ্যভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। একদিন তাঁহার এক বন্ধু বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীতে ওমরের রচনার পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন; উহা পার্চমেণ্ট কাগজে ঘন-

ছিল। এই বন্ধু ফিটজেরাল্ডের দৃষ্টি এই রচনার প্রতি আকৃষ্ট করেন।

অবশ্য এই কথাও ঠিক যে, যদি ফিটজেরাল্ডের মনোবৃত্তি ওমরের অনুরূপ না হইত, তবে পৃথিবী কখনও এই সমস্ত সুন্দর ভাব ও স্বপ্নময় কবিতাগুলি লাভ করিতে পারিত না; সুতরাং পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার বর্তমান অপেক্ষা দরিদ্র থাকিত, এই কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। একবার তিনি লিখিয়াছিলেন—"ওমর আমার নিকট সান্ত্বনার বাণী।" ওমর ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মানবীয় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপাসক; ফিটজেরাল্ডও ঠিক অনুরূপ ছিলেন। ওমর অতীত সুখের স্মৃতি লইয়াই মসগুল থাকিতে ভালবাসিতেন এবং ক্ষণস্থায়ী সুমধুর বস্তুগুলির

ওমরের মনোজগৎ নৈরাশ্যময় দার্শনিকতায় পূর্ণ ছিল, যাহা মানবাত্মার আশ্রয়হীনতার অবস্থায় উদ্ভূত; ফিট-জেরাল্ডের দার্শনিকতাও অবিকল সেইরূপ।

ফলে প্রতিভাশালী ভাস্করের মত ফিটজেরাল্ড মিশ্রিত ধাতুস্তূপ হইতে স্বর্ণমূর্তি খোদিত করিয়া পৃথিবীর বক্ষে উপহার দিলেন। তিনি যে ভাষা ও ছন্দ মনোনীত করিলেন তাহাও দার্শনিকতাপূর্ণ গম্ভীর ভাবদ্যোতক। ফিটজেরাল্ডের ধীরগতি, ছন্দ নৈসর্গিক পর্যবেক্ষণের সুন্দরস্পর্শে সমলঙ্কৃত হইয়া করুণ রসধারার সমবায়ে মধু বর্ষণ করিয়াছে।

"পূর্ণ কর পান-পাত্র ; কাজ কি বৃথা জিজ্ঞাসায় ?
পদতলে কালস্রোত পূর্ণ বেগে বয়ে যায় !
অনাগত ভবিষ্য আর মৃত্যুমলিন অতীতেরে
কাজ কি ডেকে দুঃখ পাওয়ায়—আজকে যদি
মধু ক্ষরে ?"

"নৃত্যশীলা ভাগ্যদেবী ললাট-লিপি লিখছে হায়,
লেখার শেষে আবার ছোটে, থমকে কভু না দাঁড়ায় ;
অর্ধপংক্তি রদ করে না জ্ঞানভক্তির চাটুবাদে,
মোছেনাক একটি আঁখর হাজার বছর যদি কাঁদে।"

"গুলবাগানের শোভার সাথে বসন্তেরই তিরোধান,
যৌবনেরই সাথে লুপ্ত জীবন-পুঁথির মধুর গান।
বটের শাখে ডাকত কোকিল ;—কোথায় আবার
উড়ে যায়,—
সাঙ্গ হ'লে ডাকার পালা খোঁজ ত তাহার কেউ না
পায় !"

ওমর একজন প্রকৃত কবি ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুলতানের উজিরের নিকট হইতে প্রচুর বৃত্তি পাইতেন। ফিটজেরাল্ড রুবায়ৎ অনুবাদ করার পূর্ব পর্যন্ত ওমর পাশ্চাত্যজগতে একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ও জ্যোতির্বিদ্‌রূপে পরিচিত ছিলেন। কোন কোন সমালোচক ওমরকে "রহস্যবাদী" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার উপাস্য দেবীকে বিভিন্নরূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের ভোগে অভিলাষী ; এবং ফিটজেরাল্ডও তাঁহাকে অতীন্দ্রিয়বাদীরূপে বর্ণনা করেন নাই। তিনি অজ্ঞেয়বাদী এবং অদৃষ্ট ও জীবনের রহস্যমূলক সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত ছিলেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি বা আত্মিক উন্মাদনা হইতে তিনি কোন প্রেরণা লাভ করেন নাই ; তিনি কেবলমাত্র জীবন, যৌবন, শক্তি ও সুন্দর-মধুর পৃথিবীর দিকে সতৃষ্ণনয়নে পশ্চাদ্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। জীবনের এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থনিচয়ের আনন্দ তাঁহাকে পুলকিত করিত। যেহেতু উপরিলিখিত আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং উহাকে সর্বপ্রযত্নে পরিহার করিতে হইবে,—এই নীতি তিনি গ্রহণ করেন নাই। বরং তিনি তাহাদিগের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এই সমস্ত এত সুন্দর—অথচ এত ক্ষণস্থায়ী—এই মূলতত্ত্বই ওমর ও ফিটজেরাল্ডের নিকট রহস্যরূপে প্রতিভাত হইত ;—ইহাকে নির্বাসন করা নহে—কিম্বা দূরগত আশার দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাও নহে ; বরং পুষ্পরাশি দ্বারা মাল্য রচনা কর ; যদি সম্ভব হয় সঙ্গীত রচনা কর।

"এস, পূর্ণ কর পাত্র ; বসন্তেরই হোমানলে,
অনুতপ্ত শীতের বসন দাওনা ফেলে—উঠুক জ্বলে ;
ডানা নাড়ে কালপক্ষী একটুখানি ক্ষীণপথে,—
আবার পাখী চলল উড়ে অচিন দেশে মনোরথে !"

ওমর জীবনকে ভালবাসিতেন প্রাচ্যের গরিমাময় দৃশ্যের মধ্যে, যাদুকরী ছায়ার মাঝে, শান্ত গোধূলীবেলায়, যখন পূর্ণচন্দ্র সুরভিতপুষ্পসমাকীর্ণ উদ্যানের উপরিভাগে শোভমান ; যেখানে অতিথিরা সুরাপাত্র করে সঙ্গীতের অফুরন্ত ঝঙ্কারে শষ্পশয্যায় তারকারাজির মত বিক্ষিপ্তভাবে উপবিষ্ট।

"হে মোর আনন্দ-চাঁদ নাহি জান কারে বলে ক্ষয় ;
নীলাকাশে চন্দ্রমার হইতেছে পুনরভ্যুদয়।
কতবার ঐ শশী নিম্নে এই উদ্যানের পানে,
তাকাইবে বৃথা খুঁজি আমার এ বিশুষ্ক ব্যোমে,
আর তুমি যাবে চলি চারু-চল-চঞ্চলচরণে,
শষ্পাসনে উপবিষ্ট অভ্যাগত-তারকা-মণ্ডলে,
আনন্দ বিতরি যবে উপনীত হবে সেই স্থলে,
যেথায় ছিলাম আমি—উজাড়িয়ো পাত্র ক্ষুণ্নমনে।"

এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সাফোকের উডব্রিজ নামক স্থানের সন্নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রায় সারাজীবন ঐস্থানে বাস করিয়াছেন। তিনি স্বাধীন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন; তিনি আমোদ-প্রমোদময় অলস জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাকে লোকে ভূতাবিষ্ট ভাবুক বলিয়া উল্লেখ করিত, পাঠ্যাবস্থায় তিনি নিজের খেয়ালমত প্রাচীন গ্রন্থকারদের পুস্তক পাঠ করিতেন; অঙ্কন বিদ্যা, সঙ্গীত ও কবিতা লইয়া মাতিয়া থাকিতেন। তিনি পুস্তকের যে অংশ ভালবাসিতেন তাহা ছিন্ন করিয়া লইতেন; ফলে তাঁহার আলমারীতে একখানিও সম্পূর্ণ পুস্তক ছিল না। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদের দিকেও কোন লক্ষ্য ছিল না। একবার তাঁহার গরীয়সী মাতা কেম্ব্রিজে আগমন করেন; তখন তাঁহার এক জোড়া জুতা ছিল না যাহা পরিয়া তিনি মাতৃসন্নিধানে গমন করিবেন।

তিনি ২১ বৎসর বয়সে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে অবসর জীবন যাপন করিতে থাকেন, মৃত্যুতে উহার অবসান ঘটে। তিনি কোনরূপ বাহ্যিক আচারব্যবহারের ধার ধারিতেন না এবং সমস্ত পার্থিব আচার-অনুষ্ঠানে উদাসীন ছিলেন।

ত্রিশ বৎসর বয়সে ঋষিজনোচিত গুহার অনুসন্ধানে তিনি গৃহ ছাড়িয়া বাড়ীর প্রান্তে অবস্থিত দুইখানি কক্ষ-বিশিষ্ট একটি পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইস্থানে সেক্‌স্‌পিয়ারের আবক্ষ মূর্তি, একটি বিড়াল, একটি কুকুর, 'বিউটি বব' নামক একটি টিয়া পাখী লইয়া তিনি নিজের সংসার রচনা করিলেন। এক কৃষকদম্পতি এই কুটীরে তাঁহার পরিচর্যা করিত। এই কুটীর বিশৃঙ্খলার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন ছিল—ছড়ি টেবিলের উপর, পুস্তক ভূমি-তলে ধূলায় লুণ্ঠিত, ছবি পিয়ানোর উপর নিপতিত—এই সমস্ত দৃশ্য সব সময় দেখা যাইত। এতদ্ভিন্ন এক পিপা বিয়ার নামক মদ্য ছিল। এই স্থানে ফিটজেরাল্ড অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় বসিয়া থাকিতেন কিম্বা আকাশে চাঁদের দিকে চাহিয়া পায়চারি করিতেন। সময় সময় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তাঁহাকে নিকটবর্তী অঞ্চলে বেড়াইতে দেখা যাইত।

এইরূপে তিনি ওমর খৈয়াম রচনা করিয়া ছিলেন। কালে তিনি টেনিসন, কার্লাইল, জর্জ বরো প্রভৃতির সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। সকলেই তাঁহাকে ভাল-বাসিতেন। মৃত্যুর পূর্বে টেনিসনকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কোন্ বন্ধুকে কবি সবচেয়ে ভালবাসেন, তদুত্তরে তিনি বলেন—"কেন নিশ্চয় বৃদ্ধ ফিট্‌জ।"

সকলেই তাঁহার অসামান্য সমালোচনা-শক্তিতে মুগ্ধ হইতেন। বাস্তবিক তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি। মধ্য বয়সে তিনি মিস্ বার্টনকে বিবাহ করেন; কিন্তু উহা ছয় মাস পরেই বিচ্ছেদে রূপান্তরিত হইল। উভয়ে উভয়কে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিলেও জীবনে আর কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই।

তিনি ওমর খৈয়াম প্রথমে Fraser's Magazineএ পাঠান; কিন্তু উহা দুই বৎসরেও প্রকাশিত হইল না। তখন তিনি উহা ফেরৎ চাহিয়া নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করেন। উহার মূল্য ছিল ৫ শিলিং। কিন্তু উহার বিক্রয় মোটেই ছিল না, ফলে পুস্তক-বিক্রেতা উহাকে পেনি বক্স পুস্তকা-বলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া সেলফের বাহিরে রাখিয়া দিল। সৌভাগ্যবশত এক খণ্ড রসেটির হাতে পড়ে; তিনি উহা পাঠে উল্লসিত হইয়া বন্ধুবান্ধবগণকে পুস্তক ক্রয়ে পাঠান। এইরূপে ওমর খৈয়ামের অমর-খ্যাতির সূত্রপাত।

ফিটজেরাল্ডের জীবিতকালে পুস্তকের চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাঁহার শেষ জীবন বিষাদে আচ্ছন্ন ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে নরফোকে একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াই তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। সকালবেলা ভৃত্য তাঁহাকে ডাকিতে গিয়া দেখে যে, তিনি ক্ষণস্থায়ী ইহ সংসারের মায়া কাটাইয়া অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

পরলোকে নগেন্দ্রনাথ বসু

গত ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর সুবিখ্যাত সাহিত্যিক 'বিশ্বকোষ'-সঙ্কলয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। বহুদিন

যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। বিগত কয়েক বৎসর তাঁহার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ১৮৬৬ সনে কলিকাতায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম যৌবনে তিনি "তপস্বিনী" ও "ভারত" নামে দুইখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। পরে সেই পত্রিকা উঠিয়া যায়। অতঃপর দর্জ্জিপাড়া থিয়েট্রিক্যাল ক্লাবের জন্য শঙ্করাচার্য্য, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রথমে 'বিশ্বকোষ' সঙ্কলন আরম্ভ করেন; কিন্তু তিনি মাত্র "অ" অক্ষর শেষ করিবার পর, এই গুরুভার তরুণ যুবক নগেন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। নগেন্দ্রনাথ বিশ্বকোষ সঙ্কলনে যে কৃতিত্ব রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে বাংলা-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না। নগেন্দ্রনাথ হিন্দী বিশ্বকোষও সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার" সম্পাদক ছিলেন। টেক্সট্‌বুক কমিটিরও তিনি কিছুকাল সদস্য ছিলেন। বসু মহাশয় "কায়স্থ পত্রিকারও" সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্য পরিষদের জন্য তিনি পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী,' জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল,' জয়নারায়ণের 'কাশী-পরিক্রমা' প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন। পুরাতত্ত্ব সঞ্চয়, প্রাচীন কীর্তি উদ্ধার ও পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল এবং এই জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। তিনি "প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব" উপাধি লাভ করেন। বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তথায় কর্মব্যপদেশে তিনি ময়ূরভঞ্জের যে সকল পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন, তাহা "Archæological Survey of Mayurvoanj" নামক বৃহৎ গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের যশোহর অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। বসু মহাশয় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", History of Kamrup, Modern Buddhism প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার শব পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া হরিসংকীর্তন সহযোগে রাত্রি প্রায় ৯।০ টার সময় তাঁহার বাটী হইতে শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাওয়া হয় এবং কাশীমিত্র ঘাটে সৎকার করা হয়। মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলেন ও শবানুগমন করিয়াছিলেন।

চুঁচুড়া বার্তাবহ

মাতৃজাতি-সেবক-সমিতি

এই সমিতি ১৩২৭ সালে স্থাপিত হয়। উত্তর কলিকাতায় ৩৫।১নং হরিঘোষ ষ্ট্রীটে বর্তমানে এই সমিতি অবস্থিত।

শিল্প বিভাগ (অবৈতনিক), শিক্ষা বিভাগ ও সাহায্য বিভাগ প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগে ইহা বিভক্ত। ইহার তত্ত্বাবধানে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ও পরিচালিত হয়। অধুনা নবম শ্রেণী পর্যন্ত আছে। আগামী বর্ষে দশম শ্রেণী খুলিবার কথা হইতেছে। স্কুলের কার্য মহিলা শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা পরিচালন করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে একজন ইংরাজী সাহিত্যে এম্ এ পাশ।

স্কুল বসিবার পূর্বে স্তোত্র পাঠ পূর্বক দিনের কাজ আরম্ভ করা হয়। রন্ধন, সূচীকার্য ও নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। সমিতি হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রীগণ যাহাতে ভবিষ্যতে আদর্শ জননীরূপে স্বীয় সংসারে বিরাজমান ও সুপ্রতিষ্ঠিতা হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন তজ্জন্য সমিতি এযাবৎ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী এই সমিতির সভানেত্রী এবং শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ সম্পাদক। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন কর্মীর চেষ্টায় সমিতি ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ইহারা ছাত্রীগণকে দ্বিপ্রহরে বিনামূল্যে টিফিন দিতেছেন। ইহা প্রশংসার

যোগ্য। প্রতি বৎসর পারিতোষিক বিতরণের ব্যবস্থাও আছে।

বিগত শারদীয়া পূজার সময় এই সমিতি পল্লীর অভাবগ্রস্তা নারীদিগের মধ্যে ৬০ খানি বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন।

আমরা এই সমিতির উন্নতি কামনা করি।

ভদ্রলোকের ফলের চাষ

ফলের চাষে বেকার-সমস্যা সমাধান অনেকটা সম্ভব। ফলের চাষে অধিক পরিশ্রমে অনভ্যস্ত মধ্যবিত্ত ভদ্র যুবকদিগকে উন্মুক্ত মাঠে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। ২।৩ শত বিঘা জমিতে বৎসরের সকল ঋতুতে উৎপন্ন হয় এরূপ ফল চাষ করিলে সারা বৎসর ফল উৎপন্ন করিয়া বিক্রয় করা যায়। বাংলা দেশে বহু উর্বর স্থান পড়িয়া আছে। দেশের মধ্যে ফলের চাহিদা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সময়ে নানারূপ ফল চাষ করিয়া বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলে মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত যুবকদের একটা আয়ের উপায় হইতে পারে। আম, লিচু, পিয়ারা, লেবু, পীচ, তুঁত নানাপ্রকার জাম, কুল, সফেদা, আনারস প্রভৃতির চাষ সারা বৎসর চলিতে পারে। ইহার সহিত কয়েক প্রকার তরি-তরকারিও চাষ করা যায়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আম বিক্রয় করিয়া এক একটি ঋতুতে লাভজনক আয় হয়।

সম্প্রতি এলাহাবাদে আমের প্রদর্শনী হইয়াছে। এলাহাবাদের মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ বসু পুরস্কার বিতরণ করেন। পণ্ডিত মুলচাঁদ মালবী মিঃ বসুকে অভ্যর্থনা করিয়া বলেন যে ৯৩ রকম আম প্রদর্শিত হইয়াছে এবং বোতলে ও রক্ষিত অবস্থায় ১৭২ রকম আম প্রদর্শিত হইয়াছে। মিঃ বসু বলেন তিনি বহু এম এ ও বি একে বেকার অবস্থায় দেখিয়াছেন। ফলের চাষে যুবকগণ সন্তোষজনক আয় করিতে পারেন এবং উহার ভবিষ্যৎও আশাপ্রদ। মালয় প্রদেশ হইতে ৫ কোটি টাকার টিনে করা আনারস রপ্তানি হয় এবং আধুনিক যন্ত্রাদি এই শিল্পে ব্যবহার করা সত্ত্বেও ইহাতে ৫ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। ভারতে বহু পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয়। এদেশে বিরাট্ ফল-রক্ষণের শিল্প গঠিত হইতে পারে। আমরা এতকাল শস্য উৎপাদনের দিকে মন দিতাম এখন আমাদের ফল উৎপন্ন ও ফল-সংরক্ষণ করার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

সঞ্জীবনী

স্বর্গীয় মাণিকলাল দত্ত

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ৺মাণিকলাল দত্ত মহাশয় তাহার দ্বিতীয় উইল ব্যতীত একটি কডিসিলও সম্পাদন করেন। এই কডিসিলের দ্বারা তিনি তাঁহার গুরু, পুরোহিত, ভিক্ষাপুত্র ও আত্মীয়স্বজনগণকে নগদ টাকা, অলঙ্কার প্রভৃতি দান করিয়াছেন। উহার বিবরণ নিম্নরূপ :—

১। বাদলা, সিঙ্গারকোণনিবাসী
গুরু শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী ... ৫০০৲ টাকা

২। শ্রীরামপুরনিবাসী পুরোহিত
শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী ... ১০০৲ ,,

৩। শ্রীরামপুরনিবাসী পুরোহিত
শ্রীঅঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী ... [illegible]

৪। শ্রীরামপুরনিবাসী পুরোহিত
শ্রীবামাপদ চক্রবর্তী ... ১০০৲ টাকা
৫। কলিকাতা ইটলিনিবাসী
স্বর্গীয় নরোত্তম মুখোপাধ্যায়ের
পুত্র, ভিক্ষাপুত্র শ্রীহরিশচন্দ্র
চক্রবর্ত্তী ... ২০০০৲ ,,
৬। ফরাসী চন্দননগরের অধিবাসী
শ্রীহরিপদ শীলের পত্নী, ভগ্নী
শ্রীমতী আশাময়ী দাসী ... ৫০০০৲ ,,
৭। খুড়তুত ভাই ৫১।১নং
ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট নিবাসী
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র
শ্রীমান্ তিনকড়ি দত্ত ... ২০০০৲ ,,
৮। ৩১নং হিদারাম ব্যানার্জি লেন
নিবাসী ৺লালবিহারী মল্লিকের
বিধবা পত্নী শ্রীমতী কিরণবালা
দাসী ... ১০০০৲ ,,

২১০০০৲ টাকার ৩½ টাকা সুদী কোম্পানীর কাগজ ও ১০০০৲ টাকার ৪ টাকা সুদী মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার তিনি তাঁহার খুড়তুত ভাই ৫১।১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দত্ত ও ২১নং ফিয়ার্স লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দত্তকে সমানভাগে দিয়াছেন।

তাঁহার সমস্ত হীরা-জহরতাদি ও স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ৫১।১নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীতিনকড়ি দত্তের পত্নী শ্রীমতী রাজকুমারী দাসীকে ও অন্য ভ্রাতুষ্পুত্র ২১নং ফিয়ার্স লেন নিবাসী শ্রীদুলালচন্দ্র দত্তের পত্নী শ্রীমতী শোভাময়ী দাসীকে সমানভাগে দিয়াছেন।

শ্রীরামপুরনিবাসী ৺জয়গোপাল দত্তের পুত্র তাঁহার জেঠতুত ভাই শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্তকে তিনি ১০০০৲ টাকা তাঁহার অবিবাহিতা কন্যার বিবাহের জন্য দান করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন কলিকাতা, ১২নং পঞ্চানন তলা রোড নিবাসী তাঁহার বন্ধু, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মল্লিক তাঁহাকে যে তাঁহার বসতবাটী বন্ধক দিয়াছিলেন, তিনি উহার দাবী প্রত্যাহার করেন। তাঁহার জেঠতুত ভাই শ্রীরামপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্তের বন্ধকী বাটীর দাবীও তিনি এই সঙ্গে প্রত্যাহার করিয়াছেন।

তাঁহার ৫১নং হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় লেনস্থ সমস্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, ও কাঁসার বাসনপত্র ঠাকুর-সেবার জন্য সেবায়েতগণের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য উইলের এক্জিকিউটারকে নির্দেশ করিয়াছেন।

ইহার পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি বর্তমান উইলের পূর্বে একখানি উইল সম্পাদন করিয়াছিলেন। বর্তমান উইলে উহা বাতিল করেন। নিম্নে তাঁহার প্রথম উইলের মর্ম প্রদত্ত হইল। ইহাতে উভয় উইলের পার্থক্য সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে।

প্রথম উইলে তিনি স্বীয় শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডকরণের জন্য ৫০০০৲ টাকা নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুর বেনিয়াপাড়া লেনস্থ জমির অর্ধাংশে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জিউর ঠাকুরবাড়ী ২৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইবে। উক্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা উৎসবে ২০০০৲ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না, এবং উক্ত ঠাকুরবাড়ীর নাম "মাণিকমন্দির" রাখিতে হইবে। উক্ত ঠাকুরের সেবার জন্য মাসিক তিনশত টাকা ও উৎসবাদির জন্য বার্ষিক ২৪০০৲ টাকা ব্যয়িত হইবে। এই উদ্দেশ্যে, একলক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি বা বণ্ডে রূপান্তরিত করিতে হইবে, যাহাতে মাসিক ৫০০৲ টাকা আয় হয়।

তাঁহার শ্রীরামপুরস্থ বাটীতে "বিশ্বম্ভর দাতব্য ঔষধালয়" প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই ঔষধালয় নির্মাণে ৫০০০৲ টাকার অনধিক ব্যয়িত হইবে। ৫০০০০৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে, যাহাতে এই দাতব্য ঔষধালয়ের খরচ নির্বাহার্থ মাসিক ২৫০৲ টাকা আয় হয়।

৫০,০০০৲ টাকা মাসিক ২৫০৲ টাকা আয় এইরূপ গভর্ণমেণ্ট বণ্ডে রূপান্তরিত করিয়া "শ্রীমতী গোলাপমণি দাসী বিধবা ও দরিদ্র ভাণ্ডার" স্থাপন করিতে হইবে।

এই আয় সুবর্ণবণিক্ জাতীয় বিধবা ও দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে।

২৫০০০৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট বণ্ডে রূপান্তরিত করিতে হইবে, যাহাতে বার্ষিক ১৫০০৲ আয় হয়। ইহা দ্বারা "শ্রীমতী প্রেমবতী দাসী বালিকা বিবাহ সাহায্য ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ট্রাষ্টির বিবেচনানুসারে উহা দরিদ্র সুবর্ণবণিক্ বালিকা-বিবাহে সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইবে। এই সমস্ত দরিদ্র, বিধবা ও বালিকা শ্রীরামপুর, হুগলী, চুঁচুড়া ও চন্দননগরের অধিবাসী হওয়া চাই।

২৫,০০০৲ হাজার টাকা ব্যয়ে শ্রীরামপুরে জমি ক্রয় করিয়া গৃহনির্মাণ করিতে হইবে, উহাতে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, উহার নাম হইবে "মাণিকলাল দত্ত ফ্রি স্কুল"। এক লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্ট বণ্ডে রূপান্তরিত করিয়া যাহাতে মাসিক ৫০০৲ টাকা আয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ৫০০৲ টাকা স্কুলের খরচ সরবরাহ করিবে।

তিন হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজে খাটাইতে হইবে যাহাতে মাসিক ১৫৲ টাকা আয় হয়। ঐ টাকা শ্রীরামপুর বেণিয়াপাড়ার সন্নিকটস্থ খালধারের মহাপ্রভুর সেবার জন্য ব্যয়িত হইবে।

তাঁহার খুড়তুত ভাই শ্রীসত্যচরণ দত্তের দুই কন্যার বিবাহার্থ প্রত্যেককে ৫০০৲ হিসাবে দেওয়ার নির্দেশ আছে।

গুরু শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী	...	১০০০৲ টাকা
পুরোহিত শ্রীঅঘোরনাথ চক্রবর্তী	...	১০০০৲ ,,
,, শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্তী	...	৫০০৲ ,,
,, শ্রীবামাপদ চক্রবর্তী	...	৫০০৲ ,,
ভিক্ষাপুত্র শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৫০০০৲ ,,
ভগ্নী শ্রীমতী আশাময়ী দাসী	...	২০০০৲ ,,
ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ তিনকড়ি দত্ত	...	৫০০০৲ টাকা
কলিকাতা ১২নং পঞ্চাননতলা নিবাসী শ্রীবিপিনবিহারী মল্লিকের দুই পুত্র শ্রীনিতাইচাঁদ মল্লিক ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রত্যেকে ৫০০৲ হিঃ	...	১০০০৲ ,,
চুঁচুড়ার স্বর্গীয় লালবিহারী মল্লিকের বিধবা পত্নী শ্রীমতী কিরণবালা দাসী	...	৫০০৲ ,,

অবশিষ্ট সম্পত্তি তিনি এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টিকে দান করিয়া যান, যেন তাঁহারা উহা বিক্রয় করিয়া সমস্ত অর্থ রক্ষা করেন ও জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয় করেন।

শ্রীরামপুরের দুইজন জমিদার প্রথম উইলের এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টী ছিলেন।

প্রথম উইল সম্পাদনের পর তিনি উইল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তাঁহার ও শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের সুপরামর্শে ব্যক্তিগত ট্রাষ্টে এই বিশাল সম্পত্তি দান রহিত করিয়া উহাকে গভর্ণমেণ্ট ট্রাষ্টে পরিবর্তিত করেন এবং ব্যক্তিগত দান হ্রাস করিয়া সাধারণের উপকারার্থ দানের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন।

৫এ অক্রুর দত্ত লেনে উইলের সর্তানুযায়ী শ্রীশ্রীরাধাকান্তজিউ ও শ্রীশ্রীগোপালজিউর ঠাকুর বাটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার বহির্দেশে দেওয়ালে মর্ম্মরফলকে নিম্নলিখিত অংশ উৎকীর্ণ রহিয়াছে—

"শ্রীশ্রীরাধাকান্তজিউ ও শ্রীশ্রীগোপালজিউর
ঠাকুর বাটী
শ্রীরামপুর নিবাসী বৈষ্ণবদাসানুদাস
৺মাণিকলাল দত্ত প্রতিষ্ঠিত
সন ১৩৪৫ সাল।"

সমাপ্ত

কৃষ্টফার কলম্বস

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

স্মরণীয় ঘটনা

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের একদিন মধ্যরাত্রে এক ভ্রমণ-ক্লান্ত দীর্ঘকায় সবল পথিক স্পেনের La Rabidaর প্রাচীন সন্ন্যাসীর মঠের সোপানোপরি উপবেশন করিলেন। পথিকের সঙ্গে একটি সাত বৎসর বয়স্ক পুত্র ছিল। তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মঠের আহ্বান-ঘণ্টা নিনাদিত করিলেন। ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া একজন বিস্মিত সন্ন্যাসী দ্বার খুলিয়া দিলেন। পথিক সন্ন্যাসীর নিকট তাঁহার পুত্রের জন্য একখণ্ড রুটি ও একগ্লাস জল প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দয়ালু সন্ন্যাসী পথিকের সুন্দর আকৃতি ও মধুর বাক্য শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া পথিককে সেই রাত্রে পুনরায় পথ চলিতে দিলেন না এবং সাদরে অভ্যন্তরে আগমন করিতে আহ্বান করিলেন।

অতিথিসৎকারপরায়ণ সন্ন্যাসীর প্রদত্ত খাদ্য-পানীয়ে শ্রান্তি দূর করিয়া পথিক সন্ন্যাসিগণকে তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলিতে থাকেন। পথিক বলিলেন যে, তিনি সেই দিন কাদীজ উপসাগরের তীরবর্তী সামুদ্রিক বন্দর Palosএ যাইবার উপল বন্ধুর পার্বত্য পথে বহু মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ও তথায় এক বন্ধুর খোঁজ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা পান নাই। যেহেতু সেই বন্ধু সেভিল গমন করিয়াছেন। ফলে অর্থহীন ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর অবস্থায় তিনি এই মঠের দ্বারে উপনীত হইয়াছেন। এই পথিক পৃথিবীর ইতিহাসে সুবিখ্যাত আমেরিকা-আবিষ্কারক কলম্বস।

পূর্বপরিচয়

কৃষ্টফার কলম্বস ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে ইতালির অন্তর্গত জেনোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন লেখক তাঁহার জন্ম ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে এই নগর ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী কর্মব্যস্ত সামুদ্রিক বন্দর ছিল। বাল্যে কলম্বস এই বন্দরের জেটীর অদূরে দাঁড়াইয়া জাহাজের আগম-নির্গম লক্ষ্য করিতেন। তিনি নাবিকগণের সামুদ্রিক জীবনের বিচিত্র কাহিনী নিশ্চল স্থাণুর মত দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের নিকট হইতে শ্রবণ করিতেন।

বিদ্যালয়ে তিনি ভূগোল, ল্যাটিন ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। যখনই স্কুলের পাঠ শেষ হইত, অমনি তিনি সাগরতীরে গমন করিয়া উৎসুকনয়নে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিশাল নীল জলধির দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। লবণাক্ত সমুদ্রবায়ু তীক্ষ্ণভাবে গায়ে লাগিতেছে; ফেন-মৌলি জলরাশি পোতাশ্রয়ের দেওয়ালে আছড়াইয়া পড়িতেছে; সমুদ্রের বিশাল বক্ষ ভেদ করিয়া ধীর গম্ভীর-গতিতে পোতমালা আত্মহারা সমুদ্র-বক্ষে ছুটিয়া যাইতেছে —এই সমস্ত দৃশ্য দেখিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি সুদূর দেশে গমন করিয়া দুঃসাহসিক কার্যের চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। তিনি ছিলেন স্বপ্নময় কল্পনার ভাবুক—যাঁহার একমাত্র ভাবনা সুদূর সমুদ্রপথে বিদেশে দুঃসাহসিক কার্যে আত্মনিয়োগ।

নাবিকবৃত্তি গ্রহণ

কলম্বস ১৪ বৎসর বয়সে নাবিকবৃত্তি গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে তিনি তাঁহার পিতার সহিত পৈতৃক ব্যবসায় পশম-বয়ন-কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। নাবিকবৃত্তি গ্রহণের পরও তিনি অনেক সময় গৃহে অতিবাহিত করিয়া পিতাকে সাহায্য করিতেন। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্বপ্রথম সমুদ্রযাত্রা করিয়া Chios নামক স্থানে গমন ও তথায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। এই স্থান তৎকালে জেনোয়ার অধীন ছিল। অবসর সময় তিনি মানচিত্র অঙ্কন, গণিত জ্যোতিষ, ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষায় অতিবাহিত করিতেন। মানচিত্র অঙ্কন, ও নাবিকের

নক্সা অঙ্কনে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন; প্রথম দূরতম সমুদ্রযাত্রার পূর্বে তিনি এই উপায়ে নিজের জীবিকা অর্জন করিতেন।

১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জেনোয়ার বাণিজ্য-জাহাজের সঙ্গে কলম্বস লিসবন, ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার প্রথম জীবনের সমুদ্রযাত্রার সঠিক বিবরণ সুলভ নহে।

লিসবনে বাসস্থান নির্ণয় ও বিবাহ

২৮ বৎসর বয়সে কলম্বস জেনোয়া পরিত্যাগ করিয়া ভৌগোলিক জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল লিসবন গমন করেন। পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার ও নাবিকের কার্যে দক্ষতা শীঘ্রই তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিল। তিনি বহু বৎসর পর্তুগালে বাস করেন।

কলম্বস অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। একদিন ধর্মমন্দিরে তিনি প্রিন্স হেনরী দি নেভিগেটরের একজন পরলোকগত জাহাজের কাপ্তেনের কন্যা Filippa Moñizকে দেখিয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি এই বালিকাকে ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে বিবাহ কল্লেন।

কলম্বসের বৈজ্ঞানিকজ্ঞান

এই সময় কলম্বস মেদীরার অদূরবর্তী পোর্টো স্যাণ্টো দ্বীপে কখনও কখনও বাস করিতেন কারণ তাঁহার শ্বশুর উক্ত দ্বীপের বংশানুক্রমিক অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালীন বৈজ্ঞানিকজ্ঞানলাভে কলম্বস এই সময় সফল-চেষ্ট হন। যখন বার্থোলোমিউ ডায়াজ তাঁহার ভ্রমণকাহিনী পর্তুগালের রাজার নিকট বর্ণনা করিতেছিলেন, তৎকালে কলম্বসও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

তাঁহার বৈজ্ঞানিক মতবাদ মধ্যযুগের অনুরূপ ছিল, তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকাবলীর মধ্যে কার্ডিনাল পিয়ার্র ডি এইলি প্রণীত ১৪১০ খৃষ্টাব্দে রচিত Imago Mendi নামক পুস্তক ছিল, তাহার একটি অংশে ছিল—"অ্যারিষ্টট্ল্ বলেন যে, স্পেনের দূরতম সীমা পূর্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে ভারতবর্ষের নিকটবর্তী—উভয়ের মধ্যবর্তী সমুদ্র সঙ্কীর্ণ। অধিকন্তু সেনেকা বলেন যে, এই সমুদ্র যদি বায়ু অনুকূল হয়, তবে কয়েক দিনে অতিক্রম করা যায়।" এইরূপ আরও অনেক অংশ ছিল যাহাতে অনুরূপ ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। কলম্বস যে এই পুস্তক শুধু পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা নহে তিনি উহার টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার এই টীকা সম্বলিত পুস্তক রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার "মার্কোপোলো" নামক পুস্তকও টীকা সহিত বর্তমান।

এই সমস্ত মতবাদ তৎকালীন মানচিত্রে স্থান পাইত। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে Behaim যে সুবৃহৎ গোলক নির্মাণ করেন তাহাতে দেখান হইয়াছিল যে, স্পেন ও চীন দেশের ব্যবধান ১৩০° অক্ষরেখা, পক্ষান্তরে উহা ২৩০° অক্ষরেখা হইবে। এই ভ্রমের কারণ যে, টলেমি এসিয়াকে বিস্তীর্ণ স্থান প্রদান করিয়াছেন। মার্কোপোলো বলিয়াছেন যে, জাপান চীন হইতে ১৫০০ মাইল পূর্বে অবস্থিত; ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, তৎকালীন আবিষ্কারকগণ কিরূপ ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতেন।

কলম্বস একাধিকবার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন এবং আবিষ্কার লইয়া কাপ্তেন, নাবিক প্রভৃতির সহিত আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানী ও অজ্ঞ সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনা চলিত। দ্বিতীয়তঃ Las Casas যে লিখিয়াছেন—আটলান্টিকের পরপারে অজ্ঞাত রাজ্য রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবারও কোন কারণ নাই, যেহেতু মানুষের হাতে বিচিত্রভাবে খোদিত কাষ্ঠখণ্ড সেণ্টভিনসেণ্ট অন্তরীপের পশ্চিমে ৪৫০ লীগ দূরে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে; সুবৃহৎ বেত্রখণ্ড পোর্টো স্যাণ্টোর উপকূলে আসিয়া লাগিয়াছিল ও অনুরূপ অভিজ্ঞতা প্রাপ্তির সংবাদকে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু পরিদৃষ্ট হয় না।

এই সমস্ত হইতে কলম্বস মনে মনে ধারণা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী বর্তুলাকার। সুতরাং পশ্চিমে জাহাজ চালনা করিয়া এসিয়া মহাদেশে উপনীত হওয়া সম্ভব।

অভিনব পরিকল্পনার বিকাশ

কলম্বস তাঁহার এই অভিনব মতবাদ লইয়া দিবারাত্রি চিন্তা করিতেন। অভিজ্ঞ নাবিকদিগের সহিত পরামর্শ করিতেন, ও ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞগণের সহিত তাঁহার পরিকল্পনার সফলতার সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করিতেন যে, তিনি পশ্চিমদিকে জাহাজ চালাইয়া ইণ্ডিজে উপনীত হইতে সমর্থ হইবেন কি না।

যতই তিনি স্বীয় পরিকল্পনার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল যে, এই পরিকল্পনা লইয়া পরীক্ষা করা দরকার। অনেকে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিল না, তবে তাহারা যখন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ঘুরিয়া উহার দক্ষিণতম অন্তরীপ অতিক্রম করত পূর্বাভিমুখে গমন করিয়া ইণ্ডিজের পথ আবিষ্কারে নিযুক্ত ছিল, কলম্বস তখন একাকী ঠিক বিপরীত পথের বিষয় মনে মনে পর্যালোচনা করিতেছিলেন।

যখনই সম্ভব হইত, কলম্বস সমুদ্রযাত্রা করিতেন। এইরূপ সমুদ্রযাত্রায় তিনি একবার একজন ইংরেজ নাবিকের সহিত একটি ইংল্যাণ্ডীয় বন্দরে সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রাচীন নাবিকের নিকট আটলান্টিক মহাসাগরের পরপারে অবস্থিত রহস্যময় দ্বীপ ও মহাদেশের বিবরণ শ্রবণ করেন; তিনি তৎকালীন মানচিত্র লইয়া গবেষণা শুরু করিলেন; প্রাচীন মতবাদও তিনি পূর্ব হইতেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; অবশেষে তিনি Tascanelli নামক একজন ফ্লোরেন্সবাসী জোতির্বিদের সহিত পরামর্শ করিলেন। এই ব্যক্তি তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দান করে এবং তাঁহার কার্যে অত্যধিক অনুরাগী হইয়াছিল।

সন্দেহ নিরসন

১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে বিবাহের পর কলম্বস তাঁহার শ্বশুরের ব্যবহৃত বহু মানচিত্র ও নক্সা প্রাপ্ত হইলেন। এইগুলি দ্বারা সন্দেহ তাঁহার মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া গেল। ফলে, অনতিবিলম্বে তিনি তাঁহাকে অভিযান পরিচালনায় অর্থসাহায্য করিবার জন্য ধনীর সন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন।

কলম্বস স্থির করিলেন—তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত পশ্চিম দিকে গমন করিয়া আটলান্টিকের পরপারে শস্য-শ্যামল দ্বীপরাজি আবিষ্কার করত ইণ্ডিজে উপনীত হইবেন। তাঁহার মতবাদে এই অটলবিশ্বাস কোনরূপ নৌবিদ্যার জ্ঞান হইতে উদ্ভূত হয় নাই। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী; কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভগবান্ তাঁহাকে নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া উহার অধিবাসীদিগকে সত্যধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। এই ধর্মবিশ্বাসই তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিত; যেহেতু তাহারা জীবনের সামান্য কার্যকেও ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত ছিল।

অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টায় কলম্বস

কলম্বস প্রথমে পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জনকে স্বীয় পরিকল্পনার অনুরাগী করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার কাউন্সিল কলম্বসের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিল। ফলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না।

অতঃপর তিনি ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে স্পেনে গমন করিয়া তাঁহার ভ্রাতার সহিত যোগদান করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা স্পেনে মানচিত্র অঙ্কন করিতেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি Cordoba নামক স্থানে রাজ্ঞী ইজাবেলার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজ্ঞী ইহার সত্য নির্ধারণের ভার এক রাজকীয় কমিশনের হস্তে অর্পণ করিলেন, কিন্তু কমিশন তাঁহার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিল। ইহাতে রাজ্ঞী ইজাবেলা কলম্বসকে একেবারে নিরাশ করিলেন না; কিন্তু তৎকালে স্পেন মুরদিগের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই হেতু রাজ্ঞী স্থির করিলেন যে, কোন নূতন কাজে হাত দিবার পক্ষে উহা সুসময় নহে।

হইয়াছিলেন, এই বিবরণ প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে। সন্ন্যাসিগণের সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া কলম্বস তাঁহাদের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কলম্বসের এই নবীন পরিকল্পনায় সন্ন্যাসিগণ পুলকিত হইলেন। তাঁহারা তিনি পুনরায় রাজা-রাণীর সহিত সাক্ষাতের চেষ্টায় গমন করিলে তাঁহার বালক পুত্রের ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন।

কলম্বস মঠ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন। দীর্ঘ সাত বৎসর তিনি বহুস্থানে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোথাও সফলমনোরথ হইতে পারিলেন না। এমন কি ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরীও তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন। কেহই বিশ্বাস করিল না যে, তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে পারে। যাহাদের সহিত তিনি আলোচনা করিয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া প্রকাশ্যে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়াছিল। বৃথা আশায় প্রতারিত, বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে তিনি ধৈর্যের শেষসীমায় উপনীত হইলেন, এবং চিরদিনের জন্য স্পেন হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পদব্রজে ফ্রান্সের দিকে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া পুত্রকে লইয়া যাইবার জন্য সাত বৎসর পরে La Rabidaর মঠে উপনীত হইলেন।

অভীষ্টসিদ্ধির পথে

সন্ন্যাসিগণ তখনও তাঁহার পরিকল্পনার অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা আন্তরিক সমবেদনা সহকারে কলম্বসের দুঃসাহসিক ভ্রমণকাহিনী শ্রবণ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে মঠে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ কলম্বস কয়েকদিন মঠে বিশ্রাম করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইতিমধ্যে মঠের অধ্যক্ষ Juan Perez রাজ্ঞী ইজাবেলাকে পত্র লিখিলেন। অধ্যক্ষ রাজ্ঞীর ধর্মগুরু ছিলেন। তৎকালে Granada বিজয় সম্পূর্ণ হওয়ায় এবং মুরেরা তাহাদের স্পেনের শেষ আশ্রয়স্থল হইতে বিতাড়িত হওয়ায় রাজ্ঞী তাঁহার ধর্মগুরুর বাণী অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিলেন। এই সুবর্ণসুযোগ হেলায় উপেক্ষা না করিতে তাঁহার ধর্মগুরু যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা রাজ্ঞী ইজাবেলার মর্ম স্পর্শ করিল; ফলে তিনি কলম্বসের সহিত দেখা করিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি কলম্বসের পরিকল্পনার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

কলম্বস জীবনের বহু সময় এই সুবর্ণসুযোগের অপেক্ষায় নষ্ট করিয়াছিলেন। এই সফলতায় উৎফুল্ল কলম্বস বুঝিতে পারিলেন না যে, উহা তাঁহার এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার পুরস্কার; ফলে তিনি কৃতজ্ঞহৃদয়ে La Rabidaর সন্ন্যাসিমণ্ডলীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে ছুটিলেন।

কলম্বস অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার সাফল্যবিষয়ে কৃতনিশ্চয় ছিলেন, সুতরাং তিনি প্রথম হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন যে, তিনি যে সমস্ত ধনরত্ন সঙ্গে আনিবেন তাহাতে তাঁহার অংশ থাকিবে। তিনি আরও দাবী করিলেন যে, যে সমস্ত দ্বীপ তিনি আবিষ্কার করিবেন, তিনি উহার কোন একটির শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবেন। প্রথমে তাঁহার এই দাবী অসমীচীন বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল; কিন্তু উহাতে যখন কলম্বস অবিলম্বে রাজসভা ত্যাগ করেন, তখন পুনরায় রাজ্ঞীর বিশেষ অনুরোধে দূত গিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনে। কলম্বস রাজসভায় প্রত্যাগত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সমস্ত দাবী মঞ্জুর হইয়াছে এবং তাঁহাকে Admiral of the Ocean উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

জাতীয় সংবাদ

সুবর্ণবণিক্ বালিকার কৃতিত্ব

সুবর্ণবণিক্ সমাজে সুপরিচিত দার্জিলিংনিবাসী শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যা কুমারী শ্রীমতী কনক দত্ত এই বৎসর দার্জিলিং "মহারাণী স্কুল" হইতে 'ষ্টার' ও একটি ১০৲ টাকার বৃত্তি পাইয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় "বেথুন কলেজে" আই এ পড়িতেছে।

আমরা কুমারী শ্রীমতী কনক দত্তের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ যুবকসঙ্ঘ

বস্ত্র-বিতরণ অনুষ্ঠান

গত ১৩ই আশ্বিন শুক্রবার মহাসপ্তমীর দিন অপরাহ্ণে স্বনামধন্য স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের ভবনে কলিকাতা সুবর্ণবণিক যুবকসঙ্ঘ কর্তৃক সুবর্ণবণিক্ সমাজের দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে পূজা উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বজাতিবৎসল জমিদার কুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র লাহা মহাশয়। সভায় সুবর্ণবণিক্ সঙ্ঘের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রারম্ভে সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বল্লভচাঁদ বড়াল সঙ্ঘের কার্যবিবরণী পাঠ করেন ও সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

এই সেবাব্রতের মহান্ আদর্শ মাথায় নিয়ে তিন বৎসর পূর্বে আমাদের সুবর্ণবণিক্ যুবক সঙ্ঘের উদ্বোধন হয়। সেদিন সামান্যই ছিল আমাদের প্রচেষ্টা, অতি ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ ছিল আমাদের শক্তি, তবু আমাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস ও সাহস এই সব গণ্ডী অতিক্রম করতে পেরেছিল এবং তারই উপর নির্ভর করে এই মহান্ ব্রতের ভার আমরা মাথায় তুলে নিয়েছিলুম।

এই ব্রত গ্রহণ করবার পর আমরা কতখানি সাফল্য লাভ করেছি তার কোন হিসাব নিকাশ আজ আমি আপনাদের কাছে দিতে পারবনা; সর্ব্বপ্রকার ফলাফলের বাসনা জয় করে আমরা যে সেবাকার্যের ভার নিয়েছি তার ফলাফলের কোন হিসাবও আমরা রাখি না।

তবে একটা কথা এইখানে উল্লেখ না করে আমরা কিছুতেই পারছি না; আমরা এই কার্য গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে যে কয়জন বিত্ত ও ব্যক্তিত্বশালী মহৎ ব্যক্তি আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে লোকচক্ষে বড় করেছেন, পদে পদে উৎসাহ ও সাহায্যের দ্বারা যাঁরা আমাদেরকে প্রতিকার্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন, আজ এই বস্ত্র-বিতরণী সভায় ঈশ্বরের কোন আশীর্বাদের

যোগ্যতা যদি আমরা লাভ করে থাকি তবে সে আশীর্বাদ সর্বাগ্রে তাঁদেরই মাথায় বর্ষিত হবে।

আনন্দময়ীর আগমনে যখন বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের বান ডেকে যায়, তখন সেই আনন্দের আস্বাদ যারা পেলে না দেশের সেই দুঃখী-কাঙালদের দুঃখ কি সব চেয়ে তীব্র হয়ে বেজে উঠে না? তখন কি তাদের সেই অব্যক্ত বেদনা আমাদের আনন্দের পরিপূর্ণতাকে পদে পদে ব্যাহত করে না? করে, এবং এই করাটাকে আপনারা সকলেই অনুভব করেন। তাই আমরা বিশেষ করে এই সময়টাকেই বেছে নিয়েছি, যথার্থ দুঃখের দিনে দুঃখীর পাশে এসে দাঁড়াতে, আমাদের আনন্দের দিনে আমাদের আনন্দের কিছু ভাগ আমাদের চিরবঞ্চিত ভাই-বোনদের দিতে। তাই এই পূজার দিনটিতে প্রতি বৎসর আমরা মিলিত হই আর এই বস্ত্রবিতরণ তারই একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

নিদারুণ শীতের দিনে যখন আমরা নানারূপ শীত বস্ত্রে শরীর গরম রেখে বাহিরের শীত উপভোগ করি তখনও আমাদের চোখে পড়ে সেই সব ভাই-বোনদের যাদের লজ্জা-নিবারণ করবার মতই বস্ত্র জোটে না, শীত-নিবারণ করা ত দূরের কথা! প্রচণ্ড উত্তরে হাওয়ায় তাদের সেই হিহি করে কাঁপুনী আমাদের বুকে ও কাঁপুনী ধরিয়ে দেয়। আমরা থাকতে পারি না তাই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি শীতের দিনে আবার আমরা একদিন মিলিত হব দরিদ্রনারায়ণের সেবায় তাদের মধ্যে কম্বল-বিতরণকে উপলক্ষ্য করে। আপনাদের যে সাহায্য ও উৎসাহের উপর নির্ভর করে আমরা এতদূর অগ্রসর হ'তে পেরেছি আমাদের আশা আছে তারই উপর নির্ভর করে আমরা আমাদের এই নূতন প্রচেষ্টাকে ততোধিক সাফল্যমণ্ডিত করতে পারব।

আমরা স্থির করেছি অলস দলভুক্তদেরকে কর্মের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে। সম্ভবতঃ Cooperative Society'র পন্থা ধরে আমরা এই কার্যে অগ্রসর হ'বার চেষ্টা করব।

প্রথম বৎসর আমরা মাত্র ৫০ জনকে বস্ত্র ও ছোট ছোট ছেলেদের জামা ও ফ্রক দিতে পেরেছিলুম। সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গত বৎসর প্রায় ১০০ তে দাঁড়ায়, এ বৎসর আমরা প্রায় দুইশত জনকে সাহায্য দান করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি এবং এ আশা আমাদের আছে যে আগামী বৎসরে ক্রমে ক্রমে এই সাহায্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা এত বেশীতে দাঁড়াবে যে শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় নবীনচাঁদ বড়াল মহাশয়ের এই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণেও আমরা তাদের স্থান সঙ্কুলান করিতে পারব না। ভগবান্ আমাদের সেই আশা ফলবতী করুন।"

সম্পাদকের বিবৃতি পাঠের পর শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মল্লিক এটর্নি বক্তৃতা প্রসঙ্গে সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বল্লভচাঁদ বড়াল মহাশয়ের এই অনুষ্ঠানে উৎসাহ ও উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সেন, বি এ ও শ্রীযুক্ত বাবু তিনকরি দে এম এ সুবর্ণবণিক্ সমাজের দরিদ্র জনগনের অভাব-মোচনে সঙ্ঘের এই অভিনব প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন।

তদনন্তর বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা প্রায় দুইশত ছিল ও তাহাদিগের মধ্যে বালক, বৃদ্ধ বিধবা প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় তাঁহার নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

"ভদ্র মহোদয়গণ,

আপনারা সম্পাদকের বিবৃতি শুনলেন, সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও কার্যবিবরণীও আপনারা শুনলেন। আমাদের সুবর্ণ-বণিক্ সম্প্রদায়ের কয়েকজন উৎসাহী যুবক যে অগ্রণী হ'য়ে একটা মহৎ সেবাকার্যে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে যে পথে আগিয়ে চলছে সেটা শুধু আমাদের গৌরবের কথা নয় মস্ত বড় একটা আশার কথা। 'দান' শব্দটি সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের কাছে নূতন কথা নয়। বাংলা দেশের ইতিহাসে সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায় এই দানের জন্য একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আজ তাই যখন আমি দেখলুম আমাদের কয়েকটি যুবক একটি সঙ্ঘ গঠন করে এই দানের মন্ত্রে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গড়ে তুলেছে তখন আনন্দে আমার সমস্ত বুকটা ভরে গেল।

সম্পাদক মশায় যখন বললেন তাঁদের শক্তির সীমা ক্ষুদ্র হ'লেও আত্মবিশ্বাস ও সাহসের উপর নির্ভর করে তাঁরা এত বড় একটা অসাধ্য-সাধনের ভার মাথায় তুলে নিয়েছেন তখন তাঁদের সাফল্যের উপর আমার একটু মাত্রও সন্দেহ রইলনা। সম্পাদক মহাশয় যখন আমাকে এই সভার নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করলেন তখন আমি একটু দ্বিধা বোধ করেছিলুম; দ্বিধাবোধ করেছিলুম এই ভেবে যে, এই বৃদ্ধ বয়সে যুবক-সঙ্ঘে আমি কি আমার যথাযোগ্য স্থান করে নিতে পারব। কিন্তু যখন শুনলুম এদের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা, যখন এদের প্রাণের ইচ্ছা, আশার কথা জানতে পারলুম, তখন আমারও প্রাণে যুবোজনোচিত আনন্দের স্পন্দন জেগে উঠল, আমি এখানে না এসে থাকতে পারলুম না।

আজ এই যুবকসঙ্ঘ যে কাজের আয়োজন করেছে তার মধ্যে বক্তৃতার স্থান নেই। বক্তৃতাও আমি করতে চাই না। আমি শুধু এই প্রার্থনা করি এই যুবকসঙ্ঘ নীরবে যে নিষ্কাম সেবার ব্রত গ্রহণ করেছে তার কল্যাণ সমগ্র সমাজ-দেহে ছড়িয়ে পড়ুক, তার প্রভাব আমাদের সকলের মিলিত চেষ্টাকে জনসেবা ও সমাজ-সেবার দিকে আগিয়ে নিয়ে যাক।

সম্পাদক মশায় তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, কেবল মাত্র দানের মধ্যেই তাদের কার্যাবলী নিবদ্ধ থাকবে না। সমাজের দুঃস্থ অথবা অলস ব্যক্তিদেরকে কাজের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করে তোলাও হ'বে তাদের অন্যতম কর্মপন্থা। এই উদ্দেশ্যে একটি Cooperative Society স্থাপন করার প্রস্তাব যে কত সাধু তা এক কথায় বলা যায় না। যুবক-সঙ্ঘের এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল হ'ক এই আমি কামনা করি।

এতদ্ভিন্ন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাকে সাহায্যকল্পে এই যুবকসঙ্ঘ যদি তাদের শক্তির কিয়দংশ প্রয়োগ করেন আমার মনে হয় তাতে তাঁদের শক্তির মোটেই অপপ্রয়োগ হ'বে না। সঙ্ঘ যদি এই সম্বন্ধে কোন কার্য্যকরী প্রস্তাব আনতে পারে তাহ'লে আমি তাঁদেরকে আমার যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারি।

দুঃস্থের সেবা মানব-জীবনের একটা মহৎ কাজ। সংসারে থেকে, সংসারের যাবতীয় কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করেও আমাদের যে সব অবসর মুহূর্তগুলো বাকী থাকে সেগুলিকে পরহিতার্থে দান করতে পারার চেয়ে বড় সার্থকতা আমাদের জীবনে আর কিছুই হ'তে পারে না।

অনেকের বিশ্বাস পরের উপকার করতে অনেক পয়সা থাকা দরকার, কিন্তু এ বিশ্বাস সত্য নয়। মনে সদিচ্ছা থাকলে এ সংসারে অনেক কিছু করা যায়। আমি চাই আপনারাও এই সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে আপনাদের সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হতে থাকুন। ভগবানই আপনাদেরকে সর্ববিধ সংঙ্গতি সংস্থান করে দেবেন।

আমার বক্তব্য শেষ করবার পূর্বে আমাকে আজ এই সভায় সভাপতি মনোনয়ন করার জন্যে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর সুবর্ণ-বণিক্ সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল এম এ, বি এল সঙ্ঘকে অভিনন্দিত করিয়া যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করা হয়। সঙ্ঘের অক্লান্ত কর্মী শ্রীমান্ গোপীনাথ নন্দী এম এ সভাপতি মহাশয়কে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং শ্রীমান্ বিশ্বনাথ নন্দী বি এল গৃহস্বামী ও কর্মবৎসল শ্রীযুক্ত বাবু কিশনচাঁদ বড়ালকে তাঁহার বাটী দেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ সঙ্ঘের পক্ষ হইতে জ্ঞাপন করেন। পরে সভা ভঙ্গ হয়।

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে ...

সুবর্ণবণিক সমাচার

২২শ বর্ষ | কার্তিক, ১৩৪৫ সাল | ১২শ সংখ্যা

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও নিম্নবঙ্গে জলপ্লাবন

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম্ বি এ এ, ও এ আর এফ

ভুল

ভুল সকলেই করে। কি ছোট কি বড় এমন লোক নাই যে ভুল করে না। সত্য বটে ভুলের উপরে কাহারও প্রভুত্ব নাই। No man has control upon mistakes. To err is human. এ সকলই সনাতন। কিন্তু ভুল যখন মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, তখন অন্যের পক্ষে মারাত্মক হইয়া থাকে, অন্যকে জীবন-মরণের সন্ধিস্থানে উপনীত করে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ এইরূপ একটি মারাত্মক ভুল, আরও ভুল নদীগর্ভে পাথর ফেলিয়া ভরাট করা এবং স্রোতো-পথ সঙ্কীর্ণ করা। ব্রিজ প্রস্তুত হইলে অভিজ্ঞ এঞ্জিনিয়ারগণ বলিয়াছিলেন, ব্রিজ ভাঙ্গিবেনা বটে, তবে ব্রিজের নিম্নে নদী থাকিবে কি না সন্দেহ।

পূর্বস্মৃতি

যখন হার্ডিঞ্জ ব্রিজ হয় নাই তখন বহুবার উত্তর বঙ্গে যাতায়াত করিয়াছি। দুই খানি ট্রেন পর পর কলিকাতা হইতে যাইত। এক খানি আসাম মেল, অন্য খানি দার্জিলিং মেল। এখনও দুই খানি ট্রেণ পর পর যায় তবে নাম ও সময় বদলাইয়া গিয়াছে। রাণাঘাট হইতে প্রায়ই আসাম মেলে যাইতাম, সারাঘাট হইতে দার্জিলিং মেলে। আসাম মেল ভেড়ামারা হইতে যতই পদ্মাতীরের দিকে অগ্রসর হইত, ততই এক নয়নাভিরাম দৃশ্য ফুটিয়া উঠিত। দামুকদিয়ায় পৌঁছিলে, মনে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হইত। যাত্রীদিগের কুলি কুলি রবে চীৎকার, মালপত্র নামাইবার হুড়াহুড়ি; নদীতীরের বড় বড়

হইতে বিস্ফারিত অগ্নি-জিহ্বা স্থল-জল দিনের ন্যায় আলোকিত করিত। ট্রেণের সমস্ত যাত্রী মালপত্র সহ ষ্টীমারে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, ডাকের ব্যাগগুলি ক্রমে ক্রমে ষ্টীমারে উঠিত। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই দার্জিলিং মেল আসিয়া পৌছিত। আসাম মেল অপেক্ষা ঐ ট্রেণের যাত্রী অধিক বিধায় চীৎকার হুড়াহুড়ি বেশী হইত। রাশি রাশি মেল ব্যাগ ষ্টীমারে স্তূপীকৃত হইত। অস্থিরতা কাটিয়া গেলে ষ্টীমার ধীরে ধীরে সারাঘাটের দিকে অগ্রসর হইত। কিছুক্ষণের জন্য জনতা শান্তভাব ধারণ করিত। একজন ষ্টীমারের সম্মুখ দিকে জল মাপিত, তাহার জল মাপার বিচিত্র ধ্বনি মন্দ লাগিত না। সারাঘাটে গিয়া আবার কিছুক্ষণ হুড়-হাঙ্গামার পরে প্রথমে দার্জিলিং মেল পরে আসাম মেল ছাড়িত। এ দিকের গাড়ীগুলি আকারে কিছু ছোট ছিল, এখনও দিনাজপুর রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে ছোটই আছে।

প্রত্যাবর্তনের সময়ে উত্তর বঙ্গ হইতে ট্রেণ দুইখানি ভোরে সারাঘাটে আসিয়া পৌছিত। উষার প্রথম আলোকে পদ্মার যে নয়নাভিরাম রূপ দেখিয়াছি, আজ বৃদ্ধ বয়সেও যেন তাহা চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে। সারাঘাটের পার হইতে দামুকদিয়ায় সজ্জিত ট্রেণগুলি ছেলেদের খেলিবার রেল গাড়ীর ন্যায় ছোট দেখাইত, মানুষগুলিও ছোট ছোট পুতুলের ন্যায় মনে হইত। সময়ে সময়ে পদ্মাগর্ভে রক্ত-রাগ-দ্যুতিঃ সূর্যোদয় দেখিতাম, সারাঘাটেই আমি জীবনে প্রথম অর্ধ-সূর্য দেখিয়াছিলাম।

হরিদয়াল নামে একজন মেলসর্টার ঐ স্থানে ষ্টীমারে কাজ করিতেন, আমার ভগ্নীপতির সহিত পূর্ব হইতে তাঁহার হৃদ্যতা ছিল, সেই সূত্রে আমার সহিতও বিশেষ সৌহার্দ্য হইয়াছিল। তিনি যতদিন ওখানে ছিলেন, আমাদের প্রতি বারের যাতায়াতের সময়ে অত্যন্ত যত্ন করিতেন। যতক্ষণ ডাক উঠিত আমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ডাক-তোলা দেখিতাম, ডাক-তোলার সঙ্গে সঙ্গে উভয় ট্রেণের ডাক পৃথক হইয়া যাইত। ডাকের কাজ শেষ হইলে হরিদয়াল বাবু আমাদিগকে একটি ক্যাবিনে লইয়া গিয়া কুশল প্রশ্নাদি অন্তে গল্প করিতেন, ইতি মধ্যে জনৈক পিয়ন খাবার লইয়া আসিত। তিনি আমাদিগকে না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে তাঁহাকে শেষবার সারাঘাটে দেখিয়াছিলাম, এই সুদীর্ঘকাল পরেও তাঁহার কথা মনে হওয়ায় শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তাঁহার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনমিত হইতেছে!

একবার জ্যৈষ্ঠের শেষে একাকী দিনাজপুর যাইতেছিলাম। রাণাঘাটে ট্রেণের যে কক্ষে উঠিলাম তাহাতে এক ভদ্রলোক ছিলেন। আমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তাঁহার সহিত বেশ আলাপ জমিয়া গেল। দামুকদিয়ায় নামিয়া আমি হরিদয়াল বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিলাম, তিনি অন্যত্র গেলেন। পরে সারাঘাটে দার্জিলিং মেলে উঠিবার সময়ে তাঁহার সহিত আবার একই কক্ষে উঠিলাম। ট্রেণ ছাড়িলে তিনি খাবার বাহির করিলেন, আমি ষ্টীমারে আহার করিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া কিছুই খাইলাম না, কিন্তু নিতান্ত অনুরোধে কলিকাতা হইতে আনিত বোম্বাই আম খাইতে হইল। অতঃপর দুজনে দুই বেঞ্চে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলাম। শেষ রাত্রে হিলির কাছাকাছি ঘুম ভাঙ্গিলে বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল। সন্ধ্যায় ও অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। আমার সহিত শীত বস্ত্র ছিল না, সেই ভদ্রলোক একখানি শীতবস্ত্র গায়ে দিতে ছিলেন। পথে অনেক সময়ে এই প্রকার লোক দেখা যায় যিনি স্বতঃই অপরের প্রতি স্নেহ-পরায়ণ হইয়া থাকেন, ইঁহারা নমস্য সন্দেহ নাই। পার্বতীপুরে রৌদ্র উঠিলে আর শীতবস্ত্রের প্রয়োজন হয় নাই। এই খানেই আমাদের ছাড়াছাড়ি, তিনি গেলেন দার্জিলিং, আমি গেলাম দিনাজপুর।

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ হওয়ায় দামুকদিয়া ও সারাঘাটের সে নয়নাভিরাম দৃশ্য যেন যাদুকরের মায়াদণ্ডস্পর্শে অন্তর্হিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে একটানা পাহাড়ে যাইবার মানসে একটানা রেলরোড প্রস্তুত করণ জন্য হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মিত হইল। হয়ত অন্যান্য কারণও ইহার অন্তরালে ছিল। পদ্মার অতল গর্ভে অগাধ টাকা ও পাথর ঢালা হইল; যে বিপুল জলরাশি তরল-তরঙ্গে সিন্ধুসঙ্গমে ছুটিত তাহা বাধা পাইল।

যৌবন-জল-তরঙ্গ

শৈলাধিরাজতনয়া গঙ্গা হিমবানের পাষাণ কারা ভেদ করিয়া যখন বাহির হইয়াছিলেন, তখন ধরিত্রী তাঁহার পতন-বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইলে স্বয়ং ধূর্জটিকে আসিতে হইয়াছিল। ইন্দ্র-হস্তী ঐরাবত তরঙ্গ-ভঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছিল। তুচ্ছ মানব খণ্ড প্রস্তরে তাঁহার তটভূমি সঙ্কীর্ণ ও গর্ভদেশ পরিপূরিত করিয়া তাঁহার বেগ প্রতিহত করিতে উদ্যত। মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত অসহায় একবারও তাহা চিন্তা করে না। 'মার্গাচলব্যতিকরা-কুলিতেব সিন্ধু' কতিপয় বৎসর 'ন যথৌ ন তস্থৌ' হইয়া ক্রোধে ক্ষোভে, শ্বসিয়া ফুপিয়া উঠিতেছিলেন। সে বার অন্য পথে প্রবাহিত হইবার চেষ্টা করায় হার্ডিঞ্জ ব্রিজের উপরের দিকে ছয় মাইল তটভূমি পাষাণস্তূপে সংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এবার? পদ্মার যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধ করিবে কে? উচ্ছ্বসিত বিপুল জলরাশি, নিম্ন বঙ্গ প্লাবিত করিয়া—জনপদ বিধ্বস্ত করিয়া, শস্যক্ষেত্র বিধৌত করিয়া—তর্ তর্, ছল্ ছল্ কল্ কল্ চলিয়াছে দয়িতের উদ্দেশে, কে উহার গতিরোধ করিতে পারে!

আর্যাবর্তের জল-প্রণালী

উত্তর ভারতের পূর্বদিকে সিকিম হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে শতদ্রু নদীর পূর্বদিক্‌বর্তী পার্বত্য ভূমি, এবং পশ্চিম বঙ্গের রাজমহল হইতে আরম্ভ করিয়া আরাবলী পর্বতমালার পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূ-খণ্ডের বৃষ্টির জল বাহির হইবার একমাত্র পথ নিম্ন বঙ্গের নদী-জালিকা (Net-work of the Gagetic Delta)। এতদ্ব্যতীত বিন্ধ্যাচল ও হিমাচলের উপরিভাগে যে বর্ষণ হয় সেই জলরাশি, পশ্চিম-দক্ষিণস্থ যমুনা ও তাহার উপনদী বাণগঙ্গা, বনস, চম্বল, সিন্ধ (সিন্ধু নহে), যাম্নি, বেতোয়া, কেন, টোন, কর্মনাশা ও শোণ এবং উত্তর হইতে কালীনদী, গোমতী, সরদা, সরযূ গর্গরা, রাপ্তি, ছোট গণ্ডক, বড় গণ্ডক, বাগমতি, তিলজঙ্গ, কুশি, মহানন্দা, পুনর্ভবা, অত্রেয়ী প্রভৃতি অসংখ্য নদ-নদী বাহিত হইয়া শৈলাধিরাজতনয়ার কলেবর পুষ্ট করে। ঐ বিপুল জলরাশি বাংলায়, মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তবর্তী ভাগীরথীর মোহানায় না আসা পর্যন্ত সমুদ্রে যাইবার পথ পায় না। এই স্থান হইতে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পর্যন্ত ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা এবং উহাদের শাখানদী চূর্ণী, ইছামতী, বেত্রবতী, কপোতাক্ষী, হরিহর, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা প্রভৃতির পথে সাগরে প্রবাহিত হয়। পদ্মাতীরস্থ নদীগুলির মোহানায় বালি জমিয়া এবং নদী পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রে আবাদ করার ফলে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহরের নদীগর্ভ ভরাট হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল নদী এখন আর পদ্মার বিপুল বারিরাশি বহন করিতে পারে না। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মাণ ও পদ্মার স্রোতো-পথ সঙ্কীর্ণ করিবার পূর্বে এই সকল জলপ্রণালী প্রবহমান করিবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, কিন্তু অপরিণামদর্শী মানব তাহা করে নাই।

প্রতিকারের উপায়

বন্যাবিধ্বস্ত জনপদের দুঃস্থ অধিবাসীদিগকে সাময়িক 'রিলিফ, দিলে কর্তব্য শেষ হইবে না, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ প্লাবনের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ইহার একমাত্র উপায় পূর্বোল্লিখিত নিম্ন বঙ্গের হাজা-মজা নদী-গুলির পঙ্কোদ্ধার করিয়া যাহাতে তাহারা পদ্মার বিপুল জলরাশি, দুকূল প্লাবিত না করিয়া, সাগরে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। একবার ভৈরব নদ কাটিবার প্রসঙ্গে কোন 'বিশ্বকর্মা' বলিয়াছিলেন,—"It is useless to fight with Nature." কিন্তু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও পদ্মারকূলে ও গর্ভে পাথর' বোঝাই করা কি Nature এর সহিত fight করা নয়?

মিনতি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ আঢ্য বিদ্যানিধি, সাহিত্যপুরাণরত্ন

আজি এল নিকাসের কাল ;
উড়াইয়া ধূলি সহ বিশ্বের জঞ্জাল
শুষ্কপত্র উড়ে চলে দিক্‌দিগন্তরে ;
পায়ে চলা তপ্ত পথ সভয়ে মর্মরে ;
অবসাদে ক্লান্ত দীর্ণ বনান্তের পাতা
অবনত করি নিজ মাথা
বিদায়ের জানাইছে তোমারে বন্দন ;
বিহগের কণ্ঠে জাগে করুণ ক্রন্দন ;
দিয়ে গেছ রোগশীর্ণ পাণ্ডুর অধরে হতাশার ছবি,
অঙ্গে তুমি করিয়াছ কবি ।
গঠিত সাম্রাজ্য হতে বিদূরিত করেছ সম্রাটে
ভিক্ষুকে বসায়ে রাজপাটে ;
করিয়াছ অসাধ্য সাধন—
করি তাই তোমারে বন্দন !
আজ তব বিদায়ের বেলা
ভেঙ্গে দিয়ে গর্বিতের মেলা
রেখে যাও তার স্থান যার যাহা নিশ্চিত নিশ্চয়—
বিঘোষিবে বিশ্ব তব জয় ।

রোগ-শোক নিয়ে যাও, নিয়ে যাও দৈন্য-হাহাকার
হিংসা-দ্বেষ চিত্তের আঁধার ;
অসম্মানে পদে দলি, দৈন্য, ঋণ করি সব নাশ
সুখ দাও, শান্তি দাও, নাশি অবিশ্বাস ;
স্বপদে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখি নিশি-প্রাতে
উন্নতি বর্ষণ কর মাথে ;
সবাকার প্রিয় কর, মনোমত দেহ বন্ধু-সাথী ;
অবজ্ঞা যে করে যেন তার প্রেমে কভু নাহি মাতি ।
বিদায়—বিদায় আজ হে বর্ষ বিদায় !
শান্তি, সুখ, স্বাস্থ্য, সাথী প্রার্থী আজ চায়
তোমার বিদায়কালে সকাশে তোমার ;
ভ্রষ্ট নাহি কোরো স্বাধিকার ;
হাসি দিয়ো ভাষা দিয়ো বিশ্বদেবে দিয়ো ভক্তিরাশি
বিমুগ্ধ যেমন হয় নববর্ষ দেখি হেথা আসি ।
তোমার দানের দীপ্তি তৃপ্তি যেন দেয় সর্বজনে
ধন্য যেন হয় কবি বিদায়ের ক্ষণে
তোমারে করিয়া নমস্কার ;—
হে বর্ষের শেষ-বেলা এই শুধু মিনতি আমার ।

বাল্যকাল সুখের সময়

শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ

ছেলে বেলায় বইয়ের পাতায় একদিন পড়েছিলাম—"বাল্যকাল সুখের সময়"। ঠিক যে সময় পড়েছিলাম তখন মনে হয়েছিল—বাপ্‌রে ! কি ছেলে-ভোলান ফন্দি ! একটা নিদারুণ মিথ্যাকে সত্যের খাপে পুরে কচিমন বালকের নিষ্কলুষ বইয়ের পাতায় মুদ্রিত করে ছেড়েছেন লেখক। এত বড় মিথ্যা আর নেই ! একটু প্রাণভরে খেলতে পাই না, সারাদিন পড়া আর পড়া। একটু যদি বেশী খেলে ফেলেছি, অমনি বকুনীর অন্ত নেই। খেলার ছোট ঘরখানি দাদা এসে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। আঁক কষতে ভুল করলে গুরুমশাই পেটে কুলের গুঁতো দিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। কুল গাছে চড়ে স্বেচ্ছানুরূপ কুল খাবার উপায় নেই, খুড়ামহাশয়ের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি বৃক্ষপত্র ভেদ করে

সেখানেও উপনীত হয়। প্রাণভরে সাঁতার কাটবো, সেখানেও পিসীমা দাঁড়িয়ে। গর্তের মধ্যে হাতের কনুই পর্যন্ত চালিয়ে গাঙ-শালিকের বাচ্ছা ধরতে উদ্যত হয়েছি হঠাৎ পিঠের উপর পটাস করে বেত্রাঘাত। চেয়ে দেখি কাকা বাপ্‌রে! মামাতো ভাই চাচাতো ভাই যেখান থেকে যিনিই আসেন তাঁর দাপটেই অস্থির। মাত্র দিন সাতেক হোল এসেছেন, তাঁরও এই ক্ষুদ্র প্রাণীটিকে লক্ষ্য করে সর্দারীর অন্ত নেই। দূরে বাব্‌লা বনে বসে আম ছাড়াচ্ছি, অকস্মাৎ গোবিন্দ দাদা গিয়ে লাগালে ধমক—"গুচ্‌চারখানেক টক্ খেয়ে মরবি নাকি! এই ম্যালেরিয়ার সময়!" হায়রে সুখের সময়! জল স্থল স্বর্গমর্ত্য ব্যেপে আমার শিশুত্বকে ঘিরে বড়ত্বের এই খবরদারী এবং বাহাদুরী সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। যমদূতের মত পাহারা দিয়ে আছে—একচুল এদিক্ ওদিক্ হবার জো নেই। শাসনের চাপে স্বাধীনতার শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু ঘটছে অহর্নিশি অসংখ্য-বার। পেট-পূরে বাদাম খাবার পয়সা নেই। রাত্রি জেগে যাত্রাগান শুনবার অনুমতির জন্য বদ্যিনাথের দরজায় ক্যানসারের রোগীর মত ধন্না দিয়ে থাকতে হয়। নেমন্তন্ন খেতে যাবার একটা আদ্দীর পাঞ্জাবী নেই। তবে? তবে সুখ কোথায়? কিসের মিথ্যামোহে ছোট ছোট ছেলেদেরকে উন্মত্ত করে ছাড়তে চাও তোমরা কবিরা, লেখকেরা? একটা সংশয়-লেশহীন মিথ্যাকে সত্যের সাজ পরিয়ে ছেলে ভোলাতে চাও? মিথ্যা—মিথ্যা—পরম মিথ্যা! বাল্যকাল দুঃখের আকর। একবার এই বাল্যের ধাক্কা কাটিয়ে যৌবনের রত্নকোঠায় উঠতে পারলে হয়; দেখা যাবে সুখ কোথায় থাকে। বাল্য জীবনের সব চেয়ে হীন এবং দুর্বল অবস্থা। "বাল্যকাল সুখের সময়, বাল্যকাল সুখের সময়"—ইচ্ছে হয় বইয়ের পাতা ছিঁড়ে উপড়ে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দি।

এমনি করে রূঢ় জীবনে এবং কড়া শাসনে শৈশব অতিবাহিত করে কৈশোরে পৌঁছান গেল। এও আর এক উচাটন অবস্থা। অর্ধেক স্বাধীনতা শৃঙ্খলিত করলাম নিজে, অর্ধেক ফিরতে থাকে বড়র শাসনে পেষণে দুম্‌ড়িয়ে দুম্‌ড়িয়ে। আগে কচি আম জারিয়ে খেতে ভাল লাগতো, এখন অসংখ্য মুরগীর কোরমা বানিয়ে উদরসাৎ করতে ইচ্ছে যায়। ফুটবলের দলে মিশে গ্রাম ছেড়ে তিন দিন শহরে কাটিয়ে ফেরার পথে মনে হয়—একি করলাম! পড়া বাকি পড়লো, স্কুল কামাই হোল, আবার গোটা চারেক গোলও খেয়ে ফিরলাম। বাড়ী আসতেই বাবা বলে ওঠেন—"ওরে শুয়ার, বেরো বাড়ী থেকে।" পিসী বলেন—"আহা ষাট্ ষাট্। বাছা আমার মুখে জল দেয়নি; ও কথা বলতে নেই।" গ্রামের সখের থিয়েটারে পথের শেষের নলিনীর ভূমিকায় বাহাদুরীর সাথে মেডেল নিয়ে আসি, অঙ্কের পরীক্ষায় ফেল হয়ে ক্লাসের সঙ্গে সম্পর্ক পাকা করি। নিজের মনের মধ্যে কে যেন দাঁড়কাকের মত ঠোক্‌রাতে থাকে। বাড়ী ফিরতেই দাদা বলে ওঠেন—"মা! সখের নলিনী এসেছে দুধের বাটী সাজাও। সিলভার মেডালিষ্ট।" এই টিটকারি কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে; সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। হৃদয়ের মধ্যে কোন্‌খানে যেন ঘা ছিল দাদা তার উপর নুনের ছিটে দেয়। আর বাড়ী থাকা চলে না। কত সহ্য করা যায়? বাল্যসখা ভুণ্ডুল বড়ালের বাড়ী লুকিয়ে সমস্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যার আঁধারে বাড়ী ফেরো-ফেরো করছি, এমন সময় দেখি ঊনবিংশ শতাব্দীর জমিদারের গোমস্তার মত চক্ষু লাল করে দাদা এসে হাজির, কান ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চলে এবং তদবস্থায় একেবারে দনুজ-দলন মূর্তিতে মহাপরাক্রমে আমার পরাজয়ের চিহ্নটাকে সুস্পষ্ট সম্মুখে রেখে ওঠে গিয়ে গৃহ-প্রাঙ্গণে। পিসীমা দৌড়ে এসে দাদাকে বাক্যবাণে বিধ্বস্ত করে বলেন—"তোর আক্কেলটা কিরে গোরা? ও সমস্ত দিন কিছু খায়নি, আর তুই একেবারে কান ধরে এনে হাজির করলি? প্রাণে একটু দয়ামায়া নেই, দাদা কান একেবারে লাল করে ফেলেছিস হতভাগা!" হতভাগা ঐ দাদা না আমি—এই কৈশোরওয়ালা? নাঃ এর চেয়ে ছেলেবেলায় ছিলাম ভাল। আর না হয় ঐ দাদার মত বড় না হতে পারলে আর নিস্তার নেই। দাদা এক মাতব্বর, খুড়ো এক শাসক, ভজা চাকর পর্যন্ত নালিশের

ভয় দেখায়। এমনি সব অসুবিধা-বিশৃঙ্খলা এবং বিপর্যস্ত অবস্থা এবং বেদনার মাঝে কৈশোর একদিন কোনফাঁকে যৌবনের কোঠায় পৌছিয়ে দিয়ে তার বিদায়ের বাঁশী বাজায়।

যৌবনের অরণ্য; সে যে আরও বিপদসঙ্কুল। একদিকে তার নন্দন সদৃশ পুষ্পোদ্যান—আর একদিকে বিশাল শাল বন। লোভ মোহ, মদ মাৎষর্য প্রভৃতি বাঘ ভালুক প্রভৃতি শ্বাপদের দৌর্দণ্ড উৎপাতের অন্ত নেই। স্বাধীনতা বাড়ে—বড় হয়েছি! গোবিন্দ দাদাকে মানিনে, পিসীমার শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছি! ফণ্ডে কাকাকে গ্রাহ্য করতে আমার দায় পড়েছে! কিন্তু কলেজে পড়ি। পড়া যে অনেক, কাজেই খাটুনীও অনেক। যতটা সময় বৃথা কাটাই মনের মধ্যে আপনি এসে তার খোঁচা লাগে। থিয়েটারে যাই, বায়স্কোপ দেখি—মন খারাপ করে ফিরি —নায়িকার আকস্মিক আত্মহত্যা মনের মধ্যে আড় হয়ে বিঁধতে থাকে। পড়তে বসি, মনে পড়ে নরমাশিয়ারার, গ্রেটাগার্বো, মার্লিন ডায়েট্রিক্, মনে পড়ে বেলা লাগুচি। খেলা দেখে ফেরার পথে ঐ যে নদীর ওপারে একটা তরুণীর চেহারা ছবির মত ভেসে উঠেছিল, পড়তে বসে তারই ইম্প্রেশনটা বিদ্যুৎগতিতে একবার মনের এ কোণ থেকে ওকোণ পর্যন্ত ঝিলিক মেরে যায়। কি করি, না পারি পড়ায় মন বসাতে, না পারি গার্বোর ছবি আশ মিটিয়ে দেখতে। একদিকে সুনাম, আর একদিকে চক্ষুতৃপ্তিকর, ইন্দ্রিয়-আরাম। এই দুয়ের মধ্যিখানে আমাকে ধরে রেখে কে যেন শৈশবের দোলনার মত দোল খাওয়াতে থাকে; অবস্থা হয় কুল রাখি কি শ্যাম রাখি, শ্যাম রাখি কি কুল ইত্যাদি। এইবার বাল্যের প্রতি মমতার রেশ মর্মের মধ্যে চুলবুলিয়ে ওঠে। হায় বাল্য, হায়রে শৈশব!

তারপর পরীক্ষা পাশ, তারপর আর একটা, তারপর আরও একটা—এমনি করে গোটাতিনচার পরীক্ষার পরই চাকুরি চাই। চাকুরির পর্ব সে আর এক 'বিরাট্-পর্ব'। কোনদিকে মাথা গলানর স্থান দেই। বেকার অবস্থায় কতদিন কাটান যায়! লোকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না। নিজের অসোয়াস্তিরও পার নেই। চাকুরি না হলেই বা কি, বিবাহের প্রয়োজনীয়তা খুবই—নচেৎ চরিত্র নষ্ট হতে পারে। চাকুরির অজুহাত বয়স শুনবে কেন? সে তো তার নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট দাবী জানাবেই। তাই মনে হয় বাল্যেই ছিলাম ভাল। বাদাম ভাজা দুচার পয়সা আজ জুটেছে বটে, কিন্তু খাবার সে স্বাদ কমে গেছে। যাত্রাদলের পোষাক-সর্বস্ব রাজার চীৎকার গায়ে জ্বালা ধরায়, কিন্তু বসে বসে তো আর দিন কাটেনা। শহর চষেও চাকুরি মেলে না; উপায় করতে পারিনে শুধু হাঁকপাকানী বেড়েই চলে। এতো আর এক উৎক্ষিপ্ত অবস্থা। শেষে বিয়েও একদিন হয় এবং চাকুরিও মেলে কিন্তু মন ভরে না। এদিক্ কুলোতে ওদিকে আটে না, ওদিকে মেটাতে, এদিকের ক্ষুধা বিশ্বগ্রাস করতে চায়। কাজেই এই চাকুরি ভাল না, কিংশুক বাবুর চাকরিটি বেশ। দু'পয়সা উপরি আছে। একি একটা চাকরি? এর চেয়ে আইন পড়লে ভাল ছিল, বি সি এস পরীক্ষাটা না দেওয়া ভুল হয়েছে। ইংরাজীর এম্ এ টা দেওয়া ঠিক হয়নি, ইতিহাসের এম্ এ-ই ভাল ছিল। আমার ভাল না, ওর ভাল; ওর ভাল না তার ভাল, তার ভাল না শ্যামের ভাল, শ্যামের ভাল না যদুর ভাল ইত্যাদি। কর্পোরেশনের চাকুরি ভাল নয়, রেলওয়ে ভাল; নাঃ, রেলওয়ে ভাল মনে হচ্ছে না শেষে পোর্টকমিশনার ভাল; কি যে ভাল আর কি যে ভাল নয় ঠিক তো বোঝা গেল না। এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় ওইটাই ভাল; আবার ওইখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় এইটাই ভাল।

তবে কি বাল্যই ভাল? হাঁ তাই যেন মনে হয়; কোন দায়িত্ব নেই, তাড়াহুড়ো নেই। চাকুরির চেষ্টা নেই। শুধু খাও আর খেলো আর নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোও। "বাল্যকাল সুখের সময়"—এইবার কতকটা হৃদয়ঙ্গম হতে আরম্ভ হয়েছে।

ওকালতিটা পাশ করে উকিল হলেই ঠিক হবে। কত ইচ্ছার গলা টিপে আর মারা যায়? শুধু কি আমার ইচ্ছা, স্ত্রীর ইচ্ছা, মেয়ের ইচ্ছা, ছেলের ইচ্ছা, আমার

ইচ্ছা, বাবার ইচ্ছা, মার ইচ্ছা—হায় রে যৌবন, এই কি তোমার সেই মনোহারিণী মূর্তি আর প্রলোভন আমাকে শৈশব থেকে ডেকে এনে তোমার কোঠায় পৌঁছে দেবার জন্য অন্তরের মধ্যে ব্যাকুলতার ঢেউ বহিয়ে দিয়েছিল? কোথায় তোমার সেই উদ্দাম গতিবেগ; কোথায় সেই উদাত্ত সঙ্গীতমুখর চলার ছন্দগতি!

একি মহামুস্কিল, উকালতি প্র্যাকটিস্ করেও তো সুস্থির হতে পারলাম না। ঐ যে আশেপাশের ব্যারিষ্টার, জজগুলো ওদের ষ্টাইল তো অনেক ভাল। মোটর গাড়ী আছে, ডিনার হলে খায়। পাঁচক আছে, বাবুর্চি আছে, কি আছে আর কি নেই। মোটর গাড়ী তো না হয় একখানি হয়েছে, কিন্তু এই ফোর্ডগাড়ী নিয়ে কি কাউন্সিলের মন্ত্রীপদের প্রার্থী হওয়া চলে, হাডসন আর না হয় ষ্টুডিবেকার। আর এই এক সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ী। হরিবাবু কিনেছেন আটহাজার দিয়ে আনকোরা নতুন ঝকঝকে গাড়ী। কালীবাবু ডিষ্ট্রিক্‌ট্‌ বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে গেল আর আমি একটা লোক্যাল বোর্ডেও দাঁড়াতে পারলাম না। নিতাই বাবু বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য পদে নির্বাচিত হলেন আর আমি কর্পোরেশনেই ঠাঁই পেলাম না। হায় রে দুঃখ! হায় রে আমার ওকালতি। নাঃ অদৃষ্ট, অদৃষ্ট! অদৃষ্টের বাইরে একপাও চলবার উপায় নেই!

এমনি অস্থিরতা এবং অসোয়াস্তির মধ্য দিয়েই যৌবনও একদিন অকস্মাৎ তার মস্ত বোচকাটা কাঁধে ফেলে সরে পড়ে; প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখার উপর দাঁড়িয়ে দেখি—নাঃ এও তো সুবিধে লাগছে না। বাল্যই যেন ভাল ছিল রে। সমস্ত দুঃখ-বেদনার মাঝেও নিঝঞ্ঝাট দাম্পত্যজীবনের রঙ্গীন পটভূমির উপর জীবনের স্বপ্ন রচনা করতাম যে যৌবনজীবনে, সেই বা আজ কোথায়? চারদিক্ একেবারে ঠাসা, দায়িত্বের এবং কর্তব্যের পাষাণ-চাপ। সংসার-পরিচালনায় এক অতি অদ্ভুত ধোলাটে আঁধার আমাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলতে চায়। এখানেও সেই ভাল লাগে না। সেই ওটা ভাল এটা নয় ইত্যাদি অবস্থা। যেন যৌবনই ভাল ছিল, তার চেয়ে ভাল ছিল বাল্য। তার চেয়ে ভাল ছিল মাতৃজঠর। কোন চিন্তা ছিল না, রাত্রিদিন হাঁকপাকানী ছিল না, শুধু ঘুম আর ঘুম—কুম্ভকর্ণের পর্যন্ত লজ্জা আসে—পুরো দশ মাস!

তারপর একদিন ঠিক সময় এলো বৃদ্ধত্ব। সবই যেন একের পর আর সাজান রয়েছে কিন্তু শান্তি তো কোথাও মেলে না। এ আর এক ভীষণ অবস্থা। সবই নিরুৎসাহময়। গতি নেই, চাঞ্চল্য নেই, চাওয়া নেই, পাওয়া নেই, লেনা নেই, দেনা নেই; একটা বিরাট্ স্থৈর্যের অবস্থা। কিন্তু ঠিক তা নয়। সৃজন-শক্তি সবই থেমেছে বটে কিন্তু আরাম নেই, সোয়াস্তি নেই—সেই "কি হোল, কি গেল" অবস্থা। কিছুই তো এ জীবনে করলাম না। ছেলেগুলোর একটা হিল্লে হোল না। রমেশের চাকুরি নেই। সুধীরের বিয়েতে মোটে পাঁচশো দিতে চায় কিন্তু পরকাল তাও যে যায়। দিন তো ফুরোলো, সব যে শেষ হয়ে যায়। হা ভগবান্, হা হরি, হা পতিতপাবনি গঙ্গে। উপায় কর মা জগত্তারিণী। কিন্তু সে তো হল, পরকালের উপায় তো তুমি করবে মা, এদিকে যে ছোটমেয়েটাকে এখনও পাত্রস্থা করতে পারি নি। তবে এক কথা সে তো এখন দুচার মাস আরও সবুর করতেও পারে, মোহনপুরের জমিদারীটা সস্তাদামে বিকোচ্ছে, পোষ্টাফিসের টাকাটা তুলে বরঞ্চ কিনে ফেলি ওর ফালিখানেক। দেখা যাক বগলা বাড়ুয্যের চেয়ে যদি তেজারতিটা বাড়াতে পারি। ব্যাটা ভারি পাজি। দোল দুর্গোৎসব, পুষ্করিণী-উৎসর্গ-পৌষপার্বণ এ সব না করতে পারছি যতদিন, ততদিন কি একটা মানুষ? লোকে মান্য-খাতির করবে কেন? কি দেখে? পরকালটাও তো আবার—শুধু পার্থিব বস্তুর মোহে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছটফট্ করে মরবো? একঘেয়ে জীবন! কোন বৈচিত্র্য নেই; নূতনত্ব নেই; কোথাও কোন গতির তীব্রতা নেই, ভাঙাগড়া নেই। সবই যেন স্তব্ধ—আমারই মত অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে চক্ষু বুজে পড়ে আছে। সব চেয়ে যে বড় সত্য মৃত্যু—হয়ত হাতের কাছে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। কোন

হায় রে বাল্য! হায়রে আমার স্বপ্নময় জীবনের সাধের রক্তিম প্রভাত! পিসীমার স্নেহ-চক্ষুর নীচে কি নিরুদ্বেগেই না দিন কাটিয়ে দিয়েছি। ফণে কাকার ঘুসি খেয়েও কতবার সেই আমতলায় ছুটে গেছি। সেই ঘুসির বেদনা তো গায়ের উপরই সেকেণ্ড দুই থেকে কোথায় মিলিয়ে গেছে। এমন করে চামড়া ভেদ করে বুকের মাঝে গিয়ে হুল ফোটাতে তো কোন বেদনা পারতো না। এমন করে রক্ত শুষে খাবার ক্ষমতা তো কারুর ছিল না।

এইটুকু আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে মানুষ তার নিজের যে কোন অবস্থাতেই সুখী নয়, স্থির নয়, উদ্বেগহীন নয়; সব অবস্থাতেই এই চিরস্তুপমান মনের কোনখানে যেন একটা না-পাওয়ার বেদনা, একটা অস্বস্তির কারুণ্য লেগেই আছে। তাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার সামগ্রী বাইরে নেই, জীবনের অবস্থা বিশেষের মধ্যে নেই, বয়সের মধ্যে নেই, আছে মনের শক্তির মধ্যে। তার চেয়েও বড় সত্য এই যে, যে বস্তু সুলভ তার উপর মানুষের কত অবজ্ঞা তার আর সীমাপরিসীমা নেই। আবার যা দুর্লভ তার জন্যও মানুষের তেমনি আকুলি-বিকুলির অন্ত নেই। সেই দুর্লভই যে দিন সুলভ হয়ে যায় তাকে ঠেলে দিয়ে আর এক না-পাওয়া বস্তুর জন্যই মানুষের হৃদয় সহস্র হস্ত প্রসারণ করে ছুটতে চায়—এই তার প্রবৃত্তি, এই তার অন্তরের আসল চেহারা।

মানুষের সুখ বা আনন্দ—সে বাইরের বস্তুর মধ্যে নেই, বয়সের ছোটবড়র মধ্যে নেই, আছে মনের মধ্যে, অবশ্য যদি খুঁজে বের করতে পারা যায়।

যে-বাল্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় দিগন্ত মুখরিত সেই বাল্যকে চিনলাম কখন? চিনলাম যখন বহুদূরে ফেলে এসেছি তাকে। দূরপ্রান্তের সেই স্বপ্নময় ছবির দিকে চেয়ে বসে একে একে বালক-কালের কত কথাই না স্মরণে উদয় হতে থাকে! তখনই তো টের পাই :—

"সেই মনে পড়ে জৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম।
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।

ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাবো সে জীবন?"
এই তো মানব-মনের আসল অবস্থা। যদি বালক বাল্যের সুখ না বুঝলো, যদি যুবক যৌবনের শ্রেষ্ঠত্ব না হৃদয়ঙ্গম করলো, বৃদ্ধ যদি বৃদ্ধত্বের মহিমা না অনুধাবন করতে পারে, তাহলে সেই সুখ, সেই শ্রেষ্ঠত্ব, সেই মহিমা কতখানি মূল্য দিয়ে যেতে পারে সেও তো ভেবে দেখার বিষয়। যার ভালো সে যদি বোঝে, যখনকার ভালো তখনি যদি বুঝি তবেই তো তার দাম। সেই ভালো অবস্থা থেকে দূরে সরে গিয়ে তার জন্যে চোখের জল ফেলে বা পঞ্চমুখে তার মহিমা প্রচার করে কোনই লাভ নেই—সে শুধু অনুশোচনা মাত্র।

মানুষ ছয়ঘোড়ার রথে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে। অতগুলি বলবান অশ্বের রাশ টেনে ধরে চলেছে একটি মাত্র বল্গা—মন। মনের লাগামে যদি ইন্দ্রিয়াশ্বগুলি সংযত করে ঠিক ঠিক তার অন্তরের মানবোচিত শুভ আকাঙ্ক্ষার পথে মানুষ চলতে পারে, তাহলে বাল্যের জন্য হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতেই হয় না, জীবনের যেকোন অবস্থাই অমিত সম্ভোগ নিয়ে আসতে পারে। যে শৈশবকে কণ্ডুয়ন করে আকাশমার্গে তুলে দিতে লেশমাত্র কুণ্ঠা নেই, বর্তমান জগতের মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা তো শিশুর সব চেয়ে বড়গুণ সেই আত্মভোলা ভাব এবং সরলতার উপরই আঘাত করেছেন সর্বাগ্রে। তাঁরা তার মধ্যে খুঁজে সেগুলি পাচ্ছেন না। তাঁরা তো সোজা ভাষায় বল্‌ছেন শিশু আত্মসর্বস্ব, সে হিংসার পরিপূর্ণ প্রতিমূর্তি। সে বিশ্বকে ভেঙ্গেচুরে আপনার মুখগহ্বরে পূরে দিতে চায়। বহুপূর্বের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমানের চিন্তাধারার কিছু বিরোধ ঘটেছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রমুখ যে বড় বড় মনীষী একদিন উচ্চরবে ঘোষণা করেছিলেন মানুষ যদি প্রকৃতির সংস্পর্শ থেকে নিজকে দূরে এনে, সভ্যজগতের মধ্যে ফেলে প্রকৃতিরই সঙ্গে একটা দারুণ রকম বিদ্রোহ ঘোষণা না করে দিতো, তার উপরেই যদি আত্মসমর্পণ করে পড়ে থাকতো, তাহলে তাকে এত কষ্ট ভোগ করতে হোত না; অপর পক্ষে সুন্দর সুসমঞ্জস শিক্ষার

বর্তমানের চিন্তারত চিত্ত একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছেন এই বস্তুকেই। বর্তমানের ভাবুক বলছেন মানুষকে যদি না সভ্যজগতের মধ্যে টেনে এনে তার গায়ে মাথায় আচ্ছা করে সভ্যতার পালিশ লাগান যেতো, তার মনটাকে প্রতিনিয়ত যদি না শিক্ষার আলোকে ভদ্রতার জীরকরসে জারিয়ে নেওয়া যেতো তাহলে সে হোত পুরামাত্রায় একটি পশু। শিশু-মানবের জন্মগত অঙ্কুরিত প্রবৃত্তিনিচয়ের মধ্যে স্বর্গীয় সুষমা এবং দেবোপম উৎকর্ষের চেয়ে অধোমুখী প্ররোচনাই বেশী। তাকে রাস্তা দেখিয়ে দেখিয়ে বেত্রাঘাত করে করে সুপ্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্যের পথে পরিচালিত করতে হয়, তবেই সে খাঁটি মানুষ নামের যোগ্যতা অর্জন করে। শিশু কেবল নিজেকেই চেনে; তার সমগ্র জগতে তার নিজকে ঘিরে তার স্বার্থ এবং দম্ভের কাছে কংস রাজাও হার মানে।

পক্ষপাতশূন্য হয়ে ধীর ভাবে বিবেচনা করে দেখতে গেলে আধুনিক পর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ এই উপরোক্ত অভিমত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই যদি মানতে হয়, এবং মানব-শিশুর স্বতন্ত্র অস্পষ্ট প্রভৃতিগুলিকে সভ্যতার উপদেশানুক্রমে, কৃষ্টির এবং কষ্টের সাহায্যে, আপনার মানসিক শক্তির দ্বারাই যদি উন্নতির পথে পরিচালিত করতে হয়, জীবনের সাফল্য অর্জন করতে হয় এবং সত্যিকারের মানুষ হিসাবে জগতের সম্মুখে দাঁড় করাতে হয় নিজেকে তাহলে শিশুর চেয়ে একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকের অবস্থাকেই ঢের বেশী হিংসার বস্তু বলে ধরে নেওয়াতে আপত্তি নেই। শিশুর চিন্তাপ্রসূত নিদারুণ অনুভূতিগুলি যেমন নেই, তার চিন্তাপ্রসূত সুন্দর অনুভূতিও তেমনি নেই। তাই বলতে চাই যে "বাল্য কালই সুখের সময়" "বাল্যকালই সুখের সময়" বলে চেঁচাবার কিছুই কারণ নেই। জীবনের যে কোন অবস্থায় এবং যেকোন সময় প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে পারা যায় যদি আসল শক্তি নিয়ে সুখ বাইরের জগতে না খুঁজে অন্তর্জগতে খুঁজে দেখার মত চোখ থাকে। সুখ অন্তরে, বাইরে নয়, তা ছাড়া সব অবস্থাতে এবং সব পাওয়ার মধ্যেই তো দেখা যায়:—

> "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
> যাহা পাই তাহা চাই না।"

আমার একমাত্র কথা হচ্ছে যে যার ভালো সে যদি না বুঝলো তো তার দাম কি? "বাল্যকাল সুখের সময়" বুঝলে কে? ঘা খাওয়া যুবক, মৃত্যুর দ্বারস্থ বৃদ্ধ। তাই তো বলি এ শুধু কথার কথা, ব্যথার বুলি, অনুযোগের ভাষা।

ফুলের মত হ'ত যদি আমার মন

শ্রীনদীয়ালাল শীল

(১)

ফুলের মত হ'ত যদি আমার মন—
সুখসাগরে সদাই আমি রইতাম নিমগন।
ধরার মাঝে বুকটি খুলে,
হাওয়ার সাথে হেলে দুলে,
বিশ্বমাঝে সবার সাথে করতাম আলাপন—
ফুলের মত হ'ত যদি আমার মন।

(২)

দখিণ বায়ুর সাথে আমি করতাম মিতালি,
কোকিল তাহার কণ্ঠসুধা কর্ণে দিত ঢালি।
বর্ষাশেষের ভরানদীর কুলুকুলু গান
আমার প্রাণে জাগিয়ে দিত হাজার বীণার তান।
বিশ্বে আমি চাইতাম না'ক যত মান ধন—
ফুলের মত হ'ত যদি আমার মন।

(৩)

অর্ঘ্য হয়ে লুটাতাম আমি বিভুর চরণে ;
হেসে আমি উড়িয়ে দিতাম জীবন-মরণে,
কুমুদ হয়ে ফুটতাম আমি বিশ্ব-পারাবারে,
সৌরভেতে ভরিয়ে দিতাম আমার চারিধারে।
তা হ'লে ত সদাই আমি হাসতাম্ অনুক্ষণ—
ফুলের মত হ'ত যদি আমার মন।

শেষ আবেদন

শ্রীগৌরভূষণ দে

তুমি ত চলেছ!

কিন্তু কোথায় তা' জানিনা। জানবার জন্য আকুলতা চোখে মুখে ছাপিয়ে উঠে! "কোথায় চলেছ?" এমনতর শব্দগুচ্ছ জিহ্বা যেন অনর্থক আওড়াতে চায় না। কারণ, সে জানে তুমি এবার নির্বাক্, নিস্তব্ধ! মায়া-মমতার বাঁধনটি শিথিল ক'রেই আজ তুমি চলেছ চলার পথে— তোমার অভীপ্সিত স্বর্গে, যেখানে আবেগের শক্র নেই, চিন্তার কলঙ্ক নেই, ভালবাসার পাপ নেই—সবই যেন পবিত্র, আনন্দময়! তুমি এবার চলেছ সেখানে—সেই পুণ্যময় আনন্দভবনে!

যাবেই ব'লে যখন স্থির নিশ্চিন্ত, তখন মলিনতার— গ্লানির ক্ষীণ রেখাকে অলঙ্কার করে কেন অঙ্গে পরা? অস্বাভাবিক বরণ ত তোমার পক্ষে এখন আর শোভনীয় নয়! যে পথের যাত্রী—তার পাথেয় ত অলঙ্কার নয়! পাথেয় অপূর্ব-আনন্দ আর প্রেম! তুমি না বিজ্ঞের মত কতদিন আরোপ করেছ এহেন অপূর্ব কাহিনী যা' চির সত্য, অভ্রান্ত সত্য।

প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দ আর পূর্ণিমার জোছনার মত শুভ্র মৃদু হাসিমাখা মুখই শুভ যাত্রা। মাহেন্দ্র যাত্রা ত বাঁধা পবিত্র আনন্দের আশে পাশে। সে তাকে ছেড়ে কি আর জয়ী হ'তে পারে? পরস্পরের বিরহে যেন এক কুলগ্নেরই সৃষ্টি ঘটে।

যাক্, নিস্তব্ধতা—নীরবতাকে যখন বরণই করেছ তোমার ব্রত সমাপনার আশা নিয়ে তখন আর কেন, কেন তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মনের আগুনকে জ্বালিয়ে তুলি দ্বিগুণ ক'রে! প্রাণ তো আর কিছুর দোহাই মান্তে চায় না। সে যেন বাঁধ ভেঙ্গে চায় উদ্দামপ্রকৃতির হ'তে। আবেগ, অশ্রু, কাতরতা আকুলি ব্যাকুলি নিয়ে আর ছিনিমিনি খেল্‌তে চায় না একেবারেই। প্রাণ যেন সমস্ত তন্ত্রী নিয়ে শিথিল হয়ে চলেছে মরণোন্মুখের মত। এত হাহাকার, এত কাতরতা, এ হতাশ কেন জান? শুধু তোমার নীরবতা;—তুমি নির্বাক্ ব'লে! যখন যাবে— নিশ্চয়ই চ'লে যাবে, হাসিমুখে কখন কি বিদায় পেতে না আমার কাছ থেকে? আব্দার, দাবী—আগ্রহ কোনদিন ত শিথিল হয় নি? সবই ত নিশ্বাসে মিটিয়েছি তোমার প্রার্থনা ভেবে? কোন দিন ত অসামর্থ্যের ভয়ে নীরব হইনি—গম্ভীর হ'তে পারিনি তোমার চাওয়ার কাছে!

ও—আমি এতক্ষণে বুঝেই চলেছিলাম একটা ভুলকে নিয়ে। তুমি বোধ হয়, যাবার পূর্বে আমার কাছে কিছু আব্দার ক'রবে—না? তাইতে বুঝি বেশ একটা ভাণ

ক'রে অপরূপ রূপ ধরেছ ? সত্যিই বহুরূপ ধর্‌বার একটা ক্ষমতা তোমার আছে। আচ্ছা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লাম—। তুমি আজ যা' চাইবে, আমার প্রাণ সহস্র কষ্ট স্বীকার ক'রেও তোমার প্রার্থনা পূরণ করবে। বল—তুমি কি চাও—কি তোমার আবেদন। দেব—আমি তোমায় হাসিমুখে দেব—দেব তুমি আজ যা' চাইবে।

তবু নিস্তব্ধ। হ্যাঁ বুঝেছি—তুমি কথা বলবেই না। বিদায় যখন নিকট হ'তে নিকটতর হ'য়ে আসে ধীরে ধীরে চুপে চুপে সবকে দূরে ছুড়ে ফেল্‌তে চেষ্টা পাই বটে! তাই এ পরিবর্তনের অঙ্গ-ভঙ্গিমা। ক্ষণপ্রভার চোখ ঝলসান চমক ভাঙ্‌তে বিলম্বের আশা করা যায়—কিন্তু মানসিকতার উপর রেখা কাট্‌তে বিলম্বের আশা পাওয়া যায় না। শারদ রজনীর অনাবিল আকাশ-প্রান্তরে খণ্ড মেঘের দৌরাত্ম্য কেবল সুধাক্ষরা জোছ্‌নাকে ম্লান করতে তাই হাসিমাখা রক্ত কমলটি যেন কালিমাময় হয়েছে! অশ্রু তপ্ত হয়েছে দীর্ঘ-নিশ্বাসের উত্তাপে! বুকের রক্ত-কণিকাগুলি, যে গুলি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল আমারই জন্যে —আমারি কল্যাণ-কামনায়; সে গুলিও জল হতে চলেছে বিদায়ের অস্ফুট রোদনের গভীর বেদনায়। উন্নত মস্তকটি বুকের উপর নুয়ে পড়েছে! ইঙ্গিত অশুভ! চাহনি ম্লান! প্রতিদান হয়ত শেষ করেছ—সব পূর্ণ করেছ বুকের গভীর বেদনায়! তাই নীরব তুমি! আর আজ মলিনতা তোমার অঙ্গে শোভনীয় সম্পদ!

মঙ্গল কামনা—পরার্থপরতা তোমার স্বভাব, তোমার সদ্‌বৃত্তির সহচর। আমার জন্য সর্বহিত সাধনা হয়ত তোমার শেষ হয়েছে। পিছু হাহাকার—হতাশের ভয়ে কাতর না হই তার সব ব্যবস্থা তুমি ক'রে রেখেছ। তাই বুঝি, আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য এত ব্যগ্র, এত উদ্বিগ্ন!

কিন্তু কোথায় যাবে! স্নিগ্ধ প্রকৃতি মায়ের শ্যামল শীতল ক্রোড়ে—যা' চিরদিন তুমি ভাল বেসে এসেছ প্রাণে প্রাণে? সেথাকার নিত্য নূতন পাখীর কাকলীতে নিজের শ্রান্ত প্রাণকে মুগ্ধ করতে এত ব্যাকুল; এত উৎকণ্ঠা—তোমার উত্তপ্ত মরুময় প্রাণকে শীতল করতে উষাদেবীর আঁচলবহা বাতাসে? সে প্রকৃতি চির উন্মুক্ত, সসীম হ'লেও অসীম; সে যে আনন্দময়! তুমি তার কোলে চলেছ শান্তি পেতে? জান ত সীতাদেবী তার শ্যামল শীতল কোলের স্নিগ্ধতায় নিজের দুঃখ-সন্তপ্ত জীবনকে করেছিলেন ক্লান্তিহীন—শান্তিময়। তবে তাঁর দাবী ছিল অসাধারণ—প্রকৃতি তাঁর গর্ভধারিণী। তুমি কি সে-অধিকারে অধিকার পেতে বাসনা করেছ; না কোন সুদূরে আমার মত আহত-আর্তের শুশ্রূষা ক'রে তাকে পুনর্জীবন দিতে আবার নিজেকে বিলা'তে চলেছ প্রাণ খুলে? শান্তি-স্বস্তি-অভয়-দান করবার আকুলতা তাই এত তীব্র হ'য়ে উঠেছে!

তবে যাও। "এস যেয়ে" বলবার ক্ষমতা যেন আর সচেতন নেই! সে যেন জাগতিক রীতিনীতির মাঝখানে এলিয়ে পড়েছে। মহাযাত্রার তীব্রতা যখন সান্ত্বনা হারায়েছে, তখন আমার চাওয়া-পাওয়ার আর কিছু নেই তা' আমি জানি। তবু প্রাণে যেন একটা অভাব। অভাব? অভাব নয়—আবেদন—শেষ আবেদন।

সাহচর্য মানুষের প্রাণে মানুষকে জাগা'য়ে রাখে। তাই প্রতিপদেই তোমার সাহচর্য তোমাকে আমার চোখেই জাগিয়ে রাখবে। তোমার সেই জীবন্ত সাহচর্য যখন জীবনে হারাতে বসেছি—তাই ব'লে আমি একেবারেই নিঃস্ব নই, আর তুমিও আমায় একাটি রেখে চলে যেতে পার না। তুমি ছাড়া আমার চোখের ধারা মুছা'য়ে সান্ত্বনা দেবার মত আরও অনেক সহচর আছে; যারা তোমারই মত আমাকে সর্বদাই চোখে চোখে, প্রাণে প্রাণে, বাহুর মাঝে, বুকের'পরে টেনে রাখে; তারা এখনও আমায় হারায় নি—হারাতে বসেনি অভিমানে, ব্যথায়।

জগতের তালে তাল দিয়ে শত ঝঞ্ঝা বিপদের মাঝেও তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করেছ—ক'রে এসেছ হাসি-মুখে। আজ আমার একটি অনুরোধ—। এ আবেদনের মঞ্জুর আমি চাই—। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত সে আশা সফল হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ যা অসম্ভব তা নিয়ে আর দুঃখ বাড়ান কেন? শুধু সম্বল আমার সহচরগণের কৃপা-টুকু। তা'দের কাছেই তুমি মঞ্জুরীটা পাঠিও—তা হ'লে

নিশ্চয়ই পাব তারা ত আমার কাছ থেকে পালাতে চায় না! স্নেহ-ভালবাসা দিয়েই আমাকে তুষ্ট করে। আর তুমি,—তুমি যদিও আমার কাছে হারিয়ে যাচ্ছ; কিন্তু তাদের সঙ্গে যে চিরদিনই এক হ'য়ে থাক্‌বে তাদের দিয়েই আমায় জেনো! আমরা দুজন সব সময় যে পাঁচজনের সঙ্গে মিশতাম, তারা ত আমাদের প্রাণমন—অভাব-অভিযোগ সবই জানে। তুমি তাদের কাছে আত্মগোপন ক'রো না। আমার আবেদনের মঞ্জুরী সেই পাঁচজন বন্ধুকে দিয়েই পাঠিয়ো।

আচ্ছা, প্রথমতঃ রবিদা। তাঁকে ত বেশ জানি, তিনি তোমায় আমায় বড় স্নেহ করতেন। আমাদের মিলনে কত আনন্দ প্রকাশ করতেন। তুমি তাঁর কাছে যেয়ো, তোমার ছায়াটা ঠিক আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। ছায়া ফেল্‌তে সুপটু তিনি বেশ তবু তোমার ছায়া দেখেও জীবনের অনেক কিছু আপন বলে টেনে নিতে পারব।

দ্বিতীয়তঃ সুধাংশুদা—। তাঁকে আমরা কত ভক্তি করতাম। তিনি কত আদর ক'রে আমাদের তপ্ত প্রাণকে শীতল করে দিতেন—নানা উপকথায় গল্পে। ভারী দয়ালু—বড় রসিক তিনি। তুমি তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা ক'রো তিনি প্রতিদিন না পারেন—মাসান্তের পূর্ব-দিনে আমাকে দেখা দেবেনই। সেদিন তাঁর হাসিমাখা উজ্জ্বল মুখখানা দেখে মনে করব—তুমি নিশ্চয়ই সুখে আছ। তাই তাঁর এত আনন্দ!

তৃতীয়তঃ গগনদা। তাঁর ত কাজই ছিল আমাদের মাথায় ছাতা ধরা। কত আদর-যত্ন করতেন, পাছে, আমরা দুজন কষ্ট পাব। তুমি তাঁর সঙ্গে আমার খবরটি জানিয়ে রেখো। আমি যখন একাই তাঁর ছাতার তলে দাঁড়াবো, তখন তোমার কথাগুলি আমায় না বলে সে পারবে না কিছুতেই।

সরিৎকে তুমি ত ভালই জানো। সে চাইত কি না রোজ বিকালে দু'জনে মিলে তার বাড়ীতে হাওয়া খেতে যাই। কত না আদর—সোহাগ ছিল তার প্রাণখানার। আর সে ত বড় চিত্রশিল্পী একজন। তুমি তাকে অনুরোধ ক'রে ব'লো—সে যেন তোমার একখানা চিত্র তুলে স্রোতকে দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। তুমি বললে—দিতে বাধ্য সে। সে যে আমাদের জন্য পাগল ছিল।

সমীরকে হয়ত বেশ মনে পড়ে। কেন সেই সময়ে পাগলা। রাতদিনে এধার ওধার ছুটাছুটি করে বেড়ায়। কত না তার নূতন সুর নিয়ে আমরা দু'জনে গান করেছি। কি চমৎকার তার অনুকরণ-ক্ষমতা! সে যা' একটিবার শুনে দ্বিতীয়বার নির্ভুলভাবে তার অনুকরণ করে। তুমি তার কাছে—তোমার যা' বলবার বলে দিয়ো; নূতন নূতন গান যদি দু' একখানা শেখ—তাকে শিখিয়ে দিয়ো। সে আমার কাছে নির্ভুলভাবে সব জানাবে। জান না, সে আমাদের দু'জনকে কত পছন্দ করত। সব সময় তার বাগানে বাগানে কত না অত্যাচার করেছি, কত গান করেছি; সব অসহ্য সে সহ্য করেছে। তার মত আমাদিগকে কে ভালবাস্‌তে পারে? তার ভালবাসা না পেলে আমরা দু'জনেই শুকিয়ে যেতাম।

আমরা ত বেশ জানি—আমরা কারোর অদর্শন—অভাব প্রাণে সহ্য কর্তে পারিনে। কিন্তু যাদের এমনতর সহচর—বন্ধুবান্ধব নেই তারা কি দমফেটেই মারা যেত? তা নয়। সহচর বা বন্ধুবান্ধবহীন কেউ নেই জগতে! সুতরাং তাদেরও আফশোষ্ মেটাবার—দম ছাড়বার উপায় হ'য়েই আছে। আমাদের ত কোন অভাব নেই। যারা অভাবকে অভাব ভাবতে পারে না; তাদের আবার হাহাকার দুঃখ কিসের! বিদায়ের মাঝখানে দুর্বলতাকে আদর দিলে, কাঁধে চেপে বসে। উঠ, জাগো। শুধু এইটুকু জানাতে দাও—এই আমাদের উভয়ের শেষ আবেদন; যার মঞ্জুরীর দান-প্রতিদান আমাদের মাঝেই প্রতিনিয়ত চলতে থাকবে।

ঘুমের ঘোরে

শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষাল

সেদিন নিশীথে দেখিনু স্বপন
চির বাঞ্ছিত ঘুমের ঘোরে,
কে যেন সুনীল গগন হইতে
হাতছানি দিয়ে ডাকিছে মোরে।
কহিতেছে—সুখ নাইরে হোথায়,
এই সুনীলের মাঝে চলে আয়,
হেথায় উজল শত শত তারা
আপন করিয়া লইবে তোরে।
সেদিন নিশীথে দেখিনু স্বপন
বাঞ্ছিত মোর ঘুমের ঘোরে ॥
স্নেহমাখা হায় বচন তাহার
অসীম শান্তি দানিল প্রাণে ;
তৃষিত পরাণে শুনিতে লাগিনু
সে স্বরলহরী আকুল মনে ;
কহিতে লাগিল সুমধুর রবে—
আমাদের মাঝে ছিলি তুই যবে
দিয়াছিনু মোরা তোরে ভালবাসা
অকপট হৃদে পরাণ ভরে,—
সেই ভালবাসা তেয়াগিয়া তুই
যাইলি চলিয়া অবনী'পরে !
প্রাণঢালা সেই ভালবাসা ত্যজি
চলে গেলি তুই অবনী-তলে ;
কত যে কাঁদিনু কত যে ভাবিনু
ভাসিনু কতই নয়নজলে !
আছিলি হেথায় শত তারা মাঝে
সে কথা স্মরিলে আজো মনে বাজে
কোন বেদনায় ভুলি তা সবায়
ডুবিলি দুখের সাগরজলে ;
প্রাণঢালা সেই ভালবাসা ত্যজি
চলে গেলি তুই অবনী-তলে !

আজো তোর লাগি নীরবেতে কাঁদি
উদার গগনে রজনী কালে।
মন্দির-দ্বারে দিগ্‌বধু সবে
একে একে আসি প্রদীপ জ্বালে।
নাই কারো মুখে স্নিগ্ধ সে হাসি
সেথা বিষাদের বাজিতেছে বাঁশী ;
তোর দুখ হেরি মলিন বয়ানে
তাকাইছে শুধু ধরণী-তলে,
তোর লাগি হায় নীরবেতে তবু
ভাসিতেছে ওরা নয়ন-জলে !
আয় চলে আয় অসীমের মাঝে
হেথায় এখনো রয়েছে ঠাঁই ;
আবার বরণ করিয়া লইব
যদি হায় তোরে নিকটে পাই ;
ওই ধরিত্রী নহে দুখহরা
বক্ষ উহার পঙ্কপসরা
মরণের বীজ ছড়ান হোথায়
জীবনের কোন মূল্য নাই ;
আয় চলে আয় অসীমের মাঝে
হেথায় এখনো রয়েছে ঠাঁই।
আকুল স্বরেতে কহিনু তাহারে—
ওগো কল্পনা-রাণী আমার
হাত ধরে তুমি নিয়ে চল মোরে
চলিতে শকতি নাহি যে আর।
এই মায়াময় ধরণীর মাঝে
বেদনা ও শুধু ক্লান্তি বিরাজে
সায়রসলিল হইতে আমায়
তরণী হইয়া কর মা পার
চরণে আমার শত শৃঙ্খল
পারি না খুলিতে বাঁধন তার।

সহসা তন্দ্রা টুটে গেল মোর
মেলিয়া নয়ন দেখিনু আমি ;
অমনি মিলাল স্বপন ঘোর
কঠিন ধরায় আসিনু নামি ॥
নাহি সুমধুর সে স্বরলহরী
নাহিকো সেথায় সুরসুন্দরী
ঊর্ধ্বে বিরাজে সুনীল আকাশ
কোটি কোটি তারা সেথায় রাজে—
হেথায় একেলা নীলনভঃ-তলে
রহিয়াছি শুয়ে ছাদের মাঝে !

প্রমীলা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এল্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক—২য় দৃশ্য

স্থান —সমুদ্রতীর ; কাল—গোধূলি

(বিভীষণ একাকী)

বিভীষণ। ওই দেখা যায়—
সৌধকিরীটিনী স্বর্ণলঙ্কাধাম !
সোণার মেখলা পরা,—
দাঁড়াইয়া নির্মম পাষাণ !
কৈশোরের অশান্ত চাপল্য !
যৌবনের উদ্দাম বাসনা—
আছে গাঁথা প্রতি মর্মরে মর্মরে !
কিন্তু আজ !
জীবনের অপরাহ্ণ কালে,—
ওই স্নেহ-নীড়ে নাহি স্থান !
নির্বাসিত আমি !
চির-আহ্বানের গ্রন্থি,
আজ রুদ্ধ করে দ্বার !

[কালনেমীর প্রবেশ]

কাল। বিভীষণ ! বিভীষণ !
বিভী। কে—মাতুল !
কাল। হাঁ—ভাগিনেয় !
বিভী। মাতুল !
তুমি আসিয়াছ হেথা !
কোন প্রয়োজন !
কাল। শোন বিভীষণ !
লঙ্কাবাসী বাল-বৃদ্ধ-যুবক-বনিতা—
একবাক্যে চাহে তোমা !
বিভী। চাহে মোরে !
কাল। হাঁ—ভাগিনেয় !
চাহে তোমা !
বিভী। চাহে গৃহশত্রু বিভীষণে—
শৃঙ্খলিত রাজদরবারে !
কাল। না—না—না

চাহে চারু অঙ্গে রাজ-পরিচ্ছদ !
রাজদণ্ড করে—মস্তকে উষ্ণীষ !
গৃহশত্রু বিভীষণ কে কহে তোমারে !
তুমি—তুমি ধার্মিকের শিরোমণি
লঙ্কার গৌরব !

বিভী। অসম্ভব—অসম্ভব।

কাল। না—না—না—
নহে অসম্ভব !
ক্লান্ত প্রজা রাবণের কঠোর পীড়নে !
চাহে সবে রাবণ উচ্ছেদ !
চাহে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন !
চাহে ধর্মচূড়া বিভীষণ রাজা !

বিভী। মিথ্যা কথা !
আঁখি যেন তব করিছে ছলনা !
নেহারি বিস্মিত—
আনন-দর্পণে তব
হৃদয়ের তীব্র বিভীষিকা !
মাতুল—মাতুল !
না—না—না—
নহি রাজ্যকামী !
বৃথা আশা লয়ে আসিয়াছ হেথা !

কাল। বিভীষণ—ভাগিনেয় !
স্থিরচিত্তে দেখ বিচারিয়া !
রাবণের কঠোর পীড়নে,
প্রজাকুল আকুল সকলে !
আর—

বিভী। না চাই শুনিতে আর !
নাহি চাই রাজসিংহাসন,—
মণিময় মস্তকভূষণ !
মহামূল্য রাজপরিচ্ছদ,
প্রজার পালন,—
তাও নহে মোর আকিঞ্চন !
দীন বিভীষণ্ !
মাতুল—মাতুল !

যাও—যাও—
তোমার নিশ্বাস-বায়ু
শ্বাসরোধ করে মোর—
[দ্রুত প্রস্থান]

কাল। কোথায় পালাবে বিভীষণ !
উর্বর কর্ষিত তুমি !
বীজ তাহে করিনু রোপণ !
বিভীষণ—বিভীষণ !
নেবে—নেবে—
নিজ হাতে তুলে নেবে ছুরি—
বসাইতে সহোদর-বুকে !
ভ্রাতৃরক্ত আকণ্ঠ করিবে পান।
ব্যর্থ কি কৌশল মোর ?
না—না—না—
ডুবে যাবে চন্দ্র সূর্য—
মিথ্যা হবে সমগ্র ভুবন !
কালনেমী-বুদ্ধিবল !
ইন্দ্রজাল—ইন্দ্রজাল !
হাঃ হাঃ হাঃ
দশানন—দশানন !
এইবার—এইবার !
অতিদর্প খর্ব হবে তোর !
দেখে নেবো—নেবো— [প্রস্থান]

[লক্ষ্মণ ও অঙ্গদের প্রবেশ]

অঙ্গদ। সত্য প্রভু !
বিভীষণ বড়ই অদ্ভুত !
নিজ হাতে তুলে দিল শর,—
শ্রীরামের করে।
কাঁপিল না কায়া !
বানে বানে বিদ্ধ হয়ে,
তনয় পড়িল রণে,—
নির্নিমিষে চাহিয়া দেখিল শুধু।

লক্ষ্মণ। সত্য যুবরাজ !
অতীব বিস্মিত আমি !

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভী। সৌমিত্রি—সৌমিত্রি !
প্রভু—গুরু !
ভ্রাতৃপ্রেমে দাও দীক্ষা মোরে।
যে প্রেমেতে হইয়া বৈরাগী,—
ত্যজি অযোধ্যার রাজার প্রাসাদ—
ত্যজি পত্নী জীবনসঙ্গিনী,—
ত্যজি মাতা, জরাগ্রস্ত পিতা,
স্বেচ্ছা-নির্বাসন-দণ্ড করিলে গ্রহণ,
অনাহারে অনিদ্রায়,
দীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষ ধরি,
যে প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখালে ভুবনে,
সেই প্রেমে দীক্ষা দাও মোরে।

লক্ষ্মণ। রাক্ষস-প্রধান !
কেন হেরি হেন আত্মহারা !

বিভী। প্রভু !
কত হীন আমি !
জ্যেষ্ঠ সহোদর !
শিরায় শিরায় বহে
একপিতৃপুরুষের উত্তপ্ত শোণিত !
সহোদর—সহোদর !
ব্রহ্মা দিতে এল বর—অমরত্ব দান—
আমারে দেখায়ে দিল !
অমর হইনু আমি—
বিংশতি লোচন পূর্ণ হল হর্ষ-অশ্রুভারে !
কিন্তু আজ !
ভ্রাতার বিপক্ষে ভ্রাতা !
ভ্রাতা করে ভ্রাতৃরক্ত পান !
বল প্রভু !
প্রায়শ্চিত্ত কিবা !

লক্ষ্মণ। প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত !
হাঁ—আছে !
বিভীষণ !
ফিরে যাও কনকলঙ্কায় !—
স্বদেশে তোমার !
ফিরে যাও ভ্রাতার নিকট।
অশ্রুসিক্ত করি,—
অগ্রজের চরণ যুগল,
নতশিরে মেগে লও ক্ষমা।

[রামের প্রবেশ]

রাম। হে সৌমিত্রি !
অতি সত্য বচন তোমার !
প্রিয়বর !
ফিরে যাও ভ্রাতার চরণে।
ভ্রাতার পার্শ্বেতে রহি,
যুদ্ধ কর আমাদের সনে,—
হয় হবে সীতার উদ্ধার ;—
না হয় বন্দিনী রবে,
চিরদিন অশোক-কাননে।
প্রাণ যদি নাহি চায়—
দাঁড়াইতে ভ্রাতার বিপক্ষে—
তবে তুমি থাকিও না হেথা !
মিত্রবর !
ভ্রাতা হ'তে প্রিয়তর নহি মোরা সবে।

বিভী। তবে ফিরে যাবো—ফিরে যাবো— !

[মারুতির প্রবেশ]

মারুতি। কোথা ফিরে যাবে বিভীষণ !
অতি কষ্টে আসিয়া জাহ্নবী-কূলে,
বারি নাহি করি পান ;—
পিপাসার্ত দেহখানি টানি,—
ফিরে তুমি যাবে ত নিশ্চয়।
বান্ধব !
কেবা পিতা, কেবা মাতা,
কেবা পুত্র, কেবা সহোদর,
ধ্যান-চক্ষে ভাল করি কর নিরীক্ষণ !
কেন যেচে মায়া-পাশে লভিছ বন্ধন !
সম্মুখে দাঁড়ায়ে নারায়ণ

নিখিল বাসনা ত্যজি,
লও ওই চরণে শরণ।

বিভী। মারুতি—মারুতি
ধন্য তুমি,
জ্ঞানাঞ্জনে উন্মিলিত করিলে নয়ন।

[আলিঙ্গন]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ-কক্ষ ; কাল—রাত্রি

[রাবণ]

রাবণ। নির্মম বেজেছে পদাঘাত!
নির্বাসনে গেছে বিভীষণ!
বিভীষণ—বিভীষণ!
বুঝিলি না হৃদয়ের ব্যথা!
বাহিরের কার্য শুধু করিলি বিচার!
আয়—আয়!
ফিরে আয়, ফিরে আয় ভাই!

[কালনেমীর প্রবেশ]

কে—মাতুল!
পেয়েছ সন্ধান?

কাল। হাঁ—ভাগিনেয়!
পেয়েছি সন্ধান!
সাগর-সৈকতে,
দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে রয়েছে চাহিয়া,
কনকলঙ্কার পানে।
গণিছে লহরী,
আছাড়ি পড়িছে যাহা লঙ্কার পুলিনে।
আঁখি ছল ছল,
দীর্ঘশ্বাসে বীরবর
ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে উছসি!

রাবণ। মাতুল—মাতুল!
আসিবে না ফিরে?
জানায়েছ আদেশ আমার?
বলেছ কি—জ্যেষ্ঠ তার কাঁদে হাহাকারে?

কাল। না—না—ভাগিনেয়!
আসিবে না ফিরে।
কহিলাম কত—শুনিল না কথা!
কহিল কাতরে শুধু ;—
রাবণ থাকিতে রাজা
ফিরিব না কনকলঙ্কায়।

রাবণ। মাতুল—মাতুল!
যুদ্ধ শেষ—যুদ্ধ শেষ!
সীতারে ফিরায়ে দেবো ;—
সখ্যসূত্রে বাঁধিব শ্রীরামে।
ছেড়ে দেবো রাজসিংহাসন!
হো'ক বিভীষণ রাজা!
শুধু—শুধু সে আসুক ফিরে কনকলঙ্কায়!

কাল। রাবণ—রাবণ!
দুঃসহ দুঃখের ভারে,
মস্তক-বিকৃতি বুঝি ঘটিয়াছে তব!

রাবণ। না—না—মাতুল!
আছি প্রকৃতিস্থ!

কাল। দশানন!
কেন তবে পরিহর রণ!
সগর্ব উন্নত শির,
কেন কর লুণ্ঠিত ধুলায়!

রাবণ। মাতুল—মাতুল!
ক্লান্ত আমি।
শ্রান্ত দেহ মোর চাহিছে বিরাম।

কাল। একি কহ!
ক্লান্ত তুমি দুর্জয় রাবণ!
জগতের একপ্রান্ত হ'তে
সুদূর অপর প্রান্তে,
স্থাপিয়াছে যেই ;—
আপনার শাসন-শৃঙ্খল ;
যুঝি অবিশ্রান্ত ভাবে,
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল, আনিয়া স্ববশে,—

মিটে নাই আকাঙ্ক্ষা যাহার,—
ক্লান্ত আজি সে—অসম্ভব !

রাবণ। মাতুল !
নহে অসম্ভব !
ছেড়ে গেছে সহোদর ভাই—
ভৃগুপদচিহ্ন সম,
পদচিহ্ন মোর ধরিয়া অঙ্গেতে !
নাহি চাহি রাজ্য আর !
নাহি চাহি কীর্তি যশঃ মান !
নাহি চাহি সীতা !
চাহি শুধু বিভীষণ—ধরিতে বক্ষেতে।
আঁখিজলে ধোয়াইয়া দিতে
পদচিহ্ন মোর !
মাতুল—মাতুল !
যাও পুনঃ—কহিও তাহারে !
বুভুক্ষিত প্রাণ লয়ে,
রাবণ দাঁড়ায়ে কাঁদে লঙ্কার তোরণে !

কাল। ভাগিনেয় !

রাবণ। মাতুল !

কাল। ভুলে গেছ পঞ্চবটী বন !
ভুলে গেছ খর ও দূষণ !
ভুলে গেছ বজ্রদংষ্ট্রে !
ভুলেছ অজয়ে—
অতিকায়ে, শুম্ভে ও নিশুম্ভে !

রাবণ। মাতুল—মাতুল।

কাল। ভুলে গেছ কুম্ভকর্ণে,
শূলী শম্ভু সম দুর্বার দুর্জয় !
ভুলে গেছ সূর্পণখা,
নাসাকর্ণহীনা !
না—না ভুলে গেছ তুমি !
রাবণ—রাবণ !
লঙ্কার কামিনী বুঝি স্বৈরিণী রমণী ! [প্রস্থান]

রাবণ। মাতুল—মাতুল !
[পরিক্রমণ]

[শুকের প্রবেশ]

শুক !

শুক। মহারাজ !

রাবণ। এ কি !
কেন নাহি খুঁজে পাও ভাষা !

শুক। মহারাজ—

রাবণ। দিলাম অভয় !

শুক। হত বীরবাহু !

রাবণ। উত্তম !
কহ, দিয়েছে কি বংশপরিচয় ?
রেখেছে কি লঙ্কার গৌরব ?

শুক। মহারাজ !
রাজপুত্র মহাবলবান !
করিয়াছে দুর্বার সমর !
হেন রণ দেখি নাই কভু !
প্রবেশি সংগ্রামে,—
ক্ষিপ্রহস্তে বাণ বরিষণে—
ছাইল গগন !
ঢাকিল রবির তেজ
রুদ্ধ বায়ুপথ।
বিচ্ছিন্ন শ্রীরাম-সৈন্য দীর্ণ হাহাকারে।
ধনু ধরি আসিল লক্ষ্মণ !
দুই বীরে হ'ল মহামার !
কেহ কারে জিনিতে না পারে,
কিন্তু শেষে কুমারের অব্যর্থ সন্ধানে
অচেতন হ'য়ে—
লক্ষ্মণ পড়িল রণভূমে !

রাবণ। তারপর—তারপর !

শুক। তারপর,
ছুটে এল সীতাপতি আরক্তলোচন।
বাধিল সংগ্রাম !
কেহ নেই উন।
ধীরে ধীরে আসিল গোধূলি !
আরক্ত তপন গেল অস্তাচলে !

হেনকালে—ছোট মহারাজ—
তুলে দিল মৃত্যুশর শ্রীরামের করে!
পড়িল কুমার!
সান্ধ্য সূর্য সনে, ধীরে ধীরে ডুবে গেছে,
লঙ্কার গৌরব-ভাস্কর!

[প্রস্থান]

রাবণ। বিভীষণ—বিভীষণ!

[পরিক্রমণ]

[চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ]

চিত্রা। মহারাজ!
কোথায় কুমার?

রাবণ। ওই হোথা—
শূন্যে—মেঘে, আকাশের অন্তরালে—
না—না—নক্ষত্র-আলোকে—
চাঁদের কিরণে!
কোথা!
হাঃ হাঃ হাঃ
পরপারে—পরপারে!

চিত্রা। পড়েছে কুমার!
ও হো হো হো—
বীরবাহু—বীরবাহু!

রাবণ। স্থির হও রাণী!
শান্ত কর চঞ্চলতা!
পুত্র কারো নহে চিরজীবী!
বীর পুত্র তব!
করিয়াছে দুর্বার সমর!
দেব রক্ষ নরে অসম্ভব!
সম্মুখ আহবে—
বাণ-বক্ষে চুম্বিয়া লঙ্কার মাটি,—
লভিয়াছে—দিব্য গতি।
রাখিয়াছে দেশের গৌরব!
সগর্ব উন্নত রাজশির,
দেয় নাই বিলুণ্ঠিত হতে শত্রুপদতলে।

চিত্রা। মহারাজ—মহারাজ!

রাবণ। রাণী—রাণী!
জন্ম করে মৃত্যু-আরাধনা!
বীর নাহি ভয়ে মহাকালে!
রাণী!
বল—বল—
পুত্র তব হ'ত চিরজীবী?
মরিত না কভু?
রোগ-আলিঙ্গনে অস্থিচর্মসার,
পাণ্ডুর বদন নিষ্প্রভ লোচন হয়ে
হ'ত যদি গত,
সুখী কি হইতে তায়?

চিত্রা। ও হো হো হো
পুত্র শোকে পাষাণ বিদরে বুঝি!
আর তুমি—
পাষাণ হইতে সুকঠিন!
হে নির্মম!
ফেল—শুধু এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু,
হতভাগ্য তনয়ের তরে!
বীরবাহু—ও হো হো হো—

[প্রস্থান]

রাবণ। অন্তরের দাবানল,
শুষ্ক করে নয়নের বারি!
নাই—নাই—বীরবাহু নাই!

[মন্দোদরীর প্রবেশ]

মন্দো। বীরবাহু নাই—
আছে ইন্দ্রজিত!
আছ তুমি দশানন ত্রৈলোক্যবিজয়ী।
আছে যত বীরনারী লঙ্কানিবাসিনী।
আছি আমি—মন্দোদরী!
দূর কর দুর্বলতা রাজা!
দম্ভে ফেরে শত্রু-সেনা!
বাহিনী সাজাও—
সমর-অঙ্গনে দাও হানা!
রাক্ষসের প্রতিহিংসা নিয়ে

ছুটে যাও—
ছিঁড়ে আন পুত্রঘাতি-শির !
যাও—যাও রাজা—খেদ পরিহরি !

রাবণ। মন্দোদরী—মন্দোদরী !
মন্দো। না—না—
দাসী—ভিখারিণী !

ক্রমশঃ

ক্রিষ্টফার কলম্বস

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম অভিযানে যাত্রা

কয়েকমাস উদ্যোগ-আয়োজনের অবসানে কলম্বস তাঁহার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রথম অভিযানে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই অভিযানে তিনখানিমাত্র জাহাজ ছিল ; ইহার কোনখানাই মাঝারিধরণের মৎস্য ধরিবার নৌকা অপেক্ষা বৃহৎ ছিল না। কলম্বস নিজে Santa Maria জাহাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন ; Pinta ও Niña জাহাজের অধ্যক্ষ হইলেন Pinzon ভ্রাতৃদ্বয়, নাবিকের সংখ্যা ছিল প্রায় একশত ; উহারা প্রধানত শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদিগের মধ্য হইতে গৃহীত হইয়াছিল, তাহারা কারাবাসের পরিবর্তে কলম্বসের সহিত অভিযানে যাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট কলম্বস Palos বন্দর হইতে জাহাজের নঙ্গর তুলিলেন। এইরূপ অবসাদময় অবস্থার মধ্যে কোন অভিযান অভীষ্টলক্ষ্যে যাত্রা করে নাই। যখন কলম্বস নঙ্গর তুলিলেন, তখন বহু নর-নারী সকলেই কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল, তাহারা দেখিল যেন এক ভাবী অমঙ্গলের ছায়া—কলম্বস আর তাহাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিবে না।

তীরস্থ নর-নারীরাই যে হতাশাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা নহে ; জাহাজের নাবিকদেরও অনুরূপভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল, তাহাঁরা দলে- দলে বিষাদমলিন মুখে ডেকের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল তীরভূমি ক্রমশঃ ধীরে ধীরে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যাইতেছে—তাহারাও ভাবিল হয়ত পুনরায় এ জীবনে জন্মভূমির তটরেখা নয়ন-গোচর হইবে না ! তাহাদের মধ্যে কলম্বস ছিলেন একা —যিনি এই বিপদ্-সঙ্কুল অভিযানে চলিয়াছেন আনন্দ-প্রফুল্লমনে ঈশ্বরের উপর ও নিজের শক্তিতে পূর্ণবিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া। তাঁহার মনে ভয়ের রেখা দেখা দেয় নাই ; বরং জীবনব্যাপী উচ্চাশার পরিপূর্ণতায় হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি ডেকে পায়চারী করিতেছিলেন— দীর্ঘকায় সবলপেশী রক্তকেশ বুদ্ধিদীপ্ত নীলনয়ন ও গম্ভীর মূর্তিতে সকলের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেছিলেন।

অনুকূল বায়ু-প্রবাহে শীঘ্রই তিনি ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে উপনীত হইলেন। তৎপূর্বে Pinta জাহাজের হাল অকর্মণ্য হইয়াছিল, খুব সম্ভবত নাবিকগণের চক্রান্তে। পরে ক্যানারীতে ইহা মেরামত করা হয়। তথায় জাহাজগুলিকে পুনরায় সজ্জিত করিয়া তিনি তথায় একমাস অতিবাহিত করিলেন, অতঃপর অজ্ঞাত রাজ্যের দিকে যাত্রা আরব্ধ হইল। অনুকূল বায়ু-প্রবাহে পাল তুলিয়া দিয়া কলম্বস পুরাতন পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করত সোজা পশ্চিম দিকে জাহাজ পরিচালনা করিলেন।

সমগতিতে জাহাজ চলিতে লাগিল ; কলম্বস উহার

দৈনিক গতির হিসাব রাখিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন দিনসমূহ সপ্তাহের কোলে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল, অথচ স্থলরেখা নেত্রপথে পড়িল না তখন নাবিকদল অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল প্রতি ঘণ্টায় তাহারা স্পেন হইতে দূরে নীত হইতেছে। অবশেষে তাহাদের আশঙ্কা ভীতিতে রূপান্তরিত হইল।

নাবিকদলে বিদ্রোহের সূচনা

যেহেতু সমুদ্রের উক্ত অংশে বাতাস অবিরাম পূর্বদিক্ হইতে প্রবাহিত হইত; সুতরাং নাবিকদল ভাবিল তাহারা কিরূপে স্পেনে ফিরিয়া আসিবে। তাহাদের উগ্রমস্তিষ্ক কাপ্তেন নিশ্চয় পাগল; তাহারা সিদ্ধান্ত করিল, পাগল না হইলে কেহ এরূপ করিতে পারে না। ফলে সামান্য ঘটনা অমঙ্গলসূচক বলিয়া বৃহত্তম আকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল; কম্পাশের কাঁটার দিক্‌পরিবর্তন তাহাদিগকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিল। তাহাদের অসন্তোষের কলরব বিদ্রোহের দামামা-নিনাদে ধ্বনিত হইতে লাগিল; তন্মধ্যে অসমসাহসিক ব্যক্তি কলম্বসকে জাহাজ হইতে সমুদ্র-বক্ষে নিক্ষেপের কল্পনা করিল।

এই সমস্ত দুর্বলচিত্ত লোককে শান্ত করা কলম্বসের পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য ছিল, সন্দেহ নাই। তিনি প্রথমে কপটতা, পরে প্রতিশ্রুতি ও অবশেষে ভয় প্রদর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। নাবিকগণকে দূরত্ববিষয়ে অজ্ঞ রাখিবার জন্য তিনি দুইটি লগ্‌বুক রাখিতেন; একটি তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্য,—উহাতে প্রকৃত দূরত্ব লিখিত হইত; অপরটি দূরত্ব কম লিখিয়া নাবিকগণকে দেখান হইত। অনেক সময় সান্ধ্য আকাশের ধূসর মেঘমালা তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল। যেহেতু তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্থলভাগ দেখিতেছেন; কিন্তু যখন মেঘমালা দূরশূন্যে বিলীন হইয়া যাইত, অনন্ত জলরাশি দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত দেখা যাইত, তখন তাঁহারা গভীর নৈরাশ্যে নিমগ্ন হইতেন।

এই ঘটনা এতবার পুনরাবৃত্ত হইয়াছিল যে, অবশেষে

যে, যদি তিনদিনের মধ্যে স্থল দেখা না যায়, তবে তিনি স্পেনে ফিরিয়া যাইবেন। এই সময় অদূরে যে স্থলভাগ বিদ্যমান, তাহার প্রমাণ দেখা যাইতে লাগিল। যে সমস্ত পক্ষী উপকূলভাগ হইতে দূরে যায় না, সেই সমস্ত পক্ষী জাহাজের মাস্তুলে আসিয়া বসিতে লাগিল। কলম্বসের ভয় হইল যে, তিনি হয়ত দুইটি দ্বীপের মধ্যস্থল দিয়া চলিয়াছেন। আর একটি দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। তাঁহারা সবুজ তৃণ ও গুল্ম প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন, যাহা পার্বত্য প্রদেশের নিকটবর্তী সমুদ্রে পরিদৃষ্ট হয়; এতভিন্ন শৈবালপূর্ণ সমুদ্র দেখিয়া তাঁহাদের ধারণা দূরীভূত হইল যে, পুরোভাগে স্থলভাগ অপেক্ষমাণ। তাঁহারা সমুদ্রবক্ষ হইতে মানুষের হস্ত দ্বারা সুন্দরভাবে ক্ষোদিত কাষ্ঠখণ্ড কুড়াইয়া পাইলেন; টাটকা জাম ফলে পূর্ণ একটি জামগাছের শাখা সমুদ্রস্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিলেন।

চিরস্মরণীয় দিবস

১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিবস। এই দিন পুরাতন পৃথিবীর লোকের নিকট নূতন পৃথিবীর রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইল। ১১ই অক্টোবর রাত্রিতে কলম্বস প্রত্যেক নাবিককে স্থলভাগের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর নাবিকগণের বিদ্রোহভাব আনন্দে রূপান্তরিত হইয়াছিল; যেহেতু কলম্বস ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যে প্রথমে স্থলভাগ দেখিবে সে পুরস্কার পাইবে। কিন্তু উহা কলম্বসের নিজের জন্যই বিধাতা নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। মধ্যরাত্রের দুই ঘণ্টা পূর্বে কলম্বস একাকী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া দূরে অন্ধকারের বক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যেন তিনি দূরে একটি চলমান আলোক-রশ্মি দেখিলেন; উহা কোন লোক ধীরে ধীরে লইয়া যাইতেছে। এই দৃশ্যে তাঁহার অন্তরলোকে যে উন্মাদনা দেখা দিল, তিনি উহা দমনে অসমর্থ হইয়া একটি নাবিককে পার্শ্বে ডাকিয়া ঐ দূরস্থিত চলমান

করিলেন, অমনি চকিতে উহা অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। দীর্ঘ চারিঘণ্টাকাল তিনি এই অনিশ্চয়তার মধ্যে অতিবাহিত করিলেন যে, তিনি বাস্তবিক প্রতারিত হইয়াছেন কি না! ১২ই অক্টোবর ভোর দুইটার সময় অন্য একটি জাহাজ হইতে তোপধ্বনির দ্বারা স্থলভাগের অবস্থিতি ঘোষিত হইল। কলম্বসের আশা সিদ্ধির মুক্ত দ্বারতলে উপনীত হইল। ইহাতে আত্মহারা কলম্বস ডেকের উপর জানু পাতিয়া উপবেশন করত যুক্তকরে প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবানকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

১২ই অক্টোবর প্রাতঃকালে যখন কলম্বস সর্বপ্রথম এই নূতন পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎকালে তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা চলে না। তাঁহার অদম্য সাহস, অধ্যবসায়, দৃঢ়সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা—সব এই মুহূর্তে সার্থকতা লাভ করিল। তিনি অবিশ্বাসী পৃথিবীকে দেখাইলেন যে, তিনিই সত্য নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহাদের বাণী মিথ্যা; কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের গর্বকে অতিক্রম করিয়া ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিল—তাঁহার নিজের সামান্য অবস্থা হইতে ঈশ্বর তাঁহাকেই মানবজাতির নিকট নবীন পৃথিবীর গরিমা প্রকাশে মনোনীত করিয়াছেন!

তাঁহার পুরোভাগে দণ্ডায়মান ছিল শ্যামল তরুগুল্ম-পরিবেষ্টিত নিম্ন সমতলভূমি দ্বীপ। উপকূলে বহুসংখ্যক নগ্ন অসভ্য লোক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া জাহাজের দিকে তাকাইয়াছিল। এই দেশীয় লোকগুলি স্পেনবাসীদিগের মলিন মুখমণ্ডল, তাহাদের শ্মশ্রু ও জাঁকজমকশালী পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ভাবিল—এই আশ্চর্য লোকগুলি নিশ্চয় রাত্রির মধ্যে আকাশ হইতে নামিয়াছে। ফলে যখন কলম্বস তাঁহার দলের লোকগুলি সহ নৌকায় করিয়া তীরে অবতরণ করিলেন, তখন তাহারা ভয়ে জঙ্গলে পলাইয়া গেল, এবং যতক্ষণ না তাহারা বুঝিতে পারিল যে, এই নবাগতের দল বন্ধুভাবাপন্ন, ততক্ষণ তাহারা জঙ্গলেই রহিয়া গেল।

তীরে অবতরণ করিয়াই কলম্বস ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিলেন। পরে স্পেনের রাজকীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া এই স্থানকে স্পেনের নামে দখল করিলেন। তিনি এই দ্বীপের নামকরণ করেন স্যান স্যালভেডর। এই দ্বীপ বাহামা দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম ও ইহার পূর্বনাম Guanahani। এই দ্বীপ সম্বন্ধে কলম্বস যতটা সম্ভব, বিবরণ সংগ্রহ করিলেন। তিনি দেশীয় লোকদের নিকট হইতে মালা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলঙ্কারের বিনিময়ে স্বর্ণ ও তুলা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। এক সপ্তাহ বাহামা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে জাহাজ পরিচালনার পর ২৮শে অক্টোবর কিউবা দ্বীপ প্রাপ্ত হইলেন। এই দ্বীপকে কলম্বস এশিয়া মহাদেশের অংশ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন—তিনি ভাবিয়াছিলেন উহা Catyo (Cathay) প্রদেশ। একটি অভিযান এই দ্বীপের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে গমন করে; এই অভিযানকালে তামাক আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর কলম্বস বর্তমান হাইতি দ্বীপে উপনীত হইলেন। তিনি ইহার নামকরণ করেন Española; কিন্তু তাঁহার কর্মচারীদিগকে বলিলেন যে, উহা জাপান দ্বীপ ও এই স্থান হইতে ভারতবর্ষ মাত্র দশদিনের পথ। অবশ্য তাঁহার এই ভ্রমের কারণ যে, তিনি পৃথিবীর পরিধি সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করিতেন।

হাইতি দ্বীপ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"ইহাতে সমুদ্রতীরে বহু পোতাশ্রয় আছে ও অনেক বৃহৎ নদী বর্তমান। এই দ্বীপ উচ্চ; ইহাতে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা বিরাজিত; এই সমস্ত পর্বতমালা অত্যন্ত সুন্দর, তাহাদের আকার বহুবিধ এবং সকলেই সুগম ও সহস্র রকমের বৃক্ষ দ্বারা পরিপূর্ণ—মনে হয় যেন তাহারা আকাশ স্পর্শ করিতেছে। এই সমস্ত বৃক্ষ ফলেফুলে সমৃদ্ধ; বুলবুল এখানে সঙ্গীতধারা ঢালিয়া দেয়; আরও সহস্র সহস্র পক্ষী এইস্থানে বিদ্যমান। এই স্থানে ৬।৭ রকমের তালগাছ আছে; তাহারা সৌন্দর্যের বিভিন্নতার জন্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।"

এই দ্বীপের লোক সম্বন্ধে কলম্বস লিখিয়াছেন—"এই দ্বীপের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ, তাহাদের লৌহ, ইস্পাত

বা কোনরূপ অস্ত্র নাই ; তাহারা উহা ব্যবহারেরও উপযুক্ত নহে ; কারণ, তাহারা যে সুগঠিত দেহ নহে, তাহা নয়, পরন্তু তাহারা অত্যন্ত ভীরুস্বভাব। তাহাদের অধিকৃত বস্তু সম্বন্ধে তাহারা এত উদার ও অকপট যে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করা যায় না।”

“এই দ্বীপে একটি সহর আছে, এই সহর আমি অধিকার করিয়াছি ; এই স্থান স্বর্ণখনির কার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; বাণিজ্যের পক্ষেও উহা বিশেষ উপযোগী। আমি এই সহরের নাম দিয়াছি Villa de Navidad এবং এই সহরকে সুরক্ষিত করিয়াছি।”

প্রত্যাবর্তন

হাইতি দ্বীপের সন্নিকটে Santa Maria জাহাজ মাটিতে বসিয়া গেল এবং উহাকে আর উদ্ধার করা সম্ভব হইল না। সুতরাং কলম্বস Niña জাহাজে স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ৪০ জন নাবিককে উপনিবেশ গঠনের জন্য উক্ত দ্বীপে রাখিয়া যান। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলম্বস দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি Palos বন্দরে উপনীত হইলেন। সাত মাস পরে তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া দেশের লোক গভীর আগ্রহসহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। তিনি স্পেনের রাজসভায় গমনের পথে বার্সিলোনা প্রভৃতি সহরের মধ্য দিয়া গমন করেন। রাস্তার দুইধারে উত্তেজিত জনমণ্ডলী তাঁহাকে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিত। তিনি এক অপরূপ শোভাযাত্রা করিয়া যাইতেছিলেন—তিনি নিজে ও তাঁহার সহযাত্রী নাবিকদল ব্যতীতও ছয় জন বন্দী দেশীয় লোক, অনেক রকমের পশুপক্ষীও তাহার সঙ্গে ছিল। দেশীয় লোকগুলি সেই দেশের প্রথানুসারে দেহ চিত্রবিচিত্র করিয়াছিল। রাজসভায় কলম্বসকে রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও ও রাজ্ঞী ইজাবেলা খুব জাঁকজমক সহকারে অভিনন্দিত করিলেন।

রাজসভায় রাজা ও রাজ্ঞী কলম্বসের অদ্ভুত ভ্রমণ-কাহিনী মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করিলেন। পরে রাজ্ঞী নিজে

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলম্বসকে দ্বিতীয় অভিযানে যাত্রায় সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কলম্বসের দ্বিতীয় অভিযান

১৪৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলম্বস দ্বিতীয় অভিযানে যাত্রা করেন। প্রথম অভিযান অপেক্ষা দ্বিতীয় অভিযান বৃহত্তর আকারে গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার নিজের জাহাজ Marigalante খুব বৃহৎ ছিল ; সঙ্গে আরও দুইখানি বাণিজ্য-জাহাজ এবং ১৪ খানি ক্ষুদ্র জাহাজ ছিল। এই অভিযানে তিনি বহু দ্বীপ আবিষ্কার করেন ; তন্মধ্যে ডোমিনিকা ও জ্যামেইকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি আরও উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন ; দেশীয় লোকদের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল। Espiñolaতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, অন্য দ্বীপের দেশীয় লোকেরা Villa de Nevidad সহর আক্রমণ করিয়া তাহার সৈন্যদলকে ধ্বংস করিয়াছে। এই দ্বীপে তিনি আর একটি সহর প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; তিনি উহার নামকরণ করিলেন ইজাবেলা।

অতঃপর তিনি স্পেনে ফিরিয়া আসেন এবং সঙ্গে উক্ত দ্বীপসমূহের উৎপন্ন দ্রব্য বহু ফল ও ভুট্টা লইয়া আসেন। কলম্বস বুঝিয়াছিলেন যে, দেশীয় লোকদের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করা দরকার। ফলে তিনি তাঁহার লোকগুলিকে বশে রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে এই বিষয়ে সমর্থন করিতেন না। লুণ্ঠন, দস্যুবৃত্তি ও বলপ্রয়োগ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত ছিল ; তিনি উহা নিবারণে সমর্থ ছিলেন না।

তৃতীয় অভিযান

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কলম্বস তৃতীয় অভিযানে যাত্রা করিলেন। এই যাত্রায় তিনি আরও দক্ষিণে গমন করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূলে উপনীত হন এবং অরিনোকো নদীর মোহানা পর্যন্ত গমন করেন। এই সময়

তাঁহার উৎসাহবহ্নি সমতেজে জ্বলিতেছিল এবং বুদ্ধিবৃত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। ভ্রমণের কষ্ট, তীব্র উত্তাপ, পিপাসার যন্ত্রণা সমস্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতা সহকারে তিনি এই অভিযানেও সহ্য করিয়াছেন। কেপ ভার্ডিদ্বীপের নিকট গমন করিয়া তিনি ত্রিনিদাদে উপনীত হইলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"গৃহ, লোকজন এবং চতুর্দিকের দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর ;—সবুজ ও সতেজ যেন ভ্যালেন্সিয়ায় মার্চ মাসের উদ্যান।" তিনি আরও লিখিয়াছেন—"যেখানে অরিনোকো সমুদ্রে পড়িয়াছে, সেখানে সমুদ্রতরঙ্গ পাহাড়ের পাদমূলে আছড়াইয়া পড়িলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।" ত্রিনিদাদ হইতে পশ্চিমে তুঙ্গপর্বতমালা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, তিনি এক সীমাহীন ভূখণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন। অতঃপর তিনি পরিয়া নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এইস্থান পৃথিবীর সুন্দরতম দেশসমূহের অন্যতম। এই স্থানের লোকেরা তাহাদের ডোঙ্গায় করিয়া জাহাজে আসিত। তাহাদের অনেকের গলায় স্বর্ণখণ্ড দুল্যমান ছিল এবং তাহারা বাহুতে মুক্তার মালা পরিধান করিত।

ত্রিনিদাদ হইতে তিনি হাইতি দ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, উপনিবেশে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত। তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা স্বত্তেও তিনি উহাতে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হন।

নিষ্ঠুরতার অভিযোগ

এই সময় স্পেনে কলম্বসের জনপ্রিয়তা দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল। বিশেষত দেশীয় লোকগুলিকে স্পেনে লইয়া যাওয়া বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে রাজা ফার্ডিনাণ্ড কলম্বসের স্থানে Bobadilla নামক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। উপনিবেশ হইতে পলাতক ব্যক্তিরা প্রচার করিতে লাগিল যে, কলম্বস অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক; তিনি শাসনের অনুপযুক্ত। ফলে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া স্পেনে আনিবার আদেশ দেওয়া হইল।

রাজ্ঞী ইজাবেলাকে কলম্বস সমস্ত বিবরণ বলার পর তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত নিষ্ঠুরতার অভিযোগ প্রত্যাহৃত হইল।

শেষ অভিযান

১৫০২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস ভারতবর্ষের পথ বাহির করিবার জন্য শেষবার অভিযানে যাত্রা করিলেন। প্রবল ঝড় ও অসুস্থতা স্বত্ত্বেও কলম্বস মধ্য আমেরিকার হণ্ডুরাসে উপনীত হইলেন এবং মেক্সিকো উপসাগর আবিষ্কার করিলেন। অবশেষে জ্যামেইকা দ্বীপের অদূরে জাহাজ ডুবি হয় এবং কলম্বস আড়াই বৎসর পরে স্পেনে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল, ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী ইজাবেলার মৃত্যুর পর কলম্বস ফার্ডিনাণ্ডকে কলম্বসের পূর্ব কার্যের স্বীকৃতির জন্য যে অনুনয়-বিনয় করিলেন, তাহাতে কোন ফল ফলিল না। চঞ্চল পৃথিবী তাহার মহত্তম সন্তানের ঋণের কথা ভুলিয়া গেল!

শেষ জীবন ও মৃত্যু

ভগ্ন হৃদয়ে কলম্বস Valladolid নামক স্থানে গমন করেন। তাঁহার শেষ জীবন দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। অবশ্য তাঁহার দারিদ্র্যের কারণ তিনি কতকটা নিজে; যেহেতু তিনি জেনোয়া সহরের দরিদ্র লোকদের করভার হইতে রক্ষা করিতে গিয়া বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। শেষে তাঁহার এই উদারতাই শেষ জীবনে তাঁহাকে অর্থকষ্টে নিপাতিত করিল। সর্বোপরি তিনি যে ভারতবর্ষের পশ্চিমদিক্‌কার পথ আবিষ্কর করিতে পারিলেন না—তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থতার কূলে আছড়াইয়া পড়িল—এই চিন্তা তাঁহাকে অহরহ, দিনরাত্রি, শয়নে স্বপনে ব্যথিত করিত। কিন্তু তিনি একবারও হৃদয়ঙ্গম করেন নাই যে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার ভ্রমণই সর্বাপেক্ষা বিশেষত্বপূর্ণ!

অবশেষে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে কলম্বস পরলোক গমন করেন এবং ইহজগতের দারিদ্র্য অবস্থার হাত হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে

মানবের উপকারার্থ উৎসর্গীকৃত জীবনের এমন শোচনীয় পরিণতি আর দেখা যায় না।

কলম্বসের শেষ-বিশ্রামস্থান

কলম্বসকে সেভিলে সমাহিত করা হয়। তাঁহার পুত্র Diegoকেও কয়েক বৎসর পরে সেখানে তাঁহার পার্শ্বে কবর দেওয়া হইয়াছিল। পুত্রের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে উভয়কে হাইতি দ্বীপের স্যান্ ডোমিঙ্গো নামক স্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উভয়কে পুনরায় হাভানা লইয়া গিয়া সমাধি দেওয়া হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কিউবা দ্বীপ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হস্তগত হওয়ায় আজ কলম্বস শেষ বারের মত পুনরায় সেভিলে চিরবিশ্রামে নিমগ্ন আছেন।

সমাপ্ত

তুলসী-সপ্তশতিকা

শ্রীরামচরণ দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চম সর্গ

(১)

যত্ন অনুপম জানুবর সকল কলাগুণ-ধাম।
অবিনাশী অহ অব অমল ভৌ অহ তনু ধরি রাম ॥

কলাগুণধাম অবিনাশী রাম
অবতীর্ণ ধরি অমল দেহ ;
ইহা জানি মনে শ্রীরাম-চরণে
করহ মানব অনুপ স্নেহ।

(২)

সদা প্রকাশ স্বরূপবর অন্ত ন অপর ন আন।
অপ্রমেয় অদ্বৈত অজ যাতে দূরত ন জ্ঞান ॥

সদা স্বপ্রকাশ স্বরূপ তাঁহার
অন্ত নাই, নাই অপর আন ;
অপ্রমেয় অজ অদ্বৈত অখণ্ড
তিনিই আনন্দ তিনিই জ্ঞান।

(৩)

জানহি হংস রসাল কহ তুলসী সন্ত ন আন।
জাকি কৃপা কটাক্ষতে পাযে পদ নির্বাণ ॥

সূর্য আর রসে যেমন সম্বন্ধ
সনাতনে সন্তে নাহয় আন ;
যাঁহার করুণা- কটাক্ষের বলে
প্রাপ্ত হয়ে থাকে পদ নির্বাণ।

(৪)

তজত সলিল অপি পুনি গহত ঘটত বঢ়ত নহি রীতি।
তুলসী অহগতি উর নিরখি করিয় রামপদপ্রীতি ॥

বর্ষে জল পুন টেনে লয় তারে
বাড়েনা কমেনা কভু এ রীতি ;
কহিছে তুলসী এগতি বুঝিয়া
শ্রীরাম-চরণে করহ প্রীতি।

(৫)

চুম্বক আহন রীতি জিসি সন্ত ন হরি সুখধাম।
জানতিরীক্ষর সম সফরী তুলসী জানত রাম ॥

লোহ-চুম্বকের যেইরূপ রীতি
সেইরূপ সাধু আর সুখধাম ;
সফরীই বুঝে সলিলের গতি
সেরূপ তুলসী জানে শ্রীরাম ;

(৬)

ভরত হরত দরশত সবহি পুনি অদরশ সবকাহু।
তুলসী সুগুরু প্রসাদবর হোত পরমপদ লাহু॥

নদনদী ভরি দেখায় সকলে
হরণ করিয়া অদৃশ্য করে;
কহিছে তুলসী সুগুরু-প্রসাদে
এতত্ত্ব জানিয়া এভব তরে।

(৭)

যথা প্রত্যক্ষ স্বরূপ বহু জানত হৈ সব কোয়।
তথা হি লয় গতি কোলখব অসমঞ্জস অতি দোয়॥

যেরূপে প্রত্যক্ষ ভবে বহুরূপ
সকলেই তাহা জানিতে পারে;
যেক্রমে উদ্ভব সে ক্রমে বিলয়
তবে লয় কোথা লয় কি করে?

(৮)

যথা সকল অপি জাত অপ রবিমণ্ডলকে মাহিঁ।
মিলত তথা জীব রামপদ হোত উঁহা লৈ জাহি॥

যথা সব জল বাষ্পাকার ধরি
দিনেশ-মণ্ডলে করে গমন।
লয় না হইয়া পুনঃ ফিরে আসে
রামপদ হ'তে জীব তেমন।

(৯)

কর্ম কোষ সঙ্গ লে গয়ো তুলসী অপনি বানি।
জঁহা যায় বিলসৈ উঁহা পরৈ কহা পহিচানি॥

কর্মরূপ ধন সঙ্গে লয়ে যায়
কহিছে তুলসী স্বভাব-বশে;
যথা যায় তথা ভুঞ্জে কর্মফল
আপনারে বল চিনিবে কিসে?

(১০)

জ্যোঁ ধরণী মুহঁ হেতু সব রহত যথা ধরি দেহ।
ত্যোঁ তুলসী লে রাম সহঁ মিলত কবহু নহিয়েহু॥

পৃথিবী হইতে প্রকটে যেসব
পুনঃ পৃথিবীতে করে প্রবেশ;
পূর্বরূপে পুনঃ প্রকাশিত হয়
মিলেনা ধরাতে জানায় বেশ।

(১১)

শোষক পোষক সমুঝ শুচি রাম প্রকাশ স্বরূপ।
যথা তথা বিভু দেখিয়ে জিসি আদরশ অনুপ॥

স্বপ্রকাশ রূপ অনুপ আদর্শ
বিভুরাম মনে দেখ ভাবিয়া;
বিশ্বেরে শোষেন বিশ্বেরে পোষেন
বিশ্ব তাহে নাহি যায় মিলিয়া।

(১২)

কর্ম মিটায়ে মিটত নহি তুলসী কিয়ে বিচার।
করতব হি কো ফেরহৈ যা বিধি সার অসার॥

দেহের বিনাশে কর্ম নাশ নহে
তুলসী দেখেছে করে' বিচার;
করতব্য-ফেরে ফিরে জন্ম-মৃত্যু;—
সারে কি কখনও মিলে অসার?

(১৩)

এক কিয়ে হোয় দুসরী বহুরি তিসরো অঙ্গ
তুলসী কৈশেহু মা নশৈ অতি শৈ কর্ম-তরঙ্গ॥

ক্রিয়মান কর্ম সঞ্চিত করম
আরব্ধ করম আছে আবার;
তুলসি! কিরূপে কর্মনাশ হবে
বাসনা-বাতাসে ঢেউ অপার।

ক্রমশঃ

বঙ্গীয় দান্তে সভা

সান্ধ্য সম্মিলন

বিগত ৮ই নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে বঙ্গীয় দান্তে সভার অন্যতর সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের ৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ ভবনে উক্তসভার সান্ধ্য সম্মিলনোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই সান্ধ্য সম্মিলনে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য :—ডক্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার এবং মিসেস ও মিস্ সরকার, ইতালির কনসাল জেনারেল Commendatore Guiriati, Count Milesi, Dr. Bocchetto, Mr. Benasaglio, Dr. Carelli, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত জে এন বসু, পাইক পাড়ার কুমার বিমল সিংহ, খাঁ বাহাদুর কে এম্ আসাদুল্লা, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকীল, লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল এ সি চাটার্জি, ইয়োকোহামা স্পেসি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ওয়াই ইমাগোওয়া উক্ত ব্যাঙ্কের সাব-ম্যানেজার এম স্বজুকি, টি গোয়েঙ্কু একাউণ্টেণ্ট, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ট্রামওয়ে কোম্পানীর এজেণ্ট W. R. Pepper, ডেপুটি এজেণ্ট Prussell, ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত, ও সি গাঙ্গুলি, ডক্টর মণি মৌলিক, শ্রীযুক্ত সুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাসুদেব দত্ত, শ্রীযুক্ত বল্লভচাঁদ বড়াল, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত মধুসূদন দে, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ দত্ত, শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ লাহা, কুমারী আশা লাহা, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে।

বঙ্গীয় দান্তে সভার সভাপতি ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা অভ্যাগতবর্গকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষ ও ইতালির সভ্যতায় সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এক সময়ে ভারতবর্ষ ও ইতালির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। তিনি আরও বলেন যে, বঙ্গীয় দান্তে সভা প্রধানত ভারতবর্ষ ও ইতালির মধ্যে সেই সম্বন্ধ পুনঃসংস্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আশা করেন যে, ইহা দ্বারা ভারতবর্ষ বর্ত্তমান ইতালির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া অর্থনৈতিক প্রভৃতি সংস্কারে নবযুগের প্রবর্ত্তনে সমর্থ হইবে। ভারতবর্ষ প্রাচীন বা মধ্যযুগের ইতালীর সেই সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রয়াসী যাহার প্রভাবে ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বের কৃষিপ্রধান দেশ ইতালি বর্ত্তমানে কৃষি, শিল্প ও সামাজিক জীবনে নব নব সংস্কারের দ্বারা যুগান্তর আনয়নে সমর্থ হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত জে এন্ বসু সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, দান্তে সভাকে তিনি সাদরে অভিনন্দিত করিতেছেন, যেহেতু এই সভা দ্বারা ভারতবর্ষ ও ইতালির মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হইবে। ইতালির নিকট হইতে ভারতবর্ষের অনেক কিছু শিখিবার আছে; তিনি আশা করেন যে, বর্ত্তমান সভার প্রতিষ্ঠা দ্বারা উভয় দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা বর্দ্ধিত হইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবির বক্তৃতা কালে, ইয়োরোপের সঙ্কটকালে পৃথিবীর চিন্তাধারায় দান্তের দানের উপর বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, বর্ত্তমানেও বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করিতেছে; এখন কেবলমাত্র দান্তের প্রচারিত ঐক্যদর্শনই পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে। তিনি আশা করেন যে, দান্তে সভা সাধারণ কার্য্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গে দান্তের পুস্তকাবলীর গভীরভাবে ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে অধ্যয়নে উৎসাহদান করিবেন।

বঙ্গীয় দান্তে সভার প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যতর সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার বিভিন্ন জাতি, পেশা ও ধর্মের লোককে এই সভায় সমবেত হইতে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, ভারতবর্ষ ও বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের ঐক্যের উদ্দেশ্যেই সকলে সমবেত হইয়াছেন। অবশ্য ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই; কারণ, বর্তমানে ভারতের চিন্তাধারা বিশ্ব-প্রসারী এবং ভারত মানবোন্নতির প্রত্যেক বিভাগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমানতালে পা ফেলিতে উৎসুক। তিনি আশা করেন যে, যখন কনসাল জেনারেল Giuriati ইতালিতে ফিরিয়া যাইবেন, তখন তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে বলিবেন যে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন বিভাগে এমন বহু ব্যক্তি ও পরিবার বর্তমান, যাহাদের দৃষ্টি বিশ্বপ্রসারী এবং যাহারা ইতালীয় পণ্ডিত, ব্যবসায়ী ও প্রচারকগণের নিকট হইতে বন্ধুতা ও সহযোগিতার ইঙ্গিত সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। এই প্রসঙ্গে ডক্টর সরকার বলেন যে, ইহা খুবই সমীচীন যে, ইতালীয় কৃষ্টির প্রতি ভারতের অনুরাগ-বৃদ্ধির অনুষ্ঠান ডক্টর লাহা মহাশয়ের পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইল। কলিকাতার লাহা পরিবার, ঠাকুর পরিবারের মত শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও সঙ্গীতাদি বিদ্যাকে আধুনিকতাদানের অগ্রদূত।

অতঃপর ইতালির কনসাল জেনারেলকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে তিনি প্রথমে ডক্টর লাহা মহাশয়কে দান্তে সভা প্রতিষ্ঠার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, ইতালীয় এবং ভারতবাসী—উভয়ে উভয়কে বুঝিবার পক্ষে এই সভা বিশেষ উপযোগী হইবে। দান্তে সভা যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কার্যসৌকর্যার্থ ইতালি ও ইতালীয়গণ সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করিবে—এই বিষয়ে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন। দর্শকবৃন্দের করতালি ধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, ইতালির দান্তে সভা বঙ্গীয় দান্তে সভাকে সহস্রখণ্ড পুস্তক উপহার দিবে স্থির করিয়াছে। তিনি আশা করেন এই ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উভয় দেশের মঙ্গল সাধনে নিরত হইবে।

সমাগত অভ্যাগতবৃন্দকে জলযোগে পরিতৃপ্ত করার পর সান্ধ্য সম্মিলনের অবসান ঘটে।

চমকপ্রদ ফিল্মের গঠনপ্রণালী

ফিল্মকে বৃহত্তম করা বর্তমানে ফিল্ম-উপনিবেশের একটি প্রধান কাজ। ইহা দ্বারা প্রযোজকগণের প্রায় বার্ষিক ৫ লক্ষ পাউণ্ড খরচ কমে। বর্তমানে যে সমস্ত রোমাঞ্চকর ফিল্ম তাহাদের বিশালত্বের দ্বারা মানব-মনকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার অধিকাংই কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থার ফল।

পূর্বে যে ফিল্ম তুলিতে সহস্র সহস্র মাইল অতিক্রম করিতে হইত, এখন তাহা ক্ষুদ্রাকার চারিটি দেওয়ালের মধ্যে তোলা সম্ভব হইয়াছে। Elstree নামক স্থানে একটি দৃশ্য তোলা হইয়াছিল; উহাতে পটভূমিকায় একখানি নীল কাপড় ছাড়া আর কোন দৃশ্য ছিল না; কিন্তু যখন ঐ চিত্র যবনিকায় প্রতিবিম্বিত হইল, তখন দেখা গেল যে, নায়িকা বৃটিশের গ্রাম্য দৃশ্যের মধ্যে নায়কের সহিত কথা বলিতেছেন।

ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? বহির্দৃশ্য কিছু পূর্বে গৃহীত হইয়াছিল; উহা উজ্জ্বল সূর্যালোকে বসন্তের নব সৌন্দর্য-সম্ভারের মধ্যে মাত্র একজন ক্যামেরাম্যান গ্রহণ করে। আভ্যন্তরীণ দৃশ্য মলিন নীল কাপড়ের জন্য কোনরূপ পট-ভূমিকা ব্যতীত দেখা দিয়াছিল।

দ্বৈত-প্রক্রিয়া

পরে দ্বৈত-প্রক্রিয়ানুযায়ী বহির্দৃশ্য ও আভ্যন্তরীণ দৃশ্য একসঙ্গে ষ্টুডিয়োর মধ্যে পুনরায় গৃহীত হইবে, এবং এই পুনর্গঠিত ফিল্মই যবনিকায় বিম্বিত হয়।

অন্যরূপ প্রক্রিয়া এই যে, দৃশ্যাবলীর ফিল্ম যবনিকায় বিম্বিত করিয়া উহার সম্মুখে অভিনেতাগণ অভিনয় করে ও তখন চিত্র গৃহীত হয়। অধুনা দূরতম বহির্দৃশ্যের ছবি এইভাবে গৃহীত হইয়া থাকে।

হইয়াছে, কিন্তু এই ফিল্মের অধিকাংশ দৃশ্য উপরিলিখিত উপায়ে ষ্টুডিয়োর অভ্যন্তরে গৃহীত হইয়াছে। বাহিরের দৃশ্যনিচয় ফিল্ম তুলিবার কয়েক মাস পূর্বে গৃহীত হইয়াছিল, অতঃপর উভয় দৃশ্য একত্র মিলিত করিয়া ফিল্মকে পূর্ণতা দান করা হয়। এই চিত্রে Grete Nissenকে একটি ব্যাঘ্রের খাঁচায় ঢুকিতে দেখা যায় এবং এই অভিনেত্রী একটি ব্যাঘ্রের দ্বারা আক্রান্তও হন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি আদৌ বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করেন নাই। "Long shot" দ্বারা তাঁহার ছবিকে বাঘের খাঁচায় দেখান হইয়াছে; অতঃপর দ্বৈত-প্রক্রিয়া অনুসারে বাঘের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার দেখান হইয়াছে।

The Invisible Man চিত্র সকলকে বিস্ময়ে অভিভূত করে; কিন্তু উহা কিরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা চলে যে, Claude Rainsকে এই চিত্রে মস্তকহীন দেখা গিয়াছে ও তিনি এমন একখানি সাইকেল চড়িয়াছেন, যাহা দেখা যায় না। ইহার একটি উপায় এই—এমনভাবে সাজ-সজ্জা করা হয় যে, যাহাতে মস্তক ক্যামেরাতে দেখা যায় না; অবশ্য ইহার জন্য বিশেষ আলোকের বন্দোবস্ত করিতে হয়। অন্য প্রক্রিয়া এই যে, মাত্র যে অংশ ছবিতে দেখান হইবে, তাহাই সাজসজ্জা করিয়া উপযুক্ত পটভূমিকার পুরোভাগে ছবি গৃহীত হইয়া থাকে। অন্যান্য কৌশলপূর্ণ দৃশ্যগুলি দর্পণ ও কাচের সাহায্যে তোলা হইয়াছিল।

চমকপ্রদ ফিল্ম

King Kong ফিল্ম আজও হাজার হাজার দর্শককে চমক লাগাইয়া দেয়। এই ফিল্মের ডিরেক্টর Ernest B. Schoedsock ইহার সম্বন্ধে কিছু বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। সাধারণের ধারণা Kong মানুষ; উহাকে বৃহত্তর রূপে প্রতিফলিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহা সত্য নহে। কয়েকটি দৃশ্যে ক্ষুদ্র আকৃতি দেখা গেলেও, বৃহত্তর আকৃতির জন্য ষ্টুডিয়োতে অনুরূপ মূর্তি তৈয়ারী হইয়াছিল; উহার উচ্চতা ৫০ ফিট। এই মূর্তির প্রত্যেক অংশ নমনীয়; অন্যান্য প্রাণীরাও ঠিক অনুরূপ। ফিল্মের কিছু অংশ কার্টুন ছবির প্রক্রিয়ায় তৈয়ারী, অর্থাৎ প্রত্যেক অংশের সঞ্চালন স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, Kongএর বাহু-সঞ্চালন-চিত্র গ্রহণে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছিল,—প্রথমে সাধারণ দণ্ডায়মান অবস্থার চিত্র গৃহীত হইল; অতঃপর হাতখানি একটু নড়িল অমনি সেই চিত্র গৃহীত হইল; তারপর আবার একটুখানি নড়িল—অমনি উহা ক্যামেরার বুকে দাগ আঁকিয়া দিল—এইরূপে সুদীর্ঘ বিরক্তিকর প্রক্রিয়ায় এইটি গৃহীত হইয়াছে।

Kongএর সঙ্গে Pterodactylএর যুদ্ধ তুলিতে সাত সপ্তাহ লাগিয়াছিল। এই সব বিচ্ছিন্ন দৃশ্যাবলী যবনিকায় ধারাবাহিক বলিয়া অনুভূত হয়। জটিল প্রক্রিয়ায় তারের দ্বারা Kongএর চক্ষু ও মুখ সঞ্চালিত হইত।

দ্বৈত-প্রক্রিয়ায় Fay Wrayকে দৈত্যের থাবার মধ্যে দেখান হইয়াছে। Empire State Building দৃশ্যের জন্য সাতটি ফিল্ম একটির উপরে অপরটি সংস্থাপন করত অভিলষিত রূপ পাওয়া গিয়াছে।

"Flying down to Rio" চিত্রে বালিকাগণকে দূরশূন্যে আকাশযানের ডানার উপর নৃত্য করিতে দেখা যায়। অথচ ঐ দৃশ্য ষ্টুডিয়োতে তোলা হইয়াছে। ভূমি ও ছাদের মধ্যভাগে ৭ খানি আকাশযান ঝুলাইয়া রাখা হইল, তাহাদের ডানা দুলিতে লাগিল। এঞ্জিন গর্জন সুরু করিল যেন তাহারা পুরা দমে চলিতেছে। ১৫০টি আর্ক লাইট জ্বালা হইল। বৃহৎ ফ্যান প্রবল বাতাস দ্বারা শব্দ-কক্ষ হইতে গ্যাস দূরীভূত করিতে লাগিল। বালিকারা আকাশযানের ডানার উপর উঠিয়া নৃত্য সুরু করিল। অতঃপর তাহারা প্যারাসুট খুলিয়া লম্ফ প্রদান করে। ছবিতে দেখা যায় বালিকারা প্যারাসুট ধরিয়া ভাসিতে ভাসিতে মাটিতে পড়িতেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে বালিকারা মাত্র কয়েক ফিট লম্ফ প্রদান করিয়া ক্যামেরার বাহিরে অবস্থিত জালে পড়িয়াছিল। অতঃপর একত্র সংলগ্ন করিয়া বর্তমান চিত্র গৃহীত হইয়াছে, যাহাতে ইহা বলা চলে না যে, উহা ঠিক আকাশমার্গের দৃশ্য নহে।

একবার একটি কোম্পানী হলিউড হইতে দূরে গিয়া কতকগুলি দৃশ্য তোলে। উহাতে অনেক টাকা খরচ হয়।

ফিরিয়া আসিবার পর দেখা গেল, কয়েকটি দৃশ্যের চিত্র হারাইয়া গিয়াছে। পরে উহা কৌশলে নিষ্পন্ন হইয়াছিল —কোম্পানী পুনরায় উক্ত স্থানসমূহের দৃশ্যের জন্য সেখানে গমন করে নাই। অথচ যখন ফিল্ম দেখান হইল, তখন উহার কোন্ দৃশ্য প্রকৃত ও কোন্ দৃশ্য ষ্টুডিয়োতে তোলা, তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় নাই।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

পরলোকে পদ্মনাথ সরস্বতী

গত ১৩ই কার্তিক রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বাংলা ও আসামের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ সরস্বতী মহাশয় তাঁহার শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙ্গ গ্রামস্থ নিজ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

স্বর্গীয় পদ্মনাথ সরস্বতী মহাশয় বিগত ১৮৬৮ সালের ২১শে ভাদ্র তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। গত ১৮৮৬ সালে তিনি শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল হইতে এন্‌ট্র্যান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং আসামী ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এফ এ পরীক্ষায় তিনি একটি সিনিয়র স্কলারসিপ পান এবং ইতিহাস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য মেডেল প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৮৯০ সালে তিনি ঢাকা কলেজ হইতে ইংরাজী, সংস্কৃত ও দর্শন শাস্ত্রে অনার্স সহ বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা কলেজ হইতে ইতিপূর্বে আর কেহ তিন বিষয়ে এক সঙ্গে অনার্স সহ বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। ১৮৯৩ সালে ঢাকা কলেজ হইতেই ইংরাজী ভাষায় তিনি এম এ পাশ করিয়া শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজে ইংরাজী, সংস্কৃত, লজিক ও ইতিহাস শাস্ত্রের অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করেন। বাকী জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি অধ্যাপনার কাজেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। গত ১৯২৩ সালে গৌহাটি কটন কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের সিনিয়র প্রফেসারের কাজ করার সময় তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এক সময়ে তিনি উক্ত কলেজের অস্থায়ী ভাইস প্রিন্সিপ্যালের কাজও করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত পদ্মনাথ সরস্বতী ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ হইলেও একজন প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি সর্বত্র বিদিত। এম এ পরীক্ষা পাশ করিবার পূর্বেই তিনি ঢাকা সারস্বত সমাজ হইতে উপাধিলাভ করেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় তাঁহাকে তত্ত্ব-সরস্বতী উপাধি প্রদান করেন। বিগত ১৯২২ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন।

পণ্ডিত পদ্মনাথ সরস্বতী বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিগত ১৯১১ সালে তিনিই কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি এখন সরকারী সাহায্যে পুষ্ট হইয়া একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে এবং আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে এই সমিতি অনেক অনুদ্‌ঘাটিত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থেরও বহু উপাদান তিনি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য যে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয় তাহাও তিনি স্বয়ং বহন করেন।

স্বর্গীয় পদ্মনাথ সরস্বতী মহাশয় একজন অত্যন্ত রক্ষণশীল পণ্ডিত ছিলেন। এজন্য তিনি অনেক সময়ে অনেকের বিরাগভাজন হন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা অসাধারণ ছিল। এক সময়ে কোন ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য তাঁহাকে এক হাজার টাকার প্রলোভন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু উহা তাঁহার সংস্কার-বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি উহাতে স্বাক্ষর করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ ম্যাকমিলান কোম্পানী তাঁহাকে স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়া দিবার জন্য কয়েক বার বহু টাকার প্রলোভন দেখাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার গবেষণাকার্যে ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তিনি উহাতে রাজী হন নাই। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও সরল জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত দুর্গমতীর্থ তিনি পরিভ্রমণ করেন ও প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া

তিনি নিজ গ্রামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী ছিলেন।

৩।৪ বৎসর পূর্বে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। উহার পর হইতে তিনি সংসার হইতে এক প্রকার নির্লিপ্ত অবস্থায় জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি দুইটি পুত্র এবং তিনটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ ভট্টাচার্য এম এস-সি, এম বি, ডি টি এম, ডি পি এইচ মহাশয় বর্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগে কাজ করিতেছেন।

শিক্ষা সমাচার

দুগ্ধের অদ্ভুত ব্যবহার

ইতালীয়গণ কর্তৃক দুগ্ধ হইতে পশম তৈয়ারী করিবার চেষ্টা হইতেছে। মানুষের ব্যবহারোপযোগী বহু প্রকার দ্রব্য আছে তন্মধ্যে দুগ্ধই প্রধান দ্রব্য হইতে চলিয়াছে। ইহাই মানবের প্রথম খাদ্য এবং প্রায়ই শেষ খাদ্য। দুগ্ধ হইতে বোতাম, ব্রুচ, চুড়ি, ইয়ারিং প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। দুগ্ধ হইতে কেসিন বাহির করিয়া এই সকল দ্রব্য তৈয়ারী হয়। শীঘ্রই দুগ্ধের কম্বল বাজারে বাহির হইবে। দুগ্ধ হইতে রাগ প্রস্তুত হইতেছে। ক্ষুরের হাতল দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হয়, টুথ ব্রাসের হাতল, চিরুণী প্রভৃতি সবই দুগ্ধ হইতে তৈয়ারি হয়। দুগ্ধ হইতে তৈয়ারী পশমের জামায় দুগ্ধ নির্মিত বোতাম লাগাইয়া শীত নিবারণ করা যায়। আহার্য রাখিবার বাটি দুগ্ধ দ্বারা নির্মিত হয়, চামচও দুগ্ধ হইতে নির্মিত। কাগজের উপর পালিশ দুগ্ধ দ্বারা হয় ও তাহার উপর দুগ্ধ-নির্মিত ঝরণা-কলমে লেখা হইয়া থাকে।

সঞ্জীবনী

বিনা খরচায় ছাতা তৈয়ারী শিক্ষার ব্যবস্থা

বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত সমাজে বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলার শিল্প-বিভাগ বিনা ব্যয়ে ছাতা তৈয়ারী শিক্ষা দেওয়ার জন্য নূতন ছাত্রদল ভর্তি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমুদয় ছাত্রদিগকে ছাতার বাঁট বক্র করান ও চিহ্ন দেওয়া এবং ছাতা তৈয়ারি করা শিক্ষা দেওয়া হইবে। পূর্বের মতই ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী, ক্যানাল সাউথ রোড, ইটালী, পাগলাডাঙ্গা ও কলিকাতায় শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং ছয় মাসে এই শিক্ষা শেষ হইবে।

বাংলাদেশের বেকার যুবকগণের মধ্যে যাহারা শিক্ষা-লাভের পর জীবিকার্জনের জন্য শিল্প-ব্যবসা চালাইতে স্থিরসঙ্কল্প এবং সে বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদানে প্রস্তুত, শুধু তাহাদিগকেই ভর্তি করা হইবে।

বাংলার কথা

ত্রিপুরা রাজ্যে বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা

ত্রিপুরার মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অনুমোদনা-নুসারে আগামী মাঘ মাস হইতে আগরতলা মিউনিসি-প্যালিটির এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রবর্তিত হইবে। এই আইন কার্যে পরিণত করার জন্য ঠাকুর কিশোরীমোহন দেববর্মণ, ঠাকুর সতীশচন্দ্র দেববর্মণ, মুন্সী আবদুল আজিজ উকিল এবং বাবু সতীশ চন্দ্র বসুকে লইয়া এক এডুকেশন বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

শিক্ষা সমাচার

বাংলা-মায়ের রূপ

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ত্রিশ বৎসর পূর্বে ঢাকার ফরাশগঞ্জে যে ঝুল্যমান লৌহপুল দেখিয়াছিলাম, এইবার তাহার চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম—তাহার স্থানে নবীন স্তম্ভসমন্বিত পুল সান্ধ্যছায়ায় দণ্ডায়মান। পথে যাইতে যাইতে আনন্দ-আশ্রমের কথা ভাবিতে লাগিলাম। বহু বালিকা এই আশ্রমে শিক্ষালাভ করিতেছে, কিন্তু ইহাদের ভবিষ্যৎ কি? আজ যে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে নারীপ্রগতির একটা বিরাট্ স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, ইহার পরিণাম কি? আর এই যে পাশকরা বিদ্যা লব্ধ হইতেছে, তাহারই বা সার্থকতা কোথায়?

রাত্রিকালে যেমন বিবিধ পক্ষী বিশাল বটবৃক্ষের শাখায় কুলায় রচনা করিয়া বাস করে, তেমনই এই বালিকারা আশ্রমের বুকে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, কয়েক বৎসর একত্র বাসের পর সকলেই ব্যক্তিগত গণ্ডীর মধ্যে চলিয়া যাইবে, কিন্তু এই ব্যক্তিগত গণ্ডীর অভ্যন্তরে কাহার জীবন কিভাবে নির্বাহিত হইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। নারীপ্রগতির পক্ষপাতীরা যাহাই বলুন না কেন, আমি বহুক্ষেত্রে দেখিয়াছি, যাহারা আশ্রমে বা হোষ্টেলে থাকিয়া অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষায় কিছুকাল কাটায় সেই সমস্ত বালিকারা পরবর্তীজীবনে গৃহ-ধর্মপালনে অপটু হইয়া পড়ে। তাহাদের দেহ কঠোর পরিশ্রমের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং রোগের চিরনিবাসভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এবং তাহাদের হৃদয় হইয়া পড়ে স্নেহ-মমতা-দয়া-মায়ালেশহীন ঊষর মরুভূমি। অবশ্য দুই একটি ব্যতিক্রম দেখা গেলেও, তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্ম-সুখপরায়ণ, স্বার্থপর ও বাহ্যিক আমোদ-প্রমোদে অনুরক্ত হইয়া থাকে। তাহাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা এত অধিক হইয়া থাকে যে, ঠিক প্রকৃতস্থানে স্নেহ-ভালবাসা নীড় বাঁধিতে পারে না। ইহা স্বাভাবিক যে, যেভাব যত ব্যাপক, তাহার গভীরতা তত কম, তবে মহাসমুদ্রের কথা বা ভগবান্ কিম্বা তত্তুল্য লোকের কথা স্বতন্ত্র—উহা সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তাই বাংলার নারীপ্রগতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মর্মাহত হইতে হয়। বাঙালী পরিবারের মধ্যে যে ভাঙন ধরিয়াছে, তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়।

ট্রামে, বাসে বা রাস্তায় কর্ণাচ্ছাদী কেশকলাপসমন্বিতা হাইহিলজুতাপরা কঙ্কালসারদেহ বিচিত্রবর্ণের সাড়ী পরিহিতা মহিলাগণকে যখন সগর্বে চলাফেরা করিতে দেখি, তখন ভাবিয়া আকুল হই—কোথায় গেল বাঙালীর সে লোকললামভূত সৌন্দর্য, কোথায় সে সুগঠিত দেহ যাহা কৃষ্ণবর্ণ সাঁওতাল রমণীকে বিশ্বকবির চোখেও অপরূপ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে!

আজ যে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের অভাবের দারুণ হাহাকারে দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ হইতেছে, আমার মনে হয়, তাহার অন্যতম কারণ এই নারীপ্রগতি। নারীরা প্রগতিশীলা হইয়া সংসার-কর্মে উদাসীনা; নারীর যাহা কল্যাণকর ধর্ম—স্বামীপুত্রের সেবা, রন্ধন, গৃহস্থালীর কার্য,—তাহা উপেক্ষিত হইল; গৃহলক্ষ্মী চিররুগ্না; সন্তান-সন্ততিও তথৈচব; কাজেই ঝি, চাকর ও রাঁধুনী গৃহে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল; ফলে উপার্জন যদি ঠিক তদনুপাতে না হইল, তবে যে অভাবের জ্বালা দিবারাত্রি ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? অথচ একদিন ছিল, যখন পল্লীর মেয়েরা ৭০।৮০ জন লোকের রান্না ও পরিবেশন নিজেরা করিয়াছেন কোথায় আজ বাংলার সেই স্বাস্থ্য-শ্রীসম্পন্না পল্লীনারী, আর কোথায়

এই বিংশ শতাব্দীর বীণা-পুস্তক-হস্তা 'হাড্ডী-সাররঙ্গিণী' রোগ-জালমণ্ডিতা আধুনিকা!

ত্রিশ বৎসর পরে আবার বাংলাবাজারের ধূলি-ধূসর গলির মধ্য দিয়া পটুয়াটোলার পুস্তকের দোকানের ধার দিয়া, ৩নং আসক লেনে শিক্ষা-সমাচারের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের অগ্রজ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে উপনীত হইলাম।

বিশ্রামান্তে সন্ধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত বুড়ীগঙ্গার ধারে বেড়াইতে বাহির হইলাম। তাঁহার নিকট শুনিলাম বর্তমান নারীপ্রগতির কল্যাণে, তাঁহারা রাত্রি একটু গভীর না হইলে বুড়ীগঙ্গার ধারে বেড়াইতে আসিতে পারেন না।

রাত্রি দশটায় শাস্ত্রী মহাশয়র নিকট বিদায় লইয়া নারায়ণগঞ্জে যাত্রা করিলাম। নারায়ণগঞ্জে সাধু নাগ মহাশয়ের বাড়ী দেখার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু রাত্রিকালে তাহা সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয়ত নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিয়া পুনরায় বাহাদুরাবাদের গাড়ীতে উঠিতে হইয়াছিল। তবে নারায়ণগঞ্জ পূর্বে বহুবার দেখিয়াছি, শীতালক্ষা নদীর তীরবর্তী এই বাণিজ্যবন্দর আমাকে বিশেষ আনন্দ দান করিত। নারায়ণগঞ্জ একটা পাটের ব্যবসার স্থান; অনেক ইংরেজ কোম্পানীর পাটের অফিস নারায়ণগঞ্জে বর্তমান। এতদ্ভিন্ন আরও বহুবিধ দ্রব্যের দোকান-পশার নারায়ণগঞ্জের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছে।

রাত্রি ১১॥৫টায় গাড়ী ছাড়িয়া ঢাকা ষ্টেশনে উপনীত হইল। এইস্থানে গাড়ী প্রায় একঘণ্টা থামিল। এইস্থানে জনৈক যাত্রীর সহিত মালের পয়সা লইয়া কুলীর বিরাট্ বচসা দেখিলাম। 'একহাতে তালী বাজে না'—দোষ উভয় পক্ষের ছিল।

রাত্রি ১টা কয়েক মিনিটে গাড়ী ঢাকা ষ্টেশন ত্যাগ করিল। ঢাকার একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম—মাড়োয়ারীর কোন দোকান নজরে পড়িল না। এই বিষয়ে ঢাকাকে বাহাদুরী দিতে হয়।

সারা রাত্রি নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিয়া প্রভাতে ময়মনসিংহ ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। পরিচিত কাহাকেও দেখিলাম না। সিংজানি অতিক্রম করিয়া ৯-৪০ মিনিটে বাহাদুরাবাদঘাটে উপনীত হইলাম। আবার ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিতে হইল। তখন মধ্যাহ্নসূর্য আকাশ প্রদীপ্ত করিয়া বিরাজমান। ১১-৩৫ মিনিটে তিস্তামুখঘাট পাইলাম, এই স্থান হইতে গাড়ী প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ছাড়িবে, সুতরাং হোটেলে ভোজনার্থ যাওয়া গেল। এই হোটেল এক অপরূপ পদার্থ। নদীর বালুচড়ে টিনের ছাউনি রচনা করিয়া হোটেল চালান হইতেছে। হোটেলে দক্ষিণা দিতে হইল বোধ হয় একটা সিকি; আহারের সময় পাইলাম—মোটা চাউলের অন্ন, ডাল, চচ্চরি ও একটি পার্শে মাছের ঝোল। একটি ভদ্রলোক আহারে বসিয়া আর একটি মাছের জন্য ঠাকুরের সঙ্গে যেরূপ কলহ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই লজ্জাকর। হোটেলের ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে; অথচ বহু যাত্রী এই হোটেলে আহারাদি করিতে বাধ্য হয়। যদি কেহ উন্নত প্রণালীতে একটা হোটেল চালাইবার চেষ্টা করেন, তবে বোধ হয় নেহাৎ মন্দ হইবে না, তিনিও লাভবান্ হইবেন, যাত্রীরাও আহার করিয়া বাঁচিবে। অবস্থাভেদে দুইটি শ্রেণী রাখা যাইতে পারে—সাধারণ ও বিশেষ। যাহার যেমন রুচি ও সঙ্গতি, তিনি সেইরূপ শ্রেণীতে আহারাদি করিবেন।

বেলা ১টায় গাড়ী ছাড়িয়া রাত্রি ১১টায় সান্তাহারে পৌঁছাইয়া ছিল। পথে বগুড়া ষ্টেশনে বহু যাত্রীকে করতোয়া তীরবর্তী পীঠস্থান হইতে প্রত্যাগত হইতে দেখিয়াছিলাম। আমার উক্ত পীঠস্থান দেখার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সম্ভব হয় নাই।

সান্তাহারে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস ধরিয়া ভোর পাঁচটায় কলিকাতা ফিরিলাম।

পাহাড়পুরের পথে

বগুড়া জেলার পাহাড়পুর বঙ্গদেশে প্রত্নতত্ত্ববিদের একটি তীর্থস্থান। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি এই স্থানে একটি স্তূপ আবিষ্কার করিয়াছেন; উহা বর্তমানে ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অন্তর্গত। এই স্থানে যাইতে হইলে

দিব্রজে বা গোশকটে যাতায়াত করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেল বা এক্সপ্রেস গাড়ী জামালগঞ্জে থামে না, সুতরাং নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া ঈশ্বরদি-পার্বতীপুর প্যাসেঞ্জারে উঠিলাম ও ভোরবেলা জামালগঞ্জ ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম।

অজানা-অচেনা উত্তর বঙ্গের গ্রাম্য ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একটি লোককে পাহাড়পুরের পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে একটি রাস্তা দেখাইয়া দিল। পথের দুইধারে লোকের বাস। কিছুদূর গিয়া একটা বাজারের মত স্থান দেখিলাম, শুনিলাম এখানে সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে। বাজার অতিক্রম করিয়া মেঠো গ্রাম্য পথে অজানা লক্ষ্যের দিকে যাত্রা আরম্ভ হইল। তখন প্রাতঃসূর্যের হেমাভকিরণ পথের দুই ধারের হেমন্তের শিশিরশিক্ত ইক্ষুপত্রের উপর পড়িয়া চিক্‌চিক্ করিতেছিল। পথ জনহীন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। একটি গ্রাম্য কৃষক-বালকের সঙ্গে দেখা হইল, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"আপনি কুন্ ঠাই যাইবেন ?"

আমি উত্তর করিলাম—"পাহাড়পুর !"

বালকটি আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আপ্‌নাদের বাড়ী কুন্ ঠাই ?"

আমি উত্তর দিলাম—"কলিকাতা।"

বালকটির কথা বলার ভঙ্গী একটু বিশেষত্বপূর্ব, কথায় এক প্রকার টান আছে। বালকটি ইক্ষুক্ষেত্রে প্রবেশ করিল, আমিও গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলাম। কোথাও জীর্ণ বেড়ার ফাঁক দিয়া কৃষক-রমণী পথের দিকে তাকাইতেছে; কোথাও বালকের দল প্রভাতসূর্যালোকে পুকুর ধারে খেলা করিতেছে; একটি তন্বী কিশোরী সিক্ত-বস্ত্রে কলসী কক্ষে জল লইয়া যাইতেছিল; আমাকে দেখিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, যেন আমি একটা আশ্চর্য কিছু আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছি !

অবশেষে দূরে উচ্চ রক্তিমাভ পাহাড়ের মত কি একটা বস্তু দৃষ্ট হইল। পথচারী একটা লোকের নিকট জানিতে পারিলাম, উহাই পাহাড়পুর। একস্থানে রাস্তা ভাঙ্গা; সেই স্থানে প্রায় একহাঁটু জল। জুতা খুলিয়া উহা পার হইতে হইল, অবশ্য গোযান উহা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে।

বেলা ৯টার সময় পাহাড়পুরে উপনীত হইলাম। প্রথমে অফিসে গিয়া নগদ দুই আনা দক্ষিণা দিয়া উহা দেখিবার টিকিট লাভ করিলাম। একটি চৌকিদার আমার সঙ্গে চলিল। পথ উচ্চঘাস ও কণ্টকগুল্মে সমাচ্ছন্ন। উহা একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কত সুন্দর সুন্দর মৃত্তিকানির্মিত মূর্তি ঐই স্তূপ বা বিহারের শোভা বর্ধন করিয়াছে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বর্ণনায় হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। স্তূপের উপরিভাগেও ওঠা যায়। শুনিলাম, উক্ত উচ্চস্থান হইতে খনন আরম্ভ করিয়া নিম্নে একটি কূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্তূপটি দেখিতে কতকটা পিরামিডের মত, তবে চতুষ্কোণ। চৌকিদারটি ঘুরিয়া ঘুড়িয়া সমস্ত দেখাইল। আরও কয়েকটি কূপ স্তূপের অদূরে, বিহারের সীমার মধ্যে দেখিলাম। একস্থানে চৌকিদারটি কালীমূর্তির অবস্থিতিস্থান দেখাইল; কিন্তু উহার কোন স্বরূপ চিহ্ন দেখিলাম না, উহাকে নিছক কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতে পারিলাম না। এখনও জঙ্গল পরিষ্কার হয় নাই বলিয়া চারিদিকের সমস্ত মূর্তিগুলি দেখা গেল না; তবে যতটা সম্ভব দেখিলাম।

এই স্তূপপাদমূলে দাঁড়াইয়া কত কথাই মনে পড়িল। কোথায় আজ তাহারা যাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিল এই স্তূপ ও বিহার; যাহাদের শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ধ্যানসমাহিত মূর্তি জীবনের পথে পথে কত গৌরবচ্ছটাই না বিকীর্ণ করিত সে অতীত যুগে; সব কালের ফুৎকারে অনন্তের কোলে মিশিয়া গিয়াছে। পড়িয়া আছে এই ধ্বংসস্তূপের বুকে স্মৃতির ক্ষীণ রেখা।

এমনি করিয়াই মানুষ যুগে যুগে চাহিয়াছে কালকে জয় করিতে; কিন্তু বিশ্ববিজয়ী মহাকালের গতি কোথাও স্তব্ধ হইয়া নাই—চলিয়াছে অবিরাম অবিশ্রামগতিতে দিক্ হইতে দিগন্তরে।

চৌকিদারের তাড়নায় ফিরিয়া আসিতে হইল বাহ্য-জগতে। স্তূপ দেখা শেষ করিয়া মিউজিয়াম দেখিলাম। বহু ভগ্নমূর্তি মিউজিয়ামে রাখা হইয়াছে। স্তূপে যাহা

দেখিয়াছি, মিউজিয়ামে তাহার পুনারাবৃত্তি চোখে পড়িল—নূতন কিছুই দেখিলাম না। মিউজিয়াম হইতে বাহির হইয়া চৌকিদারকে বিদায় করিয়া বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইল, কিন্তু এইস্থানে আহারের কিছুই পাইলাম না; শুনিলাম ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হাটে না গেলে কিছু মিলিবে না। অগত্যা সেই পূর্বনির্দিষ্ট পথরেখা ধরিয়া ষ্টেসনের দিকে চলিলাম। যদি কোন বাঙালী ভদ্রলোক এই স্থানে সামান্যপ্রকারের একটা খাবারের দোকান খুলিতে পারেন, তবে কিছু লাভ হইতে পারে।

বেলা প্রায় ১১টার সময় ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী বাজারে উপনীত হইলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় খাবারের দোকান যাহা আছে, তাহার দ্রব্যগুলি মানুষের অখাদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অগত্যা এক দোকানদারকে কিছু পয়সা বেশী দিয়া কয়েকখানা গরম নিমকী ভাজাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করি। পল্লীগ্রামে যাহা সুলভ, সেই চিড়ে-দইও এইখানে পাই নাই। দুঃখের কথা বটে!

রাঙাপাড়ায় দ্বিতীয়বার

বেলা ১২টায় মিক্সড্ ট্রেণ ধরিয়া ঈশ্বরদি উপনীত হইলাম এবং ঈশ্বরদি হইতে আসাম মেল ধরিয়া রাঙাপাড়া যাই। পথে পার্বতীপুরে গাড়ী পরিবর্তন করিয়া রাঙাপাড়াগামী থ্রু গাড়ীতে উঠি। আমি উঠিয়া দেখিলাম, আমার পূর্বেই অন্য একটি ভদ্রলোক বেশ বিছানা পাতিয়া অনেকটা স্থান দখল করিয়া বসিয়াছেন। আমিও তাঁহারই পাশে খানিকটা স্থান দখল করিলাম। তাহার পরেই গাড়ীতে ভিড় অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল, সর্বশেষ যখন একটি ভদ্রলোক একটি মহিলা ও তাহার শিশুসন্তানকে লইয়া আরোহণ করিলেন, তখন গাড়ীতে স্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং মহিলাটিকে স্থান দান করিতে গিয়া আমরা উভয়ে স্থান সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইলাম। এই ভদ্রলোকের নাম শ্রীসুবোধকুমার সেন গুপ্ত, তিনি মাজবাট নামিবেন।

নিশীথরাত্রির স্তব্ধতায় বনপথ অতিক্রম করিয়া যথাকালে রাঙাপাড়া পৌঁছিলাম! এইবার চা-বিস্কুটের উপর নির্ভর না করিয়া একটি হোটেলে উপনীত হইলাম এবং ভাতের ব্যবস্থা করিয়া বাঙালীর প্রাণরক্ষার উপায় করিলাম। হোটেলে রেলওয়ে মেল-সার্ভিসের অনেক ভদ্রলোক ও কলিকাতা টাউন স্কুলের একজন শিক্ষকের সহিত আলাপ হইল।

ফিরিবার পথে গাড়ীতে একজন ভদ্রলোকের সহিত ভারতীয় ইতিহাসের মহারাষ্ট্রীয় পরিচ্ছেদ লইয়া দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত আলোচনা চলিয়াছিল। তিনি ইতিহাসের ছাত্র-ছিলেন। সুতরাং আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম—"পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়ের পরাজয়ের প্রধান কারণ কি?"

ভদ্রলোক উত্তর করিলেন—"মহারাষ্ট্রীয়েরা এই সময় মোগলের অনুকরণে বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল; দ্বিতীয়ত বহু স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, বালকবালিকা তীর্থযাত্রার জন্য তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, যাহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা খুব কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তৃতীয়ত আহমদ্‌সা আবদালিকে পশ্চিম হইতে পূর্বপ্রান্তে খাদ্যভাণ্ডারপূর্ণ স্থানে আসিতে দেওয়া মহারাষ্ট্রীয়দের পক্ষে মারাত্মক রকম ভুল হইয়াছিল, কারণ তখন আক্রমণকারী ও আক্রান্ত ব্যক্তির বিভেদ লুপ্ত হইয়া হিন্দু-মুসলমান এই দুই পক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। সর্বশেষ মহারাষ্ট্রীয় অধিনায়কের অহঙ্কার পতনের শেষ সোপানে পৌঁছাইয়া দিল।"

গল্পগুজবে রাত্রি বেশ সুখে কাটিয়া গেল। পার্বতীপুর হইতে পুনরায় দিনাজপুর হইয়া নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেশে কলিকাতা ফিরিলাম।

ডায়মণ্ড হারবার

টিকেটের মেয়াদের শেষ দিনে কলিকাতা ফিরিলাম, অথচ তখনও কয়েক ঘণ্টা বেশ বেড়ান চলে। সুতরাং বেলা ২টার সময় ডায়মণ্ড হারবার যাত্রা করিলাম। পূর্বে বারুইপুর পর্যন্ত আমার দেখা ছিল; উহার পর আর আমি অগ্রসর হই নাই।

পল্লীকুটীর অতিক্রম করিয়া নারিকেল বাগানের পাশ দিয়া, বটবৃক্ষের শাখাপল্লব কাঁপাইয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

বারুইপুরে ডাবের জল পান করিলাম। বেলা ৪টার সময় ডায়মণ্ডহারবার পৌছিলাম। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া সোজা রাস্তা ধরিয়া নদীর ঘাটের দিকে চলিলাম। ডায়মণ্ড হারবারের প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু নদী; এরূপ সুপ্রশস্ত নদী নাকি বাংলার অন্য কোথাও নাই। পথের ধারে পোষ্ট অফিস, থানা, কোর্ট প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে নদীর তীরে উপনীত হইলাম। কাঠের সিঁড়ি নদীর জলের ধার পর্যন্ত নামিয়াছে। তীরে দাঁড়াইয়া নদীর অপর তীর দেখিলাম—নদী বৃহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু মেঘনা-পদ্মার সঙ্গমস্থল যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে ডায়মণ্ড হারবারের নদী তেমন বৃহৎ অনুভূত হইবে না। বড় রাস্তা এই একটি। তবে বৃহৎ বৃহৎ বট-অশ্বত্থ বৃক্ষের সারি পথের দুইধারে রোপিত থাকায় রাস্তাটিকে বেশ ছায়াময় ও শ্যামল করিয়া রাখিয়াছে। দেওয়ালির পূর্ব-দিন ছিল বলিয়া স্থানে স্থানে আতসবাজীর দোকান, অন্যান্য মনোহারী দ্রব্য ও ফলমূলের দোকান বসিয়াছে দেখিলাম। ষ্টেসনে ফিরিয়া চা-পানান্তে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

৪-৫৬ মিনিটের গাড়ীতে ডায়মণ্ড হারবার ত্যাগ করিলাম। পথে রেলগাড়ীর ধারে ধারে পল্লীকুটীরে ও ধনীর বিলাসমন্দিরে আলোর খেলা বেশ মনোরম মনে হইয়াছিল। বিশেষত শ্যামল বৃক্ষরাজির অভ্যন্তরে গৃহাদি অবস্থিত থাকায় আলোর সৌন্দর্য যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। অবশেষে ৭-১৪ মিনিটে কলিকাতা পৌছিয়া দশ টাকার টিকেটের অবাধ ভ্রমণ শেষ করিলাম।

দশ টাকায় ৪,৩৫৬ মাইল ভ্রমণ

নিম্নে আমার ভ্রমণের তালিকা মাইল অনুসারে দিলাম, ইহাতে সুস্পষ্ট দেখা যাইবে যে, দশ টাকায় কত হাজার মাইল ভ্রমণ সম্ভব হইয়াছে।

দুইবার কলিকাতা-রাঙাপাড়া	যাতায়াত	২০১৮ মাইল
দুইবার পার্বতীপুর-দিনাজপুর	,,	৭৬ ,,
পার্বতীপুর-আমিনগাঁও	,,	৪৪২ ,,
কলিকাতা-যোগবাণী	,,	৭৭৪ ,,
পার্বতীপুর-জয়ন্তী	যাতায়াত	২১৪ মাইল
কলিকাতা-নারায়ণগঞ্জ	,,	৭৫৮ ,,
কলিকাতা-ডায়মণ্ডহারবার	,,	৭৪ ,,
		৪,৩৫৬ মাইল

উপসংহার

দীর্ঘ ভ্রমণের অবসান হইল, বাংলা মায়ের অপরূপ রূপ—অখণ্ড মাতৃমূর্তি দেখিলাম প্রাণ ভরিয়া। দেখিলাম—শৈলকিরিটিনী কাননকুন্তলা বাংলা-মায়ের ভীমগম্ভীর ছবি জয়ন্তীর বুকে যেখানে অবাধ বিচরণশীল হরিণশিশুর নির্ভয় চঞ্চল গতিতে মুগ্ধ হইয়া অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে হয়; দেখিলাম—নেপালের সীমান্ত দেশে ও আসামের ঘনারণ্যে বঙ্গজননী তাঁহার শ্যামাঞ্চল বিস্তৃত করিয়াছেন। দেখিলাম—রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, ঢাকায় জননীর শস্য-সমৃদ্ধ ধনভাণ্ডার—শ্যামায়-মান ধান্যক্ষেত্র দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত; ফল-ভারাক্রান্ত বৃক্ষরাজি জননীর চরণমূলে পূজোপহার প্রদান করিতেছে; শরতের শেফালিদল জননীর কমনীয় কণ্ঠে পুষ্পহার দুলাইয়া দিতেছে; স্নেহময়ী হাস্যময়ী জননী পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, শীতললক্ষা, ব্রহ্মপুত্রের ফেনোচ্ছ্বসিত কলনাদে ছুটিয়া চলিয়াছে, রোগীর রোগযন্ত্রণা ভুলাইয়া দিয়া, ভোগীর প্রাসাদরাজি মুখরিত করিয়া, যোগীর ভজন-কুটিরের পাদমূল ধৌত করিয়া—কি সে অবাধ মুক্ত গতি। কি সে অনাবিল শান্ত-স্নিগ্ধ ছন্দ!

দেখিয়াছি হে মাতঃ বঙ্গ, তোমার রাজরাজেশ্বরী রূপ চট্টলের বুকে—পাদমূলে সমুদ্রতরঙ্গ আছড়াইয়া পড়ে; অভ্রভেদী তুঙ্গশীর্ষে মৃগাঙ্কমৌলির সুধা-ধবলিত আবাস-নিকেতন; কর্ণফুলী মেখলার আকারে কটি-দেশ বেষ্টন করিয়া বিরাজমানা; দেখিয়াছি জননি, বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়ায় তোমার গৈরিকপরিহিতা যোগিনীবালার অপরূপ ধ্যান-সমাহিত মূর্তি; দীর্ঘ শালবনের অন্তরালে পিক-পাপিয়ার কণ্ঠমুখর সান্ধ্যছায়ায় রাখাল বালকের পথ-চলা; 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ আমার মানসপথে

৺গোষ্ঠবিহারী ধর

(১৮৭১—১৯২৫)

উদাসীর পদ-রেখা অঙ্কিত করিত; শ্যামল তালীবন-পরিবেষ্টিত পল্লী-সরোবরে পল্লী-রমণীর কঙ্কণ-ঝঙ্কার দূরাগত বংশীনিনাদের মত শ্রুতিসুখকর মনে হইয়াছে; দেখিয়াছি মাতঃ, ঢাকা-ফরিদপুর-বাখরগঞ্জের জলপথে তোমার স্নেহ-ধারা গৃহস্থের সুখ-সমৃদ্ধির উপাদান বহন করিত; পল্লী-গৃহস্থের ঘরে ঘরে প্রচুর মৎস্য উপহার দিত; দেখিয়াছি নোয়াখালি-বাখরগঞ্জের সমুদ্র-শীকর-সিক্ত নারিকেল-সুপারির ঘনারণ্য, যাহার সহিত দক্ষিণ ভারতের কোচিন-মালাবারের উপমা চলে।

দেখিয়াছি জননি—তোমার কল্যাণময়ী মূর্তি—মঙ্গল-হস্ত দিকে দিকে সম্প্রসারিত; গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদী বহন করে তোমার পুণ্য-পীযুষধারা; হরিৎ ক্ষেত্র দিগন্তের বুকে দুলাইয়া দেয় তোমারই স্নেহাঞ্চল। দেখিয়াছি সজল-জলদজালে এলায়িতকেশা রুদ্রতাণ্ডবে ভীমা-ভয়ঙ্করী মূর্তিতে আষাঢ়-সন্ধ্যায় তোমার নব-জাগরণী মূর্তি; শরতের কমলবনে তোমার হাস্য-প্রফুল্ল মুখচ্ছবি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

আর দেখিয়াছি—তোমার প্রদত্ত অমূল্য সম্পদের প্রতি উদাসীন বাঙালী; চিনিল না জননী তোমাকে তোমারই সন্তান—দিশেহারা, লক্ষ্যভ্রষ্ট, পরদ্বারে অন্নের কাঙাল! হে জননী, আমাদের দাও সুমতি, যেন তোমার যে রত্নভাণ্ডারদ্বারে আসিয়া,

'ভাটিয়া খায় লুটিয়া অন্ন উড়িয়া করে বাসা'
মাড়োয়ারী তোমার দেশে বাস করছে খাসা।'

সেই রত্নভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করিয়া ধন্য হইতে পারি; তোমারই বনতলে যে অম্লান পরিমল পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া ধরণীর বুকে ধীরসমীরে গন্ধ ঢালিয়া দেয়, তাহা চয়ন করিয়া তোমারই চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।

তবে বর্ষণ কর মা জননি তোমার স্নেহাশিস্-ধারা আমার মস্তকে, হউক স্নিগ্ধ-শীতল উত্তপ্ত শীর্ষ; তবে হাস্যময়ী মূর্তিতে উদয় হও মা জননি শরতের কুন্দেন্দু-তুষারশুভ্র মেঘদলে, বনান্তের শ্যামছায়ায়, ফাল্গুনের ফুলবনে, চৈত্রের বিচিত্র নিসর্গশোভায়; বাঙালীর জীবনে, মনেপ্রাণে প্রবাহিত কর নব নব ভাবধারা, যাহার বিশ্বপ্লাবী প্রবাহ জগতের মালিন্যকালিমা দূর করিয়া তোমার চরণতলে উপহার দিবে জগদ্বাসীর অবিচলিত ভক্তি।

সমাপ্ত

স্বর্গীয় গোষ্ঠবিহারী ধর

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(১)

১২৭৭ সালের (১৮৭১ খৃষ্টাব্দ) মাঘ মাসে গোষ্ঠবিহারী ধর মহাশয় চুঁচুড়ায়, তাঁহাদের পঞ্চাননতলাস্থিত গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর সুবর্ণবণিক্।

গোষ্ঠবাবুর পিতার নাম নসীরাম ধর। নসীরাম বাবুর তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ গোষ্ঠবিহারী, মধ্যম বিপিন-বিহারী এবং কনিষ্ঠ বঙ্কুবিহারী। ধর মহাশয়দিগের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত হিরণ্য গ্রামে, মেমারী ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল দূরে। নসীরাম বাবু তিনবার বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রথমা ও দ্বিতীয়া পত্নী—উভয়েই পর পর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৃতীয় বার তিনি চুঁচুড়ার বড় শীলের বাটীর বদনচন্দ্র শীল মহাশয়ের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার এই পত্নীর গর্ভেই গোষ্ঠবিহারী প্রভৃতি তিন ভ্রাতার জন্ম হয়।

অন্যূন ৬০।৬৫ বৎসর পূর্বে নসীরাম বাবু নিজের

জাতীয় ব্যবসা সম্পর্কিত একখানি সোনা-রূপার পোদ্দারী দোকান করেন। কলিকাতায় ৫নং রামচন্দ্র ঘোষ লেনে (চুলীপাড়ায়) তাঁহার নিজ বাসভবন ছিল। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে তিনি কলিকাতার বাড়ী বিক্রয় করিয়া, চুঁচুড়া পঞ্চাননতলায় একখানি বাড়ী খরিদ করেন; এবং সেইখানেই বসবাস পূর্বক খড়ুয়া বাজারের সন্নিকটে একটি পোদ্দারী দোকান স্থাপন করেন। তিনি অতিশয় ধর্মভীরু লোক ছিলেন। মামলা-মোকদ্দমা করিবার জন্য তিনি কখনও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্য অনেকেই তাঁহাকে প্রবঞ্চনাপূর্বক ক্ষতিগ্রস্ত করে। অনুমান ৫৫।৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

পিতার মৃত্যুকালে গোষ্ঠবিহারীর বয়স ১৬।১৭ বৎসর ছিল। শৈশবে চুঁচুড়ার বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতায় গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে (ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী) এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত পড়েন। এই সময়ে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহার স্কন্ধে বিপুল সংসার-ভার পড়িল, সেইজন্য তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হয়। বাধ্য হইয়া তিনি কলিকাতার কোন সওদাগরী অফিসে একটি কাজ জোগাড় করেন।

গোষ্ঠ বাবুর পিতা মৃত্যুকালে তেমন কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মৃত্যুর পূর্বে তিনি নানাবিধ জটিল রোগে বহুদিন পর্যন্ত চিকিৎসাধীন থাকায়, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে চুঁচুড়ার বাড়ী বিক্রয় করিতে হয়।

শৈশব হইতেই গোষ্ঠ বাবু বিশেষ মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন। অফিসের কাজ ছাড়া সকাল ও সন্ধ্যায় তিনি ছাত্র পড়াইয়াও কিছু উপার্জন করিতেন। এইভাবে দুই তিন বৎসর চাকুরী করিবার পর তিনি ঐ কর্মে ইস্তফা দেন। জ্যেষ্ঠতাত পুত্রের সহিত মিলিয়া তিনি পোদ্দারী কার্য শিক্ষা করেন। তখন জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রের দোকান ছিল—৩৫৬নং আপার চিৎপুর রোডে। এই সময় তিনি চুঁচুড়ার বাস তুলিয়া, ছোটভাই দুইটির সহিত কলিকাতায় আগমন করেন। পোদ্দারী দোকানের কার্য ব্যতীত তিনি ইমারতি সরঞ্জামের একটি দোকানও চালাইতেন।

একুশ বৎসর বয়সে গোষ্ঠবাবু চুঁচুড়া নন্দীপাড়ার ব্রজনাথ নন্দীর কনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ কার্ত্তিকচন্দ্র, মধ্যম নীলরতন ও কনিষ্ঠ গোপীনাথ।

জ্যেষ্ঠতাত পুত্রের নিকটে থাকিয়া কার্যশিক্ষার সময়ে গোষ্ঠবাবু তাঁহার নিকট হইতে মাসিক ২০।২৫৲ টাকা হিসাবে পাইতেন। বিবাহের ২।৩ বৎসর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা গোষ্ঠবাবুকে অন্যত্র চাকুরীর সন্ধান করিতে বলেন। মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া গোষ্ঠবাবু তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ১৩০৩ সালে নিজে একটি পোদ্দারী দোকানের পত্তন করেন। এই সময় হইতেই গোষ্ঠবাবুর সৌভাগ্যের সূচনা হয়। ক্রমে ক্রমে তিনি কনিষ্ঠ দুই সহোদরের সাহায্যে এই দোকানের বিশেষ উন্নতি করেন। সততা ও নিষ্ঠা তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল,—ইহারই সাহায্যে তিনি ব্যবসায়ে অর্থ, প্রতিপত্তি ও সুনাম অর্জন করেন। ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া তিনি ২২নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্তীর লেনে (গরাণহাটা) বসতবাটী, চুঁচুড়া কামারপাড়া বাজারে ও খড়ুয়া বাজারে দুইখানি বাড়ী ও দমদমায় বাগজালা লেনে বাগান খরিদ করেন।

উন্নতির শীর্ষে উঠিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কেও তিনি নিকটে রাখিয়া আজীবন একান্নবর্তী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ও তাঁহারই স্নেহসিক্ত ও অনিন্দ্য আচরণে প্রীত হইয়া, তাঁহার অনুগত থাকিয়া জীবনযাপন করেন।

১৩১০ সালে ৩৪।৩৫ বৎসর বয়সে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যভগ্ন হয় এবং তিনি ইহারই দুই বৎসর পরে ১৩১১ সালে, জননী, পত্নী ও ভগ্নী প্রভৃতিকে লইয়া তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন।

এই সময় হইতেই তাঁহার দেশভ্রমণে অনুরাগ জন্মে। ফলে তিনি ভারতের বহুতীর্থ ভ্রমণ করেন। তীর্থভ্রমণ-কালে তিনি প্রত্যেক তীর্থের ইতিহাস ও বিবরণ একখানি খাতায় লিখিয়া রাখেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্কুবাবুর অনুরোধে প্রথমে তিনি কয়েকটি বিবরণ তাঁহাদের

বাড়ী হইতে, প্রকাশিত ও বন্ধুবাবুর সম্পাদিত 'বসুধা' নামক মাসিক পত্রে ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তৎপরে সাধারণের আগ্রহ ও উৎসাহে ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসে (১৯১০ খৃষ্টাব্দ) 'তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া তিনি পরে—

১৯১২ খৃষ্টাব্দে	দ্বিতীয় ভাগ
১৯১৩ ,,	তৃতীয় ভাগ
এবং ১৯১৪ ,,	চতুর্থ ভাগ

প্রকাশ করেন। ইহার পরে 'ত্রিতীর্থ' নামে তাঁহার আরও একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই শেষোক্ত পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য।

গোষ্ঠ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বন্ধুবিহারী ধর মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক। ১৩০৮ (১৯০১ খৃঃ) সালে তিনি 'বসুধা' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাইশ বর্ষ সগৌরবে এই পত্রিকা বন্ধুবাবুর সম্পাদনায় পরিচালিত হইয়া বন্ধ হয়। অক্ষয়-চন্দ্র সরকার, অক্ষয়কুমার বড়াল, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি দে, ব্রজবল্লভ রায় প্রভৃতি বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এতদ্ব্যতীত বন্ধু বাবু বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার স্থাপিত 'বসুধা এজেন্সী' হইতে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

শেষ জীবনে স্বীয় ব্যবসা-কর্মে নিযুক্ত থাকিয়াও গোষ্ঠ বাবু সাহিত্য-সেবায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি একজন ধার্মিক ও আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার গ্রন্থসমূহ পাঠেও ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।

পুস্তক চারিখানি প্রকাশের জন্য তিনি প্রভুত পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় করেন। গ্রন্থ কয়খানিতে তাঁহার অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণের নিকট পুস্তকগুলি সাগ্রহে আদৃত হইয়াছিল। বাংলার প্রবীণ সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই গ্রন্থ-কয়খানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :—

"কতকটা সখের খাতিরে, কতকটা স্বাস্থ্যের জন্য যৌবনে অনেক তীর্থেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আজ আবার বৃদ্ধ বয়সে ঘরে বসিয়া আগ্রহের সহিত 'তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী' পড়িলাম।

"দেখিলাম, এই নূতন লেখক এক নূতন পন্থায় তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের খাঁটি হিন্দুত্ব—সব প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থের গুণপণা এই যে, ইহাতে সমাসের ছড়াছড়ি, অলঙ্কারের হুড়াহুড়ি নাই। ভাষাটি বেশ সরল, স্নিগ্ধ ও শান্ত—যেন বাঙালীরই ঘরের কথা, আর গ্রন্থকারের গুণপনা এই যে পরের মুখে ঝাল না খাইয়া ধর্মপ্রাণ হিন্দুর পবিত্র চক্ষে তীর্থ সম্বন্ধে মাহাত্ম্যসকল খুঁটিনাটী কথা কহিয়া সাধারণের অজ্ঞেয় বহু তত্ত্বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই গ্রন্থের এক খণ্ড সঙ্গে থাকিলে বিদেশে গিয়া সহচরের অভাবে কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় না; কেন না, কোন্ তীর্থে কি দর্শনীয়, কি করণীয়, কোন্ পূজায় কোন্ দ্রব্য প্রয়োজনীয়, স্থানের অধিবাসীরা কোন্ জিনিষকে কি নামে অভিহিত করে, এ সকল কথা বেশ নিপুণতার সহিত বিশদ্ভাবে বোঝান হইয়াছে।"

কয়েক বৎসর ধরিয়া গোষ্ঠবাবুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; ১৩৩০ সালে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। বহু অর্থ ব্যয় ও নানাবিধ চিকিৎসা সত্ত্বেও তিনি আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে ১৩৩২ সালের (১৯২৫ খৃঃ) ১১ই অগ্রহায়ণ তিনি পরলোক গমন করিলেন।

'তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনীর' প্রথম ভাগ ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ১৭৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী* হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের মূল্য এক টাকা। গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ৪ পৃষ্ঠা, ভূমিকা তিন পৃষ্ঠা, পরিশিষ্ট (পশ্চিম তীর্থযাত্রার আবশ্যকীয় দ্রব্যের তালিকা)- এবং সূচীপত্র ৫

* বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের নাম "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স"।

পৃষ্ঠা আছে। প্রথম ভাগে নিম্নলিখিত ১৬খানি হাফ্‌টোন চিত্র আছে:—

১। গ্রন্থকার গোষ্ঠবিহারী বাবুর ছবি
২। বুদ্ধগয়া
৩। কাশীর বিশ্বনাথ ও অপরাপর মন্দির
৪। প্রয়াগের খসরুবাগের দৃশ্য
৫। হরিদ্বারে গঙ্গার সম্মুখের দৃশ্য
৬। দিল্লীর হুমায়ুন-মস্‌জিদ্‌
৭। মথুরার বিশ্রাম-ঘাট
৮। গিরি-গোবর্ধন
৯। গোবর্ধনের মানসী গঙ্গা
১০। শ্যামকুণ্ড
১১। শ্রীধাম বৃন্দাবনের শেঠজীর মন্দির
১২। আগ্রা এম্‌দাদ্‌ উদ্যানের রামবাগের দৃশ্য
১৩। জয়পুরের শ্রীগোবিন্দ জীউ
১৪। কালীঘাট
১৫। শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর দেব জীউর মন্দির
১৬। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব জীউর মন্দির

তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনীর প্রথম ভাগ গ্রন্থকার স্বীয় মাতার নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই ভাগে বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, জয়পুর, পুষ্কর, বৈতরণী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরী, দ্বারকা, কালীঘাট ও তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানের বিবরণ আছে। ১১৯টি বিষয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিভিন্ন তীর্থস্থানের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ, তাহাদের বৈশিষ্ট্য, সেখানে কি কি করণীয়, থাকিবার স্থান, খরচপত্র ও প্রণামী প্রভৃতির পূর্ণ পরিচয় ১১৯টি অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এক কথায় তীর্থযাত্রীর পক্ষে যাহা কিছু জানা দরকার তাহা এই গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়।

গ্রন্থকারের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, বর্ণনাশক্তি পরিস্ফুট এবং গুছাইয়া বলিবার ভঙ্গীও সুন্দর। তিনি ভক্তিমান্ ও বিশ্বাসী, তাঁহার লেখার ভিতর ভক্তি ও বিশ্বাসের একটা ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই ফলে, গ্রন্থখানি ভক্ত তীর্থযাত্রীর নিকট আদরের বস্তু হইয়াছে।

ক্রমশঃ

জাতীয় সংবাদ

সুবর্ণবণিক্ যুবকের ইয়োরোপ-যাত্রা

চুঁচুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ পরিতোষকুমার মণ্ডল সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হইবার উদ্দেশ্যে বিলাত গমন্ করিয়াছে। শ্রীমানের বয়স ২২ বৎসর। আমরা তাহার সাফল্য কামনা করি।

দান

ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা চুঁচুড়া অনাথ ও দুঃস্থ ভাণ্ডারের গৃহনির্মাণকল্পে ১০০০৲ টাকা দান করিবার অঙ্গীকার করিয়া প্রথম দফায় ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এবং কুমার শ্রীগোকুলচন্দ্র লাহা ও কুমার শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র লাহা যক্ষ্মা-নিবারণ-ভাণ্ডারে প্রত্যেকে ২৫০৲ টাকা হিসাবে দান করিয়াছেন।

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর মানসিক-রোগ-চিকিৎসালয়ে ৫০০৲ শত টাকা দান করিয়াছেন।

ডক্টর শ্রীবিমলচরণ লাহা অধ্যাপক গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদারের Some Aspects of Indian Civilization গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য ১৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীবলাইচাঁদ আঢ্য

মিঃ বি সি চট্টোপাধ্যায় ও সুবর্ণবণিক্

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্বনামখ্যাত আইনবিদ্ ও বঙ্গীয় হিন্দু সভার সভাপতি মিঃ বি সি চট্টোপাধ্যায় "অমৃত বাজার পত্রিকা"য় এক পত্র-প্রসঙ্গে লিখেন :—

"I maintain that the Moslem and the so-called scheduled caste Hindus have the same intellect potentially as high caste Hindus. The Sahas, Telis, Subarnabaniks, Tantubayas and Mahishyas, who were admittedly backward educationally a generation or two ago, have since educated themselves into a status of absolute intellectual equality with the high caste Hindus".

এই উক্তি সুবর্ণবণিক্ জাতির মর্যাদাহানিকর বোধে, তাহা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিয়া ১১।১০।৩৮ তারিখে তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম—কিন্তু তাহার কোনও উত্তর না পাইয়া, "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় যে প্রতিবাদ করি, তাহার সারমর্ম নিম্নে যথাযথ উদ্ধার করিয়া দিলাম—৩১শে অক্টোবর তারিখে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে :—

"Social status of Subarnabaniks.

Regarding Mr. B. C. Chatterjee's letter about the percentage in the Bengal services, Mr. Balai Chand Adhya of Balaram Street, Chinsurah protests against Mr. Chatterjee's observation that the Subarnabaniks have educated themselves to a status of equality with the high caste Hindus, in as much as it implies that they are among the lower castes. Mr. Adhya points out that the very name 'Subarnabanik' marks them out as Vaishyas and the Government Notification too has not placed them under the scheduled castes. The correspondent therefore points out that Mr. Chatterjee is wrong in classing Subarnabaniks with Sahas, Telis, Tantubayas etc."

উপরে যে সরকারী বিজ্ঞপ্তিপত্রের কথা বলা হইল—তাহা ১৯৩৫ সালের ২১শে জুন তারিখে কলিকাতা

গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। সুবর্ণবণিক্ জাতি সম্বন্ধে সকল কথা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জানা না থাবাই সম্ভব—কিন্তু আশা করিয়াছিলাম যে ভুলটি দেখান হইলে তিনি তাঁহার ভ্রান্ত ও আপত্তিকর উক্তি প্রত্যাহার করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

শ্রীবলাইচাঁদ আঢ্য

পাত্র-পাত্রী সংবাদ

একটি সুন্দরী সুবর্ণবণিক্ পাত্রী আবশ্যক। পিতা জমিদার, পাত্র বি এ পড়ে, সবিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রাদি প্রেরিতব্য।

শ্রীচারুচন্দ্র দে
৪নং ক্রুকেড লেন, চুঁচুড়া

প্রেরিত পত্র*

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা

মাননীয় "সুবর্ণবণিক্ সমাচার" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

স্বীয় বৈষয়িক কার্যব্যপদেশে এবং আত্মীয়-বান্ধবগণের সহিত দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সম্প্রতি কলিকাতায় গিয়াছিলাম। কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের নবনির্মিত সমাজভবনের পশ্চাতে, শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ দত্ত ডাক্তার ভায়ার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত দেখা হইতেই প্রথম সাক্ষাতেই তিনি বলিলেন,—"সমাজের বিজয়াসম্মিলনীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন কি ?" কথাটার ঝঙ্কারে, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, লুপ্তস্মৃতি জাগ্রত হইল—বড় মর্মবেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম।

স্মরণাতীত কাল আমরা নিজ নিজ পল্লীতে নিজ নিজ সমাজের বেষ্টনীর মধ্যে, তিমিরাচ্ছন্নাবস্থায়, পুরুষানুক্রমে কাটাইতেছিলাম। আপনারা আমাদের আলোকে আনিলেন, বলিলেন,—"ওগো তোমরা আমাদের স্বজাতি, তোমরাও যে কুলে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আমরাও তাই, এস একসঙ্গে মিশি, একভাবে ভাবান্বিত হইয়া পরস্পরের মঙ্গলের পথের সন্ধান করি, বৈবাহিক আদান-প্রদান করতঃ পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করি, সমাজ মধ্যে নানা প্রকারের যে সকল কুপ্রথা আছে তাহা নিরাকরণ করিয়া, সমাজমঙ্গলকর নীতি প্রবর্তন করতঃ সমস্ত সুবর্ণবণিক্ জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া অন্যান্য জাতির সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া জীবন্ত প্রাণবাণ্ জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করি।" "বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী" নাম দিয়া, আপনারা তাহার কর্ণধার হইয়া, আমাদের আহ্বান করিলেন, যোগদান করিতে আদেশ করিলেন। আমরা সুদূর পল্লীবাসী আপনাদের সুখশ্রাব্য মধুর ডাকে মোহিত হইয়া বঙ্গদেশের যেখানে যে ছিলাম, এমন কি আসাম হইতেও অনেকে আসিয়া সম্মিলনীতে যোগদান করিতে লাগিলাম; বৎসরান্তে সম্মিলনী-ক্ষেত্রে সমবেত হইতাম, আপনাদের সুচিন্তিত উর্বর মস্তিষ্কের পরিস্ফুট কল্পনা সভাস্থলে আলোচিত হইয়া সর্ববাদিসম্মত গৃহীত প্রস্তাব আমরা দেশে ফিরিয়া গিয়া পল্লীর স্বজাতিগণকে ডাকিয়া সভা করিয়া সকলকেই অবগত করাইতাম এবং যাহাতে উক্ত প্রস্তাব কার্যকরী হয়, এবং সর্বতোভাবে তত্রস্থ সমাজের সকলেই জানিতে পারেন তজ্জন্য উদ্বোধিত করিতাম, আমরা নিজেরাও সযত্নে প্রতিপালন করিতাম। এইরূপ কার্য দ্বারা পল্লী-সমাজের বহুদিনের বদ্ধমূল সংস্কার দূরীভূত হইয়া, নবোদ্ভাবিত সংস্কার দ্বারা উহা পরিচালিত হইবার সুযোগ লাভ করিল।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ পরমকল্যাণদায়িনী সম্মিলনী-

উৎসব আমাদের আর হয় না, জানিনা কোন্ অজ্ঞাত শত্রুর নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে এই পরম শুভঙ্করী সমাজমঙ্গল-দায়ক প্রতিষ্ঠানটি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আমাদেরই সর্বনাশ সাধিত হইল, আমরা "যে তিমিরে সে তিমিরে" থাকিতে বাধ্য হইলাম। আমরা কত শত গণ্ডগ্রামের পল্লীবাসী বৎসরান্তে প্রাণে কত আশা-উৎফুল্লতা লইয়া সুদূরদেশে সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া অভিযান করিতাম, সভাক্ষেত্রে, আবাসস্থানে, বাসগৃহে জগদ্বরেণ্য মনীষী মহানুভব স্বজাতিগণের সহিত মিলিত হইয়া অভাব-অভিযোগ-দুঃখদৈন্যের বিষয় উত্থাপন করিতাম, তৎপ্রতিকারের সমাধান করিতাম। এই সুযোগে যে সকল মহাজনের সঙ্গ লাভ করিতাম তাহা আরাধনা করিয়াও আমাদের ন্যায় নগণ্যের পক্ষে দর্শন সম্ভব হয় না;—মহারাজা, রাজা, বিদ্বান্, ধনবান্, মহীয়ান্, গরীয়ান্ মনীষিগণের সঙ্গসুখলাভ, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ-আপ্যায়ন প্রভৃতি দ্বারা যে সৌভাগ্য লাভ করিতাম তাহাতে জীবন সার্থক ও ধন্য মনে করিতাম, যে আনন্দ যে সুখ অনুভূত হইত তাহা ভাষাতীত। এই পরমানন্দ-জড়িতাবস্থায় দেশে প্রত্যাগমন করিয়া অন্যান্য সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতাম,—"ওগো আমরা পতিত নহি, আমরা ঘৃণ্য নহি, আমরাও উন্নত, আমরাও শ্রেষ্ঠ।" এই মনোবৃত্তি সদাসর্বক্ষণ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আনন্দবিভোর প্রাণে সংসার-পথে চলিয়াছি। যুগপৎ এবম্প্রকার স্মৃতিগুলি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়া হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইল, সেই সময়ে সমাজমন্দিরে আসিয়া আমাদের পরম প্রীতিভাজন, জাতির কল্যাণকামী, দেশবরেণ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি প্রীতিসহকারে আমার সহিত সম্ভাষণাদি করতঃ বিজয়া-সম্মিলনে যোগদান করিতে অনুরোধ করিলেন। অনুরুদ্ধ হইয়া অনাহূত স্বত্বেও যথাসময়ে সভায় যোগদান করিলাম। দেখিলাম স্বজাতি-মুখোজ্জ্বলকারী জগদ্বরেণ্য পরমকল্যাণীয় কুমার শ্রীমান্ ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, সমাজ-মন্দিরের নানাবিধ কল্যাণজনক বিষয় অভিভাষণে সকলের গোচরীভূত করিলেন, বহুবহু সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাজনের আগমন ও মিলন হইয়াছে, আমার এই মর্মবেদনা-প্রদায়ক প্রস্তাবটি আলোচনা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু অভিভাষণের পরেই গীত কৌতুকাদি নানাবিধ আয়োজন থাকায় আমি সেই মহতী সভায় আমার দুঃখবারতা জানাইবার সুযোগ পাইলাম না, কিন্তু আবেগ সাম্য হইল না, তৎপরদিন প্রাতে গিয়া উপেনবাবুকে প্রাণের ব্যথা সবিস্তারে বিবৃত করিলাম। তিনিও সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন এবং ইহা সমাচারে প্রকাশ করিতে আদেশ দিলেন।

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী যে উদ্দেশ্য লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল কয়েক বৎসর তাহার অনুশীলনে, আশাতীত সাফল্য আমরা লাভ করিয়াছি, ইহা প্রত্যেক স্বজাতি একবাক্যে মানিয়া লইবেন ও স্বীকার করিবেন। যে কোনও কারণে ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহা নিরাকরণকল্পে নিম্নে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অভিব্যক্তি করিতেছি, সমাজ-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি এবং আমার পরিকল্পনা ও পন্থা নির্দেশ করিতেছি।

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ মহদনুষ্ঠানের তিরোধান সম্বন্ধে আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর সমস্ত বিষয়েরই অনভিজ্ঞতা থাকিলেও এই মাত্র বলিতে পারি যে, কর্ণধারগণ যদি অভিনিবেশপূর্বক সচেষ্ট হন, তাহা হইলে ইহার পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। আমার মনে যে যে অন্তরায়-গুলি জাগিতেছে, তাহা এবং তাহার প্রতিকারোপায় বিবৃত করিলাম, সমাজের কর্তৃপক্ষগণ দয়ানুকম্পা করতঃ একবার দৃষ্টি করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

(১) যে দেশে সম্মিলনীকে আহ্বান করিবেন তাঁহারা তদ্দেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ করুন এবং তাঁহাদের সাধ্যানুসারে আড়ম্বরশূন্য আহার্য দ্বারা উপস্থিত স্বজাতিগণের সেবা করুন।

(২) কোন সমিতি হইতে সম্মিলনীতে সমাগত স্বজাতি-নারায়ণগণের আহার্য জন্য আড়ম্বরশূন্য সহজ সংক্ষেপ-ব্যয়সাধ্য খাদ্যের তালিকা করিয়া দেওয়া হউক, তদূর্ধ্ব

(৩) কেন্দ্র সমিতি একটি ফণ্ড স্থাপন করিবেন, সর্ব স্থানের সভ্যগণ তাহাতে এককালীন বা মাসিক চাঁদা দিবেন, সংগৃহীত অর্থ হইতে সভ্যগণের স্থিরীকৃত এবং তথাকার আবশ্যক পরিমাণ অর্থের, সম্মিলনী যেখানে হইবে সেই স্থানে, কতকাংশ দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

(৪) সম্মিলনীতে আগত প্রত্যেক সভ্যই যেখানে যেরূপ ডেলিগেট ফি স্থিরীকৃত হইবে, প্রথমে সেখানে গিয়াই তাহা জমা দিয়া রেজেষ্ট্রীতে নাম লেখাইয়া দিবেন, এই প্রথার অনুশীলন না করিলে তিনি সভ্য পদবাচ্য হইতে পারিবেন না।

(৫) প্রত্যেক স্বজাতি মনে ধারণা রাখিয়া প্রত্যেকেই অর্থসাহায্যের প্রবৃত্তি মনে জাগ্রত রাখিয়া যোগদান করিবেন।

আমি মনে করিতেছি যে, উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে প্রতি বৎসরই পূর্বাকারের ন্যায় সম্মিলনী আহ্বানের ও উৎসবের কোনও অসুবিধা হয় না। আমার জীবনের এই তৃতীয় প্রহরে সম্মিলনী-উৎসব যে স্থানে অবধারিত হইবে, আদেশ করিলে আমি বহুপূর্বে তথায় গিয়া আমার সমস্ত শক্তি দ্বারা তথাকার কার্যোদ্ধারের সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি, এই প্রসঙ্গে আমাদের পরম সুহৃদ্ সমাজ-সংস্কারের প্রধান উদ্যোক্তা মধুরভাষী পরলোকগত যশোহর-নিবাসী ৺অশ্বিনীকুমার চন্দ্র মহাশয়ের কথা প্রাণে জাগিয়া শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি। অর্থে, ঐশ্বর্যে, বিদ্যায় তিনি অনেক নিম্নস্তরে অবস্থান করিলেও তাঁহার সম্মিলনীর সেবা আদর্শজনক,—যেখানে সম্মিলনী আহূত হইত, তিনি সর্বরকমে সাধ্যানুসারে সাফল্যের জন্য আগুয়ান হইতেন, তাঁহার ঐকান্তিক সাধনা—অনেক সময়ে অসাধ্য সাধন ও সংঘটন করিয়াছে।

আমি দীন, স্বজাতিনারায়ণগণের চরণপ্রান্তে আমার এই অব্যক্ত মর্মব্যথা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, যতটুকু শক্তি তদ্দ্বারা এই বিষয়টি অবগত করাইতে প্রয়াসী হইয়াছি, আশা করি আমার ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করতঃ, মাত্র আমার লিখিত ভাবটি গ্রহণ করিয়া ইহার প্রতি-বিধানকল্পে সকল স্বজাতিগণই—বিশেষতঃ কর্ণধারগণ, ধনকুবেরগণ উদ্বুদ্ধ হউন—ইহাই আমার সকাতর প্রার্থনা।

আপনাদের চিরানুগত
শ্রীজগদীশচন্দ্র দত্ত
খুলনা

শুদ্ধিপত্র

বর্তমান সংখ্যা সমাচারের ৬৪১ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের ১৬ পংক্তিতে (স্বর্গীয় গোষ্ঠবিহারী ধর প্রবন্ধে) 'বাইশ বর্ষ' স্থানে 'পনের বর্ষ' হইবে।